অপরাধ ও শাস্তি

ফিওদর দস্তইয়েভ্স্কি

অনুবাদ ।। অরুণ সোম



অপরাধ ও শাস্তি

ফিওদর দস্তইয়েভ্‌স্কি

রুশ থেকে অনুবাদ

অরুণ সোম

সাহিত্য অকাদেমি

Aparadh O Shasti : Bengali translation by Arun Som of Fyodor Dostoyevsky's Russian classic *Prestuplenie i nakazanie*, Sahitya Akademi, Second revised edition, 2005. Price : Rs 180.

ISBN 81-260-2175-6

প্রথম প্রকাশ : ২০০০
দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০০৫

সাহিত্য অকাদেমি
রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ রোড, নতুন দিল্লি ১১০ ০০১
বিক্রয় কেন্দ্র : স্বাতী, মন্দির মার্গ, নতুন দিল্লি ১১০ ০০১
জীবন তারা, ২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫৩
মেইন গুণ বিল্ডিং কমপ্লেক্স, ৪৪৩ (৩০৪) আন্না সলাই, তেয়নামপেট,
চেন্নাই ৬০০ ০১৮
১৭২ মুম্বাই মারাঠি গ্রন্থ সংগ্রহালয় মার্গ, দাদার, মুম্বাই ৪০০ ০১৪
সেন্ট্রাল কলেজ ক্যাম্পাস, ডা. বি. আর. আম্বেদকর বীথি, বাঙ্গালোর ৫৬০ ০০১

মূল্য : ১৮০ টাকা

প্রচ্ছদ : মুনীন্দ্র রাজবংশী

মুদ্রক
ডি. জি. অফসেট, ৯৬ এন, মহারানী ইন্দিরা দেবী রোড, কলকাতা ৭০০ ০৬০

ভূমিকা

আত্মশুদ্ধির ব্রতকথা

দেবেশ রায়

এক

বন্ধু অরুণ সোম সদ্য ভাঙা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে অসহায়ের মত ১৯৯৫-এ কলকাতায় চলে এসেছেন। মস্কোর 'প্রগতি প্রকাশনা' তে তাঁর বাঁধা চাকরি। রুশি স্ত্রী। দুই মেয়ে—তারা সব পড়ছে। মস্কোতে তাঁর একটা ফ্ল্যাটও আছে। সব দিক থেকে অনেক দিন হল ওখানেই থিতু। অরুণ কলকাতার বাংলা দৈনিকে ওখান থেকে রিপোর্টও লিখতেন নানারকম। তিনি সেই সময়কার দিনবদলের কথা দিনের পর দিন এমন করে লিখেছিলেন যে সে-লেখাগুলো এখন পর-পর সাজিয়ে একটা বই করলে উপন্যাসের মত লাগবে। মানে, উপন্যাস পড়ে যেমন, আমরা যা রোজ দেখি তা আবার নতুন করে দেখি, বা যেমন, আমরা যা বুঝে নিই তা আবার নতুন করে বুঝে নিই। রুশভাষাকে মাতৃভাষা করে নিয়ে, অরুণ যেন বাংলা ভাষাটাকে আরো আপন করতে পেরেছেন। ৯০-এর দশকের শেষ দিক তখন। আমরা অরুণকে চেপে ধরলাম, দস্তইয়েভ্‌স্কি-র 'প্রেস্টুপ্লেনিয়ে ই নাকাজানিয়ে' রুশ থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে। আমরা তো একটু চালিয়াতি করেইছিলাম। 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট' না-বলে। রুশ না জেনেও আমরা বোঝাতে চাইছিলাম যে-ইংরেজিতে 'প্রেস্টুপ্লেনিয়ে'র নিকটতম প্রতিশব্দ সোয়া শ বছরে ধরে 'ক্রাইম'ই থেকে গেল, সে-ইংরেজিতে দস্তইয়েভ্‌স্কি-র এই উপন্যাস পড়ব কেন। 'প্রেস্টুপ্লেনিয়ে'র নিকটতম বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে— 'লঙ্ঘন,' যে-কোনো অনুচ্চার নীতিবোধ লঙ্ঘন হতে পারে, যে-কোনো দেগে দেয়া আইন অমান্য হতে পারে— কোথাও একটা লঙ্ঘন ঘটছে। আর, 'নাকাজানিয়ে'ও শুধু শাস্তি নয়, শাস্তির মধ্যে তো একটা শাস্তা থাকে, কিন্তু যে তার লঙ্ঘন-অপরাধের জন্যে নিজেকেই দণ্ড দিচ্ছে— সে তো 'শাস্তি'র জন্যে অপেক্ষা করে নেই। শাহেবরা যা বোঝাবে, তাই চিরকাল ধরে বুঝব নাকী।

অরুণ সোম এমনিতেই ঠাণ্ডা মানুষ। এতটা ইচ্ছা, বন্ধুদের তিনি ঠেকাবেন কী করে। অগত্যা রাজি হলেন। তখন তাঁর স্ত্রী ও মেয়েরা মস্কোতে। কোথায় কী হবে কিছু ঠিক নেই। নিজের সংসারের এই উল্টোপাল্টার মধ্যে অরুণ সোম লেগে গেলেন দস্তইয়েভ্‌স্কি-র 'প্রেস্টুপ্লেনিয়ে ই নাকাজানিয়ে'র বাংলা করতে যা শাহেবদের 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট'-এর বাংলা নয়। এর মধ্যে তাঁর স্ত্রী লুদ্‌মিলা চলে এলেন মেয়েদের

নিয়ে। এখানে মেয়েদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করতে হল। তাঁর স্ত্রী ও মেয়েরাও বাংলা বলেন। তাঁরাও 'প্রেস্টুপ্লেনিয়ে ই নাকাজানিয়ে'র অনুবাদের কাজে সঙ্গ দেন। বাংলা যাঁর মাতৃভাষা আর রুশকে যিনি প্রায় মাতৃভাষাই করে নিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে, তাঁর স্ত্রী আর মেয়েরাও জড়িয়ে পড়েন—রুশ যাঁদের মাতৃভাষা আর বাংলাকে যাঁরা মাতৃভাষা করে নিয়েছেন। প্রায় সোয়া শ বছর আগেকার রুশদেশ আর বিশ শতকের শেষ দশকের ভারত তাঁদের বেঁচে থাকায় ও এই অনুবাদে মিলেমিশে যায়, সোয়া শ বছর আগের সেন্ট পিটার্সবুর্গ ও তাঁদের চেনাজানা লেনিনগ্রাদের রাস্তাঘাট বড়িঘর এই কলকাতায় মিলেমিশে যায়। এক বিপর্যয়ের মধ্যে অরুণ সোম এক বিনিময়ের ভিতর ঢুকে যান।

তেমন এক বিনিময় সব সময় যে সহজে ফলন্ত হয়ে ওঠে তা নয়। 'প্রেস্টুপ্লেনিয়ে ই নাকাজানিয়ে'র নায়ক রাস্‌কোলনিকভ্ চব্বিশ বছর বয়সের এক অস্থিরমতিত্বে ও অসুখে চিরন্তন হয়ে গেছে। পরিত্রাণের জন্যে সে খুব ছক কষে একটা খুন করেছিল, কার্যত অপ্রস্তুতভাবে তা হয়ে দাঁড়ায় দুটো খুন। আর এই খুনের পক্ষে সে এক তত্ত্বও খাড়া করেছিল, যেন তত্ত্বের যুক্তি মানুষের বোধ ও স্বভাবের নিয়ন্তা হতে পারে। পয়সার অভাবে সে মাস ছয়েক আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। ছেড়েও দেয় নি ঠিক, যেমন হয় আর কী, সে আর কলেজে যাচ্ছিল না। খাওয়াদাওয়া নেই, ঘরভাড়া দেয়ার উপায় নেই, টিউশনি আর অনুবাদ করে কখনো-সখনো একটা রোজগারের চেষ্টা চলে। এমন একটি নিরুপায় সম্বলহীন যুবক মাত্র হাজার তিনেক রুবলের জন্যে ছক কষে-কষে খুন করে আর খুনের অপরাধবোধ থেকে বাঁচতে চায়। তেমন এক বাঁচার নিস্তার যেন তার মিলতেও পারে সমাজবোধের-ব্যক্তিবোধের নানা তত্ত্বের তর্ক-বিতর্কে, সেই গত শতকের ষাটের দশকের রাশিয়ার রাজধানী সেন্ট পিটার্সবুর্গে; যেমন হয়তো মিলছিল এই কলকাতাতে, ব্রিটিশ ভারতের প্রাক্তন রাজধানী কলকাতাতে, এই শতকের প্রথম-দ্বিতীয় দশক থেকে হত্যা যেখানে স্বাধীনতার সংগ্রামসূচির অংশ হয়ে গিয়েছিল ও চল্লিশের দশক থেকে ও আবার ষাট-সত্তরের দশকে শ্রেণীশত্রুকে খতম করা শ্রেণীসংগ্রামের কর্তব্যের অন্তর্গত হয়ে পড়েছিল। হত্যার এই তাত্ত্বিক সমর্থন নিয়ে তীব্র কঠিন উপন্যাস তো বাংলাতে লেখা হয়ে গেছে ১৯৩৪ এই, 'চার-অধ্যায়।' রবীন্দ্রনাথ সে-তত্ত্বের বাস্তবকেও যে ঢাকতে চান নি তা প্রথম সংস্করণের এত বছর পর আবার পড়া গেল পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত ১৯৮৬-র রচনাবলী-সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত 'আভাস'-এ। মূল রুশিতে যদি কেউ 'প্রেস্টুপ্লেনিয়ে ই নাকাজানিয়ে' এমন নিবিড় পড়েত থাকেন যার ভিতর থেকে জলছবির মত ভেসে ওঠে বাংলা বাক্য, বাঙালি-ভারতীয় চেতনা আর এই কলকাতা শহর—তাহলে তার দিশাহারা হওয়ারই কথা। তেমন কিছু অসুবিধা অরুণকে কাটাতে হয়েছিল আর তখন হয়তো কিছুদিনের জন্যে নিজেকে তিনি সরিয়ে নিয়েছেন এই লেখা থেকে। আবার, ফিরে গেছেন এই

লেখার কাছে। শেষে, একদিন তিনি 'প্রেস্টুপ্লেনিয়ে ই নাকাজানিয়ে'র চিরস্মৃত শেষ লাইনগুলি বাংলায় লেখেন, 'কিন্তু এখানে শুরু হচ্ছে এক নতুন ইতিকথা—নবজীবনের পথে একজন মানুষের ক্রমবিকাশের কাহিনী, এক জগৎ থেকে আরেক জগতে, নবজন্মে তার ধারাবাহিক উত্তরণের কথা। অভিনব, অজ্ঞাতপূর্ব এক বাস্তবতার সঙ্গে তার পরিচয়ের কথা। সে-সব আরেক নতুন কাহিনীর বিষয়বস্তু হতে পারে। কিন্তু আমাদের এই কাহিনীর এখানেই ইতি।'

বাংলায় 'প্রেস্টুপ্লেনিয়ে ই নাকাজানিয়ে'র এই অবসানে পৌঁছুতে অরুণ সোমকে কতটাই ধারণ করতে হয়েছে এই উপন্যাসকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এক তুলনা থেকে। ইংরেজি 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট'-এ এই শেষ লাইনকটি প্রত্যেক অনুবাদক একটু-একটু করে আলাদা করে নিয়েছেন কেমন, সেটা পড়লে।

মাইকেল স্ক্যামেল-এর অনুবাদে But that is the beginning of a new story, the story of a man's gradual renewal, the story of his gradual rebirth, his gradual transition from one world to another, of his encounter with new and hitherto completely unsuspected reality. That might be the subject of a new story – but our present story is ended.

জুলিয়স ক্যাটজার-এর অনুবাদে But that is the beginning of a new story, that of a man's gradual regeneration, his gradual rebirth, his gradual tansition from one world to another, of how he came to know a new and hitherto unknown reality. All that could be the theme of a new story, but this one is ended.

জেসি কাউলসেন-এর অনুবাদে But that is the beginning of a new story, the story of a man's gradual regeneration, of his slow progress form one world to another, of how he learned to know a hitherto undreamed of reality. All that might be the subject of a new tale, but our present one is ended.

এই অনুবাদগুলিই যে নিলাম তার কারণ, এগুলো সব হালের অনুবাদ—৬৫, ৮৫ আর ৮৯-এ। পুরনো সব অনুবাদ দিলে আরো প্রকট হয়ে উঠত—এক রুশ থেকে ইংরেজিতে কত আলাদা আলাদা বাক্য তৈরি হচ্ছে। আর এই কটি ইংরেজি-অনুবাদের সঙ্গে তুলনা করলেই তো পড়া যায় অরুণ সোম-এর বাংলা কতটা মৌলিক।

অরুণ সোম নিজেই যদি লিখতেন সেই কাহিনী—অনুবাদ করতে-করতে তিনি কী-রকম জড়িয়ে পড়ছিলেন এই উপন্যাসটির পাকে-পাকে, উপন্যাস যতদিন উপন্যাস জেনেই লেখা হচ্ছে সেই শ-চারেক বছরে নতুন-নতুন করে চিরন্তন ও আধুনিক হতে থাকা এই উপন্যাসটির পাকে-পাকে, আর, সেই দম-আটকানো আশ্লেষ থেকে তিনি

কী করে এই উপন্যাসের সমতুল্য বাংলাভাষা আঁকড়ে ধরছিলেন, আবার এই উপন্যাসের মূল ধারক-ভাষা তাঁকে রহস্যের কোন অনাবিষ্কৃত গহনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল—তাহলে আমরা জানতে পারতাম এমন উপন্যাসের ভাষান্তরণের জটিল সংরাগ। কিন্তু অরুণ তাতে রাজি হলেন না ও জেদ ধরলেন যে এ উপন্যাসের একটি ভূমিকা আমাকেই লিখতে হবে। তেমন একটা কথা নাকী তাঁকে দেয়াও ছিল—এ উপন্যাস অনুবাদের কোনো এক সময়ে।

এই ব্যক্তিগত কথাটুকু পাঠককে জানানো দরকার, কারণ এই উপন্যাস পড়ার পর তাঁর তো যুক্তিসঙ্গত মনে হতে পারে বা মনে হওয়াই উচিত—এই কীর্তিতে আমার এই ভূমিকার উদ্দেশ্য নেপোর দৈ-মারা কী না। ১৮৬৬-তে বেরবার পর দস্তইয়েভ্স্কির এই উপন্যাসটি বোধহয় উপন্যাসের ইতিহাসে সর্বাধিকতম আলোচিত বই। সাহিত্য-শিল্পের আলোচনায় এমন 'সর্বাধিক' বা 'সর্বনিম্ন' বিশ্লেষণগুলি দিয়ে যেমন পরিমাণের একটা আভাস দেয়া হয়, আমি তেমন একটা অস্পষ্ট আভাসই মাত্র দিতে চাই। এটুকুও বলতে চাই 'প্রেস্টুপ্লেনিয়ে ই নাকাজানিয়ে'র মত অন্য কোনো উপন্যাস উপন্যাসশিল্পের নানা ধরণ-ধারণকে এমন নিয়ন্ত্রণ করে নি। হয়তো একমাত্র তুলনীয় সারভেনতিস-এর ডন কিহোতে। আবার, গেয়র্গ লুকাচ-এর মত উপন্যাসতাত্ত্বিকরা এই উপন্যাসটি নিয়ে সারা জীবনে প্রায় কোনো কথাই বলেন নি, দস্তইয়েভ্স্কিকে নিয়েও বলেন নি—লুকাচের শেষজীবনের প্রায়শ্চিত্তগোছের লেখাটির কথা মনে রেখেও বলছি। অথচ গত প্রায় তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছরে, মিখাইল বাখতিন-এর লেখাগুলি বেরবার পর, দস্তইয়েভ্স্কি যেন এক নতুন বিষয়ই হয়ে উঠেছেন, তাঁর এই প্রধান উপন্যাসটিও নতুন করে পড়তে হচ্ছে। এই যে-উপন্যাস নিয়ে বারবার নিৎসে আর ফ্রয়েড-এর কথা *ওঠে*, সেই উপন্যাসটি যখন বেরিয়েছিল (১৮৬৬), তখন নিৎসে মাত্রই ২২ বছরের যুবক আর ফ্রয়েড ১০ বছরের বালক। উপন্যাসের ফর্মের ইতিহাসে—*ফ র্মে র* ইতিহাসে, *বি ষ য়ে র* দার্শনিক ইতিহাসে নয় বা সাহিত্যের *কালানুক্রমিক* ইতিহাসে নয়— 'প্রেস্টুপ্লেনিয়ে ই নাকাজানিয়ে' হয়তো-বা *একমাত্র* উপন্যাস যা চিরকাল সর্বাঙ্গীণ সমকালীন থেকে যাচ্ছে। এমনকী দস্তইয়েভ্স্কির অন্য প্রধান উপন্যাসগুলিও—'ইডিয়েট' (১৮৬৭), 'কারামাজোভ্ ভাইয়েরা' (১৮৮০)—এখন পড়তে গেলে তখনকার শহর-গ্রাম, যানবাহন, রাস্তাঘাট, ধরণধারণ, আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, ভাবভঙ্গি, জামাকাপড় আমাদের একটু-একটু করে বুঝে নিতে হয়। অথচ 'প্রেস্টুপ্লেনিয়ে ই নাকাজানিয়ে'তে সময়ের তেমন কোনো আড়াল কোনো সময়ই ঘটে না, যদিও এই উপন্যাসে এখনকার সেন্ট পিটার্সবুর্গের সবচেয়ে নামকরা টুপিওয়ালার উল্লেখ (৩ পৃষ্ঠা), তখনকার সবচেয়ে চালু গানের লাইন (২০ পৃষ্ঠা), এমনকী ১৮৬৫-র ৪ জুলাই রাস্তাঘাটে সিগারেট খাওয়া বারণের আইন যে তুলে নেয়া হয় তার ইঙ্গিত পর্যন্ত আছে (৫১ পৃষ্ঠা)। মাতালদের কথাবার্তা,

কোচোয়ানদের 'সামাল সামাল' চিৎকার, বাড়িউলিদের বোলচাল, বেশ্যা ও বাবুদের পোশাক-আশাক, নেশাভাঙ, শস্তার ঘর আর হোটেলের খাওয়ার জায়গার চেয়ার-টেবিল-তক্তপোশ, নতুন বাড়ি তৈরির সময়কার গুদাম বা গলি, ফাঁড়ির সিঁড়ি—এই সব, এই সব-কিছু, যা দিয়ে একটা সময়কে চেনা যায়, চেনানো যায়, এ উপন্যাসে পরতে-পরতে মিশে আছে। যেন সময়-সময় মনে হয়, দুই লাইনের মাঝখানে সেই সেন্ট পিটার্সবুর্গের রাস্তার ধুলো উড়ে গেল। এতটা সময়নির্দিষ্ট, সময়বাধ্য ও সময়নিয়ন্ত্রিত যে-উপন্যাস তাতে সময়ের চিহ্নগুলি সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে তাদের প্রামাণিকতা একটুও না খুইয়ে বা না ক্ষইয়ে সময়ের অনিবার্য বদলের সঙ্গে মিশে মিশে যাচ্ছে এই ১৩৪ বছর ধরে। এমনকী তত্ত্বের যে-তর্ক, রাশিয়ায় মান্য অর্থডক্স চার্চের খ্রিস্টধর্ম আর ব্যক্তি ও সমাজের মুক্তি নিয়ে যে-আস্থা-অনাস্থা তাও এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে পাঠকদের কাছে নানা সময়ে — সে-সবও তো ঐ সময়েই মাত্র প্রাসঙ্গিক। অথচ এই ১৩৪ বছর জুড়ে সেই প্রসঙ্গও রচনাকালীন সময়ের প্রয়োজন ও সীমা ভেঙে-ভেঙে পাঠকালীন সময়ের সমসাময়িক হয়ে উঠেছে, পাঠকের সমসাময়িক। উপন্যাসে মহত্তম যে-সব কীর্তি তৈরি হয়েছে, তাতে অবিশ্যি এটা মহত্ত্বের আবশ্যিক শর্ত নয়। মহত্তম নিয়ে যদি দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে, তাহলেও বলা যায়, যে-সব উপন্যাস একশ-দুশ বছর ধরে পড়া হয়ে আসছে সে-সবের বেলায় এমনটাই যে ঘটে তা নয়। বরং সময়চিহ্ন প্রকটই থাকতে পারে, যেমন প্রায়শই ঘটে বালজাকে। বা লেখকের নিজের সময় পেছিয়ে ঢুকে যেতে পারে অতীতের কোনো সময়ে, যেমন বারবারই ঘটে টোমাস মানের ১৯৪০-এর পরের নানা উপন্যাসে। তেমন তো দস্তইয়েভ্স্কিরও ঘটেছে। বা, সময়ের স্পষ্ট চিহ্নগুলি উপন্যাসের গল্পকে কখনো-বা এক পৌরাণিকতা মাখিয়ে দিতে পারে যাতে সে-লেখা আষ্টেপৃষ্ঠে সময়ের সব ক্ষত আর অলঙ্কার নিয়েই সমকালীন হতে থাকে, যেমন ঘটে তলস্তয়ে বা স্তাঁদালে বা ডিকেন্সে বা বঙ্কিমচন্দ্রে—'আনা কারেনিনা'য় বলনাচে আনার রূপ আর 'কপালকুণ্ডলা'য় নবকুমারের সঙ্গে প্রথমদেখায় কপালকুণ্ডলার রূপ সময়ের ফ্রেমে অনড়। 'প্রেস্টুপ্লেনিয়ে ই নাকাজানিয়ে'তে এই ফ্রেমটা অনড়ও থাকে, আবার বদলে-বদলেও যায়। সেই গল্পের মত। এক কাঠুরেকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'তোমার এই কুড়ুলটা কত দিনের?' সে চোখবুজে নিশ্চিত স্বরে জবাব দেয়, 'এ তো বাপঠাকুরদার কুড়ুল, চোদ্দ পুরুষের।' 'তা কখনো হয়? এতদিন কোনো লোহা থাকে? হাতল থাকে?' 'ধার ক্ষয়ে গেলে লোহা বদলে নিয়েছি। হাতল ভেঙে গেলে নতুন হাতল বানিয়ে নিয়েছি। তাতে কি আর চোদ্দ পুরুষের কুড়ুলের এক পুরুষও কমে?

দুই

৬ অক্টোবর, ১৯৮৪, শনিবার, ইয়োরোপস্কায়া হোটেল, লেনিনগ্রাদ।

সকাল সাড়ে নটা নাগাদ হোটেলের নীচের তলার লবিতে নেমে আসি। তেমনই

কথা ছিল। ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান গবেষণা পর্ষদের প্রতিনিধি হয়ে আমরা কয়েকজন এসেছি এখানে এক সেমিনারে। কাল পর্যন্ত সেমিনার হয়েছে—আজ আমাদের শহর দেখাবে। কালও দেখাবে। লেনিনগ্রাদ আমার আগে খুব ভাল করে দেখা। বরং একা-একা চেনা রাস্তাগুলো আর জায়গাগুলো খুঁজে বের করতে ভাল লাগবে। তাই করব। তবু সকালে এখন লবিতে নেমে এসেছি সবাইকে জানান দিতে—আমি আছি, ভাল আছি।

যেমন হয়, সবাই ঠিক সময়ে নামেন না। আমি হোটেলের কাচের বড় দরজা ঠেলে সিঁড়ির এক কোণে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখি। একটু রোদ উঠেছে, আমাদের হোটেলের উল্টোদিকের বাড়ির দেয়ালে-ফুটপাথে পড়েছে ঝকমকে রোদ। রাস্তায় গিয়ে একটু রোদে দাঁড়াতে ইচ্ছে হল।

দাঁড়িয়ে আছি — যে-গাড়িটা আমাদের নিয়ে যাবে সেটা সামনে এক ধারে দাঁড়িয়ে। যে ছেলেটি, এই বছর বাইশ-চব্বিশের, আমাদের সব দেখাবে সে একবার লবিতে ঢুকছে, আবার বেরিয়ে গাড়িটার কাছে যাচ্ছে, আবার পকেট থেকে কাগজ বের করে কী মেলাচ্ছে, আবার লবিতে ঢুকছে। ঘড়িও দেখছে মাঝে-মাঝে। মিখাইল বলেই তো ডাকা হচ্ছিল ওকে।

সে রাস্তা পেরিয়ে হঠাৎ আমার কাছে চলে এল। একটু হেসে, গোপন কথা বলার স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'রাস্‌কোল্‌নিকভের বাড়ি দেখবে?'

এই ক-দিনেই বুঝে গিয়েছিলাম মিখাইলের সাহিত্যের নেশা আছে। প্রায় হিশেব কষছিলাম, ও ওর লেখা কবিতা শোনাতে চাইবে কবে? ইঞ্জিনিয়ারিঙে কী পাশ করে আবার সাহিত্য পড়ছে। তার জিজ্ঞাসায় আমি জানতে চাইলাম, 'কোন রাস্‌কোল্‌নিকভ্?'

ওর সঙ্গে অনেক গল্প হয়েছে এই ক-দিনে। সেই ঘনিষ্ঠতার সুবাদে ও চোখ মটকে বলল, 'পৃথিবীতে রাসকোল্‌নিকভ তো একজনই।' সে এবার মুচকে হাসল। আমি বলে উঠলাম, 'সত্যি নাকী? রাস্‌কোল্‌নিকভের বাড়ি দেখা যায় নাকী? নাকী বানিয়ে-বানিয়ে বলছ!' ছেলেটি বুঝে ফেলেছে মাছ টোপ গিলেছে। সে পা নাচাতে-নাচাতে বলল, 'শুধু রাস্‌কোল্‌নিকভের বাড়ি না। সোনিয়ার বাড়ি। সেই বুড়ির বাড়ি—যাদের দু-বোনকে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ খুন করল। সেই সব রাস্তা। সেই হে-মার্কেট স্কোয়্যার—থানায় গিয়ে স্বীকার করার আগে যেখানে রাসকোল্‌নিকভ্ মাটিতে চুমু খেয়েছিল। সব স-ব। পুরো প্রেস্টুপ্লেনিয়ে ই নাকাজানিয়ের জায়গা।'

'এত বছর ধরে সে-সব আছে নাকী? কিছু বদলায় নি?' কথাটা বলে নিজেরই অপ্রস্তুত লাগল। লেনিনগ্রাদে পুরনো সব বাড়ির বয়স অনুযায়ী এক-এক রঙ। রঙ দেখেই চেনা যায় কোন শতকের। প্রথম যেবার এসেছিলাম ৭৬-এ, বৃষ্টিভেজা কাকভোরে এক খালের ব্রিজের ওপর দিয়ে হোটেলের দিকে যেতে-যেতে গাড়ি থেকে

নাতাশা আঙুল তুলে আমাকে দেখিয়েছিল 'দি গ্রেট হর্সম্যান'-এর মূর্তি, পিটার দি গ্রেট, মনে করিয়ে দিয়েছিল পুশকিনের কবিতাটি। ইয়োরোপে শহর-গ্রাম কি খুব কম বদলায়, অন্তত গত 'শ-তিন-চার বছরে? নাকী ওরা যা বদলাবার একবারে বদলে নিয়েছে? অথচ আমাদের দেশে বা জাপান-চিনে বা আফ্রিকায় শহর তৈরি, বাড়ি তৈরি আর- বাড়িভাঙা যেন শেষ হয় না। ইয়োরোপেও দু দুটো যুদ্ধ গেল। এই লেনিনগ্রাদ শহরে তো তিন বছরের অবরোধ ছিল। তারপরে তারা আবার পুরনো শহরটাকে পুরনো তৈরি করে তুলল। ইয়োরোপের প্রাচীন আমাদের প্রাচীনের মত প্রাচীন নয় বলে তারা তাদের আধুনিক-প্রাচীনকেও ছাড়তে চায় না? বোধহয় ইয়োরোপ আমাদের চেয়ে বেশি রক্ষণশীল। অথবা, ইয়োরোপের সমাজ শিল্পবিপ্লবের ফলে প্রতিষ্ঠানে বদলে গেছে বলে তাদের সমাজ বা কৌমের একটা পেছুটান ভেতরে ভেতরে কাজ করে! তাই বলে ১৮৬৬র একটা উপন্যাসের মানুষজন, তাদের শোয়াবসা, ঘোরাফেরার জায়গাগুলো এমন রাখা যায় নাকী? একটা আভাস হয়তো আসে—বিহার-উত্তরপ্রদেশের লাগোয়া জমিজিরেত মানুষজন দেখলে মনে হয় প্রেমচাঁদের জায়গা, বা বাঁকুড়ায় এখনও 'দুর্গেশনন্দিনী' মনে করা যায়, বা বাংলার নদীপার মানেই 'গল্পগুচ্ছ', বা তারাশঙ্কর-এর মাঠঘাট, শ্মশান-নদী। প্যারিসকেও ছকে নেয়া যায় উপন্যাস থেকেই—বিপ্লবের আগে, বিপ্লবের পরে। ডাবলিন ধ্বংস হলেও নাকী 'ডাবলিনার্স' থেকে তৈরি করা যাবে। লন্ডনকেও ডিকেন্স থেকে। ইংল্যান্ডের গ্রামকে জেন অস্টিন, ব্রন্টি ও লরেন্স থেকে। আরো এমন কতই তো ভাবা যেতে পারে। তাই বলে কেউ বলতে পারে, বা, এমন করে কেউ বলে নাকী, 'রাস্‌কোল্‌নিকভের বাড়ি দেখবে?'

মিখাইল রাস্তা টপকে হোটেলের ফুটে ফিরে যাচ্ছিল। অমি তাকে পেছন থেকে ডেকে রাস্তা পার হতে-হতে বললাম, 'তুমি কি টের পেয়েছিলে আমি তোমাদের সঙ্গে বেরব না? চ-লো। কাউকে বলো না।'

মিখাইল শেয়ানা ছেলে। কেন কাউকে বলতে না বললাম তা সে বুঝে নিল। আর গাড়ি চলা শুরু করলে যখন আমাদের লোকজন তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, 'কোথায় যাচ্ছি,' তখন সে না-শোনা না-বোঝার ভান করে জানলা দিয়ে এদিক-ওদিক চোখ ঘোরাতে লাগল। শুধু শিশিরকে কানে-কানে বলে দিলাম। অধ্যাপক শিশির কুমার দাশ।

গাড়িটা বেশ জোরেই যাচ্ছিল। পায়ে-পায়ে হেঁটে লেনিনগ্রাদ একটু-আধটু চেনা হলেও আমার পক্ষে আন্দাজ করা সম্ভব নয় গাড়িটা কোন দিকে যাচ্ছে। আমাদের হোটেলটা ছিল বিখ্যাত রাস্তা নেভস্কি প্রসপেক্ট-এর পাশেই, একটা ছোট রাস্তায়। তাই, কোথাও যেতে হলে ডাইনে ঘুরে নেভস্কি প্রসপেক্টই ধরা হত। কিন্তু আমাদের গাড়িটা সেদিন নেভস্কি প্রসপেক্ট-এর দিকে ঘুরলই না—ঐ ছোট রাস্তা ধরেই সোজা

দক্ষিণদিকে ছুটতে লাগল, ছুটতে-ছুটতে এক মোড়ে এসে ডান দিকে ঘুরে উত্তরে গিয়ে আবার একটা মোড়ে বাঁয়ে ঘুরে, একজায়গায় থেমে গেল। আর মিখাইল 'নামো, নামো' বলে নেমে দ্রুতপায়ে একদিকে হাঁটা দিল। আমাদের দলের সবাই ঠিক বুঝে উঠতেও পারল না, তাদের কী করতে হবে। তবে, মিখাইলের পেছন-পেছনই তারা যাচ্ছিল। আমি মিখাইলের পাশে চলে যাই। মিখাইল প্রায় গোপন-নির্দেশের মত বলে, 'এই হল গ্রেফনায়া মেসচেনস্কায়া স্ট্রিট, রাস্‌কোলনিকভের রাস্তা। এইটা ৯ নম্বর বাড়ি। রাসকোল্‌নিকভ ভাড়া থাকে।' বলে সে ডানদিকে একটা বাড়ির দেউড়িতে ঢুকল। ঢোকার পথেই ডাইনে আঙুল নাড়িয়ে দেখিয়ে দিল, 'দারোয়ানের ঘর। ঐ যে কয়লার জায়গা।' তখনো কয়লা ছিল। 'ওখান থেকেই সেই ছোট কুড়ুলটা নিয়েছিল।' মিখাইল আবার ডানদিকে ঘোরে— 'সিঁড়ি। এই সিঁড়ি বেয়েই রাস্‌কোলনিকভ ওঠানামা করত। গুনে-গুনে দেখো। নভেলে যে-কটা সিঁড়ি লেখা আছে সে-কটাই।' পুরনো আমলের ইট-সাজানো সিঁড়ি, মানুষের পায়ে-পায়ে মাথা ক্ষয়ে গেছে। পাঁচতলার ছাদ—রাস্‌কোল্‌নিকভের ঘর। শিশির এত হৈ হৈ করে দৌড়ে-দৌড়ে এত উঁচুতে উঠতে পারে না। ওর বুকে কষ্ট আছে। রাস্‌কোল্‌নিকভের ঘরটা একটা বেশ বড় ছাউনি দেয়া ঘর, নোংরা। উপন্যাসে যেমন ঘুপচি বলা হয়েছে, ঠিক তেমন নয়। মিখাইল আবার দলবল নিয়ে নীচে নামতে লাগল, সেই সিঁড়ি বেয়েই, রাস্‌কোল্‌নিকভের সিঁড়ি। আমি ঠিক রোমাঞ্চিত হওয়ারও সময় পেলাম না। কিছুটা ছুটতে-ছুটতে এসে গাড়িতে উঠলাম। অস্বস্তি নিয়েও। গাড়ি চলা শুরু করার পর মিখাইল তার আসনের সামনে আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে সবাইকে জানিয়ে দিল, 'আমরা এখন সেন্ট আইজ্যাকস ক্যাথিড্রালে যাচ্ছি।'

খানিক ভেবে রহস্যটা বের করি।

আমাদের নিয়ে কোথায়-কোথায় কী কী দেখাতে হবে তার তো একটা নির্ধারিত সূচি নিশ্চয়ই করা আছে। এ তো সরকারে-সরকারে প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা। তাতে 'রাসকোলনিকভের ঘর' থাকতেই পারে না। ছিলও না। ওটা মিখাইলের নিজের বানানো। বানাতে গেল কেন মিখাইল—এতটা বেশি দায়িত্ব নিয়ে। একটা কারণ, সহজ কারণ, সাহিত্যের টান, নইলে আর সে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে আবার সাহিত্য পড়তে শুরু করেছে কেন। এই সহজ কারণটাকেই আর-একটু সহজ করে নেয়া যায়—ওর সঙ্গে আমাদের দু-একজনের রুশ সাহিত্য নিয়ে অনেক গল্প হয়েছে, ও সোভিয়েতে, ঐ লেনিনগ্রাদেই, বইয়ের গোপন বাজার নিয়ে অনেক কথা একটু ইতস্তত করতে-করতে বলে ফেলেছে। যে-সব বই বাণিজ্যপথে আসে না, সে-সব বই ঐ চোরাইপথে বিনিময় হয়। একটু অভিনয় করেও দেখিয়েছিল— কোন একটা রাস্তায় নাকী যে বই বদলাতে চায় বা বেচতে চায় সে বইটার নাম পড়া যায় এমন করে বুকে ধরে হেঁটে যায়। অনেক পরে বুঝেছি, সেদিন হঠাৎ আমাদের

রাস্‌কোল্‌নিকভের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কারণটা একটু জটিলই ছিল। তখন সেই ১৯৮৪-তে সোভিয়েতে সমাজতান্ত্রিক ধারণা নিয়ে আপত্তি আর ঐ জীবনযাপনে অসম্মতি ছড়িয়ে পড়ছিল, ভিতরে ঢুকে যাচ্ছিল, এক নিরুপায় বিক্ষোভের ঘূর্ণি টেনে নিচ্ছিল মিখাইলকে ও তার বয়সীদের। যেমন করছিল শতাধিক বৎসর আগে রাস্‌কোলনিকভ্‌কে — সেও তো ছিল চব্বিশ বছরের যুবক, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে-পড়তে পড়া ছেড়ে দিতে হয়েছে তাকে, সেও তো তার নিরুপায়তা থেকে মুক্তি খুঁজছিল, আর সেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় একটি পরিকল্পিত খুন ও সেই খুনের অঙ্গাঙ্গী আরো একটা খুন করা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল নিজেকে। ১৯৮৪-র মিখাইল তাই সরকারি সূচি অগ্রাহ্য করে বা সরকারি সূচির ভিতর ঢুকে নিজের সূচি তৈরি করেছিল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ই কেন? কেন রাস্‌কোল্‌নিকভেরই সঙ্গে এই আত্মতা? কারণ, রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ কৃতকর্মের দায় মেনে নিয়েছিল ও শেষ পর্যন্ত রাস্‌কোল্‌নিকভের কাহিনী নৈতিক বিজয়ের কাহিনী। মিখাইলের কি সেদিন এক বিগ্রহের প্রয়োজন হয়েছিল—বিদ্রোহের ও বিজয়ের বিগ্রহ?

এ সব ভাবনার তো ভুলঠিক বলে কিছু হয় না। অনেক পরে যে এমন একটা ভাবনা মাথায় এসেছিল তাতেই শুধু মনে হয়, হতেও তো পারে।

সেদিন ঐ রকম দৌড়তে-দৌড়তে রাস্‌কোল্‌নিকভের বাড়ি দেখে আমার তো আশ মিটল না। মিখাইলের সঙ্গে কথা বলে রাখলাম যে পরশুদিন বেলা দুটোর সময় শুধু আমরা দু-জন যাব। সন্ধের মধ্যে হোটেলে ফিরলেই হবে।

৮ অক্টোবর, ১৯৮৪ সোমবার, খানিকটা হেঁটে, খানিকটা গাড়িতে ঐ হে-মার্কেট স্কোয়্যারে যখন পৌঁছুলাম তখন বিকেল।

আগের দিন যে-বাড়িটাতে ঢুকেছিলাম, সেটাই, তবে সেটা স্রেফনায়া মেসচেনস্কায়া স্ট্রিটে নয়। উপন্যাসে বলা আছে, স্টলিয়ারনি লেন। অমন খোপ-খোপ অনেক বাড়িই সেখানে। বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বাড়িটাকে দেখলাম, বাইরে থেকে। পরে, সোনিয়া যে-বাড়িতে ঘর নিয়ে ছিল আর সেই বন্ধকি-ব্যাবসার বুড়ি আলিওনা ইভানোভনার বাড়ি, এসব দেখে বুঝি, সব একই রকম— একটা বড় দেউড়ি বা ফটক, তার একদিকে সিঁড়ি, এক-একটা তলায় দুদিকে সব ঘর।

সেদিনও মিখাইল আমাকে দারোয়ানের ঘরটার দিকে আঙুল তুলে দেখাল, 'ঐ কয়লার পাঁজা থেকে কুড়ুলটা নিয়েছিল।' দারোয়ানের ঘরে মুখ ঢুকিয়ে দেখলাম— কয়লা এখনো আছে। মিখাইলকে বললাম, 'চলো, রাস্‌কোল্‌নিকভের ঘর থেকে নামি, সেদিনের মত।'

আমরা পাঁচতলার চিলেকোঠায় উঠলাম। দরজা খোলা। খোলাই থাকে? ভিতরটা চাপা, ঘুপচি, নোংরা। অথচ আকারে উপন্যাসে যেমন বলা হয়েছে, 'বড় জোর ছয় পা' তা নয়, তার চাইতে বেশ বড়, সেই তিনটি চেয়ার, একটা টেবিল আর শোয়ার

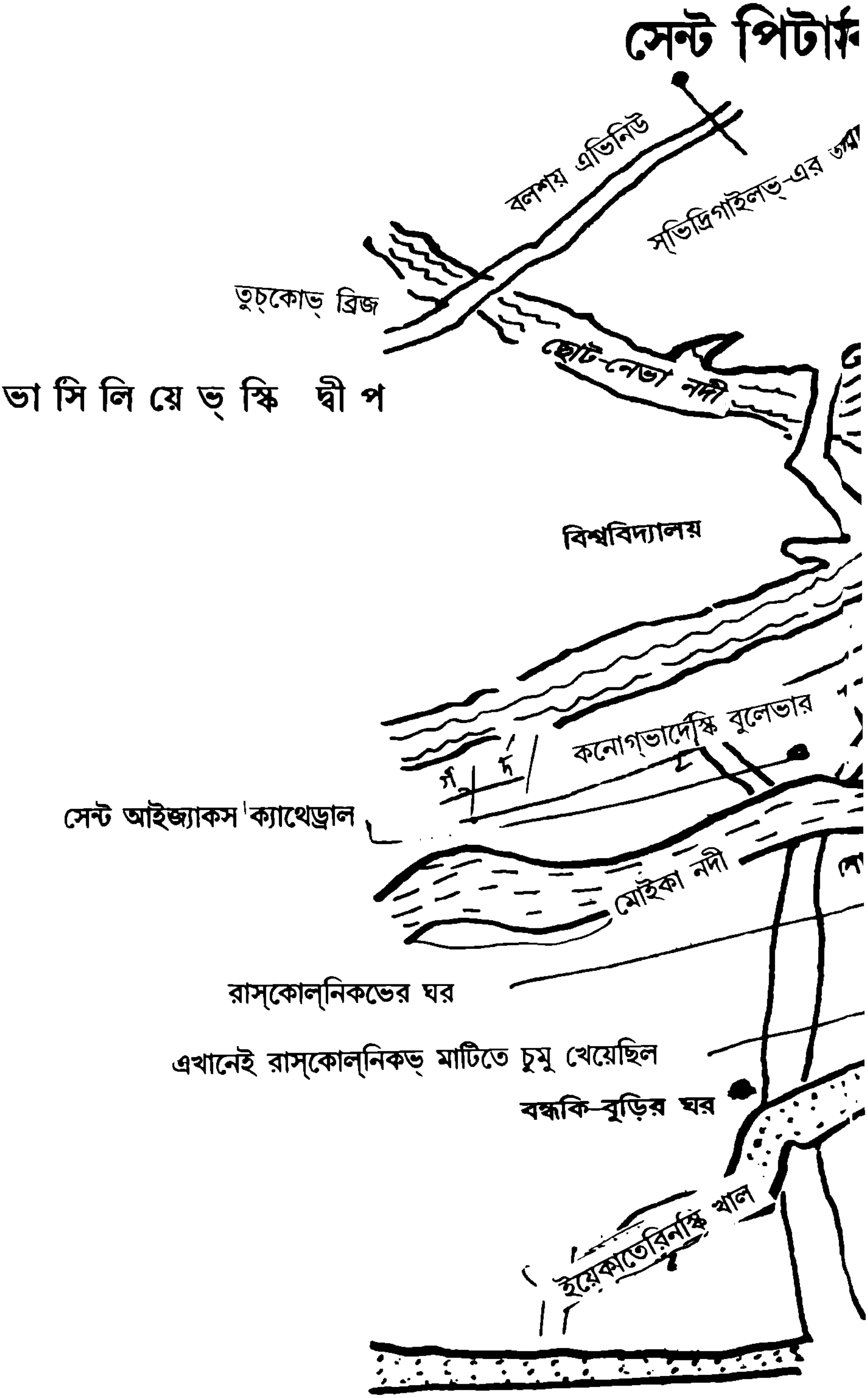
সোফার পক্ষেও বড়। আমরা ঘর থেকে বেরলাম, সেদিনের রাস্‌কোল্‌নিকভের মত। গুনে-গুনে তেরটি ধাপ নেমে চারতলার এসে ডানদিকে তাকালাম। বাড়িউলির রান্নাঘরের দরজা খোলা, সেদিনের মতই সেখান থেকে কুড়ুল নেয়া হল না— নাস্তাসিয়া কাজ করছে। 'রাস্‌কোল্‌নিকভ চোখ ফিরিয়ে নিয়ে এমন ভাবে জায়গাটা পার হয়ে গেল যেন ওকে লক্ষ্যই করে নি' (৭৯ পৃষ্ঠা)। 'রাগে জ্বলেপুড়ে নিজেকে নিয়ে নিজেরই হাসতে ইচ্ছে করছিল তার' (৭৯ পৃষ্ঠা)। 'তার দুই পা দূরে দারোয়ানের খুপড়ির ভেতরে ডানদিকের বেঞ্চের তলা থেকে কিসের একটা ঝলক ঠিকরে পড়চে তার চোখে।...কুড়ুলই বটে' (৭৯ পৃষ্ঠা)।

আমরা এর পর রাস্‌কোল্‌নিকভের মতই একটু ঘুরপথে হাঁটতে-হাঁটতে যাব সেই বুড়ির বাড়িতে, যাকে খুন করা হবে। সেটা থেকে আর এদিকে ফিরে আসা হবে না বলে মিখাইল নিয়ে গেল সোনিয়ার ঘরে, ঐ স্টলিয়ারনিই লেনেই, রাস্‌কোল্‌নিকভের বাড়ি থেকে পিঠোপিঠি দু-সারি বাড়ি পরে। সোনিয়ার ঘর বলে আলাদা কিছু নেই তবে যে-কোনো ঘরে গেলেই বোঝা যায় সোনিয়ার ঘরের সেই টেবিল আর চেয়ার, সেই মেঝে, যেখানে বিমূঢ় সোনিয়ার পদচুম্বন করেছিল রাস্‌কোলনিকভ, 'আমার এই প্রণতি তো তোমাকে নয়, মানুষের এই যে এত দুঃখ-যন্ত্রণা তাকেই' (৩৫৯ পৃ.), যেখানে 'শাশ্বত গ্রন্থ পাঠের জন্যে মিলিত' হয়েছিল 'এক পুরুষ আর এক নারী— একজন খুনি, অন্যজন ভ্রষ্টা' (৩৬৭ পৃ.), সেই ঘরে সোনিয়া, বেশ্যা, দৈবগ্রস্ত, ওরাক্‌ল্‌-এর মত, নির্দেশ দিয়েছিল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে, 'যে মাটিকে তুমি অপবিত্র করেছ প্রথমে তাকে চুমু খাও, তারপর চারদিকে ঘুরে-ঘুরে দুনিয়াশুদ্ধ সবাইকে মাথা নুইয়ে প্রণাম জানাও,' (৪৭২ পৃষ্ঠা)।

সোনিয়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে মিখাইল দেখালো সাদোভায়া স্ট্রিট যেখানে ওবুখোবস্কি প্রসপেকটে মিশেছে, রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ আর সোনিয়ার স্টোলিয়ারনি লেনের কোনাকুনি উল্টোদিকে, সেই হে-মার্কেট স্কোয়্যার। সেখানে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ আত্মসমর্পণের আগে সোনিয়া যা যা বলেছিল ঠিক তাই তাই করেছিল— মাটির ধুলোতে ঠোঁট ঠেকিয়েছিল, তারপর আবার নত হয়ে চারদিকের মানুষজনকে প্রণাম জানিয়েছিল।

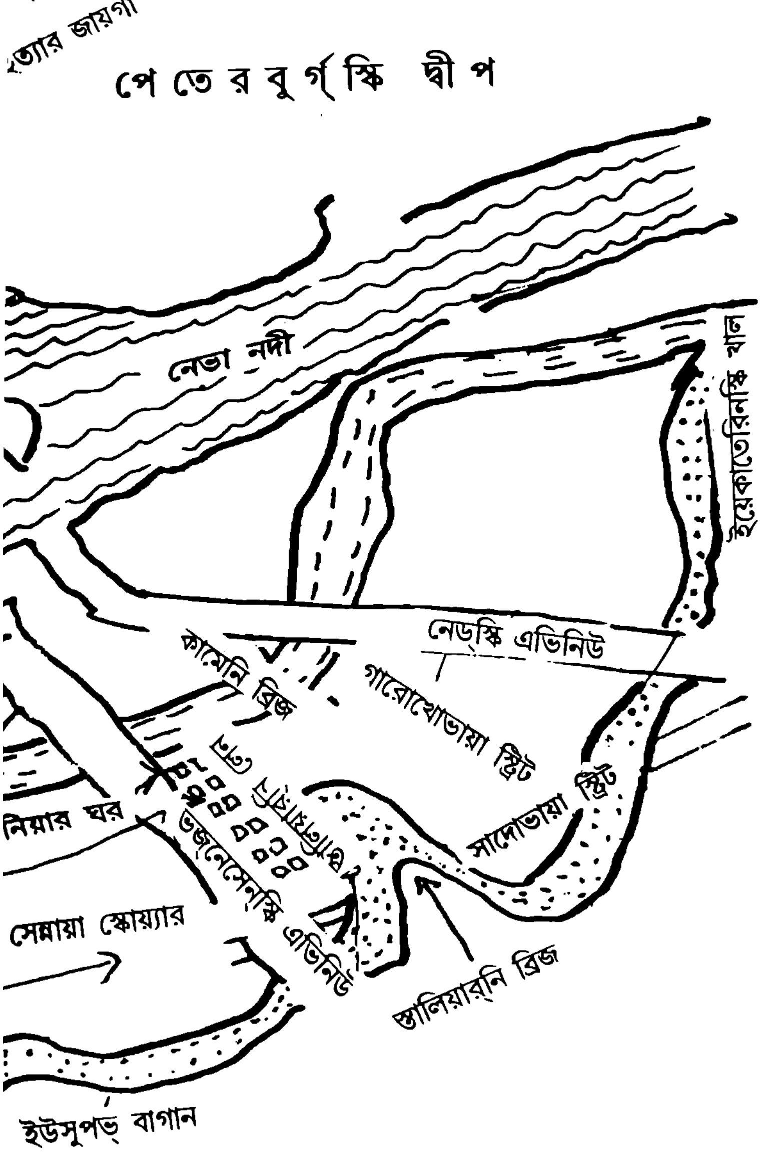
এইবার আমরা কোকুশকিন ব্রিজ দিয়ে ইউসুপভ গার্ডেনসের পাশ দিয়ে অ্যালয়না ইভানভনার বাড়ির দিকে হাঁটি। বন্ধকী ব্যবসা করেন। তাঁকেই খুন করতে যাচ্ছে রাস্‌কোল্‌নিকভ তার বাড়ি থেকে গুণে-গুণে ৭৩০টি পা ফেলে (৩ পৃ.)। পরে, অতিরিক্ত খুন করতে হবে তাকে, ইভানভনার বোন লিজাভেতাকেও।

এখানে আমি জোর করেই নিজেকে থামাচ্ছি। আমি তো উপন্যাসের পেছু-নেয়া কোনো ভ্রমণকাহিনী বলতে চাইছি না, কতদূর সত্যঘটনা অবলম্বনে তাও জানতে চাইছি না।



সেন্ট পিটার্স
বলশয় এভিনিউ
সভিদ্রিগাইলভ্-এর
তুচ্‌কোভ্ ব্রিজ
ছোট-নেভা নদী
ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপ
বিশ্ববিদ্যালয়
কনোগভার্দেস্কি বুলেভার
সেন্ট আইজ্যাকস ক্যাথেড্রাল
মোইকা নদী
রাস্‌কোল্‌নিকভের ঘর
এখানেই রাস্‌কোল্‌নিকভ্ মাটিতে চুমু খেয়েছিল
বন্ধকি-বুড়ির ঘর
ইয়েকাতেরিনাস্কি খাল

বুর্গের সেই অঞ্চল


ত্যার জায়গা
পে তে র বু র্গ স্কি দ্বী প
নেভা নদী
ইয়েকাতেরিনস্কি খাল
নেড্স্কি এভিনিউ
কামেনি ব্রিজ
গারোখোভায়া স্ট্রিট
সাদোভায়া স্ট্রিট
নিয়ার ঘর
ভজনেসেনস্কি এভিনিউ
সেন্নায়া স্কোয়্যার
স্তালিয়ারনি ব্রিজ
ইউসুপভ্ বাগান

তিন

দস্তইয়েভস্কির সেন্ট পিটার্সবুর্গে ‘প্রেস্টুপ্লেনিয়ে ই নাকাজানিয়ে’র ঘটনাগুলো যেখানে ঘটেছিল, সেই উপন্যাসের বানানো লোকজন যে-সব সত্যিকারের রাস্তায় আর জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কাল্পনিক সেই মানুষজন বাস্তবিক যে-শহরে বানানো কথা বলছিল, মারা যাচ্ছিল, খুন করছিল, খুন হচ্ছিল, বেশ্যারা খদ্দের ধরার জন্যে যে-সব পার্কে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, রাস্তার পাশের যে-সব ছোটখাট মদের দোকানে মদ খেয়ে মাতালরা ফূর্তি করছিল বা অফুরন্ত ও বিষণ্ণ জীবনবৃত্তান্ত বলছিল, পুলিশরা যে-থানায় বসে চোর-বাটপাড়-বাড়িউলিদের এজাহার লিখছিল আর হঠাৎ-হঠাৎ এক-একজনের খুনের স্বীকারোক্তি শুনছিল, গ্রাম থেকে শস্তায় কাজের মেয়েকে বিয়ের অছিলায় শহরে এনে যে-ঘরে রেখে তাকে পাচারের ফন্দি এঁটেছিল শহরের বাবু, গ্রামের মেয়েবাজ দেউনিয়া শহরে এসে হঠাৎ টাকাপয়সা বিলিয়ে দিয়ে যেখানে নিজের কপালে গুলি মেরে আত্মহত্যা করেছিল, শহরের অজস্র খালের যে-এক-একটা ছোট ব্রিজ থেকে দেখা যাচ্ছিল জলে ঝাঁপিয়ে কেউ আত্মহত্যা করল, বা যে-এক-একটা ব্রিজ থেকে জারের প্রাসাদ বা ক্যাথিড্রালের পেছনের আকাশে সেন্ট পিটার্সবুর্গের নিজস্ব বিলম্বিত সন্ধ্যারও আকাশ দেখা যাচ্ছিল, ১৯৮৪-র ৮ অক্টোবর সোমবার বিকেলে, তখনকার লেনিনগ্রাদে। সেই সব কিছু দেখতে-দেখতে সেই সব কিছুর ভিতর দিয়ে যেতে-যেতে যা মনে হচ্ছিল, আজ ২০০০-এর দোলপূর্ণিমার দুদিন পরে কলকাতায় অরুণ সোম-এর বাংলা অনুবাদ পড়তে-পড়তে তাই, অবিকল তাই মনে আসছে। বাস্তবের এই ছোট্ট একটা জায়গা, খুব বেশি হলে যাকে একটা বড় শহরের একটা ছোট পাড়া মাত্র বলা যায়, দস্তইয়েভ্‌স্কির এই উপন্যাসটিতে এতই বড় হয়ে যেতে থাকে কী করে, যেন তিনি পুরো সেন্টপিটার্সবুর্গ শহরটাকে নিয়েই লিখছেন, যেন তিনি তখনকার পুরো রাশিয়া নিয়েই লিখছেন, যেন তিনি এখনকার, এই এখনকার কলকাতা নিয়েই লিখছেন।

শেষের কথাদুটোতে হয়তো একটু উপমা এসে গেল—দস্তইয়েভ্‌স্কির এই উপন্যাস যেন সারা রাশিয়া, বা যেন কলকাতা-টলকাতার মত সব সংকর শহরের, দেশের, উপন্যাস। উপমাটা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। কারণ আমি এ-উপন্যাসের সেন্ট পিটার্সবুর্গ নিয়ে এই একটি সম্পূর্ণ নিরলঙ্কার কথা জিজ্ঞাসা করতে চাইছি, উত্তরখোঁজার জন্যে নয়, জিজ্ঞাসাখোঁজার জন্যেই জিজ্ঞাসা করতে চাইছি—উপন্যাসের ভিতরেই লেখক বলে দিয়েছেন রাস্কোল্‌নিকভের বাড়ি থেকে সেই বুড়ির বাড়ি ৭৩০ পা দূরে, তার বাড়ি থেকে থানার দূরত্বও ও-রকমই হবে উল্টোদিকে, মোটামুটি এই একফুটো জায়গাতেই এ-উপন্যাস ঘটে যাচ্ছে, এই মাত্র দেড়হাজার-পা জায়গার মধ্যে, বিশ-পঁচিশ মিনিটে ঐ কয়েক-পা হাঁটা হয়ে যায়, এ উপন্যাসটি এতটাই ছড়িয়ে পড়ল কী করে। স্‌ভিদ্রিগাইলভ-এর আত্মহত্যার জায়গা বা তুচকভ ব্রিজ বা এরকম আর দু-একটি জায়গা তো মাত্র একবার করেই এসেছে।

সাধারণভাবে ঔপন্যাসিককে সঙ্কটে পড়তে হয় উল্টোদিকে— যখন তাঁকে খুব বড় একটা বিস্তারের বোধ সঞ্চার করতে হয়। 'দুর্গেশনন্দিনী,' বা 'পেদ্রে পারামো'তে সম্পূর্ণ আলাদা তাৎপর্যে এই বিস্তার আসে। বা 'মবি ডিক' 'পদ্মা নদীর মাঝি' ও 'দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সি'-তে। এই নামগুলো শুধু বলবার কথাটা স্পষ্ট করতেই সাজানো হল। এই কাজটা দস্তইয়েভ্স্কি উল্টে দিলেন। যেমন এই উপন্যাসে দস্তইয়েভস্কি তো কয়েকটা ঘর আর কয়েকটা রাস্তার—ঐ হাজারদেড়েক-পা সীমার মধ্যে— কথা বলছেন, মাত্রই কয়েকটা ঘর আর কয়েকটা রাস্তার কথা, অথচ সেই কয়েকটা ঘর আর কয়েকটা অলিগলিকে এমন বিস্তার দেন কী করে।

'আজ আটটা বাজে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে।' খুনের পর রাস্কোল্নিকভ্ সেদিনই প্রথম পথে নেমেছে — সে যেন স্বীকারোক্তি করতে যাচ্ছে। 'প্রতি মুহূর্তে ছুটে বেরিয়ে আসছে কিছু-কিছু মেয়েমানুষ। তাদের কারো মাথায় টুপি নেই, গায়ে কোট নেই— বেশভূষা দেখে মনে হয় যেন পড়শিবাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছে। দু-তিন জায়গায় তারা ফুটপাথে দলবেঁধে ভিড় করেছিল — বেশিরভাগই নিচতলায় ঢোকার মুখে — সেখান থেকে দু-ধাপ নিচে নামলে তলকুঠুরিতে নানারকম আমোদপ্রমোদের প্রশস্ত ব্যবস্থা।... ঢোকার মুখে ভিড় করে আছে মেয়েমানুষদের এক-একটা দঙ্গল। তাদের কেউ বসে আছে সিঁড়ির ধাপে, কেউ ফুটপাতে, কেউ বা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছে' (১৭৩ পৃষ্ঠা)।

রাস্কোল্নিকভ্ যে-রাস্তায় নেমেছিল, তার ছিল দুটো মাত্র দিক, যেমন সব রাস্তারই থাকে। দু-পা ফেলতে না-ফেলতেই তার আরো সব দিক খুলে-খুলে যায়— নিচতলা, তলকুঠুরি, সিঁড়ির ধাপ। আর এই সব নানা দিককে জুড়ে দেয় ঐ মেয়েদের পোশাক, চলন, দাঁড়ানো, বসা, দঙ্গল।

যে বাড়িতে খুন করেছিল, এক সন্ধ্যায়, আনমনে, সেই বাড়িতেই সে এসে পড়ে। দেখে, সেই খুনের ফ্ল্যাটটাতে কাদের মিস্ত্রিরা কাজ করছে, নতুন ওয়ালপেপার লাগানো। 'মিস্ত্রিদের দেখে মনে হচ্ছিল তাদের দেরি হয়ে গেছে।...ওরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল। রাস্কোল্নিকভ দু-হাত আড়াআড়ি বুকের ওপর ভাঁজ করে ওদের কথা মন দিয়ে শুনতে লাগল। বড়জন ছোটজনকে বলছে, 'তা এলো মেয়েটি আমার কাছে সকালবেলায়...। ঠিক যেন ছবি, যাকে বলে ম্যাগজিন।' 'ম্যাগজিনটা কী জিনিস খুড়ো?'...'ম্যাগজিন? সে হল গিয়ে ভাই নানারকমের ছবি, রংচঙে ছবি, সেগুলো এখানে আসে শনিবার-শনিবার...বিদেশ থেকে...। যেমন ছেলেদের, তেমনি মেয়েদেরও ।... দেখে-দেখে আশ আর মিটবে না' (১৯১ পৃষ্ঠা)।

রাস্কোল্নিকভ্ যে খুনের ঘরে ফিরে আসবে, তা সে ভাবতেই পারেনি। এসে পড়ার পর 'তার কেন যেন ধারণা ছিল যে... দেখতে পাবে লাসদুটোও সেই জায়গাতেই পড়ে আছে।' যেখানে সেই ঘরে, সেই যে-ঘরের দরজা বুড়ি খুলত কত

সাবধানে, সেই যে-ঘর ছিল এক গুমট বন্ধ ঘর, সেই ঘরের নতুন রঙের ভিতর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে রাস্‌কোল্‌নিকভ শোনে মিস্ত্রিরা গল্প করছে, বিদেশী সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনে ছাপা মেয়েদের ছবি নিয়ে। শুধু এক আলগা সংলাপে ভর দিয়ে কত-কত দূর এসে মেশে সেই ঘরে, সেন্ট পিটার্সবুর্গের এক ছোট পাড়ার সেই এক ছোট ঘরে।

স্‌ভিদ্রিগাইলভ, ঘুমের ঘোরে এক দুঃস্বপ্ন দেখে। তার আত্মহত্যার আগের শেষ ঘুমের ঘোরে। সে-দুঃস্বপ্ন একটা সুস্বপ্নই ছিল। একটা কচি মেয়েকে যেন সে হোটেলের এক কোণ থেকে তুলে এনে কম্বলের গরম দিয়ে বাঁচাচ্ছে। তারপর সেই সুস্বপ্নটাই বদলে যায়, 'হঠাৎ তার মনে হল মেয়েটার চোখের পাতা কাঁপছে, পিটপিট করছে, নড়ছে পাতার দীর্ঘ, কালো লোমগুলো।...তলা থেকে উঁকি মারছে ধূর্তের তীব্র চাহনি— যে-ভাবে চোখ টিপছে তা কেমন যেন।...ও মুখ এখন মোটেই শিশুর মুখ নয়। এ তো ব্যভিচার। এ মুখ বারবনিতার মুখ, ফরাসী উপন্যাসের সেই নির্লজ্জ লাস্যময়ী ক্যামেলিয়ার মুখ।...দু-চোখের দৃষ্টিতে সে লেহন করেছে স্‌ভিদ্রিগাইলভকে, তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। ...এ কী পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে!' (৫৭৪ পৃষ্ঠা)।

এ উপন্যাসে যা ঘটছে আর যা ভাবা হচ্ছে তার মাঝখানের পার্থক্য অনেকবারই ঘুচিয়ে দেয়া হয়েছে। যা ঘটছে বলে শুধু ভাবাই হচ্ছে তাও উপন্যাসের কার্যকারণ শৃঙ্খলায় অটুট গাঁথা। এ উপন্যাসে প্রলাপ হয়ে ওঠে নিশ্ছিদ্র যুক্তিশীল। আর যা সত্য, তা উপন্যাসের শেষতকও থাকে প্রায় প্রলাপ। উপন্যাসের ফর্মের ইতিহাসে এমন ঘটাতে পারা এক অনন্য কীর্তি। সেই প্রলাপেরই মধ্যে, সেই জ্বরাক্রান্ত দুঃস্বপ্নের মধ্যেও পাঁচ বছরের মেয়ে হয়ে ওঠে যেন ধর্ষণাকাঙ্ক্ষিণী— সেই সেন্ট পিটার্সবুর্গের এক শস্তা হোটেলের ইঁদুরসঙ্কুল আলোহীন ঘরে। আর সেই শিশুর মুখ মিশে যায় ফরাসি যৌন-উপন্যাসের মলাটের মুখের সঙ্গে। এখন যাকে আমরা 'মিডিয়া' বলে চিনি, এখন স্যাটেলাইটের সাহায্যে বিদেশী যৌনতা যেমন আমাদের, এই পশ্চিমবাংলা-ভারতের মফস্বল শহরের শোয়াবসার ঘরের, প্রতিদিনের জীবনের ভিতর গেড়ে গেছে, ১৮৬৬-র সেন্ট পিটার্সবুর্গে নিশ্চয়ই তেমন ও ততটা ছিল না। অথচ সেই সময় লেখা এই উপন্যাস তার স্থানপরিধিতে পনের শ পায়ের বেশি না-গিয়েও দেশ ও কালের বিপুল ও ভবিষ্যৎ বিস্তারে মিশে যায়।

এমন সব উদ্ধৃতি তো বাড়িয়েই যাওয়া যায়। যে-কোনো পাঠক আজও এই উপন্যাসটি পড়তে-পড়তে কখনো-কখনো এমন বিভ্রমে চকিতে পড়বেন যে লেখক কি সেন্ট পিটার্সবুর্গকেই কোনো এক তির্যক অর্থে উপন্যাসটির 'নায়ক' করে তুলতে চান, তাঁর সে-ভুল হয়তো ভেঙেও যাবে, অথচ আবার তিনি হয়তো একই ভুলে পড়তে চাইবেন, যেমন, মিখাইল বাখতিন বলেছিলেন, 'এ-কথাটি বিশেষ করে বলার যে এই উপন্যাসের ঘটনাস্থল পিটার্সবুর্গ (উপন্যাসে এর ভূমিকা মহাকায়)—অস্তি আর নাস্তির সীমান্তে, বাস্তব আর মায়ার সীমান্তে, সব সময়ই মনে হয় যেন কুয়াশা,

এখনই কেটে যাবে। পিটার্সবুর্গেরও স্থায়িত্বের কোনো অভ্যন্তরীণ ভিত্তি নেই, এও এক সীমান্তে।'

এর কারণ সেন্ট পিটার্সবুর্গ রাশিয়ার প্রাচীন শহর নয়, স্থায়ী শহর নয়, পরম্পরা সমর্থিত শহর নয়। পিটার দি গ্রেট এই রাজধানী তৈরি করেছিলেন নর্থ সি-র এক সামুদ্রিক জলা ভরতি করে, সেই জলাগুলি খাল হয়ে শহরের ভিতর ছড়িয়ে ছিল, এখনো আছে, আর এ-শহর টুকরো-টুকরো হয়ে ছিল কয়েকটা দ্বীপে, সেই দ্বীপগুলোর মধ্যে সংযোগ রাখত কয়েস্টা খালপোল আর এই শহরের ভিতর দিয়েই বয়ে যায় নেভা নদী, ছোট-নেভা ও আরো দু-চারটে নদী। নেভার ওপরের ব্রিজগুলো মধ্যরাত্রির পর খুলে দিতে হয় বালটিক সমুদ্র থেকে ফিনল্যান্ড উপসাগর দিয়ে যে-জাহাজগুলো আসছে তাদের পথ দিতে। এখনো খুলে দিতে হয়। নেভাতীরের 'এমব্যাঙ্কমেন্ট' বা বাঁধ সেন্ট পিটার্সবুর্গের প্রতীক। সমুদ্রের ভিতরে ঢুকে পিটার তৈরি করেছিলেন এই তাঁর নতুন নগর, যেমন আমাদেরই চোখের সামনে বিস্তারিত হচ্ছে মুম্বাই শহরের ব্যাক-বে রিক্লেমেশন, যেমন, আমাদেরই চোখের সামনে বিস্তারিত হচ্ছে কলকাতার সামুদ্রিক জলাভূমিতে সল্টলেক-রাজারহাট, আর বড়জোর আমাদের তিনপুরুষ চারপুরুষ আগে তৈরি হয়েছিল সাবেক কলকাতা। এখনকার জগদীশ চন্দ্র বসু রোড ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডকে যদি পুরনো খাল কল্পনা করে নেয়া যায় তাহলে খালে-খালে কাটাকুটি কলকাতার সঙ্গে সেন্ট পিটার্সবুর্গের মিল অনেকটাই। সামুদ্রিক হাওয়াসহ। তফাৎ সেন্ট পিটার্সবুর্গের মেরুনৈকট্য আর কলকাতার মৌসুমি মেঘ আর গরমের হাওয়া।

মিল তো আরো গভীর — সেন্ট পিটাসবুর্গের সঙ্গে কলকাতার মত নতুন শহরের। লিউইস মামফোর্ড সেন্ট পিটার্সবুর্গ সম্পর্কেই বলেছিলেন, 'পিটার দি গ্রেটের দানবীয় জেদ।' আর সেখান থেকেই শুরু হল ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের নগরনির্মাণ— সে-নগর শান্তি, স্বস্তি, আশ্রয় আর স্বাধীনতা দেয় না। সে-নগর রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্র, নতুন নতুন দেশজয়ের বুলন্দ দরোয়াজা। আর ক্ষমতা মানেই তো অসংখ্য ঘোরালো সব আলো-অন্ধকারময় সিঁড়ি, সে-সিঁড়ি দিয়ে উঠছি কী নামছি বোঝা যায় না, সে-সিঁড়ি কুম্ভীপাকের মত পাকিয়ে ধরে, সে অসংখ্য নিশানাহীন সিঁড়িতে কোনো স্থির আলো থাকে না, কোনো স্থির অন্ধকার থাকে না, ক্ষমতার তাপ নিতে বা ভাগ নিতে প্রায় সমস্ত নাগরিক, ক্ষমতার অজস্র পরিবর্তমান স্তরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, ফিরে আসছে, ফিরে আসছে, যাচ্ছে। পেশার যে-স্থিরতা থেকে, পেশার সঙ্গে পেশার যে সংযোগ থেকে, বৃত্তির যে-নিশ্চয়তা থেকে একসময়ে নগর বা জনপদ জীবনযাত্রার সঙ্গতিতে গড়ে উঠত, সেই স্থিরতা, সংযোগ ও নিশ্চয়তা তছনছ হয়ে গেল এই নতুন নগরে, সেন্ট পিটার্সবুর্গ যার আদি এক রূপ, অসংখ্য ঔপনিবেশিক নগর—কলকাতা, মুম্বাই, মাদ্রাজ, হংকং, দিল্লি, সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক,

জাকার্তা, এশিয়া-আফ্রিকার অসংখ্য অসংখ্য সব শহর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-কান্যাডার সব শহর—এইগুলো সেই নতুন নগরের সংখ্যাধিকতম নিদর্শন। পুরনো যে-সব শহর এই নতুন ধরণের ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, সে-সব শহরের প্রাচীন আকার আর চেনা যায় না অথবা সেগুলো ক্ষমতার কেন্দ্র হতে না পারায় তাদের প্রাচীনতাতেই আটকে গেছে। 'স্বাধীন সব নগর, তাদের আচার-ব্যবহারের বৈচিত্র্য, তাদের নাগরিকদের চলনবলনের আপেক্ষিক গণতান্ত্রিকতা, ধ্বংস হয়ে গেল, জেগে উঠল বিমূর্ত নগর : অসংগত কিছু ক্ষমতাকেন্দ্র। অন্য সব নগরকে হয় এই নতুন নগরের মত হতে হবে অথবা পাথর হয়ে যেতে হবে। হতাশ সব নকলিয়ানা' (মামফোর্ড)। সে প্রক্রিয়া তো চলছেই। কলকাতা-মুম্বাইয়ের আধুনিক নগর পরিকল্পনার প্রতিমান নির্ধারিত হয় ইয়োরোপের ঐ নতুন নগরগুলি দিয়ে— সেন্ট পিটার্সবুর্গ যার আদিরূপ। রাশিয়ার ইতিহাসে সেন্ট পিটার্সবুর্গ এক প্রতীক হয়ে উঠল—রাশিয়ার ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্নতার আবার রাশিয়ার নতুন ইতিহাসের আরম্ভের, প্রতীক। তাই এ-শহরের নাম বারবার বদলেছে— সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ধাত্রী পেত্রোগ্রাদ থেকে লেনিননগর লেনিনগ্রাদ থেকে এখন আবার সেন্ট পিটার্সবুর্গ। রাশিয়ার প্রাচীন রাজধানী মস্কোর নাম আর পরিচয় তো এমন বদলায় নি। সেন্ট পিটার্সবুর্গ তার অমাঘতা, কেন্দ্রবিপর্যয়, অতিকেন্দ্রিত ক্ষমতা আর সেই কারণেই উৎকেন্দ্রিকতা নিয়ে এক অনিশ্চয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বিচ্ছিন্নতা আর আরম্ভের এক অনিশ্চয়ে, প্রবেশ আর প্রস্থানের এক অনিশ্চয়ে।

পরে মনে হয়েছিল, সেই ৮৪ সালের ৬ অক্টোবরের শনিবারের সকালে ইয়োরোপস্কায়া হোটেলের উল্টো ফুটে এসে মিখাইল আমাকে বলেছিল কেন, 'রাসকোল্‌নিকভের বাড়ি দেখবে,' ওতো বলতেও পারত, 'আনা কারেনিনার বাড়ি দেখবে?'

চার

আনা কারেনিনা'র বাড়ি তো দেখাতে চাইতেই পারত মিখাইল সেদিন, কত লেখকের কত গল্প-উপন্যাসের কত মানুষজনের বাড়ি, আস্তানা, হোটেল, পার্কই তো দেখাতে চাইতে পারত। দস্তইয়েভস্কির 'প্রেস্টুপ্লেনিয়ে ই নাকাজানিয়ে'তে যেমন রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ নিজেই কখনো হয়ে ওঠে সেন্ট পিটার্সবুর্গের নগরপুরুষ বা সেন্ট পিটার্সবুর্গই কখনো হয়ে ওঠে যেন রাস্‌কোল্‌নিকভের ব্যক্তিনগর, তেমনি কোনো-কোনো সময় কোনো দীর্ঘ কবিতায় হয়তো হয়েছে, যেমন এলিয়টের 'ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এ বা নেরুদা-র 'মাকচু পিকচুর শিখরমালা'য়, বা ছোট-ছোট কবিতায় নগর বা ভূখণ্ডই হয়ে উঠেছে এক অব্যাহত আখ্যান, যেমন বোদলেয়ারে, বা বোদলেয়ার-এরই টানা লেখা 'প্যারিস স্পিলন্‌'-এ, উপন্যাসের ব্যাপ্তি জুড়ে তেমন খুব একটা ঘটে ওঠে না। বা কোনো এক শীর্ষে বা গহনে, তেমন ঘটে উঠেই, আবার মিলিয়ে যায়।

উনিশ শতক জুড়ে রাশিয়ার আখ্যানকারেরা খুঁজে ফিরেছেন তাঁদের পিতৃভূমির এক প্রতীকনায়ক আর সেই পিতৃভূমির এক প্রতীকজনপদ। ১৮২৫-এর ডিসেম্ব্রিস্টদের বিদ্রোহ যেন বিদ্যুদ্দীপ্তিতে রাশিয়ার ঐ বিশাল বিস্তারকে আখ্যানকারদের লক্ষ করে তোলে। সাইবেরিয়ার মত অমন তুষারমহাদেশ বা ককেসাস এর মত অমন গিরিপ্রান্তরও যে রুশ আখ্যানের ভিতর এমন ঘন-ঘন চলে আসে, তার একটা প্রধান কারণ, পুশকিন, গোগোল, লেরমন্তভ, শেবচেঙ্কো, লেসকভ, তলস্তয়, দস্তইয়েভ্স্কি, কোরোলেংকো, চেরনিশেভ্স্কি, চেখভ, গোর্কি—আখ্যানকারদের এই অব্যাহত পরম্পরায় এমন কোনো লেখক ছিলেন না যিনি কোনো না কোনোভাবে জারতন্ত্র, আমলাতন্ত্র বা চার্চের সঙ্গে লড়াইয়ে জড়িয়ে না পড়েছেন। এঁদের মধ্যে দু-জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে, রহিত করে, সাইবেরিয়ার নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। কাউকে-কাউকে সরাসরিই সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, কাউকে-বা ককেসাসে, কাউকে আর্কটিক সমুদ্রের নোভায়া জেমলিয়া দ্বীপে। সেই সব দূরদূরান্ত, ব্ল্যাক-সি থেকে উত্তর পুবের বেরিং-সি, ইয়োরোপ ও মার্কিন দেশের মিলিত আয়তনের চাইতেও বিশাল এই ভূখণ্ড, তার ফলে অন্বিত হয়ে গেছে এই মহা-আখ্যানকারদের গল্প-উপন্যাসে। তাঁরা যে-জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, শাসকের দেয়া শাস্তি হিশেবে, সেই জীবনই তাঁরা লিখছিলেন তাঁদের গল্প-উপন্যাসে বা আরো নানা ধরণের আখ্যানে। রাশিয়ার জারতন্ত্রকে নিরুপদ্রব করতে যে প্রায় দিকচিহ্নহীন সীমান্তে তাদের লুপ্ত করে দেয়া হয়েছিল, তাঁরা সেই সব সীমান্ত থেকে রাশিয়ার সমগ্রতাকে আখ্যানের সত্য করে তুলছিলেন। রাশিয়া আকার নিচ্ছিল তাঁদের গল্প-উপন্যাসে, সেই রাশিয়া যার কেন্দ্র তখন সেন্ট পিটার্সবুর্গ—সমগ্র রাশিয়ার ক্ষমতাকেন্দ্র। এখনো এঁদের লেখাগুলো যদি একটানা ও পরপর পড়ে যাওয়া যায়, তাহলে কখনো-কখনো মনে হয় সেন্ট পিটার্সবুর্গের দখল নিয়েই যেন শতবর্ষের এক যুদ্ধ চলছে, জারতন্ত্রের সঙ্গে আখ্যানকারদের। ক্ষমতার কেন্দ্র সেন্ট পিটার্সবুর্গকে বিদ্রোহের কেন্দ্র হতে না দেয়ার জন্যে এই লেখকদের জার পাঠাচ্ছেন তাঁর সাম্রাজ্যের পরিধির অস্পষ্টতায়, যেন তিনি জানেন একটা কেন্দ্র ছাড়া, সেন্ট পিটার্সবুর্গ ছাড়া, এই বিদ্রোহী চিন্তা কোনো কর্মের আকার পাবে না। আর এই আখ্যানকাররা সেই পরিধি থেকে ঐ কেন্দ্রকেই সত্য করে তুলেছেন, যেন, সেন্ট পিটার্সবুর্গ ছাড়া ঐ পরিধির কোনো অর্থ নেই।

আখ্যানকাররা, এই তাঁদের সেন্ট পিটার্সবুর্গ দখলের অভিযানে, এক ধরণের চরিত্র তৈরি করেন যাদের বৈশিষ্ট্যের ঐক্য বোঝাতে এক সময়, উনিশ শতকেই, খুব আলগা করেই 'নিহিলিস্ট' শব্দটি ব্যবহার করা হত। এই শব্দটি আমাদের বাংলাতেও চলত বিশ শতকের বিশ-তিরিশের দশকে, তেমন যুবকদের বোঝাতে যারা ব্রিটিশ রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অস্বীকার করতে গোপন ষড়যন্ত্র, অন্তর্ঘাত ও হত্যার পদ্ধতি মেনে নিত। রুশ-উপন্যাসের নিহিলিস্ট চরিত্রগুলির অন্তর্গত পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রায় দুস্তর, সেই

পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য ছাড়া পুশকিন (১৭৯৯-১৮৩৭)-এর 'ইশকাপনের বিবি' (১৮৩৪) **গল্পের হেরম্যান**-এর নীতিনিরপেক্ষ অর্থলোভ, গোগোল (১৮০৯-১৮৫২)-এর 'সেন্ট **পিটার্সবুর্গ গল্প**মালা'র (১৮৩৪-১৮৪১) 'ওভারকোট'-এর কেরানি, যে মরার পরে **নিহিলিস্ট** হয়, এদের গোত্রচিহ্ন চেনা যায় না। লেরমন্তভ-এর (১৮১৪-১৮৪১) **'আমাদের সময়ের** নায়ক' (১৮৪০)-এর পেচোরিন, শেবচেঙ্কো-র (১৮১৪-১৮৬১) **'শিল্পী'** গল্পের উত্তমপুরুষ নায়ক, দস্তইয়েভস্কির (১৮২১-১৮৮১) 'প্রেস্টুপ্লেনিয়ে ই **নাকাজা**নিয়ে'র (১৮৬৬) রাস্‌কোল্‌নিকভ, তলস্তয়-এর (১৮২৮-১৯১০) **'রেজারেকশন**'-এর (১৮৯৯) নেখলুদভ, লেসকভ-এর (১৮৩১-১৮৯৫) 'সেন্ট্রি'র **(১৮৮৯)** মত ছোট্ট একটি গল্পের সেই সেপাইটি যাকে দেখলে গোগোলের গল্পের **কথা মনে** পড়ে যায়—এদের সকলেরই সেই গোত্রচিহ্ন আছে। গোগোলের এমন সব **মরণোত্তর** নিহিলিস্ট আর প্রাক্‌মরণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় বেচারার কথা মনে পড়ে যেতে **পারে** কোরোলেঙ্কো-র (১৮৫৩-১৯২১) 'আত্‌-দাবান' (১৮৯২) আখ্যানে ক্রুগনিকভ-**এর** নিজের মুখের গল্প শুনলে। গণচারভ-এর (১৮১২-১৮৯১) 'ওবলোমোভ'-এর **কথা** তুললে তো মনে এসে যাবে লেরমন্তভ-এর পেচোরিন ও তলস্তয়-এর নেখলুদভকে। সেটুকু মনে রেখে আমরা বরং 'সেই একই পুরনো গল্প'-এর (১৮৪৭) আলেকজান্ডার আদুয়েভ-এর কথা বলি, সে তো সেন্ট পিটার্সবুর্গে এসেছিল এক সম্মোহনের বশে। চেরনিশেভস্কি-র (১৮২৮-১৮৮৯) 'কী করতে হবে,'(১৮৬৪)র রাখমেতভ —'ফালতু মানুষের' বিকল্প সেই নতুন মানুষ, চেকভ-এর (১৮৬০-১৯০৪) 'তিন বোন' (১৯০১)-এর তুজেনবাক-কেই ধরা যাক, চেকভ-এর কত গল্পে এমন সব কত চরিত্রই তো ছড়ানো। গোত্রচিহ্ন ছাড়া এদের আলাদা ও এক করে **চিনে** নেয়া যেত না।

এত সন-তারিখ দিয়ে আমরা শুধু আমাদের এই অনুমানকে খানিকটা তথ্যভিত্তি দিতে চাইলাম যে সারা উনিশ শতক জুড়ে, বা আরো নির্দিষ্ট করে বললে ১৮২৫-এর ডিসেমব্রিস্ট বিদ্রোহের পর রুশ আখ্যান-সাহিত্যে যে অতুলনীয় আত্ম-আবিষ্কারের অভিযান শুরু হয়ে গেল পুশকিন থেকে, তাতে একধরণের একটি চরিত্রকে ভিতরে-ভিতরে চিনে নেয়া যায় যে নিজের চৈতন্যের একটা মেরুবদল ঘটাতে চাইছে। সব **সময়** যে পারছে তা নয়। কোনো-কোনো সময় ঐ হেরম্যানের মত স্বার্থান্বেষণের **পাকে** জড়িয়ে পড়ছে, হেরে যাওয়া যদি বলে হেরে যাচ্ছে। কখনো ওবলোমভ-এর **মত** নিরর্থকতার পাঁকে ডুবে যাচ্ছে, হেরে যাওয়া যদি বলে হেরে যাচ্ছে। কখনো **নিজের** চৈতন্যের প্রতি বিশ্বস্ততায় ক্রুগনিকভের মত বেঁচে উঠছে, জেতা বললে **জিতে** যাচ্ছে। কখনো মৃত্যুর পরও হারার বদলা নিচ্ছে, বাঁচা বললে, বেঁচে উঠছে। **এরা** প্রত্যেকে আলাদা-আলাদা হলেও এই প্রায় সত্তর বছর ধরে রুশ আখ্যানকাররা **ব্যক্তির** চৈতন্যবদলের এক প্রতিনিধি-পুরুষকে খুঁজছেন। সে একটা হেরে-যাওয়া

লোক। তবু সে জানে যে জেতা যায়। আমরা বাঙালি-ভারতীয় পাঠকরা ঠিক জানি না তাকে কেন আমাদের আপন লাগে— সে হেরে যাওয়া বলে, নাকী সে জেতা যায় জানে বলে? তার হেরে যাওয়াটা সবটুকু তার নিজের কারণে নয় বলে? তাকে কখনো সরকার, কখনো সমাজ হারিয়ে দেয়ার পাকে ফেলে হারিয়ে দিচ্ছে বলে? সে মার খায় বলে? সে নিজে যে জিতে যেতে পারে, তা সে নিজের ভিতরে-ভিতরে জানে বলে? তাকে হারিয়ে দেয়া হচ্ছে এটা যে জানে, সে সেই জানার ভিতর দিয়েই জেতা শুরু করে দেয় বলে? রুশ-আখ্যানের এই মানুষটিই কি কাফকা-র উপন্যাসগুলিতে ফিরে এল তার অস্তিত্বের বহুকৌণিকতা নিয়ে? ফরাসি উপন্যাসে কামু যে- আউটসাইডারের ভাবনা নিয়ে এলেন তা কি ঐ রুশআখ্যান-কাফকার অভিজ্ঞতাটা বাড়িয়ে দিয়েই। একটি ভাষার আখ্যান-সাহিত্যে মানুষের, ইতিহাসবদ্ধ মানুষের, ব্যক্তির, ব্যক্তির ইতিহাস-মুক্তির নিশানা জানতে প্রায় এক শতক কেটে গেল। তাতে ব্যক্তির চৈতন্যবদলের এই অভিযান বহুবর্ণময় ও নানা ব্যাপ্তিতে প্রামাণিক হয়ে উঠল। দস্তইয়েভ্স্কির 'প্রেস্টুপ্লেনিয়ে ই নাকাজানিয়ে'র রাস্কোল্নিকভ্কে হারিয়ে দেয়া হচ্ছিল, সে হেরেই গিয়েছিল—মা-বোনের কোনো উপায় করতে পারছে না, নিজেকেও পড়া ছেড়ে দিতে হয়েছে, শুধু টাকার অভাবে। সে জিততে গিয়ে আরো হেরে গেল— ভেবে-ভেবে একটা খুন করল, না-ভেবে আর-একটা খুনও তাকে করতে হল। সেই নিরন্ধ্র পতন থেকে সে এক আত্মময় নরকযাত্রার শেষে নিজেকে উদ্ধার করতে পারল।

একটা ভাষায় গল্প-উপন্যাসে পঞ্চাশ-পঁচাত্তর বছর ধরে এক গোত্রচিহ্নের চরিত্রকে বুঝতে চাওয়া তো আসলে নিজেদেরই এক বহুকৌণিক বিপরীত ও প্রতিবাদ-প্রত্যাখ্যানময় আত্মপরিচয় খোঁজা। বাংলা আখ্যানসাহিত্য কোনোভাবেই উনিশ শতকের রুশ আখ্যানসাহিত্যের মহৎ কঠিন দুঃসাহসী অভিযানের তুলনীয় নয়। তবু এমন সব মিল দেখা যায় যে রাস্কোল্নিকভ্ যেমন নিজের শিকড় উপড়ে ফেলতে চাইছিল আর সেই তাড়নায় নিজের বোন দুনিয়াকে বলছিল, 'আমি নীচ হতে পারি, কিন্তু তোর হওয়া সাজে না,' (২১৯ পৃষ্ঠা) তেমনি 'কপালকুণ্ডলা'র নবকুমার, ঐ প্রায় একই সময়ে ১৮৬৬-তে উল্টো করে ভেবেছিল, 'তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?' আমাদের আখ্যানসাহিত্যের নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, গোরা, শচীশ, বিশেষত নিখিলেশ, 'গণদেবতার' দেবু, 'একদা'র অমিত, 'জাগরী'র বিলু এরা মহত্তর কোনো ঔচিত্যবোধে নিজেদের যুক্ত করতে চাইছিল, এক-এক সময় এক-এক কারণে পারছিল না, কম সময়ই পারছিল, আবার কখনো না-পারাকে নিজের আবেগের অতৃপ্তির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলছিল— সেই মহত্তর ঔচিত্যবোধ বা নীতিবোধের যেমন ইংরেজমুগ্ধতা ছিল, তেমনি আবার নিজেদের এক মৌলিক প্রত্নমূর্তি উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষাও ছিল, আবার সঙ্গে-সঙ্গে ছবিতে-সাহিত্যে-সামাজিক সব

উৎসবে ইংরেজসমাজের নারীপুরুষের সম্পর্কের আদলের দিকে এক টানও ছিল। চিন্তার জগৎ আর আবেগের ভুবনের মধ্যে এক অসঙ্গতি দিনে-দিনেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হচ্ছিল। 'গোরা'র আত্ম-আবিষ্কারের মহত্ত্বের পরিশিষ্ট তাই ছ-সাত বছর যেতে-না-যেতেই শচীশের আগ্নেয় উচ্ছ্বাসের ভস্মশেষে লেখা হয়। গোরা আর শচীশ মিলে আমাদের সেই গোত্রপুরুষের আভাস।

বাংলা গল্প-উপন্যাসের এই প্রসঙ্গ এখানে শুধু এইটুকু ইঙ্গিতকে কিছুটা স্পষ্ট করতেই এল যে প্রায় একশ বছর ধরে রুশ-আখ্যানে এক ও একই গোত্রপুরুষের সন্ধান বলতে আমরা কোন প্রক্রিয়ার আভাস দিচ্ছি। যা স্পষ্ট করা যায় তা আর ইঙ্গিত থাকে না। যা বলতে ইঙ্গিতই দরকার, বেশি দাগাতে গেলে তা ভেঙে যায়। দস্তইয়েভ্স্কির 'প্রেস্টুপ্লেনিয়ে ই নাকাজানিয়ে'তে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তার শারীরিক অসুস্থতা, তার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, তার বাসাবাড়ি আর পথঘাট, তার চলবার-বসবার রাস্তা আর শুঁড়িখানা নিয়ে এক সঙ্কটক্ষণকে প্রলম্বিত করতে থাকে। সে-ই সবচেয়ে কুলীন গোত্রপুরুষ কী না— তেমন কোনো প্রশ্ন আমরা তুলতেই চাই না। গোত্রপুরুষের যে লক্ষণ আমরা আবছা করে বুঝে নিতে চেয়েছি রাস্‌কোল্‌নিকভ সেই লক্ষণগুলিকে সবচেয়ে প্রকট করে তুলতে পেরেছে, কারণ, উপন্যাসের এতটা বিস্তারে সে একটা শারীরিক-মানসিক বিকারের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, ও শেষ পর্যন্ত সে সেই বিকার পার করে নিয়ে যেতে পারে নিজেকে। রাস্‌কোল্‌নিকভ নিজেকে নিয়ে বিকার তৈরি করেছে নিজের হাতে, নিজের মাথায়, সেই বিকার থেকে উদ্ধার তৈরি করেছে নিজের হাতে, নিজের মাথায়। এমনই এক বিকারলক্ষণ এই উপন্যাস জুড়ে জট পাকাতে থাকে, এই উপন্যাসে মানুষজনের দেখাশোনা, কথাবার্তা, এমনকী চলাফেরাও জ্বরাক্রান্ত। গল্প-উপন্যাসে ন্যূনতম বাস্তবতা বা দৈনিকতা বাদ দিয়ে এক লাইন এগনো যায় না। সেই কারণেই গল্প-উপন্যাসে রূপকান্তর বা অর্থান্তর খুব সহজে ঘটে না। অনেক সময় ঘটেই না। তেমন ঘটা গল্প-উপন্যাসের লক্ষ্যও নয় তেমন। এই উপন্যাসে কখনো-কখনো এমন বিভ্রম তৈরি হয়, আমরা বোধহয় বাস্তবতা ও দৈনিকতার প্রয়োজনবোধ উৎরে এলাম, লেখকের বা পাঠকের তেমন কোনো দায় যেন থাকছে না। আর, সমুদ্রের ভিতরের জলদিগন্তে এক স্থায়ী উত্তরঙ্গ রেখা, তরল খাড়াইয়ের মত, রূপকান্তর আর অর্থান্তরের আভাস তৈরি করেই চলেছে। বাস্তবতার ও দৈনিকতার অভিকর্ষ থেকে গল্প-উপন্যাসের মুক্তি ঘটে যাওয়ার সেই সব দুর্লভ ক্ষণে, এমন কথাও মনে খেলে যায়, 'প্রেস্টুপ্লেনিয়ে ই নাকাজানিয়ে'ও এক দিব্য উত্তরণের আখ্যান, 'ডিভাইন কমেডি', এখানে এ উপন্যাসে মানুষ তার নিজের নরক নিজেই অতিক্রম করছে, দিশারিহীন, সঙ্গীহীন, একা। সে সেই নরকের স্থায়ী অধিবাসী হয়ে পড়ছে — নরকও টানছে, সে-ও ঝুঁকে পড়ছে। এই ভবিতব্যের কঠিন তপ্ত পেষণ নিজের শরীরে বইতে-বইতে, সইতে-সইতে ও ঠেকাতে-ঠেকাতে রাস্‌কোল্‌নিকভ্

মানবিক একাকিত্বে পুর্গাতারিওর দরজা খুলছে। এ উপন্যাসে নরক-উদ্ধার-স্বর্গ তো তিনটি আলাদা পর্যায় নয়, এ উপন্যাসে এমন কোনো সীমান্তচিহ্ন নেই। প্রথম থেকেই এই পর্যায়গুলি মিশে আছে। শেষ পর্যন্তও মিশেই আছে। ব্যক্তির মানব-অভিযানের কোনো পর্বান্তর নেই, পর্যায়ক্রম নেই, এমন কোনো ধ্যান হয়তো এই উপন্যাসের গড়ন নির্ধারণ করেছে—তাই সাইবেরিয়ায় নির্বাসনের জন্যে রচিত হল দুটো সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদ, একই পরিশিষ্টে। দৈনিকতার ধ্বংসকাহিনী যে-উপন্যাস, তার পরিশিষ্টে দৈনিকতা ফিরে আসে—রাস্‌কোল্‌নিকভের বাকিজীবনের রোজকার কাজ, সাপ্তাহিক ছুটি, সহবন্দীদের জামা রিপু করে দেয় সোনিয়া, তাদের বাড়িতে চিঠি লিখে দেয়।

পাঁচ

'ডিভাইন কমেডি' মনে পড়ার আরো বাস্তব কারণ আছে! 'ডিভাইন কমেডি'র ধর্মীয়তা স্বীকার না করে কেউ ঐ মহাকাব্য পড়তে পারবে না, তবে সেই স্বীকারের জন্যে তার নিজের ধর্মবিশ্বাস দরকারি নয়, বাধা তো নয়ই। দান্তের ধর্মজগৎ সঙ্কীর্ণ অর্থেই খ্রিস্টধর্মের জগৎ— তার ভূগোল খ্রিস্টীয়, তার নিখিল খ্রিস্টীয়, তার চেতনা খ্রিস্টীয়। অথচ সেই ভূগোল-নিখিল-চেতনা আকার দিচ্ছে মানুষের এক ভালবাসার গল্প। সেই আকারই ঐ কবিতার অর্থ বদলে-বদলে দিয়েছে। যে-খ্রিস্টান নয় সে এই কবিতাকে যে এমন সর্বার্থক গ্রহণ করতে পারে, সেটা খুব বড় কথা হলেও, সবচেয়ে বড় কথা নয়। সবচেয়ে বড় কথা— যে গভীর আস্তিক্যে খ্রিস্টান সে এই কবিতা থেকে অতিরিক্ত এমন কিছু পায় না, তার আস্তিক্যই তাকে যা দিতে পারে। 'ডিভাইন কমেডি' নিয়ে যে সাম্প্রদায়িকতা হয় নি, তা নয়। কিন্তু কত শতক লেগেছে সে সব ঝরে যেতে। এখনো 'ডিভাইন কমেডি' আরো পড়ার জন্যে খ্রিস্টানধর্মের কথা কেউ জেনে নিতে পারেন। বরং তাতে কবিতায় কখনো দ্যুতি আসে, কখনো-কখনো কৌতুকও আসে।

এই ধর্মের কথাই সবচেয়ে বেশি উঠেছে, সাধারণভাবে দস্তইয়েভ্‌স্কিকে নিয়ে, বিশেষ করে এই উপন্যাসটি নিয়ে। দস্তইয়েভ্‌স্কি যেন ব্যক্তির আত্মশক্তির সাধনাকে সমাজ বা ইতিহাস থেকে আলাদা করে নেন, যেন সেই আত্মশক্তির সাধনার অর্থ ইতিহাসের সঙ্গে নিজের অন্বয় খোঁজা নয়, যেন সেই সাধনার অর্থ ধর্মীয় নৈতিকতার সঙ্গেই নিজেকে অন্বিত করা। এই উপন্যাসে সেই ধর্মীয় নৈতিকতার কথাই হয়তো কেউ ইচ্ছে করলে শুনতে পারে সোনিয়ার কথাতে। আর এ-উপন্যাসে তো রাস্‌কোল্‌নিকভ বাইবেল থেকে ল্যাজরাসকে বাঁচিয়ে তোলার কাহিনীটি সোনিয়াকে দিয়ে পড়ায়। সোনিয়ার নির্দেশেই মাটিকে চুম্বন করে, স্বীকারোক্তি করে। সোনিয়ার কাছ থেকে লিজাবেতার, যাকে সে খুন করেছিল তার, কাঠের ক্রুশটি নিয়ে সে স্বীকারোক্তির যাত্রা শুরু করে। এ কথা স্বীকার না করে কোনো উপায় নেই, বা এই

তাৎপর্য পাশ কাটিয়েও যাওয়া যাবে না যে চতুর্থ পর্বের চতুর্থ অধ্যায় থেকেই রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌-সোনিয়ার সম্ভাষণ ও আলাপন গভীর খ্রিস্টীয় মুদ্রার সঙ্গে যুক্ত অর্থ ছড়াচ্ছে—পদচুম্বন, প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি, নিজেকে প্রাপ্য শাস্তির দিকে নিয়ে যাওয়া। এ-উপনাসের এই অংশ সেই খ্রিস্টধর্ম-অবলম্বী নানা অর্থে ভিতরে-ভিতরে এক স্তরান্তর ঘটায়। এই স্তরান্তর বাইরের ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করে না অথচ বাইরের ঘটনার তাৎপর্য সম্পূর্ণ বদলে দিতে থাকে। খুনের আগে থেকেই তো রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ স্বীকারোক্তির বয়ান তৈরি করছিল, মনে-মনে। কখনো এমনও মনে হতে পারে, খুনের আগে যে-প্রস্তুতি নিচ্ছিল তাও তো গূঢ় অর্থে খুনের পরে স্বীকারোক্তির বয়ান। তাহলে ভেবে নেয়া যেতে পারে, খুনের পরে, সোনিয়া নিরপেক্ষ এক স্বীকারোক্তিও তার ঘটতে পারত। তেমন ঘটলে কি তার ব্যক্তিত্ব ইতিহাসস্পৃষ্ট হয়ে যেত, সেই যে-ইতিহাসকে আমরা ধর্মের বিরুদ্ধে বা অপর কোটিতে স্থাপন করতে অভ্যস্ত হতে চাই বিজ্ঞানের যুগে, শিল্পবিপ্লবের যুগে, যুক্তিবাদের যুগে, সমাজ-রূপান্তরের যুগে।

সোনিয়া ছাড়া রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌-এর পরিণতির অর্থ কী হতে পারত—তেমন কোনো প্রশ্ন আমাদের নেই। সোনিয়া-রাস্‌কোল্‌নিকভ সম্পর্ক থেকে যে ধর্মীয় মুদ্রা উপন্যাসের ভিতরে ছড়িয়ে ছাড়তে লাগল, তাতেই রূপকান্তর আর অর্থান্তরের সেই দূরাভাস তরঙ্গরেখার মত দেখা দিতে থাকল। সোনিয়া তো খ্রিস্টধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিনিধি নয়, সামাজিক প্রতিনিধিও নয়, এমনকী সে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন পরিবারও তার আর নেই। সে জীবনযাপনের শেষ সীমা পার হয়ে এসেছে। তার কাছে বাইবেল—লোকায়ত জীবনাচরণের এক ওতপ্রোত উপাদান, বাইবেল বা ভগবান বা খ্রিস্ট এগুলো মিলিয়ে-মিশিয়ে সে একটা জন্মান্তরের অর্থ নিজের জন্যে তৈরি করে, রচনা করে, বা যে-জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে তার চাইতে ভিন্ন একটা জীবনকে সে বিশ্বাসের সত্য করে তোলে। এ সোনিয়া আমাদের খুব চেনা। বালবিধবা নিঃসন্তান নারী কোনো এক ঠাকুরকে — গোপাল বা রাধাকৃষ্ণ বা গৌরনিতাই—দিনযাপনের সঙ্গী করে নেয়। এমনকী আচারের শুচিবায়ুগ্রস্ত বৃদ্ধা তাঁর জীবনাসক্তিতেই জীবনের মারের ওপর জিতে যান। বাংলায় এমন অনেক গল্প লেখা হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের 'অনধিকার প্রবেশ', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দ্রবময়ীর কাশীবাস,' 'ভুবন বোষ্টমী', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগর সঙ্গমে!' সোনিয়ার খ্রিস্টধর্ম ও বাইবেল এর অতিরিক্ত কিছু নয়, নয় বলেই তার বেঁচে থাকার সর্বস্ব। সোনিয়া তাই রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে বলে, 'ভগবান না থাকলে আমার চলে?' রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ 'খুঁচিয়ে প্রশ্ন' করতেই 'চুপ করুন! ও কথা জিগগেস করবেন না। সে যোগ্যতা আপনার নেই'— বলে প্রায় আর্তনাদ করে।

যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান— এইসব চেতনা খুব বেশি হলেও তিন-চারশ বছরের মাত্র। সে চেতনা এমনকী পাশ্চাত্যের দেশগুলিতেও মানুষজনের পারিবারিক ব্যক্তিগত

জীবনে কোনো বিশ্বাসের ভঙ্গি বা মুদ্রা এখনো স্থায়ীভাবে গড়ে তুলতে পারে নি। যুক্তিবাদ বা বিজ্ঞান বা সমাজরূপান্তরের নীতিশাস্ত্র এখনো গড়ে ওঠে নি। সেখানে ধর্মীয় আস্তিক্য প্রতিষ্ঠানের বাইরে মানুষের নেহাৎ ব্যক্তিগত সব ভঙ্গি, নীরবতা ও উচ্চারণের সঙ্গে মিশে আছে।

সেই সঞ্চয় থেকে মানুষ এখনো তার অবলম্বন খুঁজে নেয়। সোনিয়া-রাস্‌কোল্‌নিকভ সম্পর্ক সেই সঞ্চয়কে এই উপন্যাসে সঞ্চারিত করে দেয়। ঔপন্যাসিক এই সঞ্চয়কেই তো খুঁজতে চান। মাটির ওপর তাঁর তৈরি মানুষজন যখন তাঁর তৈরি নানা ঘটনায় জড়িয়ে, তাঁকেও মানতে হয় এমন সব যুক্তি ও পরম্পরায় জড়িয়ে পড়তে থাকে, তখন ঔপন্যাসিক আমাদের এই দেশের কোনো কোনো অভিজ্ঞ গাঁওবুড়োর মত লাঠি ঠুকে-ঠুকে খুঁজে ফেরেন কোথায় মাটি খুঁড়ে পাথর সরালে মাটির বুকের কাছের জল, বন্দী জল, উছলে উঠবে। বাইবেল-খ্রিস্ট-খ্রিস্টপুরাণ এমন জলের পারাবার। এই উপন্যাসটিতে সেই ধর্মের ইঙ্গিত যুক্তির অর্থকে ভেঙে দেয়, যুক্তি-অতিরিক্ত অর্থ-অতিরিক্ত সব ইশারা ছড়িয়ে দেয়। উপন্যাসের এই রহস্যই হয়তো দস্তইয়েভ্‌স্কিকে এ উপন্যাসে এমন টেনেছে।

দোলপূর্ণিমা. ১৪০৬

অনুবাদকের কৈফিয়ত

অরুণ সোম

রুশ উপন্যাসের রস গ্রহণের পক্ষে একটা বড় অন্তরায় উপন্যাসে উল্লিখিত ব্যক্তিনাম: একই ব্যক্তি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কখনও তার প্রথম নামে, কখনও প্রথম নাম ও পিতৃনামের সংযোগে, কখনও বা পদবীতে, আবার ডাকনাম হিসেবে প্রথম নামেও একাধিক অপভ্রংশ রূপে উল্লিখিত ও সম্বোধিত।

স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে রুশ ব্যক্তিনামের মাঝখানের শব্দটি পিতৃপরিচয় জ্ঞাপক— পিতৃনামের অপভ্রংশ, শেষ অংশটি পদবী, স্ত্রীলিঙ্গে স্ত্রীবাচক প্রত্যয়যোগে তার রূপান্তর ঘটে। সম্পর্কের তফাতে নামের সম্বোধন বদলায়। পাঠকদের সুবিধার জন্য আগে বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে সেইরকম কয়েকটি বদল বলে দেওয়া হল। উপন্যাসে যাদের বয়সের উল্লেখ পাওয়া গেছে তাদের নামের পাশাপাশি তাও উল্লেখ করা হল।

রোদিওন রমানোভিচ্ রাস্‌কোল্‌নিকভ্ (রোদিয়া) ২৩ বছর বয়স, 'প্রথম সন্তান' বলে মা পুলখেরিয়া উল্লেখ করেন।

পুলখেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌া— তার মা, ৪৩ বছর বয়স।

আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌া (দুনিয়া)— তার ছোট বোন, ২২ বছর বয়স।

দ্‌মিত্রি প্রকোফিচ্ (বা প্রকোফিয়েভিচ্) রাজুমিখিন— তার বন্ধু।

সেমিওন জাখারভিচ্ মার্মেলাদভ্— প্রাক্তন কেরানি, মাতাল।

কাতেরিনা ইভানোভ্‌না মার্মেলাদভা— তার স্ত্রী।

সোফিয়া সেমিওনভ্‌না মার্মেলাদভা (সোনিয়া)— সেমিওনের প্রথম পক্ষের মেয়ে, ১৮ বছর বয়স।

আর্কাদি ইভানোভিচ্ স্‌ভিদ্রিগাইলভ্— জোতদার, দুনিয়া ওর বাড়িতে কাজ করত, ৫০ বছর বয়স।

মার্ফা পেত্রোভ্‌না স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌া— তার স্ত্রী।

পিওতর পেত্রোভিচ্ লুজিন— দুনিয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল, বয়স ৪৫ পেরিয়ে গেছে।

আন্দ্রেই সেমিওনাভিচ্ লেবেজিয়াত্‌নিকভ্— তার বন্ধু।

জোসিমভ— পুরো নাম নেই, উপন্যাসে শুধু পদবী ধরেই উল্লেখ আছে, রাস্‌কোল্‌নিকভের বন্ধুস্থানীয় ডাক্তার, ২৭ বছর বয়স।

আলেক্সান্দ্র গ্রিগারিকোভিচ্ জামিওতভ— পুলিশ অফিসার।

পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ্— সি. আই. ডি অফিসার, ৩৫ বছর বয়স।

রুশ ব্যক্তিনামের মধ্যে তেমন কোন বৈচিত্র্য নেই— একই নামে একাধিক ব্যক্তির সাক্ষাৎ মেলে, কিন্তু সে ঘাটতি পূরণ করে দেয় পদবী। তাই রুশ লেখকদের পরিচয়ও মূলত তাদের পদবীতে; দস্তইয়েভস্কি, তল্‌স্তোয়, চেখভ্ ইত্যাদি। ল্যেভ্ তল্‌স্তোয় ও আলেক্সেই তল্‌স্তোয়ের মতো একই পদবীর একাধিক লেখক ও সাহিত্যিকের সাক্ষাৎ কদাচিৎ মেলে।

আবার কৃত্রিম এমন সমস্ত পদবীও উদ্ভাবন করা যায় যা সুস্পষ্ট অর্থবহ, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসূচক; কিন্তু উদ্ভাবিত হলেও রুশভাষার স্বভাবের সঙ্গে মিলে গিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিক শোনায়, যার ক্ল্যাসিক দৃষ্টান্ত গোর্কি (তিক্ত)— আলেক্সেই মাক্সিমোভিচ্ পেশ্‌কভের ছদ্মনাম।

বহু লেখকই এ ধরনের স্ব-উদ্ভাবিত পদবীর সাহায্যে তাঁদের গল্প-উপন্যাসের চরিত্রগুলির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। গোগলের 'মৃত আত্মার' চরিত্রগুলির নামকরণ তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

'অপরাধ ও শাস্তি' উপন্যাসে লেখকের নিজের উদ্ভাবিত এরকম বিশেষ অর্থবহ বেশ কয়েকটি পদবী আছে। পদবীতেই তাদের বিশেষ পরিচয়। উপন্যাসের নায়ক রাস্‌কোল্‌নিকভ্। 'রাস্‌কোল্‌নিকভ্' শব্দটির মূল 'রাস্‌কোল্', যার অর্থ ভাঙন অথবা দ্বিধাবিভক্ত। আসলে নায়ক নিজেই ত এক দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্ব (split personality)। বন্ধু রাজুমিখিনের কথায় : "ওর মধ্যে ঠিক যেন আছে দুটি পরস্পরবিরোধী চরিত্র— পালা করে স্থান বদল করে।" (পৃ. ২৩৮)। লক্ষণীয় এই যে উপন্যাসের প্রায় সর্বত্র শুধু পদবী ধরেই তাকে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিষয়ে পাঠক যাতে সচেতন থাকেন হয়তো সেই উদ্দেশ্যেই? আরেকটি চরিত্র : মার্মেলাদভ্ এক ধরনের জেলিজাতীয় মিষ্টি। উপন্যাসের চরিত্রটির তার সঙ্গে স্বভাবগত সাদৃশ্য আছে। 'লুজিন' পদবীও বাস্তবে কোথাও নেই। 'লুজিন'-এর মূল 'লুজা', যার অর্থ বৃষ্টি বা অন্য কোনো কারণে জায়গায় জায়গায় জমে থাকা জলের ডোবা। লুজিন জল ঘোলা করছে বলেই কি? আরও আছে : রাজুমিখিন, লেবেজিয়াত্‌নিকভ্। রুশ ভাষায় 'রাজ্‌উম্' অর্থাৎ বুদ্ধিবিবেচনা বিচক্ষণতা চেতনা ইত্যাদি বলতে যা বোঝায় রাজুমিখিন কি তারই প্রতীক নয়? স্‌ভিদ্রিগাইলভের কথায়: "শুনেছি লোকটা বেশ বিচক্ষণ— ওঁর নামও অবশ্য সেই অর্থ বহন করে।" (পৃ. ৫৩৪)। আর লেবেজিয়াত্‌নিকভ্? 'লেবেজিৎ' অর্থ— হীন তোষামোদের ভাব প্রকাশ। তবে এ চরিত্রটির এ ধরনের সংজ্ঞানির্ধারণ পুরোপুরি খাটে না। অনুমান করা যেতে পারে চরিত্রটি আদতে যে ভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের ফলে লেখক সেখান থেকে দূরে সরে গেছেন। এটা দস্তইয়েভ্‌স্কির স্বভাবসিদ্ধও বটে। তাছাড়া

নামকরণের সর্বক্ষেত্রে লেখক যে এই নীতি অনুসরণ করেছেন তা মনে করাও ঠিক হবে না।

সেন্ট পিটার্সবুর্গ রুশ দেশে 'সাল্‌ক্‌ত পেতের্বুর্গ' নামে পরিচিত— অনুবাদে রেখে দিতে পারলে ভালো হত। কিন্তু ওটাও আসলে বিদেশী নাম— ওলন্দাজ ভাষার শব্দ। তাই পরিচিত ইংরেজি নাম সেন্ট পিটার্সবুর্গ ব্যবহার করা হয়েছে।

কোনো বিষয় ও ভাবনাচিন্তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের উদ্দেশ্যে মূল উপন্যাসে ওই সমস্ত তাৎপর্যপূর্ণ বহু বাক্য, বাক্যাংশ ও শব্দের ক্ষেত্রে লেখকের নির্দেশ অনুযায়ী বাঁকা হরফ ব্যবহার করা হয়েছিল। বাংলায় যতদূর সম্ভব তা রক্ষিত।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখক বাক্যের মাঝখানে বন্ধনী চিহ্নভুক্ত করে অপেক্ষাকৃত গৌণ ধরনের ভাবনা বা বিষয় ব্যক্ত করেছেন। রুশ উপন্যাসে এটাও বহুল প্রচারিত একটি রীতি, যা বাংলা গল্প-উপন্যাসের স্বভাববিরুদ্ধ— বিশেষত প্রত্যক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে। কিন্তু বন্ধনীচিহ্ন তুলে দিলে সে অংশটি প্রক্ষিপ্ত ও খণ্ডবাক্যে পরিণত হয়, যেটা আবার বাংলা বাক্যরীতির অনেকটা স্বভাববিরুদ্ধ। দু একটি ক্ষেত্রে এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে মূল বাক্যের গঠনবিন্যাস পালটাতে হয়েছে, যার ফলে লেখকের মূল চিন্তন-প্রক্রিয়ার পারম্পর্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়নি এমন কথা হলফ করে বলা যায় না। বাংলা ভাষার প্রতি সুবিচারের খাতিরে অনুবাদে এটুকু স্বাধীনতা আশা করি মার্জনীয়।

দস্তইয়েভ্‌স্কি তাঁর মূল রচনায় উপন্যাসে উল্লিখিত বেশ কিছু রাস্তাঘাট ও জায়গার পূর্ণাঙ্গ নামের বদলে আদ্যক্ষর ব্যবহার করে ছেড়ে দিয়েছেন। যেমন কাহিনীর শুরুতেই 'স্তলিয়াদ্‌নি লেন্' ও 'কোকুশ্‌কিন ব্রিজ' 'স— লেন' ও 'ক— ব্রিজ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। আসল পরিচয় পরবর্তীকালে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, যেহেতু আদ্যক্ষর দেখে স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষে তাদের শনাক্ত করতে কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের কাছে আদ্যক্ষরের এরকম ছড়াছড়ি বিসদৃশ বলে পুরো নামই পুনরুদ্ধার করে দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো ইংরেজি অনুবাদেও অবশ্য তা-ই করা হয়েছে।

দস্তইয়েভ্স্কির জীবনের প্রধান ঘটনা

১৮২১ ৩০ অক্টোবর মস্কোতে ফিয়োদর মিখাইলোভিচ্ দস্তইয়েভ্স্কির জন্ম।

১৮৩৭ দস্তইয়েভ্স্কির মা মারা যান। দুই ভাই সেন্ট পিটার্সবুর্গে চলে আসেন ও দুই ছোট বোনকে নিয়ে বাবা চলে যান গ্রামে।

১৮৩৯ বাবা নিজের চাষীদের হাতে খুন হন।

১৮৪২, ২১ বছর বয়সে দস্তইয়েভ্স্কি সৈন্যদলে নাম লেখান।

১৮৪৪, ২৩ বছর বয়সে সেনাবাহিনীর কাজ ছেড়ে দিয়ে লিখতে শুরু করেন। প্রথম রচনা *গরিবলোক* শুরু।

১৮৪৫ *গরিবলোক*-এর খুব নাম হয়।

১৮৪৬ ২৫ বছর বয়সে মৃগিরোগ শুরু। '*বিকল্প*' প্রকাশ।

১৮৪৯ রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তার। গুলি করে হত্যার জন্যে সারি দিয়ে দাঁড়া করানো হয়। শেষ মুহূর্তে মেরে না ফেলে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেয়া হয়।

১৮৫০-১৮৫৯, ২৯ থেকে ৩৮ বছর বয়স পর্যন্ত নির্বাসনে, ও শেষের দিকে সাধারণ সৈন্য হিশেবে, কাটান।

১৮৬০, ৩৯-বছর বয়সে আবার লিখতে শুরু করেন। দুইখণ্ডে '*শবাগার*।'

১৮৬১ *অপমানিত ও আহত* প্রকাশ।

১৮৬২ ফ্রান্সে ও ইংল্যান্ডে।

১৮৬৩ ফ্রান্সে ও ইতালিতে।

১৮৬৪ ৪৩ বছর বয়সে জার্মানিতে। প্রেস্তুপ্লিয়েনিয়ে ই নাকাজানিয়ের (ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট) প্রথম ভাবনা।

১৮৬৬ ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট (প্রেস্তুপ্লিয়েনিয়ে ই নাকাজানিয়ে) প্রকাশ। দ্বিতীয় বিয়ে আন্না স্নিতকিনা-কে। ইনিই এই উপন্যাসের ডিকটেশন নেয়ার কাজ করেছিলেন।

১৮৬৭ জার্মানিতে। '*ইডিয়েট*'।

১৮৭১ সেন্ট পিটার্সবুর্গে। '*ভূতগ্রস্ত*'।

১৮৭৮ তাঁর তিন বছরের ছেলে মৃগিরোগে মারা যায়। '*কারামাজোভ ভাইয়েরা*' শুরু করেন ৫৭ বছর বয়সে।

১৮৭৯-৮০ '*কারামাজোভ ভাইয়েরা*' বেরতে শুরু করে। আপাতত শেষ হয়। পরবর্তী অংশ লেখার কথা ভাবেন।

১৮৮১ ২৮ জানুয়ারি ৬০ বছর বয়সে ফুসফুস থেকে রক্তক্ষরণে তিনদিনের অসুস্থতার শেষে মৃত্যু।

প্রথম পর্ব

জুলাইয়ের শুরু। প্রচণ্ড গরম পড়েছে। সন্ধ্যার দিকে এক যুবক স্তলিয়ার্‌নি লেনের এক বাড়ির ভাড়াটেদের একজনের কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া এক খুপরি থেকে বেরিয়ে একটু ইতস্তত করে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল কোকুশ্‌কিন ব্রিজের দিকে।

সিঁড়িতে এবারে বাড়িউলির নজর এড়াতে কোন অসুবিধে তার হল না। যুবকের বাসস্থান খুপরিটা পাঁচতলা দালানের একেবারে টঙে— আসলে একটা চিলেকোঠা। ঘরের চেয়ে কুলুঙ্গির সঙ্গেই অবশ্য সেটার বেশি মিল। ঘরের টুকটাক কাজের জন্য একজন ঠিকে ঝি আর সেই সঙ্গে দুপুরের খাবার জোগানের কড়ারে যে মহিলা তাকে এই খুপরিটা ভাড়া দিয়েছিল সে থাকে এক সারি সিঁড়ি নিচে— আলাদা ফ্ল্যাটে। রাস্তায় বেরোতে হলে বাড়িউলির হেঁসেলের পাশ দিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না যুবকের। হেঁসেলের দরজাটা আবার সিঁড়ির দিকটায়— তাও বেশির ভাগ সময় হাঁ করে খোলা। প্রত্যেক বার পাশ দিয়ে যাবার সময় একধরনের অসুস্থ মানসিকতা, একটা ভয়-ভয় ভাব যুবককে পেয়ে বসে; লজ্জায়, বিরক্তিতে সে ভুরু কোঁচকায়। বাড়িউলির কাছে সে আপাদমস্তক ঋণে জর্জরিত। তাই ভয়— পাছে মহিলার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

যুবক ভীতু নয়, কুনো স্বভাবের নয়। বরং ঠিক উল্‌টো। কিন্তু বেশ কিছুকাল হল, দেখে মনে হয়, সে বিষণ্ণতায় ভুগছে, খিটখিটে হয়ে পড়েছে, উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। সকলের কাছ থেকে সে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে, নিজেকে নিজের ভেতরে এতটা গুটিয়ে ফেলেছে যে শুধু বাড়িউলির সঙ্গে সাক্ষাতে কেন যে কারও সঙ্গে সাক্ষাতেই তার ভয়। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে আছে, যদিও তার কোণঠাসা অবস্থাটাও আজকাল আর তার কাছে তেমন দুঃসহ মনে হয় না। সে তার নিত্যকার কাজকর্ম একেবারে ছেড়ে দিয়েছে, তাতে এতটুকু উৎসাহ তার নেই। তার আসল ভয় বাড়িউলিকে নয়— তা সে বাড়িউলি ওর বিরুদ্ধে যত ফন্দিই আটুক না কেন। কিন্তু চলতে চলতে সিঁড়িতে থমকে দাঁড়িয়ে নিত্যকার ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে রাজ্যের আজেবাজে কথা শোনা, যাতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ তার নেই, পাওনাদার বড়িউলির এত তাগাদা, হুমকি, অনুযোগ এবং অগত্যা গা বাঁচাতে গিয়ে ছলচাতুরি আর মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ, বারবার ক্ষমা চাওয়া— না, তার চেয়ে ভালো বরং বিড়ালের মতো পা টিপে-টিপে সিঁড়ি দিয়ে আস্তে করে সটকে পড়া, যাতে কারও চোখে না পড়তে হয়।

তবে এবারে পাওনাদার বাড়িউলির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয়টা রাস্তায় বেরিয়ে আসার পর তার নিজের কাছে পর্যন্ত আশ্চর্য ঠেকছিল।

'এমন একটা কাজে নামতে যাচ্ছি, অথচ কিনা একটা তুচ্ছ ব্যাপারে ভয়। ভাবতে গিয়ে মুখে তার অদ্ভুত হাসি খেলে গেল। 'হুম্... হ্যাঁ... সবই মানুষের হাতে, তা সত্ত্বেও যখন তার নাকের ডগা দিয়ে সুযোগ ফসকে বেরিয়ে যায় তখন মানতেই হবে সেটা স্রেফ তার ভীরুতার জন্য। ...এটা একেবারে স্বতঃসিদ্ধ।... মনে-মনে ভাবি, মানুষ সবচেয়ে ভয় পায় কিসে? সবচেয়ে বেশি ভয় পায় নতুন কোন পদক্ষেপ নিতে, তার নিজেরই নতুন কোন কথাকে।... কিন্তু না, আমি বড় বেশি বাজে বকছি। বাজে বকি বলেই তো আমার দ্বারা কিছু হয় না। তবে সম্ভবত ব্যাপারটা এরকমও হতে পারে যে কিছু করি না বলে বাজে বকি। আমি বাজে বকতে শিখেছি গত এক মাস হল, দিনের পর দিন ঘরের কোণায় শুয়ে-শুয়ে ভাবতে-ভাবতে...আবোল-তাবোল ভাবতে ভাবতে। কিন্তু আমি এখন কী করতে যাচ্ছি?— আমি কি *এর* উপযোগী? *এর* কি কোন গুরুত্ব আছে? না, আদৌ নেই। নিজের কল্পনাকে উসকে দিয়ে স্রেফ একটু মজা করা — ছেলেমানুষি। হ্যাঁ, সম্ভবত ছেলেমানুষিই!'

রাস্তায় অসহ্য গরম। তায় গুমোট, ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি, সর্বত্র চুনের ছড়াছড়ি, ভারা বাঁধা, ইট সুড়কি, ধুলোবালি...গ্রীষ্মকালে শহরের বাইরে বাগানবাড়ি ভাড়া করে থাকার সঙ্গতি যাদের নেই, সেন্ট পিটার্সবুর্গে বসবাসকারী সেইসব মানুষের কাছে যা বড় বেশি পরিচিত, গ্রীষ্মের সেই বিশেষ ধরনের উৎকট গন্ধ—সব মিলে একযোগে বিশ্রীভাবে ঝাঁকুনি দিল যুবকের স্নায়ুতন্ত্রীকে। যদিও অমনিতেই তা নড়বড়ে হয়ে ছিল। শহরের এই অংশে শুঁড়িখানার বিশেষ আধিক্য। এখানকার উৎকট দুর্গন্ধ এবং রোজকার স্বাভাবিক কাজের সময় সত্ত্বেও রাস্তায়-ঘাটে আকছার মাতালের সাক্ষাৎ— কদর্যতা ও বিষণ্ণতার চূড়ান্ত মাত্রা যোগ করে দৃশ্যটিকে সম্পূর্ণ করে তুলেছে। যুবকের কোমল মুখের ওপর মুহূর্তের মধ্যে ফুটে উঠল প্রবল বিতৃষ্ণার ছাপ। প্রসঙ্গত, যুবক দস্তুরমতো সুপুরুষ—গভীর কালো চোখ, গাঢ় বাদামি চুল, মাঝারিদের চেয়ে একটু বেশি লম্বা, পাতলা ছিপছিপে। দেখতে-দেখতে সে ডুবে গেল কী এক গভীর ভাবনায় — এমনকি মনে হল যেন একটা ঘোর তাকে পেয়ে বসেছে। পথ চলতে লাগল আশেপাশে কোথাও দৃকপাত না করে—দৃকপাত করার কোন বাসনাও তার ছিল না। কেবল থেকে-থেকে আপন মনে বিড়বিড় করে কী সব আওড়াতে লাগল—ওরকম স্বগতোক্তিতে অবশ্য সে অভ্যস্ত। এই অভ্যাসের কথা সে সবে নিজেও মনে-মনে স্বীকার করেছে। এই মুহূর্তে সে নিজেও উপলব্ধি করতে পারছিল যে তার ভাবনাচিন্তা সময়-সময় তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া সে খুব দুর্বলও হয়ে পড়েছে—দুদিন হল প্রায় কিছুই খাওয়া হয়নি।

যুবকের পোশাক-পরিচ্ছেদের হাল খারাপ—এত খারাপ যে ওরকম শতচ্ছিন্ন জামাকাপড়ে যারা অভ্যস্ত তারাও ওই পরে দিনে-দুপুরে পথে বের হতে লজ্জা পাবে। অবশ্য এই মহল্লাটা এমন যে পোশাক-পরিচ্ছদে এখানে কাউকে তাক লাগিয়ে দেওয়া

কঠিন। কাছেই সেন্নায়া স্কোয়ার, বিশেষ পল্লীর কুখ্যাত কিছু বাড়িঘরের প্রাচুর্য। সেন্ট পিটার্সবুর্গের মাঝখানের এই মহল্লার বড় রাস্তায় ও অলিতে-গলিতে কুখ্যাত ওয়ার্কশপের মিস্ত্রি ও কারিগর জনতার জটলা সাধারণ চিত্রটিকে এত বর্ণাঢ্য করে তুলেছে যে এখানে কোন মূর্তির আবির্ভাবে অবাক হয়ে যাওয়াটাই বরং বিস্ময়কর। কিন্তু যুবকের মনের মধ্যে তিক্ততা ও অবজ্ঞার ভাব এত বেশি পরিমাণে জমেছে যে এই বয়সের উপযোগী স্পর্শকাতরতা তার মধ্যে কখন-কখন পূর্ণমাত্রায় দেখা গেলেও এরকম শতচ্ছিন্ন জামাকাপড়ে রাস্তায় দর্শন দেওয়া তার কাছে তেমন লজ্জাজনক মনে হয় না। এই অবস্থায় যদি জানাশোনা কারও সঙ্গে বা আগেকার কোন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাহলে অবশ্য অন্য কথা। তাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ তার আদৌ পছন্দও নয়। ...ঠিক এই সময় কোথাকার কোন এক মাতালকে কেন এবং কোথায় কে জানে বিশাল ভারবাহী ঘোড়ায় টানা এক মস্ত গাড়িতে চাপিয়ে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। যেতে-যেতে হঠাৎ ওর দিকে চোখ পড়ে যেতে মাতালটা হেঁকে উঠল : 'অ্যাও জার্মান টুপিওয়ালা।' হাত দিয়ে ওকে দেখিয়ে তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করল। সঙ্গে-সঙ্গে যুবকের চলার গতি থেমে গেল, কাঁপতে-কাঁপতে সে মাথার টুপিটা আঁকড়ে ধরল। গোলাকার, উঁচু টুপি, বিখ্যাত জিমারম্যানের দোকানে কেনা। কিন্তু এতদিনের ব্যবহারে এখন জীর্ণ, একেবারে হলদেটে, টুটাফাটা, দাগধরা। কিনারাগুলো ক্ষয়ে গেছে। যাচ্ছেতাইভাবে একধারে হেলে পড়েছে টুপিটা। কিন্তু যে অনুভূতি তাকে পেয়ে বসল সেটা লজ্জা নয়—সম্পূর্ণ অন্য ধরনের—ভীতির কাছাকাছি এক অনুভূতি।

ঘাবড়ে গিয়ে বিড়বিড় করে সে বলল, "আমি আগেই জানতাম! যা ভেবেছিলাম তাই। এর চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না! এরকম একটা মূর্খামি, অতি তুচ্ছ, ছোটখাটো জিনিস পুরো পরিকল্পনাকে ভেস্তে দেবার পক্ষে যথেষ্ট!...হ্যাঁ টুপিটা বড় বেশি চোখে পড়ার মতো। ...হাস্যকর, তাই চোখে পড়ার মতো।...আমার শতচ্ছিন্ন বেশভূষার উপযুক্ত অবশ্যই হতে পারত একটা কাপড়ের টুপি— নিদেনপক্ষে কোন পুরানো তোবড়ান টুপি— এই কদাকার বস্তুটি নয়। এ ধরনের টুপি কেউ পরে না, কয়েক মাইল দূর থেকে নজরে পড়বে, লোকের মনে গাঁথা হয়ে থাকবে। তার মানে রহস্য সমাধানের একটা সূত্র হয়ে থাকবে। এক্ষেত্রে যা দরকার তা হল যতদূর সম্ভব লোকের নজরে না পড়া। ...তুচ্ছ জিনিস, কিন্তু এই তুচ্ছ জিনিসই বড় হয়ে দাঁড়ায়। এই তুচ্ছ জিনিসগুলোই তো যত নষ্টের গোড়া।..."

বেশি দূরের পথ নয়। এমনকি তার বাড়ির ফটক থেকে কয় পা দূরে তাও সে জানে : ঠিক সাতশ তিরিশ পা। একবার যখন সে এই চিন্তায় বিভোর হয়ে গিয়েছিল তখন গুনে দেখেছে। সেই সময় সে নিজেও তার এই স্বপ্নকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। স্বপ্ন যে এত বীভৎস অথচ দুর্দম আকর্ষণীয় হতে পারে এই ভেবে সে মনে-মনে

ভীষণ বিরক্তই হয়েছিল। কিন্তু এখন, এক মাস পরে সে তাকে দেখতে শুরু করেছে অন্য দৃষ্টিতে। নিজের অক্ষমতা ও দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব নিয়ে এই যে এত স্বগতোক্তি তাতে বিরক্তি বোধ করলেও 'বীভৎস' স্বপ্নটাকে যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা উদ্যোগ হিসেবে গণ্য করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, যদিও এখনও সে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছে না। এমনকি এখন যখন নিজের উদ্যোগকে প্রাথমিকভাবে *যাচাই* করে দেখতে চলেছে তখন প্রতি পদক্ষেপে বেড়ে চলেছে তার উত্তেজনা।

সুবিশাল বাড়িটার কাছাকাছি যখন সে এসে পৌঁছল ততক্ষণে তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেছে, উত্তেজনায় কাঁপছে তার সর্বাঙ্গ। বাড়ির একধারের দেয়াল ইয়েকাতেরিনা খালের দিকে, অন্য ধারেরটা সাদোভায়া স্ট্রিটের দিকে। অনেকগুলো খুদে খুদে ফ্ল্যাট নিয়ে এই বাড়িটা। দরজি, কলের মিস্ত্রি, রাঁধুনি, নানা ধরনের বৃত্তিধারী ভিনদেশী জার্মান, বাড়িছাড়া নষ্ট মেয়ে, সরকারি অফিসের ছোটোখাটো কেরানি ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার লোকজনের বাস এগুলোতে। বাড়ির সামনের ও পেছনের দুটো আঙিনা আর ফটকই লোকজনের অবিরাম ভেতরে-বাইরে যাতায়াতের ফলে সরগরম। তিন-চারজন দারোয়ান কাজ করে এখানে। তাদের কারও মুখোমুখি পড়তে হল না দেখে যুবক খুব খুশি। সকলের অলক্ষে তক্ষুণি ফটকের ভেতর দিয়ে গলে গিয়ে সোজা ডান হাতের সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। অন্ধকার, সরু সিঁড়ি —'খিড়কির সিঁড়ি' যেমন হয়। কিন্তু এ সিঁড়ি তার ভালোমতো জানা, খুঁটিয়ে দেখা আছে। গোটা পরিস্থিতিটা তার ভালোই লাগছিল : এই অন্ধকারের মধ্যে কোন কৌতূহলী দৃষ্টিও বিপজ্জনক নয়। 'আমি যদি এই মুহূর্তে এত ঘাবড়ে যাই তাহলে যখন আসল *কাজে* নামতে হবে তখন আমার কী দশা হবে?' চারতলায় উঠতে-উঠতে তার মনে হল। এখানে তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল কয়েকজন মুটে। দেখেই মনে হয় এককালে ফৌজি ছিল, এখন সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে মুটেগিরি করছে। একটা ফ্ল্যাট থেকে আসবাবপত্র বের করে আনছিল। আগেই তার জানা ছিল যে এ ফ্ল্যাটে থাকে একজন সরকারি আমলা আর তার পরিবার। লোকটা জাতে জার্মান। 'তার মানে, এই জার্মানটি এখন ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ চারতলায়, এদিককার সিঁড়ির এই চাতালে কিছুদিনের জন্য লোকজন বলতে থাকছে একমাত্র বুড়ির ফ্ল্যাটটায়। ভালো বলতে হবে।... তেমন হলে...' আবার মনে-মনে ভাবতে-ভাবতে বুড়ির ফ্ল্যাটের দরজায় ঘণ্টি বাজাল। ক্ষীণ টুং টাং আওয়াজ উঠল—মনে হচ্ছিল ঘণ্টিটা যেন তামার নয়, টিনের। এ সমস্ত বাড়ির, এ ধরনের খুদে ফ্ল্যাটগুলোর প্রায় সব ক'টারই দরজার ঘণ্টি এরকম হয়ে থাকে। এই ঘণ্টির আওয়াজ সে এতদিনে ভুলে গিয়েছিল। এখন এই বিশেষ আওয়াজটা তাকে যেন অকস্মাৎ মনে করিয়ে দিল কিসের একটা কথা, একটা স্পষ্ট ছবি।...সঙ্গে-সঙ্গে সে শিউরে উঠল। এবারে বড় বেশি দুর্বল হয়ে পড়ছে তার স্নায়ু। কিছুক্ষণ বাদে দরজা সামান্য একচিলতে ফাঁক হল। ফ্ল্যাটের বাসিন্দা

মহিলাটি আগন্তুককে নিরীক্ষণ করছে দরজার ফাঁক দিয়ে— তার দৃষ্টিতে স্পষ্ট অবিশ্বাসের আভাস। কেবল অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে তার কুতকুতে কালো চোখদুটো। সিঁড়ির চাতালে অনেক লোকজন আছে দেখে আশ্বস্ত হয়ে সে দরজা পুরো খুলে দিল। যুবক চৌকাঠ পেরিয়ে ঢুকে পড়ল পার্টিশন দিয়ে ভাগ করা সামনের ঘরে। জায়গাটা অন্ধকার। পার্টিশনের ওপাশে ছোট রান্নাঘর। তার সামনে তখন দাঁড়িয়ে আছে বুড়ি—নীরবে, তার দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টি মেলে। বুড়ি একেবারেই খুদে ছোটখাটো, শুকনো চেহারার। বয়স বছর ষাটেক হবে। ছোট-ছোট চোখদুটোর দৃষ্টি বেশ ধারাল, কুটিল। নাকটা ছোট্ট, ধারাল। মাথায় না আছে টুপি, না কোন ওড়না। মাথার চুল তেল জবজবে, চুলের রং শণের মতো, অল্পস্বল্প পাকও ধরেছে চুলে। মুরগির ঠ্যাঙের মতো লিকলিকে লম্বা গলাটা। গলায় ফ্ল্যানেলের একটুকরো কাপড় জড়ানো। গরম সত্ত্বেও তার গায়ে ঝুলছে বহু ব্যবহারে জীর্ণ, হলদেটে পশুলোমের হাতকাটা খাটো কোর্তা। বুড়ি থেকে-থেকে কাশছিল, সামান্য কাতরাচ্ছিল। যুবকের দৃষ্টিতে সম্ভবত একধরনের অস্বাভাবিকতা ছিল যার ফলে বুড়ির চোখে আবার ফুটে উঠল আগেকার অবিশ্বাস।

আরেকটু সৌজন্য দেখাতে হয় একথা মনে হতে যুবক ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়ে মিনমিন করে বলল, ''রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌। ছাত্র। মাসখানেক আগে আপনার কাছে একবার এসেছিলাম।''

''মনে আছে বাবা, মনে আছে। আপনি যে এসেছিলেন খুব মনে আছে,'' আগের মতোই যুবকের মুখের ওপর অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেলতে-ফেলতে চাঁছাছোলা গলায় বুড়ি বলল।

বুড়ির সন্দিগ্ধতায় সামান্য অপ্রস্তুত ও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌। সে বলল, ''তা...আমি আবার এসেছি সেই একই কাজে...''

অস্বস্তির সঙ্গে সে মনে-মনে ভাবল, 'কি জানি, বুড়ি হয়ত বরাবরই ওরকম। আগে আমি লক্ষ করিনি— এই যা।'

বুড়ি চুপ করে রইল, যেন মনে-মনে কিছু ভাবছে। কিছুক্ষণ পরে একপাশে সরে গিয়ে বাইরের ঘরের দরজা দেখিয়ে দিল, আগন্তুককে আগে-আগে যেতে দিয়ে মুখে বলল, ''আসুন।''

যুবক যে ঘরে ঢুকল সেটা তেমন বড় নয়। ঘরের ওয়ালপেপার হলদেটে হয়ে গেছে, জানলায় জেরানিয়াম ফুল, মসলিনের পরদা ঝুলছে। এই মুহূর্তে ঘরটা সূর্যাস্তের আলোয় উজ্জ্বল। 'তাহলে তখনও সূর্য এইভাবে আলো দেবে।... একটু খাপছাড়াভাবে চিন্তাটা ঝলক দিল রাস্‌কোলনিকভের মাথায়। ঘরের কোথায় কী আছে বুঝে নিয়ে মনে করে রাখার উদ্দেশ্যে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল। কিন্তু সেরকম উল্লেখযোগ্য কিছু চোখে পড়ল না। আসবাবপত্র সব পুরানো, হলুদ রঙের কাঠের

তৈরি। আসবাবপত্র বলতে বিশাল বাঁকানো কাঠের পিঠ দেওয়া একটা সোফা। সোফার সামনে একটা গোল টেবিল— দু-পাশে একটু লম্বাটে। দুই জায়গার মাঝখানে ড্রেসিং টেবিল, একটা ছোট আয়না, দেয়াল বরাবর সার দিয়ে রাখা খানকয়েক চেয়ার, হলদে ফ্রেমে আঁটা গোটা দুই-তিন সস্তার ছবি— পাখি হাতে জার্মান যুবতীদের ছবি। ঘরে যাবতীয় আসবাব বলতে এ-ই। এক কোণে ছোট্ট একটা আইকন, তার সামনে জ্বলছে আইকন-প্রদীপ। আসবাব, মেঝে—সবকিছু ঝকঝকে তকতকে— মেজেঘষে জেল্লা তোলা, চেকনাই দিচ্ছে। 'লিজাভেতার হাতের কাজ,' যুবক মনে-মনে ভাবল। ঘরের কোথাও ধুলোর কণাটুকুও খুঁজে পাওয়া ভার। 'কুটিল বিধবা বুড়িগুলোর বাড়িতে এরকম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখতে পাওয়া যায়'; রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ আবার মনে-মনে ভাবল। কৌতূহলভরে চোরাদৃষ্টিতে তাকাল পরের ছোট্ট কুঠুরিতে ঢোকার দরজার সামনে ঝোলান ছিটকাপড়ের পরদার দিকে। ওই ছোট ঘরটাতে আছে বুড়ির শোবার খাট আর দেরাজ-আলমারি। এখন পর্যন্ত ওখানে উঁকি মেরে দেখার সুযোগ তার হয়নি। ফ্ল্যাট বলতে এই দুটোই ঘর।

ঘরে ঢুকে এবারেও তার মুখের ওপর আগের মতো সরাসরি দৃষ্টি রাখার উদ্দেশ্যে ঠিক তার সামনে এসে দাঁড়াল বুড়ি। রুক্ষস্বরে জিগ্‌গেস করল, "কী চাই আপনার?"

"এই একটা জিনিস বন্ধক দিতে এসেছি," বলে পকেট থেকে চেপটা আকারের একটি ঘড়ি বের করল। পুরানো রুপোর ঘড়ি, উলটো পিঠে পৃথিবীর মানচিত্র খোদাই করা। শিকলিটা স্টিলের।

"কিন্তু আপনার আগের বন্ধকী মালের মেয়াদ পার হয়ে গেল যে! এক মাস পেরিয়ে গেছে দুদিন আগে।"

"এক মাসের সুদও আমি আপনাকে এনে দেব। একটু ধৈর্য ধরুন।"

"ধৈর্য ধরব নাকি আপনার জিনিস এক্ষুনি বেচে দেব, সেটা নির্ভর করছে আমার নিজের ইচ্ছের ওপর, বাবা!"

"এই ঘড়িটার জন্যে আমায় বেশ কিছুটা দেবেন তো আলিওনা ইভানোভ্‌না?"

"যত সব আজেবাজে জিনিস আনছ বাবা। এ জিনিসটার তেমন কোন দাম নেই। গতবার আঙটির জন্যে দুখানা নোট দিয়েছিলাম, অথচ সেকরার দোকানে নতুনই কেনা যায় দেড় রুবলে।"

"রুবল চারেক তো দেবেন। আমি বন্ধক ছাড়িয়ে নেব। এটা আমার বাবার ঘড়ি। শিগগিরই আমি টাকা পাচ্ছি।"

"যদি চান দেড় রুবল দিতে পারি। সেই সঙ্গে আগাম সুদ।"

"দেড় রুবল!" যুবক আর্তনাদ করে উঠল।

"এখন আপনার ইচ্ছে," এই বলে বুড়ি ফেরত দেওয়ার জন্য ঘড়িটা বাড়িয়ে দিল তার দিকে। যুবক ফেরত নিল। বুড়ির ওপর সে এত ক্ষেপে গিয়েছিল যে

পারলে তখুনি চলে যায়। কিন্তু যাবার আর কোন জায়গা নেই। সে যে আসলে অন্য আরেকটা মতলবে এসেছে একথা মনে পড়ে যেতে তৎক্ষণাৎ মত পালটাল।

"বেশ, তাই দিন," রূঢ়স্বরে সে বলল।

বুড়ি চাবির জন্য পকেটে হাত দিল। পরদার আড়ালে, অন্য ঘরটাতে চলে গেল। এ পাশের ঘরের মাঝখানে যুবক তখন একা। একা-একা দাঁড়িয়ে সে কৌতূহলভরে শুনতে লাগল ওপাশের ঘরের অওয়াজ, মনে-মনে মতলব আঁটতে লাগল। দেরাজ-আলমারির তালা খোলার আওয়াজ শোনা গেল। 'সম্ভবত ওপরের দেরাজটা,' সে অনুমান করল। 'তার মানে, দেখা যাচ্ছে, চাবি রাখে ডান পকেটে।... সবগুলো একটা গোছায়, স্টিলের রিং-এ... ওখানে একটা চাবি আছে যেটা আর সবগুলোর চেয়ে বড় —তিনগুণ বড়— তার মুখটা খাঁজকাটা। ওটা নিশ্চয়ই দেরাজ-আলমারির নয়।... তাহলে দেখা যাচ্ছে, ওখানে কোন পেঁটরা বা তোরঙ্গ আছে।... হুঁ এটা একটা ভাববার বিষয় বটে। তোরঙ্গের চাবি ওরকমই হয়ে থাকে।... ধুৎ কি যাচ্ছেতাই সব ব্যাপার-স্যাপার...'

বুড়ি ফিরে এল।

"এই যে বাবা, রুবলে যদি মাসে দশ কোপেক করে হয় তাহলে দেড় রুবলে আপনার কাছ থেকে পাওনা হচ্ছে পনেরো কোপেক, এক মাসের আগাম। তাছাড়া আগের দু রুবলের দরুন ওই হারেই আপনার কাছ থেকে পাওনা হচ্ছে আগাম কুড়ি কোপেক। একুনে পঁয়ত্রিশ। এখন তাহলে আপনার ঘড়ির জন্যে আপনি পাচ্ছেন মোট এক রুবল পনেরো কোপেক। এই নিন।"

"সে কী! এখন কিনা বলছেন এক রুবল পনেরো কোপেক!"

"ঠিক তাই।"

যুবক আর কথা না বাড়িয়ে টাকাটা নিল। বুড়ির দিকে তাকাল, কিন্তু জায়গা থেকে নড়ার জন্য কোন ব্যস্ততা দেখাল না— দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন আরও কিছু বলতে চায়, অথচ সেটা যে ঠিক কী বোধহয় সে নিজেও জানে না।

"আমি আর কয়েকদিন বাদে আপনার কাছে হয়ত আরও একটা জিনিস নিয়ে আসব আলিওনা ইভানোভ্না।...রুপোর...ভালো জিনিস...সিগারেট কেস একটা...একজন বন্ধুর কাছে আছে... ফেরত পেলেই আনব..." একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলে সে চুপ করে গেল।

"যখন পাওয়া যাবে তখনই কথা হবে বাবা।"

"তাহলে চলি। আপনি দেখছি সবসময় ঘরে একা বসে থাকেন। আপনার বোন এখানে নেই নাকি?" ঘরের সামনে খালি জায়গার দিকে পা বাড়াতে-বাড়াতে যতদূর সম্ভব উদাসীন ভাব দেখিয়ে সে জিগ্গেস করল।

"তার সঙ্গে আপনার কী দরকার বাবা?"

"না না, এমন কিছু নয়। এই অমনি জিগ্‌গেস করছিলাম আর কি। আপনি এখন কিনা... আচ্ছা চলি, আলিওনা ইভানোভ্‌না।"

রাস্‌কোলনিকভ বেশ খানিকটা বিব্রতভাবেই বেরিয়ে গেল। অস্বস্তির ভাবটা এখন তার সমানে বেড়ে চলেছে। এমনকি সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে সে বারকয়েক থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল— যেন কোন একটা কারণে হঠাৎ চমকে গেছে। অবশেষে রাস্তায় নামার পর অবাক হয়ে বলে উঠল: "হা ভগবান। কি বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড। ... সত্যিই কি... সত্যিই কি আমি... না, এ হতে পারে না! এটা অসম্ভব!" বেশ জোর দিয়ে সে যোগ করল। সত্যি-সত্যিই কি এরকম ভয়ঙ্কর জিনিস আমার মাথায় আসতে পারে? কিন্তু... ছিঃ কি নোংরামিই না করার ক্ষমতা আছে আমার মনটার! সবচেয়ে বড় কথা—নোংরা, বিশ্রী, জঘন্য, জঘন্য!...অথচ আমি কিনা পুরো একটা মাস..."

কিন্তু মুখের কথা বা বিস্ময়— কোনটা দিয়েই সে প্রকাশ করতে পারল না তার ভেতরকার উত্তেজনা। যে মুহূর্তে সে বুড়ির বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছিল ঠিক তখন থেকে যে অপরিসীম বিতৃষ্ণার ভাব তার বুকে চেপে বসেছিল তা এখন দেখতে-দেখতে প্রবল হয়ে উঠছে, এত বেশি প্রকট হয়ে পড়ছে যে সে বুঝতে পারছে না এই বিষাদ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী। ফুটপাত দিয়ে সে চলতে লাগল পাগলের মতো, পথচারীদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে। লোকজনের সঙ্গে বারবার ধাক্কা খেতে লাগল। তার সংবিৎ ফিরে এল পরের রাস্তায় আসার পর। চারদিকে তাকানোর পর সে লক্ষ করল যে দাঁড়িয়ে আছে একটা শুঁড়িখানার সামনে। ঢোকার মুখে ফুটপাত থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে তলকুঠুরিতে। দরজা দিয়ে ঠিক সেই মুহূর্তে বেরিয়ে আসছিল দুই মাতাল। একজন আরেকজনের গায়ে ঠেস দিয়ে টাল সামলাচ্ছে । অশ্রাব্য গালিগালাজ বর্ষণ করতে-করতে রাস্তায় উঠে আসছে। রাসকোল্‌নিকভ্‌ বেশি ভাবনাচিন্তা না করে তৎক্ষণাৎ নেমে গেল তলকুঠুরিতে। এর আগে কখনও সে শুঁড়িখানায় যায়নি, কিন্তু তখন তার মাথা ঘুরছে, তায় আবার ভয়ঙ্কর তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা বীয়ার খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল তার। তাছাড়া নিজের আকস্মিক শারীরিক দৌর্বল্যের কারণ হিসেবে তার এও মনে হয়েছিল যে হয়ত খিদে পিয়েছে। অন্ধকার নোংরা কোণায় একটা তেলচিটে ছোট্ট টেবিলের ধারে বসে পড়ে সে বীয়ার অর্ডার দিল। ঢকঢক করে প্রথম মগটা নিঃশেষে পান করার সঙ্গে-সঙ্গে মনটা যেন হালকা হয়ে গেল। তার ভাবনাচিন্তা স্বচ্ছ হয়ে এল। 'গোটা ব্যাপারটাই বাজে,' বুকে বল ফিরে পেতে সে মনে-মনে বলল। 'অমন ঘাবড়ানোর কোন কারণ ছিল না। নিছক শারীরিক গোলযোগ। মগখানেক বীয়ার, এক টুকরো মচমচে টোস্ট বিস্কুট-তাহলেই পলকের মধ্যে মতি স্থির হবে, ভাবনাচিন্তা পরিষ্কার হয়ে আসবে, সঙ্কল্প স্থির করা যাবে। ধ্যুৎ, নেহাতই তুচ্ছ ব্যাপার। ...' কিন্তু নিজের অবস্থা নিয়ে এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা প্রকাশ করা সত্ত্বেও তাকে এখন বেশ খুশি-খুশি দেখাচ্ছিল,

মনে হচ্ছিল যেন হঠাৎই একটা গুরুভার নেমে গেছে তার বুকের ওপর থেকে। তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠল উপস্থিত সকলের প্রতি অমায়িক ভাব। কিন্তু এমনকি এই মুহূর্তেও সে যেন আগে থাকতে অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারছিল যে ভালোর জন্য তার এই যে এত ব্যাকুলতা, এটাও পীড়াদায়ক।

শুঁড়িখানায় এই সময়টাতে আছে মাত্র গুটিকয়েক লোক। সিঁড়িতে যাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল সেই দুই মাতাল ছাড়াও তাদের ঠিক পর-পর একসঙ্গে বেরিয়ে গেল গোটা একটা দঙ্গল—জনাপাঁচেক লোক, একজনের হাতে একটা অ্যাকর্ডিয়ান, সঙ্গে একটা নষ্ট মেয়ে। এরপর জায়গাটা হয়ে গেল নিঝুম, ফাঁকা। যারা রয়ে গেল তাদের একজন নেশাগ্রস্ত—তবে নেশা তার ধরেছে অল্পস্বল্প, বসে আছে বীয়ার সামনে নিয়ে। দেখে মনে হয় নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক হবে। তার সঙ্গীটি বিশাল, স্থূলকায়। গায়ে তার সাইবেরীয় কোর্তা—উঁচু কলার, কোমরে-ছুরি। দাড়িতে পাক ধরেছে লোকটার। নেশা তার বেশ ভালোই ধরেছে। বেঞ্চের ওপর বসে-বসে ঝিমোচ্ছে। থেকে-থেকে আচমকা অর্ধজাগ্রত অবস্থায় তুড়ি মারছে, বেঞ্চি থেকে না উঠেই দু হাত দুদিকে ছুঁড়ে দেহের ঊর্ধ্বাংশ কাঁপিয়ে দুলিয়ে বেশ কষ্ট করে গানের কথা মনে করতে-করতে সে ধরল আবোল-তাবোল একটা গান—কথাগুলো অনেকটা এইরকম :

সারাটা বছর করেছি সোহাগ বধুয়ারে,
সা-রা-টা বছর ক-রে-ছি সোহাগ ব-ধু-য়া-রে...

খানিকক্ষণ ঝিম মেরে থেকে আচমকা জেগে উঠে ফের ধরল :

যেতে যেতে পথে এ কি
পুরানো নাগরী দেখি...

কিন্তু লোকটার সুখের ভাগীদার ওখানে কেউ ছিল না। তার নীরব সঙ্গীটিকে দেখে মনে হচ্ছিল এ সব আকস্মিক বিস্ফোরণকে প্রতিকূল ও সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে। এখানে আরও একজন লোককে দেখা যাচ্ছে—হাবভাবে মনে হয় কোন সরকারি অফিসের অবসরপ্রাপ্ত কেরানি। লোকটা বসে আছে সকলের চেয়ে আলাদা হয়ে, সামনে রাখা পানপাত্র থেকে একটু একটু করে চুমুক দিচ্ছে, চারপাশে তাকাচ্ছে। দেখে মনে হয় এ লোকটিও একটু উত্তেজিত।

দুই

ভিড়ে অভ্যস্ত নয় রাস্‌কোলনিকভ্। তাছাড়া আগেও বলা হয়েছে যে লোকজনের সঙ্গ সে এড়িয়ে চলছে—বিশেষত হালে। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে হঠাৎ কেন যেন লোকজন সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠল। তার ভেতরে যেন নতুন একটা কিছু ঘটতে চলেছে। সেই সঙ্গে সে অনুভব করল মানুষের সঙ্গে মেলামেশার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা। হতাশার উত্তেজনা আর নিজের দুঃখকষ্টের প্রতি একাগ্র মনোযোগের ফলে

গত এক মাসে সে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে অন্তত এক মিনিটের জন্য হলেও তার ইচ্ছে হচ্ছিল অন্য কোন জগতের আলোবাতাসে নিঃশ্বাস নেয়—তা সে যে জগৎই হোক না কেন। তাই এত নোংরা পরিবেশ সত্ত্বেও এখন এই শুঁড়িখানায় তার বেশ লাগছিল।

দোকানের মালিক ছিল অন্য ঘরে, তবে ঘন ঘন এসে ঢুকছিল বড় ঘরটাতে। সে নেমে আসছিল ওপরের কোন একটা জায়গা থেকে ধাপ বেয়ে—নামার সময় প্রথমে চোখে পড়ছিল তার পায়ের ঝকঝকে পালিশ করা হাইবুট আর বুটের ওপর দিককার চওড়া লাল পটি। তার গায়ে আঁটসাঁট লম্বা আচকান, ওপরে কালো মখমলের হাতকাটা খাটো কোর্তা—বিশ্রী রকমের তেলচিটে। নেকটাইয়ের কোন বালাই নেই। গোটা মুখটা তেল চকচকে—ঠিক যেন একটা লোহার তালা। বার-কাউন্টারে মোতায়েন ছিল একটা ছোকরা—বছর চৌদ্দ বয়স। এছাড়া ছিল আরও একটু কম বয়সের আরেকটা ছেলে —কোন খরিদ্দার কিছু চাইলে তাকে পরিবেশন করছিল। দোকানে খাবার বলতে আছে কাটা শসা, কালো টোস্ট বিস্কুট, মাছের কাটা টুকরো। ভীষণ বদগন্ধ ছাড়ছে সেসব খাবার থেকে। আবহাওয়া এমনই গুমোট যে বেশিক্ষণ বসে থাকা কঠিন। ঘরের সবকিছু মদের গন্ধে এমন ভরপুর যে মনে হয় ওই পরিবেশে পাঁচ মিনিট বসে থাকলে যে-কেউ মাতাল হয়ে যেতে পারে।

কখন-কখন সম্পূর্ণ অপরিচিত এমন সব মানুষের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যায় যে অনেকটা হঠাৎই, অপ্রত্যাশিতভাবে, প্রথম দর্শনে, কথা বলার আগেই তাদের সম্পর্কে আমরা আগ্রহ বোধ করতে থাকি। শুঁড়িখানার সেই যে খরিদ্দারটি বেশ খানিকটা দূরে বসে ছিল, যাকে দেখাচ্ছিল অবসরপ্রাপ্ত কেরানির মতো, সেও ঠিক সেরকম একটা ছাপ ফেলল রাস্‌কোল্‌নিকভের মনে। প্রথম সাক্ষাতের এই ছাপটি পরে বেশ কয়েকবার রাস্‌কোল্‌নিকভের মনে উদয় হয়েছিল, এমনকি এই সাক্ষাৎকে সে তার অদৃষ্টের পূর্বলক্ষণ বলেও মনে করে। রাস্‌কোলনিকভ্ বারবার লোকটার দিকে তাকাচ্ছিল, অবশ্য আরও এই কারণে যে লোকটা নিজেও একদৃষ্টে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিল তাকে— বোঝা যাচ্ছিল যুবকের সঙ্গে বাক্যালাপ শুরু করতে সে বেশ আগ্রহী। দোকানে আর যারা উপস্থিত ছিল—তাদের মধ্যে মালিকও বাদ যায় না—তাদের সকলের প্রতি লোকটার দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল রোজকার দেখা একটা অভ্যস্ত ভাব, এমনকি খানিকটা একঘেয়েমিজনিত বিরক্তি এবং সেই সঙ্গে দাম্ভিকতাপূর্ণ অবজ্ঞারও কিঞ্চিৎ আভাস। ভাবটা এই যে সমাজের নীচু স্তরের নিম্ন মানের এই লোকগুলোর সঙ্গে তার কোন কথা চলতে পারে না। বয়স পঞ্চাশোর্ধ্ব, মাঝারি, মজবুত গড়নের, চুলে পাক ধরেছে, মাথায় মস্ত টাক। অতিরিক্ত পানাভ্যাসের ফলে মুখের রং পাণ্ডুর, এমনকি সবজেটেই বলা যায়। চোখের পাতাগুলো ফুলো-ফুলো—তার আড়াল থেকে জ্বলজ্বল করছে ফাটলের মতো চিলতে খুদে-খুদে অথচ প্রাণবন্ত

লালচে একজোড়া চোখ। কিন্তু লোকটার মধ্যে খুবই অদ্ভুত একটা কিছু ছিল। এমন কি তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠছিল একটা দৃপ্ত মহিমা। তার সেই দৃষ্টিতে সম্ভবত চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির আভাসও ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে যেন ঝলক দিচ্ছিল উন্মত্ততা। গায়ে পুরানো, শতচ্ছিন্ন কালো ফ্রককোট— বোতামগুলো ছিঁড়ে গেছে। মাত্র একটা এখন ঝুলে আছে কোনমতে, সেটা দিয়েই কোটের বুকটা আটকান—সম্ভবত ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে। নানকিং ভেস্টের তলা থেকে বেরিয়ে আছে শার্টের সামনের দিকটা—একেবারে দোমড়ান, নোংরা, দাগধরা। দাড়িগোঁফ কামানো মুখ—সরকারি কর্মচারীদের ওটাই রীতি—সচরাচর দাড়িগোঁফ রাখে না। কিন্তু এ লোকটার দাড়িগোঁফ এত আগে কামান যে ইতিমধ্যে, নীলচে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি ঘন হয়ে বেরোতে শুরু করেছে। তাছাড়া তার হাবভাবেও বাস্তবিকই ছিল সরকারি আমলাসুলভ একটা গাম্ভীর্য। কিন্তু তাকে বিচলিত দেখাচ্ছে। সে মাথার চুলে হাত বুলাচ্ছে, থেকে থেকে ছিন্নভিন্ন হাতায় ঢাকা কুনইদুটো টেবিলে ঠেকিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে দু হাতে মাথা চেপে ধরছে। অবশেষে সরাসরি রাস্‌কোলনিকভের মুখের দিকে তাকিয়ে জোরে, জোর গলায় সে বলে উঠল:

"আপনার সঙ্গে একটু ভদ্র আলাপের সুযোগ পেতে পারি কি মাননীয় মহাশয়? যদিও দেখতে পাচ্ছি যে আপনার বেশভূষাও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, তবু আমি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে এটা উপলব্ধি করতে পারি যে আপনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি এবং মদ্যপানে অনভ্যস্ত। মানুষের অনুভূতিপ্রবণতার সঙ্গে যে শিক্ষার সংযোগ ঘটে আমি নিজে চিরকাল তারা মর্যাদা দিয়ে এসেছি। তাছাড়া আমি একজন সরকারি কর্মচারী। মার্মেলাদভ্—এই পদবিতে আমার পরিচয়। সরকারি অফিসের ছোট কেরানি। জানতে পারি কি, আপনি কোন্ সরকারি চাকুরিতে আছেন?"

"না, আমি পড়াশুনো করছি," যুবক উত্তর দিল। লোকটার কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে যে বিশেষ আড়ম্বর ছিল কতকটা সেই কারণে এবং যেভাবে সোজাসুজি, সরাসরি তাকে লক্ষ করে সে কথাগুলো বলল কতকটা সেই কারণেও সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এই কিছুক্ষণ আগেও লোকজনের সঙ্গে কোনরকম মেলামেশার একটা বাসনা ক্ষণিকের জন্য তার মনে জেগেছিল ঠিকই, তবু যে-কোন অপরিচিত মানুষ তার ব্যক্তিত্বের ওপর হানা দিলে অথবা হানা দেওয়ার ইচ্ছামাত্র প্রকাশ করলে তার প্রতি স্বাভাবিকভাবে যে অসন্তোষ, বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা সে উপলব্ধি করে থাকে তার উদ্দেশ্যে এই লোকটির নিক্ষিপ্ত প্রথম কথাতেও সেই প্রতিক্রিয়া ঘটল তার মনে।

"তার মানে ছাত্র, অথবা এই কিছুকাল আগেও ছাত্র ছিলেন, তাই তো?" লোকটা ওখান থেকে চেঁচিয়ে বলল। "আমিও তাই ভেবেছিলাম। অভিজ্ঞতা, মাননীয় মহাশয়, জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফল!" সদর্পে কপালে আঙুল ঠেকিয়ে ইশারা করার সঙ্গে-সঙ্গে সে বলল। "আপনি ছাত্র ছিলেন; অথবা জ্ঞানচর্চা করতেন। কিন্তু আপনি যদি অনুমতি করেন..." বলতে-বলতে উঠে দাঁড়িয়ে টলতে-টলতে নিজের বোতল

আর গেলাসটা হাতে নিয়ে যুবকের টেবিলের ধারে তার দিক থেকে খানিকটা কোনাকুনি বসে পড়ল। নেশা তার ধরেছে, কিন্তু কথা সে বলছিল স্বচ্ছন্দ, চটপট, যদিও কদাচিৎ জায়গায়-জায়গায় হোঁচট খাচ্ছিল, বলছিল সামান্য টেনে টেনে। মনে হচ্ছিল রাস্‌কোলনিকভের ওপর হানা দেওয়ার লোভ আর সে সামলাতে পারছিল না, যেন তারও পুরো একমাস কারও সঙ্গে বাক্যালাপের সুযোগ ঘটেনি।

প্রায় আনুষ্ঠানিক রীতিতে সে শুরু করল : "মাননীয় মহাশয়, সত্যি কথা বলতে গেলে কি, দারিদ্র্য কোন পাপ নয়। জানি এটা আরও সত্য যে মাতলামিও কোন কাজের কথা নয়। কিন্তু দৈন্য, বুঝলেন মাননীয় মহাশয়, দৈন্য একটা পাপ। দারিদ্র্যের মধ্যেও আপনি আপনার সহজাত উপলব্ধির মহত্ত্ব রক্ষা করতে পারেন, কিন্তু দৈন্যদশায় কেউ কখনও তা পারে না। দৈন্যের দায় এমনই যে তার ফলে লোকে শুধু লাঠিপেটা করে কেন, ঝেঁটিয়ে অপনাকে বিদায় করবে মানুষের সঙ্গ থেকে—সেটা আরও অপমানজনক। তবে ন্যায়সঙ্গতও, কেননা দৈন্যে আমি নিজেই প্রথম নিজেকে অপমান করার জন্য প্রস্তুত। আর তখন থেকেই পানদোষ! মাননীয় মহাশয়, এই এক মাস আগের ঘটনা—মিস্টার লেবেজিয়াত্‌নিকভ্‌ আমার সহধর্মিণীকে প্রহার করেন। আমার সহধর্মিণী—আমাকে যেমন দেখছেন আদৌ সে রকম নন। বুঝতে পারছেন আমি কী বলছি? যদি কিছু মনে না করেন, জিগ্‌গেস করি — নিছক কৌতূহলের খাতিরে— নেভা নদীতে খড়ের নৌকোয় রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা আপনার কখনও হয়েছে কি?"

"না তা হয়নি," রাসকোল্‌নিকভ্‌ স্বীকার করল। 'সেটা কী ব্যাপার?'

'তাহলে বলি, আমি আসছি সেখান থেকে—আজ পাঁচ রাত হল সেখানে আছি।"

লোকটা নিজের গেলাসে পানীয় ঢেলে পান করল, আবার কেমন যেন নিজের চিন্তায় ডুবে গেল। সত্যি-সত্যি তার জামাকাপড়ে, এমনকি চুলেও কোথাও কোথাও লেগে রয়েছে খড়কুটো। এটা খুবই সম্ভব যে পাঁচ দিনের মধ্যে সে জামাকাপড় বদল করেনি, হাতমুখও ধোয়নি। বিশেষত হাত তার নোংরা, তেলতেলে, লাল, হাতের নখগুলো কালো।

মনে হচ্ছিল তার কথাবার্তা উপস্থিত সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে—যদিও সেটা ছিল অলস কৌতূহল। বার কাউন্টারের ছেলেদুটো হি হি করে হাসতে শুরু করে দিয়েছে। দোকানের মালিক ওপরের ঘর থেকে নিচে নেমে এসেছে বোধহয় 'আজব লোকটার' কথাগুলো শোনার জন্য। আলস্যভরে অথচ গুরুগম্ভীর চালে হাই তুলতে তুলতে সামান্য দূরে এসে বসল। বোঝাই যাচ্ছে মার্মেলাদভ এখানে বহুকালের পরিচিত। আর জমকাল ভাষায় কথা বলার ঝোঁকটা সম্ভবত সে অর্জন করেছে শুঁড়িখানায় নানা জাতীয় অচেনা লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তায় অভ্যাসের ফলে। কোন কোন পানাসক্তের কাছে এই অভ্যাসটি অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে—বিশেষত সেই

শ্রেণীর পানাসক্তদের কাছে, বাড়িতে যাদের কড়া শাসনে এবং অন্যের আজ্ঞাধীন থাকতে হয়। এই কারণে মদের আড্ডায় তারা যে-কোনভাবেই হোক সবসময় নিজেদের আচরণের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করে এবং সম্ভব হলে শ্রদ্ধা উদ্রেকেরও।

"আজব লোক বটে!" দোকানের মালিক বাজখাঁই গলায় বলে উঠল। "কেরানিগিরিই যদি কর, তাহলে কাজে যাও না কেন? চাকরি কর না কেন?"

"চাকরি করি না কেন জিগ্‌গেস করছেন, মাননীয় মহাশয়?" লোকটার কথার খেই ধরে পালটা প্রশ্ন করলেও একান্তভাবে রাসকোল্‌নিকভ্‌কে লক্ষ করে মার্মেলাদভ বলল— যেন প্রশ্নটা রাস্‌কোলনিকভই তাকে করেছে। "চাকরি করি না কেন? আমি যে নিজের অক্ষমতার দরুন মাথা নিচু করে থাকি আপনি কি মনে করেন তাতে আমার বুকে ব্যথা লাগে না? এই এক মাস আগে মিস্টার লেবেজিয়াত্‌নিকভ যখন নিজের হাতে আমার সহধর্মিণীকে প্রহার করলেন, কিন্তু আমি মাতাল অবস্থায় পড়ে রইলাম, তখন কি আমি কষ্ট পাইনি? মাফ করবেন ইয়ং ম্যান, আপনাকে কি কখনও... হুম...মানে, কোন আশা নেই জেনেও টাকা ধার করতে যেতে হয়েছে কারও কাছে?"

"তা হয়েছিল..কিন্তু আশা নেই জেনে বলতে কী বোঝাচ্ছেন?"

"আমি বলতে চাই, আশা একেবারে নেই জেনে—এতে যে কোন লাভ নেই আগে থাকতে তা জানা সত্ত্বেও। এই ধরুন আপনি আগে থাকতে জানেন যে অমুক লোকটি, পরম কর্তব্যনিষ্ঠ ও পরম উপকারী নাগরিকটি আপনাকে কোন মতেই টাকা ধার দেবেন না। তাছাড়া দেবেনই বা কেন?—আমি জিগ্‌গেস করি। কেননা উনি বেশ ভালোভাবে জানেন ও টাকা তাকে আমি ফেরত দিতে যাচ্ছি না। তিনি কি তাহলে সমবেদনাবশত দেবেন? কিন্তু মিস্টার লেবেজিয়াত্‌নিকভ নতুন নতুন আইডিয়ার সন্ধান রাখেন—তিনি হালে ব্যাখ্যা করে বোঝালেন যে সমবেদনা নামে বস্তুটি একালে বিজ্ঞানেও নিষিদ্ধ, যেখানে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র প্রচলিত সেখানে, বিলাতেও এখন তাই। তাই বলি, উনি আমায় দেবেন কেন? তবু কিনা, উনি দেবেন না একথা আগে থাকতে জেনেও আপনি রওনা দিলেন এবং..."

"তাহলে আর যাওয়া কেন?" রাস্‌কোলনিকভ্‌ যোগ করল।

"কিন্তু ধরুন যদি আর কেউ না থাকে, যাবার মতো কোন জায়গা না থাকে! এটা তো ঠিক, যে-কোন লোকের অন্তত যাবার মতো একটা জায়গা থাকা চাই, যেহেতু মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন তার কোথাও না কোথাও না গেলে একেবারে চলে না! যখন আমার একমাত্র মেয়ে খাতায় নাম লিখিয়ে হলুদ টিকিট দিয়ে রোজগারে নামল তখন আমিও বেরিয়ে গেলাম... যেহেতু আমার মেয়ে ওই হলুদ টিকিটে রোজগার করে..." সামান্য অস্বস্তির সঙ্গে যুবকের দিকে তাকাতে

তাকাতে বন্ধনীর মধ্যে যোগ করার ভঙ্গিতে সে বলল। " সে যাক গে, মাননীয় মহাশয়, ও কিছু নয়!" কাউন্টারের ছোঁড়াদুটো ফিকফিক করে হাসছে এবং মালিকের মুখেও হাসি ফুটে উঠেছে দেখে তৎক্ষণাৎ বাইরে শান্তভাব বজায় রেখে তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল। "ও কিছু নয়! ওসব মাথা নাড়ানোতে মুষড়ে পড়ার পাত্র আমি নই, কেন না কারও কাছে কিছু গোপন নেই, কোন কিছুই চিরকাল গোপন থাকে না। তাই অবজ্ঞার দৃষ্টিতে নয়, বিনয়ের দৃষ্টিতেই দেখছি এটাকে। তাই হোক! তাই হোক! 'অহো মনুষ্য!' মাফ করবেন ইয়ং ম্যান, আপনি এই যে এখন, এই মুহূর্তে নিবিষ্টভাবে আমাকে অবলোকন করছেন, আপনি কি পারেন...না, না, বিষয়টিকে বরং আরও জোরাল আলঙ্কারিক ভাষায় প্রকাশ করি : *পারেন* বলব না, আপনি কি হলফ করে বলার *সাহস রাখেন* যে আমি একটা আস্ত শুয়োর নই?"

যুবক উত্তরে একটি কথাও বলল না।

"তাহলে," ঘরের মধ্যে আবার চাপা হাসি খেলে গেল দেখে তা যতক্ষণ থিতিয়ে না আসে ততক্ষণ অপেক্ষা করার পর গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে—এমনকি এবারে যেন আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হয়ে বক্তা বলল। "তাহলে হলামই না হয় আমি একটা শুয়োর, কিন্তু উনি তো একজন ভদ্রমহিলা! আমি একটা মূর্তিমান জানোয়ার, কিন্তু কাতেরিনা ইভানোভ্না, আমার সহধর্মিণী—উনি তো দস্তুরমতো শিক্ষিত, একজন ফিল্ড অফিসারের মেয়ে। না হয়, না হয় আমি একজন ইতর লোকই হলাম, কিন্তু ওঁর মনটা খুব বড়, শিক্ষার ফলে মার্জিত, সূক্ষ্ম অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। তবে হ্যাঁ...হায় রে, যদি উনি আমায় করুণা করতেন! মাননীয় মহাশয়, মাননীয় মহাশয়, যে কোন মানুষেরই অন্তত এরকম একটা ঠাঁই থাকা দরকার যেখানে তাকে করুণা করে! কিন্তু কাতেরিনা ইভানোভ্না মহীয়সী নারী হলেও ন্যায়বিচার তার স্বভাবে নেই। ...অবশ্য আমি নিজেও বুঝি, উনি যখন আমার চুলের মুঠো ধরে টানেন তখন অন্য কোন কারণে নয়, আন্তরিক করুণাবশতই টানেন, যেহেতু... দেখুন, এতটুকু অস্বস্তি প্রকাশ না করে আমি আবার বলছি, উনি আমার চুলের গোছা ধরে টানেন, ইয়ং ম্যান!" আবারও চাপা হাসির গুঞ্জন শুরু হতে তা শুনে আত্মমর্যাদা সম্পর্কে দ্বিগুণ সচেতন হয়ে পড়ল সে। জোর দিয়ে বলল, "কিন্তু হা ভগবান! উনি যদি অন্তত একবারও... কিন্তু না! না! তা হবার নয়! সব বৃথা! কিছু বলার নেই! বলার কিছু নেই! ...কেন না ইতিমধ্যে একাধিকবার আমার বাসনা পূর্ণ হয়েছে, একাধিকবার আমি করুণার স্পর্শও পেয়েছি, কিন্তু... আমার স্বভাবটাই এমন... আমি পশু হয়ে জন্মেছি!"

"তা আর বলতে!" হাই তুলতে-তুলতে মালিক মন্তব্য করল।

মার্মেলাদভ্ সজোরে টেবিলে ঘুষি মারল।

"আমার স্বভাবটাই এমন! আপনি কি জানেন, জানেন কি, মশাই গো, মশাই আমার, আমি ওঁর পায়ের মোজা পর্যন্ত বেচে মদের পেছনে উড়িয়ে দিয়েছি? জুতো

নয়, মহাশয়, ...আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। জুতো হলেও না হয় মোটামুটি বোঝা যেত। কিন্তু তা তো নয়, পায়ের মোজা, মোজাই বেচে উড়িয়ে দিলাম মদের পেছনে! ছাগলের ফিনফিনে লোমের যে দামি শালটা ওঁর ছিল, যেটা আমার নয়, ওঁর নিজের, বিয়ের আগে উপহার পেয়েছিলেন সেটাও বেচে মদ খেয়েছি। যে ডেরাটায় আমরা থাকি সেটা ঠাণ্ডা কনকনে। এই শীতে ওঁর ঠাণ্ডা লেগেছে। উনি সমানে কাশছেন, কাশির সঙ্গে রক্তও পড়ছে। বাচ্চাকাচ্চা আমাদের তিনটি। কাতেরিনা ইভানোভ্না দিনরাত খাটেন, মাজাঘষা, ধোওয়ামোছা আর ছেলেপুলেদের স্নান করিয়ে ধুইয়ে সাফসুতরো করে রাখার কাজে ব্যস্ত, কেননা ছোটবেলা থেকে উনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত। অথচ ওর বুকের দোষ আছে। রোগের প্রবণতা আছে—আমি সেটা উপলব্ধি করি। আমি কি আর উপলব্ধি করি না? যত বেশি মদ খাই তত বেশি করে উপলব্ধি করি। মদ খাই এই জন্যে যে এই পানের মধ্যে আমি সমবেদনা আর অনুভূতি খুঁজি। আমোদ-ফূর্তি নয়, একমাত্র যা খুঁজি তা হল দুঃখ!'' বলতে-বলতে টেবিলের ওপর ওর মাথা ঝুঁকে পড়ল— দেখে মনে হল ভেঙে পড়েছে।

''ইয়ং ম্যান'', আবার মাথা তুলে সে বলতে শুরু করল। ''আমি আপনার মুখে একটা দুঃখের ছায়া দেখতে পাচ্ছি। আপনি ঢোকামাত্র আমি লক্ষ করেছি। সেই কারণে সঙ্গে-সঙ্গে আপনাকে ডেকে কথা বলেছি। আমার জীবনকাহিনী আপনার কাছে প্রকাশ করার পেছনে আমার যে উদ্দেশ্য ছিল তা এই নয় যে নিজেকে এসব অলস অকর্মণ্য লোকের কাছে উপহাসের পাত্র করে তোলা। ওরা অমনিতেই সব জানে। আমি আসলে খুঁজছি একজন দরদী শিক্ষিত মানুষকে! আপনি এও জেনে রাখুন যে আমার সহধর্মিণী অভিজাত মহিলাদের এক প্রাদেশিক ইনস্টিটিউটে লেখাপড়া শিখেছেন। সেখান থেকে পাশ করার পর বিদায় সংবর্ধনার আসরে গভর্নর এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে শাল নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন, যার স্বীকৃতি হিসেবে সোনার মেডেল আর প্রশংসাপত্র পেয়েছিলেন। মেডেল...হুঁ... মেডেলটা বিক্রি হয়ে গেছে।...অনেক আগে বিক্রি হয়ে গেছে...হুম্...প্রশংসাপত্রটা অবশ্য এখনও ট্রাঙ্কে রাখা আছে—এই কিছুদিন আগেও আমাদের বাড়িউলিকে উনি দেখাচ্ছিলেন। যদিও বাড়িউলির সঙ্গে তাঁর খিটিমিটি লেগেই আছে, তবু কোন একজনের সামনে নিজেকে জাহির করার এবং তাকে নিজের বিগত সুখের দিনের কথা জানানোর বড় সাধ তাঁর হয়েছিল। এতে আমি নিন্দার কিছু দেখি না, না, নিন্দার কিছু দেখি না এতে। যেহেতু তাঁর কাছে অতীতের স্মৃতি হিসেবে রয়ে গেছে কেবল এটা। বাকি সব কোথায় উবে গেছে! হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভদ্রমহিলা বদমেজাজি, দেমাকি, অবাধ্য। ঘরের মেঝে তিনি নিজে ধোবেন, সামান্য কালো রুটি খেয়ে জীবনধারণেও তাঁর আপত্তি নেই, কিন্তু অপমান তিনি সইবেন না। এই কারণেই মিস্টার লেবেজিয়াত্নিকভের অভদ্র ব্যবহার তিনি সহ্য করতে পারলেন না, আর মিস্টার লেবেজিয়াত্নিকভ এর জন্য তাঁকে যখন প্রহার

করলেন তখন তিনি শয্যা নিলেন—প্রহারের কারণে ততটা নয়, যতটা মনে আঘাত লাগার দরুন। আমি যখন তাঁকে আমার ঘরনী করে নিই তখন তিনি ছিলেন বিধবা। তখনই তাঁর পিঠোপিঠি তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। প্রথম স্বামী ছিলেন পদাতিক বাহিনীর অফিসার। প্রেম করে বিয়ে। বাপের বাড়ি থেকে পালিয়ে যান তাঁর সঙ্গে। প্রচণ্ড ভালোবাসতেন স্বামীকে। কিন্তু ভদ্রলোক জুয়া ধরলেন, মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়লেন, শেষকালে মারাও গেলেন। শেষের দিকে বৌকে ধরে ঠেঙাতেন, যদিও মহিলা নিজেও কখনও ছেড়ে কথা কইতেন না— সে সম্পর্কে আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য, লিখিত সাক্ষ্যপ্রমাণও আছে—তবু আজও তাঁর মনে পড়ে যায় ভদ্রলোকের ছলছল চোখদুটি। আমার পক্ষে অস্বস্তিকর। কিন্তু আমি খুশি। আমি খুশি এই কারণে যে অন্তত কল্পনায় হলেও তিনি দেখতে পান যে অতীতে কোন এক সময়ে তিনি সুখী ছিলেন।... স্বামীর মৃত্যুর পর তিনটে ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে তাঁকে থাকতে হয় বহু দূরের এক জংলা এলাকায়। সেই সময় আমিও সেখানে ছিলাম। এমন একটা আশাভরসাহীন দৈন্যদশার মধ্যে তিনি দিনপাত করছিলেন যে আমার মতো যে-মানুষ বহু বিচিত্র দুঃসাহসিক ঘটনা চোখে দেখেছে তার পক্ষেও ওই অবস্থার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। আত্মীয়স্বজন সকলে তাঁকে পরিত্যাগ করে। তাছাড়া তিনি ছিলেন অহঙ্কারী, বড় বেশি অহঙ্কারী। ...আর ঠিক তক্ষুণি, মাননীয় মহাশয়, তখন আমি—আমিও বিপত্নীক, আমার প্রথম পক্ষের একটি মেয়ে আছে, তার বয়স তখন চৌদ্দ— বিয়ের প্রস্তাব দিলাম তাঁকে, কেন না ওঁর সে দুঃখ চোখে দেখা যায় না। অভাব যে তাঁকে কোন্ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল তা এই ঘটনা দিয়ে বিচার করতে পারেন যে অমন শিক্ষিত মার্জিত, অত বড় ঘরের মেয়ে হয়েও তিনি এককথায় আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেলেন। বাস্তবিকই রাজি হয়ে গেলেন। চোখের জল ফেলতে-ফেলতে, ফুঁপিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে, দুঃখে হতাশায় হাত কচলাতে-কচলাতে রাজি হয়ে গেলেন এই বিয়েতে। যাবার আর কোন জায়গাও ছিল না তাঁর। বুঝতে পারছেন, বুঝতে পারছেন কি মাননীয় মহাশয়, যখন আর কোথাও যাবার জায়গা না থাকে তার অর্থ কী হতে পারে। না, এ আপনার এখনও বোঝার ক্ষমতা হয়নি। ...পুরো একটি বছর আমি ভক্তিভরে সৎভাবে আমার কর্তব্য পালন করে গেলাম, স্পর্শই করলাম না এ বস্তু", ভোদকার সেই বোতলটায় আঙুলের টোকা মেরে সে বলল। "কেন না আমার অনুভূতি আছে। কিন্তু তাতেও তাঁর মন পেলাম না। ঠিক এই সময় চাকরিটা খোয়ালাম, তাও নিজের দোষে নয়— অফিসে কর্মী ছাঁটাই হচ্ছিল বলে। তখন আবার ধরলাম। এই বছর দেড়েক আগে হবে, বিস্তর ঘোরাঘুরি এবং বহু বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে কাটানোর পর আমরা অবশেষে এসে হাজির হলাম অসংখ্য ঐতিহাসিক ইমারত আর স্মৃতিচিহ্নে সাজান এই জমকাল মহানগরে। এখানে আমার কাজও জুটে গেল। ... যেমন জুটল তেমনি আবার হারালামও। বুঝতে পারছেন?

এবারে কিন্তু হারালাম নিজের দোষে কেননা বেরিয়ে পড়ল আমার আসল চেহারা।...এখন আমরা বাস করি একটা ঘরে, আমালিয়া ফিওদরভ্‌না লিপ্‌পেভেক্‌জেল আমাদের বাড়িউলি। কিন্তু কিসের ওপর আমরা আছি, কী দিয়ে পাওনা মেটাচ্ছি সে সম্পর্কে কোন ধারণা আমার নিজেরই নেই। আমরা ছাড়াও আরও অনেক মানুষই তো ওখানে আছে।...নরককুণ্ড আর কাকে বলে!...হুম্...হুঁ... এরই মধ্যে আবার আমার প্রথম পক্ষের মেয়েটাও বড় হয়ে উঠেছে। আর এই বাড়ার মুখে মেয়েটাকে তার সৎ মায়ের কাছ থেকে যে কত যাতনা সইতে হয়েছে সে কথা না হয় না-ই বললাম! কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার মনটা উদার অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকলে কী হবে তিনি বদমেজাজি, খিটখিটে স্বভাবের মহিলা, তাঁর মুখের কোন আগল নেই।...ঠিক বলছি! অবশ্য ও প্রসঙ্গ আবার মনে আনাই বা কেন? বুঝতেই পারছেন, সোফিয়া আমার কোন শিক্ষাদীক্ষা পায়নি। বছরচারেক আগে ভূগোল আর পৃথিবীর ইতিহাস নিয়ে ওর সঙ্গে বসার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ওই বিষয়গুলোতে আমার নিজের তেমন দখল নেই। তাছাড়া ভালো পাঠ্যবইও আমাদের হাতের কাছে ছিল না, যাও বা ছিল ...হুম। ... সে সব আর নেই, ও সব বই আর নেই। তাই ওখানেই সমস্ত পড়াশুনোর ইতি। পারস্যের সাইরাসে এসে আমাদের পাঠের সমাপ্তি। পরে পূর্ণবয়স্কতা অর্জনের পর সে রোমান্টিক বিষয়বস্তুর বেশ কয়েকটা বই পড়ে। আর এই কিছুদিন আগে মিস্টার লেবেজিয়াত্‌নিকভের কল্যাণে পড়ার সুযোগ পায় 'ফিজিওলজি'—জর্জ লিউসির লেখা— নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন বইটার নাম? পড়েছিল খুব আগ্রহ নিয়ে, এমনকি অংশবিশেষ আমাদের পড়েও শোনায়। সমস্ত শিক্ষা বলতে এই। এবারে মাননীয় মহাশয় আমার, নিজে প্রশ্ন রাখছি নিজের তরফ থেকে—ব্যক্তিগত প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় একটা গরিব অথচ সৎ চরিত্রের মেয়ে সৎভাবে পরিশ্রম করে অনেক অর্থ উপার্জন করতে পারে? ...দিনে পনেরো কোপেকও উপার্জন করতে পারবে না মহাশয়, যদি সে সৎ হয়, অথচ বিশেষ কোন প্রতিভা তার না থাকে। — আর থাকলেও তাকে খাটতে হবে উদয়াস্ত! তাও বলব কি। স্টেট কাউন্সিলার ইভান ইভানোভিচ ক্লোপ্‌স্টোক—নামটা হয়ত শুনে থাকবেন— হাফ ডজন হল্যান্ড শার্ট সেলাইয়ের টাকা তো আজ অবধি দিলেনই না বরং মেঝেতে পা ঠুকে দাবড়ানি দিয়ে অপমান করে ওকে তাড়িয়ে দিলেন, বিশ্রী গালিগালাজ দিলেন এই অজুহাতে যে শার্টের কলার মাপমতন হয়নি, তেরছা কাটা হয়েছে। এদিকে ঘরে বাচ্চারা অনাহারে আছে।... এদিকে কাতেরিনা ইভানোভনা কী করবেন বুঝতে না পেরে অসহায়ভাবে নিজের হাত নিজেই মোচড়াচ্ছেন, ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। তাঁর গালে ফুটে উঠেছে লাল চাকা চাকা দাগ— এই রোগে সচরাচর যেমন হয়ে থাকে। মেয়েটার ওপর ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন: 'কুঁড়ে কোথাকার! আমাদের এখানে আছিস, গিলছিস, দিব্যি আরাম করছিস!'— আরে বাবা, গেলার মতো কিছু

ঘরে থাকলে তো, যেখানে বাচ্চাগুলোই তিন দিন হল রুটির একটা কণা পর্যন্ত চোখে দেখেনি। আমি তখন শুয়ে ছিলাম... তা বলব আর কি!— শুয়ে ছিলাম মাতাল অবস্থায়। শুয়ে-শুয়ে শুনছি আমার সোনিয়া বলছে— সাত চড়ে রা কাড়ে না মেয়েটা, গলার স্বরও এত নিচু... মাথার চুল হালকা রঙের, রোগা, ছোট্ট মুখটা সবসময় ফেকাসে— শুনছি ও বলছে: 'কী করি তাহলে কাতেরিনা ইভানোভ্না? আমাকে কি তাহলে ওকাজে নামতে বলেন?' ওদিকে দারিয়া ফ্রান্ৎসোভ্না নামে এক ফন্দিবাজ কুটনী— বেশ কয়েকবার পুলিশের খপ্পরে পড়ায় পুলিশ মহলেও সুপরিচিত— বাড়িউলির মারফত ইতিমধ্যে বারতিনেক খোঁজখবর নিয়ে গেছে। কাতেরিনা ইভানোভ্না বিদ্রূপের হাসি হেসে জবাব দিলেন: 'নামলেই বা! অত যত্ন করে রেখে লাভটা কী? কি আমার মহামূল্যবান সম্পদ।' কিন্তু না, দুষবেন না, মাননীয় মহাশয়, দুষবেন না ওঁকে। সুস্থ মস্তিষ্কে ও কথা বলা হয়নি। উনি তখন ভীষণ উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, অসুস্থ। বাচ্চাগুলো না খেতে পেয়ে কাঁদছে। তাছাড়া কথাগুলো বলা হয়েছিল সঠিক অর্থে ততটা নয়, যতটা অপমান করার উদ্দেশ্যে।... কেন না, কাতেরিনা ইভানোভ্নার স্বভাবটাই ওরকম। ছেলেমেয়েরা কান্নাকাটি শুরু করলে— সে যদি খিদের দরুনও করে সঙ্গে-সঙ্গে তাদের ধরে পেটাতে শুরু করে দেবেন। তা আমি দেখলাম, পাঁচটার পর কোন একসময় হবে, সোনিয়া আমার উঠে দাঁড়াল, মাথায় ওড়না জড়াল, আংরাখাটা গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। ফিরে এলো আটটার পরে। এসে সোজা কাতেরিনা ইভানোভ্নার কাছে গিয়ে তিরিশটা রুবল তাঁর সামনে টেবিলের ওপর রাখল। একটি কথাও বলল না, চোখ তুলে তাকালও না একবার। তুলে নিল আমাদের বড় সবুজ শালটা— বাড়ির সকলের ব্যবহারের জন্যে ওরকম একটা শাল আমাদের আছে। শালে মাথা-মুখ সম্পূর্ণ ঢেকে দেয়ালের দিকে মুখ করে খাটে শুয়ে পড়ল। থেকে-থেকে কাঁপছিল শুধু ওর ছোট্ট কাঁধজোড়া আর শরীরটা।... কিন্তু আমি যেমনকার তেমন শুয়ে রইলাম। তখন আমি দেখেছি, ইয়ং ম্যান, আমি দেখেছি, এরপর কাতেরিনা ইভানোভ্না— তিনিও একটি কথাও না বলে— সোনিয়ার বিছানার কাছে এগিয়ে গেলেন, সারাটা সন্ধ্যা ওর পায়ের কাছে বসে রইলেন, ওর পায়ে চুমু খেতে লাগলেন, উঠতে আর চান না। তারপর দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ল এ ওকে জড়িয়ে ধরে... দুজনেই...হ্যাঁ, দুজনেই।... এদিকে আমি... আমি হতভাগা শুয়ে রইলাম মাতাল অবস্থায়।"

মার্মেলাদভ্ চুপ করে গেল, মনে হল তার গলা ভেঙে গেছে। তারপর আবার হঠাৎ করে চটপট খানিকটা পানীয় গেলাসে ঢেলে ঘোঁৎ করে গলায় ঢেলে দিল।

"তারপর থেকে কী হল বলি গো মশাই আমার..." অল্প সময়ের জন্য মৌন থাকার পর সে আবার শুরু করল।"তারপর থেকে, একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার ফলে এবং কিছু কুচুটে লোকজন যথাস্থানে খবরটি পৌঁছে দিতে তারই ভিত্তিতে আমার

কন্যা সোফিয়া সেমিওনভ্‌না—সোনিয়া, খাতায় পাকাপাকি নাম লিখিয়ে হলুদ টিকিট নিতে বাধ্য হল। এর পেছনে অবশ্য বিশেষ মদত আছে দারিয়া ফ্রান্‌ৎসোভ্‌নার, যেহেতু তার ধারণা হয়েছিল তাকে তার ন্যায্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, উপেক্ষা করা হয়েছে তাকে। যেহেতু হলুদ টিকিট নিয়েছে সেইহেতু সোনিয়া তারপর থেকে আর আমাদের সঙ্গে একত্রে বসবাসও করতে পারছে না। আমাদের বাড়িউলি আমালিয়া ফিওদরভ্‌নার এ ব্যাপারে ঘোরতর আপত্তি— অথচ এর আগে নিজে দারিয়া ফ্রান্‌ৎসোভ্‌নাকে মদত দিয়েছিলেন। আর তাছাড়া মিস্টার লেবেজিয়াত্‌নিকভ্‌...হুম্‌... আরে সোনিয়াকে নিয়েই তো কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার সঙ্গে তাঁর ওই কাণ্ডটা বাধল। প্রথম-প্রথম নিজে আমার খুকির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তখন হঠাৎ তাঁর আত্মসম্মানে লাগল: 'আমি একজন শিক্ষিত লোক হয়ে কী করে এরকম একটা মেয়ের সঙ্গে একই বাড়িতে বসবাস করতে পারি।' কিন্তু কাতেরিনা ইভানোভ্‌না ছেড়ে কথা কইবার পাত্রী নন— মেয়ের পক্ষ নিয়ে দাঁড়ালেন ... আর তাতে ঘটনাটা ঘটল। ... এখন খুকি আমাদের কাছে বেশির ভাগ আসে অন্ধকার নামার পর, কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার মনের ভার হালকা করে, সাধ্যমতো অর্থকড়ি দিয়ে তাকে সাহায্য করে।... থাকে সে দরজি কাপেরনাউমভের ফ্ল্যাটে— তার ওখানে ঘর ভাড়া নিয়েছে। কাপেরনাউমভ লোকটা খোঁড়া, তার জিভের আড়ষ্টতা আছে। গুচ্ছের লোকজন তার পরিবারে— তাদেরও সবার জিভ আড়ষ্ট। ওর বৌয়েরও।... একটা ঘরে থাকে সকলে, সোনিয়ারটা আলাদা— পার্টিশন দিয়ে ভাগ করা। ...হুম্‌— হ্যাঁ... ওরা গরিব, বেজায় গরিব, জিভ ওদের আড়ষ্ট... হ্যাঁ।... তা আমি তো সেদিন সকালে উঠলাম, উঠেই আমার শতচ্ছিন্ন জামাকাপড় গায়ে চড়ালাম, দুহাত আকাশের দিকে তুলে ভগবানের নাম করে রওনা দিলাম মহামান্য ইভান আফানাসিয়েভিচের কাছে। মহামান্য ইভান আফানাসিয়েভিচকে জানেন কি?... জানেন না? তাহলে একজন দেবতুল্য মানুষকে জানেন না। ইনি মোমের মত... ভগবানের হাতে গড়া মোমের পুতুল— অনায়াসে গলে যান।... কৃপাপরবশ হয়ে আগাগোড়া সব কথা শুনলেন। শোনার পর তাঁর চোখে জল এসে গেল। বললেন, 'দ্যাখো মার্মেলাদভ, একবার কিন্তু তুমি আমায় নিরাশ করেছ।... আমার ব্যক্তিগত দায়িত্বে আরও একবার তোমাকে নিচ্ছি,' ঠিক এই কথাটা বললেন, 'মনে রেখো। এখন যাও।' ওঁর পায়ের ধুলো চাটলাম— অবশ্য মনে-মনে— কেন না সত্যি কথা বলতে গেলে কি, একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী হয়ে, আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত রাষ্ট্রচিন্তার ধারক ও বাহক হয়ে তাঁর পক্ষে ওই কাজে অনুমতি দেওয়া সম্ভব ছিল না। বাড়ি ফিরে এলাম। আমি যেই ঘোষণা করলাম যে চাকরিতে আবার বহাল হয়েছি, মাইনেও পেতে যাচ্ছি, ওঃ ভগবান। ... যা হুলুস্থুল পড়ে গেল।..."

বলতে-বলতে মার্মেলাদভ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। তাই আবার থামল।

এই সময় হৈ চৈ করে রাস্তা থেকে ভেতরে এসে ঢুকল এক দঙ্গল মাতাল। এমনিতেই তারা তখন মত্ত। সদর দরজায় সামনে বেজে উঠল ভাড়া করা কলের বাজনার সুর আর বছর সাতেকের একটা বাচ্চার কচি গলায় জনপ্রিয় গান 'ছোট্ট আমার গাঁ'। সোরগোল পড়ে গেল। মালিক আর দুই ভৃত্য নতুন আগন্তুকদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নবাগতদের দিকে কোন মনোযোগ না দিয়ে মার্মেলাদভ আবার তার কাহিনী শুরু করল। সে সম্ভবত ইতিমধ্যে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু নেশা তাকে যত পেয়ে বসছিল ততই বেড়ে যাচ্ছিল তার কথা বলার ঝোঁক। সেদিনকার চাকুরিলাভের সাফল্যের কথা মনে হতে সে সজীব হয়ে উঠল, এমনকি তার চোখেমুখে ছড়িয়ে পড়ল উজ্জ্বল দীপ্তি। রাসকোল্‌নিকভ মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল।

"বুঝলেন মশাই, সেটা ঘটেছিল এই হপ্তাপাঁচেক আগে। হ্যাঁ, তাই। ওরা দুজনে- — কাতেরিনা ইভানোভ্‌না আর আমার খুকি সোনিয়া — সবে শুনতে পেল খবরটা। আর পায় কে ওদের। মনে হল আমি যেন স্বর্গরাজ্যে উঠে এসে বসবাস করছি। এর আগে পড়ে থাকতাম পশুর মতো, শুনতে হত খালি গালিগালাজ। কিন্তু এখন ঘরে সকলে পা টিপে-টিপে চলে, বাচ্চাদের চুপ করিয়ে দিয়ে বলে, 'শ্‌-শ্‌-শ্‌! তোদের বাপ অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেছেন, এখন জিরোচ্ছেন।' কাজে যাবার আগে কফি পাই, কফির সঙ্গে দুধের ক্রিম—গরম-গরম ক্রিম। খাঁটি ক্রিম আনতে শুরু করল... শুনছেন...খাঁটি ক্রিম! কোথা থেকে কে জানে ওরা কুড়িয়েবাড়িয়ে জোগাড় করে ফেলল আমার অফিসে যাবার উপযোগী ভদ্রগোছের ধড়াচুড়োর জন্যে এগারো রুবল পঞ্চাশ কোপেক। বুটজুতো, কোটের তলায় ব্যবহারের জন্য ক্যালিকো কাপড়ের শার্টফ্রন্ট, সরকারি আমলাদের দারুণ জমকাল উর্দি—সবগুলোই দিব্যি ভালো অবস্থায় — খুঁজেপেতে বের করেছে সাড়ে এগারোয়। প্রথম যে দিন কাজ সেরে বাড়ি ফিরি, দেখি কাতেরিনা ইভানোভ্‌না রেঁধে রেখেছেন দু'দুটো পদ—একটা সুপ, সস্‌ দেওয়া নুনে জারানো মাংস— যা এর আগে ধারণাই করা যেত না, ওঁর নিজের তো জামাকাপড় বলতে তেমন কিছু নেই... মানে জামাকাপড় ওঁর মোটে নেই। কিন্তু এখন এমন সাজগোজ করেছেন যে দেখে মনে হয় বুঝি কারও বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছেন। আহামরি কিছু নয়, কিন্তু তুচ্ছ অস্তিত্বহীন বস্তু থেকেও বানানোর ক্ষমতা রাখেন: সুন্দর চুলের সাজ, জামার কলারটি পরিপাটি, হাতায় কাফ লাগান— একেবার অন্য মানুষটি! বয়স কমে গেছে, রূপ খুলে গেছে। সোনিয়া, খুকি আমার সাহায্য করত শুধু টাকাপয়সা দিয়ে, নিজের কথা উঠলে বলত, 'আমার, এখন কিছু সময়ের জন্য তোমাদের এখানে ঘন-ঘন আসাটা ভালো দেখাবে না— আসতে পারি একমাত্র রাতের অন্ধকারে, যখন কেউ দেখতে পাবে না।' শুনলেন? কথাটা শুনলেন? একবার কাজের পর দুপুরে একটু গড়িয়ে নেবো বলে বাড়ি ফিরেছি... কী দেখলাম ধারণা করতে পারেন? কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার আর তর সইছিল না: এই এক সপ্তাহ

আগেও আমাদের বাড়িউলি আমালিয়া ফিওদরভ্‌নার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল ওঁর—এখন দেখি তাঁকেই আপ্যায়ন করছেন কফি দিয়ে। দু ঘণ্টা বসে-বসে সমানে গুজগুজ ফুসফুস: 'উনি এখন চাকরিতে বহাল হয়েছেন, মাইনে পাচ্ছেন। নিজে গিয়ে দেখা করেছিলেন মহামান্যের সঙ্গে। মহামান্য আর সবাইকে অপেক্ষা করতে বলে নিজে বেরিয়ে এসেছিলেন, সকলের সামনে ওকে হাতে ধরে অফিসঘরে নিয়ে গেলেন।' শুনলেন? শুনলেন একবার কথাটা? 'মহামান্য বললেন, মিস্টার মার্মেলাদভ, আপনি কর্মক্ষেত্রে যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তা অবশ্যই আমার মনে আছে এবং যদিও আপনি আপনার বুদ্ধিবিবেচনাহীন দুর্বলতাকে আঁকড়ে ধরে রইলেন, তবু এখন আপনি যখন কথা দিচ্ছেন, পরন্তু আপনাকে ছাড়া আমাদের কাজও যখন ভালো চলছে না...' শুনলেন? শুনলেন তো... 'তখন আমি আশা করছি...' তিনি বললেন... 'আপনি আপনার কথার মর্যাদা রাখবেন।' তাহলে আমি আপনাকে বলি, এসবই আমার সহধর্মিণীর স্রেফ বানানো কথা। কিন্তু এটা চপলতা নয়, নিছক বড়াই নয়। না, তা নয়। তিনি নিজে ও সমস্ত বিশ্বাস করেন, নিজের কল্পনায় নিজে মশগুল হয়ে থাকেন। ভগবানের দিব্যি। আমি কিন্তু ওঁকে দোষ দিই না, এর মধ্যে দোষের কিছু দেখি না।... ছয়দিন আগে আমি যখন আমার প্রথম মাইনের টাকা— তেইশ রুবল চল্লিশ কোপেক— পুরোটা বাড়ি নিয়ে এলাম, উনি আমাকে 'মিষ্টি আমার' বলে ডাকলেন। 'ওগো আমার মিষ্টিটি।' —বললেন কখন জানেন? যখন আমরা একা ছিলাম। অবশ্য মনে হতে পারে, কীই বা ছিরিছাঁদ আমার আছে? কী ধরনের দামি আমি? তবু আমার গালে চিমটি কেটে বললেন, 'ওগো আমার মিষ্টিটি।'

মার্মেলাদভ হাসল, হাসার চেষ্টা করতে গিয়ে হঠাৎ তার থুতনিটা কাঁপতে শুরু করল। যা হোক, শেষকালে সে নিজেকে সামলে নিল। এই শুঁড়িখানা, লোকটার চেহারায় উচ্ছৃঙ্খলতার চিহ্ন, খড়ের নৌকোয় পাঁচ রাত, এই মদের বোতল, সেই সঙ্গে স্ত্রী আর পরিবারের প্রতি তার ব্যাধিগ্রস্ত অনুরাগ তার শ্রোতাটিকে পদে-পদে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছিল। রাস্‌কোলনিকভ্‌ গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিল তার কথাগুলো, কিন্তু শুনতে-শুনতে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল এক পীড়াদায়ক অনুভূতি। এখানে আসার জন্য আফশোস হচ্ছিল তার।

"মাননীয় মহাশয়, মাননীয় মহাশয়!" ধাতস্থ হয়ে মার্মেলাদভ গলা চড়িয়ে বলল, "মশাই আমার, আর দশজনের মতো আপনার কাছেও এসব হাস্যকর মনে হতে পারে। আমার গার্হস্থ্য জীবনের এ সমস্ত অর্থহীন তুচ্ছ খুঁটিনাটির বিবরণ দিয়ে হয়ত আমি আপনার বিরক্তি উদ্রেক করছি মাত্র। কিন্তু আমার কাছে এগুলো মোটেই হাসির নয়,... কেননা এর সবটাই আমি উপলব্ধি করতে পারি।... আমার জীবনের স্বর্গীয় আনন্দের ওই দিনটা— সারা দিন ধরে, সারাটা সন্ধে আমি নিজেও স্বপ্নের ডানায়

ভাসতে-ভাসতে চলছিলাম। অর্থাৎ ভাবছিলাম, সব গুছিয়ে নেব, বাচ্চাগুলোর গায়ে জামাকাপড় উঠবে, আমার স্ত্রীর মনের শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারব, আর আমার একমাত্র মেয়েকে অবমাননার হাত থেকে উদ্ধার করে পরিবারের কোলে ফিরিয়ে আনতে পারব। আরও অনেক, অনেক স্বপ্ন ছিল। ... থাকাটা কি অন্যায় ছিল? আপনিই বলুন না। আপনি তো একজন সজ্জন ব্যক্তি..." মার্মেলাদভ হঠাৎ যেন শিউরে উঠল। মাথা তুলে শ্রোতার মুখের ওপর সরাসরি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, "কিন্তু ঠিক তার পরের দিন, এতসব স্বপ্ন দেখার পর— অর্থাৎ আজ থেকে ঠিক পাঁচদিন আগের ঘটনা— সন্ধ্যার দিকে, ধূর্ত ফন্দি খাটিয়ে, চোরের মতো রাতের অন্ধকারে কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার কাছ থেকে তাঁর ট্রাঙ্কের চাবি চুরি করলাম, আমার আনা মাইনের টাকার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল বের করে নিলাম— ঠিক কত ছিল মনে নেই — তারপর এখন আমাকে দেখুন, সব গেছে। আজ পাঁচদিন হল বাড়ির বাইরে। ওরা আমার খুঁজে বেড়াচ্ছে। চাকরিরও দফারফা। অফিসে যাবার জন্য যে উর্দিটা কেনা হয়েছিল সেটা পড়ে আছে এগিপিয়েতস্কি ব্রিজের কাছে এক শুঁড়িখানায়। তার বদলে পেয়েছি এই জামাকাপড়।...সব শেষ।"

মার্মেলাদভ্ কপাল চাপড়াল, দাঁতে দাঁত চাপল, চোখ বন্ধ করে জোরে কনুইয়ের ভর দিল টেবিলে। কিন্তু মিনিট খানেক বাদে ওর চোখের দৃষ্টি হঠাৎ পালটে গেল— কতকটা কৃত্রিম ধূর্ততা, কতকটা চেহারায় চেষ্টাকৃত ভাব ফুটিয়ে তুলে রাস্‌কোল্‌নিকভের দিকে তাকিয়ে সশব্দে হেসে উঠল, বলল:

"আজ গিয়েছিলাম সোনিয়ার কাছে, খোয়ারি ভাঙার জন্য টাকা চাইতে। হে- হে- হে!"

"দিল?" নবাগতদের মধ্যে কে একজন পাশ থেকে চেঁচিয়ে বলল। বলেই ফেটে পড়ল অট্টহাসিতে।

"এই যে আধ পাঁইটের বোতলটা দেখছেন এটা ওরই পয়সায় কেনা," আর কাউকে আমল না দিয়ে বিশেষভাবে রাস্‌কোলনিকভকে উদ্দেশ করে সে বলল। "তিরিশ কোপেক এনে দিল নিজে হাতে করে, ওর শেষ কপর্দক, আমার নিজের চোখে দেখা। কিছু বলল না, শুধু নীরবে তাকাল আমার দিকে।...ইহজগতের কথা বলছি না...বলছি ওখানকার কথা...যেখানে মানুষের জন্য বেদনা প্রকাশ করা হয়, চোখের জল ফেলা হয়—তাকে নিন্দা করা হয় না, তিরস্কার করা হয় না। কিন্তু যখন নিন্দা করা হয় না তিরস্কার করা হয় না সেটা আরও বেশি বেদনাদায়ক। বুঝলেন আরও বেশি বেদনাদায়ক। তিরিশ কোপেক, হ্যাঁ, তিরিশ কোপেক। কিন্তু এটা এখন যে ওরও দরকার। তাই না? আপনার কী মনে হয়? ওকে তো এখন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়। আর এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আবার বিশেষ ধরনের, এর জন্য টাকা লাগে। বুঝলেন কিনা? টাকা লাগে। ওকে নানারকম প্রসাধন সামগ্রীও কিনতে হয়—ওগুলো না হলে নয়।

ঘাগরাটা কলপ দেওয়া হওয়া চাই, জুতোজোড়াতেও থাকা চাই বেশ খানিকটা ঠাটঠমক, যাতে রাস্তার জলকাদা ডিঙিয়ে পার হওয়ার সময় পাদুটো চোখে পড়ে। এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যে কী তা বুঝতে পারছেন? বুঝতে পারছেন তো? অথচ আমি ওর জন্মদাতা বাপ হয়ে ওই তিরিশটা কোপেক কিনা হাতালাম খোয়ারি ভাঙার জন্যে। মদ গিলছি! মদ খেয়ে সব উড়িয়েই দিয়েছি! ...তাহলে বলুন, আমার মতন একজন মানুষকে কে করুণা করবে? অ্যাঁ? আমার জন্যে কি আপনার করুণা হয়? বলুন মশাই, করুণা হয় কি হয় না? বলুন, হয় কি হয় না? হে-হে-হে-হে!"

বোতল থেকে ঢালতে গিয়ে দেখল সেখানে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। বোতল খালি।

মালিক ততক্ষণে আবার ওদের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। মার্মেলাদভের কথার জবাবে সে চেঁচিয়ে বলল, "তোমাকে করুণা করার কী আছে বল তো?"

ঘরের মধ্যে হাসির ধুম পড়ে গেল। এমনকি একপশলা গালিগালাজও বর্ষিত হল। যারা মার্মেলাদভের বুকনি শুনছিল তারা এবং যারা শুনছিল না তারাও শুধুমাত্র এই প্রাক্তন সরকারি কর্মচারীটির মূর্তি আর তার হাবভাব দেখেই হাসল, গালাগাল করল।

"করুণা! আমাকে করুণা করার কী আছে?" দস্তুর মতো অনুপ্রাণিত হওয়ার ভাব করে এক হাত সামনে বাড়িয়ে মার্মেলাদভ উঠে দাঁড়াল, হঠাৎ এমনভাবে গর্জন করে উঠল যে মনে-হল এই কথাগুলোই বুঝি তার কাছে প্রত্যাশিত ছিল। "করুণা করার কী আছে?— এই কথা বলবেন তো? হ্যাঁ ঠিক, আমাকে করুণা করার কোন কারণ নেই! করুণা করা নয়, ক্রুশে চড়ান উচিত আমাকে! তা ক্রুশে বিঁধুন আমাকে, হে মহামান্য বিচারক, ক্রুশে বিদ্ধ করুন, কিন্তু ক্রুশবিদ্ধ করে করুণা করুন মানুষটিকে! তখন আমি স্বয়ং আসিব তোমার সমীপে ক্রুশবিদ্ধ হইতে, যেহেতু আনন্দ নহে, হর্ষ নহে, অশ্রুর নিমিত্ত আমি ব্যাকুল!...ওহে দোকানদার, তুমি কি ভাবছ তোমার এই আধ পাঁইটের বোতল আমাকে আনন্দ দিয়েছে? দুঃখ, দুঃখ আমি খুঁজেছি তার তলায়। দুঃখ আর চোখের জল, তার স্বাদ পেয়েছি, তাকে পেয়েছি। আমাদের করুণা করবেন তিনি, যিনি সকলকে করুণা করে থাকেন। সব বুঝতে পারেন। একমাত্র তিনি, তিনিই বিচারক। সে দিন তিনি আবির্ভূত হয়ে শুধোবেন : 'কোথায় রহিয়াছে সেই কন্যা যে তাহার ক্রোধান্ধ ও ক্ষয়রোগগ্রস্ত বিমাতার নিমিত্ত, অপরের শিশু সন্তানদিগের নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ করিয়াছে? কোথায় রহিয়াছে সেই কন্যা যে তাহার ইতর পানাসক্ত পার্থিব পিতার নৃশংসতায় আতঙ্কিত না হইয়া তাহাকে করুণা করিয়াছে?' তিনি বলবেন, 'আমার সন্নিকটে আইস। আমি ইতোমধ্যে তোমায় একবার মার্জনা করিয়াছি।...একবার ক্ষমা করিয়াছি— এবং তোমার কৃত পাপসকলও এই ক্ষণে মার্জনা করা হইল, যেহেতু তোমার হৃদয় অগাধ প্রেমে পরিপূর্ণ।...' তাই আমার সোনিয়াকে তিনি ক্ষমা করবেন,

আমি ঠিক জানি যে ক্ষমা করবেন।...এটা আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছি কিছু আগে, যখন আমি সোনিয়ার কাছে গিয়েছিলাম।...তিনি বিচার করবেন সকলের এবং ক্ষমা করবেন শিষ্ট ও দুষ্ট, পরম জ্ঞানী ও সাধারণ বুদ্ধির মানুষ—সকলকে। যখন সকলের বিচার শেষ করবেন তখন আমাদের ডাক পড়বে। বলবেন, 'আইস তোমরাও আইস! আইস তাহারা, যাহারা পানাসক্ত, যাহারা দুর্বল প্রকৃতির, যাহাদিগের আচরণ লজ্জাজনক!' তখন এগিয়ে যাব আমরা সকলে, লজ্জাশরমের বালাই না রেখে দাঁড়াব তাঁর সামনে। তিনি বলবেন, 'তোমরা শূকরবিশেষ। মূর্তিমান পশু, পশুর প্রতিমূর্তি, তথাপি আইস, তোমরাও আইস।' পরম জ্ঞানীগুণী ন্যায়বিচারকের দল তখন আর্তস্বরে বলে উঠবেন : 'হা ঈশ্বর! কিসের নিমিত্ত আপনি ইহাদিগকে গ্রহণ করিতেছেন?' তিনি বলবেন : 'গ্রহণ করিতেছি এই কারণে..., হে পরমজ্ঞানী...গ্রহণ করিতেছি এই কারণে... হে ন্যায়বিচারকবৃন্দ... যে ইহাদিগের কেহই নিজেকে ইহার যোগ্য বিবেচনা করে না।...' আমাদের দিকে তিনি তখন তাঁর হস্ত প্রসারণ করে দেবেন, আমরা লুটিয়ে পড়ব তাঁর পদতলে, ...অশ্রুপাত করব। ...সব বুঝতে পারব। তখন সব বুঝতে পারব আমরা।...বুঝতে পারবে সকলে...কাতেরিনা ইভানোভ্না...তিনিও পারবেন।... হে প্রভু, তোমার রাজ্য সমাগত!"

বলতে-বলতে শক্তি হারিয়ে ফেলে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে সে ধপ করে বসে পড়ল বেঞ্চিতে। কারও দিকে দৃকপাত করল না। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল স্থানকাল বিস্মৃত হয়ে, গভীর কোন ভাবনায় ডুবে গেছে। তার কথাগুলোর বেশ খানিকটা প্রভাব উপস্থিত সকলের ওপর পড়েছিল। তাই কিছুক্ষণের জন্য নেমে এলো নিস্তব্ধতা। কিন্তু অচিরেই আবার শোনা গেল আগের সেই হাসি, সেই গালিগালাজ।

"ভালো বিচার বটে!"

"গুচ্ছের মিথ্যে কথা!"

"কেরানিবাবু!"

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

"চলুন মহাশয়", মাথা তুলে রাস্কোল্নিকভকে উদ্দেশ্য করে আচমকা বলে উঠল মার্মেলাদভ। "আমায় পৌঁছে দিন। ... কোজেলের বাড়ি, উঠোনের দিকটায় ঢোকার রাস্তায়।...এবারে যেতে হয়...কাতেরিনা ইভানোভ্নার কাছে।..."

অনেক আগেই এখান থেকে উঠে পড়ার জন্য উশখুশ করছিল রাস্কোল্নিকভ্। লোকটাকে সাহায্য করার কথাও সে ভেবেছিল। দেখা গেল মার্মেলাদভের পা দুটো তার জবানের তুলনায় বেশি দুর্বল। যুবকের ওপর শরীরের ভার বড় বেশি ছেড়ে দিয়েছিল সে। দু-তিনশ পা দূরে তাদের গন্তব্যস্থল। বাড়ির যত কাছাকাছি এগিয়ে আসছিল বিব্রত ও সন্ত্রস্ত ভাব তত বেশি করে পেয়ে বসছিল মাতালটিকে।

"আমার এখন ভয় কাতেরিনা ইভানোভ্নাকে নয়," উত্তেজিত হয়ে বিড়বিড় করে

সে বলল। "ভয় এই কারণে নয় যে তিনি আমার মাথার চুল ধরে টানবেন। চুল... সে তো তুচ্ছ ব্যাপার। চুলের থোড়াই পরোয়া করি! আমি আপনাকে বলে রাখি। উনি যদি চুল ধরে টানেন সেটা বরং ভালো, আমি তাতে ভয় পাই না...আমি ভয় পাই...আমার ভয় ওঁর চোখকে...হ্যাঁ... চোখ। ...ওঁর গালের লাল চাকা-চাকা দাগ— তাতেও আমার ভয়...আরও ভয় ওঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে।...ওই রোগ যার আছে সে উত্তেজিত হয়ে পড়লে কীভাবে নিঃশ্বাস নেয় দেখেছ কখনও? আমার এছাড়াও ভয় বাচ্চাদের কান্না... কেননা সোনিয়া যদি ওদের ভরপেট না খাওয়াতে পারে তাহলে...আমি জানি না কী হবে! জানি না! মারের ভয় করি না।... জেনে রাখ গো মশাই, ওসব মারকে আমি ডরাই না, বরং উপভোগ করি, যেহেতু ও ছাড়া আমার চলে না। সেটা ভালো। মারুন, মেরে মনের ভার হালকা করুন। ...বরং ভালো। ...এই যে এসে গেছি।... কোজেলের বাড়ি। যার নামে বাড়ি সে লোকটা একটা কলের মিস্ত্রি, জাতে জার্মান, বড়লোক। ...নিয়ে চল হে।"

উঠোনের দিক থেকে ভেতরে ঢুকে ওরা চারতলায় উঠে গেল। সিঁড়ি যত ওপরে উঠে গেছে ততই বেশি অন্ধকার। রাত প্রায় এগারোটা। যদিও বছরের এই সময়টাতে সেন্ট পিটার্সবুর্গে সত্যিকার রাত নামে না। রাতের অন্ধকার ঘনায় না, তবু সিঁড়ির ওপরের দিকটাতে বড় বেশি অন্ধকার জমে ছিল।

সিঁড়ির শেষে, একেবারে ওপর তলায় ঝুলকালিমাখা ছোট্ট একটা দরজা। দরজাটা খোলাই ছিল। ক্ষয়ে আসা মোমবাতির ক্ষীণ আলোয় সিঁড়ির ওপরের ধাপের চাতাল থেকে চোখে পড়ে ঘরের ভেতরের দৃশ্য—চরম দুর্দশাগ্রস্ত, লম্বায় দশ পা মতন হবে ঘরটা। ঘরের সর্বত্র বিশৃঙ্খলার চিহ্ন+ঘরের সবকিছু বিশেষত, ছোটদের নানারকম ছেঁড়া জামাকাপড়—ইতস্তত ছড়ান। পেছনের কোনা বরাবর টাঙান রয়েছে টুটাফাটা একটা বিছানার চাদর। তার ওপাশে সম্ভবত শোবার খাট। ঠিক ঘর বলতে যেটুকু জায়গা, সেখানে মোটে দুটো চেয়ার, একেবারে ছিন্নভিন্ন অয়েলক্লথে মোড়া একটা সোফা। সোফার সামনে পাইন কাঠের একটা পুরানো রান্নার টেবিল—রঙের কোন বালাই নেই। টেবিলে ঢাকনা বলতেও কিছু নেই। টেবিলের এক প্রান্তে একটা লোহার বাতিদানে চর্বিমাখান মোমবাতির শেষ অংশ—জ্বলতে-জ্বলতে শেষ হওয়ার মুখে। দেখা যাচ্ছে, মার্মেলাদভরা যে কারও ঘরের একটা অংশে থাকে এমন নয়— পুরো একটা ঘর নিয়েই তাদের বসবাস, তবে ঘরটা আসলে যাতায়াতের একটা গলি। আরও পরে, যার কাছ থেকে সরাসরি ওরা ভাড়া নিয়েছে ওদের সেই বাড়িউলি আমালিয়া লিপ্‌পেভেখ্‌জেলের ফ্ল্যাট— ছোট-ছোট ঘরে বা প্রকোষ্ঠে ভাগ ভাগ করা— সেখানে প্রবেশের দরজাটা ভেজান। ভেতর থেকে ভেসে আসছে হৈ-হট্টগোল, চিৎকার, চেঁচামেচি, হাসির হররা খুব সম্ভব তাসের ও চা পানের আসর বসেছে। থেকে-থেকে বেরিয়ে আসছে রীতিমতো অশালীন কিছু-কিছু মন্তব্য।

কাতেরিনা ইভানোভ্‌নাকে দেখেই চিনতে পারল রাস্‌কোল্‌নিকভ। ভীষণ ক্ষয়ে যাওয়া চেহারা। বেশ লম্বা, ছিপছিপে পাতলা গড়নের। চুলের রং এখনও চমৎকার হালকা বাদামি। গালে সত্যি-সত্যি অতিরিক্ত লাল আভা, তার ওপর লাল চাকা-চাকা দাগ। মহিলা ছোট্ট ঘরটাতে সামনে পেছনে সমানে পায়চারি করে চলেছে দুহাত বুকে চেপে। ঠোঁট শুকনো, চড়চড় করছে। অসমান তালে দমকে-দমকে শ্বাসপ্রশ্বাস ওঠানামা করছে, জ্বরের তাপে জ্বলজ্বল করছে দুচোখ। কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, স্থির। অবশিষ্ট মোমবাতির নিভু-নিভু কাঁপা-কাঁপা আলোয় এই ক্ষয়রোগগ্রস্ত উত্তেজিত মুখে অসুস্থতার ভাব প্রকট করে তুলছে। রাস্‌কোল্‌নিকভের মনে হচ্ছিল মহিলার বয়স বছর তিরিশেক, মার্মেলাদভের সঙ্গে বাস্তবিকই তাকে মানায় না। ওরা কখন ঘরে ঢুকেছে সে টেরও পায়নি, তার নজরে পড়েনি। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে একটা ঘোরের মধ্যে আছে, তার চোখ কান দুই-ই বন্ধ। ঘরের আবহাওয়া গুমোট, তবু জানলা সে খোলেনি। সিঁড়ির দিক থেকে ভেসে আসছে দুর্গন্ধ, অথচ 'সেদিককার দরজাটা খোলা। ওপাশের সামান্য ভেজান দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরের ঘরগুলো থেকে গলগল করে ঢুকছে তামাকের ধোঁয়া, তাতে সে কাশছিল, কিন্তু দরজা বন্ধ করার কোন গরজ তার নেই। সবার ছোট মেয়েটি— বছর ছয়েক বয়স— ঘুমোচ্ছে মেঝেতে, কতকটা যেন বসে-বসে, কুণ্ডলী পাকিয়ে, সোফায় মাথা গুঁজে। বছরখানেকের বড় ছেলেটি ঘরের এক কোনায় ফুলে-ফুলে কাঁদছে। সম্ভবত এইমাত্র মার খেয়েছে। বড় মেয়েটি— বছর নয়েক হবে— লম্বাটে, কাঠির মতো পাতলা। তার গায়ে একটা ছেঁড়া হাতকাটা জামা— শতছিন্ন। খালি কাঁধের ওপর বিবর্ণ, জীর্ণদশাপ্রাপ্ত আঙরাখা— সম্ভবত দু-বছর আগে তার জন্য সেলাই করা হয়েছিল, কেননা এখন সেটা তার হাঁটু পর্যন্তও পৌঁছায় না। মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে ঘরের কোনায় তার ভাইটির পাশে, কাঠির মতো সরু-সরু লম্বা-লম্বা হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে। সম্ভবত ভাইকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, ফিসফিস করে কিছু বলছে, যথাসাধ্য চেষ্টা করছে তাকে সামলে রাখার, যাতে আবার ডুকরে কেঁদে না ওঠে। সেইসঙ্গে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে বিশাল-বিশাল কালো দুচোখ বিস্ফারিত করে লক্ষ করছে তার মার গতিবিধি। মেয়েটির চোখজোড়া তার বিশীর্ণ ভীতিগ্রস্ত ছোট্ট মুখটার তুলনায় রীতিমতো বড় দেখাচ্ছে। মার্মেলাদভ্ নিজে ঘরের একেবারে ভেতরে না ঢুকে রাস্‌কোলনিকভ্‌কে সামনে ঠেলে দিয়ে দরজার সামনে নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে একজন অজানা-অচেনা মানুষ দেখতে পেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে থমকে দাঁড়াল মহিলা। মুহূর্তের জন্য যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে মনে-মনে ভাবতে লাগল লোকটা এখানে কী মতলবে ঢুকল? তবে নিশ্চয়ই সঙ্গে-সঙ্গে তার এও মনে হয়েছিল যে আগন্তুকের গন্তব্যস্থল দূরের অন্য কোন ঘর, যেহেতু তাদের নিজেদের ঘরটা আসলে যাতায়াতের একটা গলি। একথা মনে হতে লোকটার দিকে আর মনোযোগ না দিয়ে বাইরের সিঁড়ির

দরজাটা ভেজিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে সেদিকে এগিয়ে গেল। তারপরই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ঠিক দোরগোড়ায় স্বামী রত্নটিকে নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

"বটে!" রাগে অন্ধ হয়ে সে হাউমাউ করে উঠল। "ফিরে এসেছ তাহলে। জেলঘুঘু! শয়তান! টাকা কোথায়, শুনি? পকেটে কী আছে দেখা! পোশাকটাও নেই দেখছি। কোথায় গেল ওটা? টাকা কোথায়? বল!..."

বলতে-বলতে মহিলা সামনে ধেয়ে গেল মার্মেলাদভের পকেট তল্লাশির উদ্দেশ্যে। মার্মেলাদভ্ তল্লাশির কাজটা সহজতর করার জন্য বাধ্য ছেলের মতো বিনীতভাবে দুটো হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিল। একটা কোপেকও পাওয়া গেল না।

"কোথায় গেল টাকা?" মহিলা চেঁচাতে লাগল। "হায় হায়। সবই কি তাহলে মদ খেয়ে উড়িয়ে দিয়েছে? বারো রুবল ছিল যে ট্রাঙ্কে।...রাগে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে মার্মেলাদভ্‌কে টেনে নিয়ে এলো ঘরের ভেতরে। মার্মেলাদভ্ নিজেই অবশ্য সহজ্যসাধ্য করে দিল তার স্ত্রীর প্রয়াস—নতজানু অবস্থায় হেঁচড়ে-হেঁচড়ে তাকে অনুসরণ করল।

"আহা আনন্দ, আনন্দ। বেদনা না, আ-ন-ন্দ পাচ্ছি মাননীয় মহাশয়!" মাথায় ঝাঁকুনি খেয়ে আর্তনাদ করতে-করতে সে বলে উঠল। এমনকি একবার তো মেঝেতে তার কপালই ঠুকে গেল। যে বাচ্চা ছেলেটা মেঝেতে ঘুমোচ্ছিল ঘুম ভেঙে যেতে সে কাঁদতে শুরু করে দিল। কোনার ছেলেটা এ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে থরথর করে কাঁপতে লাগল, ভীষণ ভয় পেয়ে মৃগী রোগীর মতো হাত-পা ছুঁড়ে বিকট চিৎকার করতে-করতে ছুটে গেল বোনটির কাছে। বড় মেয়েটির যেন চমক ভাঙল, বাঁশপাতার মতো কাঁপতে লাগল সে।

যুবক বিনা বাক্যব্যয়ে স্থান পরিত্যাগের উদ্যোগ করল। এমন সময় ভেতরের একটা ঘরের দরজা দড়াম করে খুলে গেল, সেখান থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল বেশ কিছু কৌতূহলী মুখ। নির্লজ্জের মতো মুখ বাড়িয়ে দিয়ে হাসতে লাগল লোকগুলো। — তাদের কারও মুখে সিগারেট, কারও মুখে পাইপ, কারও বা মাথায় চাঁদি টুপি। এমন সব মূর্তিরও আবির্ভাব ঘটল যাদের গায়ে ড্রেসিং গাউন, তাও সামনের দিকটা খোলা— গরমকালের আটপৌরে পোশাক— আদৌ শালীন বলা চলে না। কারও কারও হাতে তাস। তারা বিশেষভাবে উপভোগ করছিল দৃশ্যটি, চুল ধরে টেনে আনার সময় মার্মেলাদভ যখন কাতর স্বরে বলছিল যে সে আনন্দ পাচ্ছে তখন প্রাণভরে হাসছিল। এমন কি তারা এক-পা দু-পা করে ঘরের ভেতরেও ঢুকতে শুরু করে দিয়েছে। অবশেষে শোনা গেল গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো একটা বিকট চিল চিৎকার: সকলকে ঠেলে সামনে এগিয়ে আসছে বাড়িউলি আমালিয়া লিপ্‌পেভেক্‌জেল। তার উদ্দেশ্য— নিজের মতো করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং কালই ঘর খালি করে দিতে হবে এই বলে অন্তত একশবার অশ্রাব্য ভাষায় হুকুম

জারি করে ভাড়াটিয়া বেচারিকে ভয় দেখানো। সরে পড়ার সময় রাস্‌কোল্‌নিকভ কোনমতে তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ে বের করল কিছু তামার পয়সা। শুঁড়িখানায় রুবলটা ভাঙিয়ে খরচ করার পর যে ক'টা খুচরো পয়সা পেয়েছিল তারই খানিকটা সকলের অলক্ষ্যে জানলার ধারে সেগুলো রেখে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে সে তরতর করে নিচে নামতে লাগল। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতেই সে আবার মত পালটে ফেলল, ভাবল ফিরে যায়।

"এ কি যা তা কাণ্ড করে বসলাম!" সে মনে-মনে ভাবল। 'ওদের সোনিয়া আছে, কিন্তু আমার তো নিজেরই দরকার। কিন্তু না, ফেরত নেওয়া অসম্ভব। এমনিতে অবশ্য ফেরত নেওয়া সম্ভবও নয়— মনে-মনে এই বিবেচনা করে চিন্তাটা বাতিল করে দিয়ে সে বাড়ির পথ ধরল। 'সোনিয়ার আবার প্রসাধন সামগ্রীও দরকার', রাস্তায় পা ফেলতে-ফেলতে একথা মনে হতে তার মুখে ফুটে উঠল বিদ্রূপের হাসি। 'এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য টাকা লাগে... হুম কিন্তু সোনিয়া নিজেও তো আজ ফতুর হয়ে যেতে পারে, যেহেতু ওর ঝুঁকি অনেকটা বড় শিকারের পেছনে ধাওয়া করার মতো... কিংবা সোনার খনির সন্ধানে ঘোরার মতো।... সেক্ষেত্রে আমার পয়সাগুলো না পেলে কাল ওদের পেটে কিল মেরে পড়ে থাকতে হত... বাহবা সোনিয়া! ভালো পন্থা বের করেছে দেখছি ওরা! কাজেও লাগাচ্ছে তোমাকে! নির্দ্বিধায় কাজে লাগাচ্ছে। ধাতস্থ হয়ে গেছে। একটু-আধটু কাঁদল তারপর ধাতস্থ হয়ে গেল। সবেতেই ধাতস্থ হয়ে যায় মানুষ নামে ইতর প্রাণীটি।'

চিন্তায় পড়ে গেল রাস্‌কোলনিকভ্।

"কিন্তু আমার চিন্তা যদি মিথ্যা হয়ে থাকে!" আচমকা আপনা-আপনি বেরিয়ে এলো তার মুখ থেকে। "মানুষ যদি সত্যি-সত্যি ইতর *প্রাণী* না হয়ে থাকে— অর্থাৎ কিনা সাধারণভাবে, সামগ্রিকভাবে মানবজাতি যদি তা না হয়ে থাকে, তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে বাদবাকি যা থাকছে ...সব... নেহাত সংস্কার... কেবল মনগড়া ভয়। বাধাবন্ধন বলে কিছু নেই— তাই এমনটাই হওয়া উচিত।..."

তিন

রাতে তার ভালো ঘুম হয়নি। পরদিন ঘুম ভাঙল বেশ বেলায়। কিন্তু ঘুম থেকে ওঠার পরও জুতসই লাগছিল না। মেজাজ রুক্ষ তিরিক্ষি, ক্রুদ্ধ। বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে নিজের কুঠুরিটার ওপর সে আগাগোড়া একবার চোখ বুলিয়ে নিল। ছোট্ট একটা খাঁচা, দৈর্ঘ্যে ছয় পা মতন হবে, চরম দুর্দশাগ্রস্ত। দেয়ালে ধূলিধূসরিত, হলদেটে বিবর্ণ ওয়ালপেপার সাঁটা, এখানে-ওখানে যত্রতত্র উঠে আসছে দেয়াল থেকে। ছাদ এত নিচু যে কেউ মাথায় একটু লম্বা হলেই তার পক্ষে ভয়ঙ্কর মনে হবে এই ঘরে, সারাক্ষণ মনে হবে এই বুঝি ছাদে মাথা ঠুকে যাবে। আবাসেরই উপযোগী আসবাবপত্র

—তিনটি পুরোনো চেয়ার, অবস্থা তেমন চলনসই নয়, ঘরের কোনায় একটা রংকরা টেবিল, তার ওপর খানকয়েক বই আর খাতা— ওপরে এত পুরু হয়ে ধুলো জমেছে যে একমাত্র তাতেই বুঝতে বাকি থাকে না যে বহুকাল হল সেগুলোতে কারও হাতের ছোঁয়া লাগেনি। এছাড়া আছে একটা বেঢপ ধরনের বিশাল সোফা — প্রায় সমস্ত দেয়াল আর গোটা ঘরের অর্ধেক জুড়ে। কোনও এককালে ছিটকাপড়ে মোড়া ছিল, কিন্তু এখন শতচ্ছিন্ন। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ওটাকে তার বিছানা হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। অনেক সময় সে বাইরে থেকে ঘরে এসে যেমন ছিল তেমনি জামাকাপড় না ছেড়ে, কোন চাদর না পেতে, ছাত্রজীবনের পুরানো জীর্ণ ওভারকোটে গা ঢেকে এবং একটা ছোট্ট বালিশ মাথায় দিয়ে ওই সোফাতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। মাথার দিকটা একটু উঁচু করার জন্য বালিশের নিচে সে রাখত তার যাবতীয় কাপড়চোপড়— পরিষ্কার ও নোংরা—দুইই। সোফার সামনে একটা ছোট্ট টেবিল।

এর চেয়ে দীন-হীন, এর চেয়ে নোংরা ও বিশৃঙ্খল পরিবেশ কল্পনায় আনা কঠিন। কিন্তু রাস্‌কোল্‌নিকভের মনের এখন যা অবস্থা তাতে এ পরিবেশ তার বেশ ভালোই লাগছিল। সে নিজেকে সকলের কাছ থেকে একেবারে সরিয়ে নিয়েছে। কচ্ছপের মতো নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে নিজের খোলের ভেতরে। এমনকি তার ঘরের কাজ করার জন্য যে ঠিকে ঝিটিকে রাখা হয়েছিল সে যখন মাঝেমধ্যে ঘরে এসে ঢুকত, তখন তার মুখ দেখেও মন-মেজাজ বিগড়ে যেত রাস্‌কোল্‌নিকভের। সে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠত। নির্দিষ্ট কোন একটা বিষয়ে বড় বেশি মাত্রায় নিবিষ্ট কোন-কোন মানসিক রোগীর ক্ষেত্রে এরকম হয়ে থাকে। আজ দু-সপ্তাহ হল তার বাড়িউলি তাকে খাবার পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে। খাবার ছাড়া বসে থাকা সত্ত্বেও খাবার না পাবার জন্য মহিলার কাছে গিয়ে যে কৈফিয়ত দাবি করবে এখন পর্যন্ত এ চিন্তা তার মাথায় আসেনি। বাড়িউলির একমাত্র চাকরানি এবং রাঁধুনি নাস্তাসিয়া ভাড়াটের এরকম মনোভাবে খানিকটা খুশিই— এখন আর সে একেবারেই তার ঘর ধোয়া-মোছা করতে আসে না কেবল মাঝে-মাঝে সপ্তাহে একবার অনিচ্ছাভরে ঝাঁটা হাতে নেয়। এখন সে আসাতে রাস্‌কোল্‌নিকভের ঘুম ভেঙে গেল।

"উঠে পড়। ঘুমোচ্ছ যে বড়!" রাস্‌কোলনিকভের মাথার ওপর ঝুঁকে পড়ে সে হাঁক ছাড়ল। "ন'টা বেজে গেছে! চা নিয়ে এসেছি গো তোমার জন্যে। চা খাবে তো? না খেয়ে শুঁটকি মেরে আছ মনে হচ্ছে?"

চমকে উঠে চোখ খুলল ভাড়াটে রাস্‌কোলনিকভ্। চিনতে পারল নাস্তাসিয়াকে।

"বাড়িউলি পাঠিয়েছে বুঝি চা?" ধীরে-ধীরে সে উঠে বসল। ওকে তখন দেখে মনে হচ্ছে অসুস্থ।

"বাড়িউলি?— তাহলেই হয়েছে!"

রাস্‌কোলনিকভের সামনে নাস্তাসিয়া নামিয়ে রাখল তার নিজের ফাটা কেটলিটা।

কেটলিতে খানিকটা জলো চা। সেইসঙ্গে হলদেটে চিনির দুটো ডেলাও রাখল।

"এই যে নাস্তাসিয়া এটা ধর দেখি," পকেট হাতড়ে-হাতড়ে (জামাকাপড় না ছেড়েই সে শুয়ে পড়েছিল) একমুঠো খুচরো বের করে সে বলল, "এক ছুটে দোকানে গিয়ে আমার জন্য একটুকরো রুটি কিনে আন। আর হ্যাঁ, মাংসের দোকানে গিয়ে একটু সস্তা দেখে খানিকটা সসেজও নিয়ে এসো।"

"রুটি আমি তোমায় এক্ষুনি এনে দিচ্ছি। কিন্তু সসেজের বদলে বাঁধাকপির ঝোল হলে চলবে না? গতকালের রান্না। রান্নাটা ভালোই হয়েছিল। গতকাল তোমার জন্যে রেখে দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি এলে দেরি করে। ভালো, সত্যিই ভালো, বলছি।"

বাঁধাকপির ঝোল আসার পর রাস্‌কোলনিকভ্ যখন খাবার দিকে মনোযোগ দিল তখন নাস্তাসিয়া সোফায় তার পাশে এসে বসল। শুরু হয়ে গেল ওর বকবকানি। নাস্তাসিয়া পুরাদস্তুর গাঁয়ের মেয়ে, বকবক করতে খুব ভালোবাসে।

বাড়িউলি প্রাস্‌কোভিয়া পাভ্‌লোভ্‌না তো তোমার নামে পুলিসে নালিশ করতে চায়," সে বলল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ রেগেমেগে ভুরু কোঁচকাল।

"পুলিসে? কেন? কী চাই ওর?"

"ভাড়া দিচ্ছ না ঘরও ছাড়ছ না। কী চাই, বুঝতেই তো পারছ।"

"বোঝ কাণ্ড! ওটাই বাকি ছিল আর কি!" দাঁত দাঁত ঘষতে-ঘষতে বিড়বিড় করে সে বলল।" "নাঃ এটা এখন আমার পক্ষে... গতিক সুবিধার নয় ।... আচ্ছা বোকা মহিলা তো।" গলা চড়িয়ে সে যোগ করল। "আমি আজই ওর কাছে যাব। কথা বলতে হবে ওর সঙ্গে।"

"মানলুম না হয় বোকা— আমার মতোই হদ্দ বোকা। কিন্তু তুমি বাপু অমন চালাক-চতুর হয়ে ঘরের কোনায় বস্তাব মতো পড়ে থাক কী বলে? তোমাকে কিছু করতে দেখি না কেন? আগে নাকি ছেলেমেয়েদের পড়াতে যেতে, কিন্তু এখন কিছুই কর না— কেন?"

"করি..." অপ্রস্তুতভাবে রাস্‌কোল্‌নিকভ বলল— যদিও কথা বলার ইচ্ছে ওর· ছিল না।

"কী কর?"

"কাজ করি।..."

"কী কাজ?"

"আমি ভাবি," একটু চুপ করে থেকে গম্ভীরভাবে উত্তর দিল সে।

হাসতে-হাসতে গড়িয়ে পড়ার দশা নাস্তাসিয়ার। কথায় কথায় হাসা তার স্বভাব আর হাসির কথা হলে সে হাসতে থাকে নিঃশব্দে, ফুলে-ফুলে দমকে-দমকে। কাঁপতে থাকে তার সর্বাঙ্গ। শেষকালে যখন নিজেরই বিরক্তি এসে যায় হাসিতে, একমাত্র

তখনই সে থামে।

"তা টাকাকড়ি কি অনেক বার করেছ অত ভেবে?" দম ফেলার পর অনেক কষ্টে সে বলল।

"পায়ে জুতো নেই তো ছেলেমেয়েদের পড়াতে যাব কী করে? অবশ্য পড়াতে বয়েই গেছে আমার।"

"বয়ে গেছে বললেই হল? ওটাই তো তোমার রুজি-রোজগার।"

"বাচ্চাদের পড়িয়ে কানাকড়িও মেলে না। অত কম পয়সায় কী করে চলে বল তো?" অনিচ্ছাভরে সে বলে যেতে লাগল কথাগুলো। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যেন নিজের ভাবনাচিন্তার জবাব সে নিজেই দিচ্ছে।

"তাহলে কি চাও গাছে না উঠতেই এক কাঁদি?"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে।

"হ্যাঁ তা-ই," একটু চুপ থেকে কঠিন স্বরে সে জবাব দিল।

"না বাপু, একটু-একটু করেই চেষ্টা কর— তুমি কিন্তু আমায় ভয় পাইয়ে দিচ্ছ, জোর ভয় পাইয়ে দিচ্ছ। রুটি আনতে যাব কি তাহলে?"

" সে তোমার যা ইচ্ছে।"

"ও হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম! গতকাল তোমার নামে একটা চিঠি এসেছে, তুমি তখন বাড়ি ছিলে না।"

"চিঠি! আমার! কার কাছ থেকে?"

"কার কাছ থেকে, জানি নে। পিওনকে তিন কোপেক দিতে হয়েছে নিজের গ্যাঁট থেকে। সেটা শুধবে তো।"

"নিয়ে এসো ভগবানের দোহাই, এক্ষুনি নিয়ে এসো!" নিদারুণ উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল রাস্‌কোল্‌নিকভ্। "ওঃ ভগবান!"

মিনিট খানেক পরে চিঠিটা এলো। যা ভেবেছিল তাই: মা'র চিঠি, রিয়াজান প্রদেশ থেকে লেখা। চিঠিটা নিতে গিয়ে তার মুখ ফেকাশে হয়ে গেল। বহুদিন কোন চিঠিপত্র সে পায়নি। কিন্তু এখন এছাড়াও আরও কী একটা কারণে অব্যক্ত ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল তার বুকের ভেতরটা।

"নাস্তাসিয়া, চলে যাও, ভগবানের দোহাই! এই যে তোমার তিন কোপেক। শুধু দোহাই ভগবানের, এক্ষুনি চলে যাও।"

চিঠিটা এখন তার হাতের মুঠোয় থরথর করে কাঁপছে। নাস্তাসিয়ার সামনে ওটা খোলার ইচ্ছে তার ছিল না। এই চিঠিটা নিয়ে একান্তে থাকার ইচ্ছে হচ্ছিল তার। নাস্তাসিয়া বেরিয়ে যেতে সে চিঠিটা দ্রুত ঠোটে ঠেকিয়ে চুমু খেল। তারপর আরও অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করল চিঠির ওপরে হাতে লেখা ঠিকানা— তার পরিচিত, বড় আদরের, খুদে-খুদে অক্ষরের তেরছা হাতের লেখা, মা'র হাতের লেখা। এই

মামণিই তাকে একসময়ে লিখতে-পড়তে শিখিয়েছিলেন। সে দেরি করতে লাগল, মনে হচ্ছিল যেন ভয় পাচ্ছে খুলে পড়তে। একসময় খুলে দেখল। বেশ বড়সড়, ঘন করে লেখা চিঠি; বড়-বড় ফুল্‌সক্যাপ কাগজের দুভাঁজ করা দুটো পাতা— খুদে-খুদে অক্ষরে আগাগোড়া বোঝাই।

মা লিখছেন: "স্নেহের খোকা রোদিয়া, আজ দু'মাসের ওপরে হয়ে গেল চিঠিতে তোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সুযোগ হয়নি। তার ফলে আমার নিজেরই কষ্ট হচ্ছে, এমনকি মাঝে-মাঝে রাতে ঘুমোতে পারি না তোর কথা ভেবে। আমি যে চুপ করে ছিলাম সেটা আমার নিজের ইচ্ছায় নয়। এর জন্য, আশা করি, তুই আমাকে দোষ দিবি না। তুই তো জানিস, আমি তোকে কত ভালোবাসি। তুই আমাদের একমাত্র অবলম্বন, আমার ও দুনিয়ার— আমাদের দু'জনের একমাত্র আশাভরসা। আমি যখন জানতে পারলাম যে নিজের খরচ চালানোর উপযোগী সঙ্গতির অভাবে গত কয়েক মাস হল তুই ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দিয়েছিস এবং ছাত্রছাত্রী পড়ানো ও আয়ের অন্যান্য পথ তোর বন্ধ হয়ে গেছে তখন আমার মনের যা অবস্থা হয়েছিল তোকে কেমন করে বলব! বছরে আমি যে একশ কুড়ি রুবল পেনশন পাই তা থেকে তোকে কীই বা সাহায্য করতে পারি বল? চারমাস আগে আমি তোকে যে পনেরো রুবল পাঠিয়েছিলাম সেটা তুই নিজেও জানিস, আমার ওই পেনশন জামিন রেখেই ধার নিয়েছিলাম স্থানীয় মহাজন আফানাসি ইভানোভিচ ভাখুশিনের কাছ থেকে। তিনি বড় সজ্জন, তাছাড়া তোর বাবার বন্ধুও ছিলেন। কিন্তু তাঁকে আমার হয়ে পেনশনের টাকা তোলার অধিকার দেওয়ার ফলে ঋণশোধ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছিল, সে মেয়াদ সবে শেষ হয়েছে। তাই এই সময়ের মধ্যে আমি তোকে কিছু পাঠাতে পারিনি। কিন্তু এখন, ঈশ্বরের কৃপায়, মনে হয়, আমি তোকে আরও কিছু পাঠাতে পারি। তাছাড়া আমরা এখন মোটের ওপর আমাদের সৌভাগ্যের জন্য গর্বও করতে পারি। এই সংবাদটা তোকে জানানোর জন্য আর তর সইছে না। প্রথমত, ভাবতে পারিস, খোকা আমার, তোর বোন গত দেড় মাস হল আমার সঙ্গেই আছে এবং ভবিষ্যতেও আমাদের ছাড়াছাড়ি হওয়ার আর কোন আশঙ্কা নেই! প্রভুর অসীম করুণা, ওর দুঃখযন্ত্রণার দিন শেষ হয়েছে। সে যা হোক, তোকে একে-একে বলছি, তা থেকে তুই জানতে পারবি কী করে কী ঘটল এবং এতদিন তোর কাছ থেকে আমরা কী লুকিয়ে এসেছি। মাসদুয়েক আগে তুই যখন আমাকে লিখেছিলি কার মুখে নাকি শুনেছিস যে স্‌ভিদ্রিগাইলভদের বাড়িতে দুনিয়াকে বহু অপমান সহ্য করতে হচ্ছে এবং আমার কাছে সঠিক ঘটনা জানতে চেয়েছিলি, তখন আমি তোকে উত্তরে কীই বা লিখতে পারতাম? আমি যদি তোকে পুরো সত্যি লিখতাম, তুই সম্ভবত সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে হলেও আমাদের কাছে চলে আসতিস। তোর স্বভাব আর মন তো আমার জানা আছে। তোর বোনকে তুই এই

অপমান সহ্য করতে দিতিস না। আমি নিজেও হতাশার মধ্যে ছিলাম, কিন্তু কী করতে পারতাম বল! আমি নিজেও তো তখন সব সত্য জানতাম না। সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল এইখানে যে দুনিয়া গত বছর ওদের বাড়িতে বাচ্চাদের দেখাশোনা ও পড়ানোর কাজে বহাল হওয়ার সময় পুরো একশটা রুবল আগাম নিয়েছিল এই কড়ারে যে মাসে-মাসে ওর বেতন থেকে কেটে সেটা শোধ করা হবে। অর্থাৎ ঋণ শোধ না করে কাজ ছেড়ে দেওয়ার উপায় ছিল না। ওরে খোকা, মানিক আমার, এখন আর তোকে বলতে কোন বাধা নেই, ওই টাকাটা তোর বোন নিয়েছিল বিশেষত তোকে ষাট রুবল পাঠাবে বলে। ওই টাকাটা তখন তোর বড় দরকার ছিল, সেটা পেয়েও ছিলি গতবছর আমাদের কাছ থেকে। আমরা তখন তোর সঙ্গে ছলনা করেছিলাম— লিখেছিলাম যে ওটা দুনিয়ার আগেকার জমানো টাকা থেকে দেওয়া। কিন্তু ঘটনা তা নয়— এখন তোকে জানাই সব সত্য, কেননা ভগবানের ইচ্ছায় সব এখন হঠাৎ করে পালটে গেছে, ভালোর দিকে মোড় নিয়েছে; আর আমার ইচ্ছে তুই জান দুনিয়া তোকে কত ভালবাসে, কত বড় ওর মনটা। বাস্তবিক স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ প্রথম-প্রথম ওর সঙ্গে বড় দুর্ব্যবহার করতেন, টেবিলে একসঙ্গে খেতে বসে ওর সম্পর্কে নানারকম অশোভন মন্তব্য করতেন, ওকে নিয়ে হাসাহাসি করতেন। ...যা হোক ওসব দুঃসহ ঘটনায় বিশদ বর্ণনার মধ্যে যাচ্ছি না—মিছিমিছি তোকে আর উত্তেজিত করা কেন, যেহেতু এখন সে পাট চুকে গেছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, স্‌ভিদ্রিগাইলভের স্ত্রী মার্ফা পেত্রোভনা এবং বাড়ির আর সকলের সদয় ও উদার ব্যবহার সত্ত্বেও দুনিয়ার পক্ষে ওখানে জীবনযাপন করা বড়-দুর্বিষহ হয়ে উঠল, বিশেষত স্‌ভিদ্রিগাইলভ যখন তার রেজিমেন্ট জীবনের পুরানো অভ্যাসবশত সুরাদেবতার প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন। কিন্তু পরিণামে কী দাঁড়াল? ধারণা করতে পারিস ওই বুড়ো ভামটার অনেকদিন হলই' লোভী দৃষ্টি পড়েছিল দুনিয়ার ওপর। কিন্তু ওর প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও রূঢ়তার আড়ালে তা ঢেকে রাখতেন। একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি ও পরিবারের পিতা হয়ে এরকম কাণ্ডজ্ঞানহীন আশাকে যে মনে-মনে প্রশ্রয় দিচ্ছেন এই ভেবে হয়ত বা তিনি নিজেই লজ্জা পেয়েছিলেন, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই নিজের অনিচ্ছাতেই দুনিয়ার ওপর রাগারাগি করতেন। আবার এও হতে পারে যে খারাপ ব্যবহার করে এবং ওকে নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করে অন্যদের কাছ থেকে আসল সত্যটা লুকোতে চাইতেন। কিন্তু শেষকালে আর নিজেকে সামলাতে না পেরে সাহস করে খোলাখুলি বিশ্রী প্রস্তাবটা দিয়ে বসলেন দুনিয়াকে—ওকে নানারকম পারিতোষিক দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন, সর্বোপরি এও বললেন যে সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে ওকে নিয়ে অন্য কোন গ্রামে, তেমন হলে বিদেশে চলে যেতেও প্রস্তুত। দুনিয়ার কষ্টটা একবার ভেবে দ্যাখ। তৎক্ষণাৎ কাজটা ছেড়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না, বড় রকমের আর্থিক ঋণ তো ছিলই, তাছাড়া মার্ফা পেত্রোভ্‌নার কথাও ভাবতে হয়—দুম্ করে কাজ ছেড়ে দিলে

ওঁর হঠাৎ সন্দেহ হতে পারে, পরিণামে পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। আবার দুনিয়ার পক্ষেও এটা হত বড় রকমের কেলেঙ্কারি— সেটা এড়ানো যেত না। আরও নানা কারণ ছিল। যার ফলে ছয় সপ্তাহের আগে দুনিয়ার পক্ষে কোনমতে ওই ভয়ঙ্কর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। দুনিয়াকে তুই অবশ্যই জানিস, জানিস ও কত বুদ্ধিমতী, শক্ত মনের মেয়ে। দুনিয়ার আমার সহ্যক্ষমতা অনেক, এমনকি সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও বজায় রাখতে পারে মনের উদারতা। চরিত্রের দৃঢ়তা ও হারায় না। দুনিয়ার সঙ্গে আমার খবরাখবর চালাচালি প্রায়ই হত, অথচ সবকিছু ও আমাকে খুলে লেখেনি, পাছে আমি বিচলিত হয়ে পড়ি। ঘটনা চূড়ান্ত পরিণতির দিকে গড়াল অপ্রত্যাশিতভাবে। মার্ফা পেত্রোভ্‌নার স্বামী যেদিন বাগানে দুনিয়ার কাছে কাতর অনুনয়-বিনয় করতে থাকেন ঘটনাচক্রে মার্ফা পেত্রোভ্‌না তা শুনে ফেলেন। কিন্তু সবটাই ভুল বুঝলেন, সমস্ত ঘটনার জন্য দোষী সাব্যস্ত করলেন দুনিয়াকে, ভাবলেন গোটা ব্যাপারটার মূল কারণ দুনিয়া। তক্ষুনি, ওই বাগানেই ঘটে গেল খণ্ডপ্রলয়। মার্ফা পেত্রোভ্‌না দুনিয়াকে মেরেই বসলেন, ওর কোন কথা পর্যন্ত শুনতে চাইলেন না। নিজে তিনি ঝাড়া একঘণ্টা ধরে গলা ফাটালেন. শেষকালে হুকুম দিলেন দুনিয়াকে তক্ষুনি চাষীদের সাধারণ ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে আমার কাছে শহরে পাঠিয়ে দেওয়ার। ওই ঘোড়ার গাড়িতে দুনিয়ার যাবতীয় জিনিসপত্র, ওর জামাকাপড়, পোশাক-পরিচ্ছদ— সব বাঁধাছাঁদা না করে, এলোমেলোভাবে যাহোক-তাহোক করে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে রাখল ওরা। এমন সময় শুরু হল মুষলধারে বর্ষণ, অপমানিত লাঞ্ছিত দুনিয়াকে খোলা গাড়িতে একজন চাষীর সঙ্গে পাড়ি দিতে হল টানা বারো মাইল। এখন ভেবে দ্যাখ, কী আমি তোকে লিখতে পারতাম চিঠিতে, দু-মাস আগে তোর যে চিঠি পেয়েছিলাম তার জবাবে? কী লিখতাম বল? আমি নিজে ছিলাম হতাশার মধ্যে। তোকে সত্যি কথা লেখার মতো সাহস ছিল না আমার, কেননা তাতে তোর মনে বড় অশান্তি হত, তুই কষ্ট পেতিস, রাগে-অপমানে জ্বলতে থাকতিস। এছাড়া আর কীই বা করার ক্ষমতা ছিল তোর? সম্ভবত নিজের ধ্বংস ডেকে আনতিস। অবশ্য দুনিয়া নিজেও নিষেধ করে দিয়েছিল জানাতে। তাছাড়া মন যখন এতটা ভার হয়ে আছে সেই অবস্থায় এটা-ওটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে লিখে চিঠিটার পাতা ভরাট করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমাদের সারা শহর জুড়ে পুরো এক মাস ধরে এই ঘটনা নিয়ে গালগল্প চলতে থাকে। ব্যাপার এতদূর গড়ায় যে লোকের দৃষ্টি আর কানাকানির ফলে আমার আর দুনিয়ার পক্ষে গির্জায় যাওয়া পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে ওঠে। এমনকি আমাদের উপস্থিতিতে লোকে শুনিয়ে-শুনিয়ে নানারকম মন্তব্য করতে থাকে। আমাদের জানাশোনা সকলে আমাদের এড়িয়ে চলতে থাকে, দেখা হলে কেউ আর সম্মান দেখিয়ে মাথা পর্যন্ত নোয়ায় না। আমি নিঃসন্দেহে জানতে পারলাম, কোন কোন দোকান কর্মচারী ও অফিস কর্মচারী আমাদের বাড়ির গেট আলকাতরা দিয়ে

লেপে আমাদের চূড়ান্ত অপমান করার মতলব আঁটছিলেন, যাতে বাড়ির মালিক বিরক্ত হয়ে ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে বলেন আমাদের। এ সবের মূলে ছিলেন মার্ফা পেত্রোভ্‌না—এর মধ্যেই দুনিয়াকে অভিযুক্ত করে পাড়ার বাড়িতে-বাড়িতে দুনিয়ার নামে অপবাদ রটিয়ে বেড়িয়েছেন। আমাদের এখানকার সকলের সঙ্গে তাঁর জানাশোনা আছে। এই মাসে তিনি শহরে আসছিলেন বেশ ঘন-ঘন। উনি যেহেতু একটু বেশি কথা বলেন এবং নিজের পারিবারিক বিষয় সম্পর্কে নির্বিচারে সকলকে বলতে ভালোবাসেন, বিশেষত ভালোবাসেন নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে অনুযোগ করতে—যা আদৌ ভালো নয়—তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যে আগাগোড়া সমস্ত গল্পটি শুধু শহরে নয়, সারা জেলায় চাউর হয়ে গেল। আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। দুনিয়া আমার চেয়ে শক্ত ধাতের। তুই যদি দেখতিস কী করে ও অতসব সহ্য করল, আমাকেই ও সান্ত্বনা দিত, আমাকে উৎসাহ দিত। ও মানুষ নয়, স্বর্গের দেবী! কিন্তু ঈশ্বরের অসীম কৃপায় আমাদের দুঃখযন্ত্রণা লাঘব হল : স্‌ভিদ্রিগাইলভের চৈতন্যোদয় হল, তাঁর অনুশোচনা হল, সম্ভবত দুনিয়ার জন্য দুঃখ হতে সে যে সম্পূর্ণ নির্দোষ তার যাবতীয় প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসাবে মার্ফা পেত্রোভ্‌নার কাছে পেশ করলেন একটা চিঠি। মার্ফা পেত্রোভ্‌না যখন ওদের বাগানে দেখতে পেয়েছিলেন তার আগে ওই চিঠিটা দুনিয়া বাধ্য হয়ে লিখে পাঠিয়েছিল স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌কে, ব্যক্তিগতভাবে কৈফিয়ত দেওয়ার ব্যাপারে এবং গোপন সাক্ষাতের জন্য তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধে আপত্তি জানিয়ে। দুনিয়া চলে যাবার পর চিঠিটা স্‌ভিদ্রিগাইলভের কাছেই থেকে যায়। চিঠিতে বিশেষত মার্ফা পেত্রোভ্‌নার প্রতি তাঁর হীন আচরণের জন্য দুনিয়া তীব্র ভাষায় ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ করে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌কে তিরস্কার করে। চিঠিতে তাঁকে এও স্মরণ করিয়ে দেয় যে তিনি একজন সংসারী মানুষ, সন্তানের পিতা এবং সর্বোপরি ওর মতো অমনিতেই দুঃখী ও অবলা একটি মেয়েকে যন্ত্রণা দেওয়া, দুঃখ দেওয়া তাঁর পক্ষে নীচতার পরিচায়ক। এককথায়, খোকা আমার, চিঠিটা এত বড় অনুভূতি আর দরদ দিয়ে লেখা যে পড়তে-পড়তে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। এখনও পড়তে পারি না চোখের জল না ফেলে। তাছাড়া দুনিয়ার সমর্থনে অবশেষে বাড়ির চাকরদের সাক্ষ্যও পাওয়া গেল। এরা, সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ যতটা অনুমান করতেন তার চেয়ে অনেক বেশি জিনিস চোখে দেখেছিল, জেনেও ছিল। মার্ফা পেত্রোভ্‌না একেবারে অবাক, আরও একবার 'ধরাশায়ী' হলেন তিনি পরে— তা নিজমুখে স্বীকারও করেছেন। তবে দুনিয়া যে নির্দোষ এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না। এই ঘটনার ঠিক পরের দিন। রবিবার সোজা চলে এলেন ভজনালয়ে, নতজানু হয়ে সাশ্রু নয়নে এই নতুন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষমতা এবং নিজের কর্তব্য পালনের উপযুক্ত শক্তি চেয়ে প্রার্থনা জানালেন জননী মেরির কাছে। তারপর ভজনালয়ে থেকে পথে আর কোথাও না থেমে সোজা চলে

এলেন আমাদের বাড়ি। সব কথা আমাদের খুলে বলে অনুশোচনা প্রকাশ করার সঙ্গে-সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়লেন, দুনিয়াকে জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইলেন। ওইদিন সকালেই এতটুকু কালবিলম্ব না করে আমাদের কাছ থেকে সোজা বেরিয়ে শহরের সকলের বাড়ি-বাড়ি ঘুরলেন। সর্বত্র চোখের জল ফেলতে-ফেলতে পঞ্চমুখে প্রশংসা করতে লাগলেন দুনিয়ার। দুনিয়ার অনুভূতি ও আচরণ যে মহৎ, ওর যে কোন অপরাধ নেই তার প্রমাণ দিলেন। শুধু কি তাই?—সকলকে দেখালেন, পড়ে শোনালেন নিজের হাতে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌কে লেখা দুনিয়ার চিঠিটা, এমনকি চিঠির কপি করারও অনুমতি দিলেন— যেটা অবশ্য আমার কাছে একটু বাড়াবাড়িই মনে হয়েছে। এইভাবে পর-পর বেশ কয়েক দিন শহরের সবগুলো বাড়ি তাঁকে ঘুরতে হয়। যেহেতু কেউ-কেউ এই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে যে অন্যদের প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে পর পর নাম লেখা একটা তালিকাই তৈরি হয়ে গেল, ফলে প্রতি বাড়িতে আগে থাকতে লোকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করত, সকলে জানত মার্ফা পেত্রোভ্‌না কবে কোথায় ওই চিঠিটা পড়ে শোনাবেন। প্রত্যেকবার পড়ার সময় ওইসব লোকও আবার এসে ভিড় করত যারা তাদের নিজেদের বাড়িতে এবং পালা করে চেনাপরিচিত অন্যদের বাড়িতে বেশ কয়েকবার করে চিঠির পাঠ শুনেছে। আমার মত এই যে এখানে অনেক কিছু, অনেকটাই বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। কিন্তু মার্ফা পেত্রোভ্‌নার স্বভাবটাই ওরকম। অন্তত এটা ঠিক যে তিনি দুনিয়ায় মানসম্মান পুরোপুরি উদ্ধার করে দেন। কিন্তু এই ঘটনার সমস্ত মালিন্য তাঁর স্বামীর ওপর স্থায়ী কলঙ্ক হয়ে লেগে থাকল। কেননা তিনি ছিলেন আসল দোষী। তাঁর জন্য আমার দুঃখ হয়—বড় বেশি শাস্তি হয়ে গেছে এই হাঁদা লোকটার। দুনিয়া সঙ্গে-সঙ্গে বেশ কয়েকটা বাড়িতে পড়ানোর ডাক পেতে লাগল। কিন্তু সে কাজ ও নিল না। মোটের ওপর, হঠাৎই সকলে ওকে বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করল। এ সবের ফলস্বরূপ প্রধানত ঘটে গেল আরও একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা— যে কারণে, বলা যেতে পারে, আমাদের জীবনের ধারাটাই সম্পূর্ণ পালটে যাচ্ছে। তাহলে বলি শোন রোদিয়া, দুনিয়ার একটি পাত্র জুটেছে, ওকে বিয়ে করতে চায়। দুনিয়া ইতিমধ্যে মতও দিয়েছে। সেই কথাটাই তোকে জানাতে চাই তাড়াতাড়ি করে। ব্যাপারটা যদিও তোর পরামর্শ ছাড়া ঘটেছে তবু তুই সম্ভবত আমার ওপর কিংবা তোর বোনের ওপর রাগ করবি না, কেননা ঘটনার গতিবিধি থেকে নিজেই দেখতে পাবি যে তোর উত্তর পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা বা ঝুলিয়ে রাখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। ঘটনাটা কী ভাবে ঘটে, বলি। পাত্রের নাম পিওতর পেত্রোভিচ্‌ লুজিন— কোর্ট কাউন্সিলার, মার্ফা পেত্রোভ্‌নার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। এ ব্যাপারে মার্ফা পেত্রোভ্‌না অনেকখানি সহায়তা করেন। তাঁর মারফত আমাদের সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা প্রকাশ দিয়ে শুরু। তা আমাদের সাধ্যমতো আমরা ওকে আপ্যায়ন করি। কফির নিমন্ত্রণ ছিল আমাদের বাড়িতে।

পরের দিনই চিঠি—চিঠিতে অতি বিনীতভাবে তাঁর প্রস্তাব নিবেদন করেন, আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত সত্বর জানতে চান। উনি কাজের লোক, বড় ব্যস্ত মানুষ, এখন সেন্ট পিটার্সবুর্গে যাবার তাড়া, তাই প্রতিটি মিনিট তাঁর কাছে দামি। বলাই বাহুল্য, গোড়ায় আমরা খুব অবাক হয়ে যাই, কেননা সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল বড় বেশি তাড়াতাড়ি, অপ্রত্যাশিতভাবে। ওইদিন, সারাদিন ধরে আমরা দুজনে একসঙ্গে ভাবনা-চিন্তা করলাম, বিবেচনা করে দেখলাম। বেশ নির্ভরযোগ্য লোক, অবস্থাপন্ন, একসঙ্গে কাজ করেন দুটো জায়গায়, নিজস্ব পুঁজিও কিছু করে ফেলেছেন ইতিমধ্যে। এটা ঠিক যে বয়স পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু চেহারা যথেষ্ট ভালো—মহিলাদের এখনও মনে ধরার মতো। তাছাড়া মোটের ওপর তিনি বেশ রাশভারী, ভদ্র চেহারার মানুষ, তবে একটু খিটখিটে—মনে হতে পারে যে দাম্ভিক। কিন্তু সেটা মাত্র প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে। হ্যাঁ একটা বিষয়ে তোকে আগে থাকতে সতর্ক করে দিই, খোকা আমার। সেন্ট পিটার্সবুর্গে তাঁর সঙ্গে তোর দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, খুব শিগগিরই হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু তোর আমার যেমন স্বভাব, তাই আগে থাকতে বলে রাখি প্রথম দৃষ্টিতে ওঁর ভেতরে কোন কিছুর অভাব দেখতে পেলে মাথা গরম করে হুটহাট কোন সিদ্ধান্ত করে বসিস নে যেন। কথাটা বলছি সাবধানতার খাতিরে, যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওঁকে তোর ভাল লাগবে। তাছাড়া কোন মানুষকে ভালোভাবে জানতে গেলে ধাপে-ধাপে সন্তর্পণে তার দিকে এগোতে হয়। তা না হলে ভুল ও অন্ধবিশ্বাসের কবলে পড়তে হয় যা পরে সংশোধন করা ও দূর করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু পিওতর পেত্রোভিচ অন্তত বহু ক্ষেত্রে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। প্রথম যেদিন আমাদের বাড়িতে আসেন সেদিনই তিনি আমাদের জানান যে তিনি বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। তবে অনেক বিষয়ে—তাঁর নিজের কথায়—'আমাদের নতুনতম প্রজন্মের ধ্যানধারণার সঙ্গে' তিনি একমত এবং যাবতীয় কুসংস্কারের তিনি ঘোর বিরোধী। আরও অনেক কথা তিনি বলেন, কেননা খানিকটা আত্মম্ভরিতা তাঁর আছে এবং লোকে তাঁর কথাগুলো শুনলে তিনি খুব খুশি হন। তবে এটা তেমন দোষের মনে করি না। আমি অবশ্য সামান্যই বুঝতে পারি, তবে দুনিয়া আমায় বুঝিয়ে বলে যে উনি খুব একটা উচ্চশিক্ষিত না হলেও বেশ বুদ্ধিমান এবং মনে হয় সজ্জন। তুই তো তোর বোনের স্বভাব ভালো করেই জানিস খোকা। মেয়ে আমার দৃঢ়চরিত্রের, বিচক্ষণ, সহিষ্ণু, উদার স্বভাবের, যদিও আবেগপ্রবণ—আমি ভালোমতো লক্ষ করে ওর মধ্যে সেটা দেখতে পেয়েছি। অবশ্য এটা ঠিক যে ওদের দুজনের কারও দিক থেকেই ভালোবাসা তেমন একটা নেই, কিন্তু দুনিয়া বুদ্ধিমতী মেয়ে তো বটেই। সেইসঙ্গে তার চরিত্রের মধ্যে মহত্ত্বও আছে—স্বর্গের দেবীর মতো। স্বামীকে সুখী করা সে তার কর্তব্য বলে গ্রহণ করবে, যদি অন্যদিক থেকে স্বামীও তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রাখেন। এ বিষয়ে সন্দেহের বড় কারণ আপাতত আমরা দেখতে পাচ্ছি

না, যদিও স্বীকার করতে বাধা নেই যে কাজটা বড় তাড়াহুড়োয় হয়ে গেছে। পরন্তু উনি খুব বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাই নিজেই অবশ্য দেখতে পাবেন যে দুনিয়া তাঁর সান্নিধ্যে নিজেকে যত বেশি সুখী অনুভব করবে তাঁর নিজের দাম্পত্যসুখও তত বেশি সুনিশ্চিত হবে। আর চরিত্রের কিছু-কিছু স্থূলতা, কিছু পুরানো অভ্যাস, এমনকি কোন-কোন ক্ষেত্রে মতের অমিল—যা সবচেয়ে সুখী দাম্পত্যজীবনেও এড়ানো সম্ভব নয়—এ ব্যাপারে দুনিয়া নিজে আমাকে বলেছে যে সে তার নিজের ওপর আস্থা রাখে। এখানে চিন্তার কোন কারণ নেই। ওদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক যদি সততা ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে তাহলে অনেককিছু সহ্য করতে সে প্রস্তুত। ভদ্রলোককে, যেমন ধর, গোড়ায় আমার মনে হয়েছিল একটু রুক্ষ ধরনের, কিন্তু সেটা তো একারণেও হতে পারে যে তিনি স্পষ্টবক্তা—হতে পারে কেন, আসলেও তাই। যেমন ধর, দ্বিতীয়বারের সাক্ষাতের সময়, যখন তিনি মত পেয়ে গেছেন, কথায়-কথায় বলে ফেললেন যে অনেক আগে থাকতে—দুনিয়াকে যখন দেখেননি তারও অনেক আগে—কোনরকম যৌতুক ছাড়াই দুঃস্থ পরিবারের এমন একজন সচ্চরিত্রের মেয়েকে ঘরে তোলার ইচ্ছে তাঁর ছিল। তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন, তার কারণ এই যে স্বামীর উচিত নয় তার স্ত্রীর সঙ্গে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকা, বরং অনেক বেশি ভালো হয় যদি স্ত্রী নিজেকে স্বামীর অনুগৃহীতা বলে মনে করে। সঙ্গে-সঙ্গে এও বলি যে আমি যে-ভাবে লিখলাম তার চেয়ে অনেক নম্র ও অনেক ভদ্র ভাষায় তিনি কথাগুলি বলেছিলেন। আসলে ঠিক কীভাবে বলেছিলেন তা ভুলে গেছি, মনে আছে শুধু ভাবটা। তাছাড়া তিনি আদৌ আগে থাকতে ভেবেচিন্তে ওকথা বলেননি—স্পষ্টই বোঝা যায়, কথাপ্রসঙ্গে উত্তেজনাবশত তাঁর মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল, তাই পরে শোধরানোর ও নরম করে বলার চেষ্টাও করেছিলেন। তা সত্ত্বেও ব্যাপারটা আমার কাছে একটু কটু ঠেকেছিল, দুনিয়াকে আমি পরে তা জানাই। কিন্তু দুনিয়া অনেকটা যেন বিরক্ত হয়েই উত্তরে আমাকে বলল—"কথা মানেই তো আর কাজ নয়"—কথাটার মধ্যে অবশ্য সত্যতা আছে। মন স্থির করার আগে সারা রাত দুনিয়া ঘুমোতে পারেনি। আমি ঘুমোচ্ছি এই ভেবে সে বিছানা ছেড়ে উঠে সারা রাত ঘরের ভেতরে পায়চারি করতে থাকে। শেষে নতজানু হয়ে আইকনের সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে আবেগভরে প্রার্থনা করতে লাগল। ভোরবেলা আমাকে জানাল যে মনস্থির করে ফেলেছে।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে পিওতর পেত্রোভিচ্ এখন সেন্ট পিটার্সবুর্গ রওনা দিচ্ছেন। সেখানে তাঁর অনেক কাজ। সেন্ট পিটার্সবুর্গে একটা সলিসিটরের অফিস খোলারও ইচ্ছে তাঁর আছে। তিনি ইতিমধ্যে বহুকাল যাবৎ নানা ধরনের মামলা-মোকদ্দমা চালানোর দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত আছেন, মাত্র কয়েকদিন আগে একটা বড় রকমের মামলায় জিতেছেন। সেন্ট পিটার্সবুর্গে তাঁর আরও এই কারণে যাওয়া দরকার

যে সিনেটে তাঁর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে আছে। তাই বলছিলাম কি, খোকা আমার, উনি তোরও খুব উপকারে আসতে পারেন—এমনকি সবরকমভাবে উপকারে আসতে পারেন। আমি আর দুনিয়া ইতিমধ্যে ভেবে দেখেছি যে তুই এই আজকের দিন থেকেই সঠিকভাবে নিজের কর্মজীবন শুরু করতে পারিস এবং ধরে নিতে পারিস তোর ভবিষ্যৎ ইতিমধ্যে স্পষ্ট আকার নিয়েছে। ওঃ যদি সত্যি-সত্যি তাই হয়! এতে এত উপকার হতে পারে যে ঘটনাটিকে আমাদের ওপর সর্বশক্তিমানের অসীম করুণার সরাসরি প্রকাশ ছাড়া আর কিছু বলার থাকতে পারে না। দুনিয়া কেবল এই স্বপ্নই দেখছে। আমরা ইতিমধ্যে সাহস করে এই বিষয়ে দু-একটা কথা পিওতর পেত্রোভিচ্‌কে বলেছি। তিনি হুঁশিয়ার হয়ে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন, বলেন যে সেক্রেটারি ছাড়া তাঁর যখন চলবে না তখন বলাই বাহুল্য বাইরের একজন লোককে মাইনে দেওয়ার চেয়ে কোন আত্মীয়কে দেওয়া বরঞ্চ ভালো—অবশ্য সে যদি ও পদের উপযুক্ত হয় (তুই উপযুক্ত হবি না এ একটা কথা হল!) তবে সঙ্গে-সঙ্গে, সন্দেহও প্রকাশ করলেন যে ইউনিভার্সিটির ক্লাসের পর তোর পক্ষে তাঁর অফিসে কাজ করার মতো সময় বার করা হয়ত সম্ভব হবে না। এবারের মতো ব্যাপারটার এখানেই ইতি। কিন্তু দুনিয়া এখন ওছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না। আজ বেশ কয়েকদিন হল এই নিয়ে সে রীতিমতো উত্তেজিত। ইতিমধে পুরোপুরি এরকম একটা পরিকল্পনাও ছকে ফেলেছে যে যাতে শেষপর্যন্ত তুই পিওতর পেত্রোভিচের জুনিয়র হতে পারিস, এমনকি আইন ব্যবসায়ে তাঁর অংশীদারও হতে পারিস। বিশেষত যেহেতু তুই ল' পড়ছিস। আমি দুনিয়ার সঙ্গে ও ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। ওর সমস্ত পরিকল্পনা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমার মতের এতটুকু অমিল নেই, দেখতে পাচ্ছি বাস্তবে তা সম্ভবও। পিওতর পেত্রোভিচ্‌ অবশ্য কৌশলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। তবে তার কারণ বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয় না। যেহেতু তিনি তোকে এখনও দেখেননি। তবু দুনিয়ার দৃঢ়বিশ্বাস যে তার ভাবী স্বামীর ওপর নিজের প্রভাব খাটিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করবে। এতে ওর কোন সন্দেহ নেই। আমরা অবশ্য হুঁশিয়ার আছি যাতে মুখ ফসকে ঘুণাক্ষরেও বেরিয়ে না পড়ে আমাদের ভবিষ্যতের এইসব প্রত্যাশা—সবচেয়ে বড় কথা, পিওতর পেত্রোভিচের সঙ্গে তোর অংশীদারিত্বের বিষয়টি। তিনি একজন উদ্যোগী পুরুষ, বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, বিষয়টিকে তিনি স্থূলভাবে গ্রহণ করতে পারেন, আমাদের সমস্ত ভাবনাচিন্তা তাঁর কাছে নিছক দিবাস্বপ্ন বলে মনে হতে পারে। ঠিক সেই ভেবেই, তুই যতদিন ইউনিভার্সিটিতে পড়ছিস ততদিন তোকে টাকাকড়ি দিয়ে সহায়তার ব্যাপারে উনি যে আমাদের সাহায্য করবেন, আমাদের এই দৃঢ় প্রত্যাশা সম্পর্কেও আমি বা দুনিয়া কেউই তাঁকে ঘুণাক্ষরেও একটি কথা এখনও বলিনি। এ বিষয়ে আমরা কথা বলিনি এই কারণে যে প্রথমত যথাসময়ে অমনিতেই সেটা হবে এবং উনি সম্ভবত আমরা আগ বাড়িয়ে কিছু বলার আগেই

নিজে থেকে সে প্রস্তাব দেবেন। এ ব্যাপারে দুনিয়াকে কি আর 'না' বলতে পারবেন!—পরন্তু আরও এই কারণে যে তুই অফিসের কাজে ওঁর ডান হাত হতে পারিস এবং দাতব্য হিসাবে নয়, দস্তুরমতো তোর প্রাপ্য বেতন হিসাবেই পেতে পারিস এই সাহায্য। দুনিয়া মা আমার, ব্যবস্থাটা করতে চায় এধরনের, আমিও ওর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। দ্বিতীয়ত আরও এই কারণে বলিনি যে বিশেষত আমার ইচ্ছে ছিল কিছুদিনের মধ্যে আমাদের যে দেখা হবে সেখানে তাঁর সঙ্গে সমানে-সমানে তোকে রাখা। দুনিয়া যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁকে তোর কথা বলে তখন উত্তরে তিনি বলেন যে—কোন লোককে বিচার করতে গেলে প্রথমে নিজের চোখে, খুব কাছ থেকে তাকে খুঁটিয়ে দেখতে হয়, তাই তোর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরই তোর সম্পর্কে তাঁর নিজের মত গড়ে তোলার সুযোগ হবে। খোকা, মানিক আমার, কোন-কোন কারণে—প্রসঙ্গত, পিওতর পেত্রোভিচের সঙ্গে তার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই, নেহাতই আমার নিজস্ব, ব্যক্তিগত মতামত— এমনকি হয়ত বা বুড়ো বয়সের মেয়েলি খামখেয়ালি হতে পারে—আমার মনে হয় যে ওদের বিয়ের পর ওদের সঙ্গে না থেকে আমি যদি এখন যেমন আছি সেইরকম আলাদা থাকি তাহলে বোধহয় ভালো হয়। আমি নিশ্চিত জানি যে তিনি এত মহৎ, এত ভদ্র যে নিজে আমাকে আমন্ত্রণ জানাবেন, বলবেন যে মেয়ের কাছ থেকে আমাকে আর আলাদা হয়ে থাকতে হবে না। এখন পর্যন্ত যদি তা না বলে থাকেন, তার কারণ অবশ্য এই যে একথা বলাই বাহুল্য। তবে আমি আপত্তি করব। আমি জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছি কোনও শাশুড়িই কখনও তার জামাইয়ের মন পায় না। কারও এতটুকু বোঝা হয়ে আমি থাকতে চাই না। তাছাড়া আমার নিজের ইচ্ছা সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকা, যতক্ষণ নিজের মুখের অন্ন জোগানোর সার্মথ্য আমার আছে, তোর আর দুনিয়ার মতো সন্তান আমার আছে। সম্ভব হলে তোদের দুজনের কাছাকাছি কোথাও আস্তানা নিয়ে থাকব। তাহলে শোন খোকা, সবচেয়ে আনন্দের খবরটা আমি রেখে দিয়েছি চিঠির শেষে জানাব বলে। এবারে বলি তোকে; হয়ত খুবই শিগগির আমরা সকলে আবার একসঙ্গে মিলব, প্রায় তিন বছরের ছাড়াছাড়ির পর আমরা তিনজনে একে অন্যকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারব! ইতিমধ্যে হয়ত স্থিরও হয়ে গেছে যে দুনিয়া আর আমি সেন্ট পিটার্সবুর্গ যাচ্ছি। ঠিক কবে, জানি না, তবে এটা ঠিক যে শিগগির, খুবই শিগগির—এমনকি হয়ত এক সপ্তাহের মধ্যে। সব নির্ভর করছে পিওতর পেত্রোভিচের ওপর। সেন্ট পিটার্সবুর্গে তাঁর দেখাশোনার কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি আমাদের জানাবেন। নানা কারণে বিয়ের অনুষ্ঠানটা তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেরে ফেলতে চান— এমনকি সম্ভব হলে মেরি মাতার স্বর্গারোহণ উৎসবের আগে সামনে যে উপোসের পালা শুরু হচ্ছে তার আগেই, কিন্তু হাতে সময় কম থাকার দরুন সেটা সম্ভব না হলে অনুষ্ঠান হবে উপোস ভাঙার পর, স্বর্গারোহণ

উৎসবের ভোজ যখন শুরু হবে তখন। ওঃ তোকে বুকে চেপে ধরে কী সুখই যে আমি পাব! তোর সঙ্গে দেখা হবে এই ভেবে দুনিয়ার খুশি আর ধরে না। একবার ঠাট্টা করে এমন কথাও বলে যে একমাত্র এটাই যদি কারণ হত তাহলেও সে পিওতর পেত্রোভিচ্‌কে বিয়ে করতে রাজি ছিল। মেয়ে নয়, স্বর্গের দেবী! ও এখন এই চিঠির সঙ্গে কিছু যোগ করছে না, আমাকে শুধু এই কথা লিখতে বলেছে যে তোর সঙ্গে এত কথা বলার আছে, এত বেশি যে এখন কলম হাতে নিতেও ওর ভরসা হচ্ছে না। যেহেতু কয়েক ছত্রে কিছুই লেখা যাবে না— মিছিমিছি মন খারাপ হবে। বলেছে তোকে অনেক আদর জানাতে, অসংখ্য চুমু দিতে। শিগগিরই আমরা সশরীরে একসঙ্গে মিলব এরকম সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কয়েকদিনের মধ্যে তোকে যতটা বেশি করে পারি টাকা পাঠাচ্ছি। এখন যেহেতু সকলে জানতে পেরেছে যে পিওতর পেত্রোভিচের সঙ্গে দুনিয়ার বিয়ে হচ্ছে, আমার ঋণশোধের বিশ্বাসযোগ্যতাও হঠাৎ বেড়ে গেছে লোকের কাছে এবং আমি নিশ্চিত জানি যে আফানাসি ইভানভিচ্‌ এখন আমাকে বিশ্বাস করে আমার পেনশন জামিন রেখে দরকার হলে পঁচাত্তর রুবল পর্যন্ত ধার দেবেন। তাই আমি তোকে হয়ত পঁচিশ এমনকি তিরিশ রুবল পাঠাব। হয়ত আরও বেশিই পাঠাতাম, কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে আমাদের রাহাখরচের কথা ভেবেঃ যদিও পিওতর পেত্রোভিচের অসীম দয়া— আমাদের রাজধানী যাত্রা বাবদ ব্যয়ের একটি অংশ নিজে বহন করছেন, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর নিজের ব্যয়ে আমাদের মালপত্র ও বড় তোরঙ্গটা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছেন (এটা অবশ্য তিনি করেছেন তাঁর ওখানকার জানাশোনা লোকজনের মারফত), তবু সেন্ট পিটার্সবুর্গে পৌঁছুনোর পরও কিছু খরচপাতির ব্যাপার আছে তাও ভাবতে হয়। ওখানে তো আর আমরা কপর্দকশূন্য অবস্থায় হাজির হতে পারি না—অন্তত প্রথম কয়েকদিনের সংস্থান তো রাখতেই হয়। প্রসঙ্গত, আমি আর দুনিয়া—আমরা দুজনে মিলে খুঁটিনাটি সমস্ত হিসাব কষে দেখেছি। দেখা যাচ্ছে পথখরচ খুব একটা বেশি পড়বে না। এখান থেকে রেলস্টেশন পর্যন্ত দূরত্ব মাত্র ষাট মাইল। দরকার হতে পারে এই ভেবে আমরা ইতিমধ্যে আমাদের এক পরিচিত চাষীর সঙ্গে কথা বলে তার গাড়িটা ঠিক করে রেখেছি। ওখান থেকে দুনিয়া আর আমি থার্ড ক্লাস কামরায় চেপে বহাল তবিয়তে চলে যাব। তাই আমার মনে হয় পঁচিশ কেন, তিরিশ রুবলই তোকে পাঠানোর উপায় বার করতে পারব। কিন্তু আর নয়। দুটো পাতা ঠাসাঠাসি লিখে ভরিয়ে ফেলেছি— আর জায়গা নেই। এই আমাদের পুরো বৃত্তান্ত। কত ঘটনাই না জমেছিল! এবারে খোকা, মানিক আমার, আমাদের দেখা হওয়ার আর বেশি দেরি নেই, তবু তার আগেই তোকে আদর জানাচ্ছি, আশীর্বাদ করছি তোকে। এ তোর মায়ের আশীর্বাদ। দুনিয়াকে ভালোবাসিস, ভালোবাসিস তোর বোনটাকে। খোকা, ওকে ভালোবাসিস তেমনি, যেমন ও তোকে ভালোবাসে। জেনে রাখিস তোর প্রতি ওর ভালোবাসার

কোন সীমা-পরিসীমা নেই। ও নিজের চেয়েও তোকে বেশি ভালোবাসে। ও আমাদের স্বর্গের দেবী, আর তুই, খোকা— তুই আমাদের সর্বস্ব— আমাদের একমাত্র আশাভরসা। তোর সুখে আমাদের সুখ। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিস কি আগের মতো, খোকা? বিশ্বাস করিস কি আমাদের সৃষ্টিকর্তার, আমাদের ত্রাণকর্তার, করুণায়? মনে-মনে আমার বড় ভয় নাস্তিকতা যে-ভাবে হালের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে তুইও না তার খপ্পরে পড়ে যাস। যদি তা-ই হয় তাহলে আমি তোর জন্যে প্রার্থনা করব। মনে করে দ্যাখ, সোনা আমার, ছোটবেলায়, তোর বাবা তখনও বেঁচে, তুই আমার কোলে বসে তোর প্রার্থনা আউড়াতিস। তখন আমরা সবাই কী সুখীই না ছিলাম! চলি— না, বলি, আসি। *আবার দেখা হবে*। তোকে অনেক, অনেক আদর জানাই, অসংখ্য চুমু দিই।

আমরণ তোর,
তোর মা
পুলখেরিয়া রাস্‌কোল্‌নিকভা''

চিঠি পড়তে-পড়তে বলতে গেলে চিঠির একেবারে শুরু থেকে অবিরাম অশ্রুধারায় ভেসে যাচ্ছিল রাস্‌কোলনিকভের মুখ। কিন্তু শেষ করার পর তার মুখ ফেকাসে হয়ে গেল, মুখের মাংসপেশীতে টান ধরল, বিকৃত হয়ে উঠল তার মুখ, ঠোঁটের ফাঁকে খেলে গেল বেদনা, তিক্ততা ও বিদ্বেষের জ্বালা-ধরা বাঁকা হাসি। শতচ্ছিন্ন শীর্ণ বালিশটায় মাথা রেখে সে শুয়ে পড়ল, শুয়ে-শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগল। তার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল, প্রবল উত্তেজনায় আলোড়িত হতে লাগল ভাবনাচিন্তা। দেখতে-দেখতে কুলুঙ্গি অথবা সিন্দুকের মতো দেখতে এই হলদে বিবর্ণ ছোট্ট কুঠুরিটার ভেতরে তার হাঁপ ধরে উঠল, দম বন্ধ হয়ে এলো। দৃষ্টি ও ভাবনাচিন্তার প্রসারের জন্য একটু ফাঁকা জায়গা দরকার হয়ে পড়ল। মাথার টুপিটা খপ করে তুলে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। সিঁড়িতে কারও সঙ্গে যে দেখা হয়ে যেতে পারে এবারে কিন্তু সে আশঙ্কা তার মনে উদয় হল না— ও কথা সে ভুলে গেছে। ভজ্‌নেসেন্‌স্কি এভিনিউ দিয়ে পা বাড়াল ভাসিলিয়েভ্‌স্কি দ্বীপের দিকে। দেখে মনে হচ্ছিল বুঝি ওর কাজের তাড়া আছে। কিন্তু হাঁটছিল নিজের চিরাচরিত অভ্যাসমতো, পথের কোথাও দৃকপাত না করে আপন মনে বিড়বিড় করতে-করতে। এমনকি সময়-সময় জোরে-জোরে নিজের সঙ্গে কথা বলছিল। ওর হাবভাব দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে যাচ্ছিল পথচারীরা। অনেকে ভাবছিল লোকটা বোধহয় মাতাল।

চার

মা'র চিঠি পেয়ে ওর ভারি কষ্ট হল। কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, মূল যে

বিষয়টি সে নিয়ে ওর মনে মুহূর্তের জন্যও এতটুকু সন্দেহ ছিল না— এমনকি যখন চিঠিটা পড়ছিল তখনও ছিল না। সে তার কাজের মূল বিষয়টি মনে-মনে স্থির করে ফেলেছে, স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছে: 'এ বিয়ে হবে না, আমি বেঁচে থাকতে হবে না! চুলোয় যাক পিওতর লুজিন।'

'কেন না ব্যাপারটা খুবই স্পষ্ট,' নিজের সংকল্পের সাফল্য আগে থাকতে ভেবে হিংস্র উল্লাসে বাঁকা হাসি হেসে সে আপন মনে বিড়বিড় করে বলল। 'না গো মা জননী, না দুনিয়া, আমাকে ঠকানো তোমাদের সাধ্য নয়!' আমার পরামর্শ চাওয়া হয়নি, আমাকে বাদ দিয়ে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এর জন্য আবার ক্ষমাও চাওয়া হচ্ছে! তাহলে আর কি! ভাবছে, এখন আর ভাঙা যাবে না। আচ্ছা, আমিই দেখে নেবো যায় কি না! আহা কী ওজনদার যুক্তি! কী? না, 'এত কাজের লোক পিওতর পেত্রোভিচ, এত ব্যস্ত মানুষ যে বিয়ে করতে হলে ডাকগাড়িতে, এমনকি রেল রাস্তায় করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।' না রে দুনিয়া আমি সব দেখতে পাচ্ছি। জানি তুই আমার সঙ্গে কী অত কথা বলতে চাস। আমি এও জানি ঘরে পায়চারী করতে-করতে সারা রাত তুই কী ভেবেছিলি। মা'র শোবার ঘরে কাজানের মেরিমাতার যে আইকন্ আছে তার সামনে কী প্রার্থনা তুই করেছিলি তাও জানি। যিশু যে টিলায় ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন সেই গলগথায় ওঠা কিন্তু বেশ কঠিন। হুম... তার মানে সব ঠিক হয়ে গেছে, চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে গেছে: তাহলে আমাদের দুনিয়ার... শ্রীমতী আভ্‌দোতিয়া রমানভ্‌না রাস্‌কোলনিকভার বিয়ে হতে চলেছে একজন কর্মব্যস্ত যুক্তিবাদী মানুষের সঙ্গে যিনি নিজস্ব পুঁজি করে ফেলেছেন (নিজস্ব পুঁজিও কিছু করে ফেলেছেন ইতিমধ্যে—এটা আরও শাঁসাল, আরও জমকাল শোনায়), ভদ্রলোক একসঙ্গে কাজ করেন দুটো জায়গায় এবং আমাদের নতুনতম প্রজন্মের ধ্যানধারণার সঙ্গে একমত (মা যেমন লিখেছেন চিঠিতে) এবং *মনে হয়* সজ্জন— যেমন মন্তব্য করেছে দুনিয়া নিজে। এই *'মনে হয়'*-এর চেয়ে চমৎকার আর কী হতে পারে! আর এই *মনে হওয়ার* জন্যই কিনা বিয়ে করতে যাচ্ছে আমাদের দুনিয়া!... চমৎকার! বাঃ চমৎকার!

তবে জানতে ইচ্ছে হয় কী ভেবে মা 'নতুনতম প্রজন্মের' কথা আমাকে লিখলেন? সেটা নিছক মানুষটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার জন্য, নাকি তার আরও কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে?— আমাকে লুজিনের পক্ষে টানার উদ্দেশ্যে নয় তো? ওঃ কী চালাকি দেখ! এছাড়া জানতে ইচ্ছে করে আরও একটি বিষয় : ওইদিন, ওই রাতে এবং তার পরেও ওরা দুজনে একে অন্যের কাছে কতদূর পর্যন্ত অকপট ছিল। সব কথাই কি ওদের দুজনের মধ্যে সরাসরি উচ্চারিত হয়েছিল, নাকি দুজনেই বুঝতে পেরেছিল যে তাদের মনে ও চিন্তায় ঘোরাফেরা করছে একই জিনিস, তাই সেসব মুখে বলে কাজ নেই, মুখে বলতে গেলে কী বলতে কী বেরিয়ে যায় তাই বা কে জানে? সম্ভবত ঘটনাটা অনেকটা এরকমই হবে। চিঠিতে দেখা যাচ্ছে— মা'র কাছে

মনে হয়েছিল উনি রুক্ষ, 'একটু রুক্ষ ধরনের', মা সরল মনে তাঁর মন্তব্যটি প্রকাশ করেন দুনিয়ার কাছে। দুনিয়া, বলাই বাহুল্য, তাতে বিরক্তি প্রকাশ করে— 'অনেকটা যেন বিরক্ত হয়'। তা তো হবেই! কার না গা জ্বালা করে যখন সরলমনের প্রশ্ন ছাড়াই ব্যাপারটা বোধগম্য, যখন স্থির হয়ে গেছে যে বলার আর কিছু নেই। তাছাড়া এই যে মা লিখছেন: 'দুনিয়াকে ভালোবাসিস খোকা, ও নিজের চেয়েও তোকে বেশি ভালোবাসে'— এটা কেন? তার মানে কি এই নয় যে ছেলের জন্য মেয়েকে বলি দিতে রাজি হয়েছেন বলে ভেতরে-ভেতরে বিবেকের দংশনে ভুগছেন? 'তুই আমাদের সর্বস্ব— আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা!' 'ওঃ মা, মা গো! ...' রাগে সর্বাঙ্গ রি রি করে উঠল, উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল সে জ্বালা। এখন যদি লুজিনের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায় তাহলে মনে হয় খুন করে বসতে পারে লোকটাকে!

'হুম্ এটা সত্যি', ভাবনা-চিন্তার যে ঘূর্ণি তার মাথার ভেতরে পাক খাচ্ছিল তাকে অনুসরণ করতে-করতে সে মনে-মনে বলল, 'এটা সত্যি যে, কোন মানুষকে ভালো ভাবে জানতে গেলে ধাপে-ধাপে সন্তর্পণে তার দিকে এগোতে হয়।' কিন্তু ব্যাপারটা পরিষ্কার। 'কাজের মানুষ, মনে হয় সজ্জন': খেলা কথা নয়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিশাল তোরঙ্গটা নিজের গরজে পৌঁছে দিচ্ছেন! সজ্জন নয় তো কী? এদিকে ওরা দুজন, পাত্রী আর তার মা ভাড়া নিচ্ছে একজন চাষীর ঘোড়াগাড়ি— মাদুরের ছাউনি দেওয়া গাড়ি (আমিও ওইভাবেই ঘুরেছি)! 'ও কিছু নয়! মাত্র ষাট মাইল... ওখান থেকে থার্ডক্লাস কামরায় চেপে বহাল তবিয়তে চলে যাব ... ছয় শ মাইল।' বিচক্ষণতার পরিচায়ক বটে: আয় বুঝে ব্যয়। কিন্তু আপনি? আপনি কী ধরনের মানুষ 'মিস্টার লুজিন?' হাজার হোক সে আপনার ভাবী বধূ। ...এমন নয় যে আপনি জানেন না, মা পেনশন বাঁধা রেখে রাহাখরচের টাকা ধার নিয়েছেন। অবশ্য আপনার কাছে এটা একটা সাধারণ বাণিজ্যিক লেনদেন, পারস্পরিক লাভ ও সমপরিমাণ শেয়ারভিত্তিক একটি উদ্যোগ, অর্থাৎ ব্যয়ও আধাআধি— যেমন রুশ প্রবচনে বলা হয়ে থাকে: নুন-রুটি একসঙ্গে, কিন্তু তামাকটা যার যার তার তার।— আতিথেয়তার একটা সীমা আছে না? তবে কর্মবীর মানুষটি এখানে ওদের সঙ্গে সামান্য তঞ্চকতা করলেন : ওদের দুজনার গাড়িভাড়ার যা খরচ, মালপত্র পাঠানোর খরচ কিন্তু তার চেয়ে কম— এমনকি এও হতে পারে যে ওই মাল পাঠানোর জন্য এক পয়সাও খরচ তাঁকে করতে হয়নি? কী ব্যাপার?— ওদের দুজনের কেউই কি এটা দেখতে পায় না, নাকি ইচ্ছে করে চোখ বুজে আছে? অথচ দেখ, কী খুশি, কী খুশি! ভেবে দেখ, এইতো সবে ফুল ধরল ফলের এখনও ঢের বাকি! এখানে যা বড় কথা তা কৃপণতা নয়, নীচতাও নয়— বড় কথা হল এর অন্তর্নিহিত *সুরটি।* এ যে বিয়ের পর ভবিষ্যতের সুর! এটা ভবিষ্যদ্বাণী! ... কিন্তু আমাদের মাতৃদেবীকে বলিহারি! অত জাঁক কিসের? কী সম্বল নিয়ে আসছেন সেন্ট পিটার্সবুর্গে? তিনটে চাঁদি, না কি... 'দু'খানা নোট'... যেমন

বলেছিল ওই সুদখোর বুড়িটা? ... হুম্! এরপর কিসের ওপর ভরসা করে তিনি সেন্ট পিটার্সবুর্গে থাকবেন? কোন না কোন কারণে এটা নিশ্চয় তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে দুনিয়ার বিয়ের পর তার সঙ্গে থাকা সম্ভব হবে না ওঁর পক্ষে— এমন কি গোড়ার দিকেও না? পেয়ারের লোকটি সম্ভবত কথায়-কথায় *বলে ফেলেছেন* মনের কথাটা, যদিও মাতৃদেবী দু-হাত নেড়ে আপত্তি জানিয়ে বাতিল করে দেন এই চিন্তাটি, ওঁর কথায় : 'আমি নিজে আপত্তি করব।' তাহলে কিসের ওপর ভরসা?— পেনশনের একশ কুড়ি রুবল, যেখান থেকে আফানাসি ইভানভিচের কাছে ঋণবাবদ কাটা যাচ্ছে? শীতের শাল বুনছেন, জামার হাতা এম্ব্রয়ডারি করছেন— মিছিমিছি নষ্ট করছেন বুড়ো বয়সের চোখদুটো। আমার যতদূর জানা আছে, ওসব শাল-টাল থেকে একশ কুড়ি রুবলের সঙ্গে বছরে যোগ হয় বড় জোর আরও কুড়ি রুবল। তার মানে ওদের ভরসা মিস্টার লুজিনের মহানুভবতা। মা'র ধারণা : 'নিজে থেকে বলবেন, পীড়াপীড়ি করবেন।' তাহলেই হয়েছে! যেমন সবসময় ঘটে শিলারীয় ভাবাপন্ন নির্মল মনের এই মানুষগুলির ক্ষেত্রে: শেষমুহূর্ত পর্যন্ত মানুষকে সাজাবে ময়ূরের পালকে, শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ভালোর প্রত্যাশা, মন্দের কথা ভাবতেও পারে না। যদি উলটো দিকটার বিন্দুমাত্র আভাস পেয়ে থাকেও সত্যি কথাটা আগে থাকতে কোন মতে মনে-মনে উচ্চারণ পর্যন্ত করবে না। ওই চিন্তার প্রশ্রয় দেওয়াটাই তাদের কাছে পীড়াদায়ক। যতক্ষণ না তাদের নিজেদের হাতে বিচিত্র বর্ণে সাজানো সেই মানুষটি তাদের বোকা বানাবে ততক্ষণ দু-হাত নেড়ে প্রবল আপত্তি জানাবে সত্য সম্পর্কে। জানতে ইচ্ছে হয় মিস্টার লুজিন কোন পদকের অধিকারী কিনা। বাজি ধরে বলতে পারি ওঁর বোতামের ঘরায় আটকানো আছে সিভিল সার্ভিসে কৃতিত্বের পুরস্কার— সেন্ট আনা ক্রস। বণিক আর ঠিকাদারদের ভোজসভায় তিনি নির্ঘাত ওটা পরে থাকেন। বলা যায় না, হয়ত নিজের বিয়ের বাসরেও পরবেন! যাক গে, চুলোয় যাক!...

'আচ্ছা, মা'র ব্যাপারটা না হয় বুঝলাম, বাদ দিলাম ওঁর কথা। মা আমার ওরকমই। কিন্তু দুনিয়া? আদরের বোন আমার, আমি তো তোকে জানি! শেষবার যখন আমাদের দেখা হয় তখনও তোর বয়স কুড়ির নিচে। তখনই তোর স্বভাব আমি বুঝতে পেরেছি। মা তো লিখেইছেন: 'দুনিয়ার আমার সহ্যক্ষমতা অনেক।' সে আমি জানি। জানি ওই আড়াই বছর আগে থেকে। তারপর থেকে গত আড়াই বছর ভেবেছি এই নিয়ে— ঠিক এই নিয়ে যে 'দুনিয়ার আমার সহ্যক্ষমতা অনেক।' স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ নামে লোকটিকে এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে যাবতীয় হাঙ্গামা সহ্য করার ক্ষমতা যে মেয়ের আছে তার সহ্যক্ষমতা যে অনেক তাতে আর সন্দেহ কি! এখন আবার মা'র সঙ্গে মিলে ঠিক করেছে যে মিস্টার লুজিনকে সহ্য করা যেতে পারে। অর্থাৎ সহ্য করা যেতে পারে এমন একজন মানুষকে যিনি স্বামীর কাছে স্ত্রী চিরকৃতজ্ঞ থাকবে এই বিবেচনায় দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার করে কাউকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণের

পক্ষপাতী। সে তত্ত্ব আবার তিনি জাহির করেন সাক্ষাতের প্রথম দিনেই। ধরা যাক ওঁর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে, যদিও তিনি একজন যুক্তিবাদী মানুষ।— কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে আদৌ মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়নি, আসলে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যত তাড়াতাড়ি পারা যায় নিজেব দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া। কিন্তু দুনিয়া— এ কী করল দুনিয়া? মানুষটাকে তো তার বুঝতে বাকি রইল না, অথচ এরই সঙ্গে তাকে জীবন কাটাতে হবে! দুনিয়া এমন মেয়ে যে শুধু জল রুটি খেয়ে থাকবে, কিন্তু নিজের সত্তাকে বিক্রি করবে না, আর নিজের নৈতিক স্বাধীনতাকে তো বৈষয়িক সুখস্বাচ্ছ্যন্দের খাতিরে কখনই বিসর্জন দেবে না— লুজিনের কথা তো ছাড়, শ্লেজউইগ-হলস্টেইনের গোটা তালুকের বদলেও না। না, আমি যতদূর জানি, দুনিয়া তো অমন ছিল না, তবে ...না, না, অবশ্যই বদলায়নি এখনও। অবশ্য এও ঠিক যে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌রা কঠিন ধাতুতে গড়া। সারা জীবন বছরে দুশ রুবলের বিনিময়ে এ জেলা সে জেলা ঘুরে-ঘুরে বড়লোকের বাড়িতে ছেলেমেয়ে তদারকের কাজ করা বেশ কঠিন। কিন্তু তবু আমি জানি যে আমার বোন কোন বাগিচায় নিগ্রো ক্রীতদাসীর কাজ করবে অথবা বাল্‌টিক প্রদেশের কোন জার্মান জমিদারের ভূমিদাসী হয়ে কাজ করবে তাও ভালো, কিন্তু যে মানুষটিকে সে শ্রদ্ধা করে না, যার সঙ্গে তার মনের এতটুকু মিল নেই, একমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে চিরজীবনের জন্য গাঁটছড়া বেঁধে নিজের আত্মা ও নীতিবোধকে কলঙ্কিত হতে সে দেবে না ! লুজিন যদি আগাগোড়া নিখাদ সোনার অথবা নিরেট হীরার তৈরিও হতেন্ তবু তাঁর আইনসম্মত রক্ষিতা হতে কখনও রাজি হত না দুনিয়া! তাহলে এখন রাজি হচ্ছে কেন? ব্যাপারটা কী? আসল রহস্যটা কী? ব্যাপারটা পরিষ্কার: নিজের জন্য, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, এমনকি নিজেকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্যও নিজেকে সে বিক্রি করবে না, কিন্তু অন্যের জন্য করবে! প্রিয়জনের খাতিরে, শ্রদ্ধা-ভালোবাসার পাত্রের খাতিরে সে তা করবে। সার কথাটা হল এই যে ভাইয়ের জন্য, মা'র জন্য নিজেকে বিকিয়ে দেবে! সর্বস্ব বিকিয়ে দেবে। হায়, এখানে দরকার হলে আমরা আমাদের নীতিবোধকেও দমন করব; স্বাধীনতা, মনের শান্তি এমনকি বিবেক— সব, সবকিছু হাটে বিকোব। প্রাণ যায় যাক! —আমাদের প্রিয়জনেরা সুখী হলেই হল। শুধু তাই নয়, আমরা নিজস্ব যুক্তিতর্ক খাড়া করব, জেসুইটদের কাছ থেকে শিক্ষা নেবো এবং সাময়িকভাবে সম্ভবত নিজেদের সান্ত্বনা দেবো, নিজেদের এই বলে বুঝ দেবার চেষ্টা করব যে এটা দরকার, সৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাস্তবিকই দরকার। এইরকমই জীব আমরা— সব পরিষ্কার, দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। এটা পরিষ্কার যে এখানে যে মানুষটি প্রাধান্য পাচ্ছে, পুরোভাগে আছে সে হল আমি— এই অধম— রোদিওন রমানভিচ রাস্‌কোলনিকভ। তা হবে না কেন? হয়ত ওর একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া, ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগ করে দেওয়া, ওকে কোন

অফিসের অংশীদার করে দিতে পারা, ওর ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করা— এতেই পরম সুখ! পরিণামে সম্ভবত সে হবে ধনী, মানী, পরম শ্রদ্ধাভাজন— আবার এমনও হতে পারে যে জীবনের শেষপ্রান্তে এসে হবে একজন নামী লোক! কিন্তু মা? এ যে তাঁর বড় আদরের খোকা, রোদিয়া, তাঁর প্রথম সন্তান! এমন সোনার টুকরো ছেলের জন্য এরকম মেয়েকেও বলি দিতে আপত্তি নেই। হায়, দরদী মন! কোথায় তোমাদের ন্যায়বিচার? কিন্তু ও কিছু নয় : এখানে আমরা সম্ভবত সোনিয়ার অদৃষ্ট নিয়েও আপত্তি করব না! সোনিয়া, সোনিয়া মার্মেলাদভা, শাশ্বত চিরন্তন তার এই রূপ যতদিন টিকে আছে এই জগৎসংসার! কিন্তু তোমাদের এই আত্মবলি তোমাদের দুজনের কেউই কি পুরোপুরি খতিয়ে দেখেছ? দেখেছে কি? শক্তিতে কুলোবে কি? এতে কোন লাভ আছে কি? বিচক্ষণতার পরিচায়ক কি এটা? তুই জানিস কি রে দুনিয়া যে লুজিনের সঙ্গে তোর দৈবনির্বন্ধের যে পরিণতি সোনিয়ার অদৃষ্ট তার চেয়ে কোন অংশে মন্দ নয়? 'ভালোবাসা এখানে থাকতে পারে না'—মা লিখছেন। বলি, ভালোবাসা যদি না থাকল তা হলে থাকল কী?— শ্রদ্ধারও কোন প্রশ্ন নেই, বরং যা আছে তা এগুলোর বিপরীত—আছে বিরূপতা, অবজ্ঞা, ঘৃণা। তাহলে? তাহলে দাঁড়াচ্ছে, আবারও দেখা যাচ্ছে *'পরিচ্ছন্নতা রক্ষার খাতিরে'*। তাই নয় কি? কিন্তু বুঝতে পারছ, বুঝতে পারছ কি, তোমরা বুঝতে পারছ কি এই পরিচ্ছন্নতার অর্থ? তোমরা বুঝতে পারছ কি যে লুজিনের পরিচ্ছন্নতা ওই সোনিয়ার মতোই—এমনকি হয়ত বা তার চেয়েও খারাপ, আরও ইতর আরও হীন প্রকৃতির? তার কারণ এই যে তুই দুনিয়া হিসাব করছিস বাড়তি সুখস্বাচ্ছন্দ্য কিন্তু ওর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা স্রেফ অনাহারে মৃত্যু থেকে বাঁচার তাগিদ। 'বড় বেশি দাম, বড় বেশি দাম রে তোর এই পরিচ্ছন্নতার!' কিন্তু পরে যদি শক্তিতে না কুলোয় তখন কি অনুশোচনা করবি? কত শোক, কত দুঃখ, কত অভিশাপ, সকলের কাছ থেকে লুকানো চোখের জলই বা কত! কেননা তুই তো আর মার্ফা পেত্রোভ্না নোস! মা'র কী দশা হবে তাহলে? এমনকি এখনই অস্থির হয়ে পড়েছে, কষ্ট পাচ্ছে; কিন্তু যখন সব পরিষ্কার দেখতে পাবে তখন কী হবে? আর আমার অবস্থাটা?...'আচ্ছা আমাকে আসলে তোমরা কী মনে কর বল তো? তোমাদের ওই আত্মত্যাগ আমি চাইনে, না দুনিয়া, না মা, এ আমি চাই নে! আমি বেঁচে থাকতে তা হবার নয়, হবে না, হবে না! আমি মানছি না!'

হঠাৎ তার সংবিৎ ফিরে এলো। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'হবার নয় বলছ? কিন্তু যাতে না হয় তার জন্য তুমি কী করবে? নিষেধ করবে? কোন্ অধিকারে? ওই অধিকার পাবার জন্য তোমার দিক থেকে কী প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দিতে পার? নিজের সমস্ত জীবন, সমস্ত ভবিষ্যৎ তাদের জন্য উৎসর্গ করবে *পড়াশুনো শেষ করে একটা চাকরি জোটানোর পর?* ওসব আমরা শুনেছি, যতসব ফাঁকা বুলি। কিন্তু এখন? এখন কী হবে? এক্ষেত্রে দরকার এক্ষুনি এই মুহূর্তে কিছু

একটা করা—বুঝতে পারছ কি? কিন্তু তুমি এখন কী করছ? ওদেরই তো দোহন করছ। টাকা বলতে তো ওদের আছে একশ রুবল পেনশন থেকে অগ্রিম, তাও আবার স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌দের কাছে বন্ধক দিয়ে পাওয়া! ওই স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌দের কবল থেকে, আফানাসি ইভানভিচ্‌ ভাখ্রুশিনের কবল থেকে কী করে ওদের বাঁচাবে হে ভাবী কোটিপতি, ওদের ভাগ্যনিয়ন্তা দেবরাজ জুপিটার? দশ বছর পরে, তাই তো? আরে দশ বছরের মধ্যে তো মা অন্ধ হয়ে যাবেন শাল বুনতে-বুনতে, হয়ত বা চোখের জল ফেলতে-ফেলতেই; উপোস করতে-করতে শুকিয়ে মারা যাবেন। আর বোন? একবার কল্পনা করে দেখ না দশ বছর পরে অথবা এই দশ বছরের মধ্যে কী দশা হতে পারে তার? আন্দাজ করতে পারলে?'

এসব কথা মনে-মনে আন্দোলন করতে গিয়ে কষ্ট পেল। নিজেকেই অতিষ্ঠ করে তুলল প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে। কেমন যেন একটা তৃপ্তিও পাচ্ছিল তাতে। প্রসঙ্গত, প্রশ্নগুলোর কোনটাই তার কাছে নতুন ছিল না, আকস্মিক ছিল না— সবই পুরানো, বেদনাদায়ক, অনেক দিনের। তাকে যন্ত্রণা দিতে শুরু করেছিল বহুকাল হল, যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে তার বুকের ভেতরটা। সেই কোনকালে তার বুকের ভেতরে বাসা বেঁধেছিল এখনকার এই সমস্ত আর্তি, তখন থেকে বাড়তে-বাড়তে বিপুল পরিমাণে জমে উঠেছে, সম্প্রতি পরিপূর্ণতা লাভ করে ঘনীভূত হয়ে ভয়াবহ, দানবীয়, বিকট এক প্রশ্নের আকার নিয়ে তার বুকের ভেতরে, মস্তিষ্কের ভেতরে পীড়া দিচ্ছে, জরুরি সমাধান দাবি করছে। এখন মার চিঠি বজ্রাঘাতের মতো হঠাৎ তাকে আঘাত করল। এটা পরিষ্কার যে এখন মন-মরা হয়ে থাকলে চলবে না, এসব প্রশ্নের কোন সমাধান নেই একমাত্র এই ভেবে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থেকে কষ্ট ভোগ করলে চলবে না। কিছু একটা করতে হয়—অবশ্যই করতে হয়, এই মুহূর্তে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। যে করেই হোক, মন স্থির করতে হবে, অন্তত কোন একটা মীমাংসায় আসতেই হবে নয়ত....

'নয়ত জীবনের মায়া ত্যাগ করতে হয় চিরকালের জন্য!' ক্ষোভে হঠাৎ ফেটে পড়ল সে। অদৃষ্ট যেমন আছে তেমনি তাকে মেনে নেওয়া, বিনা প্রতিবাদে চিরকালের জন্য মেনে নিয়ে নিজের ভেতরকার সমস্ত কিছুকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলা! কিছু করার, বাঁচার, ভালোবাসার অধিকার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা।

'বুঝতে পারছেন, আপনি কি বুঝতে পারছেন মাননীয় মহাশয়, যখন আর কোথাও যাবার থাকে না, তার অর্থ কী হতে পারে?' হঠাৎ মনে পড়ে গেল মার্মেলাদভের গতকালের প্রশ্ন। 'কেন না যে কোন মানুষের অন্তত কোথাও না কোথাও যাবার মতো জায়গা থাকা চাই!...'

হঠাৎ সে চমকে উঠল— গতকালেরই আরও একটি চিন্তা আবার খেলে গেল তার মাথায়। চিন্তাটা মাথায় খেলে গেল বলে যে সে চমকে উঠল তা নয়। তার

জানাই ছিল, সে *আগে থাকতে উপলব্ধি করতে পারছিল* যে চিন্তাটা অবশ্যই 'মাথায় খেলবে'। এর জন্য সে অপেক্ষাও করছিল। চিন্তাটা যে গতকালের, ঠিক তাও বলা যায় না। তবে মাসখানেক আগে, এমনকি গতকাল পর্যন্ত সেটা ছিল স্বপ্নমাত্র, কিন্তু এখন ...এখন হঠাৎ দেখা যাচ্ছে ঠিক স্বপ্ন নয়—তার কাছে প্রকাশ পাচ্ছে এক নতুন রূপে, ভয়ঙ্কর রূপে। সে রূপটা যে তার একেবারে পরিচিত নয়, নিজে হঠাৎ হৃদয়ঙ্গম করল।...তার মাথা ঘুরে গেল, চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল সে।

আশেপাশে দ্রুত নজর বুলিয়ে কিছু একটা খুঁজতে লাগল। ইচ্ছে হচ্ছিল কোথাও গিয়ে বসে, তাই বেঞ্চের সন্ধান করছিল। সেই সময় বুলভার ধরেই যাচ্ছিল সে। সামনে, শ'খানেক পা দূরে একটা বেঞ্চ চোখে পড়ল। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পা চালাল সেদিকে। কিন্তু পথে ছোটোখাটো একটা ঘটনা কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মনোযোগ আকর্ষণ করল।

বেঞ্চের খোঁজে যখন সে দৃষ্টিপাত করছিল তখন লক্ষ করছিল তার সামনে বিশ পা মতন তফাতে এক মহিলা হেঁটে চলেছে। এ পর্যন্ত আরও যেসব বস্তু তার সামনে পড়েছে সেগুলোর মতোই এদিকেও গোড়ায় সে কোন মনোযোগ দেয়নি। বলতে গেলে বহুবার এমনও হয়েছে যে কোন্ রাস্তা ধরে যাচ্ছে আদৌ খেয়াল না করেও সে ঠিক বাড়ি পৌঁছে গেছে। এভাবে পথ চলতে সে অভ্যস্তও হয়ে গেছে। কিন্তু যে মহিলাটি হেঁটে যাচ্ছিল তার মধ্যে অদ্ভুত এমন একটা কিছু ছিল যা প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে পড়ারি মতো। রাস্‌কোলনিকভের মনোযোগ, অল্প অল্প করে তার দিকে আকৃষ্ট হতে লাগল। প্রথম-প্রথম মনোযোগের মধ্যে ছিল খানিকটা অনিচ্ছা—কতকটা যেন বিরক্তিও। কিন্তু পরে আকর্ষণ ক্রমেই বেড়ে চলল। তার জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল এই মহিলাটির মধ্যে কী এমন আছে যাতে তাকে অদ্ভুত মনে হচ্ছে। প্রথমত, বয়স সম্ভবত খুব কম, নেহাত বালিকা। এই পোড়া গরমে হাঁটছে খালি মাথায়, মাথায় ছাতা নেই, হাতে দস্তানা নেই। হাঁটছেও অদ্ভুতভাবে দু-হাত দোলাতে-দোলাতে। পরনে পাতলা রেশমি কাপড়ের পোশাক, কিন্তু সেটা পরার ভঙ্গিও খুব অদ্ভুত। কোনরকমে বোতাম লাগানো; পেছনে কোমরের কাছটায়, স্কার্টের একেবারে শুরুতে— ছেঁড়া, পুরো একটা চিলতে ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়েছে, আলগা হয়ে ঝুলছে। গলার কাছটা খালি, সেখানে ফেলা আছে একটা ছোট্ট স্কার্ফ—তাও বেরিয়ে আছে কেমন যেন বাঁকা হয়ে, এক পাশে। সর্বোপরি মেয়েটি চলেছে স্খলিত চরণে, হোঁচট খেতে-খেতে এমনকি এদিক-ওদিক টলতে-টলতে। দৃশ্যটি শেষপর্যন্ত রাস্‌কোল্‌নিকভের একাগ্র ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলল। বেঞ্চের একেবারে কাছাকাছি এসে মেয়েটির নাগাল সে ধরে ফেলল। বেঞ্চ পর্যন্ত গিয়ে মেয়েটি বেঞ্চের ধারে ধপ্ করে বসে পড়ে গা এলিয়ে দিল। এক ঝটকায় মাথাটা বেঞ্চের পিঠে ঠেকিয়ে চোখ বুজল—সম্ভবত অতিরিক্ত ক্লান্তিবশত। ভালোমতো নিরীক্ষণ করার পর রাস্‌কোলনিকভের বুঝতে বাকি রইল না যে মেয়েটা

মদের নেশায় বেহুঁশ হয়ে আছে। এমন অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাকিয়ে দেখা যায় না। রাস্‌কোলনিকভের এমনও মনে হল যে সে হয়ত ভুল করছে। সামনের এই মুখটা একেবারে কচি দেখে মনে হয় বয়স ষোল, এমনকি মাত্র পনেরোও হতে পারে—মুখের আদলটি ছোট্ট, দেখতে ভালো। উত্তেজনায় জ্বলছে, একটু যেন ফোলা। মাথার চুল হালকা রঙের। সম্ভবত নিজের অবস্থা সম্পর্কে তেমন সচেতন নয় মেয়েটি। পায়ের ওপর পা তুলে এমন ভাবে বসেছে যে প্রকাশের ভঙ্গিটা শালীনতার মাত্রা বেশ খানিকটা ছাড়িয়ে যায়। সব লক্ষণ দেখে এটাই অনুমান করা যেতে পারে যে সে যে এখন রাস্তায় এ বোধও তার নেই।

রাস্‌কোলনিকভ বসল না, তবে সরে পড়ার ইচ্ছেও তার ছিল না। চুপচাপ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটির সামনে। এই বুলভারটা অমনিতেই সর্বদা নির্জন, তার ওপর এখন বেলা প্রায় দুটো, প্রচণ্ড গরম—তাই ক্বচিৎ কাউকে চোখে পড়ে। তা সত্ত্বেও একপাশে, পনেরো পা মতন দূরে, বুলভারের কিনারায় এক ভদ্রলোককে চলতে-চলতে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখা গেল! দেখেশুনে মনে হচ্ছিল বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে মেয়েটির কাছে ঘেঁষার খুব ইচ্ছে তার। সম্ভবত মেয়েটিকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে তার নাগাল ধরার চেষ্টা করছিল, কিন্তু রাস্‌কোলনিকভ তাতে বাদ সেধেছে। তাই ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল রাস্‌কোলনিকভের দিকে —যদিও সেটা যাতে রাস্‌কোলনিকভের নজরে না পড়ে সে ব্যাপারে তার চেষ্টার ত্রুটি দেখা গেল না। এই বিরক্তিকর লোচ্চাটা কখন দূর হবে এই ভেবে ভদ্রলোক অধৈর্য হয়ে নিজের পালা কখন আসবে সেই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। তার উদ্দেশ্য পরিষ্কার। বয়স বছর তিরিশেক। হৃষ্টপুষ্ট, মেদবহুল চেহারা, গায়ের রং দুধে আলতা মেশানো। ঠোঁটের রং গোলাপি, ছোট্ট একজোড়া গোঁফ আছে। জামাকাপড় রীতিমতো কেতাদুরস্ত। রাস্‌কোলনিকভ ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এই মেদস্ফীত নাগরটিকে অপমান করার একটা তাগিদ হঠাৎ সে ভেতরে-ভেতরে অনুভব করল। মুহূর্তের জন্য মেয়েটিকে ছেড়ে এগিয়ে গেল তার দিকে।

"ওরে স্‌ভিদ্রিগাইলভের জাতভাই! এখানে কী মনে করে?" হাতের মুঠো পাকিয়ে সে গলা চড়িয়ে বলল। রাগে তার ঠোঁটের দুপাশে ফেনা উঠতে শুরু করেছিল। সেই অবস্থাতে মুখে ফুটে উঠল বাঁকা হাসি।

"মানে? এর মানে কী?" ভুরু কুঁচকে, রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে লোকটা উলটে ধমকে উঠল।

"বলছিলাম কি, এক্‌খুনি এখান থেকে কেটে পড়ুন!"

"তবে রে ইতর, তোর এত বড় আস্পর্ধা!...'

এই বলে হাতের ছড়িটা ঘোরাল সে। রাস্‌কোলনিকভ দুই হাতে ঘুষি পাকিয়ে তেড়ে গেল তার দিকে—এক মুহূর্তের জন্যও ভেবে দেখল না যে, হৃষ্টপুষ্ট লোকটি

অনায়াসে ওর মতো দুজন লোকের মহড়া দিতে পারে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন থেকে কে একজন ওকে শক্ত করে চেপে ধরল। ওদের দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে এক পুলিস কনস্টেবল।

"অনেক হয়েছে মশাই, প্রকাশ্যে মারামারি করার নিয়ম নেই। আপনাদের কী চাই বলুন তো? আপনি কে?" রাস্‌কোল্‌নিকভের শতচ্ছিন্ন জামাকাপড়ের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শেষ কথাগুলো ধমকের সুরে তাকেই জিগ্‌গেস করল।

রাস্‌কোলনিকভ মনোযোগ দিয়ে তাকে দেখল। ডাকাবুকো চেহারার লোক, মনে হয় এককালে সেনাবাহিনীতে ছিল। দাড়িতে ও জুলপিতে পাক ধরেছে, বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি। "আপনাকেই তো চাইছিলাম আমি মনে-মনে," তার হাত ধরে সোল্লাসে চেঁচিয়ে বলল রাস্‌কোলনিকভ। "আমি রাস্‌কোলনিকভ...ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলাম।...আপনিও জেনে রাখুন," ভদ্রলোকের দিকে ফিরে সে বলল। "এবারে আসুন দেখি, এদিকে আসুন, দেখে যান একটা জিনিস।..."

এই বলে কনস্টেবলের হাত ধরে টানতে-টানতে সে নিয়ে গেল বেঞ্চের কাছে।

"এই যে তাকিয়ে দেখুন। বদ্ধ মাতাল। এইমাত্র যাচ্ছিল বুলভার দিয়ে। কোথা থেকে উঠে এসেছে কে জানে, তবে দেখে লাইনের মেয়ে বলে মনে হয় না। খুব সম্ভব কোথাও কেউ বেশি করে খাইয়ে মাতাল করে দিয়েছে, ফুসলে বার করে এনেছে এই প্রথমবার—বুঝতে পারছেন কি? তারপর রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছে। চেয়ে দেখুন, কী রকম ছেঁড়াখোঁড়া ওর জামাকাপড়। চেয়ে দেখুন, কী ভাবে পরা : দেখলেই বুঝতে পারবেন ও নিজে পরেনি, কেউ পরিয়ে দিয়েছে; আর পরিয়েছেও আনাড়ি হাতে, কোন পুরুষ মানুষ। এটা চোখে না পড়ে যায় না। এবারে দেখুন এদিকে : এই ফুলবাবু লোকটি— যার সঙ্গে আমার এইমাত্র হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল— আমার অপরিচিত, এই প্রথম দেখছি ওঁকে। কিন্তু উনিও লক্ষ করেছিলেন মেয়েটিকে এই এখুনি, রাস্তা দিয়ে যাবার সময়; বুঝতে পেরেছিলেন নেশার ঘোরে আছে, নিজের বশে নেই! ওঁর এখন বড় সাধ মেয়েটির কাছে ঘেঁষার, তার এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাকে পাকড়াও করে কোথাও নিয়ে যাবার—আমার নিশ্চিত ধারণা ব্যাপারটা আসলে তাই। বিশ্বাস করুন আমাকে, আমার ভুল হয়নি। আমি স্বচক্ষে দেখেছি উনি ওর ওপর নজর রাখছিলেন— ওর গতিবিধি লক্ষ করছিলেন। কিন্তু বাদ সাধলাম আমি— এখন তাই অপেক্ষা— কখন আমি সরে পড়ি। দেখুন! এখন একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ভাবটা এমন যেন সিগারেট পাকাচ্ছেন। ...কী ভাবে থামানো যায় লোকটাকে, বলুন তো? আমরা কি কোনভাবে মেয়েটাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারি না? ভেবে দেখুন!"

কনস্টেবলটি মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি আঁচ করে নিল, তার বুঝতে বাকি রইল না ব্যাপারটা। স্থূলকায় ভদ্রলোকটির ভূমিকা অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু মেয়েটার কথা

ভাবতে হয়। বেশ কাছ থেকে নিরীক্ষণ করার উদ্দেশ্যে সেপাই ঝুঁকে পড়ল মেয়েটার ওপর, সঙ্গে-সঙ্গে তার চোখেমুখে ফুটে উঠল আন্তরিক সমবেদনার চিহ্ন।

"ইস্, কী দুঃখের কথা!" মাথা নেড়ে সে বলল। একেবারে বাচ্চা মেয়ে দেখছি। কেউ ফুসলিয়ে বের করে নিয়ে এসেছে কোন সন্দেহ নেই। এবারে মেয়েটিকে ডেকে সে বলল, "এই যে বোনটি, শুনছেন, আপনার বাড়ি কোথায়?" মেয়েটি চোখ খুলল। ক্লান্ত ঘোলাটে দৃষ্টিতে ফ্যাল-ফ্যাল করে প্রশ্নকর্তাদের দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারায় তাদের সরে যেতে বলল।

রাস্‌কোলনিকভ বলল, "শুনুন!...এই যে.." পকেট হাতড়াতে-হাতড়াতে খুঁজেপেতে বিশ কোপেক বার করে বলল, "এই যে, একটা ছেকড়া গাড়ি ভাড়া নিয়ে গাড়োয়ানকে বলে দিন মেয়েটাকে ওর ঠিকানায় পৌঁছে দিতে। এখন ওর ঠিকানাটা আমাদের জানতে পারলেই হয়!"

"দিদিমণি, ও দিদিমণি!" কনস্টেবল পয়সাটা নিয়ে আবার ডাকাডাকি শুরু করল। "আমি এখুনি একটা গাড়ি ভাড়া নিচ্ছি, নিজে আপনাকে ঘরে পৌঁছে দেবো। কিন্তু কোথায় নিয়ে যেতে হবে বলবেন তো? কোথায় আপনার ঘর?"

"য্-যাও বলছি।...জ্..জ্বালিও না!" বিড়বিড় করে বলে আবার হাত নেড়ে ইশারায় সরে যেতে বলল।

"ইশ্ দেখ দেখি! ভালো নয়, মোটে ভালো নয়! ছিঃ বড় লজ্জার কথা, দিদিমণি! বড় লজ্জার কথা!" আবার সে মাথা নাড়ল—লজ্জা, করুণা ও বিতৃষ্ণা প্রকাশের ভঙ্গিতে। তারপর রাস্‌কোলনিকভের দিকে ফিরে বলল, "কী ফেসাদেই না পড়া গেল!" সঙ্গে-সঙ্গে একনজরে আরও একবার তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল। রাস্‌কোল্‌নিকভকে নির্ঘাত তার অদ্ভুত মনে হচ্ছিল : নিজের পোশাকের তো ওই ছিরি—আবার কিনা অন্যকে টাকা দিচ্ছে।

আপনি একে এখান থেকে কতদূরে দেখতে পেয়েছিলেন? কনস্টেবল জিগ্‌গেস করল রাস্‌কোলনিকভকে।

"বললাম তো আপনাকে—আমার আগে-আগে যাচ্ছিল টলতে-টলতে এই বুলভার দিয়েই। কোনমতে বেঞ্চে পৌঁছেই গা এলিয়ে দিল।"

"ছি ছি, কী লজ্জার কথা! দুনিয়ায় হালচাল কী হয়ে দাঁড়িয়েছে মশাই। এই কাঁচা বয়স—অথচ এখনই এরকম পাঁড় মাতাল। কেউ ফুসলিয়ে এনে এই অবস্থায় ফেলেছে কোন সন্দেহ নেই! দেখুন না পোশাকটাও কেমন ছেঁড়া!...ইশ্, কী অনাচারই আজকাল চলছে! সম্ভবত ভালো ঘরের মেয়ে, হয়ত দুঃস্থ হবে...ইদানীং এরকম হামেশা দেখা যাচ্ছে। দেখেশুনে তো মনে হয় নরম স্বভাবের, ভদ্রঘরের মেয়ে বলতে যা বোঝায়..." বলতে-বলতে আবার ঝুঁকে পড়ল মেয়েটির ওপর।

হয়ত ওর নিজের পরিবারেই মানুষ হচ্ছে ওই বয়সের মেয়ে—নরম স্বভাবের,

ভদ্রঘরের মেয়ে বলতে যা বোঝায়। তাদেরও ভাবভঙ্গি হয়ত শিক্ষিত মনের পরিচায়ক এবং তারাও হয়ত সবরকম আধুনিক ফ্যাশন অনুকরণ করে।

রাস্‌কোলনিকভ্ উদ্বেগ প্রকাশ করে বলল, "সবচেয়ে বড় কথা, এই ইতরটার খপ্পরে যেন না পড়ে! তাহলে আর দেখতে হবে না—আরও একবার মেয়েটার ইজ্জত নষ্ট হবে! স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ওর মতলবটা কী! ওঃ দেখ কাণ্ড, বদমাশটা কিছুতেই নড়ছে না!"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ কথাগুলো বলছিল জোরে-জোরে, সরাসরি হাত দিয়ে লোকটাকে দেখিয়ে। কানে যেতে লোকটা আবার মেজাজ দেখানোর উপক্রম করছিল, কিন্তু কী যেন ভেবে শুধুই অবজ্ঞাভরা দৃষ্টির মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখল। তারপর ধীরে ধীরে আরও দশ পা মতন দূরে সরে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল।

"খপ্পরে যাতে না পড়ে সে ব্যবস্থা তো করাই যেতে পারে", চিন্তিতভাবে পুলিস কনস্টেবল উত্তরে বলল। "যদি জানা যেত কোথায় ওঁকে নিয়ে যেতে হবে, নইলে...দিদিমণি, ও দিদিমণি!" বলতে-বলতে আবার সে ঝুঁকে পড়ল।

মেয়েটি এবারে হঠাৎ দুচোখ মেলে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে দেখল। দেখে মনে হল যেন বুঝতে পেরেছে কিছু একটা। সঙ্গে-সঙ্গে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটা দিল উলটো পথে—যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকে।

"উঃ কি বেহায়া লোকজন! আঠার মতো লেগে রয়েছে!" বলতে-বলতে আরও একবার হাত নাড়া দিল। দ্রুত চলতে লাগল সে, কিন্তু আগের মতোই ভীষণ টলতে-টলতে। ফুলবাবুটিও তার ওপরে স্থির নজর রাখতে-রাখতে তাকে অনুসরণ করল—তবে আরেকটা সরু পথ ধরে।

"চিন্তা করবেন না, আমি ছাড়ছি না", গোঁফওয়ালা কনস্টেবলটি দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে এই কথা বলে ওদের দুজনকে অনুসরণ করল। "ছি ছি কী অনাচারই না শুরু হয়ে গেছে আজকাল!" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে আরও একবার জোরে-জোরে বলে উঠল।

সেই মুহূর্তে রাস্‌কোলনিকভ্ যেন হুলের খোঁচা খেল। মুহূর্তের মধ্যে তার ভেতরে সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেল।

"এই যে শুনুন!" গোঁফওয়ালাকে সে পেছন থেকে চেঁচিয়ে ডাকল।

গোঁফওয়ালা ফিরে তাকাল।

"ছেড়ে দিন! আপনার কী? বাদ দিন!" আঙুলের ইশারায় ফুলবাবুটিকে দেখিয়ে বলল, "মজা লুটতে দিন। আপনার মাথাব্যথা কিসের?"

কনস্টেবল বুঝতে না পেরে চোখ বড়-বড় করে তাকাল তার দিকে। রাস্‌কোলনিকভ্ হো হো করে হেসে উঠল।

"নাও ঠ্যালা!" তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে ফুলবাবুটি ও মেয়েটির পেছন পেছন চলতে লাগল সেপাই। রাস্‌কোলনিকভ্‌কে সে সম্ভবত বাতুল বা তার চেয়েও

খারাপ কিছু বলে ধরে নিয়েছে।

"আমার বিশটা কোপেক গচ্চা গেল!" ওরা চলে যাবার পর রাগে গরগর করতে-করতে রাস্‌কোলনিকভ আপন মনে বলে উঠল।" "নিক গে, ব্যাটাচ্ছেলে ওই লোকটার কাছ থেকেও কিছু নিয়ে মেয়েটিকে ওর হাতে ছেড়ে দিক—ওখানেই ঘটনার ইতি।... কেন যে আমি সাহায্য করতে গিয়েছিলাম! সাহায্য করার আমি কে? সাহায্য করার অধিকার আমার আছে কি? মরুক গে, ওরা খেয়োখেয়ি করে মরুক আমার তাতে কী? তাছাড়া কোন সাহসে আমি বিশ কোপেক দিয়ে দিলাম? ওগুলো কি আমার ছিল?"

এই অদ্ভুত কথাগুলো সত্ত্বেও তার মনটা বেশ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। ছেড়ে যাওয়া বেঞ্চটার এক কোনায় সে বসে পড়ল। এলোমেলো ভাবনাচিন্তা পেয়ে বসল তাকে।...মোট কথা নির্দিষ্ট কোন একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করা এই মুহূর্তে তার পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠল। তার ইচ্ছে হচ্ছিল একেবারে আত্মবিস্মৃত হয়ে সবকিছু ভুলে থাকে, পরে জেগে উঠে সব নতুনভাবে শুরু করে।

"বেচারি মেয়েটা!" বেঞ্চটার খালি কোনার ওপর দৃষ্টিপাত করে সে বলল। "হুঁশ ফিরে পাবার পর খানিকটা কান্নাকাটি করবে, পরে মা জানতে পারবে।...প্রথমে কয়েক ঘা লাগাবে, পরে চাবকে সর্বাঙ্গ ব্যথায় জর্জরিত করে দেবে, অপমানের বোঝা মাথায় চাপিয়ে সম্ভবত বাড়ি থেকে দূর করে দেবে। তা যদি নাও করে, কোনও দারিয়া ফ্রান্‌ৎসোভ্‌না ঠিক গন্ধ পেয়ে যাবে, তখন বেচারি মেয়েটির এখানে-ওখানে ভেসে-ভেসে বেড়ানো ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। অতঃপর গতি হবে হাসপাতালে— যেমন সবসময় ঘটে থাকে সেইসব মেয়েদের বেলায়, যারা বাড়িতে সচ্চরিত্রের মায়েদের সঙ্গে থেকে তাদের অগোচরে তলেতলে নষ্টামি করে বেড়ায়। তারপর...তারপর আবার হাসপাতাল...মদ...শুঁড়িখানা...আবারও হাসপাতাল।...দুতিন বছরের মধ্যে পঙ্গু, অথর্ব। সবসুদ্ধ আঠারো-উনিশ বছরের জীবনের এই হল মোট যোগফল। এদের কি আর আমি দেখিনি? কীভাবে তাদের এই গতি হয়? কীভাবে আবার?—সকলের মতো ওই একই ভাবে।...ছি! যাক গে, যা হবার তাই হোক! লোকে বলে, অমনই নাকি হওয়া উচিত। বলে, প্রতিবছর শতকরা অত অত ভাগকে যেতে হয় ওই পথে... কোথাও... গোল্লায়, সম্ভবত অন্যদের জিইয়ে রাখার জন্য, তাদের কিছু না ঘটানোর জন্য। শতকরা হিসাব! আহা, চমৎকার ওদের এই কথাগুলো! মনে কি সান্ত্বনাই না দেয়। আর কি বিজ্ঞানসম্মত! একবার যেই বলা হল 'শতকরা হিসাবে' তারপর চিন্তার আর কী কারণ থাকতে পারে? হ্যাঁ অন্য কোন শব্দ যদি হত তাহলে হয়ত...সম্ভবত ...চিন্তার খানিকটা কারণ থাকলেও থাকতে পারত। ...আচ্ছা এমন যদি হয়...যদি আমাদের দুনিয়াও ওই শতকরা হিসাবের মধ্যে পড়ে যায়। এটাতে না হোক, যদি ওই শতকরাদের অন্য কোন ভাগে পড়ে?.."

"কিন্তু আমি চলেছি কোথায়?" হঠাৎ তার চমক ভাঙল। "কী অদ্ভুত! কিসের জন্য না আমি যাচ্ছিলাম! চিঠিটা পড়ে শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গে আমি যাত্রা করলাম...ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপে, রাজুমিখিনের কাছে যাচ্ছিলাম।...হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে... কোথায়। কিন্তু কেন? কী কাজে? রাজুমিখিনের কাছে যাবার চিন্তাটা কেন আমার মাথায় খেলল—ঠিক এই মুহূর্তে? আশ্চর্য, বড় আশ্চর্য!"

নিজের কথা ভেবে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিল সে। রাজুমিখিন তার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহপাঠীদের একজন। লক্ষ করার বিষয় এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় রাস্‌কোল্‌নিকভের প্রায় কোন বন্ধুবান্ধব ছিল না, সকলকে সে এড়িয়ে চলত, কারও কাছে যেত না, কেউ তার কাছে এলে তাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করত না। তবে দেখতে-দেখতে তার কাছ থেকেও সকলে মুখ ফিরিয়ে নিল। ছাত্রদের সাধারণ সভাসমিতিতে, আলাপ-আলোচনায়, আমোদ-প্রমোদে— কোথাও সে যোগ দিত না। পড়াশুনো সে করত খুব যত্ন নিয়ে, নিজেকে এতটুকু অব্যাহতি না দিয়ে— যে কারণে শ্রদ্ধা সে পেত। কিন্তু ভালো তাকে কেউ বাসত না। সে ছিল হতদরিদ্র, কিন্তু বড় বেশি দাম্ভিক আর চাপা স্বভাবের। তাকে দেখে মনে হত নিজের সম্পর্কে কিছু একটা গোপন রাখছে। কোন-কোন সহপাঠীর কাছে মনে হত সে যেন তাদের তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে, মনে করে তারা নেহাত বালখিল্য, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে, বিদ্যাবত্তায়, বোধে সে তাদের সকলকে ছাড়িয়ে গেছে এবং তাদের বোধবুদ্ধি ও আগ্রহকে সে নিকৃষ্টস্তরের বলে মনে করে।

তবে রাজুমিখিনের সঙ্গে কেন যেন তার ভাব হয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ ভাব যদি নাও বলা যায়, তার সঙ্গে অনেক বেশি খোলাখুলি, অকপট কথাবার্তা চলত। অবশ্য রাজুমিখিনের সঙ্গে অন্য কোনও ধরনের সম্পর্কও সম্ভব ছিল না। রাজুমিখিন দারুণ মিশুকে আর হুল্লোড়বাজ ছোকরা, এত ভালোমানুষ যে অনেক সময় বড় সরল মনে হয়। এই সারল্যের আড়ালে অবশ্য সে ঢেকে রাখত তার মনের গভীরতা, আত্মসম্মানবোধ। তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা এটা বুঝতে পারত, এই গুণের জন্য তাকে সকলে ভালোবাসত। বোকা সে মোটে ছিল না, যদিও সময়-সময় তাকে বাস্তবিক বড় বেশি সরল মনে হত। তার চেহারায় বৈশিষ্ট্য ছিল—লম্বা, ছিপছিপে, মাথার চুল কালো, গোঁফদাড়ি কস্মিনকালে ভালোমতো কামাত না সে। কখন-কখন সে দুর্দান্ত হয়ে পড়ত, আসুরিক শক্তির অধিকারী বলে তার খ্যাতিও ছিল। একবার রাতে দলে পড়ে হৈ-হল্লা করার সময় আইন-শৃঙ্খলার রক্ষক জনৈক সাড়ে ছয় ফুট দীর্ঘদেহীকে সে এক ঘুষিতে ধরাশায়ী করেছিল। /পান সে করতে পারত সীমাহীন। আবার একবোরে পান না করেও থাকতে পারত। তার কৌতুক সময়-সময় স্বাভাবিকতার মাত্রা ছাড়িয়ে যেত, আবার তেমন মনে হলে কৌতুকের ধারেকাছেও সে যেত না। রাজুমিখিনের আরও একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, কোন

ব্যর্থতায় সে কখনও মুষড়ে পড়ত না। তাকে দেখে মনে হত কোন কঠিন পরিস্থিতির চাপে সে কখনও ভেঙে পড়ে না। দরকার হলে খোলা ছাদে সে আস্তানা গেড়ে থাকতে পারত, নারকীয় ক্ষুধাযন্ত্রণা এবং প্রচণ্ড ঠাণ্ডাও সহ্য করতে পারত। সে ছিল খুবই গরিব। দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে নিজে একার চেষ্টায়, টুকটাক কাজ করে অর্থ উপার্জন করে নিজের খরচ চালাত। এ ধরনের কাজের এবং বলাই বাহুল্য, অর্থ উপার্জনের অসংখ্য সূত্র তার জানা ছিল। একবার সারা শীতকাল সে তার ঘর গরমের জন্য জ্বালানি ব্যবহার করেনি, এমনকি জাঁক করে বলেও বেড়ায় যে ব্যাপারটা বরং উপভোগ্য, কেননা ঠাণ্ডায় ভালো ঘুম হয়। বর্তমানে সেও আপাতত বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে, তবে খুব বেশি দিনের জন্য নয়। ভবিষ্যতে যাতে পড়াশুনা চালিয়ে নেওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে দ্রুত অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য সে উঠেপড়ে লেগেছে। গত মাস চারেকের মধ্যে তার কাছে রাস্‌কোলনিকভের যাওয়া হয়নি। রাস্‌কোলনিকভের বাসা কোথায় তাও জানত না রাজুমিখিন। মাস দুয়েক আগে একবার রাস্তায় ওদের দেখা হতে-হতে হয়নি— রাস্‌কোলনিকভ মুখ ঘুরিয়ে নেয়, এমনকি ওর নজর এড়ানোর জন্য রাস্তা পার হয়ে উলটো দিকে সরে যায়। রাজুমিখিন দেখতে পেলেও পাশ কাটিয়ে চলে যায়। বন্ধুকে বিব্রত বা বিরক্ত করার ইচ্ছে তার ছিল না।

পাঁচ

'সত্যিই তো এই কিছুদিন আগেও আমি বলেছিলাম রাজুমিখিনকে বলব আমার জন্য টুইশান বা ওই গোছের কোন একটা কাজ জোগাড় করে দিতে..' রাস্‌কোলনিকভ্ মনে করে দেখল। 'কিন্তু এখন ও আমাকে সাহায্য করবে কী ভাবে? ধরে নিলাম টুইশান জোগাড় করে দিল এমনকি ধরে নিলাম, নিজের শেষ কপর্দকের ভাগও দিল—অবশ্য যদি ওর সেরকম অবস্থা থাকে, হয়ত দিল এই উদ্দেশ্যে যাতে আমি পড়াতে যাবার উপযুক্ত একজোড়া বুটজুতো কিনতে পারি, জামাকাপড় ভদ্রস্থ করে তুলতে পারি। ...হুম্...কিন্তু তারপর? ওই সামান্য কয়েকটা কোপেক দিয়ে কী হবে আমার? আমার এখন যা দরকার সেটা কি এই? আমি যে সত্যি-সত্যি রাজুমিখিনের কাছে যাচ্ছিলাম, এটা হাস্যকর।..'

কেন যে এখন রাজুমিখিনের কাছে যাচ্ছিল এই প্রশ্নটি রাস্‌কোলনিকভের নিজের কাছে যেমন মনে হয়েছিল, তার চেয়েও যেন বেশি উতলা করে তুলল তাকে। যেটাকে আপাতদৃষ্টিতে অতি সাধারণ ব্যাপার বলে মনে হতে পারে তারই মধ্যে সে নিজের পক্ষে অশুভ কিছু একটা লক্ষণ খুঁজে বার করার জন্য ছটফট করতে লাগল।

'তাহলে কি আমি পুরো ব্যাপারটা একমাত্র রাজুমিখিনের মারফত শোধরাতে চাইছিলাম? সবকিছুর মীমাংসা খুঁজে পেয়েছিলাম রাজুমিখিনের মধ্যে?' আশ্চর্য হয়ে

সে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করল।

ভাবতে-ভাবতে সে কপাল রগড়াল। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে যেন অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ থাকার পর অনেকটা আচম্বিতে, হঠাৎ প্রায় আপনা-আপনি তার মাথায় এসে গেছে রীতিমতো উদ্ভট একটা চিন্তা।

'হুম... রাজুমিখিন', এমন শান্তভাবে হঠাৎ সে বলে উঠল যেন কোন স্থির সিদ্ধান্তে এসে গেছে। 'তা রাজুমিখিনের কাছে আমি যাব, অবশ্যই যাব।... তবে...এখন নয়। আমি ওর কাছে যাব... অন্য কোনদিন, যাব *ওর* পর, ওটা একেবারে চুকেবুকে গেলে। যখন সবকিছু শুরু হবে নতুন করে তখন...'

তারপর হঠাৎ সে তার স্বাভাবিক বোধশক্তি ফিরে পেল। ঝট করে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে আর্তস্বরে বলে উঠল '*ওর* পর? *ওটা* কি ঘটবে? সত্যি-সত্যিই ঘটবে কি?'

বেঞ্চ ছেড়ে সে এগিয়ে চলল প্রায় ছুটতে-ছুটতে। তার ইচ্ছে হচ্ছিল পেছন ফিরে বাড়ি চলে যায়, কিন্তু বাড়ি ফেরার চিন্তাটা হঠাৎ তার ভয়ঙ্কর বিশ্রী মনে হতে লাগল। ওখানে, ওই ভয়ঙ্কর কুলুঙ্গিটার মধ্যে, তার একটা কোনাতেই তো গত এক মাসের ওপর ওটা ধীরে-ধীরে পরিণতি লাভ করতে থাকে। সে তাই চলতে লাগল যেদিকে দু'চোখ যায়।

স্নায়ুর কাঁপুনি চলে গিয়ে একরকম জ্বরজ্বর ভাব ওকে ভর করল। এমনকি জ্বরের কাঁপুনিও সে অনুভব করতে পারছিল। অত গরমেও শীত-শীত করছিল। কতকটা যেন চেষ্টা করে, নিজের অজ্ঞাতসারে ভেতরের কোন এক তাগিদে, যেন মরিয়া হয়ে মনোযোগ সরিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে যা যা চোখের সামনে পড়ছিল সব কিছু অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু খুব একটা লাভ হল না তাতে, প্রতি মুহূর্তে সে তলিয়ে যেতে লাগল গভীর ভাবনায়। যখন আবার শিউরে উঠে মাথা তুলে চারপাশে তাকাচ্ছিল সেই মুহূর্তে ভুলে যাচ্ছিল এইমাত্র কী ভাবনাচিন্তা সে করছিল, এমনকি কোথা থেকে কোন্ রাস্তায় এসে পড়েছে— তাও। এমনই উদ্‌ভ্রান্ত এক অবস্থায় গোটা ভাসিলিয়েভ্‌স্কি দ্বীপ পার হয়ে ছোট নেভা নদীর মুখে গিয়ে পড়ল রাসকোলনিকভ্, ব্রিজ পার হয়ে বাঁক নিল দ্বীপপুঞ্জের দিকে। শহরের ধুলোবালি, চুন আর শ্বাসরোধকারী ঘেঁষাঘেঁষি বিশাল-বিশাল ইমারতে অভ্যস্ত, ক্লান্ত দু-চোখ সবুজের সমারোহে আর স্নিগ্ধতায় প্রথম-প্রথম জুড়িয়ে যাচ্ছিল। এখানে গুমোট ভাব নেই, পূতিগন্ধ নেই, কোন পানশালাও নেই। কিন্তু একটু পরেই এই নতুন মনোরম উপলব্ধিও বেদনাদায়ক ও অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াল। মাঝে-মাঝে সে দাঁড়িয়ে পড়ছিল শ্যামলিমায় ভূষিত কোন বাগানবাড়ির সামনে, তাকিয়ে দেখছিল বেড়ার ফাঁক দিয়ে। দূর থেকে নজরে পড়ছিল বাড়ির ঝুলবারান্দায়, ও উঁচু চত্বরে সাজগোজ করা মহিলার দল, বাগানে হুটোপুটি করছে বাচ্চারা। তাকে বিশেষত মুগ্ধ করে ফুল, সবচেয়ে বেশি

সময় নিয়ে ফুলই দেখতে লাগল সে। তাছাড়া চোখে পড়ছিল জমকাল ঘোড়ার গাড়ি আর ঘোড়ার পিঠে মহিলা ও পুরুষ সওয়ার। কৌতূহলী দৃষ্টিতে সে তাদের গতিবিধি অনুসরণ করতে লাগল। কিন্তু চোখের আড়াল হওয়ার আগেই দৃশ্যগুলোকে সে ভুলে যাচ্ছিল। একবার থমকে দাঁড়িয়ে তার টাকাপয়সাগুলো গুনে দেখল— তিরিশ কোপেক মতন আছে। 'কুড়ি দেওয়া হয়েছে পুলিসের লোকটাকে, তিন— নাস্তাসিয়াকে— চিঠির দরুন। তার মানে, গতকাল মার্মেলাদভ্‌দের দিয়েছিলাম সাতচল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ,' কোন একটা কারণে হিসাব করতে-করতে সে আওড়াল। কিন্তু কী ভেবে যে পকেট থেকে পয়সাগুলো বের করেছিল তা পর্যন্ত বেমালুম ভুলে গেল। কথাটা অবশ্য তার মনে পড়ে গেল সস্তার হোটেল গোছের একটা খাবারের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে। টের পেল খিদে পেয়েছে। দোকানে ঢুকে সে এক পেগ ভোদ্‌কা, সেইসঙ্গে ভেতরে কিসের যেন পুর দেওয়া একটা খাবার অর্ডার দিল। খাবারটা শেষ করল ওখান থেকে আবার রাস্তায় বেরিয়ে আসার পর। বহুকাল সে ভোদকা খায়নি, তাই মুহূর্তের মধ্যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল— যদিও খেয়েছে সে মাত্র এক পেগ। পাদুটো হঠাৎ সীসের মতো ভারী হয়ে এলো, ঘুমের প্রবল ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসল। সে বাড়ির দিকে রওনা দিল। কিন্তু পেত্রোভ্‌স্কি দ্বীপ পর্যন্ত আসার পর শরীরের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে যাবার ফলে তাকে থামতে হল। রাস্তা থেকে নেমে একটা ঝোপের ভেতর ঢুকে ঘাসের ওপর গড়িয়ে পড়ল সে। সঙ্গে-সঙ্গে ঘুম নেমে এল দুচোখে।

অসুস্থ অবস্থায় মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে তখন প্রায়ই তা হয়ে থাকে অসাধারণ প্রকট, স্পষ্ট, তার বড় বেশি মিল থাকে বাস্তবের সঙ্গে। কখন-কখন বিকট ধরনের ছবি আসে বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে উপস্থাপনা, দৃশ্যবিন্যাস ও সমগ্র প্রক্রিয়াটির বিশ্বাসযোগ্যতা এত বেশি, তার বিশদ বর্ণনাগুলি এত সূক্ষ্ম, অপ্রত্যাশিত হওয়া সত্ত্বেও শিল্পসুষমায় সর্বাঙ্গীণ চিত্রটির সঙ্গে এতদূর সঙ্গতিপূর্ণ যে ওই স্বপ্ন যে দেখেছে সে নিজেও জাগ্রত অবস্থায় কখনও তা উদ্ভাবন করতে পারবে না —এমনকি পুশকিন বা তুর্গেনেভের মতো কল্পনাশক্তির অধিকারী হলেও না। এ ধরনের স্বপ্ন, এরকম পীড়াদায়ক স্বপ্ন সবসময় দীর্ঘকালের জন্য স্মৃতিতে থেকে যায়, মানুষের যে মন বিচলিত হয়ে পড়েছে, ইতিমধ্যেই উত্তেজিত হয়ে আছে, তার ওপর গভীর ছাপ ফেলে।

রাস্‌কোলনিকভ্‌ একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখল। স্বপ্ন দেখল তার ছোটবেলার— তখনও থাকে তাদের সেই ছোট্ট শহরটিতে। ওর বয়স বছর সাতেক। কোন একটা উৎসবের দিনে সন্ধ্যার দিকে তার বাবার সঙ্গে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে শহরের বাইরে। সময়টা ধূসর, দিনটা গুমোট, পারিপার্শ্বিক হুবহু সেই এক, যেমন গাঁথা হয়ে আছে তার স্মৃতিতে; এমনকি এখন স্বপ্নে যেমন দেখছে তার চেয়ে অনেকটাই বেশি মুছে

গিয়েছিল স্মৃতি থেকে। শহরটা দাঁড়িয়ে আছে নিরাবরণ, যেন খোলা হাতের তালুতে ধরা, আশেপাশে কোথাও ঝোপঝাড়ের চিহ্নমাত্র নেই। কোথায় যেন অনেক দূরে আকাশের সেই শেষপ্রান্তে জেগে আছে ছোট-ছোট গাছপালার কালো রেখা। শহরের শেষ আনাজ ক্ষেতের কয়েক পা দূরে একটা শুঁড়িখানা— শুঁড়িখানাটা বেশ বড়। বাবার সঙ্গে বেড়াতে-বেড়াতে ওটার পাশ দিয়ে যাবার সময় প্রতিবার তার মনের ওপর একটা অপ্রীতিকর ছাপ ফেলত—এমনকি ভীতিসঞ্চার করত মনে। ওখানে সবসময় কি ভিড়ই না লেগে থাকত, লোকে কি চিৎকার-চেঁচামেচি-হাসাহাসিই না করত, গালিগালাজ করত, অসভ্যের মতো উৎকট ভাঙা গলায় গান গাইত, কি ঘনঘনই না মারপিট লেগে থাকত জায়গাটায়। শুঁড়িখানার আশেপাশে সবসময় ঘুরঘুর করে বেড়াত রাজ্যের মাতাল। তাদের দেখলে ভয় হয়। তাদের দেখে সে ভয়ে বাবার সঙ্গে সিঁটিয়ে লেগে থাকত, তার সর্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরত।... শুঁড়িখানার পাশ দিয়ে চলে গেছে একটা পথ— মেঠো পথ— সবসময়ে ধুলোয় ভরা, আর সেই ধুলোর রং সবসময় মিশমিশে কালো। পথটা গেছে এঁকেবেঁকে, কিছুটা দূরে, শদুয়েক গজ দূরে বাঁক নিয়ে চলে গেছে ডাইনে শহরের গোরস্তানকে পাক দিয়ে। কবরখানার মাঝখানে একটা গির্জা, তার গম্বুজটা সবুজ। গির্জায় বছরে বারদুয়েক সে যেত মা-বাবার সঙ্গে, সকালের প্রার্থনা সভায়, তখন প্রার্থনা করা হত তার ঠাকুমার আত্মার শান্তির জন্য। ঠাকুমা অবশ্য মারা গেছেন অনেককাল আগে, তাঁকে চোখেও দেখেনি সে। যখন যেত তখনই সঙ্গে নিয়ে যেত সাদা থালায় করে পাতলা চাদরে ঢাকা নৈবেদ্য। নৈবেদ্যটা হত চিনির রসে সেদ্ধ করা ভাতের; তার ভেতরে ক্রুশের আকারে চেপে চেপে সাজানো কিশমিশ। বড় ভালো লাগত এই গির্জাটা, গির্জার পুরানো আইকনগুলো। বেশির ভাগেরই চারপাশে ধাতুর পাত লাগান নেই। ওর ভালো লাগত গির্জার বৃদ্ধ পুরোহিতকে। তাঁর মাথাটা সবসময় কাঁপত। ঠাকুমার কবরের ওপর পাথরের ফলক বসানো। সেই কবরের পাশে আরও একটি কবর। এটি ছোট— ওর ছোট ভাইয়ের। সে মারা গিয়েছিল ছয় মাস বয়সে— তাকেও সে একেবারে জানত না, মনে করতে পারে না। কিন্তু সে শুনেছে যে তার একটা ছোট ভাই ছিল। তাই যত বার গোরস্থানে আসত প্রত্যেকবারই সে ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে ছোট্ট কবরটার ওপর ক্রুশ-প্রণাম করত, মাথা নোয়াত, কবরটাকে চুমু খেত।.এখন সে স্বপ্নে দেখতে পেল বাবার সঙ্গে গোরস্তানের পথ ধরে হেঁটে চলেছে, যাচ্ছে শুঁড়িখানার পাশ দিয়ে। সে তার বাবার হাত আঁকড়ে ধরে আছে, বিভীষিকার দৃষ্টিতে ফিরে-ফিরে দেখছে শুঁড়িখানাটা। এখন তার মনোযোগের বিষয় একটা বিশেষ দৃশ্য—এবারে যেন সেখানে সেজেগুজে দলে-দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে শহুরে ও গ্রাম্য মেয়েরা, তাদের স্বামীরা, রাজ্যের ইতর লোকজন। সবাই মাতাল, সবাই গান গাইছে। শুঁড়িখানার দেউড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ঘোড়ার গাড়ি। গাড়িটা অদ্ভুত। সেই ধরনের একটা গাড়ি যাতে

মস্ত-মস্ত ভারবাহী ঘোড়া জোতা থাকে, যাতে করে বস্তাবন্দী মাল আর মদের পিপে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই বিশাল-বিশাল ভারবাহী ঘোড়াগুলোকে দেখতে তার বরাবরই ভালো লাগত। লম্বা-লম্বা তাদের কেশর, মোটা-মোটা পা, ধীরস্থির তাদের চলন, মাপা পদক্ষেপ—স্বচ্ছন্দে টেনে নিয়ে চলেছে পর্বতপ্রমাণ বোঝা— দেখে মনে হয় বোঝা ছাড়া চলার চেয়ে বোঝা টানাটাই তাদের পক্ষে সহজসাধ্য। কিন্তু এবারে অদ্ভুত কাণ্ড! ওরকম একটা বিরাট ঠেলাগাড়িতে জোতা হয়েছে চাষীদের একটা ছোটখাটো, হাড় জিরজিরে, বাদামি রঙের বেতো মাদী ঘোড়া। এই জাতীয় ঘোড়াগুলোর অবস্থা... সে অনেক সময়ই লক্ষ করে দেখেছে... খড় বা জ্বালানি কাঠের স্তূপাকার বোঝার ভারে কখন-কখন প্রাণান্তকর হয়ে ওঠে...বিশেষত গাড়ি যদি কাদায় বা রাস্তার খানাখন্দে পড়ে আটকে যায় এবং সে ক্ষেত্রে চাষীরা যদি চাবুক মারে, এতটুকু দয়ামায়া না করে যখন-তখন নির্দয়ভাবে প্রহার করে—কখন-কখন মুখে ও চোখে পর্যন্ত চাবুক মারতে ছাড়ত না—তাহলে তো কথাই নেই। এই দৃশ্য দেখে তার বড় কষ্ট হয়, এত কষ্ট হয় যে প্রায় কান্না পেয়ে যায়, তখন মা ওকে জানলার ধার থেকে সরিয়ে দেয়। এখন ওখানে হঠাৎ শুরু হয়ে গেছে বেজায় হৈ-হট্টগোল : চিৎকার চেঁচামেচি করতে-করতে, গান গাইতে-গাইতে, বালালাইকা বাজাতে-বাজাতে শুঁড়িখানার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে বেহুঁশ বেহদ্দ মাতাল, বিশাল-বিশাল চেহারার চাষীরা। গায়ে লাল-নীল জামা, কাঁধের ওপর আলগা করে ফেলা মোটা সুতিকাপড়ের কোর্তা। "উঠে পড়, সবাই উঠে পড়!" ওদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে বলল। এ লোকটার বয়স কম, ইয়া মোটা ঘাড়, মাংসল মুখটা গাজরের মতো লাল। "উঠে পড়, সবাইকে পৌঁছে দেব!" লোকটা এই কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে চারদিক থেকে হাসি আর কোলাহলের ধুম পড়ে গেল।

"এই মরকুটে কিনা আমাদের নিয়ে যাবে!"

"আরে মিকোল্‌কা, তোর মাথার ছিট আছে নাকি? এই থুত্থুড়ে ঘুড়ীটাকে নাকি জুতছিস অমন একটা গাড়ির সঙ্গে!

"ওরে, এই পিংলেটার বয়স অন্তত বছর কুড়ি তো হবেই! কী বল ভাই?"

"উঠে পড়, সবাইকে পৌঁছে দেব!" আবার হাঁকল মিকোল্‌কা! বলতে-বলতে নিজেই প্রথমে গড়িতে লাফিয়ে উঠে পড়ল, লাগাম হাতে নিয়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল সামনে, গাড়োয়ানের জায়গাটাতে! "মাত্‌ভেই এই কিছুক্ষণ আগে তেজী ঘোড়াটা নিয়ে বেরিয়ে গেছে,"গাড়ির ওপর থেকে সে চেঁচিয়ে বলল। "এই থুত্থুড়ে ঘুড়ীটার দিকে তাকালে আমার বুক ভেঙে যায়, ভাই। মনে হয় মেরেই ফেলি এটাকে— গুচ্ছের গেলে, কোনও কাজে লাগে না। বলছি, উঠে পড়! জোর কদমে ছুটিয়ে দেব! জোর কদমে ছুটবে!" এই বলে চাবুক তুলে নিয়ে সোৎসাহে ঘুড়ীটার গায়ে বসানোর জন্য প্রস্তুত হল।

"তাহলে আর কি! উঠে পড়!" মাঝখান থেকে হাসির হর্‌রা উঠল। "শুনলে, জোর কদমে ছুটবে!"

"সম্ভবত দশ বছরের মধ্যে এটা জোর কদমে লাফায়নি।"

"লাফাবে এ বারে লাফাবে!"

"দয়ামায়া করে লাভ নেই ভাই! তুলে নাও চাবুক, তৈরি হও!"

"ঠিক কথা! লাগাও চাবুক!"

হাসিতামাসা করতে-করতে সকলে হুড়মুড় করে উঠে পড়ল মিকোল্‌কার গাড়িতে। ছয়জন উঠে পড়ার পর আরও জায়গা রয়ে গেল। সঙ্গীদের মধ্যে ছিল একজন মোটাসোটা চাষী-বৌ। গালের রং গোলাপি। পরনে ক্যালিকো কাপড়ের লাল টকটকে পোশাক, মাথায় পুঁতির টায়রা, পায়ে শীতের বুটজুতো। পটপট বাদাম ভাঙছে, খিলখিল করে হাসছে। ভিড়ের মধ্যে চারদিক থেকে সকলেই হাসাহাসি করছে। হাসাহাসি করবেই না বা কেন?— এরকম একটা লিকলিকে থুত্থুড়ে ঘোড়া কিনা এই ভারী বোঝা জোর কদমে টেনে নিয়ে যেতে পারবে! গাড়িতে উঠে বসা লোকজনের মধ্যে দুই ছোকরা তৎক্ষণাৎ তুলে নিল একটি করে চাবুক, মিকোল্‌কাকে সাহায্য করবে বলে। আওয়াজ উঠল : "এই, হট্ হট!" মরকুটে ঘোড়াটা প্রাণপণে টান মারে গাড়িতে, কিন্তু জোর কদমে ছোটা দূরের কথা, এক পাও নড়াতে পারে না, কেবল এক জায়গায় পা চলে, ঘোঁৎ করে আওয়াজ তোলে, তিনজনের তিন চাবুকের সপাং সপাং ঘা শিলাবৃষ্টির মতো তার গায়ে আছড়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আঘাতে জড়সড় হয়ে পড়ল ঘোড়াটা। গাড়ির লোকজন এবং বাইরের জনতার মধ্যে হাসির মাত্রা দ্বিগুণ বেড়ে গেল, তাতে মিকোল্‌কা রেগে কাঁই, ক্ষিপ্ত হয়ে আরও ঘন-ঘন চাবুক মারতে থাকে— যেন তার সত্যি-সত্যি ধারণা মরকুটেটা এক্ষুনি জোর কদমে ছুটতে শুরু করবে।

"ওরে ভাই, আমাকেও যেতে দে তোদের সঙ্গে!" এই দৃশ্য দেখে আত্মহারা হয়ে ভিড়ের ভেতর থেকে এক ছোকরা বলে উঠল।

"উঠে এসো! সবাই উঠে এসো!" মিকোল্‌কা হাঁকাহাঁকি করে। " সবাইকে নিয়ে যাবে। মারব সপাং! " বলে চাবুক মেরেই চলে অবিরাম, রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বুঝতে পারে না আর কী দিয়ে মারা যেতে পারে।

"বাপি, বাপি!" ছেলে চেঁচিয়ে বলল বাবাকে।"ওরা কী করছে বাপি? বেচারা ঘোড়াটাকে অমন পিটোচ্ছে কেন গো বাপি?"

"চলে আয়, চলে আয়!" বাবা বললেন। "মাতালদের বদ খেয়াল! গণ্ডমূর্খের দল! চলে আয়, দেখতে হবে না!" বাবার ইচ্ছে ছেলেকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান, কিন্তু ছেলে বাপের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায়, কী করতে চলেছে বুঝতে না পেরে ছুটতে থাকে ঘোড়াটার উদ্দেশে। বেচারা ঘোড়ার অবস্থা ততক্ষণে বেশ

খারাপ হয়ে এসেছে। হাঁপাচ্ছে, থেকে-থেকে দাঁড়িয়ে পড়ছে, আবার হেঁচকা টান মারছে, পড়তে-পড়তে সামলে নিচ্ছে।

"চাবুক মেরে খতম করে দে!" মিকোল্‌কা চেঁচিয়ে বলল "এছাড়া উপায় দেখছি না। আমিই খতম করব চাবকে!"

"ওরে পাষণ্ড! খ্রিস্টের ক্রশ কি তোর গলায় ঝুলানো নেই?" জনতার ভেতর থেকে চিৎকার করে বলল এক বৃদ্ধ।

"এরকম একটা হাড় জিরজিরে ঘোড়াকে এত বড় বোঝা টানতে কে কোথায় দেখেছে?" আরেকজন যোগ করল।

"মেরে ফেলবে দেখছি !" তৃতীয় আরেক জনের চিৎকার শোনা গেল।

"তফাত যাও! আমার সম্পত্তি! যা খুশি তাই করব। আরও কে কে আছ উঠে পড়! সবাই উঠে পড়! জোর কদমে ছুটতেই হবে এটাকে— আমার ইচ্ছে!..."

অতর্কিত একচোট হাসির হর্‌রা— চাপা পড়ে যায় সবকিছু। ঘন-ঘন আঘাত সহ্য করতে না পেরে ঘুড়ীটা অসহায়ভাবে লাথি ছুঁড়তে থাকে। এই দৃশ্য দেখে বৃদ্ধ লোকটিও মুচকি না হেসে পারল না: এমন একটা থুত্থুড়ে মরকুটে ঘোড়া— সেও কিনা লাথি ঝাড়ছে।

ভিড়ের মধ্য থেকে দুই ছোকরা আরও একটি করে চাবুক তুলে নিয়ে অসহায় জীবটির পাঁজরার দুপাশে চাবুক মারার উদ্দেশ্যে ধেয়ে গেল দুদিক থেকে।

মিকোল্‌কা এবারে হাঁক পাড়ল, "মারো ওটার মুখে, মারো চোখে, মারো ভাই!"

"গান হোক ভাই, গান!"গাড়ির ভেতর থেকে কে একজন চেঁচিয়ে বলল, গাড়ির আর সকলেও সঙ্গে-সঙ্গে ধুয়া তুলল। শুরু হয়ে গেল উদ্দাম কণ্ঠের অশ্লীল গান। ঝনঝন বাজতে থাকে খঞ্জনী আর সেই সঙ্গে গানের ধুয়া হিসাবে ফাঁকে-ফাঁকে উৎকট শিস। চাষী বৌটি পটাপট বাদাম ভেঙে চলেছে, মুখ টিপে-টিপে হাসছে।

...বালক ছুটতে থাকে ঘোড়ার পাশে-পাশে, ছুটতে-ছুটতে সামনে চলে যায়। ও দেখতে পেল চাবুক আছড়ে পড়ছে ঘোড়াটার চোখের ওপর, ঠিক চোখদুটো লক্ষ করে! ওর কান্না পায়। বুকের ভেতরটা ওলট-পালট হতে থাকে, জলে ভেসে যায় দুচোখ। ওদের একজনের চাবুকের বাড়ি ওর মুখে এসে লাগল। কিন্তু বালক উপলব্ধি করতে পারল না। অসহায়ের ভঙ্গিতে নিজের হাত নিজে মোচড়াতে থাকে, **চেঁচায়**, ছুটে যায় সেই সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো মানুষটির দিকে। লোকগুলোর এই কাজে **সায়** দিতে পারছে না বৃদ্ধ, ঘন-ঘন মাথা নাড়ছে। একজন চাষী-বৌ বালকের হাত চেপে ধরে তাকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু বালক ছিটকে বেরিয়ে গেল তার হাত থেকে, আবার ছুটতে লাগল ঘোড়াটার দিকে। সেটার তখন অন্তিম দশা, তবু আরও একবার লাথি ছুঁড়তে শুরু করেছে।

রাগে-উত্তেজনায় ফেটে পড়ল মিকোল্‌কা। "তবে রে হারামজাদী!" এই বলে

হাতের চাবুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হেঁট হয়ে গাড়ির ভেতরের তলা থেকে টেনে বার করল গাড়িতে ঘোড়া জোতার ইয়া লম্বা মোটা ডাণ্ডাটা। দুহাতে ডাণ্ডার একটা প্রান্ত চেপে ধরে অনেক কষ্টে তুলে বাগিয়ে ধরল পাটকিলে ঘোড়াটার মাথার ওপর।

"বসিয়ে দেবে! বসিয়ে দিল বলে!" চারদিক থেকে কোলাহল উঠল।

"খুন করবে!"

"আমার সম্পত্তি!" মিকোল্‌কা চেঁচাতে-চেঁচাতে জোয়ালটা বসিয়ে দিল সমস্ত গায়ের শক্তি প্রয়োগ করে। ধপাস করে একটা ভারী আওয়াজ উঠল।

"মারো মারো, চাবুক মারো! আরে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?" জনতার ভেতর থেকে উচ্চকণ্ঠের ধ্বনি ওঠে।

এদিকে মিকোল্‌কা আরও একবার জোয়ালটা উঁচিয়ে ধরে। আবারও সজোরে চাবুক আছড়ে পড়ল হতভাগা প্রাণীটার পিঠের ওপর। তার সমস্ত শরীরটা নেতিয়ে পড়ে, পেছনটা সম্পূর্ণই বসে যায়, তবু থেকে-থেকে সে লাফিয়ে ওঠে, ঝাঁকুনি মারে, শেষ শক্তি প্রয়োগ করে, এদিক-ওদিক টলতে-টলতে ঝাঁকুনি মেরে চেষ্টা করে গাড়িটা নাড়ানোর। কিন্তু চতুর্দিক থেকে ছয়টি চাবুকের বাড়ি এসে পড়ল, আবার ওপরে উঠে নিচে নেমে এল মিকোল্‌কার হাতের জোয়ালটা— এই নিয়ে তিনবার, তারপর আবার চতুর্থবার, সমান তালে, সজোরে। একঘায়ে মারতে পারছে না বলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে মিকোল্‌কা।

"বড় কঠিন জান।" আশপাশ থেকে আওয়াজ ওঠে।

"এই এক্ষুনি মুখ থুবড়ে পড়বে ভাই, পড়ল বলে! এখানেই ওর দফারফা!" ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন উৎসাহী চেঁচিয়ে উঠল।

"কুড়ুল ছাড়া আর উপায় কি? কুড়ুল মেরে সাবাড় কর ওটাকে!" আরও একজন চিৎকার করে বলল।

"নিকুচি করেছি তোর! সরে যাও দেখি!" দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচাতে-চেঁচাতে হাতের জোয়ালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মিকোল্‌কা আবার হেঁট হয়ে গাড়ির ভেতর থেকে বার করল একটা লোহার শাবল। "সামাল।" হুঙ্কার দিয়ে ঝটকা মেরে মাথার ওপরে তুলে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এক কোপ বসিয়ে দিল হতভাগা ঘোড়াটার ওপর। আঘাত এসে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়াটা টাল খেল, মাটিতে বসে পড়ে চেষ্টা করল টান মারার, কিন্তু শাবলটা আবার সবেগে ওপরে উঠে ঝপাং করে নেমে এলো তার পিঠে। এবারে মাটিতে এমনভাবে লুটিয়ে পড়ল যেন তার চারটি পা-ই একসঙ্গে কাটা পড়েছে।

" শেষ করে দাও!" চেঁচাতে-চেঁচাতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো একলাফে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল মিকোল্‌কা। আরও কয়েকটা ছোকরা—তারাও মাতাল, তাদেরও মুখ লাল টকটক করছে—চাবুক, লাঠি, **জোয়াল**— যে যা হাতের কাছে পেল তুলে নিয়ে

ধেয়ে গেল মুমূর্ষু প্রাণীটার দিকে। মিকোল্‌কা দাঁড়িয়ে পড়ল একপাশে, সেখান থেকেই অন্ধের মতো শাবল দিয়ে দমাদম মারতে থাকে ওর পিঠে। হাড় জিরজিরে প্রাণীটা সামনের দিকে মাথা বাড়িয়ে দিল। শেষবারের মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।

"গেছে!" ভিড়ের মধ্যে আওয়াজ উঠল।

"যাবেই তো! জোর কদমে ছুটল না কেন?"

"আমার সম্পত্তি!" রক্তচক্ষু ঘোরাতে-ঘোরাতে শাবল হাতে হুঙ্কার দিয়ে উঠল মিকোল্‌কা। সে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল যে দেখে মনে হচ্ছিল হাতের সামনে মারার আর কেউ নেই বলে বুঝি তার আফসোস হচ্ছে।

"হুঁ বোঝাই যাচ্ছে খ্রিস্টের ক্রুশচিহ্নের কোন ধার ধারিস না তুই!" জনতার মাঝখান থেকে বহুকণ্ঠের ধ্বনি ওঠে।

বেচারি ছেলেটির ততক্ষণে কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে। তারস্বরে কাঁদতে-কাঁদতে ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে সে ঘোড়াটার কাছে চলে এলো। মরা ঘোড়াটার রক্তাক্ত মাথা জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। চুমু খেল তার চোখে ঠোঁটে। তারপর হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে দুহাতে মুঠো পাকিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মিকোল্‌কার ওপর। বাবা অনেকক্ষণ ধরে তার পিছু ধাওয়া করতে-করতে শেষকালে ঠিক এই মুহূর্তে তাকে ধরে ফেলল, তাকে টেনে বের করে আনল ভিড়ের ভেতর থেকে।

বাবা ছেলেকে বলল, "চল! চল! বাড়ি যাই আমরা!"

"বাপি! কেন... কেন ওরা মেরে ফেলল বেচারি ঘোড়াটাকে?" বলতে-বলতে ফোঁপাতে থাকে সে। কিন্তু কথা বলার দম পায় না, তাই কথার বদলে বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে চাপা আর্তনাদ।

"ওসব মাতালদের কারবার। আমাদের ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই। চল্‌!" ছেলে দুহাতে জড়িয়ে ধরল বাবাকে, কিন্তু বুকের ভেতরটা যেন কেমন চাপা-চাপা লাগতে থাকে। নিঃশ্বাস নেবার জন্য ছটফট করতে থাকে সে, চেঁচানোর চেষ্টা করে। সঙ্গে-সঙ্গে ঘুম ভেঙে যায়।

ঘুম যখন ওর ভাঙল তখন সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে, মাথার চুল পর্যন্ত ভিজে সপসপ করছে। তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল ভয়ে, আতঙ্কে সে উঠে বসল।

"ভগবানকে ধন্যবাদ যে এটা নিছক স্বপ্ন।" গাছের তলায় ঘুম ভাঙার পর ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ঘন-ঘন শ্বাস নিতে-নিতে সে বলল। 'কিন্তু এটা কী? কী বিশ্রী স্বপ্ন!...জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন দেখছি নাকি?'

সর্বাঙ্গ যেন ব্যথায় জর্জরিত। মন বিক্ষুব্ধ, অন্ধকারে ছেয়ে আছে। হাঁটুতে কনুই ঠেকিয়ে সে দুহাতে মাথা চেপে ধরল।

"হা ভগবান!" সে বলে উঠল। "তাহলে, তাহলে কি সত্যি-সত্যিই আমি কুড়ুল

তুলে নিয়ে ওর মাথায় বসিয়ে দেব, ওর মাথার খুলি ভেঙে চুরমার করে দেব...চটচটে উষ্ণ রক্তধারার ওপর দিয়ে পিছলে-পিছলে হেঁটে গিয়ে তালা ভাঙব, চুরি করব, থরথর করে কাঁপতে থাকব। ...হাতে কুড়ুল, সর্বাঙ্গ রক্তে মাখামাখি হয়ে আমাকে লুকোতে হবে...ওঃ ভগবান! এও কি সত্যি?"

কথাগুলো উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে সে কাঁপতে লাগল বাঁশপাতার মতো।

"কিন্তু এ আমার কী হল?" আবার ঘুরে-ফিরে ভাবতে-ভাবতে যেন দস্তরমতো অবাক হয়ে যাচ্ছিল সে। "আমি তো জানতামই যে এ আমি সহ্য করতে পারব না, তাহলে নিজেকে এতক্ষণ এত কষ্ট দেওয়া কেন? কেননা গতকাল, সবে গতকাল যখন আমি গিয়েছিলাম *যাচাই* করে দেখতে, তখন...গতকালই তো আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে ও কাজ আমার দ্বারা হবে না!... তবে এখন আমি আবার কী ভাবছি? এখনও আমার সন্দেহ হচ্ছিল কেন? গতকালই তো সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে আমি নিজে মনে-মনে বলেছি যে এটা জঘন্য, ন্যক্কারজনক, নীচ, অতি নীচ...বিষয়টা মনে-মনে চিন্তা করে জাগ্রত অবস্থাতেও আমার গা গোলাচ্ছিল, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম আমি।..."

"না, না, এ আমি সহ্য করতে পারব না, একাজ আমার দ্বারা হবে না! এমন কি আমার সমস্ত হিসাবের মধ্যে যদি এতটুকু সন্দেহ নাও থাকে, তবুও পারব না। এমনকি এই এক মাস ধরে যা যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা যদি দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়, যদি অঙ্কের মতো ঠিক-ঠিক মিলে যায়, তবুও নয়। হা ভগবান! যদি তাও হয় তবু আমার সাহসে কুলোবে না! আমি পারব না, সহ্য করতে পারব না! তাহলে, তাহলে কেন এতদিন..."

সে উঠে দাঁড়াল, অবাক হয়ে চারদিকে দৃষ্টিপাত করল— যেন কীভাবে সে এখানে এসে পড়ল কেনই সে তুচ্‌কোভ ব্রিজের দিকে পা বাড়িয়েছিল তা ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। ওকে এখন ফেকাসে দেখাচ্ছিল, ওর দুচোখ জ্বলজ্বল করছিল। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে খিল ধরে আসছে। কিন্তু তারপর হঠাৎই যেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আবার সহজ-স্বাভাবিক হয়ে এলো। সে উপলব্ধি করল যে ভয়ঙ্কর ভারী ঝোপটা এতক্ষণ তার বুকে চেপে বসেছিল সেটা ইতিমধ্যে ঝেড়ে ফেলে দিতে পেরেছে। মন্ তাই হালকা আর শান্ত হয়ে এলো। মনে-মনে সে প্রার্থনা করল, "হে ভগবান! আমাকে আমার পথ দেখাও, আমি তাহলে ছেড়ে দেব আমার এই অভিশপ্ত স্বপ্নবিলাস!"

ব্রিজ পেরিয়ে যেতে-যেতে সে ধীর-স্থির শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল নেভা নদীর জলস্রোত, উজ্জ্বল রক্তিম সূর্যের জ্বলন্ত অস্তরাগ। দুর্বলতা সত্ত্বেও সে কিন্তু ক্লান্তি অনুভব করছিল না। যেন হৃৎপিণ্ডের ওপর যে বিষফোঁড়াটা গত এক মাস হল পাকতে-পাকতে পুঁজরক্তে ভরে উঠেছিল, সেটা হঠাৎ ফেটে গেছে। মুক্তি,

মুক্তি! সে এখন মুক্ত, এই মোহাবরণ থেকে, জাদুমন্ত্র, ইন্দ্রজালের প্রভাব থেকে, আবেশ থেকে মুক্ত!

বহুকাল পরে যখন তার মনে পড়ত এই সময়টিকে, এই দিনগুলিতে তার জীবনে যা যা ঘটেছিল সেসব ঘটনা, ঘটনার খুঁটিনাটি, প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি বৈশিষ্ট্য, তখনই সে অবাক হয়ে যেত। একটি ঘটনার কথা ভেবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিস্ময়ে ছেয়ে যেত তাঁর মনটা। অমনিতে দেখতে গেলে সেটা অসাধারণ কিছু নয় কিন্তু পরে সবসময় তার মনে হত যেন এই ঘটনাটাই কোন না কোন ভাবে তার ভাগ্যকে নির্ধারণ করে দিয়েছিল। ঘটনাটা এই যে সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, নিজের কাছে ব্যাখ্যাও খুঁজে পাচ্ছিল না, শ্রান্ত-ক্লান্ত তার পক্ষে যখন সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ও সোজা পথ ধরে বাড়ি ফেরাটাই বেশি সুবিধাজনক ছিল, তখন কেন সে বাড়ি ফিরল সেন্নায়া স্কোয়ার দিয়ে— যেটা ছিল একেবারে বাড়তি পথ। খুব বেশি ঘুরপথ না হলেও, এটা ঠিক যে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। অবশ্য এর আগেও আরও অনেকবার এমন ঘটেছে যে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তাঘাট সম্পর্কে কোন হুঁশ তার থাকত না। কিন্তু নিজেকে সে বারবার প্রশ্ন করেছে কেন, কীভাবে এমন গুরুতর, ওর পক্ষে চূড়ান্ত এবং সেইসঙ্গে দারুণ চমক লাগানো সাক্ষাৎ ঘটেছিল এই সেন্নায়া স্কোয়ারে। অথচ ওই পথ দিয়ে যাবার কোন যুক্তিই তার ছিল না। তাও ঘটনাটা ঘটল কিনা এখন, ঠিক এই দণ্ডে, তার জীবনের এমন এক মুহূর্তে, যখন তার মন-মেজাজ আর পরিস্থিতি এমনই যে এই সাক্ষাৎ তার সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনের ওপর চূড়ান্ত ও চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে? যেন ওরই জন্য ওত পেতে ছিল!

সেন্নায়ার ওপর দিয়ে যখন সে যাচ্ছিল তখন রাত প্রায় নয়টা। রাস্তার ফিরিওয়ালা, টেবিল সাজিয়ে বসা পসারি, ছোট বড় দোকানদার—সকলেই সেদিনের মতো দোকানপসারের ঝাঁপ বন্ধ করে দিচ্ছিল অথবা যার-যার পসরা তুলে নিয়ে বাড়ি যাবার উদ্যোগ করছিল, খরিদ্দাররাও তাই। ভূগর্ভ কুঠুরির হোটেলগুলোর কাছে, সেন্নায়া স্কোয়ারের বাড়িঘরের নোংরা পূতিগন্ধময় উঠোনগুলোতে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শুঁড়িখানাগুলোর দরজার সামনে ভিড় জমিয়েছে নানা ধরনের, নানা শ্রেণীর ফন্দিবাজ ও বাউণ্ডুলের দল। রাস্‌কোলনিকভ্ যখন উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় ঘুরতে বের হত তখন বিশেষ করে এই জায়গাগুলো এবং আশেপাশের গলিগুলোও তার ভালো লাগত। এখানে তার ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক কারও তাচ্ছিল্যের খোরাক হত না, কারও মর্মপীড়ার উদ্রেক না করে যে কোন পোশাকে এখানে অবাধে হাঁটাচলা করা যেত। কোন্নি গলির ঠিক মুখটাতে, এক কোনায় এক ফিরিওয়ালা আর একজন স্ত্রীলোক— লোকটার বৌ হবে—দুটি টেবিলে সাজিয়ে বিক্রি করছিল তাদের পসরা— সুতো, ফিতে, ছিটকাপড়ের রুমাল— এইসব টুকিটাকি। ওরাও বাড়ি যাবার জন্য উঠি উঠি করছিল, কিন্তু ওদের দেরি হয়ে যাচ্ছিল পরিচিত একজন কাছে আসতে তার

সঙ্গে গল্পগুজব করতে-করতে। পরিচিতটি আর কেউ নয়—লিজাভেতা ইভানোভ্না, অথবা স্রেফ লিজাভেতা, যে নামে তাকে সবাই ডাকত—সরকারি করণিকের বিধবা স্ত্রী সেই সুদখোর বুড়ি আলিওনা ইভানোভ্নার ছোট বোন, যার কাছে গতকাল রাস্‌কোলনিকভ্ তার ঘড়ি বন্ধক দিতে এবং পরিস্থিতি *যাচাই* করে দেখতে গিয়েছিল।...লিজাভেতা সম্পর্কে সবকিছু তার অনেকদিন হল জানা হয়ে গেছে, এমনকি লিজাভেতাও তাকে একটু-আধটু জানে। লিজাভেতা লম্বা গড়নের, জবুথবু গোছের, শান্ত নিরীহ প্রকৃতির আইবুড়ো মেয়ে, বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, প্রায় হাবাগোবা, দিদির পুরোপুরি বশে, অহোরাত্র তার জন্য খেটে মরে। দিদির সামনে সে থরথর করে কাঁপে, এমনকি তার কাছ থেকে চড়চাপড়ও সহ্য করতে হয়। একটা পুঁটলি হাতে পসারি লোকটি আর তার বৌয়ের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের কথা সে বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। মুখে চিন্তার ছাপ। ওরা দুজনে বিশেষ উৎসাহভরে ওকে কী যেন বোঝাচ্ছিল। হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে নিদারুণ বিস্ময়ের মতো কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি আচ্ছন্ন করে ফেলল রাসকোলনিকভ্‌কে। অথচ এই দেখা হয়ে যাবার মধ্যে বিস্ময়ের কিছুই ছিল না।

পুরুষমানুষটি উঁচু গলাতেই বলছিল, "তা লিজাভেতা ইভানোভ্না, আপনি নিজে মনস্থির করুন না। কাল আসুন, ছ'টার পরে। ওঁরাও আস্‌বেন তখন।"

"কাল?" কেমন যেন দোটানায় পড়ে গিয়ে লিজাভেতা বলল। যেন এখনও মনস্থির করতে পারছে না।

ফিরিওয়ালার বৌটি বেশ ছটফটে। সে চটপট বলে উঠল, 'ইস্, আলিওনা ইভানোভ্না দেখছি আপনাকে একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে দিয়েছেন। আপনাকে যখন দেখি তখন মনে হয় একেবারে ছোট বাচ্চাটি। আপনার মায়ের পেটের বোনও নন উঁনি— সৎ বোন, অথচ কী খবরদারিই না করছেন, বলুন!"

"আর হ্যাঁ, এবারে কিন্তু আলিওনা ইভানোভ্নাকে এ ব্যাপারে কিছু বলবেন না", মহিলার স্বামী কথার মাঝখানে বলল। "এই হল আমার পরামর্শ। ওঁকে কিছু জিগ্‌গেস না করেই আমাদের কাছে আসুন একবার। লেনদেনটা লাভের। পরে আপনার দিদি নিজেও বুঝতে পারবেন।"

"তাহলে আসব বলছেন?"

"কাল ছ'টার পরে। ওদের তরফ থেকেও লোক আসবে। আপনি নিজে মনস্থির করুন।"

"চায়ের নেমন্তন্নও রইল", বৌ যোগ করল।

" বেশ, আসব," লিজাভেতা বলে ফেলল। তখনও সে চিন্তিত। কথাগুলো বলার পর ধীরে-ধীরে স্থানত্যাগ করল।

রাস্‌কোলনিকভ ঠিক সেই মুহূর্তে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। আর কোন কথা তার কানে

গেল না। পাশ দিয়ে যাবার সময় হাঁটছিল সে সকলের নজর এড়িয়ে ধীরে-ধীরে, একটি কথাও যাতে বাদ না যায় এ ব্যাপারে সে সচেষ্ট ছিল। গোড়ার দিককার বিস্ময়ের ভাবটা অল্প-অল্প করে বিভীষিকার আকার ধারণ করল। শিরদাঁড়া দিয়ে ঠাণ্ডা শিরশিরে স্রোত বয়ে গেল। সে এখন জানতে পারল, আচমকা আকস্মিকভাবে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই জানতে পারল যে আগামীকাল সন্ধ্যা ঠিক সাতটার সময় বুড়ির বোন, বাড়িতে বুড়ির একমাত্র সঙ্গিনী লিজাভেতা বাড়ি থাকছে না, তার মানে সন্ধ্যা ঠিক সাতটার সময় বুড়ি *একা থাকছে বাড়িতে*।

রাস্‌কোলনিকভের আস্তানা মাত্র কয়েক পা দূরে। নিজের ঘরে যখন সে ঢুকল তখন তার অবস্থা ফাঁসির আসামির মতো। কোন বিচার-বিবেচনার মধ্যে সে গেল না, বিচার-বিবেচনা করার মতো মানসিক অবস্থাও তার ছিল না। কিন্তু সে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছিল যে এখন তার না আছে স্বাধীন চিন্তা করার ক্ষমতা, না আছে কোন ইচ্ছাশক্তি। হঠাৎই যেন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেল সবকিছুর।

এটা ঠিক যে অভিসন্ধিটা মাথায় রেখে তাকে হয়ত বছরের পর বছর সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হত। কিন্তু এই মুহূর্তে আকস্মিকভাবে যে সুযোগ এসে গিয়েছে তার চেয়ে সুনিশ্চিতভাবে সাফল্যের পথে পা বাড়ানোর কথা ভাবাই যায় না। সে যাই হোক না কেন, যার প্রাণনাশের প্রস্তুতি চলছে সেই অমুক বুড়ি আগামীকাল অমুক সময়ে যে একেবারে একা বাড়ি থাকবে এটা নিশ্চিত। যতদূর সম্ভব কম ঝুঁকি নিয়ে কোনরকম জিজ্ঞাসাবাদ ও অনুসন্ধানের ঝুঁকি না নিয়ে, যতদূর সম্ভব নিখুঁতভাবে এই খবরটি সংগ্রহ করা আগের দিনও কিন্তু কঠিন ছিল।

ছয়

পরে অবশ্য রাস্‌কোলনিকভ জানতে পেরেছিল রাস্তার সেই ফিরিওয়ালা আর তার বৌ কেন লিজাভেতাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। ব্যাপারটা খুবই সাধারণ, সাধারণের অতিরিক্ত কিছুই ছিল না তার মধ্যে। শহরে নবাগত এক পরিবার দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়ে পড়ায় বেশ কিছু জিনিসপত্র, জামাকাপড় ইত্যাদি— সবই মেয়েদের—বিক্রি করে দিচ্ছিল। বাজারে বিক্রি করা লাভজনক নয় বলে তারা একজন দালালের খোঁজ করছিল। লিজাভেতা এই কাজই করত। দালালি নিয়ে কেনাবেচার ব্যবস্থা করত। ব্যবসা তার বেশ ভালো চলছিল, যেহেতু মানুষটি খুব সৎ, সবসময় যতদূর সম্ভব কম দাম বলত, যে দর বলত সেটাই চূড়ান্ত। কথা বলত খুব কম এবং আগেই বলা হয়েছে, সে ছিল নিরীহ, ভীতু গোছের।...

কিন্তু রাস্‌কোলনিকভ্ ইদানীং কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। কুসংস্কারের ছাপ এরপরেও আরও বহুদিন ওর মধ্যে থেকে গিয়েছিল, তার মূলোচ্ছেদ করা প্রায় অসাধ্য ছিল। পরে সবসময় এ সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে বিশেষ ধরনের কোন কিছুর প্রভাব ও দৈব যোগাযোগের মতো কোন অদ্ভুত বস্তু ও রহস্যের সন্ধান করা তার একটা প্রবণতা

হয়ে দাড়িয়েছিল। সেই শীতকালের কথা— পক্রোয়েভ্ নামে তার এক পরিচিত ছাত্র যখন খারকভ্ চলে যাচ্ছিল, তখন কথায়-কথায় তাকে বুড়ি আলিওনা ইভানোভ্নার ঠিকানা জানিয়ে বলে দরকার হলে তার কাছে রাস্কোলনিকভ জিনিস বন্ধক রাখতে পারে। বহুদিন সে তার ধারে-কাছে যায়নি,কারণ তখন টুইশান ছিল, কোনরকমে চলে যাচ্ছিল। মাসদেড়েক আগে ঠিকানাটা তার মনে পড়ে গেল। বন্ধক দেওয়ার উপযোগী জিনিস ছিল ওর কাছে দুটো : বাবার কাছ থেকে পাওয়া রুপোর পুরানো ঘাড়ি আর বিদায়ের সময় স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে বোনের দেওয়া উপহার—একটা ছোট্ট আংটি; আংটিটা সোনার, তাতে একধরনের খুদে-খুদে তিনটে পাথর বসানো। রাস্কোলনিকভ ঠিক করেছিল আংটিটা বাঁধা দেবে। বুড়িকে খুঁজে বার করল। বুড়ির সম্পর্কে তখন পর্যন্ত তার বিশেষ কিছু জানা ছিল না। তা সত্ত্বেও প্রথম দৃষ্টিতেই তার প্রতি একটা অদম্য বিতৃষ্ণার ভাব রাস্কোলনিকভ্ ভেতরে-ভেতরে অনুভব করল। বুড়ির কাছ থেকে দুটো 'নোট' পাওয়ার পর পথে সে একটা সস্তার সরাইয়ে ঢুকে পড়ল। চা ফরমাশ দিয়ে সে বসে পড়ল, গভীর ভাবনায় ডুবে গেল। ডিমের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মুরগির ছানা যেমন খোলস ঠোকরায়, তেমনি তার মাথার ভেতরেও ঠোকরাতে লাগল এক অদ্ভুত চিন্তা, তাকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলল।

প্রায় তার পাশে আরেকটি টেবিলে বসে ছিল এক ছাত্র। তাকে সে জানত না, কোথাও দেখেছে বলে মনেও করতে পারছিল না। এছাড়া ছিল এক অল্পবয়সী আর্মি অফিসার। একহাত বিলিয়ার্ড খেলার পর তারা তখন চা পান করছিল। এমন সময় তার কানে এলো ছাত্রটি সরকারি করণিকের বিধবা স্ত্রী সুদখোর আলিওনা ইভানোভ্নাকে নিয়ে কথা বলছে এবং সঙ্গীটিকে বুড়ির ঠিকানা জানাচ্ছে। এই ব্যাপারটাই রাস্কোলনিকভের কাছে কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকল : এইমাত্র সে বুড়ির ওখান থেকে এসেছে, এখানে কিনা তাকে নিয়েই কথা হচ্ছে। বলাবাহুল্য, নেহাতই কাকতালীয়। তবু দারুণ অস্বাভাবিক এই ঘটনার প্রভাব সে কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। এমন সময় কেউ যেন আরও খোরাক জুটিয়ে দিল তাকে : ছাত্রটি হঠাৎ তার সঙ্গীকে ওই আলিওনা ইভানোভ্না সম্পর্কে নানা খুঁটিনাটি সংবাদ দিতে শুরু করল।

"মহিলা কিন্তু দারুণ", সে বলল। "যখন-তখন তার কাছে টাকা পাওয়া যায়। ইহুদীদের মতো ধনী, এককথায় পাঁচ হাজার বার করে দিতে পারে, আবার এক রুবলের বন্ধক রাখতেও নাক সিঁটকোয় না। আমাদের অনেককেই ওর দ্বারস্থ হতে হয়েছে। তবে বুড়ি বড় নচ্ছার।..."

এই বলে বুড়ি কেমন বদমেজাজি আর খামখেয়ালি তার বর্ণনা দিতে শুরু করল, বলল বন্ধকের মেয়াদ মাত্র একদিন পার হয়ে গেলেই আর দেখতে হচ্ছে না— বন্ধকী জিনিস বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। জিনিসের দামের চার ভাগের এক ভাগ দেবে, কিন্তু মাসে সুদ নেবে শতকরা পাঁচ এমনকি সাত। — এরকম নানা কথা, অনেক

কথা ছাত্রটি বকবক করে বলে চলল। এও জানাল যে বুড়ির এক বোন আছে, লিজাভেতা তার নাম। বোনটাকে কথায়-কথায় প্রহার করে, দাসী-বাঁদির মতো দেখে তাকে, এমন ব্যবহার করে তার সঙ্গে যেন যে একটা ছোট বাচ্চা। হাড় বজ্জাত বেঁটে বুড়িটা। অথচ লিজাভেতা লম্বায় প্রায় ছয় ফুট।...

"চিজ বটে!" চেঁচিয়ে কথাগুলো বলে হো হো করে হেসে উঠল ছাত্রটি। ওরা লিজাভেতা সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করল। ছাত্রটি তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিশেষ একধরনের আনন্দ উপভোগ করছিল, কথায়-কথায় হাসছিল। এদিকে অফিসারটি বেশ মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনে যাচ্ছিল, ছাত্রটিকে এও বলল সে যেন এই লিজাভেতাকে তার কাছে পাঠিয়ে দেয়— কিছু জামা-কাপড় রিফু করার আছে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ প্রত্যেকটি কথা হাঁ করে গিলতে লাগল, একসঙ্গে সবকিছু জানতে পারল। জানতে পারল যে লিজাভেতা হল বুড়ির ছোট সৎ বোন — এক মায়ের পেটের বোন ওরা নয়। তার বয়স তখন পঁয়ত্রিশ। সে দিনরাত দিদির কাজ করে— বাড়িতে রাঁধুনি বল, ধোপানী বল সবই সে। তার ওপর বিক্রির জন্য জামাকাপড় সেলাই করে, এমনকি লোকের বাড়িতে ঘর ধোয়ামোছার কাজও করে কিন্তু উপার্জনের সমস্ত টাকাকড়ি দিদির হাতে তুলে দেয়। বুড়ির অনুমতি ছাড়া সাহস করে নিজে থেকে কোন অর্ডার নিতে বা কোন কাজ নিতে সে পারে না। এদিকে বুড়ি যে উইল করে রেখেছে তা লিজাভেতার নিজের অজানা ছিল না। সেই উইল অনুযায়ী চেয়ার-টেয়ার ধরনের কিছু অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়া লিজাভেতা এক কপর্দকও পাচ্ছে না, টাকাকড়ি সব লিখে দেওয়া হয়েছে 'ন' প্রদেশের একটি মঠকে— বুড়ির আত্মার চিরশান্তির জন্য। লিজাভেতা ছিল নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর— তার দিদির মতো সরকারি আমলার বিধবা স্ত্রী নয়। আইবুড়ো, চলাফেরায় বিশ্রী রকমের জবুথবু, চোখে পড়ার মতো ঢ্যাঙা, পাদুটো লম্বা-লম্বা, চেপ্টা, ওপরের দিকে ওলটানো। সবসময় পায়ে পরত ছাগলের চামড়ার সস্তার ক্ষয়ে যাওয়া জুতো। থাকত ফিটফাট। আসলে যে কারণে ছাত্রটি অবাক হয়ে যায় এবং হাসে তা হল এই যে লিজাভেতাকে সবসময় গর্ভবতী দেখা যেত।

"ও, তাহলে বলতে চাও হতকুচ্ছিৎ?" অফিসারটি বলল।

"বেশ রোদে পোড়া তামাটে। মনে হয় যেন পোশাক বদল করা সেপাই। তবে হ্যাঁ হতকুচ্ছিৎ— তা বলা যায় না। চোখে-মুখে দয়ামায়ার চিহ্ন আছে। খুব বেশি রকমই আছে। প্রমাণ— অনেকের ভালো লাগে ওকে। বড় শান্ত, নিরীহ, সাত চড়ে রা করে না— সবেতেই রাজি— এককথায় রাজি। আর হাসিটা ওর বড় মিষ্টি।"

"তার মানে, তোমারও ভালো লাগে ওকে, তাই তো?" অফিসার হাসতে-হাসতে বলল।

"অদ্ভুত বলে ভালো লাগে। না, আমি তোমাকে যা বলতে চাই শোন তাহলে। আমি পারলে ওই হতচ্ছাড়া বুড়িটাকে খুন করে ওর টাকাকড়ি ছিনিয়ে নিতাম। বিশ্বাস কর, আমার বিবেকে এতটুকু বাধত না," ছাত্রটি সোৎসাহে যোগ করল।

অফিসারটি আবারও হো হো করে হেসে উঠল, কিন্তু রাস্‌কোলনিকভ্ চমকে উঠল। কী অদ্ভুত কাণ্ড!

"দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি তোমাকে একটা সিরিয়াস প্রশ্ন করতে চাই," উত্তেজিত হয়ে ছাত্রটি বলল। "আমি এইমাত্র যা বললাম, ঠাট্টা করেই বললাম। কিন্তু ভেবে দেখ একদিক থেকে দেখতে গেলে, মূর্খ-নির্বোধ, অপদার্থ, কুচুটে, অসুস্থ এক খুনখুনে বুড়ি— কারও দরকার তো নেইই তাকে বরং অন্যের অনিষ্ট করে বেড়াচ্ছে। নিজেই জানে না কিসের জন্য বেঁচে আছে, হয়ত আগামীকাল অমনিতেই মারা যাবে। বুঝতে পারছ? কী বলছি বুঝতে পারছ?"

"হুঁ, বুঝতে পারছি", উত্তেজিত সঙ্গীটিকে একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে-করতে অফিসার উত্তর দিল।

"তাহলে আরও শোন। অন্যদিকে অল্পবয়সী সব মানুষ, তাদের তরতাজা শক্তি অমনি-অমনি নষ্ট হচ্ছে কোন কাজের অভাবে— সংখ্যায় তো তারা হাজার-হাজার। এটা সর্বত্র! শয়ে-শয়ে, হাজারে-হাজারে ভালো-ভালো কাজ আর উদ্যোগ শুরু করা যেত, এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত বুড়ির ওই টাকায়, অথচ তার গতি হচ্ছে মঠে! শয়ে-শয়ে হাজারে-হাজারে মানুষকে হয়ত পথের সন্ধান দেওয়া যেতে পারত, অসংখ্য পরিবারকে বাঁচানো যেত অভাব আর কষ্টের হাত থেকে, সর্বনাশ আর দুর্নীতির হাত থেকে, যৌনব্যাধির হাসপাতালের কবল থেকে। এ সবই হতে পারত ওই বুড়ির টাকায়। ওকে খুন কর, কেড়ে নাও ওর টাকাকড়ি। এই টাকার সাহায্যে পরে তোমার জীবন উৎসর্গ কর সমস্ত মানবজাতির সেবায়, সমাজের কল্যাণে। তোমার কি মনে হয়, একটা ছোট্ট, নগণ্য অপরাধ হাজার-হাজার সৎকাজ দিয়ে মুছে ফেলা যাবে না? একটা প্রাণের বিনিময়ে পচন আর বিনষ্টির কবল থেকে উদ্ধার পেতে পারে হাজার-হাজার প্রাণ। একটি মৃত্যু— তার বিনিময়ে একশ'টি প্রাণ— আরে এ যে সোজা অঙ্কের হিসাব! তাছাড়া সামগ্রিকতার নিক্তিতে ওজন করলে কী-ই বা মূল্য আছে এই ক্ষয়রোগগ্রস্ত মূর্খ, কুচক্রী বুড়ির প্রাণের? একটা উকুন বা আরশুলার প্রাণের চেয়ে বেশি নয়— এমনকি তাও নয়, কেননা বুড়ি অনিষ্টকারী, অন্যের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলছে। এই তো সেদিন, রাগে লিজাভেতার আঙুল কামড়ে দিয়েছিল— প্রায় কেটেই ফেলেছিল!"

অফিসার মন্তব্য করল, "বেঁচে থাকার যোগ্য অবশ্যই নয়। কিন্তু এটা তো প্রকৃতি —তাই নয় কি?"

"কী যে বল ভাই! প্রকৃতিকে লোকে শোধরায়, চালায়, তা নইলে আমরা তো

কুসংস্কারে ডুবে থাকতাম! এ না হলে একজন মহাপুরুষকেও পাওয়া যেত না। 'কর্তব্য' 'বিবেক'— এসব অনেক কথা লোকে বলে। কর্তব্য ও বিবেকের বিরুদ্ধে আমারও কিছু বলার নেই— কিন্তু প্রশ্ন হল আমরা সেগুলোকে কী ভাবে গ্রহণ করি? দাঁড়াও, আমি তোমাকে আরও একটা প্রশ্ন করব। শোন!"

"না, তুমি দাঁড়াও। বরং আমিই তোমায় প্রশ্ন করব। শোন!"

"বেশ!"

"এই যে তুমি এখন এত বোলচাল মারছ, বক্তিমে মারছ, তুমি আমায় বল দেখি বুড়িকে কি তুমি *নিজে* খুন করবে?"

"বলাই বাহুল্য, না! আমি ন্যায়ের খাতিরে বলছি।... কিন্তু ব্যাপারটা আমাকে নিয়ে নয়।"

"কিন্তু আমার মতে, তুমি নিজে যখন স্থির করতে পারছ না তার মানে এর মধ্যে ন্যায়ের কিছু নেই। চল আরেক হাত খেলা যাক!"

রাসকোলনিকভের উত্তেজনা চরমে উঠে গিয়েছিল। এগুলো অবশ্যই ছিল যুব সমাজের মধ্যে প্রায়শ প্রচলিত অতি সাধারণ আলাপ-আলোচনা ও চিন্তাভাবনা যা সে নিজেও একাধিকবার শুনেছে— কেবল অন্য আকারে অন্য প্রসঙ্গে। কিন্তু কেন ঠিক এখনই তাকে শুনতে হল এ জাতীয় আলাপ-আলোচনা, এরকম চিন্তাভাবনা যখন তার নিজের মাথার ভেতরেও এইমাত্র জন্ম নিতে শুরু করেছে... *ঠিক ওই একই চিন্তাভাবনা?* কেন ঠিক এই মুহূর্তে, যখন সে বুড়িকে নিয়ে তার নিজের চিন্তাভাবনার বীজ সবে বহন করে নিয়ে এসেছে বুড়ির কাছ থেকে, ঠিক তখনই বুড়ির সম্পর্কে আলোচনা তার কানে এলো?... এই কাকতালীয় মিলটা তার কাছে অদ্ভুত ঠেকছিল। সরাইয়ে শোনা এই তুচ্ছ কথাবার্তা ঘটনা বিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে তার ওপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছিল— বুঝি বা সত্যি-সত্যি এর মধ্যে ছিল নিয়তির কোন এক অমোঘ নির্দেশ।...

* * *

সেন্নায়া থেকে ঘরে ফিরে এসে সে কোনরকমে সোফার ওপর শরীরটা ছুঁড়ে দিল। ঝাড়া এক ঘণ্টা বসে রইল স্থির হয়ে। ইতিমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। ঘরে মোমবাতি নেই, মোমবাতি যে জ্বালাতে হবে এমন চিন্তাও তার মাথায় আসছিল না। পরে সে কখনও মনে করতে পারেনি ওইসময় সে সত্যি-সত্যি কিছু ভাবছিল কিনা। অবশেষে সে অনুভব করল খানিকক্ষণ আগেকার সেই জ্বরজ্বর ও শীত-শীত ভাবটা যেন আবার ফিরে আসছে, স্বস্তি বোধ করল এই ভেবে যে অন্তত সোফায় শুয়ে পড়া যেতে পারে। দেখতে-দেখতে গভীর ঘুম সীসের মতো ভারী হয়ে তার চোখের পাতায় চেপে বসল।

ঘুমালো সে অনেকক্ষণ। এত দীর্ঘ সময় সে সচরাচর ঘুমোয় না। তার ওপর ঘুমটা ছিল স্বপ্ন ছাড়া। পরদিন সকাল দশটার সময় ঘরে ঢুকে নাস্তাসিয়া জোরজার করে তাকে ঠেলে ঘুম থেকে তুলল। তার জন্য চা আর রুটি নিয়ে এসেছে। এবারেও চা'টা ছিল দ্বিতীয়বার ভিজানো চা-পাতার ওপর খানিকটা গরম জল ঢেলে তৈরি, এবারেও নাস্তাসিয়া সেটা নিয়ে এসেছে তার নিজের কেটলিতে করে।

"একি, ঘুমোচ্ছে যে! এখনও ঘুমোচ্ছে!" নাস্তাসিয়ার আর্তকণ্ঠে বিতৃষ্ণা ঝরে পড়ল।

অনেক চেষ্টায় উঠে বসল রাস্‌কোল্‌নিকভ্। মাথা ব্যথা করছে। উঠে দাঁড়াতে গেল, খুপরির ভেতরে ঘুরে দাঁড়িয়ে কয়েক পা ফেলেই আবার ধুপ করে সোফার ওপর পড়ে গেল।

"ফের ঘুম!" নাস্তাসিয়া ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। "অসুখ করেছে না কি, অ্যাঁ।"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ জবাব দিল না।

"বলি, চা খাবে তো?"

"পরে," আবার চোখ বুজে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে অনেক কষ্টে সে উচ্চারণ করল। নাস্তাসিয়া খানিকক্ষণ তার ওপর ঝুঁকে পড়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"এ যে দেখছি সত্যি-সত্যি অসুখ করেছে," এই বলে উলটো দিকে ফিরে ঘর ছেড়ে চলে গেল নাস্তাসিয়া।

নাস্তাসিয়া আবার এলো বেলা দুটোয়। স্যুপ নিয়ে এসেছে। যেমন দেখে গিয়েছিল তেমনি ভাবেই শুয়ে আছে রাস্‌কোলনিকভ্। চা স্পর্শ করেনি, যেমনকার তেমন পড়ে আছে। মনে-মনে অসন্তুষ্টই হল নাস্তাসিয়া, রেগে ধাক্কাতে শুরু করল।

"কী অত পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছ?" বিরক্তিভরে তার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল নাস্তাসিয়া। রাস্‌কোলনিকভ্ উঠে বসল। কিছু না বলে তাকিয়ে রইল মাটির দিকে।

"তোমার অসুখ করেছে, না কী?" নাস্তাসিয়া জিগগেস করল, কিন্তু এবারেও উত্তর পেল না।

"একটু রাস্তায় বেড়িয়ে এলেও তো পারতে," একটু চুপ করে থাকার পর সে বলল। "যাও না, একটু হাওয়া খেয়ে এসো। কিছু মুখে দেবে তো?"

"পরে", ক্ষীণকণ্ঠে সে বলল। "এবারে যাও", হাতের ইশারায় রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তাকে বিদায় দিল।

নাস্তাসিয়া এর পরও আরও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, সমবেদনার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল, শেষকালে বেরিয়ে গেল।

কয়েক মিনিট বাদে রাস্‌কোলনিকভ্ চোখ তুলল, অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল চা আর স্যুপের দিকে। তারপর একটুকরো রুটি তুলে নিয়ে চামচ দিয়ে স্যুপ খেতে শুরু করল।

খিদে ছিল না, খেলো সামান্য— তিন-চার চামচ— অনেকটা যন্ত্রচালিতের মতো। মাথার যন্ত্রণাটা একটু কম আছে। খাওয়ার পর আবার হাত-পা ছড়িয়ে দিল সোফার ওপর, কিন্তু ঘুম আর এলো না। তবু শুয়ে রইল নিশ্চল হয়ে, উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে। সে তখনও দেখছিল স্বপ্ন— জাগর স্বপ্ন— বড় অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন। থেকে-থেকে তার মনে হচ্ছিল সে যেন গিয়ে পড়েছে আফ্রিকায় কোথাও, মিশরে, সেখানকার কোন এক মরূদ্যানে। কারাভান বিশ্রাম নিচ্ছে যাত্রার মাঝখানে, শান্তভাবে শুয়ে আছে উটের দল। সর্বত্র, চারদিক ঘিরে আছে সারি-সারি খেজুরগাছ। মরুযাত্রীরা সকলে খেতে বসেছে। কিন্তু সে জল খাচ্ছে— একপাশে কুলুকুলু শব্দে বয়ে চলেছে একটা স্রোতধারা— সেখান থেকে। কি প্রাণ জুড়ানো স্নিগ্ধ, কী আশ্চর্য, নীল নীল ঠাণ্ডা সেই ধারা ছুটে চলেছে রংবেরঙের পাথর আর পরিষ্কার চকচকে স্বর্ণাভ বালুরাশির ওপর দিয়ে। ... হঠাৎ সে স্পষ্ট শুনতে পেল ঘড়ির আওয়াজ। তার চমক ভাঙল। মাথাটা সামান্য উঠিয়ে জানলা দিয়ে তাকিয়ে সে মনে-মনে আন্দাজ করে নিল ক'টা বাজে। চেতনা ফিরে পেতে হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠল— যেন কেউ ঝটকা টানে তাকে সোফা থেকে টেনে নামাল। পা টিপে-টিপে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, আস্তে করে দরজাটা সামান্য খুলে সিঁড়ির নিচের দিকে কান পাতল। তার বুকের ভেতর ভয়ঙ্কর টিপটিপ করছিল। কিন্তু সিঁড়িতে এতটুকু সাড়াশব্দ নেই— গোটা বাড়িটা নিঝুম।... সে যে গতকাল থেকে এমন বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে এবং এখন পর্যন্ত কিছুই করে উঠতে পারেনি, কোন কিছুর প্রস্তুতি নিতে পারেনি এই ভেবে তার অদ্ভুত ও আশ্চর্য লাগছিল। ... এদিকে ঘড়িতে বোধহয় ছয়টাই বাজল। নিদ্রা আর জড়তার জায়গায় একটা অস্বাভাবিক জ্বরজ্বর ভাব, কতকটা বিভ্রান্তিকর অস্থিরতা হঠাৎ তাকে পেয়ে বসল। অবশ্য প্রস্তুতির দরকার ছিল সামান্যই। মনের সমস্ত জোর খাটিয়ে সে ভাবতে চেষ্টা করল গোটা ব্যাপারটা, ভেবে দেখল কোথাও কোন ভুলভ্রান্তি থেকে যাচ্ছে কিনা। বুক সমানে টিপটিপ করছে, এত বেশি করছে যে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। প্রথমত, দড়ির একটা ফাঁস মতন বানিয়ে ওভার কোটটার ভেতর দিকে সেলাই করতে হবে— এটা এক মিনিটের কাজ। বালিশের তলায় হাতড়ে সেখানে স্তূপাকার করে রাখা জামাকাপড়ের ভেতর থেকে সে সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন একটা পুরানো ময়লা জামা বের করল। সেখান থেকে ছিঁড়ে বের করল চার আঙুল চওড়া ও হাতখানেক লম্বা একটা ফালি। ফালিটা দুভাঁজ করল। ওপরে পরার বস্ত্র বলতে তার একমাত্র সম্বল ছিল গরমকালে পরার উপযোগী মোটা টুইল কাপড়ের, মজবুত, ঢিলে ওভারকোটটা। গা থেকে সেটা খুলে নিয়ে এবারে ভাঁজ করা ফালিটার দুটো মুড়ো সেলাই করে লাগাতে বসে গেল ওভারকোটের ভেতর দিকে বাঁ বগলের নিচে। সেলাই করার সময় তার হাত কাঁপছিল থরথর করে, সে-বাধা জয় করে সেলাইপর্ব সমাধার পর ওভারকোট আবার গায়ে চাপাল— সেলাইয়ের চিহ্নমাত্র

বাইরে থেকে চোখে পড়ছে না। ছুঁচ-সুতো সে অনেকদিন আগে থেকে তৈরি রেখেছিল, পড়ে ছিল তার টেবিলের দেরাজে, একটুকরো কাগজের মোড়কে। আর ফাঁসের ব্যাপারটা তার নিজের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত — ওটা কুড়ুল ঝোলাবার জন্য। কুড়ুল হাতে করে আর ত রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায় না। আবার ওভারকোটের তলায় যদি লুকিয়ে রাখে তাহলে হাত দিয়ে চেপে রাখতে হয়— তাতে নজরে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। এখন ফাঁসটা থাকায় কুড়ুলের ফলাটা তার ভেতরে গলিয়ে দিলেই হল— কুড়ুল নিরাপদে ভেতরে, তার বগলের তলায় সারাটা পথ ঝুলতে থাকবে। একটা হাত ওভারকোটের পাশ-পকেটে গুঁজলে কুড়ুলের হাতলটাও সে ধরে রেখে এদিক ওদিক নড়াচড়া বন্ধ রাখতে পারে। আর ওভারকোটটা যেহেতু খুবই ঢোলা— খাঁটি বস্তা যাকে বলে, সেহেতু পকেটের ভেতরে হাত দিয়ে যে কিছু ঠেকিয়ে রেখেছে বাইরে থেকে তা ধরার উপায় থাকছে না। এই ফাঁসটাও সে ভেবে বের করেছে দু-সপ্তাহ আগে।

কাজ শেষ করার পর সোফা আর মেঝের মাঝখানের চিলতে ফাঁকের ভেতরে আঙুল গলিয়ে দিয়ে বাঁ কোণের কাছে হাতড়াতে লাগল, হাতড়ে বের করল বন্ধক। অনেকদিন আগে তৈরি করে লুকিয়ে রেখেছিল। বন্ধক রাখার জন্য তৈরি এই জিনিসটি কিন্তু আদৌ বন্ধক রাখার মতো জিনিস না। আসলে রেঁদা ঘষে মসৃণ করা স্রেফ একটুকরো ছোট্ট পাতলা কাঠ— রুপোর সিগারেট কেস যেমন হয় সেই আকারের, তেমনি পুরু। এই ছোট তক্তাটা সে দৈবক্রমে কুড়িয়ে পেয়েছিল একবার বেড়াতে-বেড়াতে একটা বাড়ির আঙিনায়। বাড়িটার বাইরের কোঠায় একটা ওয়ার্কশপ গোছের ছিল। পরে কাঠের টুকরোটার সঙ্গে যোগ করে মসৃণ পাতলা একটা লোহার পাত— সম্ভবত কোনকিছুর ভাঙা টুকরো— ওটাও রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছিল, ওই একই সময়। দুটোর মধ্যে লোহার পাতটা ছিল একটু ছোট । দুটো টুকরো একটার পর একটা রেখে সে কোনাকুনি করে সুতো দিয়ে শক্ত করে বাঁধল। তারপর দেখার মতো করে নিখুঁতভাবে একটা পরিষ্কার কাগজে মুড়ে পাতলা ডুরি দিয়ে বাঁধল, এবারেও বাঁধল দুধার থেকে কোনাকুনি করে, গিঁটটা চালাকি করে এমনভাবে দিল যাতে সহজে খোলা না যায়। উদ্দেশ্য ছিল বুড়ি যখন গিঁট খোলা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে তখন সাময়িকভাবে তাকে অন্যমনস্ক করে দিয়ে অসতর্ক মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করা। লোহার পাতটা যোগ করা হয়েছিল ওজনের জন্য, যাতে বুড়ি বুঝতে না পারে যে জিনিসটা আসলে কাঠের। এ সবই এ পর্যন্ত তার সোফার তলায় সযত্নে রাখা ছিল। বন্ধক রাখার জিনিসটা সে সবে বার করেছে এমন সময় বাইরে কোথায় যেন কে চেঁচিয়ে উঠল :

"ছ'টা বেজে গেছে অনেকক্ষণ হল!"

"ওহো! তাই নাকি!"

রাস্‌কোলনিকভ ছুটে গেল দরজার কাছে, কান পাতল, টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে বিড়ালের মতো চুপিসাড়ে সন্তর্পণে সিঁড়ির তেরোটা ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করল নিচে। এখন সামনে আছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি— রান্নাঘর থেকে কুড়ুলটা চুরি করা। কাজ যে কুড়ুল দিয়েই সারবে এটা বহুকাল হল স্থির করে রেখেছে। বাগানে কাজ করার উপযোগী একটা ভাঁজ করা ছুরিও তার ছিল। কিন্তু ছুরির ওপর, বিশেষত নিজের শক্তির ওপর তার তেমন আস্থা না থাকায় শেষপর্যন্ত কুড়ুলে এসে ঠেকে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এ ব্যাপারে তাবৎ যে সমস্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সে গ্রহণ করেছে তার একটি বিশেষত্ব : চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে যত এগিয়ে যেতে থাকে ততই বেশি করে সিদ্ধান্তটা তার নিজের চোখে বিশ্রী ও অসঙ্গত মনে হতে থাকে । ভেতরে-ভেতরে যুঝে-যুঝে এত ক্ষতবিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও সারা সময়ের মধ্যে মুহূর্তের জন্যও নিজের পরিকল্পনাকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে সে আস্থা রাখতে পারছিল না।

এমনকি যদি কখনও এমন হত যে সমস্ত কিছুর চুলচেরা সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করার পর মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না রেখে সে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে সম্ভবত পুরো ব্যাপারটাকেই সে বাতিল করে দিত উদ্ভট, পৈশাচিক ও অসম্ভব বলে। কিন্তু অমীমাংসিত খুঁটিনাটি ও সন্দেহ সংশয় তখন এত পরিমাণ ছিল যে সেগুলোর কূলকিনারা মেলে না। কুড়ুল কোথায় পাওয়া যেতে পারে এই তুচ্ছ প্রশ্নটা নিয়ে সে এতটুকু মাথা ঘামায়নি, কেননা এর চেয়ে সহজ আর কিছু ছিল না। ঘটনাটা এই যে নাস্তাসিয়া ঘন-ঘন বাড়ির বাইরে যায়— বিশেষত সন্ধ্যাবেলা। কখনও ছুটছে পাড়াপড়শির কাছে কখনও বা দোকানে। দরজা সবসময় হাঁ খোলা রেখেই যায়। এই নিয়েই বাড়িউলির সঙ্গে তার অহর্নিশ ঝগড়া। তাই সময় যখন আসবে তখন চুপিসাড়ে রান্নাঘরে ঢুকে কুড়ুলটা তুলে নেওয়া। পরে সব শেষ হয়ে গেলে— ঘণ্টাখানেক বাদে— আবার গিয়ে রেখে আসা— এই যা। তবে এখানেও সংশয় যে একেবারে ছিল না তা নয়। ধরা যাক এক ঘণ্টা বাদে সে ফিরে এলো কুড়ুলটাকে ফের জায়গায় রেখে দিতে, এমন সময় দেখা গেল নাস্তাসিয়াও ঠিক সেখানে হাজির, ফিরে এসেছে। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই পাশ কাটিয়ে চলে গিয়ে অপেক্ষা করে থাকতে হবে ফের কখন বেরোয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি ঠিক এই সময়ই কুড়ুলের দরকার হয়ে পড়ে— তখন তো খুঁজতে শুরু করে দেবে, চেঁচিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে বসবে— ব্যস, সন্দেহ এসে পড়বে, না হলেও সন্দেহের একটি কারণ অন্তত হবে।

তবে এগুলো নেহাত বাহ্য—এ নিয়ে সে ভাবতেই শুরু করেনি, ভাবার অবকাশও তার ছিল না। তার ভাবনা ছিল মূল বিষয়টিকে নিয়ে। খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলোকে সে সরিয়ে রেখেছিল যতক্ষণ না নিজে *সমস্ত কিছু সম্পর্কে নিশ্চিন্ত* হতে পারছে। কিন্তু

এই শেষ কাজটিই মনে হয় দস্তুরমতো অসাধ্য। তার নিজের অন্তত তাই মনে হচ্ছিল। যেমন, সে ধারণায় আনতে পারছিল না এই নিয়ে তার ভাবনাচিন্তার কখনও অবসান ঘটবে কিনা— *স্রেফ উঠে* দাঁড়িয়ে সোজা সে যেতে পারবে কিনা সেখানে। এমনকি তার এই সেদিনের *যাচাই*, অর্থাৎ চূড়ান্ত পর্যায়ে সরেজমিনে তদন্ত করার উদ্দেশ্যে স্থান পরিদর্শন— আসলে সে যা করতে যাচ্ছে তা *যাচাই করে দেখার* একটা চেষ্টামাত্র। আসল ব্যাপার থেকে তা অনেকটা দূরে। এ যেন অনেকটা : 'যাই, নিজের চোখে গিয়ে হালচাল দেখে আসি। মিছিমিছি স্বপ্ন দেখা কেন?' তখন সঙ্গে-সঙ্গে ভেঙে পড়েছিল তার সংযমের বাঁধ, নিজের ওপর প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে সে থুতু ফেলেছিল, পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে তার মনে হচ্ছে নৈতিক মীমাংসার অর্থে বুঝিবা প্রশ্নটির সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ সে শেষ করে ফেলেছে। তার বিবেক সংক্রান্ত কূটতর্কের মীমাংসা ক্ষুরধার হয়ে উঠেছিল, নিজের ভেতর থেকে সে আর কোন সচেতন বাধা খুঁজে পাচ্ছে না। তবু যেন নিজেকে সে পুরোপুরি বিশ্বাসও করতে পারছে না। এখন সে দাসের মতো পরনির্ভরশীল, আপত্তির খোঁজে মরিয়া হয়ে চারদিক হাতড়ে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন গায়ের জোর খাটিয়ে তাকে *ঠেলে* দিচ্ছে কাজটা করতে। এই শেষ দিনটি বড় আকস্মিকভাবে এসে পড়ল, এবং এক কোপে সমস্ত কিছুর সমাধান ঘটিয়ে দিয়ে বলতে গেলে তার ওপর সম্পূর্ণ যান্ত্রিক এমন এক প্রভাব সৃষ্টি করল, যে মনে হচ্ছিল বুঝি বা কেউ, কোন অতিপ্রাকৃত, অপ্রতিরোধ্য শক্তি তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছে, সে অন্ধের মতো তাকে অনুসরণ করছে, বাধা দিতে পারছে না তাকে। যেন তার পোশাকের বেশ খানিকটা অংশ চলন্ত গাড়ির চাকার সঙ্গে বেধে গেছে, গাড়ি তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে চাকার তলায়।

প্রথম-প্রথম— সেটা অবশ্য অনেককাল আগের কথা—তাকে আকর্ষণ করত একটি প্রশ্ন : কেন প্রায় সব অপরাধ এত সহজে প্রকাশ পেয়ে যায়, মীমাংসিত হয় এবং কেনই বা প্রায় সব অপরাধীই রহস্য সমাধানের এত স্পষ্ট সূত্র রেখে যায়? অল্প-অল্প করে সে উপনীত হয় বিচিত্রমুখী কৌতূহলোদ্দীপক এক সিদ্ধান্তে। তার মতে, অপরাধ গোপন করা অসম্ভব বলে ততটা নয়, মূল কারণ আসলে নিহিত আছে স্বয়ং অপরাধীর মধ্যে। অপরাধ সংঘটনের মুহূর্তে অপরাধীর নিজের এবং— প্রায় সব অপরাধীরই— ইচ্ছাশক্তি ও বিচারশক্তি অনেকটা হ্রাস পেয়ে যায়, তার বদলে তাকে পেয়ে বসে বিপরীত একটি শক্তি—শিশুসুলভ চাপল্য। অথচ ঠিক এই মুহূর্তেই তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল বিচারশক্তি ও সতর্কতাবোধ। তার মতে, দেখা যায়, এই বিচারশক্তিহীনতা এবং ইচ্ছাশক্তি হ্রাস অসুস্থতার মতো মানুষের ওপর ভর করে, ধীরে-ধীরে বিকশিত হয়ে অপরাধ সংঘটনের স্বল্পক্ষণ আগে উপনীত হয় সঙ্কট মুহূর্তে, ওই একই আকারে চলতে থাকে অপরাধের *ঠিক* মুহূর্তটিতে এবং তার

পরেও আরও বেশ খানিকক্ষণ— ইতরবিশেষ ঘটে ব্যক্তিবিশেষে। এরপর যে কোন ব্যাধির মতোই কেটে যায়। প্রশ্ন হল ব্যাধিই কি তাহলে অপরাধের জন্ম দেয়, নাকি অপরাধ তার বিশেষ স্বভাববশত ব্যাধিজাতীয় কিছুর সহচর হয়? —সে নিজে এ প্রশ্ন সমাধানে সক্ষম বলে এখন পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারছে না।

এ ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর সে স্থির করল যে ব্যক্তিগতভাবে তার ক্ষেত্রে, তার কাজে ওরকম ব্যাধির প্রকোপ হওয়ায় সম্ভাবনা নেই এবং সে যে পরিকল্পনা করে রেখেছে তা বাস্তবে প্রয়োগ করার সময় বিচারশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে, সর্বক্ষণ তার সঙ্গে থাকবে। ... থাকবে একমাত্র এই কারণে যে তার মস্তিষ্কপ্রসূত বস্তুটি 'অপরাধ নয়'।... যে যুক্তির সাহায্যে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল তার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি আমরা আর এখানে উল্লেখ করলাম না। অমনিতেই আমরা বড় বেশি দূর চলে এসেছি। ...শুধু এই যোগ করতে পারি যে কাজের বাস্তব ও খাঁটি বৈষয়িক বাধা-বিপত্তিগুলির ভূমিকা তার চিন্তায় একান্ত গৌণ ছিল। তার ধারণায় এগুলোর ওপর যদি নিজের সমস্ত ইচ্ছাশক্তি, সমস্ত বিচারশক্তি টিকিয়ে রাখা যায়, তবেই কাজের সঙ্গে, কাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যাবতীয় খুঁটিনাটির সঙ্গে পরিচয়ের পালা যখন আসবে তখন, যথাসময়ে সবগুলোকেই জয় করা যাবে।... কিন্তু কাজ এখনও শুরু হল না। অথচ নিজের চূড়ান্ত মীমাংসার ওপর তার আস্থা কমে যেতে শুরু করেছে। সময় যখন এলো তখন কিন্তু পুরো ব্যাপারটা ঘটল একেবারে অন্যভাবে— কতকটা অনিচ্ছাকৃতভাবে এমনকি প্রায় আকস্মিকভাবে।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার আগেই তাকে কানাগলিতে নিয়ে ফেলল অতি তুচ্ছ একটি ঘটনা। বাড়িউলির হেঁসেলের কাছাকাছি আসার পর যখন দেখতে পেল হেঁসেলের দরজাটা যথারীতি হাঁ করে খোলা রয়েছে তখন সে সন্তর্পণে আড়চোখে ভেতরে উঁকি মেরে দেখে আগেভাগে নিশ্চিত হতে চাইল নাস্তাসিয়ার অনুপস্থিতিতে সেখানে খোদ বাড়িউলি আছে কিনা, যদি না থাকে তাহলে বাড়িউলির ঘরের দরজা ভালো মতো বন্ধ আছে কিনা। তা না হলে রাস্‌কোলনিকভ্ যখন কুড়ুল নিতে ঢুকবে তখন দৈবক্রমে সেও সেখান থেকে মাথা বাড়িয়ে তাকে দেখে ফেলতে পারে। রাস্‌কোলনিকভ্ কী আশ্চর্যই না হল যখন হঠাৎ তার চোখে পড়ে গেল যে নাস্তাসিয়া এবারে বাড়িতে, রান্নাঘরেই আছে; শুধু তাই নয়, কাজে ব্যস্ত আছে—একটা চুপড়ি থেকে কাচা জামাকাপড় নিয়ে দড়িতে মেলছে! রাস্‌কোলনিকভ্‌কে দেখতে পেয়ে সে কাপড় মেলা বন্ধ করে তার দিকে ফিরে তাকাল, জায়গাটা পেরোতে রাস্‌কোলনিকভের যতক্ষণ সময় লাগল ততক্ষণ তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল তাকে। রাস্‌কোলনিকভ্ চোখ ফিরিয়ে নিয়ে এমনভাবে জায়গাটা পার হয়ে গেল যেন ওকে লক্ষ্যই করেনি। কিন্তু কাজের দফারফা : কুড়ুল পাওয়া গেল না! দারুণ হকচকিয়ে গেল সে।

ফটকের নিচ দিয়ে যেতে-যেতে মনে-মনে ভাবল : 'কিন্তু কী বলে আমি ভাবতে পারলাম, কেন আমি ধরে নিয়েছিলাম যে ঠিক এই মুহূর্তে ও অবশ্যই বাড়ি থাকবে না? কেন, কেনই বা আমি এত নিশ্চিত ছিলাম?' রাস্‌কোলনিকভ দমে গেল, এমনকি যেন খানিকটা আহতও হল। রাগে জ্বলেপুড়ে নিজেকে নিয়ে নিজেরই হাসতে ইচ্ছে করছিল তার। ...একটা অন্ধ, জান্তব ক্রোধ তার ভেতরে টগবগ করতে লাগল।

ফটকের নিচে এসে চিন্তিতভাবে থমকে দাঁড়াল। বেড়াতে যাবার ভান করে রাস্তায় বের হতে হচ্ছে এটা তার কাছে বিরক্তিকর লাগছিল। বাড়ি ফিরে আসা— সেটা আরও বিরক্তিকর। 'ইস্ কী সুযোগই না হাতছাড়া হয়ে গেল!—চিরকালের মতো হাতছাড়া হয়ে গেল!' ফটকের নিচে দারোয়ানের অন্ধকার ছোট্ট খুপরিটার ঠিক উলটো দিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে সে বলল। খুপরির দরজাও খোলা। হঠাৎ চমকে উঠল রাস্‌কোলনিকভ্। তার দুই পা দূরে দারোয়ানের খুপরির ভেতরে ডান দিকের বেঞ্চের তলা থেকে কিসের একটা ঝলক ঠিকরে পড়ছে তার চোখে। চারপাশে তাকিয়ে দেখল— কোথাও কেউ নেই। পা টিপে-টিপে এগিয়ে গেল দারোয়ানের খুপরির দিকে, দুটো ধাপ বেয়ে ভেতরে নেমে নিচু গলায় ডাকল দারোয়ানকে। 'যা ভেবেছিলাম তাই, ঘরে নেই! আছে কাছে-পিঠে, উঠোনেই কোথাও হবে, কেননা দরজা হাঁ করে খোলা।' সে দ্রুত ছুটে গেল কুড়ুলটার দিকে। কুড়ুলই বটে! বেঞ্চের তলায় দুটো চেলাকাঠের মাঝখানে। সেখান থেকে টান দিয়ে বের করে ঘর থেকে বেরোবার আগেই, ঝটপট ফাঁসটার সঙ্গে আটকে ঝুলিয়ে দিল, তারপর পকেটে দুহাত গুঁজে বেরিয়ে এলো দারোয়ানের ঘর ছেড়ে। কারও নজরে পড়ল না! বিচারশক্তি দিয়ে কাজ না হোক, শয়তানে করে দেবে। মনে-মনে এই কথা ভেবে অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। এই ঘটনায় তার উৎসাহ বেড়ে গেল।

কারও মনে যাতে এতটুকু সন্দেহের উদ্রেক না হয় এই জন্য সে ধীরেসুস্থে *গুরুগম্ভীর চালে* পথ চলতে লাগল। পথচারীদের দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করছিল না, এমনকি চেষ্টা করছিল তাদের মুখের দিকে আদৌ না তাকাতে, যতদূর সম্ভব লোকজনের নজরে না পড়তে। এইসময় তার মনে পড়ে গেল নিজের মাথার টুপিটার কথা। 'হা ভগবান! গত তিনদিন আগেও আমার কাছে টাকা ছিল, অথচ তার বদলে টুপি কিনতে পারলাম না!' বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো শাপশাপান্ত।

দৈবক্রমে একটা দোকানের ওপর এক চোখের কোনার একঝলক দৃষ্টি পড়ে যেতে সে দেখতে পেল সেখানে দেয়ালঘড়িতে ইতিমধ্যে সাতটা বেজে দশমিনিট পেরিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি করতে হয়, অথচ ঘুরপথ না ধরলেও নয়, উলটো দিক থেকে ঘুরে যেতে হবে বাড়িটার দিকে।

আগে যখন এসব তাকে মনে-মনে কল্পনা করতে হত তখন সময়-সময় মনে হত যেন বড় বেশি ভয় পাচ্ছে। কিন্তু এখন আর তেমন ভয় লাগছিল না—এমনকি,

একেবারেই লাগছিল না। এমনকি এই মুহূর্তে তার মন জুড়ে ছিল একেবারে অবান্তর কতকগুলি চিন্তা। অবশ্য তার কোনটাই বেশিক্ষণ স্থায়ী হচ্ছিল না। ইউসুপভ্ বাগানের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে এমনও হল যে সে প্রায় ডুবে গিয়েছিল অন্য একটি চিন্তায় : তার মনে হচ্ছিল উঁচু-উঁচু ফোয়ারা বসাতে পারলে শহরের স্কোয়ারগুলিতে কী তাজা হাওয়াই না পাওয়া যেত। ধীরে-ধীরে সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুল যে গ্রীষ্মকালীন প্রমোদোদ্যানকে যদি মার্স প্রাঙ্গণ জুড়ে প্রসারিত করা যায় এবং এমনকি মিখাইলোভ্স্কি প্রাসাদের উদ্যানগুলির সঙ্গে যোগ করা যায় তাহলে শহরের পক্ষে বড় চমৎকার ও উপকারী হয়। এইসময় হঠাৎ তার কৌতূহল উদ্রেক করল আরও একটি জিনিস : কেন, ঠিক এই বড়-বড় শহরের মানুষজনের মধ্যেই কেন যে শহরে এমন সমস্ত অংশে বসবাস করার ও বসত পাতার একটা অদ্ভুত প্রবণতা দেখা যায় কে জানে? শুধু প্রয়োজনের তাগিদে তাই বা বলা যায় কী করে? না আছে কোন পার্ক না আছে কোন ফোয়ারা। আছে কেবল জঞ্জাল, পূতিগন্ধ ও রাজ্যের নোংরা জিনিস। এইসময় তার মনে পড়ে গেল সেন্নায়াতে তার নিজের ঘুরে বেড়ানোর কথা। মুহূর্তের জন্য তার হুঁশ ফিরে এলো। মনে-মনে ভাবল, কী সব আবোল-তাবোল চিন্তা! নাঃ, এর চেয়ে একেবারে কিছু না ভাবাও ভালো!

'দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত যে সব মানুষকে ফাঁসির মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় সম্ভবত তাদেরও ভাবনাচিন্তা পথে যা যা জিনিস চোখের সামনে পড়ে সেগুলোর ওপর এরকম আটকে যায়', তার মাথার ভেতর ঝলক দিয়ে উঠল চিন্তা। কিন্তু সে কেবল ক্ষণিকের বিদ্যুৎ চমকের মতো। নিজেই আবার তাড়াতাড়ি করে নিভিয়ে দিল চিন্তাটা। '...এইবার এসে গেছে কাছাকাছি। ...এই যে বাড়িটা, এই তো বাড়ির ফটক।...' হঠাৎ কোথায় যেন ঢং করে বাজল একটা ঘণ্টা। 'কী ব্যাপার? তাহলে কি এখন সাড়ে আটটা? হতেই পারে না, নির্ঘাত ফাস্ট যাচ্ছে ঘড়িটা!'

এবারেও কপাল ভালো। ফটকে কোন ব্যাঘাত ঘটল না। শুধু তাই নয়, ঠিক এই মুহূর্তে যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই ঠিক তার সামনে দিয়ে ফটকের ভেতরে এসে ঢুকল খড় বোঝাই একট প্রকাণ্ড গাড়ি, তার ঢোকার মুখে সর্বক্ষণ তাকে আড়াল দিয়ে। গাড়িটা যেই ফটক দিয়ে আঙিনার ভেতরে এসে ঢুকল অমনি সে চোখের পলকে সাঁৎ করে ডানদিকে চলে গেল। গাড়ির ওপাশ থেকে ভেসে এলো বেশ কিছু কণ্ঠের হাঁকডাক, তর্কবিতর্ক। কিন্তু তাকে কেউ লক্ষ করল না, কেউ তার সামনাসামনি পড়ল না। এই বিশাল চারকোনা আঙিনার মুখোমুখি বহু জানলা এই মুহূর্তে খোলা ছিল। কিন্তু রাস্কোলনিকভ্ মাথা তুলে তাকাল না। সে শক্তি তার ছিল না। বুড়ির ঘরে যাবার সিঁড়ি কাছেই, ফটকের ঠিক ডানদিকে। এখন সে সিঁড়িতে।...

হৃৎপিণ্ড ধড়াস-ধড়াস করছে, তাই দম নিয়ে বুকের ওপর হৃৎপিণ্ডের কাছটা হাত দিয়ে চেপে ধরে সঙ্গে-সঙ্গে আরও একবার হাতড়াতে-হাতড়াতে কুড়ুলটা ঠিকঠাক

করে নিল, তারপর সাবধানে চুপিসাড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করল। ওঠার পথে প্রতি মুহূর্তে উৎকর্ণ হয়ে রইল। কিন্তু সিঁড়িও সেই সময় একদম ফাঁকা, সব ঘরেরই দরজা বন্ধ। কারও মুখোমুখি হতে হল না। দোতলায় একটা ফাঁকা ফ্ল্যাট, তার দরজা অবশ্য হাট করে খোলা। সেখানে চুনকামের মিস্তিরিরা কাজ করছিল, কিন্তু তারাও ফিরে তাকাল না। একটু দাঁড়িয়ে সে ভেবে নিল, তারপর যথারীতি এগিয়ে গেল। 'অবশ্য এই লোকগুলো এখানে একেবারে না থাকলেই ভালো হত, তবে... ওদের ওপরে আরও দুটো তলা আছে।'

অবশেষে এই তো চারতলা, এই যে দরজা, এই তো উলটো দিকের ফ্ল্যাটটা। খালি ফ্ল্যাট। তিনতলায় বুড়ির ফ্ল্যাটের ঠিক নিচের ফ্ল্যাটটা— সমস্ত লক্ষণ দেখে মনে হয়— সেটাও খালি। দরজার গায়ে-পেরেক মেরে একসময় যে নামফলকটা সাঁটা ছিল সেটা এখন তুলে ফেলা হয়েছে— তার মানে ভাড়াটিয়া ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে গেছে। ... সে হাঁপাতে লাগল। মুহূর্তের জন্য তার মাথায় খেলে গেল একটা চিন্তা: 'চলে যাব নাকি?' কিন্তু প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে বুড়ির ফ্ল্যাটের দরজায় কান পাতল। কবরের নিস্তব্ধতা। তারপর আরও একবার কান পাতল সিঁড়িতে, নিচের দিকে। শোনার চেষ্টা করল অনেকক্ষণ ধরে, মন দিয়ে। ... তারপর শেষবারের মতো চারপাশে নজর বুলাল, নিজেকে একবার গুছিয়ে নিল, ঠিকঠাক হয়ে নিল, আরও একবার হাত দিয়ে দেখে নিল ফাঁসের মধ্যে কুড়ুলটা ঠিক আছে কিনা। 'আমাকে কি ফেকাসে দেখাচ্ছে? খুবই ফেকাসে দেখাচ্ছে কি?' তার মনে হল। 'বড্ড বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছি কি আমি? বুড়ি সন্দেহপ্রবণ।...তাহলে কি অপেক্ষা করব আরেকটু... বুকের ধড়ফড়ানি যতক্ষণ বন্ধ না হয়?...'

কিন্তু বুকের ধড়ফড়ানি আর বন্ধ হয় না। বরং উলটে, যেন ইচ্ছে করে, উত্তরোত্তর বেশি জোরাল হতে থাকে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ আর ধৈর্য ধরতে পারল না— উপরে হাত বাড়াল দরজার ঘণ্টির দিকে, ঘণ্টি বাজাল। আধ মিনিট খানেক বাদে আবার বাজাল, আরও জোরে।

কোন সাড়াশব্দ নেই। আবার বাজানো অর্থহীন। তাছাড়া তার আত্মসম্মানেও বাধছিল। বুড়ি অবশ্যই বাড়িতে, কিন্তু তার মন সন্দেহপ্রবণ, বাড়িতে সে একা। বুড়ির অভ্যাস অল্পস্বল্প জানা ছিল রাস্‌কোল্‌নিকভের।... আরও একবার দরজার গায়ে কান পাতল। হয় তার অনুভূতি খুব তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল— যেটা আদৌ ভাবা যায় না —অথবা বাস্তবিকই বেশ শোনা যাচ্ছিল... সে যাই হোক না কেন হঠাৎ সে ধরতে পারল দরজার গা-তালার হাতলে সন্তর্পণে হাত পড়ার মতো খুট করে আওয়াজ আর দরজার একেবারে গায়ে জামাকাপড়ের ঘষা লাগার খসখস। সহজে যাতে ধরা না পড়ে যায় এমনভাবে কে যেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দরজার গা-তালার ঠিক পাশটিতে, ঠিক যেমন ও নিজে আছে এখানে, দরজার ওপাশে ওরই মতো ভেতরের

সেই জনও কান ঠেকিয়ে রেখেছে দরজার গায়ে। লুকিয়ে ভেতর থেকে কান পেতে শুনছে।

রাস্কোল্‌নিকভ্ ইচ্ছে করে নড়েচড়ে উঠে সামান্য গলা চড়িয়ে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল, যাতে কেউ মনে না করে যে সে আত্মগোপন করছে। তারপর ঘণ্টি বাজাল তৃতীয়বার। এবারে আস্তে, সাবলীল ভঙ্গিতে। অসহিষ্ণুতার এতটুকু পরিচয় আর সে দিল না। পরে পরিষ্কার মনে করে সে দেখেছে— এই বিশেষ মুহূর্তটি তার স্মৃতিপটে চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে গেছে। সে ভেবে কূল পেত না কোথা থেকে এত চালাকি সেদিন তার মাথায় খেলেছিল, বিশেষ করে যখন তার বুদ্ধিসুদ্ধি মুহুর্মুহু লোপ পাবার উপক্রম হচ্ছিল এবং নিজের শরীর সম্পর্কে প্রায় কোন উপলব্ধিই তার ছিল না!... এক মুহূর্ত পরেই কানে এলো ছিটকিনি খোলার আওয়াজ।

সাত

দরজা খুলে গেল সেই আগের বারের মতোই এবারেও সামান্য একচিলতে ফাঁক হয়ে। আবারও অন্ধকার ভেদ করে শাণিত দুচোখের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ওকে বিঁধল। এই সময় রাস্কোল্‌নিভের বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল, আরকটু হলেই একটা মারাত্মক ভুল করে বসছিল সে।

ওরা দুজন ছাড়া ধারেকাছে আর কেউ নেই দেখে বুড়ি ঘাবড়ে যেতে পারে এই আশঙ্কা করে এবং তার চেহারা ও বেশভূষায় বুড়ি যে আশ্বস্ত হবে তেমন ভরসা না থাকায় দরজার হাতল ধরে সে সামনের দিকে টান মারল। তার ভয় ছিল পাছে বুড়ি আবার কিছু ভেবে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। ব্যাপারটা লক্ষ করেও বুড়ি কিন্তু উলটে দরজা নিজের দিকে হেঁচকা টান মারার চেষ্টা করল না। তবে ওপাশ থেকে দরজার গা-তালার হাতল ছেড়েও দিল না। তাই রাস্কোলনিকভ দরজা ধরে হেঁচকা টান মারতে বুড়ি প্রায় বাইরে সিঁড়ির মুখে বেরিয়ে পড়ল। সে যখন দেখল বুড়ি তার ভেতরে যাবার পথ আড়াল করে আড়াআড়িভাবে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে তখন সে সোজা এগিয়ে গেল তার দিকে।

"নমস্কার আলিওনা ইভানোভ্না," যতটা স্বচ্ছন্দভাবে পারা যায় কথা শুরু করল, কিন্তু কণ্ঠস্বর তার নিয়ন্ত্রণে রইল না— কথা আটকে যেতে লাগল, গলা কাঁপতে লাগল। "আমি ... আপনার জন্যে... নিয়ে এসেছি... একটা জিনিস। ... বরং আসুন না এদিকে... একটু আলোতে..." বলেই বুড়ি যেখানে ছিল সেখানে তাকে ফেলে রেখে বিনা আমন্ত্রণে সটান ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতরে। বুড়ি তার পেছনে-পেছন ছুটে এলো। এবারে তার মুখে কথা ফুটল।

"হা ভগবান! কী চাই আপনার?... আপনি কে? আপনার মতলবটা কী?"

"মাফ করবেন, আলিওনা ইভানোভ্না।... আপনার চেনা লোক...

রাসকোল্‌নিকভ্‌... এই যে দেখুন, বন্ধক দেবার জন্যে একটা জিনিস নিয়ে এসেছি— সেদিন যেটার কথা আপনাকে বলেছিলাম," এই বলে জিনিসটা বাড়িয়ে ধরল তার দিকে।

বুড়ি ওটার ওপর দৃষ্টিপাত করতে যাচ্ছিল, কিন্তু পরক্ষণেই তার দৃষ্টি সরাসরি এসে ঠেকল অনাহূত আগন্তুকটির চোখের ওপর। সে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। তার দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছিল ক্রোধ আর অবিশ্বাস। মিনিটখানেক কেটে গেল। রাস্‌কোলনিকভের মনে হচ্ছিল বুড়ির দৃষ্টিতে যেন ফুটে উঠেছে উপহাসের ভাব, যেন ইতিমধ্যে সব তার কাছে ধরা পড়ে গেছে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ বুঝতে পারছিল যে তার বুদ্ধি লোপ পেতে চলেছে, কেমন যেন ভয়-ভয় করছে, এত ভয় করছে যে মনে হচ্ছিল বুড়ি যদি একটি কথাও না বলে আরও আধ-মিনিট মতন ওইভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকত, তাহলে সে পালিয়ে যেত।

"বা, আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছেন কেন? মনে হচ্ছে যেন চিনতে পারছেন না!" সেও রাগতস্বরে বলে উঠল। "ইচ্ছে হলে নিন, নইলে অন্যের কাছে যাব। আমার সময় নেই।"

এ কথা সে যে ভেবেচিন্তে বলেছিল এমন নয়— হঠাৎই অমনি-অমনি বেরিয়ে গিয়েছিল তার মুখ ফসকে।

বুড়ির চমক ভাঙল, আগন্তুকের কথা বলার সাবলীল ভঙ্গিতে সম্ভবত সে আশ্বস্ত হল।

"কিন্তু কী ব্যাপার বাবা... বলুন তো? কেন অমন আচমকা... এর মানে কী?" বন্ধকের দিকে দৃষ্টিপাত করে সে জিগ্‌গেস করল।

"রুপোর সিগারেট-কেস। গতবার আমি বলেছিলাম না!"

বুড়ি হাত বাড়াল।

"একি আপনাকে অমন ফেকাসে দেখাচ্ছে কেন? হাতও কাঁপছে দেখছি! স্নান করার পর ঠাণ্ডা লেগেছে নাকি বাবা?"

"জ্বর", চটপট জবাব দিল সে। "খাবার না জুটলে ফেকাসে দেখাবে না তো কী?" কোনরকমে কথাগুলো উচ্চারণ করল সে। আবার তার বোধ হল যেন শরীরের শক্তি চলে যাচ্ছে। কিন্তু উত্তরটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হল। বুড়ি তাই প্যাকেটটা হাতে নিল।

"এটা কী?" বন্ধকটা হাতে নিয়ে ওজন আন্দাজ করতে-করতে এবং আরও একবার একাগ্র দৃষ্টিতে রাস্‌কোল্‌নিকভের দিকে তাকিয়ে সে জিগ্‌গেস করল।

"জিনিসটা..., সিগারেট-কেস.... রুপোর... দেখুন একবার।"

"কোথায়, রুপোর বলে তো মনে হচ্ছে না! ইস্‌, কী শক্ত করে বেঁধেছেন!" ডুরির বাঁধন খোলার চেষ্টা করতে-করতে বেশি আলো পাবার উদ্দেশ্যে সে জানলার দিকে ফিরল। গুমোট আবহাওয়া সত্ত্বেও ঘরের সব জানলা বন্ধ ছিল। কয়েক মুহূর্তের

জন্য রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে ছেড়ে দিয়ে সে তার দিকে পিঠ করে দাঁড়াল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তার ওভারকোটের বোতাম খুলে ফাঁস থেকে কুড়ুলটা ছাড়িয়ে নিল, কিন্তু তখনই সম্পূর্ণ বের না করে ডান হাত ঠেকিয়ে পোশাকের তলাতে চেপে রাখল মাত্র। হাত ভীষণ দুর্বল লাগছে। সে নিজে অনুভব করতে পারছিল প্রতি মুহূর্তে হাতদুটো ক্রমে বেশি করে অসাড় ও অনড় হয়ে আসছে। তার ভয় হচ্ছিল এই বুঝি কুড়ুলটা হাত ফসকে মাটিতে পড়ে যায়!... হঠাৎ যেন মাথা ঘুরতে লাগল।

"কিন্তু এ কী মুড়ে রেখেছে এর মধ্যে!" বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে বুড়ি তার দিকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য নড়েচড়ে উঠল।

আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা যায় না। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ কুড়ুলটা সম্পূর্ণ বের করে ফেলল, দুহাতে ধরে এক ঝটকায় ওপরে তুলল। কী করতে যাচ্ছে সে বোধ প্রায় লুপ্ত হয়েছে তার। অবলীলাক্রমে অনেকটা যন্ত্রচালিতের মতো কুড়ুলের ভোঁতা দিকটা বসিয়ে দিল বুড়ির মাথায়। এইমুহূর্তে যা কাজ করেছিল তা বুঝি বা ওর নিজের শক্তি নয়। কিন্তু কুড়ুল বসিয়ে দেবার সঙ্গে-সঙ্গে ওর ভেতরে নিজের শক্তি আবার জেগে উঠল।

বুড়ির মাথায় কখনও টুপি থাকে না— এবারেও ছিল না। হালকা রঙের, পাক ধরা, পাতলা চুল বরাবরের অভ্যাসমতো জবজবে তেলে মাখা, ইঁদুরের লেজের মতো সরু বেণী করে পাকিয়ে শিঙের চিরুনির ভাঙা টুকরো দিয়ে গুছিয়ে ঘাড়ের ওপরে তোলা। চুলের সঙ্গে গাঁথা চিরুনির টুকরোটা মাথার পেছনে উঁচিয়ে আছে। কোপটা পড়েছিল সরাসরি মাথার চাঁদিতে— এ ব্যাপারে সহায়তা করেছিল তার খর্বতা। বুড়ি চেঁচাল, কিন্তু অতি ক্ষীণকণ্ঠে। পুরো শরীরটা ধীরে-ধীরে ছেড়ে দিল মেঝের ওপর, যদিও তখনও দুহাত মাথার দিকে ওঠানোর মতো শক্তি তার ছিল। একহাতে তখনও ধরা ছিল 'বন্ধক'। এবারে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ঘা মারল আরেক বার, তারপর আরও একবার, কুড়ুলের সেই ভোঁতা দিক দিয়ে সেই একই জায়গায়— মাথার চাঁদি লক্ষ করে। গেলাস উলটে গড়িয়ে পড়ার মতো হুড়হুড় করে গড়িয়ে পড়ল রক্তস্রোত। দেহটা পড়ে গেল চিত হয়ে। রাস্‌কোল্‌নিকভ পেছনে সরে গিয়ে পড়ে যেতে দিল। পরক্ষণেই ঝুঁকে পড়ল মুখের ওপর। বুড়ির প্রাণ ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে। চোখজোড়া বিস্ফারিত, যেন কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, বলিরেখায় আচ্ছন্ন কপাল আর সারা মুখ, খিঁচুনির ফলে বিকৃত হয়ে গেছে।

মড়ার পাশে মেঝেতে কুড়ুলটা রেখে, রক্তস্রোতে যাতে মাখামাখি না হয়ে যায় সে বিষয়ে হুঁশিয়ার থেকে তৎক্ষণাৎ সে হাত ঢুকিয়ে দিল বুড়ির পোশাকের ডান পকেটে— সেই পকেটটাতে যেখান থেকে বুড়ি সেবার চাবির গোছা বের করেছিল। তার মাথা পুরো মাত্রায় কাজ করছিল। এখন আর চোখে অন্ধকার দেখছিল না, মাথাও ঘুরছিল না। তবে হাত আগের মতোই কাঁপছিল। পরে সে মনে করে দেখেছে

যে তখন সে খুব হুঁশিয়ার ও সাবধান হয়ে কাজ করছিল, রক্তের ছিটেফোঁটা যাতে না লাগে তার জন্য চেষ্টার ত্রুটি ছিল না তার। চাবির গোছা সে তৎক্ষণাৎ বের করে আনল। সবগুলো চাবি একটা ইস্পাতের রিং-এ গোছা করা— সেই সেবারে যেমন দেখেছিল। চাবির গোছা নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে সে ছুটে গেল শোবার ঘরে। ঘরটা খুবই ছোট। একপাশের দেয়ালের ধারে একটা বিশাল কলুঙ্গিতে সারি-সারি আইকন। আরেক দেয়ালের ধারে একটা বড় পালঙ্ক দস্তুরমতো টুকরো-টুকরো রেশমি কাপড়ের তালি দিয়ে তৈরি লেপ দিয়ে ঢাকা । তৃতীয় দেয়ালটার ধারে দেরাজ দেওয়া একটা আলমারি। একটা অদ্ভুত ব্যাপার: সবে সে গোছা থেকে চাবি নিয়ে আলমারিতে লাগিয়ে দেখার চেষ্টা শুরু করেছে, চাবির ঝনঝন আওয়াজ তার কানে এসে বাজছে, অমনি যেন একটা শিহরণ খেলে গেল তার সর্বাঙ্গে। আবারও হঠাৎ তার ইচ্ছে হতে লাগল সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যায়। কিন্তু সেটা ছিল নেহাত ক্ষণিকের। এখন আর সরে পড়ার উপায় নেই— দেরি হয়ে গেছে। নিজের দশা দেখে তার নিজেরই হাসি পাচ্ছিল। ঠিক এমন সময় হঠাৎই আরেকটা উদ্বেগজনক চিন্তা তার মাথায় ঘা মারল। তার হঠাৎ মনে হল বুড়ি সম্ভবত এখনও বেঁচে আছে, এখনও তার জ্ঞান ফিরে আসতে পারে। চাবির গোছা ও আলমারি ছেড়ে দিয়ে সে ছুটে গেল পেছনে যেখানে লাশটা পড়ে আছে। কুড়ুলটা নিয়ে আরও একবার তুলল বুড়ির মাথার ওপরে। কিন্তু নামাতে হল না। বুড়ি যে মারা গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঝুঁকে পড়ে আরও কাছ থেকে আরেকবার নিরীক্ষণ করার পর সে স্পষ্ট দেখতে পেল খুলিটা চুরমার হয়ে গেছে, এমনকি একপাশে খানিকটা সরে গেছে। সে আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে নিল। দরকার নেই, অমনিতেই তো দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে রক্ত জমে ছোটখাটো একটা ডোবার মতো হয়ে গেছে। এমন সময় লক্ষ করল বুঁড়ির গলায় একটু ডুরি ঝুলছে। ধরে টান মারল, কিন্তু ডুরিটা বেশ শক্তপোক্ত, ছিঁড়ল না। তার ওপর আবার রক্তে ভিজে গেছে। চেষ্টা করতে যাচ্ছিল জামার ভেতরে হাত গলিয়ে বের করে আনার, কিন্তু কিসে যেন আটকে যাচ্ছিল। কোথাও বেধে ছিল। ওপর দিক থেকে শরীরের ওপরেই তৎক্ষণাৎ কোপ মেরে ডুরিটা কেটে ফেলার উদ্দেশ্যে অধৈর্য হয়ে সে আবার কুড়ুল তুলতে গেল কিন্তু সাহসে কুলোল না। মিনিটদুয়েক চেষ্টার পর কুড়ুলের স্পর্শ থেকে গা বাঁচিয়ে অনেক কষ্টে ডুরিটা কেটে খুলে আনল, যদিও দুই হাত আর কুড়ুল রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল। তার ভুল হয়নি— টাকার থলি। ডুরিতে ঝুলছিল দুটো ক্রস— একটা সাইপ্রেস কাঠের, আরেকটা তামার, এছাড়া কলাই করা একটা ছোট্ট বিগ্রহ। সোয়েড চামড়ার ময়লা দাগধরা থলিটা আংটা পরানো, চারদিকে স্টিলের পাত। ভেতরটা একেবারে ঠাসাঠাসি। খুলে না দেখেই রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ওটা পকেটস্থ করল। ক্রসদুটো ছুঁড়ে ফেলে দিল বুড়ির বুকের ওপর। ফের ছুটল শোবার ঘরে— এবারে কুড়ুলটাও সঙ্গে নিল।

ভীষণ তাড়া ছিল তার। চাবির গোছা তুলে নিয়ে আবার কাজে লেগে গেল। কিন্তু সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। একটা চাবিও তালায় লাগছিল না। তার হাত কাঁপছিল বলে নয়, আসলে সে বারবার ভুল করছিল। যেমন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এটা সে চাবি নয়, খাপ খাচ্ছে না, তবু গোঁজার চেষ্টা। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, সে বুঝতে পারল এখানে অন্য ছোট-ছোট চাবির সঙ্গে মুখের কাছটায় খাঁজ কাটা এই যে বড় চাবিটা ঝুলছে এটা— সেবারেও তার মনে হয়েছিল— আদৌ আলমারির নয়, নির্ঘাত কোন ট্রাঙ্কের। আর সেই ট্রাঙ্কেই সম্ভবত সব জিনিস লুকানো আছে। আলমারিটা ছেড়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ খাটের তলায় ঢুকে হাতড়াতে লাগল— জানত, বুড়িরা সচরাচর ট্রাঙ্ক খাটের নিচেই রাখে। যা ভাবা গিয়েছিল তা-ই: সেখানে পাওয়া গেল বেশ বড়সড় আকারের হাত দেড়েকের বেশি লম্বা একটা ট্রাঙ্ক। তার ডালাটা স্ফীত আকারের, চারধারে ইস্পাতের পেরেক গেঁথে লাল মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো। খাঁজকাটা চাবিটা ঠিকই লেগে গেল। ট্রাঙ্ক খোলা হল। ওপরে, সাদা চাদরের তলায় খরগোসের চামড়ার ফারকোট— বাইরের দিকটা লাল সালুতে ঢাকা । তার নিচে রেশমি জামা, তারপর একটা শাল, তারও নিচে একেবারে তলায় মনে হয় শুধুই পুরানো ছেঁড়া কাপড়চোপড়। প্রথমেই লাল কাপড়ের পোশাকের গায়ে রক্তমাখা হাত মুছতে শুরু করল। 'লালের ওপর রক্তের লাল দাগ চোখে পড়বে না,' সে যুক্তি দিয়ে নিজের মনকে বুঝ দিতে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই তার টনক নড়ল। 'হা ভগবান!' আঁতকে উঠে সে মনে-মনে ভাবল, 'আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?'

ছেঁড়া কাপড়গুলো সবে নাড়াচাড়া শুরু করেছে এমন সময় ফারকোটটার নিচে থেকে গড়িয়ে পড়ল একটা সোনার ঘড়ি। এবারে চটপট সব জিনিস ওলটপালট করে দেখতে লাগল। বাস্তবিকই ছেঁড়া কাপড়চোপড়ের ফাঁকে-ফাঁকে গোঁজা ছিল টুকিটাকি সোনার জিনিস— হাতের বালা, গলার হার, কানের দুল, পিন ইত্যাদি— সম্ভবত সবগুলোই বন্ধক, কোনটা তামাদি হয়ে গেছে, কোনটার ছাড়ানোর মেয়াদ এখনও পার হয়ে যায়নি। কোন-কোনটা ছোট-ছোট খাপে রাখা, কোনটা বা স্রেফ খবরের কাগজে মোড়ানো— তবে নিখুঁতভাবে, যত্ন করে, দু-ভাঁজ করা কাগজের পাতার মধ্যে সব কয়টিই ডুরি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। এতটুকু কালবিলম্ব না করে, কোনটার মোড়ক বা খাপ না খুলে বিনা বাছবিচারে সেগুলো সে ঠাসতে লাগল নিজের প্যান্ট ও ওভারকোটের পকেটে। কিন্তু বেশি হাতানোর সুযোগ তার হল না।...

হঠাৎ কানে এলো বুড়ি যে ঘরে পড়ে আছে সেখানে কারও চলাফেরার আওয়াজ। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ থমকে পড়ার মতো স্থির হয়ে গেল। কিন্তু না, কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই— তাহলে, মনের ভুল। হঠাৎ স্পষ্ট শোনো গেল একটা অস্ফুট চিৎকার, কে যেন কাটা-কাটা অস্ফুট আর্ত চিৎকার করে থেমে গেল। তারপর আবার

কবরের নিস্তব্ধতা— মিনিটদুয়েক হবে। ট্রাঙ্কের সামনে উবু হয়ে বসে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌। তারপর এক ঝটকায় লাফিয়ে উঠে কুড়ুলটা বাগিয়ে ধরে শোবার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়ল।

ঘরের মাঝখানে বিশাল পোঁটলা হাতে দাঁড়িয়ে আছে লিজাভেতা। আতঙ্কে স্থির হয়ে তাকিয়ে রয়েছে খুন হয়ে যাওয়া দিদির নিষ্প্রাণ দেহটার দিকে। সারা মুখ সাদা, ছাই হয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে চেঁচানোর শক্তিও তার নেই। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে ভিতরের ঘর থেকে ছুটে আসতে দেখে সে পাতার মতো কাঁপতে লাগল, মৃদু শিহরণ খেলে গেল তার সর্বাঙ্গে, থেকে-থেকে টান ধরতে লাগল মুখের মাংসপেশীতে। একটা হাত সে একটু ওপরে তুলল, মুখ খুলতে গেল, কিন্তু মুখ ফুটে এতটুকু আর্তনাদ পর্যন্ত বের করতে পারল না। ধীরে-ধীরে রাস্‌কোল্‌নিকভের কাছ থেকে পিছু হটে কোনায় সরে যেতে লাগল তার ওপর সরাসরি স্থির দৃষ্টি রেখে। তবু চেঁচাল না। মনে হচ্ছিল দমে কুলোচ্ছে না। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ কুড়ুল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। লিজাভেতার ঠোঁট বেঁকে গেল করুণ ভঙ্গিতে— একটা ছোট শিশু কোন কারণে ভয় পেতে শুরু করলে যেমনভাবে ভয়ের বস্তুটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে এবং চিৎকারের উপক্রম করে। এই বেচারি লিজাভেতা ছিল এত সরল, নিরীহ ও চিরকালের ভীতু স্বভাবের যে নিজের মুখটা বাঁচানোর জন্য হাত পর্যন্ত তুলতে পারল না, যদিও সেই মুহূর্তে ওটাই হত অবশ্য প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক ভঙ্গি, কেননা কুড়ুল তোলা হয়েছিল সোজা তার মুখ লক্ষ করে। সে কেবল তার খালি বাঁ হাতটা সামান্য ওঠাল, তবে মুখের ধারেকাছে নয়। ধীরে-ধীরে বাড়িয়ে দিল সামনে, রাস্‌কোল্‌নিকভের দিকে, তাকে সরিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে। ধারাল ফলকের আঘাত সোজা এসে পড়ল মাথার খুলিতে, সঙ্গে-সঙ্গে কপালের ওপর দিককার পুরো অংশটা, প্রায় মাথার চাঁদি পর্যন্ত কেটে বসে গেল। মুহূর্তের মধ্যে সে লুটিয়ে পড়ল। রাস্‌কোল্‌নিকভের তখন চৈতন্য লোপ পাবার দশা। লিজাভেতার পোঁটলাটা তুলে নিল, আবার কী ভেবে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সামনের ঘরে ছুটে গেল।

উত্তরোত্তর তাকে গ্রাস করে ফেলতে লাগল বিভীষিকার উপলব্ধি— বিশেষত সম্পূর্ণ আকস্মিক এই দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ডের পর। তার ইচ্ছে হচ্ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে পালিয়ে যায়। তখন যদি সঠিক দেখতে পাবার ও বিচার-বিবেচনা করার মতো মনের অবস্থা ওর থাকত, ও যদি ধারণায় আনতে পারত কী জটিল, কতটা নৈরাশ্যজনক, বীভৎস ও উদ্ভট ওর মানসিক অবস্থা, যদি বুঝতে পারত এই বাড়ি থেকে কোনমতে ছাড়া পেয়ে বাড়ি পৌঁছতে হলে আরও কত বাধাবিপত্তি জয় করতে হবে, হয়ত বা আরও কতো দুষ্কর্মে ওকে জড়িয়ে পড়তে হবে তাহলে খুব সম্ভব এসব ছেড়ে দিয়ে সে তৎক্ষণাৎ নিজেই নিজের কুকীর্তির কথা যথাস্থানে গিয়ে ঘোষণা করে আসত। কাজটা সে হয়ত করত নিজের জন্য ভয়ে ততটা নয়, যতটা

তার কৃতকর্মের জন্য আতঙ্ক ও বিতৃষ্ণাবশত। বিশেষ করে বিতৃষ্ণার ভাবটা দুর্দম হয়ে উঠতে লাগল প্রতি মুহূর্তে। শত প্রলোভন দেখালেও এই মুহূর্তে ট্রাঙ্কটার কাছে তো ঘেঁষতই না, এমনকি ঘরে ঢুকতেও রাজি হত না।

কিন্তু একধরনের উদ্‌ভ্রান্ত ভাব এমনকি অন্যমনস্কতা ধীরে-ধীরে তাকে গ্রাস করতে থাকে। একেক সময় সে যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে যাচ্ছিল অথবা আরও ভালোভাবে বলতে গেলে, আসল প্রসঙ্গটি ভুলে গিয়ে খুঁটিনাটিগুলোকে আঁকড়ে ধরছিল। সে যাই হোক, রান্নাঘরে উঁকি মেরে সেখানে বেঞ্চের ওপর অর্ধেক জলভর্তি একটা বালতি দেখতে পেয়ে তার খেয়াল হল নিজের হাতদুটো ও কুড়ুলটা ধুয়ে ফেলা দরকার। রক্তে মাখামাখি হয়ে চটচট করছিল হাতদুটো, কুড়ুলটা। প্রথমেই কুড়ুলের ফলা সোজা ডুবিয়ে দিল জলে। জানলার ধারে একটা ভাঙা ডিশে একটুকরো সাবান দেখতে পেয়ে সেটা তুলে নিয়ে সরাসরি বালতির ভেতরেই হাত ধুতে শুরু করল। হাত ধোয়ার পর কুড়ুলটাও বালতি থেকে তুলে তার লোহার ফলা ধুয়ে সাফ করল, কাঠের হাতলে রক্ত লেগে থাকায় অনেকক্ষণ ধরে, মিনিট তিনেক ধরে সেটাও ঘষে-ঘষে ধুল, এমনকি সাবান দিয়ে রক্তের দাগ ওঠানোর চেষ্টা করল। ওখানেই রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে টানা একটা দড়িতে কিছু জামা-কাপড় শুকাচ্ছিল। সেখান থেকে একটা কাপড় টেনে নিয়ে তাই দিয়ে সবকিছু মুছল। তারপর জানলার কাছে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সযত্নে, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে কুড়ুলটা দেখল। কোন চিহ্ন নেই, কেবল কাঠটা তখনও ভিজে। কুড়ুলটা সযত্নে ওভারকোটের তলায় ফাঁসে ঝুলিয়ে রাখল। এরপর রান্নাঘরের টিমটিমে আলোয় যতদূর দেখতে পারা সম্ভব, ওভারকোট, প্যান্ট আর জুতোজোড়া নিরীক্ষণ করে দেখল। বাইরে থেকে, আপাতদৃষ্টিতে ধরার উপায় নেই। কেবল জুতোর ওপর কিছু দাগ ছিল। নেকড়া ভিজিয়ে সেগুলো ঘষে-ঘষে তুলল। এটাও বুঝতে পারছিল যে ভালোমতো খুঁটিয়ে দেখা হয়নি, হয়ত চোখে পড়ার মতো এমন কিছু আছে যা তার নজর এড়িয়ে গেছে। চিন্তিতভাবে সে দাঁড়িয়ে রইল ঘরের মাঝখানে। তার ভেতরে-ভেতরে পাকিয়ে উঠতে লাগল একটা যন্ত্রণাদায়ক বিষণ্ন চিন্তা। মনে হচ্ছিল যে সে পাগল হয়ে যাচ্ছে, এই মুহূর্তে তার চিন্তাশক্তি লোপ পেয়েছে, আত্মরক্ষা করার ক্ষমতাও তার নেই এবং এখন সে যা করছে হয়ত আদৌ তা করা উচিত নয়। 'হা ভগবান! পালাতে হবে, পালাতে হবে! বিড়বিড় করে বলতে-বলতে সে ছুটে গেল সামনের ঘরে। কিন্তু সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিল আরেক বিভীষিকা। এমন অভিজ্ঞতা এর আগে অবশ্যই তার কখনও হয়নি।

দাঁড়িয়ে নজর বুলিয়ে সে যা দেখতে পেল তাতে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। দরজা খোলা। সামনের ঘর থেকে সিঁড়িতে যাবার দরজা অর্থাৎ বাইরের দরজা— যে দরজার ঘন্টি বাজিয়ে এই কিছুক্ষণ আগেও সে ভেতরে ঢুকেছিল— সেটা খোলা, এমনকি বিঘৎখানেক ফাঁক। না গা-তালা, না ছিটকিনি—কোনটাই লাগান

নেই। এতক্ষণ, সারাক্ষণ এইভাবেই ছিল! বুড়ি ভেতরে ঢুকে বন্ধ করেনি— সম্ভবত সতর্কতার খাতিরে। কিন্তু হা ভগবান! সে যে পরে লিজাভেতাকে দেখেছে! তাহলে কেন, কেন তার মনে প্রশ্ন জাগল না— কী করে, কোথা দিয়ে ঢুকল লিজাভেতা। দেয়াল ফুঁড়ে তো হতে পারে না!

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ছুটে দরজার কাছে গিয়ে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল।

'উঁহু, এবারেও ভুল হল! যেতে হবে, যেতে হবে যে আমাকে!...'

ছিটকিনিটা খুলে দরজার পাল্লা ফাঁক করে সিঁড়িতে কান পাতল।

শোনার চেষ্টা করল অনেকক্ষণ ধরে। নিচে, দূরে কোথায় যেন— সম্ভবত ফটকের নিচে— শোনা যাচ্ছে দুটি কণ্ঠের চিৎকার-চেঁচামেচি। তীব্রস্বরে, উঁচু গলায় বচসা ও গালিগালাজবর্ষণ চলছে দুটো লোকের মধ্যে। 'কী চায় ওরা?...' রাস্‌কোল্‌নিকভ্ অপেক্ষা করতে থাকল ধৈর্য ধরে। অবশেষে আচমকা সব স্তব্ধ, গোলমালটা থিতিয়ে গেল, লোকদুটো চলে গেছে। রাস্‌কোলনিকভ্ বেরোবার উপক্রম করছিল, এমন সময় ঠিক নিচের তলায় সশব্দে খুলে গেল সিঁড়ির দরজা— কে একজন নিচে নামছে কী একটা সুর গুনগুন করতে-করতে। 'ওরা সকলে অমন গোলমাল শুরু করেছে কেন?' বিদ্যুতের মতো তার মাথায় প্রশ্নটা জাগল। আবার দরজা ভেজিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করে রইল। একসময় সব থেমে গেল, কোথাও কোন জনপ্রাণী নেই। এবারে সে সিঁড়িতে পা বাড়াতে গেল, এমন সময় আবার কার পায়ের আওয়াজ— এটা নতুন কারও।

আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল অনেক দূরে, সিঁড়ির একেবারে নিচের ধাপ থেকে। কিন্তু সে বেশ ভালোভাবে এবং পরিষ্কার মনে করতে পারে যে প্রথম আওয়াজেই কেন যেন তার সন্দেহ হচ্ছিল যে সেটা নির্ঘাত *এখানে*, এই চারতলায়, বুড়ির কাছেই আসছে। কেন এমন মনে হচ্ছিল? কী এমন বিশেষত্ব, কী এমন তাৎপর্য ছিল তার মধ্যে? এ আওয়াজ ভারী, ধীরেসুস্থে, সমানতালে পা ফেলার। এই তো এবারে একতলা পার হয়ে গেল, এখন উঠছে আরও ওপরে। ক্রমেই স্পষ্ট, আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে! আগন্তুকের ভারী নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও শোনা যাচ্ছে। এই এবারে শুরু হয়ে গেল তিনতলা...আসছে এদিকে! হঠাৎ তার মনে হল যেন তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ হয়ে গেছে, যেন সে স্বপ্ন দেখছে, স্বপ্নে খুব কাছ থেকে কারা যেন তাকে তাড়া করছে খুন করবে বলে। অথচ সে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মতো। হাত পর্যন্ত নাড়াতে পারছে না।

অবশেষে আগন্তুক যখন চারতলায় উঠতে শুরু করল একমাত্র তখনই ধড়ফড় করে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল রাস্‌কোলনিকভ। যথাসময়ে কায়দা করে সিঁড়ির মুখ থেকে ফের ঘরের ভেতর সেঁধিয়ে গিয়ে চটপট দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর খিলটা আস্তে করে, নিঃশব্দে যথাস্থানে ঠেলে দিল। কাজটা সে করল সহজাত প্রবৃত্তিবশে।

সব শেষ হতে সে তৎক্ষণাৎ দরজার ঠিক কাছটাতে লুকিয়ে পড়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। অনাহূত আগন্তুকটিও ততক্ষণে চলে এসেছে দরজার কাছে। ওরা দুজনে এখন একে অন্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, যেমন এই কিছুক্ষণ আগে সে দাঁড়িয়ে ছিল বুড়ির মুখোমুখি। তখনও দুজনের মাঝখানে ছিল দরজার ব্যবধান। তখনও রাস্‌কোলনিকভ্ দরজায় ঠিক এইভাবে কান পেতে ছিল।

আগন্তুক কয়েকবার ভারী নিঃশ্বাস ফেলল। 'লোকটা মোটাসোটা, বেশ লম্বা-চওড়া মনে হচ্ছে', কুড়ুলটা হাতে চেপে ধরে রাস্‌কোলনিকভ্ মনে মনে বলল। আসলে, সত্যি-সত্যি যেন এসব সে স্বপ্নে দেখছে। আগন্তুক দরজার ঘণ্টিতে হাত দিয়ে বেশ জোরে টান মারল।

কানেস্তারা পেটানোর মতো টং টং শব্দে ঘণ্টি বেজে ওঠামাত্র রাস্‌কোলনিকভের চমক ভাঙল। হঠাৎ তার মনে হল ঘরের মধ্যে যেন কেউ নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত সে রীতিমতো কান খাড়া করে শোনার চেষ্টাও করল। অজানা লোকটি আবার বাজাল, আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর অসহিষ্ণু হয়ে হঠাৎ সর্বশক্তিতে দরজার হাতল ধরে টানাটানি করতে লাগল। আতঙ্কিত হয়ে রাস্‌কোলনিকভ্ তাকিয়ে দেখল ফাঁকের ভেতরে দরজার খিলটা সমানে লাফাচ্ছে। আতঙ্কে ভেবাচেকা খেয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল এই বুঝি খুলে বেরিয়ে আসবে। বাস্তবিকই সেটা সম্ভব মনে হচ্ছিল— লোকটার হেঁচকা টানে দারুণ জোর ছিল। রাস্‌কোলনিকভ্ ভাবছিল খিলটা ধরে ঠেকিয়ে রাখবে কিনা। কিন্তু তাহলে আবার *লোকটা* ধরে ফেলতে পারে। আবার যেন ঘুরতে লাগল ওর মাথা। 'নাঃ এবারে পড়ে যাব।' বিদ্যুৎ চমকের মতো চিন্তাটা মাথায় চাড়া দিয়ে উঠল। এদিকে অজানা লোকটা এবারে কথা বলতে শুরু করেছে। সঙ্গে-সঙ্গে রাস্‌কোলনিকভের চমক ভাঙল।

'যা বাবা! পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে না কি? নাকি কেউ টুঁটি টিপে মেরে ফেলেছে ওদের? ধুত্তোর!' গাঁক-গাঁক করে বলল। যেন হাঁড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো আওয়াজটা। "এই আলিওনা ইভানোভ্‌না, ডাইনী বুড়ি! লিজাভেতা ইভানোভ্‌না, ওলো আমার পটে আঁকা সুন্দরী! দরজা খোল! ধুত্তোর! ঘুমোচ্ছে নাকি সব, অ্যাঁ?"

ফের ভয়ঙ্কর খেপে গিয়ে সে প্রাণপণ শক্তিতে পরপর বার দশেক ঘন্টিতে টান মারল। লোকটা নিশ্চয় ক্ষমতাশালী এবং এ বাড়িতে পরিচিত।

ঠিক এই মুহূর্তে সিঁড়িতে সামান্য দূরে হঠাৎ শোনা গেল ছোট-ছোট দ্রুত পা ফেলার আওয়াজ। আরও একজন কে এগিয়ে আসছিল। রাস্‌কোলনিকভ্ গোড়ায় শুনতেই পায়নি।

"কী হল, কেউ নেই নাকি?" প্রথম আগন্তুক তখনও ঘণ্টি ধরে টেনে চলেছে দেখে সরাসরি তাকে লক্ষ করে খুশিভরা উঁচু গলায় নবাগতটি চেঁচিয়ে উঠল। "এই যে কোখ্, নমস্কার।"

'গলা শুনে মনে হচ্ছে খুব কম বয়সী', রাস্‌কোলনিকভের হঠাৎ মনে হল।

"কে জানে বাপু! তালা তো প্রায় ভেঙে ফেললাম," কোখ্ উত্তর দিল। "কিন্তু আমাকে কী করে জানেন বলুন তো?"

"বা! এই তো গত পরশু 'গাম্‌ব্রিনুস' হোটেলে আপনার সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলে পরপর তিনটে গেম জিতলাম!"

"ও।..."

"তা নেই নাকি ওরা কেউ? অদ্ভুত ব্যাপার! এ যে অসম্ভব! রীতিমতো অসম্ভব! বুড়ি যাবে কোথায়? আমার কাজ আছে ওর সঙ্গে।"

"আমারও কাজ আছে ভাই।"

"তাহলে উপায়? ফিরেই যেতে হবে দেখছি। ধুত্তোর! আমি আবার ভাবছিলাম কিছু টাকাপয়সা জোগাড় করা যাবে!" যুবক বলে উঠল।

"ফিরে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কী? কিন্তু বলি তাহলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা কেন? ডাইনী বুড়িটা নিজে সময় ধার্য করেছিল। আমাকে অনেক ঘোরানো পথে আসতে হয়েছে এখানে। তাছাড়া কোন্ জাহান্নামেই বা ঘুরে বেড়াতে পারে, মাথায় আসছে না। বুড়ি সারাটা বছর বাড়িতে বসে-বসে পচে মরছে, পায়ের ব্যথায় নড়তে পারে না, এখন কিনা হঠাৎ বেড়ানোর শখ চাগিয়ে উঠল!"

"দারোয়ানকে জিগ্‌গেস করে দেখব নাকি?"

"কী জিগ্‌গেস করবেন?"

"কোথায় গেল, কখন ফিরতে পারে?"

"হুম্ ... কী ছাই হবে জিগ্‌গেস করে?... কখনও কোথাও যায় না যে..." বলতে-বলতে সে আবার হেঁচকা টান মারল দরজার হাতল ধরে। "ধুত্তোর! চলে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর দেখছি না!"

"দাঁড়ান!" হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল যুবকটি। "দেখুন, চেয়ে দেখুন, টান মারলে দরজাটা কেমন সরে আসছে।"

"তাতে কী হল?"

"তার মানে এই যে বাইরে থেকে গা-তালা লাগানো নেই, ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগানো, মানে আগল দেওয়া। শুনতে পাচ্ছেন, আগলটা কেমন ঘটাং-ঘটাং আওয়াজ করছে?"

"তাতে কী হল?"

"আরে, এটাও বুঝতে পারছেন না? এর অর্থ, ওদের কেউ না কেউ ঘরে আছে। দুজনেই যদি চলে যেত তাহলে তো ভেতর থেকে খিল দেওয়া থাকত না, বাইরে থেকে দরজায় তালাচাবি দেওয়া থাকত। অথচ এখানে... শুনতে পাচ্ছেন খিলের ঘটাং-ঘটাং? আর ভেতর থেকে খিল দিয়ে বসে থাকতে হলে বাড়িতেই থাকতে

হয়— এটা মানবেন তো? তার মানে ওরা বাড়িতেই আছে, দরজা খুলছে না!"

"তাই তো! আপনি ঠিক বলেছেন!" কোখ্ আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠল। "তাহলে ওরা কী করছে ওখানে?" ক্ষিপ্ত হয়ে সে দরজা টানাটানি করতে লাগল।

"দাঁড়ান!" আবার ডেকে বলল যুবকটি? টানাটানি করে লাভ নেই। ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে।... আপনি ঘণ্টি মেরেছেন, দরজা ধরে টেনে দেখেছেন— কেউ খুলছে না। তার মানে হয় ওদের দুজনেই সংজ্ঞা লোপ পেয়েছে, নয়ত..."

"নয়ত কী?"

"কী, তাই বলছি। চলুন দেখি, দারোয়ানের খোঁজ করে দেখি। দারোয়ান নিজেই বরং এসে ওদের ডেকে তুলুক।"

"তাই হোক!" দুজনেই নিচের দিকে পা বাড়াল।

"দাঁড়ান্! আপনি বরং এখানেই থাকুন, আমি একছুটে নিচে গিয়ে দারোয়ানের খোঁজ করে দেখি।"

"এখানে থাকার কী আছে?"

"কখন কী ঘটে বলা যায় না তো।..."

"তা যা বলেছেন।"

"দেখুন, আমি তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার জন্য পড়াশুনা করছি! এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বেশ স্পষ্ট যে কিছু একটা গড়বড় আছে!" উত্তেজিত হয়ে যুবক এই কথা বলে ছুটতে-ছুটতে নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে।

কোখ্ দাঁড়িয়ে রইল, আরও একবার আস্তে করে ঘণ্টি নাড়াল, আরও একবার টং করে আওয়াজ তুলল ঘণ্টিটা। তারপর অনেক ভাবনা-চিন্তা বিচারবিবেচনা করে আস্তে-আস্তে দরজার হাতল ধরে টানল, টেনে আবার ছেড়ে দিয়ে আরও একবার নিশ্চিত হতে চাইল একমাত্র আগলের ওপরই আছে কিনা দরজাটা। তারপর ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে নুয়ে পড়ে চাবি ঢোকানোর ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে গেল। কিন্তু দেখবে কী? ফুটোয় ভেতর থেকে চাবি গোঁজা!

শক্ত মুঠোয় কুড়ুল চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল রাস্কোল্নিকভ। সে যেন তখন একটা ঘোরের মধ্যে। ওরা ভেতরে ঢুকলে ওদের সঙ্গে মারপিট করার জন্যও সে মনে-মনে প্রস্তুত হচ্ছিল। ওরা যখন দরজার ধাক্কা মারছিল, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল তখনও বেশ কয়েকবার হঠাৎ-হঠাৎ এমন চিন্তা তাকে পেয়ে বসছিল যে এক্ষুনি সবকিছুর অবসান ঘটিয়ে দরজার আড়াল থেকে চেঁচিয়ে জানান দেয়। সময়-সময় তার ইচ্ছে করছিল ওরা যতক্ষণ দরজা না খুলছে ততক্ষণ ওদের চুটিয়ে গালাগাল করে, ওদের নিয়ে ঠাট্টা করে। 'আর কত? যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো!' মাথার মধ্যে ঝলক দিল চিন্তাটা।

"তবে, মরুক গে..."

সময় কাটতে থাকে। এক মিনিট... আরও এক মিনিট— কারও দেখা নেই। কোখ্ অস্থির হয়ে নড়েচড়ে উঠল।

"মরুক গে যা!" হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল। আর ধৈর্য ধরে রাখতে না পেরে পাহারাদারি ছেড়ে দিয়ে সেও ত্রস্ত পা বাড়াল নিচের দিকে, সিঁড়িতে জুতোর খটখট আওয়াজ তুলে নামতে লাগল। একসময় মিলিয়ে গেল পায়ের আওয়াজ।

"হা ভগবান! এখন কী করা?"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ আগল খুলে দরজা ফাঁক করে দেখল। কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ কোন ভাবনাচিন্তা না করে সে বেরিয়ে পড়ল, বেরিয়ে আসার পর যতদূর সম্ভব ভালো করে ঠেলে দরজা বন্ধ করে নিচে নামতে লাগল।

তিন সারি সিঁড়ি পার হয়ে নিচে নেমেছে, এমন সময় শুনতে পেল আরও নিচে প্রচণ্ড হৈচৈ। কোথায় যায় তখন সে? গা ঢাকা দেবার মতো কোন জায়গা নেই এখানে। একবার ভাবল ছুটে আবার ফিরে যায় ফ্ল্যাটে।

"এই হতভাগা শয়তান! ধর্ ওকে!"

নিচে কোন এক ফ্ল্যাট থেকে কে একজন চেঁচাতে-চেঁচাতে ছিটকে বেরিয়ে পড়ল, বেরিয়ে ছোটা তো নয়, যেন হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ল, পড়তে-পড়তে চেঁচাতে লাগল গলা ফাটিয়ে।

"মিত্রি! মিত্রি! অ্যাই মিত্রি! থামলি হতভাগা!"

চিৎকারটা শেষ হল আর্তনাদে। শেষ আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল আঙিনায়, পরে আবার সব নিস্তব্ধ। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই জোরে অনর্গল কথা বলতে-বলতে বেশ কিছু লোক সোরগোল তুলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। সংখ্যায় তিন-চারজন। রাসকোলনিকভ্ ওরই মধ্য থেকে আলাদা করে চিনতে পারল, সেই যুবকটির গমগমে গলার আওয়াজ। 'এ যে ওরা দেখছি!'

আর কোন আশা নেই দেখে যা আছে কপালে— এই ভেবে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ সোজা এগিয়ে গেল তাদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য। বাধা যদি পায় তাহলে সব গেল, যদি ছেড়ে দেয় তাতেও ওই একই হাল— ওরা ওকে মনে করে রাখবে। লোকগুলো এর মধ্যে কাছাকাছি চলে এসেছে— মাঝখানে তখন মাত্র এক সারি সিঁড়ির ব্যবধান। এমন সময় উদ্ধারের পথ পেয়ে গেল রাসকোল্‌নিকভ্। কয়েক ধাপ নিচে ডান দিকে হাঁ করে খোলা ফাঁকা ফ্ল্যাটটা—দোতলার সেই ফ্ল্যাটটা— যেখানে কাজ করছিল চুনকাম ও রঙের মিস্ত্রিরা। ওরা ঠিক এই মুহূর্তে ঘর ছেড়ে চলে গেছে— যেন ইচ্ছে করেই। সম্ভবত ওরাই তখন অমন চেঁচাতে-চেঁচাতে ছুটে বেরিয়ে গেল। কাঠের মেঝে সবে রং করা। ঘরের মাঝখানে পড়ে আছে একটা ছোট টব, রঙের একটা ভাঙা পাত্র, একটা বুরুশ। মুহূর্তের মধ্যে খোলা দরজা দিয়ে চট করে

ভেতরে ঢুকে দেয়ালের আড়ালে গা ঢাকা দিল রাস্কোল্‌নিকভ্‌। ঠিক সময়ে লুকিয়ে পড়েছিল। ওরা ততক্ষণে সিঁড়িব সামনের বড় চাতালটাতে এসে পড়েছে, এর পর ওপরের দিকে মোড় নিয়ে জোরে-জোরে কথা বলতে-বলতে পাশ দিয়ে চার তলায় চলে গেল। বাস্‌কোলনিকভ্‌ অপেক্ষা করছিল কখন ওরা চলে যায়। চলে যেতেই পা টিপে-টিপে বেরিয়ে এসে নিচে ছুট দিল।

সিঁড়িতে কেউ নেই। ফটকের তলায়ও না। দ্রুত ফটক পেরিয়ে বাঁ হাতে ঘুরে রাস্তা ধরল।

সে বেশ ভালোভাবে জানত, খুবই ভালোভাবে জানত যে ওরা এতক্ষণে এই মুহূর্তে ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছে, যে দরজা এইমাত্র বন্ধ দেখে গিয়েছিল সেটা খোলা দেখে ভারি আশ্চর্য হয়ে গেছে, এতক্ষণে নিশ্চয়ই মৃতদেহদুটি দেখছে। আর মিনিটখানেক যেতে না যেতে তারা ব্যাপারটা ধরে ফেলবে, নির্ঘাত বুঝতে পারবে যে খুনি এইমাত্র এখানেই ছিল, সুযোগ বুঝে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে ছিল, তাদের নজর এড়িয়ে, তাদেরই পাশ কাটিয়ে পালিয়েছে। ওরা সম্ভবত এও অনুমান করতে পারবে যে ওরা যতক্ষণে ওপরে যাচ্ছিল সেই সময় সে ফাঁকা ঘরটাতে বসে ছিল। তা হলেও কিন্তু কোনমতে পায়ের গতি বিশেষ বাড়াতে সে ভরসা পাচ্ছিল না, যদিও আর একশ পা এগোলেই প্রথম মোড়টা। কোথাও একটু অপেক্ষা করলে ভালো হত না কি? না, সর্বনাশ হয়ে যাবে! কুড়ুলটা কি কোথাও ফেলে দেব? একটা ঘোড়ার গাড়ি নেব নাকি? ওরে বাবা! সর্বনাশ!

অবশেষে পড়া গেল গলির মুখে। গলির ভেতরে যখন মোড় নিল তখন সে জীবন্মৃত। এখন সে অন্তত অর্ধেক নিরাপদ— এটা সে বুঝতে পারছিল। এখানে সন্দেহের আশঙ্কা কম, পরন্তু চারধারে গিজগিজ করছে অসংখ্য মানুষ, এই জনারণ্যে সে সৈকতে বালুকণার মতো। কিন্তু এতক্ষণের এই মানসিক যন্ত্রণা তাকে এতটা দুর্বল করে ফেলেছে যে তার নড়াচড়ার ক্ষমতা প্রায় লোপ পেতে বসেছে। ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম ঝরতে শুরু করেছে সারা শরীর দিয়ে। ঘাড়টা সম্পূর্ণ ভিজে গেছে ঘামে। গলি থেকে বেরিয়ে যখন সে খালধারে এলো তখন শুনতে পেল কে একজন তাকে লক্ষ করে চেঁচিয়ে বলছে: "ওঃ মাত্রাটা বড় বেশি হয়ে গেছে দেখছি!"

নিজের অবস্থা সম্পর্কে এখন ভালোমতো চেতনা তার ছিল না— প্রতি মুহূর্তে খারাপের দিকে গড়াচ্ছিল। অবশ্য পরে সে মনে করতে পারত যে বেরিয়ে খালপাড়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে তার আশঙ্কা হচ্ছিল যে এই জায়গাটায় লোকজন কম, নজরে পড়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি, তাই আবার ফিরে গলিতে ঢুকে পড়ার উপক্রম করছিল সে। যদিও সে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল তবু শেষপর্যন্ত ঘুরপথ ধরে একেবারে অন্য ধার থেকে বাড়ি পৌঁছাল।

নিজের বাড়ির আঙিনার ফটক যখন সে পার হল তখনও তার ঘোর সম্পূর্ণ কাটেনি। যখন সে সিঁড়িতে পা রেখেছে একমাত্র তখনই তার মনে পড়ল কুড়ুলের

কথা। তখন কিন্তু তার সামনে রয়েছে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা : কুড়ুলটাকে ফের যথাস্থানে রেখে দেওয়া— যতদূর পারা যায় অলক্ষিতে। অবশ্যই তার তখন এটা বোঝার মত ক্ষমতা ছিল না যে তার পক্ষে সবচেয়ে ভালো হত কুড়ুলটা আগের জায়গায় মোটে না রেখে চুপচাপ অন্য কোথাও চালান করে অন্তত পরে হলেও অন্য কোন বাড়ির উঠোনে ফেলে দেওয়া।

কিন্তু সব মিটে গেল নির্বিঘ্নে। দারোয়ানের ঘরের দরজা ভেজানো ছিল, তালা লাগানো ছিল না, অর্থাৎ দারোয়ান খুব সম্ভব বাড়িতেই আছে। কিন্তু রাস্‌কোল্‌নিকভের বুদ্ধিসুদ্ধি ইতিমধ্যে এতদূর লোপ পেয়ে গেছে যে সোজা দারোয়ানের ঘরের দিকে এগিয়ে এসে দরজা খুলে ফেলল। লোকটা যদি জিগ্‌গেস করত ''কী চাই?'' — তাহলে হয়ত সে অমনি সোজাসুজি কুড়ুলটা তুলে দিত তার হাতে। কিন্তু দারোয়ান এবারেও ঘরে নেই। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তাই অনায়াসে কুড়ুল রেখে দিতে পারল যথাস্থানে, বেঞ্চের তলায়। এমনকি আগের মতো চেলাকাঠ দিয়ে একটু ঢেকেও দিল। পরে, নিজের ঘরে যাবার পথে কারও মুখোমুখি তাকে পড়তে হল না, একটি জনপ্রাণীরও না। বাড়িউলির দরজাও বন্ধ। ঘরে ঢুকে সে যেমন ছিল তেমনি জামাকাপড় পরা অবস্থাতেই সোফায় গা ছেড়ে দিল। তার ঘুম আসছিল না, কিন্তু চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। এই সময় যদি কেউ তার ঘরে ঢুকত তাহলে সে লাফিয়ে উঠে চিৎকার জুড়ে দিত। কিছু-কিছু ভাবনা-চিন্তার ছেঁড়া-ছেঁড়া টুকরো-টাকরা তার মাথার ভেতরে ঝাঁকে-ঝাঁকে ভিড় করতে লাগল। কিন্তু শত চেষ্টা করেও কোনটাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারছিল না, কোনটার ওপর মন বসাতে পারছিল না।...

দ্বিতীয় পর্ব

এভাবে সে শুয়ে রইল বড় দীর্ঘ সময় ধরে। মাঝে-মাঝে তার মনে হচ্ছিল যেন ঘুম ভেঙে গেছে। সেইসব মুহূর্তে তার খেয়াল হয় যে রাত অনেক গড়িয়ে গেছে। তবু বিছানা ছেড়ে ওঠার কথা মাথায় আসে না। শেষকালে সে লক্ষ করল ইতিমধ্যে দিনের আলো দেখা দিয়েছে। সোফাতে সে শুয়ে ছিল চিত হয়ে, তখনও কিছু আগের হতভম্ব ও আচ্ছন্ন ভাব সে কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। নিচের রাস্তা থেকে তার কানে ভেসে আসছিল তীক্ষ্ণ মরিয়া কণ্ঠের বিকট চিৎকার-চেঁচামেচি—এ আওয়াজ অবশ্য রোজই রাত তিনটের দিকে তার জানলার নিচে শোনা যায়। তাতেই এখন তার ঘুম ভেঙে গেল। 'ও, মাতালরা এখন শুঁড়িখানা থেকে বেরোচ্ছে।' সে মনে-মনে বলল। 'দুটো বেজে গেছে।' হঠাৎ সে একলাফে উঠে পড়ল, যেন সোফা থেকে কেউ তাকে উঠিয়ে দিল হেঁচকা টানে। 'কী কাণ্ড! দুটো বেজে গেছে ইতিমধ্যে!' সোফায় বসে-বসে সে পুরো ঘটনাটা মনে করার চেষ্টা করল। হঠাৎ এক পলকে সব তার মনে পড়ে গেল!

প্রথম মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল বুঝি পাগল হয়ে যাবে। বেজায় ঠাণ্ডা লাগছে, শীত-শীত করছে। কিন্তু শীত-শীত ভাবটা ছিল জ্বরের কারণে। জ্বরের প্রকোপ তার শুরু হয়ে গিয়েছিল অনেক আগে, যখন সে ঘুমোচ্ছিল। এবারে হঠাৎ এমন কাঁপুনি এসে ভর করল যে ঠাণ্ডায় সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল। ঠকঠক করে দাঁতকপাটি লেগে দাঁতের পাটি খুলে বেরিয়ে আসার উপক্রম। ঘরের দরজাটা খুলে সে কান পাতল: গোটা বাড়িটা নিঝুম ঘুমন্ত পুরী। অবাক হয়ে সে নজর বুলাল নিজের ওপর, ঘরের চারপাশে। কিন্তু বুঝতে পারছিল না কী করে গতকাল ঘরে ঢুকে ছিটকিনি দিয়ে দরজা বন্ধ না করে কেবল জামাকাপড় না ছেড়েই, এমনকি মাথার টুপিটা পর্যন্ত না খুলে সে সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছিল। টুপিটা মাথা থেকে খুলে গিয়ে ওখানেই মেঝেতে বালিশের কাছাকাছি গড়াগড়ি খাচ্ছে। 'কেউ যদি ঢুকে পড়ত, তাহলে কী ভাবত? ভাবত আমি মাতাল, কিন্তু...' সে জানলার দিকে ছুটে গেল। যথেষ্ট আলো ছিল। দ্রুত নজর বুলিয়ে দেখতে লাগল নিজেকে, নিজের আপাদমস্তক, সর্বাঙ্গ, গায়ের ওভারকোটটার আগাপাশতলা— চিহ্ন আছে কি কোথাও? কিন্তু ওভাবে দেখা সম্ভব হচ্ছিল না। জ্বরের ঠাণ্ডায় কাঁপতে-কাঁপতে নিজের গা থেকে একে-একে সমস্ত জামাকাপড় খুলে সে আবার সবকিছু, সর্বত্র খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। শেষ সুতো আর টুকরো পর্যন্ত ওলট-পালট করে দেখল, নিজের ওপর আস্থা রাখতে না পেরে বার তিনেক সে তার পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করল। কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না, সম্ভবত

কোন চিহ্ন নেই। কেবল প্যান্টের তলার যে অংশটা ছিন্নভিন্ন হয়ে ঝালরের মতো ঝুলছে সেখানে একজায়গায় ঘন জমাট রক্তের দাগ রয়ে গেছে। বড় চাকুটা তুলে নিয়ে ঝালর কেটে ফেলল। আর বোধহয় কোথাও নেই। এমন সময় ওর মনে পড়ে গেল বুড়ির ট্রাঙ্ক থেকে যে টাকার থলি আর অন্যান্য জিনিস বের করেছিল সে সবই এখন পর্যন্ত পড়ে আছে ওর পকেটে! এখন পর্যন্ত সেগুলোকে পকেট থেকে বের করে লুকিয়ে রাখার কথা সে ভাবেইনি! এমনকি এখনও, জামাকাপড় অত করে দেখার সময় তার খেয়াল হয়নি। এ কী রকম? চোখের পলকে সে চটপট কাজে লেগে গেল। জিনিসগুলো টেনে-টেনে বের করতে লাগল। ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলতে লাগল টেবিলের উপর। সব জিনিস বের করে আনার পর, এমনকি আরও কিছু থেকে গেল কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য পকেটগুলো উলটে-পালটে দেখে নিয়ে জিনিসপত্রের গাদাটা ঘরের এক কোনায় এনে রাখল। ঠিক ওই কোনাটাতে, মেঝের কাছাকাছি জায়গায় খানিকটা ওয়াল পেপার ছিঁড়ে গিয়ে দেয়াল থেকে আলগা হয়ে ঝুলছিল। তৎক্ষণাৎ সে কাগজের তলায় ফোকরের ভেতরে জিনিসগুলো গুঁজতে লেগে গেল। 'যাক, ঢুকে গেছে! চোখের সামনে থেকে দূর হয়েছে, টাকার থলেটাও!' খুশি মনে এইকথা ভেবে সামান্য উঠে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কোনার ফোকরটার দিকে— জায়গাটা আরও বেশি ফুলে আছে। হঠাৎ আতঙ্কে কেঁপে উঠল তার সর্বাঙ্গ। হতাশ হয়ে অস্ফুট স্বরে সে বলল, 'হা ভগবান! এ আমার কী হল? একে কি লুকিয়ে রাখা বলে? এভাবে কি কেউ লুকিয়ে রাখে?'

সত্যি বলতে গেলে কি, কোন জিনিসপত্র তার চিন্তার মধ্যে ছিল না। সে ভেবেছিল শুধু টাকাই থাকবে। তাই আগে থাকতে জায়গা তৈরি করে রাখেনি। 'কিন্তু এখন— এখন আমার খুশি হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে?' সে ভাবল। 'এভাবে কি কেউ লুকিয়ে রাখে? আমার বুদ্ধিসুদ্ধি বিলকুল লোপ পেয়েছে দেখছি!' অবসন্ন হয়ে সে সোফায় বসে পড়ল, সঙ্গে-সঙ্গে একটা অসহ্য শীত-শীত ভাব আর কাঁপুনি তার ওপর ভর করল— পাশেই চেয়ারের ওপর পড়ে ছিল শীতের ওভারকোটটা— গরম, তবে প্রায় শতচ্ছিন্ন— ছাত্র অবস্থায় এককালে ব্যবহার করত। যন্ত্রচালিতের মতো চেয়ার থেকে সেটা তুলে নিয়ে তাই দিয়ে গা মুড়ি দিল। একই সঙ্গে তন্দ্রাবেশ ও বিকারের ঘোরে আবার সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল।

এই অবস্থায় পাঁচ মিনিটেরও বেশি কাটল না। আবার একলাফে উঠে বসল। তৎক্ষণাৎ দিশেহারার মতো ছুটে গেল তার জামাকাপড়গুলো আরও একবার দেখে নিতে। 'কী করে আমি ঘুমোতে পারি যখন কিছুই করা হয়নি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো। ওভারকোটের বগলের তলা থেকে ফাঁসটাই তো এখন পর্যন্ত খুলিনি! এমন একটা কাজ ভুলে গিয়েছিলাম। এরকম একটা প্রমাণ!' ফাঁসটা সে টেনে খুলে ফেলল; তাড়াতাড়ি টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে বালিশের তলায় তার জামাকাপড়ের

মধ্যে গুঁজে রেখে দিল। নানারকম ছেড়াঁ কাপড়ের টুকরো-টাকরা কারও মনে কখনও সন্দেহের উদ্রেক করবে না বলেই মনে হয়। তাই তো মনে হয়!' ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বারকয়েক সে আওড়াল। অনেক চেষ্টায় গভীর মনোযোগ দিয়ে সে আবারও চতুর্দিকে, মেঝের ওপর, সর্বত্র অনুসন্ধানী দৃষ্টি ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে নিশ্চিত হতে চাইল কোথাও কোন ভুলচুক হল কিনা। সমস্ত কিছু, এমনকি স্মৃতি, এমনকি সাধারণ বোধশক্তিও সে হারাতে চলেছে এই দৃঢ়বিশ্বাস অসহ্য যাতনা দিতে লাগল তাকে। তাহলে, সত্যিই কি তা হলে শুরু হয়ে গেল অপরাধের দণ্ড? তাই তো দেখছি! আরে যা ভেবেছিলাম, তাই!' বাস্তবিকই প্যান্টের ঝুলের যে ছেঁড়া-ছেঁড়া অংশ সে কেটে ফেলেছিল তার কুচিগুলো ঘরের মাঝখানে মেঝেতে ছড়িয়ে আছে— ঘরে ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়বে! 'সত্যিই তো, এ আমার কী হল?' হতবুদ্ধি হয়ে সে আবার আর্তনাদ করে উঠল।

এইসময় তার মাথায় ঢুকল এক অদ্ভুত চিন্তা— তার মনে হল হয়ত তার সমস্ত জামাকাপড়েই রক্ত লেগে রয়েছে, হয়ত অনেক দাগ লেগে আছে, কিন্তু সে দেখতে পাচ্ছে না, তার নজরে পড়ছে না, কেননা তার বোধশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে, ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে,... চিন্তা করার ক্ষমতা লোপ পেয়ে গেছে।... হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল টাকার থলিটার গায়েও রক্তের দাগ ছিল। 'বা, তাহলে তো হয়ে গেল!— তার মানে পকেটেও রক্ত লাগার কথা, কারণ থলিটা যখন পকেটে ঢোকাই তখনও ওটা ভিজে ছিল!' তৎক্ষণাৎ সে পকেট ওলটালো— সত্যিই তাই— পকেটের লাইনিং-এ চিহ্ন আছে, রক্তের দাগ লেগে আছে! 'দেখা যাচ্ছে বুদ্ধি এখনও একেবারে লোপ পায়নি। আমার নিজেরই যখন খেয়াল হল, নিজেই যখন অনুমান করতে পারলাম, তখন মানতে হবে বোধশক্তি ও স্মৃতিশক্তি কাজ করছে! দুর্বলতাটা স্রেফ জ্বরের, এ ছিল মুহূর্তের একটা ঘোর।' মনে-মনে সে উল্লসিত হল। খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল । প্যান্টের বাঁ পকেটের পুরো লাইনিংটা পড়পড় করে টেনে ছিঁড়ে ফেলল। ঠিক সেই মুহূর্তে সূর্যের কিরণ এসে পড়ল তার বাঁ পায়ের জুতোর ওপর। ছেঁড়া ফুটোর ফাঁক দিয়ে মোজার যে খানিকটা অংশ বেরিয়ে ছিল সেখানে মনে হল যেন দাগ লেগে রয়েছে। টেনে খুলে ফেলল জুতোর পাটিটা। 'দাগই বটে! মোজার ডগাটা রক্তে ভিজে সপসপ করছে। নিশ্চয় তখম অসাবধানে রক্তের ডোবায় তার পা পড়ে গিয়েছিল।... 'এখন তাহলে কী করি এ দিয়ে? এই মোজা, প্যান্টের ঝুলের এই শতচ্ছিন্ন কাটা টুকরো, পকেটের এই টুকরো কাপড়— এগুলোর কী গতি হবে?'

সব জড়ো করে হাতে নিয়ে সে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল। 'উনুনটার ভেতরে গুঁজে রেখে দেব? কিন্তু প্রথমে তো উনুনের ভেতরটাই ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করবে ওরা। পুড়িয়ে ফেলব? কিন্তু পোড়াব কী দিয়ে? একটা দেশলাই কাঠি পর্যন্ত আমার কাছে নেই। নাঃ, সবচেয়ে ভালো হয় কোথাও বেরিয়ে সবকিছু ফেলে দেওয়া। হ্যাঁ,

বাইরে ফেলে দেওয়াই বরং ভালো!' সোফার ওপর আবারও বসে পড়ে সে আওড়াতে লাগল। 'এই এখন, এতটুকু দেরি না করে, এই মুহূর্তে!...' কিন্তু তার বদলে ওর মাথা আবার ঢলে পড়ল বালিশের ওপর, আবার কনকনে ঠাণ্ডা শীত-শীত ভাব তার সর্বাঙ্গে অসহ্য কাঁপুনি ধরিয়ে দিল, আগের বারের মতো এবারেও ওভারকোটটা গায়ে টেনে দিল। অনেকক্ষণ, বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে তন্দ্রার ঘোরে কেবলই তার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগল এক প্রচণ্ড ঝোঁক, এই চিন্তা যে 'যাই, আর দেরি না করে কোথাও গিয়ে এসব ফেলে দিয়ে আসি, চোখের সামনে থেকে দূর করে আসি, তাড়াতাড়ি, যত তাড়াতাড়ি পারা যায়।' কয়েকবার সেখান থেকে ঝটকা মেরে ওঠারও চেষ্টা সে করল, কিন্তু আর পারল না। তার ঘুম শেষপর্যন্ত ভাঙল দুমদাম দরজা ধাক্কানোর আওয়াজে।

"এই, দরজা খোল! বলি, বেঁচে আছ তো? দেখ কাণ্ড! এখনও কিনা পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে!" দরজায় দুমদাম কিল মারতে-মারতে নাস্তাসিয়া হাঁকডাক করতে লাগল। "সারাটা দিন পড়ে-পড়ে ঘুম মারছে কুকুরের মতো! কুকুর ছাড়া আর কী বলব! খুলবে কিনা? দশটা বেজে গেছে।"

"নাকি বাড়ি নেই!" একটি পুরুষকণ্ঠ বলে উঠল।

'আরে, এ যে দারোয়ানের গলার আওয়াজ শুনছি!... কী চাই ওর?' ধড়ফড়িয়ে সোফায় উঠে বসল রাস্‌কোল্‌নিকভ্। তার বুকের ভেতরটা এত জোরে ধক করে উঠল যে ব্যথা করতে লাগল।

"তাই যদি হয় তাহলে ভেতর থেকে ছিটকিনিটা দিল কে শুনি?" নাস্তাসিয়া প্রতিবাদ করে বলল। "ইস্, ভেতর থেকে আগল দিতে শুরু করেছে! ভাবছে ওকেই তুলে নিয়ে যাবে নাকি, অ্যাঁ? ওরে আমার মাথাওয়ালা, দরজাটা খোল ঘুম থেকে ওঠো!"

'কী চাই ওদের? দারোয়ান এখানে কী করতে? সব জানাজানি হয়ে গেছে। তাহলে বাধা দেব? নাকি খুলব? মরুক গে...' সামান্য উঁচু হয়ে বসে সামনের দিকে ঝুঁকে সে আগল খুলে দিল। রাস্‌কোল্‌নিকভের পুরো ঘরটা আকারে এতই ছোট যে বিছানা ছেড়ে না উঠেও দিব্যি হাত বাড়িয়ে দরজার আগল খোলা যায়।

যা ভেবেছিল তাই : সামনে দাঁড়িয়ে দারোয়ান আর নাস্তাসিয়া। নাস্তাসিয়া কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ যুদ্ধংদেহি, মরিয়া ভঙ্গিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল দারোয়ানের দিকে। দারোয়ান নীরবে তার দিকে বাড়িয়ে দিল গালা দিয়ে সীল করা দুভাঁজ করা একটুকরো ছাইরঙা কাগজ।

"স্টেশন থেকে নোটিশ এসেছে," কাগজটা হাতে দিয়ে সে বলল।

"কোন্ স্টেশন থেকে?"

"পুলিস স্টেশন থেকে, মানে পুলিশের কাছে ডাক পড়েছে। বুঝতেই পারছ কোন্

স্টেশন।”

“পুলিসের কাছে!... কেন?...”

“সে আমি কী করে বলব? ওরা যখন ডেকে পাঠিয়েছে তখন যেতেই হয়।” দারোয়ান মনোযোগ দিয়ে ওকে একবার দেখল, ঘরের চারপাশে নজর বুলাল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে যাবার জন্য পা বাড়াল।

“অসুখটা খুব বাড়াবাড়ি রকমের মনে হচ্ছে যেন,” ওর মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে নাস্তাসিয়া মন্তব্য করল। দারোয়ানও এই শুনে ঘাড় ফিরিয়ে মিনিটখানেকের জন্য তার দিকে তাকাল। নাস্তাসিয়া সঙ্গে-সঙ্গে যোগ করল, “গতকাল থেকে জ্বরে পড়ে আছে।”

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ কোন জবাব না দিয়ে তখনও সীল না খুলে কাগজটা যেমনকার তেমন হাতে ধরে রেখে দিল।

সোফা থেকে সে পা নামাতে যাচ্ছে দেখে মমতাভরে তাকে বাধা দিয়ে নাস্তাসিয়া বলল, “আরে উঠতে হবে না। অসুখ যখন করেছে তখন না গেলেও চলবে। এক্ষুনি না গেলে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু একী! তোমার হাতে ওগুলো কী?”

রাস্‌কোলনিকভ তাকিয়ে দেখল : তার ডান হাতের মুঠোয় ধরা আছে প্যান্টের তলার দিককার ঘষায়-ঘষায় ছিঁড়ে যাওয়া কাপড়ের সেই কাটা কুচি, সেই মোজা আর টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলা পকেটের টুকরো কাপড়টা। ওই নিয়েই সে ঘুমিয়ে ছিল এতক্ষণ। পরে ঘটনাটা মনে-মনে পর্যালোচনা করার পর তার মনে পড়তে থাকে যে জ্বরের ঘোরে অর্ধজাগ্রত অবস্থায় ওগুলো সে হাতের মুঠোয় শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল এবং ওই অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

‘ইস্‌ দেখ কাণ্ড! একগাদা ছেঁড়া টুকরো-টাকরা নিয়ে ঘুমোচ্ছে। যেন সম্পত্তি আগলাচ্ছে,” বলতে-বলতে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো হাসতে-হাসতে গড়িয়ে পড়ল নাস্তাসিয়া। রাস্‌কোলনিকভ্‌ চোখের পলকে জিনিসগুলো ওভারকোটের তলায় গুঁজে ফেলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। সেই মুহূর্তে সবকিছু পরিষ্কার বোঝার মতো মনের অবস্থা তার না থাকলেও সে উপলব্ধি করতে পারছিল যে যাকে ধরতে আসে তার সঙ্গে কেউ এরকম ব্যবহার করে না। ‘কিন্তু... পুলিস?’

“চা খেলে পারতে না? চাই? নিয়ে আসি— খানিকটা পড়ে আছে এখনও ”

“না, থাক!... আমি যাচ্ছি। আমি এখুনি যাচ্ছি।” অস্ফুট স্বরে বলতে-বলতে সে উঠে দাঁড়াল।

“আমার তো মনে হয় সিঁড়ি দিয়ে নামার মতো ক্ষমতা তোমার নেই।”

“যাই...”

“সে যা তুমি ভালো বোঝ।”

দারোয়ান চলে যাবার পর নাস্তাসিয়াও আর দাঁড়াল না। রাস্‌কোলনিকভও

তৎক্ষণাৎ আলোর দিকে ছুটে গিয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগল প্যান্টের তলাকার কাটা কুচি আর মোজাটা। দাগ আছে বটে, তবে খুব একটা নজরে পড়ার মতো না। কাদা লেগে ঢাকা পড়ে গেছে, রং মুছে গেছে। আগে থেকে যার জানা নেই তার কিছুই নজরে পড়বে না। অর্থাৎ ঈশ্বরের কৃপায় দূর থেকে কিছু দেখতে পাওয়া নাস্তাসিয়ার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এবারে কাঁপা-কাঁপা হাতে সমনটা খুলে পড়তে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে পড়ার পর শেষকালে বুঝতে পারল— স্থানীয় পুলিস স্টেশন থেকে পাঠানো এক মামুলি নোটিশ : ওইদিনই বেলা সাড়ে নয়টার সময় লোকাল থানার ওসি-র সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ।

'কিন্তু এরকম কখনও তো ঘটেনি! তাছাড়া ঠিক আজই বা কেন?' রীতিমতো অবাক হয়ে গিয়ে সে ভাবল। 'হা ভগবান, যত তাড়াতাড়ি হেস্তনেস্ত হয়ে যায় তত ভালো!' সে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে প্রার্থনা করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার নিজেরই হাসি পেয়ে গেল— প্রার্থনার কথা ভেবে নয়, নিজের কথা ভেবে। চটপট জামাকাপড় পরতে লাগল। 'ফাঁসার হলে ফাঁসব— কিছুতে কিছু এসে যায় না! মোজা পরতে হবে!' হঠাৎ সে মনে-মনে ঠিক করে ফেলল! 'তাহলে ধুলোয় আরও বেশি করে ঢাকা পড়ে যাবে-- কোন চিহ্ন থাকবে না।' কিন্তু পরার সঙ্গে-সঙ্গে আবার টেনে খুলে ফেলল নিদারুণ আতঙ্কে ও বিতৃষ্ণায়। খুলে ফেলল বটে, কিন্তু যখন ভেবে দেখল যে অন্য মোজা তার নেই তখন তুলে নিয়ে আবার পরল। আবার হেসে উঠল। 'এ সবই বাঁধা গৎ, সবই মামুলি, সাধারণ জিজ্ঞাসাবাদ' হঠাৎ মনের এক কোনায় ক্ষীণ আশার মতো চিন্তাটা তার খেলে গেল। তবু থরথর করে কাঁপতে লাগল তার সর্বাঙ্গ।

'কিন্তু এই তো পরে ফেললাম! পরে একটা হেস্তনেস্তও করে ফেললাম, তাই না?' তার হাসি অবশ্য সঙ্গে-সঙ্গে বিষাদে পরিণত হল। 'না, এ আমার শক্তির বাইরে,' সে মনে-মনে ভাবল। পা কাঁপতে লাগল ঠকঠক করে। 'আতঙ্কে!' আপন মনে বিড়বিড় করে বলল সে। জ্বরের প্রকোপে মাথা ঘুরতে লাগল, ব্যথা করতে লাগল। 'এটা একটা চালাকি! ওরা চালাকি করে আমাকে ফাঁদে ফেলে সুযোগ বুঝে ঘায়েল করতে চায়,' সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতে-বাড়াতে সে মনে-মনে ভাবল। 'যাচ্ছেতাই ব্যাপার এই যে আমি এখন প্রায় একটা ঘোরের মধ্যে আছি,... বোকার মতো কিছু একটা করে বসতে পারি।...'

সিঁড়িতে তার মনে পড়ল, সমস্ত জিনিস ওয়াল পেপারের তলার ওই গর্তটার মধ্যেই পড়ে রইল। 'বেছে বেছে আমার অনুপস্থিতিতেই যদি খানাতল্লাশি হয়ে যায়!'

কথাটা মনে হতে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু এমন এক চরম হতাশা , আসন্ন বিনাশের সম্ভাবনাপূর্ণ সর্বদোষদর্শী অবজ্ঞা বলতে যা বোঝায় সেরকম একটা ভাব তাকে আচমকা গ্রাস করে ফেলল। তাই ওই চিন্তার কোন প্রশ্রয় না দিয়ে সে এগিয়ে চলল।

যত তাড়াতাড়ি ঢুকে যায় ততই ভালো!'

রাস্তায় আবার সেই অসহ্য গরম! বৃষ্টির ছিঁটেফোঁটাও যদি পড়ত গত কয়েকদিনে। আবার ধুলোবালি, ইট, চুন, আবার দোকানপাট ও শুঁড়িখানায় সেই পূতিগন্ধ, আবার ঘনঘন মাতালের দেখা, আবার রাস্তার ফেরিওয়ালা, আবার সেই ঝরঝরে ছেকড়া গাড়ি। সূর্যের উজ্জ্বল আলো চোখে ঝলক দিচ্ছে, সে আলো এত জোরালো যে চোখ টাটিয়ে উঠছে, চোখ মেলে তাকাতে কষ্ট হচ্ছে। তার মাথা রীতিমতো ঘুরতে লাগল। দুপুরে ঝাঁঝা রোদের মধ্যেও ধুম জ্বর গায়ে আচমকা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লে এরকম হওয়াটা বিচিত্র নয়।

গতকালের রাস্তার মোড়ে পৌঁছনোর পর যন্ত্রণাদায়ক উদ্বেগের উপলব্ধি নিয়ে সে দৃষ্টিপাত করল রাস্তার দিকে, *সেই* বাড়িটার দিকে।... পরক্ষণেই দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

'ওরা যদি জিগ্‌গেসবাদ করে, তাহলে আমি ওদের বলেও দিতে পারি', পুলিস স্টেশনের দিকে পা বাড়াতে-বাড়াতে সে মনে-মনে ভাবল।

তার বাড়ি থেকে পুলিস স্টেশনের দূরত্ব সিকি মাইলও হবে না। সবে একটা নতুন বাড়ির চারতলার নতুন ফ্ল্যাটে উঠে এসেছে। আগে যে ফ্ল্যাটে ছিল সেখানে সে একবার সামান্য কিছুক্ষণের জন্য গিয়েছিল— তাও অনেক কাল হয়ে গেল। ফটকের তলায় ঢুকে সে দেখতে পেল ডানদিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে একজন লোক, রেজিস্ট্রি বই হাতে। 'বেয়ারা গোছের কেউ হবে, তার মানে পুলিস স্টেশনটা এখানেই,' এই ভেবে আন্দাজে সে ওপরে উঠতে লাগল। কাউকে কোন কিছু জিগ্‌গেস করার ইচ্ছে তার হচ্ছিল না।

''ঢুকেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে সব কবুল করব ওদের কাছে,' চারতলায় ঢোকার মুখে সে ভাবল।

আদ্যপ্রান্ত সিঁড়ি, খাড়া উঠে গেছে। জঞ্জালে আগাগোড়া বোঝাই। চারটে তলার সবকটিতেই সবগুলো ফ্ল্যাটের সব রান্নাঘরের দরজা এই সিঁড়ির দিকটায় খোলা। খোলা থাকে প্রায় সারাদিন, যার ফলে জায়গাটা ভয়ঙ্কর গরম আর গুমোট। ওপরে নিচে সমানে ওঠানামা করছে রেজিস্টার বগলে দপ্তরি, পুলিসের পেয়াদা, স্ত্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীরই বিচিত্র লোকজন— সাক্ষাৎপ্রার্থী আগন্তুকের দল। অফিসে ঢোকার দরজাটাও হাট করে খোলা। ভেতরে ঢুকে বাইরের ঘরে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। চাষাভুষো গোছের কিছু লোকজন সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। এ জায়গাটাও মারাত্মক গুমোট। এছাড়া এ ঘরের সদ্য রঙের পোঁচ তখনও কাঁচা থাকায় পচা দুর্গন্ধযুক্ত তিসির তেল মেশানো সেই রঙের ঝাঁঝাল গন্ধ যেভাবে ধক করে নাকে এসে লাগছিল তা বমি উদ্রেক করার পক্ষে যথেষ্ট। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শেষপর্যন্ত সে আরও এগিয়ে গিয়ে পাশের ঘরে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। সবগুলো ঘরই খোপ-খোপ, ছোট-ছোট, ছাদ নিচু। একটা নিদারুণ অসহিষ্ণুতা তাকে ক্রমাগত সামনের

দিকে টেনে নিয়ে চলল! কেউ তাকে লক্ষ করল না। দ্বিতীয় খোপটাতে বসে কাগজপত্র লেখালেখি করছে কিছু কেরানি, তাদের বেশভূষা ওর তুলনায় সামান্য উন্নত। দেখতে কেমন যেন অদ্ভুত। ওদেরই একজনের দিকে এগিয়ে গেল সে।

"কী চাই?"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ পুলিস স্টেশনের নোটিশটা দেখাল তাকে।

"আপনি কি ছাত্র?"

নোটিশটার দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, ছাত্র ছিলাম।"

কেরানি তার ওপর নজর বুলাল— বিন্দুমাত্র কৌতূহলের লক্ষণ প্রকাশ করল না। লোকটা কেমন যেন অগোছাল ধরনের, তার চোখের দৃষ্টির স্থির, ভাবলেশহীন।

"এ লোকটার কাছ থেকে কিছু জানা যাবে না, কেন না এর কাছে সবই সমান', রাস্‌কোল্‌নিকভ্ মনে-মনে ভাবল।

"চলে যান ওই ওখানে, হেডক্লার্কের কাছে," এই বলে কেরানি আঙুল দিয়ে একেবারে শেষের ঘরটি দেখিয়ে দিল

বাইরের ঘরের পরে এই চতুর্থ ঘরটাতে সে ঢুকল। এ ঘরটা ঠাসাঠাসি লোকজনে বোঝাই, গিজগিজ করছে। এখানে লোকগুলোর জামাকাপড় ওই ঘরের লোকজনের তুলনায় খানিকটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সাক্ষাৎপ্রার্থী আগন্তুকদের মধ্যে ছিল দু'জন মহিলা। ওদের একজনের গায়ে শোকের পোশাক। বেশভূষায় দারিদ্র্যের ছাপ। হেডক্লার্কের টেবিলের সামনে বসে তারই মুখে-মুখে বলে যাওয়া একটা বয়ান লিখছিল। অন্য মহিলাটি বেশ মোটাসোটা, লাল টকটকে, মুখে ছোপ-ছোপ দাগ। চোখে পড়ার মতো চেহারা। পোশাকের খুবই বাহার, বুকের ওপর ঝুলছে চায়ের পিরিচের আকারের ইয়া বড়ো একটা ব্রোচ। মহিলা একটু দূরে দাঁড়িয়ে কিসের যেন অপেক্ষা করছিল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ নোটিশটা বাড়িয়ে দিল হেডক্লার্কের দিকে। হেডক্লার্ক সেটার ওপর চট করে নজর বুলিয়ে নিয়ে 'একটু অপেক্ষা করুন' বলেই শোকের পোশাক পরা মহিলাকে নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

রাসকোল্‌নিকভ্ এতক্ষণে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারল। 'সম্ভবত যা ভাবছিলাম তা নয়!' অল্প-অল্প করে সে মনে সাহস সঞ্চয় করতে লাগল। সাহস সঞ্চয় করার ও চেতনা ফিরে পাবার জন্য প্রাণপণে নিজেকে বুঝ দিতে লাগল।

'ছোটখাটো বোকামি, মনোযোগের সামান্য অভাব, তাহলেই দেখতে হবে না— ধরা পড়ে যাব! হুম্... আফসোসের কথা, এখানে বাতাসের অভাব'... সে যোগ করল, 'বড় গুমোট।... মাথাটা আরও বেশি ঘুরছে।... বুদ্ধিসুদ্ধিও গুলিয়ে যাচ্ছে।...'

সে মনে-মনে উপলব্ধি করতে পারছিল তার ভেতরে-ভেতরে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। তার ভয় হচ্ছিল নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ সে হারিয়ে ফেলবে... চেষ্টা

করল কোন একটা বিষয়কে আঁকড়ে ধরে রাখতে। কোন একটা বিষয়কে নিয়ে, এমন একটা কিছু নিয়ে ভাবতে, যার সঙ্গে এর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই, কিন্তু সেটা তার পক্ষে একবারেই সম্ভব হচ্ছিল না। তবে হেড ক্লার্কটি তার বেশ মনোযোগ আকর্ষণ করছিল। তার কেবলই ইচ্ছে হচ্ছিল লোকটার মুখ দেখে যদি কিছু একটা আন্দাজ করা যায়, আসল মতলবটা জানা যায়। লোকটার বয়স নিতান্তই কম, বছর বাইশেক হবে। রোদে পোড়া তামাটে চেহারা, চটপটে ভাবভঙ্গি, বয়সের তুলনায় বেশি দেখায় তাকে। বেশভূষা বেশ আধুনিক— এমনকি একটু আতিশয্যের দিকে। মাথার মাঝখান দিয়ে চাঁদি পর্যন্ত সিঁথিকাটা ব্যাকব্রাশ করা, ফুলেল তেলমাখা চুল, বুরুশ দিয়ে ঘষামাজা, সাদা ধবধবে হাতের আঙুলে ছোটবড় অসংখ্য আংটি — কোনটাতে মোহর, কোনটাতে নামের ছাপ। ওয়েস্টকোট থেকে ঝুলছে সোনার চেইন। সেখানে উপস্থিত একজন বিদেশীকে সে ফরাসীতে গোটা দুয়েক কথাও বলল। — বেশ সন্তোষজনক ফরাসীতেই বলল।

বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত, সেই লাল টকটকে মহিলাটি তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে, তার পাশে একটা চেয়ার খালি পড়ে থাকা সত্ত্বেও। মনে হচ্ছিল নিজে থেকে বসার সাহস তার হচ্ছিল না। তার দিকে দৃষ্টি পড়তে হেডক্লার্কটি কাজের ফাঁকেই একবার বলে উঠল : "বসুন না লুইজা ইভানোভ্না।"

"Ich danke", এই বলে রেশমি কাপড়ের মৃদু খসখস আওয়াজ তুলে আস্তে করে মহিলা বসে পড়ল চেয়ারে। সাদা লেসের ঘের দেওয়া তার হালকা নীল পোশাকটা বেলুনের মতো চেয়ারের চারধারে ছড়িয়ে পড়ল প্রায় অর্ধেক কামরা জুড়ে। ছড়িয়ে পড়ল সেন্টের ঘ্রাণ। কিন্তু মহিলা যে ঘরের অর্ধেকটা দখল করে ফেলেছে এবং এতটা সেন্টের ঘ্রাণ ছড়াচ্ছে তাতে তাকে কুণ্ঠিত মনে হল। অবশ্য মৃদু হাসিও লেগে আছে তার মুখে— সে হাসিতে একই সঙ্গে ফুটে উঠছে ভয়-ভয় অথচ নির্লজ্জ ভাব; আবার উদ্বেগের ভাবও গোপন থাকছিল না সেখানে।

শোকগ্রস্ত মহিলাটির কাজ শেষ হয়ে গেছে। শেষকালে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, এমন সময় বেশ খানিকটা সোরগোল তুলে প্রতি পদক্ষেপে কাঁধদুটো কেমন যেন বিশেষ ভঙ্গিতে নাচাতে-নাচাতে ঘরে ঢুকল দস্তুরমতো জাঁদরেল চেহারার এক অফিসার। তকমা আঁটা টুপিটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে ধপ করে একটা আরাম চেয়ারে বসে পড়ল। জমকাল পোশাক পরা মহিলাটি তাকে দেখে যেন কতই খুশি হয়েছে এমন ভাব দেখিয়ে তড়াক করে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে অভিবাদন জানানোর উদ্যোগ করল। কিন্তু অফিসার ভদ্রলোকটি তার দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিলেন না। মহিলাও তার উপস্থিতিতে ফের চেয়ারে বসতে আর ভরসা পেল না। অফিসার ভদ্রলোকটি পদমর্যাদায় একজন লেফটেনান্ট, পুলিস থানার ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট! মুখের দুপাশে খাড়া হয়ে বেরিয়ে আছে লালচে কটারঙের গোঁফজোড়া, তার নেহাত ছোটখাটো মুখের আদলে অবশ্য একধরনের ঔদ্ধত্য ছাড়া

উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্যের ছাপ ছিল না। আড়চোখে এবং অনেকটা বিরক্তিভরেই সে তাকাল রাস্‌কোল্‌নিকভের দিকে: ওর পোশাক-পরিচ্ছদ যাচ্ছেতাই রকমের নোংরা, কিন্তু দারিদ্র্যের চিহ্ন যত প্রকটই হোক না কেন মার্জিত ভাবভঙ্গির সঙ্গে বেশভূষার কোন মিল ছিল না। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ অসতর্কতাবশত বড় বেশি সোজাসুজি এবং এত বেশিক্ষণ ধরে তাঁর দিকে তাকাল যে তাতে অফিসারটি মনে-মনে ক্ষুব্ধই হলেন।

ছিন্নভিন্ন জামাকাপড় পরা এমন একটা লোক কিনা তাঁর বিদ্যুদ্দীপ্ত দৃষ্টির সামনে নিষ্প্রভ হয়ে যাবার এতটুকু লক্ষণ দেখাচ্ছে না, সম্ভবত এই ভেবে অবাক হয়ে গেল। তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন: "কী চাই তোমার?"

"ডেকে পাঠিয়েছে... নোটিশ দিয়ে," রাস্‌কোলনিকভের দায়সারা গোছের জবাব।

"এই পার্টির কাছ থেকে, *ছাত্রের* কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্য একটা সমন পাঠানো হয়েছিল," কাজের দলিল থেকে চোখ তুলে তড়বড়িয়ে বলে উঠল হেডক্লার্ক। "এই যে!" রাস্‌কোল্‌নিকভের দিকে একটা লেজার ছুঁড়ে দিয়ে সেখানে একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সে বলল, "পড়ে দেখুন!"

'টাকা? কিসের টাকা?' রাস্‌কোল্‌নিকভ মনে-মনে ভাবল। 'তাহলে... কারণ *ওটা* হতে পারে না।' আনন্দে সে কেঁপে উঠল। হঠাৎ এত হালকা বোধ করল যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তার বুকের বোঝা একেবারে নেমে গেল।

"এখানে আপনার ক'টার সময় হাজিরা দেবার কথা লেখা ছিল মশাই?" মিছিমিছি, কী কারণে কে জানে, ক্রমেই বেশি মাত্রায় অপমানিত বোধ করে ধমকে উঠল লেফটেনান্ট। "আপনাকে লেখা হয়েছে নয়টায়, এখন এগারোটা বেজে গেছে!"

"আমাকে দেওয়া হয়েছে মাত্র পনেরো মিনিট আগে", লেফটেনান্টের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁচু গলার কথাগুলো ছুঁড়ে দিল রাস্‌কোলনিকভ্। আচমকা এবং নিজের কাছেও অপ্রত্যাশিত এহেন ক্রোধের প্রকাশে বেশ খানিকটা তৃপ্তিও খুঁজে পাচ্ছিল সে। শেষে যোগ করল, "আমি যে জ্বর গায়ে এখানে এসেছি এটাই তো যথেষ্ট।"

"দয়া করে চেঁচামেচি করবেন না!"

"আমি চেঁচাচ্ছি না। আমি মাত্রাজ্ঞান বজায় রেখে স্বাভাবিক গলায় কথা বলছি। আপনিই আমার ওপর গলা চড়াচ্ছেন। আমি একজন ছাত্র, আমার ওপর কেউ চেঁচিয়ে কথা বলবে এটা আমি বরদাস্ত করব না।"

ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট এতে এত রেগে গেলেন যে প্রথম মিনিটখানেক তাঁর মুখ থেকে কোন বাক্যস্ফূর্তি হল না। কেবল *ঠোঁটের* ফাঁক দিয়ে অস্ফুট আওয়াজের সঙ্গে -সঙ্গে খানিকটা থুতু ছিটকে বেরোল। তিনি লাফিয়ে উঠলেন জায়গা ছেড়ে।

"চু-উ-প্! চুপ করুন বলছি! ভুলে যাবেন না, আপনি এসেছেন একটা সরকারি অফিসে। অভদ্রতা করার জায়গা নয় এটা, মশাই!"

"হ্যাঁ, আপনিও ভুলে যাবেন না আপনি কোথায় আছেন," রাস্‌কোলনিকভ্

চেঁচিয়ে বলল। "শুধু চেঁচাচ্ছেনই না, সিগারেটও ফুঁকছেন আবার, তার মানে আমাদের কাউকে আপনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না," কথাগুলো বলে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ অবর্ণনীয় তৃপ্তি উপভোগ করল।

হেডক্লার্ক তাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি-মুচকি হাসছিল। রগচটা লেফটেনান্ট যে থতমথ খেয়ে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

"সেটা আপনাকে দেখতে হবে না মশাই!" শেষকালে অস্বাভাবিক রকম চেঁচিয়ে গলা ফাটালেন তিনি। "আপনার কাছ থেকে যা যা তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে, দয়া করে সেগুলো দিন। ওঁকে দেখান তো আলেক্সান্দ্র গ্রিগোরিয়েভিচ্। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ! আপনি পাওনা টাকা মেটাচ্ছেন না । দিব্যি আছেন, অ্যাঁ!"

কিন্তু রাস্‌কোল্‌নিকভ্ আর এ সমস্ত কথায় কান দিচ্ছিল না। ততক্ষণে লোভীর মতো তাড়াতাড়ি করে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রহস্যভেদের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছে সে। একবার পড়ল, আরও একবার পড়ল, তবু বোধগম্য হল না।

"এটা কী?" হেডক্লার্ককে সে জিগ্‌গেস করল।

"সময়মতো টাকা শোধ করবেন বলে আপনি যে খতে সই করেছিলেন সেই অনুযায়ী এখন আপনার কাছ থেকে টাকা দাবি করা হচ্ছে। হয় আপনাকে যাবতীয় খরচ, জরিমানা ইত্যাদি বাবদ পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে, নয়ত লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে কবে তা শোধ করতে পারবেন, সেই সঙ্গে এও লিখে দিতে হবে যে ঋণ যতদিন না শোধ হচ্ছে ততদিন রাজধানী ছেড়ে কোথাও যেতে পারবেন না, আপনার সম্পত্তির কোন অংশ বিক্রি করতে অথবা গোপন করতে পারবেন না। কিন্তু আপনার উত্তমর্ণ ইচ্ছে করলে আপনার সম্পত্তি বিক্রি করতে পারেন এবং আইন অনুযায়ী আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন।"

"কিন্তু আমি... আমি তো কারও কাছে ঋণী নই!"

"সেটা আমাদের ব্যাপার নয়। নয় মাস আগে সরকারি কর নির্ধারকের বিধবা পত্নী জার্‌নিৎসিনাকে আপনি একশ পনেরো রুবল ঋণের যে খত লিখে দিয়েছিলেন, জার্‌নিৎসিনার কাছ থেকে মূল্য পরিশোধ বাবদ তা সরকারি আমলা চেবারভের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। এখন ওই খতের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় ঋণ পরিশোধ না করার দায়ে আইনসঙ্গত একটি অভিযোগ আমাদের কাছে দায়ের করা হয়েছে। এই কারণেই আপনাকে এখানে ডেকে পাঠানো।"

"কিন্তু উনি যে আমার বাড়িউলি!"

"তা বাড়িউলি হল তো কী হয়েছে।"

হেডক্লার্ক যে ভাবে হেসে রাস্‌কোল্‌নিকভের দিকে তাকাল তাতে ফুটে উঠল করুণা মিশ্রিত প্রশয়ের ভাব, সেইসঙ্গে বেশ খানিকটা বিজয়োল্লাস। ভাবটা এমন,

যেন একজন সদ্য রিক্রুট-করা সৈনিককে এই প্রথম গুলিগোলার মুখে পড়ে নাস্তানাবুদ হতে দেখে প্রশ্ন করছে : "এখন কেমন?" কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে ওই খত নিয়ে, ঋণ আদায়ের জন্য তার বিরুদ্ধে যে সমন জারি করা হয়েছে তাই নিয়ে কি আর ভাবার অবকাশ আছে রাস্‌কোল্‌নিকভের? এখন কি আর এটা কোন দুশ্চিন্তার— এমনকি সামান্যতম মনোযোগেরও বিষয় হতে পারে? রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ওখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পড়ল, শুনল, জবাব দিল, এমনকি নিজেও প্রশ্ন করল— কিন্তু সবই যন্ত্রচালিতের মতো। ভবিষ্যতের কথা ভেবে কোন চিন্তা নয়, কোন বিশ্লেষণ নয়, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন রহস্যসৃষ্টি নয়, সেই রহস্যজাল ভেদ করার কোন চেষ্টাও নয়, কোনরকম সন্দেহ, কোন প্রশ্ন ছাড়াই আসন্ন বিপদের বোঝা থেকে মুক্তি ও নিজেকে রক্ষা করতে পারার বিজয়োল্লাস— এই মুহূর্তে। ঠিক এই উপলব্ধিই অধিকার করে ছিল তার সমগ্র সত্তা। এটা ছিল একান্তই, পরিপূর্ণ, নির্ভেজাল জৈবিক আনন্দের একটি মুহূর্ত। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই পুলিস স্টেশনের ঘরের ভেতরে ঘটে গেল এমন একটা ঘটনা যাকে অনেকটা বজ্রবিদ্যুৎ-পাতের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এইমাত্র যে শ্রদ্ধা ও সৌজন্যের অভাবের পরিচয় লেফ্‌টেনান্ট পেলেন তার ধাক্কা তিনি তখন পর্যন্ত সামলে উঠতে পারেননি, তখনও রাগে ফুঁসছেন। এই অবস্থায়, বোঝাই যাচ্ছে নিজের হৃত মর্যাদাকে পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশ্যে তিনি ফেটে পড়লেন সেই বেচারি জমকাল মহিলাটির ওপর। লেফটেনান্ট যখন প্রবেশ করেন সেই মুহূর্ত থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত আকাট মুর্খের মতো তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছিল সে।

"আর এই যে, এসে জুটেছে যত রাজ্যের হ্যানা-ত্যানা!" আচমকা তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন গলা সপ্তমে চড়িয়ে (শোকগ্রস্ত মহিলাটি ততক্ষণে চলে গেছে)! "গত রাতে তোমাদের ওখানে কী হয়েছিল, শুনি? ফের সারা মহল্লা জুড়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ডকারখানা, হাঙ্গামা, হুজ্জোতি শুরু করে দিয়েছ! আবারও মারপিট, মাতলামি! অ্যাঁ! নেশা ছাড়ানোর জন্য পুলিস থানায় জলে চুবুনি দিলে ভালো হবে, না? পই-পই করে বলেছি, হাজার বার এই বলে সাবধান করে দিয়েছি যে পরের বার আর কোন ছাড়াছাড়ি নেই! অথচ আবার, আবার শুরু করে দিয়েছে, যত রাজ্যের হ্যানা-ত্যানা!"

ঘটনার আকস্মিকতায় রাসকোল্‌নিকভের হাতের কাগজটা খসে পড়ল। এমন অশালীনভাবে জমকাল চেহারার মহিলাকে হেনস্তা হতে দেখে সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। কিন্তু শিগগিরই আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারল, সঙ্গে-সঙ্গে অল্প-অল্প করে ঘটনাটা থেকে বেশ খানিকটা রসও উপভোগ করতে লাগল। শুনতে -শুনতে এত মজা লাগতে শুরু করল যে তার ইচ্ছে করছিল হাসে, শুধুই হাসে, অবিরাম হাসতে থাকে— এত বেশি লাফাচ্ছিল তার স্নায়ুগুলো।

'ইলিয়া পেত্রোভিচ্!" উদ্বিগ্ন হয়ে কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল হেডক্লার্ক, অপেক্ষা করতে লাগল উপযুক্ত সুযোগের, কেননা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তার

জানা ছিল যে ক্রোধোমত্ত লেফ্‌টেনান্টকে হাত ধরে ঠেকানো ছাড়া রোখার কোন উপায় নেই।

এদিকে বজ্রবিদ্যুৎপাতের ফলে জমকাল মহিলাটির প্রথম-প্রথম দারুণ কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল। কিন্তু গালাগাল বর্ষণের মাত্রাবৃদ্ধি ও বাক্যবাণ উত্তরোত্তর শানিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার ভাবভঙ্গি আরও বেশি ভদ্র হয়ে উঠতে লাগল, আরও বেশি মিষ্টি হেসে সে তাকাতে লাগল ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ লেফ্‌টেনান্টের দিকে। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছটফট করতে-করতে বারবার সৌজন্য দেখিয়ে সে নিচু হয়ে কুর্নিশ করতে লাগল তাকে। অসহিষ্ণু হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কখন লেফটেনান্ট তাকে কথা বলার সুযোগ দেবেন। শেষকালে অবসান ঘটল তার প্রতীক্ষার।

"কোন হৈ-হাঙ্গামা-হুজ্জোতি হোয়নি কাপটেনসাব," হঠাৎ ফাঁক পেয়ে তড়বড়িয়ে সে বলে উঠল— যেন মাটিতে ছিটকে পড়ল মটরদানা। তার কথার মধ্যে জার্মান টান স্পষ্ট ফুটে উঠলেও এতটুকু আড়ষ্টতা ছিল না তার রুশীতে। "কোন কেলেঙ্কারি মোটে হোয়নি, অ্যাথটুকুও হোয়নি। কিনঠু লোগ্গুলো এসেছিল মাথাল হোয়ে। সোব আপনাকে বোলবো কাপটেন সাব। ধোষ হামার নোয়।... ভোদ্র মানুষের বাড়ি হামার, কাপ্‌টেনসাব ও হামাদের বেবহারও ভালো, কাপ্‌টেনসাব কেলেঙ্কারি হামি কোখনও চাই না, কোখোনও না। কিন্তু ওরা সব এসেছিল বিলকুল মাথাল হোয়ে। থারপর চাইল আরো তিন বোটল। থারপর ওনাদের অ্যাকজনা পা ওঠাল, পিয়ানো বাজাতে লাগল ধুই পায়ে। এঠা ভালো নোয়— বিলকুল্‌ ভালো নোয়। ভোদ্র মানুয়ের বাড়িতে এসোব কী কাণ্ড! ভেঙেই ফেললো পিয়ানোঠা। বেবহার ঝানে না— বিলকুল ঝানে না, একদোম ঝানে না— আমি থাই বোললাম। লোখ্‌টা বোটল হাথে নিয়ে থাই দিয়ে সবার পেছনে ধাক্কা মারতে লাগল। তোখোন আমি তুরন্ত দারবানকে ডাকলাম। কার্ল আসতে ওর চোখে দিলো এক ঘা বসিয়ে, হেন্‌রিয়াটাকেও হামাকেও চড় মারলো পাঞ্চবার। ভোদ্র মানুষের বাড়িতে এক্কি অভোদ্র কাজ কাপটেন সাব আপনিই বলুন! আমি চেল্লালাম। লোখ্‌টা খালপাড়ের ঝান্‌লা খুলে ঝান্‌লার তাকের ওপর দেঁড়িয়ে চ্যাঁ ভ্যাঁ করতে লাগল শুয়োর বাচ্ছার মতো! বোড়ো শরমের বাত। ছি- ছি- ছি! কার্ল ওনাকে পেছন থেকে কোট ধরে টানতে লাগলো, ঝানলা থেকে নামাতে গেলো। এঠা ঠিক কাপ্‌টেনসাব যে টানাটানিতে লোখ্‌টার কোঠের পেছনের লেজ্‌ই ছিঁড়ে গেলো! তোখুন লোখ্‌টা এই বোলে চেল্লাতে লাগল ঝে পন্দ্রো রুবল ফাইন দিতে হোবে। এই অভোদ্র লোকটাই, কাপ্‌টেন সাব ঝত গণ্ডগোল পাকিয়ে দিলো। হামাকে বোলল, আপনার ওপর বড় এখ্‌টা হাসির লেখা লিখব, ঝে কোনো কাগজে আপনার বিষয়ে লিখতে পারি হামি।"

"ওঃ এ যে একজন লেখক দেখছি, অ্যাঁ!"

"হ্যাঁ, কাপ্‌টেনসাব। কী অভোদ্র এই লোখ্‌টা, ভোদ্র বাড়িতে কিনা..."

"হয়েছে, অনেক হয়েছে! আমি তো তোমাকে বলেইছি, কতবার বলেছি, পই-পই করে বলেছি..."

'ইলিয়া পেত্রোভিচ্!" হেডক্লার্ক আবার অর্থব্যঞ্জক ভাবে বলে উঠল। লেফটেনান্ট এবারে দ্রুত চোখ তুলে তাকালেন তার দিকে। হেডক্লার্ক ঈষৎ মাথা নেড়ে ইশারা করল।

"...তাহলে ওগো আমার লুইজা ইভানোভ্না , তোমাকে বলি শোনো— এই আমার শেষ কথা, এই শেষবারের মতো বলছি," লেফটেনান্ট বললেন, "তোমার ওই ভদ্র বাড়িতে যদি আরও একবার এতটুকু হাঙ্গামা-হুজ্জোতি ঘটেছে বলে শুনি, তাহলে ভদ্রসমাজে যমের দক্ষিণ দুয়ার বলতে যা বোঝায় আমি তোমাকে সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করব। বুঝেছ? বলছ একজন লিখিয়ে-পড়িয়ে ভদ্রলোক, একজন লেখক মানুষ 'ভদ্র বাড়িতে' কোটের লেজ খোয়া যাওয়ায় পাঁচটা রুবল আদায় করে ছেড়েছে, অ্যাঁ? এই তো লিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষদের হাল! গত পরশুদিন এক শুঁড়িখানায় এরকমই একটা ঘটনা ঘটেছিল : একটা লোক খেয়েদেয়ে পরে আর টাকা দিতে চায় না, উলটে বলে, আমি তোমাদের নামে কাগজে রসিয়ে একটা লেখা লিখব। এই কয়েকদিন আগে, গত সপ্তাহে স্টিমারে একজন তো এক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর গণ্যমান্য পরিবার, তাঁর স্ত্রী আর কন্যাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করল। কিছুদিন আগে মিষ্টির দোকান থেকে একজনকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করতে হল। এই তো সব লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকজনের নমুনা, লেখক, ছাত্র, গলাবাজদের কাণ্ডকারখানা।... ছ্যা-ছ্যা! ভাগো এখন! আমি নিজে গিয়ে একবার দেখে আসব।... তাই সাবধান করে দিচ্ছি! শুনছ?"

সৌজন্য দেখানোর জন্য আরও বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ল লুইজা ইভানোভ্না। ঘটা করে বারবার চারদিকে ঘুরে-ঘুরে কুর্নিশ করতে-করতে এক-পা দু-পা করে দরজার দিকে পিছিয়ে গেল। কিন্তু দোরগোড়ায় তার পশ্চাদ্দেশ দুম্ করে ধাক্কা খেল একজন পুলিস অফিসারের গায়ে। অফিসারটির চেহারা চোখে পড়ার মতো, চোখমুখের ভঙ্গি সতেজ, সপ্রতিভ, সোনালি রঙের ঘন চুলের জমকাল জুলপি গালের দুপাশে। খোদ নিকোদিম ফোমিচ্, থানার অফিসার ইনচার্জ। লুইজা ইভানোভ্না তাকে দেখামাত্র প্রায় আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ ঠুকল, দ্রুত ছোট-ছোট পদক্ষেপে লাফাতে-লাফাতে ছিটকে বেরিয়ে গেল অফিসঘর থেকে।

"আবার বজ্রবিদ্যুৎ, আবার ঘূর্ণিঝড়, ঝঞ্ঝা!" বন্ধুভাবে, অমায়িক সুরে ইলিয়া পেত্রোভিচ্‌কে সম্বোধন করে বলল নিকোদিম ফোমিচ্। "আবার আপনি বড় বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন, আবার মেজাজ খারাপ করছেন! সেই সিঁড়ি থেকে শুনতে পাচ্ছি।"

"তো কী?"— এমনকি তাও নয় অনেকটা "তো-ও কী-ই-ই!"— বেরিয়ে

এলো তাঁর মুখ থেকে। কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল বড়মানুষী অবজ্ঞার ভাব। লোকজনকে দেখিয়ে-দেখিয়ে প্রতি পদক্ষেপে কাঁধ নাচাতে-নাচাতে, সেইসঙ্গে সমান তালে পা ফেলতে-ফেলতে একতাড়া কাগজ হাতে নিয়ে আরেকটি ডেস্কের দিকে তিনি এগিয়ে গেলেন। যেতে-যেতে বললেন, "এই যে দয়া করে দেখুন একবার,... এই একজন লেখক মশায়, মানে একজন ছাত্র... এককালে ছাত্র ছিলেন আর কি পাওনা মেটাচ্ছেন না, গুচ্ছের হ্যান্ডনোট দিয়ে বসে আছেন। ফ্ল্যাট ছাড়ার নাম নেই, সমানে অভিযোগ আসছে ওঁর নামে। এদিকে উল্‌টে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন... কী?...না, আমি ওঁর সামনে সিগারেট ধরিয়েছি! নিজেই কিন্তু ব্যবহারে ধা-ষ-টা-মোর পরিচয় দিচ্ছেন, একবার চেয়ে দেখুন— নয়ন সার্থক করুন আপনারা ওনার ছিরি দেখে!"

"দারিদ্র্য কোন অপরাধ নয়, বন্ধু, ওটা কোন ব্যাপার নয়! জানা গেল, আপনি একটা বারুদের স্তূপবিশেষ, অপমান সহ্য করতে পারেননি, আপনি সম্ভবত্ কোন কারণে ওঁর ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন, নিজেকে সামলাতে পারেননি," অমায়িক ভঙ্গিতে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে লক্ষ করে নিকোদিম ফোমিচ্ বলল। "কিন্তু ওরকম করা আপনার উচিত হয়নি। হ্যাঁ, আমি আপনাকে বলছি, খু-উ-ব ভালো লোক উনি, কিন্তু তাহলে কী হবে? — বারুদ, যাকে বলে বারুদ! আগুন লাগল, হুস্ করে জ্বলে উঠল, জ্বলে পুড়ে গেল— তারপর কিছু নেই! সব শেষ! ফলে? ফলে কী পাচ্ছেন? মানুষ তো নয়— খাঁটি সোনা! রেজিমেন্টে ওর নামই হয়ে গিয়েছিল লেফটেনান্ট বারুদ।"

"আর কী রে- জি-মেন্টই না ছিল!" যদিও চাপা রাগে তখনও তাঁর মুখ থমথম করছে। তবু হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়ে নিজের প্রশংসা ভালোমতো উপভোগ করতে করতে ইলিয়া পেত্রোভিচ্ বলল।

রাস্‌কোল্‌নিকভের সহসা প্রবল বাসনা জাগল ওদের সকলকে অসাধারণ ভালো কিছু বলার।

নিকোদিম ফোমিচ্‌কে লক্ষ করে হঠাৎই রীতিমতো অন্তরঙ্গ সুরে সে বলতে শুরু করল, "কিছু মনে করবেন না ক্যাপ্টেন। আমার পরিস্থিতিটাও বোঝার চেষ্টা করুন। ... আমি যদি আমার দিক থেকে, কোনভাবে ভদ্রলোককে অসম্মান করে থাকি, তাহলে ক্ষমা চাইতেও রাজি আছি ওঁর কাছে। আমি একজন দুস্থ, অসুস্থ ছাত্র, দারিদ্র্য-পীড়িত (পীড়িত কথাটাই সে ব্যবহার করেছিল)। আমি এককালে ছাত্র ছিলাম— ছিলাম এই কারণে বলছি যে বর্তমানে নিজেকে চালানোর মতো সঙ্গতি আমার নেই। তবে শিগ্‌গিরই আমি কিছু টাকাকড়ি পাচ্ছি। আমার মা আর বোন রিয়াজান প্রদেশে থাকে।... ওরা আমাকে পাঠাচ্ছে।... আমি শোধ করে দেবো। আমার বাড়িউলি ভালো মানুষ কিন্তু আমি টুইশান হারিয়েছি, চারমাস হতে চলল ওঁকে কোন টাকাপয়সা ঠেকাচ্ছি না দেখে উনি আমার ওপর এত রেগে গেছেন যে খাবার পাঠানো পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন?... কিন্তু হ্যান্ডনোটটা কিসের সেটাই তো আমি বুঝতে পারছি না!

লিখিতভাবে ঋণস্বীকার করে ওঁকে যে কাগজ দিয়েছি সেটার ভিত্তিতে উনি, এখন টাকা দাবি করছেন, কিন্তু সে আমি শোধ করি কী করে, আপনারা নিজেরাই বিচার করে বলুন!"

"কিন্তু ওটা আমাদের ব্যাপার নয়..." হেডক্লার্ক আবার মন্তব্য করতে গেল।..

"অবশ্যই নয়, অবশ্যই নয়, আমি মানছি। আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু আমাকেও একবার নিজের অবস্থাটা বুঝিয়ে বলতে দিন," রাসকোল্‌নিকভ্ আবার বলতে শুরু করল.. তবে হেডক্লার্ককে উদ্দেশ্য করে নয়... আগের মতোই নিকোদিম ফোমিচের উদ্দেশ্যেই। সেইসঙ্গে তার আপ্রাণ চেষ্টা ছিল ইলিয়া পেত্রোভিচ্‌কেও উদ্দেশ্য করে বলা, যদিও ইলিয়া পেত্রোভিচ্ গোঁ ধরে ভাব দেখানোর চেষ্টা করছিলেন যে কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছেন এবং রাসকোল্‌নিকভের প্রতি অবজ্ঞাবশত তার কথায় কোন কান দিচ্ছেন না। এদিকে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বলেই চলেছে : "দাঁড়ান, আমার তরফ থেকে একবার বুঝিয়ে বলি আপনাকে— আমি ভদ্রমহিলার বাড়িতে বসবাস করছি প্রায় তিন বছর হল— সেই মফস্বল শহর থেকে যখন এখানে আসি তখন থেকে। আগে...আগে... অবশ্য স্বীকার করতেই বা বাধা কোথায়? ...একেবারে গোড়ায়, আমি ওঁকে কথা দিয়েছিলাম যে ওঁর মেয়েকে বিয়ে করব। প্রতিশ্রুতিটা ছিল মৌখিক, কোনরকম বাধ্যবাধকতা ছাড়া।... একটা কুমারী মেয়ে।... মোটকথা, দেখেশুনে ভালোই লেগেছিল আমার.. যদিও প্রেমে আমি পড়িনি।... এককথায়, যৌবন।... মানে আমি বলতে চাই; বাড়িউলি আমাকে সেই সময় প্রচুর ধার দিতেন। আমিও একধরনের জীবনযাপন করতে লাগলাম... আমি ছিলাম একেবারে চপলমতি।..."

"আপনার কাছ থেকে আপনার ব্যক্তিগত জীবনের অত খুঁটিনাটি বর্ণনা এখানে মোটে কেউ চাইছে না মশায়, তাছাড়া সময়ও নেই," সুযোগ বুঝে একহাত নেওয়ার উদ্দেশ্যে রূঢ়ভাবে তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলতে গেলেন ইলিয়া পেত্রোভিচ্। কিন্তু রাস্‌কোলনিকভ্ উত্তেজিত হয়ে তাকে থামিয়ে দিল, যদিও হঠাৎ সে অনুভব করল কথা বলতে তার বেশ অসুবিধে হচ্ছে।

"না, না, দয়া করে বলতে দিন, আমাকে বলতে দিন। ... কী ঘটেছিল,... বিশেষত আমার দিক থেকে.. যদিও... যদিও... আমি আপনার সঙ্গে একমত যে এসবই বিরক্তিকর বাড়তি কথা।... কিন্তু এক বছর আগে মেয়েটি টাইফাসে মারা যায়, এদিকে আমি আগের মতোই ওঁর ভাড়াটে হয়ে রইলাম। বাড়িউলি তাঁর এখনকার ফ্ল্যাটে উঠে আসার পর আমাকে বললেন... এবং বললেন বন্ধুভাবে... যে আমার ওপর তাঁর পূর্ণ আস্থা আছে ... এইরকম নানা কথার পর জিগ্‌গেস করলেন আমি তাঁর কাছে মোট যে একশ পঁয়ত্রিশ রুবল ধারি বলে তিনি মনে করেন, তার জন্য কোন হ্যান্ডনোট লিখে দেবার কোন অভিপ্রায় আছে কিনা। বিশ্বাস করুন মশায়, তিনি এও বলেন যে ওই কাগজটা লিখে দিলে সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে যত খুশি তত ধার পেতে

পারি এবং যতদিন না আমি ধার শোধ করছি ততদিন তিনি নিজে থেকে কখনও, কস্মিনকালেও ওই কাগজের সুযোগ গ্রহণ করবেন না— এ ছিল তাঁর নিজের মুখের কথা।... অথচ দেখুন, এখন, যখন আমি টুইশান খুইয়েছি, আমার খাবার সঙ্গতি নেই, তখন কিনা উনি আদায়ের নোটিশ জারি করলেন! এখন কী আর বলব, বলুন?

ইলিয়া পেত্রোভিচ তাকে অভদ্রভাবে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "শুনুন মশায়, ওসব সেন্টিমেন্টাল খুঁটিনাটিতে আমাদের এতটুকু আগ্রহ নেই। আপনার কাছ থেকে চাওয়া হয়েছে লিখিত জবাবদিহি ও প্রতিশ্রুতি। আর কোথায় কবে আপনি প্রেমে পড়েছিলেন, বা আপনার জীবনের সমস্ত করুণ কাহিনী— ওসব নিয়ে আমরা মোটে মাথা ঘামাই না।"

"নিজের ডেস্ক অধিকার করে বসে নিকোদিম ফোমিচ্‌ও কিছু কাগজপত্র সই করতে যাচ্ছিল— এমন সময় ইলিয়া পেত্রোভিচের মন্তব্যে খানিকটা লজ্জা পেয়ে সে বিড়বিড় করে বলল "না, না, এটা বড় বেশি নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছে..."

"আচ্ছা, এবারে লিখুন," হেডক্লার্ক বলল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে।

"কী লিখতে হবে?" রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ বেশ খানিকটা অভদ্রভাবেই জিগ্‌গেস করল।

"আমি আপনাকে মুখে-মুখে বলছি।"

রাস্‌কোল্‌নিকভের মনে হল তার স্বীকারোক্তির পর হেডক্লার্ক যেন তাকে আরও বেশি তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা করছে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার এই যে হঠাৎ সে নিজেই ঠিক করে বসল তার সম্পর্কে কার কী মনোভাব তাতে তার এতটুকু এসে যায় না। পরিবর্তনটা কেমন যেন এক মুহূর্তে পলকের মধ্যে ঘটে গেল। তার যদি আরেকটু ভেবে দেখার ইচ্ছে থাকত তাহলে অবশ্যই সে এই ভেবে অবাক হয়ে যেত যে কী ভাবে এই এক মিনিট আগেও সে ওদের সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারল, এমনকি নিজের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে ঝোলাঝুলি করতে পারল। কোথা থেকেই বা এলো এই সব অনুভূতি? এখন যা হল বরং তার উলটোটা : এখন যদি থানার লোকজনে না হয়ে তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুবান্ধবে হঠাৎ এই ঘরটি ভরে যেত, তাহলেও মনে হয়, তাদের জন্য একটিও দরদভরা কথা সে খুঁজে পেত না— সহসা এমনই একটা শূন্যতা পেয়ে বসল তাকে। হঠাৎ সে ভেতরে-ভেতরে সচেতনভাবে অনুভব করতে লাগল বিরক্তিকর সীমাহীন বিচ্ছিন্নতা ও বিষাদগ্রস্ত নিঃসঙ্গতা। রাসকোলনিকভের বুকের ভেতরে যে আচম্বিতে এমন ওলটপালট ঘটে গেল তার কারণ ইলিয়া পেত্রোভিচের সামনে নিজের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশের হীনতা নয়, অথবা রাস্‌কোলনিকভের ওপর একচোট নিতে পেরে লেফটেনান্টের উল্লাসে ফেটে পড়ার মতো নীচতাও নয়। এখন তার নিজের নীচতা-হীনতা এইসব উচ্চাভিলাষ, কোথাকার কোন লেফটেনান্ট, জার্মান মহিলা, পাওনা আদায়ের জন্য নোটিশ জারি,এই পুলিস স্টেশন ইত্যাদি, ইত্যাদি— এর কোনটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কী আর অবকাশ আছে

তার! এই মুহূর্তে যদি মৃত্যুদণ্ডও জারি করে তাকে পুড়িয়ে মেরে ফেলার কথা উঠত তবু, তাতেও সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হত না, এমনকি ঘোষণা পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনত কিনা সন্দেহ। তার ভেতরে-ভেতরে এমন একটা কিছু ঘটছিল যা তার নিজের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, অভিনব, আকস্মিক, অভূতপূর্ব। সে যে কেবল বুঝতেই পারছিল তা নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি দিয়ে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারছিল যে এই কিছুক্ষণ আগে কেমন সমস্ত আবেগ-উচ্ছ্বাস ঢেলে দিয়ে থানার এই লোকগুলোর কাছে আবেদন জানিয়েছিল, সেভাবে তো নয়ই, এমনকি কোনভাবেই এখন আর এদের কাছে কোনও আবেদন জানানো তার পক্ষে সম্ভব নয়— এমনকি পুলিস-লেফটেনান্ট না হয়ে এরা সবই যদি তার আপন ভাই-বোন হত তবুও নয়, কোনও পরিস্থিতিতেই নয়। এই মুহূর্তটির আগে পর্যন্ত এমন অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর অনুভূতি আর কখনও তার হয়নি। সবচেয়ে মর্মন্তুদ এই যে এটা ছিল চেতনার অতিরিক্ত, বোধেরও অতিরিক্ত একটা উপলব্ধি, একধরনের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি— এ পর্যন্ত জীবনে এর মতো মর্মন্তুদ উপলব্ধি তার আর হয়নি।

হেডক্লার্ক মুখে-মুখে তাকে বলে যেতে লাগল বিবৃতির আনুপূর্বিক বয়ান— এক্ষেত্রে সচরাচর যেমন হয়ে থাকে : অর্থাৎ, এই মুহূর্তে ঋণ শোধে আশ্বাস, এই মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইলাম যে অমুক সময়ে অমুক দিনের মধ্যে তাহা করিব, শহর পরিত্যাগ করিব না, সম্পত্তি বিক্রয় করিব না, উপহারস্বরূপ কাহাকেও প্রদান করিব না ইত্যাদি।

"আরে আপনি দেখছি লিখতে পারছেন না, আপনার হাত থেকে কলম খসে পড়ছে," কৌতূহলভরে রাসকোল্‌নিকভ্‌কে লক্ষ করে হেডক্লার্ক মন্তব্য করল। "আপনি কি অসুস্থ?"

"হাঁ, ...মাথা ঘুরছে। ... বলে যান!"

"ব্যস। এবারে সই করুন।"

হেডক্লার্ক কাগজটা ওর হাত থেকে নিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ সই করার পর কলমটা ফিরিয়ে দিল। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে চলে যাবার বদলে কনুই টেবিলে ঠেকিয়ে দুহাতে মাথা চেপে ধরল। তার মনে হচ্ছিল মাথার চাঁদিতে যেন কেউ তুরপুন চালিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ তার মাথায় বিদ্যুৎ চমকের মতো খেলে গেল একটা অদ্ভুত চিন্তা — এক্ষুনি উঠে দাঁড়িয়ে নিকোদিম ফোমিচের কাছে গিয়ে গতকালের সমস্ত ঘটনা, তার সামান্যতম খুঁটিনাটি পর্যন্ত আগাগোড়া বর্ণনা করবে, তারপর তাঁকে সঙ্গে করে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে দেখাবে ঘরের কোনায়, ফোকরের মধ্যে রেখে দেওয়া জিনিসগুলো। অন্তরের এই তাগিদটা এত জোরাল হয়ে উঠল যে তা মেটাবে বলে সে জায়গা ছেড়ে উঠেও দাঁড়াল। 'আরও অন্তত মিনিটখানেক ভেবে দেখলে হত না?' আচমকা তার মনে হল। 'না আর

কোনও ভাবনাচিন্তা নয়, এ বোঝার ভার হালকা করে দেওয়াই ভালো!' কিন্তু এগোতে গিয়ে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পাথরের মূর্তির মতো। নিকোদিম ফোমিচ্ তখন উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে ইলিয়া পেত্রোভিচের সঙ্গে। কথাগুলো রাসকোল্‌নিকভেরও কানে এলো।

"এ হতে পারে না, দুজনকেই ছেড়ে দেবে ওরা! প্রথমত, সবগুলো একটা আরেকটার বিরোধী। কাজটা যদি ওদেরই হয়ে থাকে তাহলে দারোয়ানকে ডাকতে যাবে কেন? নিজেরাই নিজেদের ধরিয়ে দেবার মতলব? নাকি এটা একটা চালাকি? না, না, চালাকিই যদি হয় তো বড় বাড়াবাড়ি রকমের হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া দারোয়ানদের দুজনেই এবং একজন ভদ্রগোছের মহিলাও ঠিক সেই সময় ফটকের একেবারে সামনে দেখেছে ছাত্র পেস্তিয়াকভ্‌কে। পেস্তিয়াকভ্ তখন ভেতরে ঢুকছিল, তার সঙ্গে-সঙ্গে আসছিল তার তিনজন বন্ধু। ফটকের ঠিক সামনে ওদের সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। বন্ধুরা থাকতে-থাকতে, তাদের সামনেই ওখানকার বাসিন্দাদের সম্পর্কে দারোয়ানের কাছে সে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। ওরকম কোন অভিসন্ধি নিয়ে এলে কেউ কি আর বাসিন্দাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে? আর কোখ্ বুড়ির কাছে যাবার আগে নিচে রুপোর কারিগরের কাছে আধঘণ্টা বসে ছিল, কাঁটায়-কাঁটায় পৌনে আটটায় তার কাছ থেকে ওপরে বুড়ির কাছে রওনা দেয়। এবারে চিন্তা করে দেখুন..."

"কিন্তু মাফ করবেন, তাহলে ওরা যা যা বলছে তার একটা আরেকটার বিরুদ্ধে যাচ্ছে কেন?— নিজেরাই জোর দিয়ে বলছে যে যখন দরজায় ধাক্কা দেয় তখন দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, আবার তিন মিনিট পরে যখন দারোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে এলো তখন দেখা গেল দরজা খোলা।"

"কথাটা তো এখানেই। খুনি নির্ঘাত ঘাপটি মেরে বসে ছিল ভেতর থেকে খিল এঁটে। কোখ্ যদি বোকামি করে নিজে দারোয়ানের খোঁজে না যেত তা হলে অবশ্যই তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলা যেত। ঠিক ওই মাঝখানের সময়টাতেই সে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে কোনমতে ওদের পাশ কাটিয়ে সটকান দেবার অবকাশ পায়। কোখ্ দু'হাতে ক্রুশ-প্রণাম ঠুকছে, বলছে : 'আমি যদি ওখানে থাকতাম তা হলে একলাফে বেরিয়ে এসে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, কুড়ুল দিয়ে আমাকে কুপিয়ে মেরে ফেলত।' এখন ফাঁড়া কেটে যাওয়ায় গির্জায় পুজো দিতে চায়। হা, হাঃ!..."

"খুনিকে তাহলে কেউ দেখেনি?"

হেড্‌ক্লার্ক এতক্ষণ তার নিজের জায়গা থেকে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। এবারে সে মন্তব্য করল: "কী করে দেখবে? বাড়ি তো নয়, নোয়ার জাহাজ!"

"ব্যাপারটা পরিষ্কার, বেশ পরিষ্কার!" নিকোদিম ফোমিচ্ উত্তেজিত হয়ে আওড়াল।

"না, ব্যাপারটা মোটেই তেমন পরিষ্কার নয়," ইলিয়া পেত্রোভিচের সিদ্ধান্ত।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তার টুপিটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল। কিন্তু দরজা পর্যন্ত তাকে যেতে হল না।...

যখম তার সংবিৎ ফিরে এলো তখন দেখতে পেল সে চেয়ারে বসে আছে, তাকে ডানদিক থেকে ধরে আছে একজন লোক, বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন হলদেটে জলে ভরা হলুদ রঙের একটা গেলাস হাতে, সামনে দাঁড়িয়ে আছে নিকোদিম ফোমিচ্— এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

"কী ব্যাপার? আপনি কি অসুস্থ?" বেশ তীক্ষ্ণস্বরে জিগ্‌গেস করল নিকোদিম ফোমিচ্।

"উনি যখন সই করছিলেন তখনই দেখা যাচ্ছিল কলম ভালোমতো চালাতে পারছেন না," নিজের জায়গায় গিয়ে আবার কাগজপত্র নিয়ে বসতে-বসতে হেডক্লার্ক মন্তব্য করল।

"আপনি কি অনেকদিন হল অসুস্থ?" ইলিয়া পেত্রোভিচ্‌ও কাগজপত্র ঘাঁটতে-ঘাঁটতে নিজের জায়গা থেকে চেঁচিয়ে বলল। বলাই বাহুল্য, অসুস্থ লোকটি অজ্ঞান হয়ে যেতে সেও তাকে পরীক্ষা করে দেখতে এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার সংজ্ঞা ফিরে আসার সঙ্গে-সঙ্গে নিজের জায়গায় চলে আসে।

"গতকাল থেকে," উত্তরে বিড়বিড় করে রাস্‌কোলনিকভ্ বলল।

"গতকাল কি আপনি বাইরে বেরিয়েছিলেন?

"বেরিয়েছিলাম।"

"অসুস্থ অবস্থায়?"

"হ্যাঁ, অসুস্থ অবস্থায়।"

"ক'টায়?"

"সন্ধে আটটায়।"

"দয়া করে বল্‌বেন কি, কোথায়?"

"রাস্তায়।"

"সংক্ষেপে, স্পষ্ট ভাষায়।"

রাস্‌কোল্‌নিকভের উত্তরগুলো হয়ে যাচ্ছিল কর্কশ, ছাড়া-ছাড়া। কাগজের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিল তার মুখ। ইলিয়া পেত্রোভিচের দৃষ্টির সামনে পড়ে কিন্তু সে তার ফোলা-ফোলা কালো চোখের দৃষ্টি নামাল না।

"উনি বলতে গেলে দাঁড়াতে পারছেন না, আর তুমি কিনা..." নিকোদিম্ ফোমিচ্ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল।

"ও কি-ছু না—!" অদ্ভুত একটা সুর ইলিয়া পেত্রেভিচের কণ্ঠস্বরে। নিকোদিম ফোমিচ্ আরও কিছু যোগ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হেডক্লার্কও তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে

তাকিয়ে আছে দেখে চুপ করে গেল। সবাই হঠাৎ চুপ করে গেল। এক অদ্ভুত পরিস্থিতি।

"আচ্ছা, বেশ," ইলিয়া পেত্রোভিচ্ সিদ্ধান্ত করল। "আমরা আপনাকে আর আটকে রাখছি না।"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। তখনও সে শুনতে পাচ্ছিল তার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে শুরু হয়ে গেছে উত্তেজিত আলোচনা। সবার ওপরে শোনা যাচ্ছিল নিকোদিম ফোমিচের প্রশ্নসূচক কণ্ঠস্বর।... রাস্তায় আসার পর সে পুরোপুরি ধাতস্থ হল।

"তল্লাশি, তল্লাশি, এখুনি তল্লাশি হবে।" তাড়াতাড়ি পা চালাতে-চালাতে সে আপন মনে আওড়াল। "ডাকাতের দল! আমাকে সন্দেহ করছে ওরা!" আগেকার সেই ভয় আবার এসে জুড়ে বসল তার সর্বাঙ্গে, আপাদমস্তক।

দুই

'কিন্তু ইতিমধ্যে যদি তল্লাশি হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে? বাড়ি গিয়ে যদি দেখি ওরা ঠিক ওখানে হানা দিয়েছে, তাহলে?'

এই তো ওর ঘর। না, কিছু নেই, কেউ নেই। কেউ উঁকি-ঝুঁকি মারেনি। এমনকি নাস্তাসিয়ার হাতেরও কোন স্পর্শ কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু কী সর্বনাশ! কী ভাবে সে ওই ফোকরটার ভেতরে সবগুলো জিনিস ফেলে রেখে যেতে পারল?

ঘরের কোনায় ছুটে গিয়ে ওয়াল পেপারের তলায় হাত চালিয়ে একে-একে জিনিসগুলো টেনে বের করে সে পকেট বোঝাই করতে লেগে গেল। সবসুদ্ধ দেখা গেল আটটা জিনিস : দুটো ছোট বাক্স— সেখানে দুল বা ওই ধরনের কিছু একটা হবে— ভালো করে দেখলও না সে। তারপর চারটে মরক্কো কেস, একটা হার— স্রেফ খবরের কাগজে মোড়া। খবরের কাগজে মোড়া আরও একটা কী যেন— মনে হয় সরকারি কোন পদক।...

ওভারকোটের এ-পকেটে ও পকেটে, প্যান্টের যে ডান পকেটটা অবশিষ্ট ছিল সেটার ভেতরেও জিনিসগুলো সব ঢোকাল সে— এমনভাবে রাখার চেষ্টা করল যাতে কারও নজরে না পড়ে। আর সব জিনিসের সঙ্গে টাকার থলিটাও নিল। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল— এবারে কিন্তু ঘরের দরজা একেবারে হাঁ করে খুলে রেখে।

তাড়াতাড়ি জোর পায়ে হাঁটতে লাগল। যদিও অনুভব করছিল যে সর্বাঙ্গ যেন ভেঙে পড়ছে, তবু চেতনা তার পুরোমাত্রায় বজায় ছিল। তার ভয় হচ্ছিল এই বুঝি কেউ তাকে ধাওয়া করে, ভয় হচ্ছিল আধঘণ্টার মধ্যে, হয়ত বা পনেরো মিনিটের মধ্যেই তার গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্য পুলিসের নির্দেশ বেরিয়ে যাবে, তার

আগেই যা হোক তা হোক করে সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপাট করে দিতে হবে। এখনও, যতক্ষণ এতটুকুও শক্তি অবশিষ্ট আছে, অন্তত সামান্য খানিকটা বিচারশক্তিও অবশিষ্ট আছে, এরই মধ্যে কাজটা সারা দরকার।... কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়?

এ ব্যাপারে অনেক আগে সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল : জিনিসগুলো সব খালের ভেতরে ফেলে দেবে— তাহলে সাক্ষ্যপ্রমাণের সলিলসমাধি, মামলার নিষ্পত্তি। এই সিদ্ধান্ত সে নিয়েছিল আগের রাতে, জ্বরের ঘোরে। সেই মুহূর্তে এই ঘটনার কথা মনে হতে সে বেশ কয়েকবার জোর করে উঠে বাইরে যাবার চেষ্টাও করেছিল। তার তখন মনে হয়েছিল, 'আর দেরি নয়, এখনই, এই মুহূর্তে সব ফেলে দিতে হয়।' কিন্তু দেখা গেল ফেলে দেওয়া অত সহজ কাজ নয়।

ইয়েকাতেরিনস্কি খালের পাড় ধরে সে ঘুরে বেড়াল— আধঘণ্টা, এমনকি তার কিছু বেশি সময়ও হতে পারে, বারকয়েক যেখানে-যেখানে ঘাটের সিঁড়ি চোখে পড়ল, তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল, কিন্তু কাজ হাসিল করার কথা ভাবাই যায় না। হয় ঘাটের সিঁড়ির একেবারে ধারে ভিড়ানো রয়েছে কাঠের ভেলা, তার ওপরে মেয়েমানুষরা জামাকাপড় ধোয়া-কাচা করেছে, নয়ত ভিড়ানো রয়েছে নৌকো। সর্বত্র গিজগিজ করছে লোকজন। তাছাড়া খালপাড়ের রাস্তার সবদিক থেকে, সব জায়গা থেকে সমস্ত কিছু দেখা যায়, নজরে পড়ে। একটা লোক ইচ্ছে করে নিচে নামল, সিঁড়ির নিচের ধাপে দাঁড়াল, তারপর কিছু একটা ছুঁড়ে ফেলে দিল খালের জলে— এটা সন্দেহজনক না হয়ে যায় না। আর হ্যাঁ, গয়নাগাঁটির ওই যে ছোট খাপগুলো— ওগুলো যদি জলে না ডুবে ভাসতে থাকে? তাই তো, ভাসবেই তো! যে-কারও চোখে পড়ে যাবে। তাছাড়া অমনিতেই যে কেউ সামনা-সামনি হতে তাকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে, যেন সে ছাড়া আর কোন ভাবনাচিন্তার বিষয় ওদের নেই? 'তা কেন হবে? নাকি এটা আমার মনের ভুল?' মনে-মনে ভাবল সে।

শেষকালে তার মাথায় এলো, নেভা নদীর কোথাও গেলে কি বরং ভালো হয় না? সেখানে লোকজন কম, নজরে পড়ার আশঙ্কাও কম। মোটের ওপর জায়গাটা বেশ জুতসই। আর সবচেয়ে বড় কথা— এ জায়গা থেকে অনেকটা দূরে। হঠাৎ সে এই ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেল— এ কেমন কথা যে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা আর দুশ্চিন্তার মধ্যে সে পুরো আধঘণ্টা ঘুরে বেড়াল বিপজ্জনক জায়গাগুলোতে, অথচ এটা আগে তার মাথায় খেলল না! পুরো আধঘণ্টা যে স্রেফ একটা অযৌক্তিক কাজের পেছনে মিছিমিছি চলে গেল তার কারণ এই যে ঘুমের ঘোরে, বিকারের ঘোরে হুট করে সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়েছিল। সে বুঝতে পারছিল রীতিমতো অন্যমনস্ক ও অমনোযোগী হয়ে পড়ছে। অবশ্যই তাড়াতাড়ি কার্যোদ্ধার করতে হবে।

ভজ্‌নেসেন্‌স্কি এভিনিউ ধরে সে হাঁটা দিল নেভা-নদীর দিকে। কিন্তু পথে যেতে -যেতে ঝট করে তার মাথায় এলো আরও একটি চিন্তা : নেভায় কেন? জলেই বা

কেন? তার চেয়ে ভালো হয় না কি অনেক দূরে কোথাও চলে গিয়ে, আবার না হয় দ্বীপেই গিয়ে, সেখানে কোথাও, কোন নির্জন জায়গায়, বনের মধ্যে, কোন ঝোপঝাড়ের তলায় সবকিছু পুঁতে রেখে দিয়ে জায়গাটা মনে রাখার জন্য কাছাকাছি কোন গাছ চিহ্নিত করে রাখা? যদিও সে উপলব্ধি করতে পারছিল যে এই মুহূর্তে সবকিছু সুস্থমস্তিষ্কে স্পষ্টভাবে ভাবনাচিন্তা করার মতো অবস্থা তার নেই, তবু চিন্তাটা তার কাছে নির্ভুল বলে মনে হল।

কিন্তু দ্বীপে যাওয়া তার ভাগ্যে ছিল না— ঘটল অন্য এক ঘটনা। ভজ্‌নেসেন্‌স্কি এভিনিউ ছেড়ে বেরিয়ে একটা স্কোয়ারে উঠে আসার পর হঠাৎ তার চোখে পড়ল বাঁ দিকে নিশ্ছিদ্র দেয়ালে সম্পূর্ণ ঘেরা একটা আঙিনায় ঢোকার মুখ। ডান দিকে. ফটকে ঠিক ঢোকার মুখেই আঙিনার অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে পাশের চারতলা বাড়ির চুনকাম-না-করা জানলা-দরজাহীন দেয়াল। বাঁয়ে, নিশ্ছিদ্র দেয়ালের সমান্তরালে এবং এবারেও ঠিক ফটক থেকে চলে গেছে একটা কাঠের বেড়া— আঙিনার বিশ পা মতো ভেতরে, তারপর অবশ্য আচমকা বাঁক নিয়েছে বাঁয়ে। এটা ছিল একটা নির্জন, পরিত্যক্ত, ঘেরা জায়গা— লোহালক্কড় জাতীয় কিছু জিনিসপত্র স্তূপাকার হয়ে পড়ে ছিল সেখানে। আরও দূরে আঙিনায় বেশ খানিকটা ভেতরে, বেড়ার এধার থেকে দেখা যাচ্ছিল পাকা গাঁথনি দিয়ে তোলা, ঝুলকালিমাখা একটা নিচু চালাঘরের একটা কোনা— সম্ভবত কোন ওয়ার্কশপের অংশ। ঘোড়ার গাড়ির চাকা বা লোহার খুচরো যন্ত্রপাতি গোছের কিছু তৈরির কোন ছোটখাটো কারখানা বোধহয় আছে এই জায়গাটায়। সর্বত্র, প্রায় ফটক পর্যন্ত কালো হয়ে আছে কয়লার গুঁড়োর পুরু স্তরে। 'এই তো এখানে এগুলো ফেলে দিয়ে সরে পড়লেই হয়!' তৎক্ষণাৎ তার মনে হল। আঙিনায় কোন জনপ্রাণী নেই দেখে সে ফটকের ভেতরে পা বাড়াল। তখনই তার চোখে পড়ল ফটকের লাগোয়া বেড়ার গায়ে জলনিষ্কাশনের নালী— সচরাচর যেমন হয়ে থাকে এসব বাড়িতে, যেখানে বহু ফ্যাক্টরি-শ্রমিক, কারিগর, গাড়োয়ান ইত্যাদি শ্রেণীর লোকজনের বাস। নালীটার ওপরের দিকে ওই বেড়ার গায়েই চক দিয়ে লেখা ছিল এসব ক্ষেত্রে চিরপ্রচলিত রসিকতা— লোকে যাতে প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদন না করে তার জন্য সতর্কবাণী 'এখেনে দারান নিশেদ'। এতে বরং ভালোই হল এখানে তার আসা বা দাঁড়ান নিয়ে কারও কোন সন্দেহ থাকছে না। 'এখানে একবারে সব জিনিস কোন একটা স্তূপের ভেতরে ফেলে দিয়ে সরে পড়তে পারলেই হল!'

আরও একবার ফিরে তাকিয়ে চারপাশ দেখে নিয়ে সে পকেটে হাত গলাল, এমন সময় বাইরের দেয়ালের ঠিক গায়ে, ফটক আর নালীর মাঝখানে সওয়া গজ পরিমাণ চওড়া ব্যবধানের মধ্যে তার নজরে পড়ল এক বিশাল এবড়োখেবড়ো পাথরের টুকরো— সম্ভবত মনখানেক ওজন হবে সেটার। পড়েছিল রাস্তার পাকা দেয়ালটার একেবারে গায়ে। এই প্রাচীরের ওধারে রাস্তা, ফুটপাথ, শোনা যাচ্ছে পথচারীদের

চলাচলের আওয়াজ— তাদের সংখ্যা এখানে কোন সময়ই কম নয়। কিন্তু ফটকের ওপাশ থেকে তাকে কারও দেখতে পাবার সম্ভাবনা ছিল না, যদি না রাস্তা থেকে কেউ ঢুকে পড়ে! সেটা ঘটা অবশ্য খুবই সম্ভব ছিল। তাই কাজটা তাড়াতাড়ি হাঁসিল করা দরকার।

পাথরটার দিকে ঝুঁকে পড়ে সে দুহাতে তার মাথাটা শক্ত করে চেপে ধরল, সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে শেষপর্যন্ত সেটাকে উলটে ফেলল। পাথরের নিচে মাটি খানিকটা বসে গেছে। তৎক্ষণাৎ সে পকেট থেকে একে-একে সমস্ত জিনিস বের করে গর্তটার ভেতরে ফেলতে লাগল। টাকার থলিটার জায়গা হল সবচেয়ে ওপরে, তা সত্ত্বেও গর্তে আরও জায়গা রয়ে গেল। এরপর সে আবার পাথরটা আঁকড়ে ধরল, এক ঠেলায় ওটাকে আগের অবস্থায় উলটে যথাস্থানে রেখে দিল। কেবল মনে হল একটু উঁচু হয়ে গেছে— অবশ্য খুবই সামান্য। তবু খানিকটা মাটি আঁচড়ে তুলে এনে চারপাশে ছড়িয়ে দিয়ে পায়ে চেপে-চেপে সমান করে দিল। এখন আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

এরপর সে আঙিনা থেকে বেরিয়ে স্কোয়ারের দিকে রওনা দিল। আবার প্রায় অসহনীয়, প্রবল আনন্দের, উল্লাসের একটা আবেশে সে অভিভূত হয়ে পড়ল মুহূর্তের জন্য, যেমন এই কিছুক্ষণ আগে ঘটেছিল পুলিস স্টেশনে। 'চিহ্নগুলো সব লোপাট করে দেওয়া হয়েছে! কার মাথায় আসতে পারে, কারই বা মাথায় আসতে পারে এই পাথরের তলায় খুঁজে দেখার চিন্তা? হয়ত বাড়ি তৈরির সময় থেকে ওখানে পড়ে আছে, ওইভাবে আরও অত কাল হয়ত পড়েও থাকবে। আর যদি খোঁজও পায় আমার ওপর কার সন্দেহ হবে? সব শেষ। কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই!' ভাবতে-ভাবতে তার হাসি পেয়ে গেল। হ্যাঁ তার বেশ মনে আছে সে হেসেছিল অনেকক্ষণ ধরে, দমকে-দমকে। তার হাসিটা ছিল নিঃশব্দ, নার্ভাস গোছের। যতক্ষণ স্কোয়ারটা পার হচ্ছিল ততক্ষণ, সারা সময় ধরে সে হাসছিল, কেবলই হাসছিল। কিন্তু যেখানে দুদিন আগে ওই বাচ্চা মেয়েটির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল সেই বুলভারে গিয়ে যখন পড়ল তখন নিমেষে তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তার মাথার মধ্যে এসে ভিড় করতে লাগল অন্য চিন্তাভাবনা। তার মনে হল— এবং তাও যেন নিমেষে— ওই যে বেঞ্চটার ওপর তখন সে বসেছিল মেয়েটি চলে যাবার পর, বসে-বসে চিন্তা করছিল, এখন সেটার পাশ দিয়ে যেতে তার বিশ্রী লাগবে, বিশেষ করে খুবই খারাপ লাগবে যে গুঁফো লোকটাকে সে বিশ কোপেক দিয়েছিল তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে। 'মরুক গে ব্যাটা!'

ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে-তাকাতে সে আনমনে পথ চলতে লাগল। তার সমস্ত ভাবনা-চিন্তা এখন আবর্তিত হচ্ছে একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ মুখ্য বিষয়কে ঘিরে। সে নিজেও উপলব্ধি করতে পারছিল যে বিষয়টি বাস্তবিকই গুরুত্বপূর্ণ এবং এখন,

ঠিক এই মুহূর্তে একা-একা সে তার মুখোমুখি হচ্ছে। তাও ঘটতে চলেছে কিনা গত দু'মাসের মধ্যে এই প্রথম।

'ধুত্তোর।... যত সব...!' একটা অসীম বিরক্তি ও প্রচণ্ড ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে হঠাৎ সে মনে-মনে ভাবল। 'শুরু হয়ে গেল, এই বুঝি শুরু হয়ে গেল। —মরুক গে যা... মরুক গে আমার নতুন জীবনের চিন্তা। হা ভগবান! কী হাস্যকর!... কিন্তু মিথ্যাচার, বজ্জাতি... এতটুকু কম করেছি নাকি আজ! এই কিছুক্ষণ আগে অতি নোংরা ধরনের লেফটেনান্টটাকে কী বিশ্রীভাবেই না তোষামোদ করেছি, তার মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করেছি! তবে এও তুচ্ছ! আমি থোড়াই পরোয়া করি ও সবের, ওদের সকলকে, কিংবা আমি যে ওদের তোষামোদ করেছি, মন জোগানোর চেষ্টা করেছি— এও তুচ্ছ! আসল ব্যাপারটা তা নয়! মোটেই তা নয়!...'

চলতে-চলতে আচমকা সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও নতুন অথচ অত্যন্ত সাধারণ একটি প্রশ্ন এক আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলল। তিক্ততায় ও বিস্ময়ে ছেয়ে গেল তার মনটা।

'এসব কাজ যদি বোকার মতো না করে সত্যি-সত্যি সজ্ঞানে করা হয়ে থাকে, এর পেছনে যদি সত্যি-সত্যি তোমার কোন নির্দিষ্ট স্থির লক্ষ্য থাকত, তাহলে এটা কী করে হল যে তুমি টাকার থলেটার ভেতরে এখন পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করলে না, এখন পর্যন্ত জান না তুমি কী পেলে; তাহলে কেন অত কষ্ট করতে গেলে, কেনই বা জেনেশুনে এমন ইতর, হীন ও নীচ কাজে নামতে গেলে? তাছাড়া হ্যাঁ, তুমি আবার টাকার ওই থলেটা জলেই ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছিলে বাকি আর সমস্ত জিনিসের সঙ্গে— সেই জিনিসগুলোও যে কী সেও তুমি এখন পর্যন্ত দেখনি।... এ কী করে হল?'

হ্যাঁ, তাই। ঘটনা তাই। সে অবশ্য আগে থাকতেই এটা জানত এবং এটা তার কাছে আদৌ কোন নতুন প্রশ্ন নয়। গতরাতে যখন জলে ফেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন সেই সিদ্ধান্তের মধ্যে এতটুকু দ্বিধা, এতটুকু ওজর-আপত্তির ভাব ছিল না। মনে হয়েছিল এমনটাই হওয়া স্বাভাবিক, অন্যরকম কিছু হওয়া অসম্ভব।... হ্যাঁ, এসব সে জানত, সবই মনে করতে পারছিল। সঠিকভাবে বলতে গেলে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল গতকালই, ঠিক সেই মুহূর্তটিতে যখন ট্রাঙ্কের ওপর হুমড়ি খেয়ে বসে ভেতর থেকে গয়নার ছোট-ছোট বাক্সগুলো বার করছিল।...তাই, ঠিক তাই!...

'এর কারণ এই যে আমি অসুস্থ, খুবই অসুস্থ' হতাশ হয়ে শেষপর্যন্ত সে সিদ্ধান্ত করল। 'আমি নিজেই নিজেকে কষ্ট দিচ্ছি, যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছি। নিজেই জানি না কী করছি। ... গতকাল এবং গত পরশুও, আগাগোড়া এই সময়টা ধরে নিজেকে কষ্ট দিয়েছি।... সুস্থ হয়ে নিই, আর নিজেকে এভাবে কষ্ট দেব না...কিন্তু যদি একেবারেই সুস্থ না হই, তাহলে কী হবে? হা ভগবান! কী বিরক্তিই না ধরিয়ে দিল!...'

কোথাও মুহূর্তের জন্য না থেমে সে পা চালাতে লাগল। কোনভাবে অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে ওর। কিন্তু কী করা যায়, কী ব্যবস্থা এখন নেওয়া যায় তা ওর জানা ছিল না। প্রায় প্রতিটি মুহূর্তে উত্তরোত্তর বেশিমাত্রায় ওকে আচ্ছন্ন করে ফলছিল অপ্রতিরোধ্য, নতুন এক উপলব্ধি : সেটা ছিল তার পরিপার্শ্বের, তার চোখে পড়া সমস্ত কিছুর ওপর এক অপরিসীম বিতৃষ্ণা—প্রায় শারীরিক জুগুপ্সা—ঘৃণা ও ক্রোধের এক বিমিশ্র দৃঢ় উপলব্ধি। যাদের সে চোখে দেখছিল তাদের সকলকে তার বিশ্রী লাগছিল, বিশ্রী লাগছিল তাদের মুখচোখ, চালচলন, ভাবভঙ্গি। অবস্থাটা এমনই যে কেউ যদি এখন তার সঙ্গে কথা বলতে আসে তাহলে সে তার মুখে থুতু ছিটিয়ে দেবে, হয়ত বা কামড়েই দেবে তাকে।

ছোট-নেভার ধারের বাঁধানো সড়কে পড়ে ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপের সেতুর কাছাকাছি এসে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'এই তো এখানে, এই বাড়িতে ও থাকে,' সে মনে-মনে ভাবল। 'রাজুমিখিনের বাড়িতে আমি নিজে-নিজেই চলে এলাম— এ কী ব্যাপার! আবার সেই তখনকার মতো।... খুবই অদ্ভুত বলতে হবে। —আমি নিজে থেকে এলাম, নাকি পথ চলতে-চলতে হঠাৎই চলে এসেছি? তাতে কিছু এসে যায় না। বলেছিলাম না আমি...গত পরশুদিন... এর পরে, পরের দিন ওর কাছে যাব, তাহলে আর কি? — যাব! এখন আর ভেতরে না যাবার কী আছে?...'

সিঁড়ি দিয়ে পাঁচতলায় উঠে গেল রাজুমিখিনের ঘরে।

রাজুমিখিন বাড়িতে, তার নিজের ঘরেই ছিল। সেই মুহূর্তে ব্যস্ত ছিল, লিখছিল। নিজেই দরজা খুলল। মাস চারেকের মধ্যে ওদের দুজনের কোন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। রাজুমিখিন ঘরে বসেছিল প্রায় খসে পড়ার মতো ছেঁড়াখোঁড়া পুরানো রং-চটা ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়িয়ে, পায়ে চটি, তবে মোজা ছিল না। চেহারা আলুথালু, মুখের দাড়ি কামানো হয়নি, চোখ-মুখও ধোয়নি। তার চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

"একি, তুমি!" বন্ধু ভেতরে ঢুকতে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে সে চেঁচিয়ে উঠল। পরক্ষণেই চুপ করে গিয়ে মৃদু শিস দিয়ে উঠল।

"দিনকাল কি এতই খারাপ পড়েছে? তুমি দেখছি ভাই আমাদের দলের সব্বাইকে টেক্কা মেরেছ", রাস্কোলনিকভের জীর্ণদশাগ্রস্ত জামাকাপড়ের দিকে তাকিয়ে সে যোগ করল। "আরে বোসো, বোসো, ক্লান্ত মনে হচ্ছে!" রাস্কোলনিকভ্ অয়েলক্লথ-ঢাকা গদির ওপর গা ছেড়ে দিল। গদিটার অবস্থা ওর নিজের সোফাটার চেয়েও খারাপ। রাজুমিখিন হঠাৎ তার আগন্তুকটিকে ভালোমতো নিরীক্ষণ করে বুঝতে পারল যে সে অসুস্থ।

"তুমি তো দস্তুরমতো অসুস্থ দেখছি! সেটা কি তোমার জানা আছে?" সে তার নাড়ি দেখতে গেল। রাস্কোলনিকভ্ ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে নিল।

"কোন দরকার নেই", সে বলল। "আমি এসেছি... শোনো, বলি—আমার কোন

টুইশান নেই।...বলছিলাম কি, আমি চাই...অবশ্য যাক গে, কোন দরকার নেই আমার টুইশানের।..."

"তুমি কি বুঝতে পারছ, কী বলছ?...ভুল বকছ তুমি!" একদৃষ্টে তাকে লক্ষ করতে-করতে রাজুমিখিন মন্তব্য করল।

"না, ভুল বকছি না", বলতে-বলতে রাস্‌কোলনিকভ্ সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। রাস্‌কোলনিকভ্ যখন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিল তখন সে ভাবতেও পারেনি যে রাজুমিখিনের সঙ্গে তার এমন মুখোমুখি দেখা হয়ে যেতে পারে। এখন কিন্তু এক মুহূর্তে সে অনুমান করতে পারল—ইতিমধ্যে তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা থেকে সে যা বুঝতে পারছিল তা এই যে ঠিক এই মুহূর্তে কারও সঙ্গে, দুনিয়ায় কারও সঙ্গে মুখোমুখি দেখাসাক্ষাৎ যত কম হয় তত ভালো— তা সে যার সঙ্গেই হোক না কেন্না। রাজুমিখিনের ঘরের চৌকাঠ পেরোনের সঙ্গে-সঙ্গে নিজের ওপর তার নিজেরই এত রাগ হচ্ছিল যে দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল।

"চলি!" বলে হঠাৎ সে দরজার দিকে পা বাড়াল।

"আরে দাঁড়াও দাঁড়াও! বড় আশ্চর্য মানুষ তো!"

"না না, দরকার নেই!..." হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে আবার বলে উঠল।

"তাহলে আমার কাছে এসেছিলে ছাই কী বলে? তোমার মাথাটা কি একেবারে গেছে? এ যে...এ যে বলতে গেলে অপমান! আমি এভাবে ছেড়ে দিতে পারি না।"

"বেশ, শোনো—আমি তোমার কাছে এসেছিলাম, কেন না তোমাকে ছাড়া আর এমন কাউকে জানি না যে আমাকে সাহায্য করতে পারে...শুরুতে... কেন না তুমি সবার চেয়ে ভালো, মানে বুদ্ধিমান, তোমার বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা আছে। ...কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি ওসব কিছুই আমার দরকার নেই।...শুনছ, মোটে দরকার নেই কারও অনুগ্রহ, কারও কোন সহানুভূতি।...আমি নিজে...একা...যাকগে অনেক হয়েছে! আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও।"

"আরে দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও, ভূত কোথাকার! বদ্ধ পাগল দেখছি! আমার কথা যদি বল, কিছুতে কিছু এসে যায় না আমার। দেখ, টুইশান আমারও কোন নেই, কিন্তু ওসবের থোড়াই পরোয়া করি আমি। সস্তায় বিকিকিনির বাজারে এক বইয়ের দোকানি আছে — খেরুভিমভ্ তার নাম — সে নিজেই একধরনের টুইশান। এখন আমি ব্যবসাদারদের বাড়িতে মোট-মোটা পাঁচটা টুইশানের বদলেও ওকে ছাড়তে রাজি নই। ইদানীং সে বইয়ের কারবার খুলেছে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ওপর ছোট-ছোট বই বের করছে— সেগুলোর যা কাটতি! একেকটার নামেই বাজিমাৎ! তুমি তো সবসময় বলতে যে আমি একটা আহম্মক। কিন্তু ভগবান সাক্ষী, ভাই, আমার চেয়েও আহাম্মক লোকজন আছে। এখন লোকটা যুগের হাওয়াও ধরতে পেরেছে, কিন্তু নিজে এসব বিষয়ের মাথামুণ্ডু কিছু বোঝে না, বলাই বাহুল্য, আমি

তাকে খুব করে তাতাচ্ছি। এই যে এখানে আছে একটা জার্মান টেক্সট— ফর্মাদুয়েকের একটু বেশি হবে—আমার মতে, মূর্খামির চূড়ান্ত, এককথায়, রাজ্যের ফাঁকা বুলি। যে প্রশ্নটি বিচার করা হচ্ছে তা হল স্ত্রী-জাতি মনুষ্যপদবাচ্য কিনা। আর বলাই বাহুল্য শেষকালে সোল্লাসে প্রমাণ করতে হয়েছে যে হাঁ, মনুষ্যপদবাচ্য। জাতির সমস্যার ওপর এরকম একটা ছোট বই খেরুভিমভ্ প্রকাশ করতে যাচ্ছে। আমি অনুবাদ করছি। ওই আড়াই ফর্মাকে আমরা টেনে ছয় ফর্মায় দাঁড় করাব, তারপর ভেবেচিন্তে লাগসই গোছের একটা টাইটেল বার করব আধপাতা জুড়ে, বাজারে ছাড়ব পঞ্চাশ কোপেক করে একেক কপি। চমৎকার, ব্যবস্থা। অনুবাদের জন্যে আমি পাচ্ছি ফর্মা পিছু ছয় রুবল করে—পুরো কাজটার জন্যে পাওনা পনেরো, আগাম নিয়েছি ছয়। এটা শেষ হলে তিমি সম্পর্কে অনুবাদে হাত দেবো, তারপর confessions-এর দ্বিতীয় খণ্ড থেকে বস্তাপচা কিছু গালগল্প— তাও অনুবাদ করব বলে ইতিমধ্যে ঠিক হয়ে আছে! খেরুভিমভ্কে কে যেন বলেছে রুশো আমাদের রাদিশ্চেভ্ গোছের একজন কেউ। বলাই বাহুল্য, আমার বয়ে গেছে বিরোধিতা করতে! চাও তো বল, 'স্ত্রী-জাতি মনুষ্যপদবাচ্য কিনা'-র দ্বিতীয় ফর্মা অনুবাদ করবে? যদি চাও তাহলে এখুনি এই নাও টেক্সট, এই রইল কাগজ-কলম—সব ওদের খরচে—আর এই নাও তিনটে রুবল, কেননা পুরো অনুবাদের জন্যে আমি আগাম নিয়ে নিয়েছি প্রথম ও দ্বিতীয়—দুটো ফর্মারই। অতএব দাঁড়াচ্ছে এই তিন রুবল সরাসরি তোমার ভাগে পড়ছে। ফর্মা শেষ হলে পাবে আরও তিন রুবল। আর হ্যাঁ, ভালো কথা, দয়া করে এটাকে আমার তরফ থেকে কোন অনুগ্রহ বলে ভেবো না। বরং তার উলটো : তুমি ঘরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে আমি ঠিক করে ফেলেছি তুমি আমার কী উপকারে লাগতে পার। প্রথমত, আমি বানানে কাঁচা, দ্বিতীয়ত জার্মানে আমি ক্ষেত্রবিশেষে একবারে নিরেট, ফলে লিখতে-লিখতে বেশির ভাগই নিজের মন থেকে যোগ করি। তবে এই ভেবে সান্ত্বনা পাই যে এতে রচনার মান আরও উন্নতই হচ্ছে। তবে কে বলতে পারে? হয়ত এতে উন্নতি হচ্ছে না, বরং অবনতিই ঘটছে!... নেবে কিনা বল?"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ চুপচাপ জার্মান ভাষায় লেখা পাতাগুলো নিল, তিন রুবলও নিল, তারপর একটি কথাও না বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। রাজুমিখিন হাঁ করে চেয়ে দেখল তাকে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু সিঁড়ির প্রথম পাক পর্যন্ত যাবার পর রাস্‌কোল্‌নিকভ্ হঠাৎ কী মনে হতে ফিরতি পথ ধরল। আবার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে ফিরে গেল রাজুমিখিনের কাছে। জার্মান ভাষার বইটার পৃষ্ঠাগুলো ও তিন রুবল টেবিলের ওপর রাখল। এবারেও কোন কথা বলল না। সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

"আরে অতিরিক্ত নেশা করে শেষকালে তোমার মাথায় বায়ু চড়ে গেল নাকি,

অ্যাঁ?" ক্ষিপ্ত হয়ে শেষকালে গর্জন করে উঠল রাজুমিখিন। "এসব কী রসকিতা হচ্ছে, শুনি?। আমার মাথাটাও দেখছি গুলিয়ে দিলে। গোল্লায় যাও তুমি! এখানে আসার কী কারণ ছিল তোমার বল তো?"

"দরকার নেই...অনুবাদের," সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতেই বিড়বিড় করে বলল রাস্‌কোলনিকভ্।

"তাহলে কী ছাই তোমার দরকার?" ওপর থেকে চেঁচিয়ে বলল রাজুমিখিন। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ আগের মতোই নীরবে নামতে লাগল।

"এই শোনো! তোমার ডেরাটা কোথায়?"

কোনও জবাব নেই।

"জাহান্নামে যাও তাহলে!"

কিন্তু রাসকোল্‌নিকভ্ ততক্ষণে রাস্তায়। নিকোলায়েভ্‌স্কি ব্রিজের ওপর আসার পর আরও একবার তার বোধশক্তি পূর্ণমাত্রায় ফিরে এলো তার পক্ষে অত্যন্ত অপ্রীতিকর একটি ঘটনার ফলে। একটা ছ্যাকরা গাড়ির এক গাড়োয়ান জোর চাবুক কষিয়ে দিল তার পিঠে, কেননা গাড়োয়ান তিন-চারবার তাকে চিৎকার করে সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও আরেকটু হলেই সে ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়ে যাচ্ছিল। কোন অজ্ঞাত কারণে, সে হাঁটছিল ব্রিজের ঠিক মাঝখান দিয়ে। এটা যানবাহন চলাফেরার রাস্তা—পথচারীদের হাঁটার পথ নয়। চাবুকের ঘা খেয়ে সে এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল যে ছিটকে রেলিং-এর গায়ে সরে গিয়ে কিড়মিড় করে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল। চারপাশে বলাই বাহুল্য, হাসির রোল পড়ে গেল।

"বেশ হয়েছে!"

"কোন বদ লোক হবে।"

"জানা আছে, মাতালের ভান করে ইচ্ছে করে চাকার তলায় পড়বে—এখন তুমি খেসারত দাও।"

"এ এক ভালো কারবার ফেঁদেছে মশায়, দিব্যি কারবার ফেঁদেছে।"

কিন্তু যখন সে রেলিং-এর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে ক্রুদ্ধ ও অর্থহীন দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখছিল গাড়িটার দূরে চলে যাওয়া, ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ তার মনে হল কে যেন তার হাতে পয়সা গুঁজে দিচ্ছে। তাকিয়ে দ্যাখে কোন বেনে পরিবারের এক বয়স্কা মহিলা— মাথায় কাপড় বাঁধা, পায়ে ছাগচর্মের জুতো; সঙ্গে একটি মেয়ে— মাথায় টুপি, হাতে সবুজ ছাতা— সম্ভবত মহিলারই মেয়ে। "নাও বাবা, খ্রিস্টের নামে দিচ্ছি। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ নিতে ওরা দুজনে পাশ দিয়ে চলে গেল। পয়সা বলতে কুড়ি কোপেক। তার জামাকাপড় আর চেহারা দেখে খুব সম্ভব তারা ওকে রাস্তায় ভিখ মেগে বেড়ানো সত্যিকারের ভিখিরি বলে ধরে নিয়েছিল। সে যে পুরো বিশটা কোপেক ভিক্ষা পেয়ে গেল তার

জন্য সম্ভবত গাড়োয়ানের কশাঘাতের কাছে সে ঋণী, কেননা তার ফলে তাদের মনে করুণার উদ্রেক হয়েছিল।

বিশ কোপেকের মুদ্রাটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে দশ পা মতন এগিয়ে যাবার পর সে মুখ ফেরাল নেভা নদীর দিকে রাজপ্রাসাদের সামনাসামনি। আকাশে একফোঁটা মেঘ নেই, নদীর জল প্রায় নীল— নেভাতে এরকম ক্বচিৎ দেখা যায়। ভজনালয়ের বিশ পা খানেক এদিকে, এখান থেকে, ব্রিজ থেকে দেখলে ক্যাথেড্রালের মাথার গম্বুজটা যেমন পটে আঁকা ছবির মতো সুন্দর দেখায় তেমন আর একটি জায়গা থেকেও দেখায় না। দারুণ ঝলমল করছে সেটা, মেঘমুক্ত আকাশপটে, স্বচ্ছ নির্মল বায়ুতরঙ্গ ভেদ করে তার অলঙ্করণের প্রতিটি রেখা পর্যন্ত স্পষ্ট চোখে পড়ে। কশাঘাতের দরুন যে যন্ত্রণা বোধ হচ্ছিল তার প্রশমন ঘটল, রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ভুলে গেল আঘাতের কথা। তাকে তখন বিশেষভাবে অধিকার করে বসেছে একটা অস্থির চিন্তা, যেটা তার কাছে তেমন স্পষ্ট নয়। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল দূরের দিকে। এই জায়গাটা তার বড় বেশি পরিচিত। সে যখন য়ুনিভার্সিটিতে পড়ত তখন সচরাচর — বেশিরভাগ সময় বাড়ি ফেরার পথে— এমন ঘটেছিল হয়ত শ খানেক বার— সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ত ঠিক এই জায়গাটাতে এসে, একদৃষ্টে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখত সত্যিকারের জমকাল এই বিপুল দৃশ্য। প্রায় প্রতিবারই অবাক হয়ে যেত। এক ধরনের অস্পষ্ট উপলব্ধি তাকে এমনভাবে গ্রাস করে ফেলত যার কোন সমাধান সে খুঁজে পেত না। এই বিপুল দৃশ্যপট দেখতে-দেখতে সবসময় তার সর্বাঙ্গে খেলে যেত অবর্ণনীয় শীতল প্রবাহ। এই জমকাল চিত্রটি এক ধরনের মূক ও বধির সম্মোহনজাল বিস্তার করত তার ওপর। ... প্রতিবার সে অবাক হয়ে যেত তার নিজের বিষাদাচ্ছন্ন ও প্রহেলিকাময় এই প্রতিক্রিয়ায়। কিন্তু প্রতিবারই রহস্যভেদের সঙ্কল্পটি সে ভবিষ্যতের কোন এক সময়ের জন্য মুলতুবি রেখে দিত— নিজেকে সে বিশ্বাস করতে পারত না। তখন হঠাৎ স্পষ্ট মনে পড়ে গেল তার সেই আগেকার প্রশ্নগুলো, তার বিহ্বলতা। তার মনে হচ্ছিল এখন যে এসব তার মনে পড়ল সেটা আকস্মিক নয়। একটা জিনিস তো অবশ্যই তার কাছে অদ্ভুত ও আশ্চর্যের ঠেকছে— সে চলতে-চলতে দাঁড়িয়ে পড়েছে আগেকার সেই জায়গায়, যেন সত্যি-সত্যি সে কল্পনা করতে পেরেছিল যে আগেকার মতো ওই জিনিস নিয়েই এখন সে ভাবনাচিন্তা করতে পারে এবং আগেকার সেই একই বিষয়, একই চিত্র যা... এই কিছুদিন আগেও তাকে আকর্ষণ করত, এখনও তাকে আকর্ষণ করতে পারে আগের মতো। এমনকি একথা ভেবে তার মনে-মনে যেন হাসি পেল। সেইসঙ্গে বুকের ভেতরে একটা চাপা যন্ত্রণাও সে অনুভব করল। এখন তার মনে হল নিচে, পায়ের তলায়, অনেক-অনেক দূরে চোখে পড়ে কি পড়ে না... পড়ে আছে আগেকার, অতীতের সমস্ত কিছু, তখনকার চিন্তাভাবনা, তখনকার সমস্যা, তখনকার

বিষয়, আগেকার আবেগ-অনুভূতি, এই বিপুল দৃশ্যপটের সমস্তটা... সে নিজে... সব... সমস্ত কিছু।... মনে হচ্ছিল সে যেন উড়ে যাচ্ছে উর্ধ্বে কোথাও, সবকিছু অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তার চোখের সামনে।... অনিচ্ছাকৃতভাবে হাত একটু নাড়াতে সে অনুভব করল হাতের মুঠোয় ধরা বিশ কোপেকের মুদ্রাটা। মুঠো আলগা করে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেটার দিকে, তারপর হাতটা সজোরে দুলিয়ে এক ঝটকায় ছুঁড়ে ফেলে দিল নদীর জলে। এবারে পিছন ফিরে হাঁটা দিল বাড়ির দিকে। তার মনে হল এই মুহূর্তে সে যেন কাঁচি চালিয়ে নিজেই নিজেকে সবার কাছ থেকে, সমস্ত কিছু থেকে কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

বাড়ি যখন সে ফিরে এলো তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দেখা যাচ্ছে, হেঁটেছিল সে মোট ঘণ্টাছয়েক। কোন্ পথে, কী ভাবে ফিরে এলো কিছুই মনে করতে পারছিল না। তার সর্বাঙ্গ বড় বেশি হাঁকানোর ফলে দম ফুরিয়ে যাওয়া ঘোড়ার মতো থরথর করে কাঁপছিল। এই অবস্থায় জামাকাপড় ছেড়ে ওভারকোটটা গায়ের ওপর টেনে সে সোফায় শুয়ে পড়ল, সঙ্গে-সঙ্গে তার বাহ্যজ্ঞান লোপ পেল।

তখন পুরোপুরি অন্ধকার নেমে এসেছে, এমন সময় তার চটকা ভেঙে গেল একটা ভয়ঙ্কর চিৎকারে। হা ভগবান, এ কিসের চিৎকার! এমন অস্বাভাবিক আওয়াজ, এমন আর্তনাদ, তর্জন-গর্জন, কড়কড় আওয়াজ, কান্নাকাটি, মারপিট, গালিগালাজ জীবনে কখনও সে শোনেনি, কখনও দেখেনি। এরকম হিংস্রতা, এরকম ক্ষিপ্ততা সে ধারণায়ই আনতে পারছিল না। ভয়ে-আতঙ্কে প্রতিটি মুহূর্তে জড়সড় হয়ে, কাতরাতে-কাতরাতে শেষকালে সে বিছানায় উঠে বসল। কিন্তু মারপিট, আর্তনাদ, গালিগালাজের মাত্রা উত্তরোত্তর চড়তে লাগল। আশ্চর্যের ওপর আশ্চর্য এই যে হঠাৎ ওরই মধ্যে সে শুনতে পেল বাড়িউলির গলা। তীক্ষ্ণস্বরে হাউমাউ করে চেঁচাচ্ছে, বিলাপ করছে, হড়বড় করে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে কতকগুলো শব্দ, যার মাথামুণ্ড কিছুই বোঝার উপায় নেই। ইনিয়ে-বিনিয়ে কী সব বলছে— বুঝতে বাকি থাকে না যে তাকে যাতে আর না মারা হয় তার জন্য হাতে-পায়ে ধরছে, কেননা সিঁড়ির ওপরে তাকে ধরে বেধড়ক প্রহার করা হচ্ছিল। যে লোকটা তাকে প্রহার করছিল প্রচণ্ড ক্রোধে ও প্রবল উত্তেজনায় তার কণ্ঠস্বর এত বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল যে তার মুখে আর কথা ফুটছিল না। তার বদলে মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল কেবল একটা ভাঙা ঘড়ঘড় আওয়াজ। তবু প্রহাররত লোকটাও কিছু একটা বলছিল, সেও বলছিল দ্রুত, হড়বড় করে, বলতে-বলতে হাঁপাচ্ছিল। তারও কথাগুলো দুর্বোধ। হঠাৎ পাতার মত থরথর করে কাঁপতে শুরু করে দিল রাস্কোল্‌নিকভ্। গলার আওয়াজে চিনতে পেরেছে লোকটাকে। লেফটেনান্ট ইলিয়া পেত্রোভিচ্।— এখানেও! বাড়িউলিকে ধরে পেটাচ্ছে! লাথি মারছে, তার মাথা ধরে সিঁড়িতে সমানে ঠুকছে— যে রকম চিৎকার-চেঁচামেচি, দুমদাম আর চড়চাপড়ের

আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল তাতে অন্তত এটা পরিষ্কার। কী ব্যাপার— পৃথিবী ওলটপালট হয়ে গেল নাকি? আওয়াজ শুনে বোঝা যাচ্ছিল বাড়ির সবগুলো তলায়, সিঁড়ির সর্বত্র ভিড় জমে গেছে। কানে আসছে লোকজনের কণ্ঠস্বর, তাদের কথাবার্তায় বিস্ময়, ক্রোধ ও আক্ষেপের সুর। সিঁড়িতে তাদের দুপদাপ উঠে আসার, চারদিক থেকে ছুটে এসে জড় হওয়ার এবং দরজা ধাক্কানো ও দড়াম-দড়াম খোলাবন্ধ হওয়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। 'কিন্তু কেন, কী কারণে? কী ভাবে এটা সম্ভব হতে পারে!' সে মনে-মনে আওড়াল। সে রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়েছিল এই ভেবে যে তার মাথাটা সম্ভবত একেবারে গোলমাল হয়ে গেছে। কিন্তু না, সে বেশ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে!.... কিন্তু তাহলে তো ওরা এখনই ওর এখানেও হানা দিতে পারে, 'কেন না.... সম্ভবত, এসবের কারণ সেই... গতকালের... হা ভগবান!' একবার ভাবল দরজার ছিটকিনিটা এঁটে দেবে কিনা। কিন্তু হাত আর উঠল না।... তাছাড়া ওতে কোন লাভও নেই। একটা বরফের চাঁই যেন ঠাণ্ডা শিরশিরে আতঙ্কে ছেয়ে ফেলল তার সমস্ত সত্তা, তাকে যন্ত্রণা দিতে লাগল, অসাড় করে দিল তার সর্বাঙ্গ।... যাক, হৈ-হট্টগোল সম্ভবত মিনিটদশেক জোর চলার পর অবশেষে আস্তে-আস্তে থিতিয়ে আসতে লাগল। বাড়িউলি অবশ্য তখনও কাতরাচ্ছে, 'উঃ আঃ' করে চলছে, ইলিয়া পেত্রোভিচ্‌ও শাসানি ও গালিগালাজ চালিয়ে যাচ্ছে।... দেখতে-দেখতে, মনে হল, ইলিয়া পেত্রোভিচ্‌ও শান্ত হয়ে এলো। এবারে আর পাওয়া যাচ্ছে না তার সাড়াশব্দ। 'সত্যিসত্যি কি চলে গেল! ভগবান করুন!...' হ্যাঁ এইবারে চলে যাচ্ছে বাড়িউলিও— যেতে-যেতে এখনও কাতরাচ্ছে, ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে।... এবারে তার ঘরের দরজাও দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল।... হ্যাঁ ভিড়টাও সরে যাচ্ছে, সিঁড়ি দিয়ে লোকজন চলে যাচ্ছে যে যার ঘরে— 'আহা উহু' করছে, নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি হাঁকাহাঁকি করছে, কথা বলতে-বলতে কখনও গলা এত চড়াচ্ছে যে চিৎকারের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে, কখনও বা গলা নামিয়ে ফেলছে ফিসফিসানির পর্যায়ে। সম্ভবত সংখ্যায় কম ছিল না। প্রায় সারা বাড়ির লোকজনই ছুটে এসেছিল। 'ওঃ ভগবান, এও কি সম্ভব! কেন, কী কারণে লোকটা এসেছিল এখানে?'

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ নিস্তেজ হয়ে সোফায় ঢলে পড়ল, কিন্তু চোখের পাতা আর ফেলতে পারল না। আগে কখনও যে অভিজ্ঞতা তার হয়নি সীমাহীন বিভীষিকার সেরকম একটা অসহ্য উপলব্ধি ও যন্ত্রণায় দগ্ধাতে-দগ্ধাতে সে এইভাবে আধঘণ্টা মতো শুয়ে রইল। হঠাৎ জোরাল আলোয় ভরে গেল তার ঘরটা : এক প্লেট স্যুপ আর একটা জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে করে ঘরে এসে ঢুকল নাস্তাসিয়া। রাস্‌কোলনিকভের দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে দেখল। ভালো করে দেখার পর যখন বুঝল যে সে ঘুমোচ্ছে না তখন মোমবাতিটা টেবিলের ওপর বসিয়ে রাখল তারপর যা যা এনেছিল— রুটি, নুন, প্লেট, চামচ একে-একে সাজিয়ে রাখতে লাগল।

"গতকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি মনে হচ্ছে। সারাটা দিন গায়ে জ্বর নিয়ে টো টো করে ঘুরে বেড়ালে।"

"নাস্তাসিয়া,... বাড়িউলিকে ধরে পেটাল কেন বল তো?"

নাস্তাসিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। বলল, "কে পেটাল বাড়িউলিকে?"

"এই তো... আধ ঘণ্টাখানেক আগে, ডেপুটি পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইলিয়া পেত্রোভিচ... সিঁড়িতে... কেন অমনভাবে মারল ওকে?... কেনই বা এসেছিল?..."

নাস্তাসিয়া কোন কথা না বলে ভুরু কুঁচকে তাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল, ওইভাবে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। নাস্তাসিয়ার এই অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে রাসকোল্‌নিকভ রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। এক অজানা আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে উঠল।

"চুপ করে রইলে যে বড়, নাস্তাসিয়া?" অবশেষে ভয়ে-ভয়ে ক্ষীণকণ্ঠে সে বলল।

"এ হল গিয়ে রক্ত," শেষকালে উত্তরে নাস্তাসিয়া বলল। নিচু গলায় যেন আপন মনেই কথাগুলো বলল!

"রক্ত!... কিসের রক্ত?... দেয়ালের দিকে সরে যেতে-যেতে বিড়বিড় করে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বলল। তার মুখ ফেকাসে হয়ে গিয়েছিল। নাস্তাসিয়া আগের মতোই নীরবে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

"কেউ মারেনি বাড়িউলিকে," কঠোর ও দৃঢ় কণ্ঠে সে আবার বলল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল নাস্তাসিয়ার দিকে। ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল প্রায়।

"আমি নিজের কানে শুনেছি।... আমি যে ঘুমিয়ে ছিলাম এমন নয়... বসে ছিলাম," আরও আমতা-আমতা করে সে বলল। "অনেকক্ষণ ধরে চলছিল... কানে এসেছে।... ডেপুটি পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট এসেছিল।... বাড়ির সবগুলো ফ্ল্যাট থেকে লোকজন সব ছুটে এসে ভিড় জমাল সিঁড়িতে।..."

"কেউ আসেনি। তোমার শরীরের ভেতরে রক্ত হাঁকডাক করছে। রক্ত যখন বেরোবার পথ না পেয়ে লিভারে জমাট বেঁধে যায় তখনই লোকে কল্পনায় নানা রকম জিনিস দেখতে থাকে।... খাবে কিনা বল।"

রাস্‌কোলনিকভ্ জবাব দিল না। নাস্তাসিয়া জায়গা ছেড়ে গেল না, ঠায় দাঁড়িয়ে রইল তার ওপর ঝুঁকে পড়ে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

"একটু জল দাও।... জল খেতে দাও গো।"

নাস্তাসিয়া নিচে নেমে গেল। মিনিট দুয়েক বাদে সাদা চিনেমাটির একটা মগে করে জল নিয়ে ফিরল। কিন্তু এরপর কী হল রাস্‌কোল্‌নিকভ্ আর মনে করতে পারল না। তার শুধু এইটুকুই মনে ছিল যে একঢোক ঠাণ্ডা জল চুমুক দিয়ে খাবার পর অনেকটা চল্‌কে পড়ে গেল তার বুকের ওপর। পরক্ষণেই তার সংজ্ঞা লোপ পেল।

তিন

অসুখের সময় অবশ্য সর্বক্ষণই তার যে বেহুঁশ অবস্থায় কাটত এমন নয়। কাটত অনেকটা জ্বরের ঘোরে, অর্ধচেতন বিকারের ঘোরে। অনেককিছু সে পরে মনেও করতে পারত। সময়-সময় তার মনে হচ্ছিল তার আশেপাশে বহু লোকের ভিড় জমে গেছে, তারা তাকে কোথায় যেন তুলে নিয়ে যেতে চায়। তাকে নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে জোর তর্কাতর্কি, ঝগড়া-বিবাদ চলছে। কোন-কোন সময় হঠাৎ মনে হয় সে একা ঘরে পড়ে আছে— সবাই চলে গেছে ঘর ছেড়ে, সবাই ভয় পাচ্ছে তাকে দেখে, কেবল কদাচিৎ ঘরের দরজা সামান্য ফাঁক করে তাকে দেখছে, তাকে শাসাচ্ছে, নিজেদের মধ্যে কী সব শলা-পরামর্শ করছে, হাসছে, তাকে দেখে ভেংচি কাটছে। তার মনে আছে অনেক সময় নাস্তাসিয়াকে সে দেখতে পেত তার পাশে। সকলের মাঝখান থেকে আলাদা করে দেখতে পেত আরও একটি মানুষকে—মানুষটা যেন তার অতি পরিচিত। কিন্তু ঠিক কে কোনমতে ধরতে পারত না। ধরতে না পারায় মনের ভেতরে একটা ব্যাকুলতা অনুভব করত সে। এমনকি, কান্না পেয়ে যেত তার। কখন-কখন তার মনে হত সে যেন এক মাস হল পড়ে আছে, কখনও বা মনে হত বুঝি বা ওই একই দিন যাচ্ছে। কিন্তু ওই যে *ওটা... ওটার* কথা সে বিলকুল ভুলে গিয়েছিল, তবে প্রতিমুহূর্তে তার মনে পড়ত কী যেন একটা সে ভুলে গেছে... এমন একটা জিনিস, যা ভুলে যাওয়া তার উচিত নয়। মনে করার চেষ্টা করতে গিয়ে সে কষ্ট পেত, যন্ত্রণা পেত, যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠত, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত, কখনও বা শিউরে উঠত অসহনীয় ভয়ঙ্কর আতঙ্কে। তখন জোর করে শয্যা ছেড়ে উঠে ছুটে বেরিয়ে যাবার ইচ্ছে হত তার, কিন্তু এইসব মুহূর্তে সবসময় কে যেন তাকে জোর করে থামিয়ে দিত। সে তখন আবার অসহায় হয়ে পড়ত, চেতনা হারিয়ে ফেলত। অবশেষে একসময় তার চেতনা সম্পূর্ণ ফিরে এলো।

সেটা ঘটল একদিন সকালে, দশটার সময়। সকালের এই সময়টিতে আকাশ পরিষ্কার থাকলে রোদ সবসময় লম্বা ফালি হয়ে তার ঘরের ডান দিকের দেয়ালে পড়ে আলোকিত করে তোলে দরজার পাশের কোনাটা। তার শয্যায় পাশে দাঁড়িয়ে ছিল নাস্তাসিয়া এবং আরও একটি লোক। লোকটা আদৌ তার পরিচয় নয়। খুব কৌতূহল নিয়ে তাকে নিরীক্ষণ করছিল। আসলে অল্পবয়সী এক ছোকরা —মুখে সামান্য দাড়ি, গায় ঢোলা হাতার জামা। চেহারা দেখে মনে হয় কোন সমবায় সমিতির কর্মী বা সদস্য হবে। আধাখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছিল বাড়িউলি। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বিছানা থেকে শরীরটা সামান্য ওঠাল।

"এ কে, নাস্তাসিয়া?" ছোকরাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সে জিগ্‌গেস করল।

"আরে, আরে, দ্যাখ, জ্ঞান ফিরে এসেছে!" নাস্তাসিয়া বলল।

"হ্যাঁ, জ্ঞান ফিরে এসেছে" ছোকরাটি প্রতিধ্বনি করল। বাড়িউলি এতক্ষণ দরজা

দিয়ে ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারছিল, কিন্তু রাস্‌কোলনিকভের জ্ঞান ফিরে এসেছে বুঝতে পেরে সঙ্গে-সঙ্গে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গা ঢাকা দিল। মহিলা অমনিতেই লাজুক স্বভাবের, কথাবার্তা বলা বা কোন বিষয়ে জবাবদিহি করতে যাওয়া— এসব ব্যাপারে সবসময় অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। বয়স বছর চল্লিশ, স্থূলাঙ্গিনী, মেদবহুল শরীর। চোখ কালো, চোখের ভুরুও কালো। স্থূলত্ব ও আলস্যের দরুন নরম স্বভাবের, এমনকি দেখতে শুনতেও তাকে নেহাত মন্দ বলা যায় না। বড় বেশি মাত্রায় লাজুক।

"আপনি কে?" সমবায় সমিতির লোকটিকেই এবারে সে সরাসরি জিগ্‌গেস করল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা আবার খুলে গেল— এবারে খুলে গেল হাট হয়ে। ঘরে ঢুকল রাজুমিখিন। লম্বা বলে সামান্য ঝুঁকে পড়ে তাকে ঢুকতে হল।

"আরে এ যে জাহাজের কেবিন দেখছি।" ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতে সে চেঁচিয়ে বলল। "বারবার কপাল ঠুকে যাচ্ছে। এটাকেও কিনা ঘর বলে! তা তোমার জ্ঞান ফিরে এসেছে দেখছি ভাই! এখুনি জানতে পারলাম পাশেন্‌কার কাছ থেকে।"

"সবে জ্ঞান ফিরল," নাস্তাসিয়া বলল।

"সবে জ্ঞান ফিরল," সমবায়ের ছোকরাটি এবারেও কথার পিঠে সায় দিয়ে মৃদু হেসে বলল।

হঠাৎ তার দিকে ফিরে রাজুমিখিন জিগগেস করল, "মাফ করবেন, আপনি কে মশায়? সামনে এই যে অধমকে দেখছেন সে হল ভ্‌রাজুমিখিন— যদিও আমাকে সকলে রাজুমিখিন বলে ডাকে, তবু আসলে কিন্তু ভ্‌রাজুমিখিন। আমি একজন ছাত্র, ভদ্রসন্তান। আর এ হল আমার বন্ধু। আপনি কে মশায়?"

"আমি? আমাদের সমবায় সমিতির অফিসের একজন কর্মী। বনিক শোলো-পায়েভের হয়ে কাজ করি। এখানে একটা কাজে এসেছি মশায়।"

"দয়া করে এই চেয়ারটায় বসুন মশায়," এই বলে রাজুমিখিন নিজে ছোট টেবিলটার আরেক দিকে, অন্য চেয়ারটাতে বসে পড়ল। এবারে রাস্‌কোল্‌নিকভের দিকে ফিরে বলল, "তোমার যে ভাই জ্ঞান ফিরে এসেছে এটা বেশ ভালো কথা। আজ চারদিন হল প্রায় কিছুই খাচ্ছ না, জলও খাচ্ছ না। অবশ্য চামচে করে চা একটু দেওয়া হয়েছিল। আমি জোসিমভ্‌কে এখানে নিয়ে এসেছিলাম দু'বার। জোসিমভ্‌কে মনে আছে তো? ও তোমাকে ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখেছে। সঙ্গে-সঙ্গেই বলেছে এমন কিছু নয়— কোন কারণে শক পেয়েছ। নার্ভের সামান্য গোলমাল দেখা দিয়েছে আর কি। বলল খাদ্যসরবরাহ বাজে ছিল, খাবারের মধ্যে বীয়র আর ঝালমুলোর ঘাটতি পড়েছে— সেটাই রোগের কারণ, তবে ও কিছু নয়— সেরে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। সাবাস বলতে হবে জোসিমভ্‌কে। ডাক্তার হিসাবে বেশ নামডাক হয়েছে ওর।...ও হ্যাঁ, আপনার দেরি করিয়ে দিচ্ছি বোধহয়," এবারে সমবায় সমিতির লোকটির দিকে ফিরে সে বলল। "আপনার কী কাজের কথা আছে বলুন তাহলে।

রোদিয়া, জেনে রাখ, ওদের অফিস থেকে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার লোক এলো, তবে আগের বার উনি আসেননি। তখন এসেছিলেন অন্য আরেকজন, তার সঙ্গে আমাদের যা যা কথাবার্তা হওয়ায় হয়ে গেছে। আপনার আগে কে এসেছিল যেন এখানে?"

"যতদূর মনে হচ্ছে গত পরশু দিন। হ্যাঁ, তাই হবে। এসেছিলেন আলেক্সেই সেমিওনোভিচ্। তিনিও আমাদের অফিসেরই লোক।"

"তিনি আপনার চেয়ে একটু বেশি বুদ্ধিসুদ্ধি ধরেন বলে মনে হয়, তাই না?"

"হ্যাঁ মশায়, উনি বেশ ভারিক্কি গোছের।"

"বাঃ খুবই তারিফ করার মতো। বেশ, চালিয়ে যান।"

সমবায় সমিতির লোকটি এবারে রাস্‌কোলনিকভ্‌কে লক্ষ করে বলল, "মশায়, ব্যাপারটা হল এই যে আপনার নামে একটা মনি অর্ডার এসেছে আপনার মাতৃদেবীর অনুরোধে আমাদের অফিসের মারফত। সেটা এসেছে আফানাসি পেত্রোভিচ্ ভাখ্রুশিনের মারফত। তাঁর নাম, আমার ধারণা, আপনি একাধিকবার শুনে থাকবেন। আপনি যদি মানসিকভাবে সুস্থ থাকেন, সেক্ষেত্রে আমি, মশায়, পঁয়ত্রিশ রুবল আপনার হাতে তুলে দিতে চাই, যেহেতু সেমিওন সেমিওনোভিচ্ আপনার মাতৃদেবীর অনুরোধে এই মর্মে নির্দেশ পেয়েছেন আফানাসি পেত্রোভিচের কাছ থেকে। আশা করি আপনি তা অবগত আছেন, ঠিক বলছি কিনা মশায়?"

"হ্যাঁ,...মনে পড়ছে....ভাখ্রুশিন..." রাস্‌কোল্‌নিকভ্ অন্যমনস্কভাবে বলল।

"শুনছেন, বণিক ভাখ্রুশিনকে জানে বলছে!" রাজুমিখিন চেঁচিয়ে বলে উঠল "মানসিকভাবে যে সুস্থ তাতে কি সন্দেহের অবকাশ আছে?" প্রসঙ্গত, আমি এখন দেখতে পাচ্ছি, আপনিও বেশ বুদ্ধিসুদ্ধি ধরেন। বেশ, বেশ! জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা শুনেও আনন্দ!"

"ইনিই সেই ব্যক্তি— ভাখ্রুশিন, আফানাসি ইভানোভিচ্— আপনার মাতৃদেবীর অনুরোধে, এর আগেও যেমন একবার এই একই উপায়ে তাঁর মারফত আপনাকে মনি অর্ডার পাঠানো হয়, এবারেও তিনি সেই অনুগ্রহ দেখাতে সম্মত হন এবং কয়েকদিন আগে সেমিওন সেমিওনোভিচকে ওখান থেকে নির্দেশ পাঠিয়েছেন পঁয়ত্রিশ রুবল আপনার হাতে তুলে দিতে, আপনার মঙ্গলের আশায়।"

"বাহবা, এই যে 'মঙ্গলের আশায়'— এটা কিন্তু আপনি মোক্ষম বলেছেন! অবশ্য 'আপনার মাতৃদেবী'— এই অংশটাও নেহাত মন্দ হয়নি। তাহলে আপনার কী মনে হয়?— মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ আছে কি লোকটা, নাকি নেই?"

'আহা, আমার আর কী আছে, মশায়? একমাত্র যেটা দরকার তা হল ওঁর সইটা।"

"সে একটা আঁকিবুকি কেটে দেবে যা হোক! কোথায় করতে হবে? কোনও রসিদ বইটই আছে নাকি আপনার?"

"রসিদবই, এই যে মশায়।"

"এদিকে দিন। এবারে গা তোল দেখি রোদিয়া। আমি তোমাকে একটু ঠেকা দিয়ে ধরে রাখছি। একটা টান মেরে লিখে ফেল দেখি, রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌। এই নাও কলম। আরে ভাই, টাকার চেয়ে মিষ্টি এখন আর কিছু হতে পারে না আমাদের কাছে।"

"দরকার নেই," কলমটা সরিয়ে দিয়ে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ বলল।

"দরকার নেই মানে?"

"সই করব না।"

"ধুত্তোর! রসিদ ছাড়া কী করে হবে?"

"দরকার নেই... টাকার..."

"টাকার দরকার নেই... বল কি! না ভাই এ তুমি বাজে বকছ, আমি সাক্ষী আছি! দয়া করে চিন্তা করবেন না, ও এই অমনি... আবারও টালবাহানা শুরু করে দিয়েছে। অবশ্য যখন হুঁশে থাকে তখনও ওর ওরকম হয়। আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি। আমরা ওকে দিয়ে হাতে ধরে কাজটা করিয়ে নেবো। অর্থাৎ স্রেফ হাতে ধরে ওকে লেখাব, সই না করে যাবে কোথায়? শুরু হয়ে যাক তাহলে..."

"না, না, আমি না হয় অন্য একদিন আসব, মশায়।"

"না, না, আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। আপনি হলেন গিয়ে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি।... এই যে বাবা রোদিয়া, ভদ্রলোককে আর আটকে রেখো না বাপ্‌।... দেখছ না অপেক্ষা করে আছেন," এই বলে সত্যি-সত্যি সে হাত ধরে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে লেখাতে প্রবৃত্ত হল।

"রাখো দেখি, আমি নিজেই সই করব," এই বলে কলম তুলে নিয়ে রসিদ বইতে সই করল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌। সমবায়ের লোকটি টাকাগুলো দিয়ে সরে পড়ল।

"বাহবা! আচ্ছা ভাই, এবারে খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই?"

"পেয়েছে", রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ উত্তর দিল।

"খাবার কী আছে? স্যুপ?"

"গতকালের", নাস্তাসিয়া উত্তর দিল। এতক্ষণ সে একঠায় দাঁড়িয়ে ছিল।

"আলু আর চালের খুদের?"

"হ্যাঁ তাই।"

"ও আমার মুখস্থ। লাগাও স্যুপ, আর হ্যাঁ, চা-ও দাও।"

"এই আনছি।"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ ভীষণ অবাক হয়ে অহেতুক ভয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল কাণ্ডকারখানা। ঠিক করল চুপচাপ অপেক্ষা করে দেখবে শেষকালে কী ঘটে। মনে-মনে ভাবল, 'মনে তো হচ্ছে না আমি কোন ঘোরের মধ্যে আছি। সব সত্যি বলেই মনে হচ্ছে।...'

মিনিট দুয়েক বাদে স্যুপ নিয়ে ফিরল নাস্তাসিয়া, জানাল শিগ্‌গিরই চা আসছে। স্যুপের সঙ্গে-সঙ্গে এলো দুটি চামচ, দুটি প্লেট এবং খাবার টেবিলের পুরোদস্তুর সরঞ্জাম: নুনদানি, মশলাদানি, মাংসের জন্য সরষে বাটা ইত্যাদি—এর আগে অনেককাল এরকম নিখুঁতভাবে এসব টেবিলে রাখতে দেখা যায়নি। টেবিলক্লথটাও পরিষ্কার।

"শোনো নাস্তাসিয়া, নেহাত মন্দ হয় না যদি প্রাস্কোভিয়া পাভ্‌লভনা এখানে গোটা দুই বোতল বীয়ার পাঠিয়ে দেন। আমরা দু'জনে খেতাম তাহলে।"

"আহা সাধ দেখ।" নাস্তাসিয়া গজগজ করে বলল। মুখে বলল বটে, কিন্তু চলে গেল আজ্ঞা পালন করতে।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ আগের মতোই হতভম্ব হয়ে, উত্তেজিতভাবে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগল চারধার। ইতিমধ্যে রাজুমিখিন সোফায় তার পাশে এসে বসেছে ভালুকের মতো জবুথবু হয়ে। বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরল রাস্‌কোল্‌নিকভের মাথাটা, যদিও রাস্‌কোলনিকভ্ তার সাহায্য ছাড়া নিজেই উঠে বসতে পারত। ডানহাতে রাস্‌কোল্‌নিকভের মুখের কাছে চামচে করে স্যুপ এনে প্রথমে বারকয়েক ফুঁ দিয়ে নিল, যাতে ওর মুখ পুড়ে না যায়। কিন্তু স্যুপটা ঈষদুষ্ণ ছিল মাত্র। রাস্‌কোল্‌নিকভ সাগ্রহে গিলে ফেলল প্রথম চামচ, তারপর আরও এক চামচ এবং আরও। কিন্তু কয়েক চামচ এইভাবে তুলে-তুলে খাওয়ানোর পর রাজুমিখিন হঠাৎ খাওয়ানো বন্ধ করে দিয়ে ঘোষণা করল, এর পরে খাওয়াতে গেলে তাকে জোসিমভের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

নাস্তাসিয়া ঘরে ঢুকল দু বোতল বীয়ার নিয়ে।

"চা লাগবে?"

"লাগবে।"

"জলদি লে আও চা, নাস্তাসিয়া, কেননা চায়ের ব্যাপার আমার মনে হয় ডাক্তারের অনুমতি ছাড়াও চলতে পারে। কিন্তু এখানে আবার বীয়ারও আছে!" বলতে বলতে সে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে স্যুপ আর মাংস নিজের দিকে টেনে নিয়ে এমনভাবে গবগব করে খেতে শুরু করল যে দেখে মনে হল তিন দিন হল কিছু পেটে পড়ে নি।

"বলব কী ভাই রোদিয়া, আমি তোমাদের এখানে রোজ খাওয়া-দাওয়া করছি আজকাল," মুখভর্তি মাংস ঠেসে চিবুতে-চিবুতে অস্পষ্ট স্বরে সে বলল। "এ সবই তোমার বাড়িউলি পাশেন্‌কার কল্যাণে। খাইয়ে আনন্দ পায়, আমাকে মনেপ্রাণে শ্রদ্ধা করে। আমি অবশ্য জোরাজুরি করি না, তবে প্রতিবাদও করি না। এই যে নাস্তাসিয়া এসে গেছে চা নিয়ে। উ, কি চটপটে! কী গো একটু বীয়ার চলবে নাকি?"

"ন্যাখ দেখি তোমার যত ফাজলামি!"

"তাহলে চা?"

"চা হতে পারে।"

"ঢাল। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি নিজে তোমাকে ঢেলে দিচ্ছি। বোসো।"

রাজুমিখিন তক্ষুণি চায়ের ভার নিল। এক কাপ ঢালল, তারপর আরও এক কাপ। তারপর খাওয়া ছেড়ে ফিরে এসে আবার সোফায় বসল। আগেকার মতো আবার বাঁ হাতে রোগীর মাথাটা জড়িয়ে ধরে তাকে উঠিয়ে ধরে চামচে করে চা খাওয়াতে লাগল, আবারও মহা উৎসাহে অবিরাম চামচে ফুঁ দিতে লাগল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন ফুঁ দেওয়ার এই প্রক্রিয়াটির মধ্যেই নিহিত আছে সুস্থ হয়ে ওঠার মুখ্য কারণ ও সঞ্জীবনী শক্তি। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ চুপ করে রইল, কোন বাধা ছিল না, যদিও ভেতরে -ভেতরে সে অনুভব করছিল যে বাইরের কারও কোন সাহায্য ছাড়াই সোফায় উঠে বসার মতো যথেষ্ট শক্তি তার আছে এবং চামচ অথবা কাপ ধরে রাখার মতো হাতের জোর তো তার আছেই, এমনকি হয়ত হেঁটে-চলে বেড়াতেও সে পারে। কিন্তু কোন এক অদ্ভুত কারণে, বলতে গেলে একধরনের জৈব ধূর্ততাবশত হঠাৎ তার মাথায় খেলল আপাতত নিজের শক্তিটা গোপন করে, নিজেকে আড়ালে রেখে, দরকার হলে এমন ভান করবে যেন সে এখনও কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। এই অবসরে ভালো করে সবকথা শুনে বোঝার চেষ্টা করবে আসলে কী ঘটছে। তা সত্ত্বেও সে তার বিরাগ চেপে রাখতে পারল না— দশ চামচ খানেক চা গলাধঃকরণ করার পর সে এক ঝটকার মাথাটা ছাড়িয়ে নিল, মেজাজ দেখিয়ে চামচটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আবার ধপ করে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল। তার মাথার নিচে এবারে সত্যি-সত্যি বালিশ ছিল— সত্যিকার বালিশ— নরম পালকঠাসা, তুলতুলে, ফরসা ওয়াড় লাগানো। এটাও তার নজর এড়াল না। এটাও ভাবার কথা।

"পাশেন্‌কা যেন আজ আমাদের জন্য খানিকটা র‍্যাস্পবেরি জ্যাম পাঠিয়ে দেয়, ওই দিয়ে ওকে সরবত বানিয়ে দিতে হবে," বলতে-বলতে আবার ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসে স্যুপ আর বীয়ার নিয়ে পড়ল সে।

"তোমার জন্যে এখন র‍্যাস্পবেরি সে কোত্থেকে পাবে শুনি?" হাতের ছড়ানো পাঁচ আঙুলের ডগায় ডিশ ধরে রেখে একেক চুমুকে মুখের ভেতরে রাখা 'চিনির ডেলা মারফত' ছাঁকা চা গলার ভেতরে চালান করতে-করতে নাস্তাসিয়া জিগ্‌গেস করল।

"আহা বাছা আমার, তাও জান না? পাবে দোকানে। বুঝলে রোদিয়া, তোমার অনুপস্থিতিতে অনেক কাণ্ড হয়ে গেছে এখানে। তুমি যখন ওরকম অভদ্রভাব ছুটে পালিয়ে গেলে, কোথায় থাক তাও জানালে না, তখন হঠাৎ আমি এত খেপে গিয়েছিলাম তোমার ওপর যে ঠিক করলাম তোমাকে খুঁজে বার করে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। ওইদিনই আমি কাজে নেমে পড়লাম। কত জায়গায় কত ঘোরাঘুরি

করলাম, জিগ্‌গেসবাদ করলাম! তোমার এখনকার এই ফ্ল্যাট আমার মনে ছিল না। অবশ্য কস্মিনকালে মনে করতেও পারতাম না, যেহেতু জানতামই না। তবে তোমার আগেকার আস্তানাটা সম্পর্কে আমার কেবল এইটুকু মনে ছিল যে ফাইভকর্নার্স এলাকার কাছাকাছি, খার্‌লামোভের বাড়ি। অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম খার্‌লামোভের বাড়ি কিন্তু পরে দেখা গেল ওটা আদৌ খার্‌লামোভের বাড়ি নয়— বুখের বাড়ি— অনেক সময় শব্দে তালগোল পাকিয়ে গেলে যা হয় আর কি! মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেল। মেজাজ তিরিক্ষি হলেও যা হবার হবে ভেবে পরদিন চলে গেলাম পুলিস স্টেশনে, ভাবলাম ঠিকানার রেজিস্ট্রি বইটা ওখানে দেখি। কী হল, ধারণা করতে পার?— দু মিনিটের মধ্যে ওরা খুঁজে বার করে দিল। তোমার নাম ওদের রেজিস্ট্রি বইতে লেখা আছে।

"লেখা আছে!"

"আছে বৈ কি! তবে আমি যতক্ষণ ছিলাম সেই সময়ের মধ্যে জেনারেল কোবেলেভ্‌কে ওরা খুঁজে বের করতে পারল না। যাগ গে, সেসব অনেক কথা। মোদ্দা কথা এই যে, এখানে হানা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তোমার সমস্ত খবর পেলাম। হ্যাঁ ভাই, সমস্ত খবর পেলাম, কিছু আর জানতে বাকি নেই তোমার সম্পর্কে। এই যে নাস্তাসিয়া সাক্ষী। নিকোদিম ফোমিচের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, ইলিয়া পেত্রোভিচ্‌কেও ওরা দূর থেকে দেখিয়েছে আমাকে। আলাপ হয়েছে বাড়ির দারোয়ানের সঙ্গে, এখানকার থানার অফিসের হেডক্লার্ক আলেক্সান্দার গ্রিগোরিয়েভিচ জামিওতভের সঙ্গে, শেষকালে তোমার বাড়িউলি পাশেন্‌কার সঙ্গেও—আর এটাই ছিল চূড়ান্ত। এই যে নাস্তাসিয়া জানে, ও-ই বলুক।..."

"তা হবে না? যা মিষ্টি ঢেলেছ তার কানে!" ধূর্ত হাসি হেসে বিড়বিড় করে বলল নাস্তাসিয়া।

"আহা চিনিটা মুখের ভেতরে না রেখে চায়ের কাপে ঢাললেই তো ভালো করতে নাস্তাসিয়া নিকিফরভ্‌না।"

"ঝ্যাটা মারি তোমার মুখে!" হঠাৎ ঝাঁঝিয়ে উঠল নাস্তাসিয়া। পরক্ষণেই হেসে গড়িয়ে পড়ল। তাছাড়া আমি নিকিফরভ্‌না নই, আমি পেত্রোভ্‌না," হাসি থামানোর পর হঠাৎ সে যোগ করল।

"বেশ মনে থাকবে দিদিমণি। তা যা বলছিলাম ভাই, সংক্ষেপে বলতে গেলে গোড়ায় আমার ইচ্ছে ছিল এই এলাকা থেকে একটানে সমস্ত কুসংস্কারের মূল উপড়ে ফেলি, এখানকার সবকিছুর ওপর ইলেক্‌ট্রিক শক প্রয়োগ করি। কিন্তু জয় হল পাশেন্‌কার। ওর যে এত... ওই যে কী বলে ... আকর্ষণ থাকতে পারে আমার জানা ছিল না, ভাই। তোমার কী মনে হয়?... অ্যাঁ?"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ চুপ করে রইল। এতক্ষণের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধুর

ওপর থেকে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি সরায়নি। এখনও তীব্র সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখতে লাগল তাকে।

রাস্‌কোল্‌নিকভের নীরবতায় এতটুকু দমল না সে। যেন সত্যিকারের একটা জবাব পেয়ে গিয়ে তারই সায় দিয়ে রাজুমিখিন বলে চলল, "ঠিক তাই। সমস্ত দিক থেকেই তাই।"

"আ ম'লো যা।" আবারও চেঁচিয়ে উঠল নাস্তাসিয়া। তবে তার সুরে মনে হল কথাগুলো সে রীতিমতো উপভোগ করছে।

"খুবই দুঃখের কথা ভাই, গোড়া থেকে তুমি পরিস্থিতি ঠিক হাতে নিতে পারনি। ওর সঙ্গে ওরকম করা উচিত হয়নি। মহিলার স্বভাব, বলতে গেলে কি, খুব চমকে দেবার মতো! যাক গে, স্বভাবের কথা পরে হবে।... শুধু আমি, যেমন ধর, এটাই ভেবে পাই না কোন সাহসে তোমাকে খাবার পাঠানো বন্ধ করল! কী করে ঘটনা অতদূর গড়াল? তারপর ধর ওই হ্যান্ডনোট। আরে, তোমার কি মাথা খারাপ! ওরকম একটা জিনিসে কেউ সই করে নাকি! কিংবা ধর, মেয়ে নাতালিয়া ইয়েগরভ্‌না বেঁচে থাকতে ওই বিয়ের প্রস্তাব।... আমি সব জানি! যাক গে, আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার দুর্বল জায়গায় ঘা দিয়েছি।— আমি একটা আস্ত গাধা! আমায় ক্ষমাঘেন্না করে দিও। আর হ্যাঁ বোকামির কথা যদি বলতে হয় তাহলে তোমার কি মনে হয় না ভাই প্রাস্‌কোভিয়া পাভ্‌লভ্‌না, মানে আমাদের পাশেন্‌কাকে আপাতদৃষ্টিতে যেমন মনে হয় আসলে মোটেই তেমন বোকা নয়? কী বল?"

"যা বলেছ," চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ মিনমিন করে বলল, তবে বুঝতে পারছিল কথাবার্তার ধারা জিইয়ে রেখে বরং লাভ আছে।

"ঠিক বলেছি কিনা?" জবাব পেয়ে মনে হয় উল্লসিত হয়েই চেঁচিয়ে উঠল রাজুমিখিন। "তবে কিনা বুদ্ধিমতীও বলা যায় না তাকে, তাই না? স্বভাবটা এমনই যে কখন কী করে বসে বলা যায় না, একদম বলা যায় না! আমি ভাই, সত্যি বলতে গেলে কি, মাঝে-মাঝে বেকুব বনে যাই।... ওর বয়স নির্ঘাত চল্লিশ হবে। ও বলে — ছত্রিশ। একথা বলার হক ওর অবশ্যই আছে। তবে হ্যাঁ, তোমাকে হলফ করে বলতে পারি যে ওর সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি বেশির ভাগ বুদ্ধিনির্ভর, পুরোপুরি মেটাফিজিক্যাল স্তরের। তাইতে তো বুঝলে ভাই, আমাদের মধ্যে এমন সব প্রতীক আর সাঙ্কেতিক চিহ্নের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল যে কোথায় লাগে তোমার এলজেব্‌রা! মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না! যাক গে ওসব বাজে কথা। তবে আসল ঘটনাটা এই যে সে যখন দেখতে পেল যে তুমি আর ছাত্র নও, তোমার কোন টুইশানি নেই, ভালো পোশাক-পরিচ্ছদও নেই এবং মেয়েটা মারা যাবার পর তোমাকে আর পরিবারের একজন বলে ধরারও কোন মানে হয় না, তখন হঠাৎই সে ঘাবড়ে গেল। অন্যদিকে তুমি, তোমার নিজের দিক থেকে যখন একেবারে কুনো হয়ে পড়লে,

আগেকার সমস্ত কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলে তখনই সে মনে-মনে মতলব আঁটল তোমাকে ঘর থেকে উচ্ছেদ করার। মতলবটা সে বহুদিন ধরে ভাঁজছিল। কিন্তু হ্যান্ডনোটটা খোয়াতেও তার আফসোস হচ্ছিল। তার ওপর তুমি নিজে আবার আশ্বাসও দিয়েছিলে যে তোমার মা ঋণ শোধ করবেন।...''

''ওকথা বলে আমি আমার নীচতারই পরিচয় দিয়েছি।...আমার মা নিজেই প্রায় ভিখিরি... আমি মিছে কথা বলেছিলাম যাতে ঘরে থাকতে পারি, খাবার পেতে পারি,'' রাসকোলনিকভ্ উঁচু গলায় স্পষ্টাস্পষ্টি বলল।

''হ্যাঁ, এটা তুমি বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। তবে গণ্ডগোলটা শুরু হল তখনই যখন ঘটনাস্থলে কোর্ট কাউন্সিলার ও ব্যবসায়ী চেবারোভ্ মশাইয়ের আবির্ভাব ঘটল। এ লোকটা না থাকলে পাশেন্কা ওসব ভাবতেই পারত না— লজ্জাশরমটা তার একটু বেশি মাত্রায়ই আছে। কিন্তু ব্যবসায়ী মানুষের তো আর লজ্জাশরমের বালাই নেই, তাই বলাই বাহুল্য তার প্রথম প্রশ্ন ছিল হ্যান্ডনোটের ঋণ শোধ হওয়ার আশা আছে কিনা। উত্তরঃ হ্যাঁ আছে, কেন না ওর যে মা আছে সে এমনই যে নিজে অনাহারে থাকলেও তার একশ পঁচিশ রুবল পেনশন দিয়ে নয়নের মণি রোদিয়াকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসবে, আছে ওর এমন এক বোন যে তার আদরের ভাইটিকে বাঁচানোর জন্য দাসখত লিখে দিতেও পিছপা নয়।... লোকটার ভরসা ছিল এখানেই।... আহা, অস্বস্তির কী আছে? আমি ভাই এখন তোমার সমস্ত অভিসন্ধি জেনে গেছি। তুমি যখন ওদের পরিবারের একজন ছিলে সেই সময় পাশেন্কার কাছে মন খুলে সব কথা বলে তুমি কিন্তু ঠিক করনি বাপু। এখন আমি বন্ধু হিসেবে তোমাকে ভালোবেসে যা বলছি শোন।... ব্যাপারটা হল এই যে সৎ আর ভাবুক লোকেরা অকপট হয়, কিন্তু যারা কাজের লোক তারা বসে-বসে তোমার কথা-বার্তা শুনবে, হাঁ করে গিলবে... শেষকালে দেখবে, তোমাকে সুদ্ধ গিলে খাবে। তাই হল কি, পাশেন্কা তোমার ওই হ্যান্ডনোটটা ছেড়ে দিল চেবারোভ্কে— তাই দিয়ে পাওনা মেটাল। এদিকে চেবারোভ্ এতটুকু ইতস্তত না করে আনুষ্ঠানিকভাবে ওটার ভিত্তিতে টাকা দাবি করে বসল। আমি যখন সবকিছু জানতে পারলাম তখন ইচ্ছে হচ্ছিল নিজের বিবেকটাকে পরিষ্কার রাখার খাতিরে একবার লোকটার কাছে গিয়ে আচ্ছা করে মনের ঝাল মিটিয়ে আসি, কিন্তু ঠিক সেই সময় পাশেন্কার সঙ্গে আমার মিলমিশ হল, তাই আমি ব্যাপারটাকে একেবারে তার উৎসমুখেই বন্ধ করতে বললাম এই ভরসা দিয়ে যে তুমি ধার শোধ করবে। আমি তোমার জামিনদার হয়েছি ভাই, শুনছ? ডেকে পাঠানো হল চেবারোভ্কে — কড়কড়ে দশটি রুবল দিয়ে তার মুখ বন্ধ করা হল, কাগজটাও ফেরত পাওয়া গেল। এই যে, আপনার সম্মুখে উপস্থিত করতে পেরে নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি... এখন আপনার মুখের কথাতেই বিশ্বাস করতে হবে... এই যে অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করুন...বাতিল করার জন্য যতদূর পারা যায় ছিঁড়ে রেখেছি

নিজের হাতে।''

রাজুমিখিন ছেঁড়া হ্যান্ডনোটটা টেবিলের ওপর বিছিয়ে রাখল। রাস্‌কোলনিকভ্ তাকিয়ে দেখল, কিন্তু একটি কথাও না বলে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। রাজুমিখিন পর্যন্ত হকচকিয়ে গেল।

মিনিটখানেক বাদে সে বলল, ''আমি দেখতে পাচ্ছি ভাই, ফের আমি বোকা বনে গেলাম। ভাবলাম, কোথায় দুটো গল্পগাছা করে, আমোদফুর্তি দিয়ে তোমাকে ভুলিয়ে রাখব, তা নয় দেখা যাচ্ছে তোমাকে বিরক্তই করলাম।''

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ও মিনিটখানেক চুপচাপ রইল, তারপর মাথা না ঘুরিয়েই জিগ্‌গেস করল, ''আচ্ছা, বিকারের ঘোরে যাকে আমি চিনতে পারিনি সে কি তুমি?''

''হ্যাঁ আমিই। এমনকি তুমি ভীষণ খাপ্পাও হয়ে গিয়েছিলে এ ব্যাপারে, বিশেষত, একবার যখন জামিওতভ্‌কে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম।''

''জামিওতভ্? সেই হেডক্লার্ক? কিসের জন্যে?'' রাস্‌কোল্‌নিকভ্ চট করে মাথা ঘুরিয়ে রাজুমিখিনের দিকে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

''আরে, এ আবার কী হল তোমার?... অত ঘাবড়ে যাবার কী আছে? নিজেই যেচে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিল, কেননা তোমাকে নিয়ে ওর সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়। ... তা নইলে আর কার কাছ থেকেই বা তোমার সম্পর্কে এত জানতে পারতাম? বড় ভালো মানুষ ভাই, অতি চমৎকার লোক... বলাই বাহুল্য, তার নিজস্ব ধরনে। এখন আমরা বন্ধু, প্রায় রোজ দেখাসাক্ষাৎ হয় আমাদের। আমি আবার এই মহল্লাতেই উঠে এসেছি কিনা। তুমি এখনও জান না— তাই না? সবে উঠে এসেছি। ইতিমধ্যে ওর সঙ্গে লাভিজার ওখানেও বারদুয়েক গেছি। লাভিজাকে তোমার মনে আছে তো?— সেই যে লাভিজা ইভানোভ্‌না?''

''আচ্ছা, আমি কি ভুল বকছিলাম?''

''তা আর বলতে! তুমি তো আর তখন তোমাতে ছিলে না।''

''কী বকেছি আমি?''

''শোনো কথা! কী ভুল বকেছ? লোকে কী ভুল বকতে পারে তাও বলতে হবে?... আচ্ছা ভাই, এবারে সময় নষ্ট না করে কাজের কথায় আসা যাক।''

সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটা তুলে নিল।

''না, না, কী ভুল বকেছিলাম আমি?''

''আচ্ছা জ্বালা তো! আবার সেই ঘুরেফিরে একই কথা! কেন কোন গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে এমন আশঙ্কা আছে নাকি? ঘাবড়ানোর কারণ নেই: কোন কাউন্টেসের কথা ঘুণাক্ষরেও উচ্চারণ করনি, তবে হ্যাঁ কোনও এক বুলডগের কথা বলেছিলে, তারপর হ্যাঁ, কোথাকার কানের দুল আর গলার হার, ক্রেস্তোভ্‌স্কি দ্বীপ, কোথাকার কোন দারোয়ান, নিকোদিম ফোমিচ্ আর ডেপুটি পুলিস সুপারিন্টেডেন্ট

ইলিয়া পেত্রোভিচ্ সম্পর্কেও অনেক বকবক করেছ। তাছাড়া নিজের একপাটি মোজার ব্যাপারে বড় বেশি আগ্রহ প্রকাশ করছিলে, বাস্তবিকই বাড়াবাড়ি রকমের। বারবার অনুনয়-বিনয় করছিলে, ইনিয়ে-বিনিয়ে বলছিলে সেই এক কথা: 'ওটা আমায় দাও।' জামিওতভ্ নিজে ঘরের আনাচে-কানাচে তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছে তোমার মোজা। তারপর শেষে আতরে ধোয়া দামি আংটিপরা হাতে তোমায় তুলে দিয়েছে সেই জঘন্য জিনিসটা। একমাত্র তখনই তুমি শান্ত হলে, সারা দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা হাতে ধরে রইলে সেই জঘন্য জিনিসটা। কেড়ে নেবার সাধ্যিও ছিল না কারও। সম্ভবত এখনও তোমার লেপের তলায় কোথাও পড়ে আছে। তারপর আবার পাতলুনের তলাকার ছেঁড়া কুচির জন্যেও বায়না ধরেছিলে। আর সে কী কান্না! আমরা তখন উঠেপড়ে জেরা করতে লেগে গেলাম : কী ধরনের ছেঁড়া কুচি আবার? কিন্তু কিছুতেই কিছু বুঝতে পারলাম না।... হ্যাঁ, যা বলছিলাম— কাজের কথায় আসা যাক! এই যে এখানে আছে পঁয়ত্রিশ রুবল; তা থেকে দশ নিচ্ছি, ঘণ্টাদুয়েক বাদে তার হিসাব দেবো। ইতিমধ্যে জোসিমভ্কেও খবর পাঠাচ্ছি, যদিও অমনিতেই ওর এতক্ষণে এখানে এসে যাবার কথা, কেননা এগারোটা বেজে গেছে। নাস্তাসিয়া, লক্ষ্মীটি, আমি যতক্ষণ না থাকছি ততক্ষণ মাঝে-মাঝে এসে দেখে যেও, যদি জল বা অন্য কিছু খেতে চায়।... আর পাশেন্কাকে যা বলার আমি নিজেই তখনই বলব। আচ্ছা চলি।"

"আহা ঢং দেখ! 'প্রাস্কোভিয়া' না বলে আদর করে 'পাশেন্কা' বলে ডাকা হচ্ছে! বজ্জাতের ফন্দিবাজি দেখে গা জ্বলে যায়!" রাজুমিখিন বেরিয়ে যেতে পেছন থেকে টিপ্পনী কাটল নাস্তাসিয়া। পরে দরজা ফাঁক করে কান পেতে কী যেন শোনার চেষ্টা করল। কিন্তু শেষপর্যন্ত ধৈর্য ধরতে না পেরে নিজেই ছুটে নেমে গেল নিচে। বাড়িউলির সঙ্গে রাজুমিখিনের কী কথা হয় তা জানার জন্য এতটুকু তর সইছিল না। তাছাড়া মোটের ওপর দেখাই যাচ্ছিল রাজুমিখিন তাকে সম্পূর্ণ বশ করে ফেলেছে।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে নাস্তাসিয়া চলে যেতে না যেতে রোগী তার গা থেকে লেপ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আধাপাগলের মতো একলাফে শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ল। এতক্ষণ সে ছটফট করছিল, কাঁপতে-কাঁপতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল কখন সকলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়— ওর আশা ছিল, ওদের অনুপস্থিতির সুযোগে কালবিলম্ব না করে সে কাজে হাত দেবে। কিন্তু সেটা কী? কী সেই কাজটা? —বেছে-বেছে যেন ঠিক এই মুহূর্তটিতেই সে ভুলে গেল। 'হা ভগবান! আমায় শুধু একটি কথাই বল : ওরা কি সব জেনে ফেলেছে? নাকি এখনও জানে না? আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে ওরা ইতিমধ্যেই জানে। বলা যায় না এতক্ষণ যখন আমি শুয়ে আছি তখন কেবল ভান করছে যে কিছুই জানে না? কিন্তু আড়ালে আমাকে ভেংচি কাটছে? পরে হয়ত হঠাৎ একসময় সকলে মিলে ঘরে ঢুকে বলবে সব তারা অনেক আগে থেকে জানে, এতদিন তারা কেবল অমনি... এখন তাহলে কী করা? এই তো ভুলে গেলাম,

বেছে-বেছে ঠিক এখনই হঠাৎ করে ভুলে গেলাম, অথচ কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছিলাম!...'

হতভম্ব হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল ঘরের মাঝখানে, মনের জ্বালায় ছটফট করতে-করতে উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল ঘরের চারপাশে। দরজার দিকে এগিয়ে গেল, দরজা ফাঁক করে কান পাতল।... উঁহু যা করবে বলে ভাবছিল এটা তা নয়। পরক্ষণে হঠাৎই মনে পড়ে যেতে সে ছুটে গেল ঘরের কোনায়, যেখানে মেঝের কাছে ওয়ালপেপারের ছেঁড়া জায়গাটায় কোটর মতো ছিল। সবকিছু খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল, ভেতরে হাত গলিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করল।... কিন্তু না, এটাও তা নয়। চুল্লির কাছে গেল, চুল্লির মুখের ঝাঝরি ফাঁক করে ছাইয়ের গাদার ভেতরে হাতড়াল— পাতলুনের নিচের অংশের সেই ছেঁড়া কুচি আর উপড়ে ফেলা পকেটের সেই টুকরো কাপড়টা যেমন সে তখন ফেলে দিয়েছিল তেমনি গড়াগড়ি যাচ্ছে ওখানে।... তার মানে, কারও নজরে পড়েনি! এমন সময় ওর মনে পড়ে গেল মোজার কথা। রাজুমিখিন এইমাত্র তার উল্লেখ করেছিল। ঠিকই তো, ওটা সোফায়, লেপের তলাতেই পড়ে আছে। কিন্তু ওই সময়ের পর থেকে ঘষা খেয়ে আর নোংরা লেগে এমন হাল হয়েছে যে অবশ্যই কিছু নজরে না পড়ার কথা জামিওতভের।

'ও হ্যাঁ, জামিওতভ্! ... পুলিস স্টেশন!.... আচ্ছা পুলিস স্টেশনে আমার ডাক পড়ল কেন? সমন কোথায়? ধুৎ!... আমি ঘুলিয়ে ফেলছি!... সে তো তখনকার কথা! তখনও তো আমি মোজাটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখেছি, কিন্তু এখন তো আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তাহলে জামিওতভ্ এসেছিল কী করতে? রাজুমিখিনই বা ওকে নিয়ে এসেছিল কী কারণে?...' নির্জীবভাবে বিড়বিড় করে বলতে-বলতে সে ফের সোফায় গিয়ে বসল। 'কিন্তু এটা কী ব্যাপার? এ কি সত্যি? নাকি আমি এখনও বিকারের ঘোরে আছি? কিন্তু না, মনে হচ্ছে সত্যিই।... ও হ্যাঁ মনে পড়েছে, পালাতে হবে। শিগ্গির পালাতে হবে। এক্ষুনি অবশ্যই পালাতে হবে, অবশ্যই! ঠিক কথা, ...কিন্তু পালিয়ে যাব কোথায়? ও হ্যাঁ, আমার ওভারকোটটা কোথায়? জুতোজোড়াও দেখছি না! সরিয়ে নিয়েছে! লুকিয়ে রেখেছে! বুঝতে পারছি! ও, এই তো আমার ওভারকোট।... ওদের চোখ এড়িয়ে গেছে! টেবিলের ওপর কিছু টাকাপয়সাও আছে দেখছি।...ভগবানকে ধন্যবাদ! আর এই যে হ্যান্ডনোটটা।... টাকাপয়সাগুলো নিয়ে এখান থেকে সরে পড়ব। অন্য জায়গায় ফ্ল্যাট ভাড়া নেব, ওরা খুঁজে বার করতে পারবে না! ... কিন্তু ভাড়া নিলেই তো রেজিস্ট্রি অফিসে নাম-ঠিকানা লেখাতে হবে। ঠিক খুঁজে বের করবে! রাজুমিখিন ঠিক বের করে ফেলবে। তার চেয়ে বরং একেবারে পালিয়ে... দূরে কোথাও... আমেরিকায়... ব্যস আর পরোয়া করতে হবে না ওদের কারও। হ্যান্ডনোটটাও নেওয়া যেতে পারে... ওখানে কাজে লাগবে। আর কী নেওয়া যায়? ওরা ভাবছে আমি অসুস্থ! ওরা জানেই না যে

আমার হাঁটার ক্ষমতা আছে, হে- হে- হে!... আমি চোখ দেখেই আন্দাজ করতে পেরেছি ওরা সব জানে! এখন সিঁড়ি দিয়ে কোনরকমে নিচে নামতে পারলেই হল! কিন্তু ওখানে যদি ওদের কোন পাহারাদার থাকে, যদি পুলিস থাকে? আরে, এটা কী? চা? এই যে বীয়ারও দেখছি রয়ে গেছে আধ বোতলটাক— বেশ ঠাণ্ডা!'

বোতলটা সে তুলে নিল। বোতলে তখনও বীয়ার পড়েছিল পুরো এক গেলাস পরিমাণ। এক নিঃশ্বাসে পরম তৃপ্তিভরে বীয়ারটা শেষ করে সে যেন তার বুকের ভেতরের জ্বালা মেটাল। কিন্তু মিনিটখানেক যেতে না যেতে বীয়ারের ঝাঁঝ তার মাথার ভেতরে জোর ধাক্কা মারল, শিরদাঁড়ায় খেলে গেল এমন একটা মৃদু শিরশির ভাব যে তাতে আরামই লাগল। এবারে সে শুয়ে লেপটা গায়ের ওপর টেনে দিল। ভাবনাচিন্তাগুলো অমনিতেই ছিল অসুস্থ, অসংলগ্নও, এখন যেন ক্রমে আরও বেশি করে তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। দেখতে-দেখতে হালকা, মধুর তন্দ্রা এসে গেল। এক ধরনের আরাম উপভোগ করতে-করতে সে বালিশে মাথা রাখার ঠাঁই করে নিল। আগেকার ছেঁড়াখোঁড়া ওভারকোটের জায়গায় যে নরম তুলোর লেপটা তখন তার গায়ে ছিল বেশ জুত করে সেটা গায়ে জড়াল। মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে চোখ বুজে এলো। গভীর, গাঢ় সেই নিদ্রা তাকে সুস্থ করে তুলল।

কে যেন ঘরে ঢুকল— আওয়াজ কানে আসতে তার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলে দেখতে পেল দরজা হাট করে খুলে চৌকাটে দাঁড়িয়ে আছে রাজুমিখিন— ইতস্তত করছে ঢুকবে কি ঢুকবে না। রাস্‌কোলনিকভ্ চটপট সোফায় উঠে বসে তার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন কিছু একটা মনে করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

"ও, ঘুমোচ্ছ না। এই যে আমি এসে গেছি! নাস্তাসিয়া, এদিকে নিয়ে এসো দেখি পোঁটলাটা!" সিঁড়ির নিচের দিকে তাকিয়ে রাজুমিখিন হাঁক দিল। "এবারে হিসেব-নিকেশের পালা।..."

"কটা বাজে?" শঙ্কিত হয়ে চারদিকে দৃষ্টিপাত করতে-করতে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ জিগ্‌গেস করল।

"ওঃ, জোর ঘুম দিয়েছ ভাই! বাইরে ঘোর সন্ধে, ছ'টা আন্দাজ হবে। ছয় ঘণ্টারও বেশি ঘুমিয়েছ।..."

"বল কি! কী করে হল!..."

"তাতে কী আছে? মনের সুখে ঘুম মার! তাড়াহুড়োর কী আছে? কোন মেয়ের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে নাকি? এখন পুরোটা সময়ই আমাদের হাতের মুঠোয়। আমি ইতিমধ্যে ঘণ্টা তিনেক তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। বারদুয়েক এসেছিলাম — দেখলাম তুমি ঘুমোচ্ছ। জোসিমভের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম দু'বার— বাড়ি নেই। নেই তো নেই! ও কিছু না, ঠিকই আসবে!... নিজের ছোটখাটো কাজের ব্যাপারেও একটু বাইরে যেতে হয়েছিল। আমি আজই উঠে এসেছি, একেবারে উঠে

এসেছি আমার কাকার সঙ্গে। আমার সঙ্গে এখন আমার এক কাকা থাকেন, বুঝলে।... সে যাগ গে! এবারে কাজের কথা।... নিয়ে এসো এদিকে পোঁটলাটা, নাস্তাসিয়া লক্ষ্মীটি আমার। এই যে আমরা এবারে... তা কেমন বোধ করছ ভাই?"

"আমি সুস্থ! আমার কোন অসুখ নেই।... তুমি কত সময় হল এখানে আছ, রাজুমিখিন?"

"বলছি না, তিন ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি।"

"না, কিন্তু তার আগে?"

"তার আগে আবার কী?"

"কোন্ সময় থেকে তুমি এখানে আসা-যাওয়া করছ?"

"বা, আমি তো তোমাকে আগেই সব বলেছি। নাকি তোমার মনে নেই?"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ চিন্তা করতে লাগল। এই কিছুদিন আগের ঘটনাগুলো স্বপ্নের মতো আবছা-আবছা ভাসতে লাগল তার সামনে। কারও সাহায্য ছাড়া একা তার সামর্থ্য হল না মনে করার। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রাজুমিখিনের দিকে।

"হুম্!" রাজুমিখিন বলল। "ভুলে গেছ! এই কিছুক্ষণ আগেও আমার মনে হচ্ছিল তুমি এখনও নিজের বশে নেই। এখন ঘুমোনোর ফলে সুস্থ হয়ে উঠেছ।... ঠিকই, তোমাকে অনেক ভালো দেখাচ্ছে। এই তো চাই! ও হ্যাঁ, কাজের কথা! এই এক্ষুনি মনে করতে পারবে। এদিকে তাকাও দেখি পেয়ারের দোস্ত আমার!"

রাজুমিখিন পোঁটলা খুলতে শুরু করল। বোঝাই যাচ্ছিল এটাই এখন তার বড় বেশি আগ্রহের বিষয়।

"বিশ্বাস কর ভাই, এই বিষয়টা আমার মনের মধ্যে বিশেষ করে খচখচ করছিল। কেননা তোমাকে মানুষের মতো করে তোলা দরকার। শুরু করা যাক। ওপর থেকেই শুরু করি। এই যে টুপিটা দেখছ? সস্তার হলেও দস্তুরমতো ভালো, দেখতে খুবই সাধারণ একটা টুপি", পোঁটলার ভেতর থেকে বের করতে-করতে সে বলল। "নাও, মেপে দেখা যাক!"

"থাক, পরে হবে," বিরক্তির সঙ্গে হাত নাড়িয়ে সরিয়ে দিয়ে বলল রাস্‌কোল্‌নিকভ্।

"না ভাই রোদিয়া, আর বাধা দিও না। পরে দেরি হয়ে যাবে। তাছাড়া সারা রাত আমার ঘুম হবে না, কেন না মাপ না নিয়ে আন্দাজে কিনেছি।... আহা, ঠিক মাপসই হয়েছে!" টুপিটা ওর মাথায় দিয়ে মেপে দেখার পর সোল্লাসে সে বলে উঠল। "ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত! পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে সবার ওপরে জায়গা হল শিরোভূষণের— এ হল একধরনের সুপারিশপত্র। যেমন ধর, আমার বন্ধু তল্‌স্তিকোভ্। যাকে বলা হয় পাব্লিক প্লেস, সেখানে দশজনে টুপিটাপা পরে থাকলেও সে কিন্তু মাথার ঢাকনা খুলে ফেলতে বাধ্য হয়। লোকে ভাবে এটা তার একধরনের

দাস মনোবৃত্তি। কিন্তু কারণটা স্রেফ এই যে মাথার ওই পাখির বাসাটাতে তার বড় লজ্জা।...এতই লাজুক স্বভাবের মানুষ সে! এখানে দেখ তো নাস্তাসিয়া,... এই ধর তোমার দু ধরনের শিরোপা : এই পামারস্টোন..." রাস্‌কোল্‌নিকভের টুটোফাটা গোলাকার সেই হ্যাটটাকে, কেন যেন সে 'পামারস্টোন' আখ্যা দিয়েছিল। কোনা থেকে সেটা বার করে এনে সে বলল, "নাকি এই দামি হাতের কাজটা? আন্দাজ কর দেখি রোদিয়া... তোমার কী মনে হয় , কত দাম দিয়েছি এর জন্যে? কী গো নাস্তাসিয়া, তোমার কী ধারণা?" রাস্‌কোল্‌নিকভ চুপ করে আছে দেখে নাস্তাসিয়াকেই সে জিগ্‌গেস করল।

"বিশ কোপেক মতো দিয়েছ বোধহয়," নাস্তাসিয়ার জবাব।

"বিশ কোপেক! বলে কী! আচ্ছা বোকা তো!" অসন্তুষ্ট হয়ে সে খেঁকিয়ে উঠল। "আরে যা দিনকাল পড়েছে তাতে বিশ কোপেকে তো তোমাকেও কেনা যাবে না। আশি কোপেক এর দাম! তাও আবার ব্যবহার করা বলে। তবে হ্যাঁ সেইসঙ্গে গ্যারান্টিও আছে : এটা ছিঁড়ে গেলে পরের বছর আরেকটা মাগনায় দেবে, মাইরি বলছি! আচ্ছা, এবারে ধরা যাক পাতলুন। আগে থেকেই বলে রাখি, এই পাতলুন নিয়ে আমি বড়াই করতে পারি!" এই বলে রাস্‌কোল্‌নিকভের সামনে সে ভাঁজ খুলে রাখল হালকা পশমি কাপড়ের তৈরি, গরমকালে পরার উপযোগী ছাইরঙা একটা পাতলুন। "কোথাও কোন ফুটোফাটা নেই, দাগ নেই, সেকেন্ড হ্যান্ড হলে কী হবে, দিব্যি ভালো বলা চলে। ওয়েস্টকোটটাও তাই— একই রঙের, একেবারে কেতামাফিক। তাছাড়া ব্যবহার করা হয়েছে তো কী হয়েছে? — বরং সত্যি বলতে গেলে কি ভালোই— এতে পরতে আরও নরম আর মোলায়েম লাগবে।... বুঝলে রোদিয়া, এই পৃথিবীতে কাজে উন্নতি লাভ করতে গেলে, আমার মতে, সবসময় ঋতুর সঙ্গে তাল রেখে চলা উচিত, জানুয়ারিতে যদি আস্পারাগাস না চাও তাহলে পকেটের কিছু পয়সা বাঁচাতে পারবে। এগুলো কেনার ব্যাপারেও তাই। এখন গরমকাল, তাই গরমকালের জিনিসই কিনেছি। শরৎকালে অমনিতেই বেশি গরম কাপড়ের দরকার হবে, তখন এগুলো ফেলে দিতে হবে।... তাছাড়া ওইসময়ের মধ্যে এগুলো বরবাদও হয়ে যাবে— বিলাসিতার বাসনা বেড়ে যাবার ফলে যদি নাও হয়, জিনিসটার ভেতরে গলদ দেখা যাওয়ার দরুন তো বটেই। এবারে আন্দাজ কর দেখি! কত হতে পারে বলে মনে হয়? দু'রুবল পঁচিশ কোপেক! মনে রেখো কিন্তু এবারে, সেই আগের শর্তে : এটা ছিঁড়ে গেলে পরের বছর আরেকটা পাবে মাগনায়! ফেদিয়ায়েভের দোকানে একবার কোন জিনিসের দাম চুকিয়ে দিলে তো সারা জীবনের মতো নিশ্চিন্ত, যেহেতু এটাই দস্তুর— তা নইলে তুমি ওপথে আর পা মাড়াবে! আচ্ছা, এবারে জুতো দেখা যাক— কেমন মনে হচ্ছে? দেখাই যাচ্ছে অবশ্য যে ব্যবহার করা, কিন্তু মাসদুয়েক তো চলবেই। বিদেশী কারিগরের হাতের কাজ বলে

কথা! বিদেশী মাল। ইংলন্ডের এম্বাসির সেক্রেটারি গত সপ্তাহে পুরানো বাজারে ছেড়েছে। মাত্র ছয়দিন পরেছে, টাকার বড় দরকার পড়ে গিয়েছিল। দাম এক রুবল পঞ্চাশ কোপেক। সুবিধায় পেয়েছি, কী বল?"

"কিন্তু পায়ে নাও লাগতে পারে তো!" নাস্তাসিয়ার মন্তব্য।

"পায়ে লাগবে না মানে! তাহলে এটা কী?" এই বলে পকেট থেকে টেনে বার করল রাস্‌কোল্‌নিকভের একপাটি পুরানো জুতো— আগাগোড়া শুকনো কাদায় মাখা, চড়চড়ে, টুটোফাটা। "হুঁ হুঁ বাবা, তৈরি না হয়ে কি আর গিয়েছিলাম! এই বিদ্‌ঘুটে জিনিসটা দিয়েই ওরা সত্যিকারের মাপ ঠিক উদ্ধার করেছে। পুরো কাজটা দরদ দিয়ে করা। ভেতরের কাপড়-জামা ও টুকিটাকির ব্যাপারে তোমার বাড়িউলির সঙ্গে কথা বলে একটা বন্দোবস্ত করেছি। এই যে, প্রথমত, তিনটে শার্ট— কাপড় মোটা বটে, তবে ওপরটা বেশ কায়দাদুরস্ত। ... এবারে হিসেব করা যাক— টুপি আশি কোপেক, অন্যান্য পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি দু'রুবল পঁচিশ— একুনে তিন রুবল পাঁচ কোপেক। এক রুবল পঞ্চাশ হল গিয়ে একজোড়া জুতো— কেননা খুবই ভালো।... মোট চার রুবল পাঁচ কোপেক, আর ভেতরের জামাকাপড় ইত্যাদি টুকিটাকি পাঁচ রুবল। পাওয়া গেছে পাইকারি দরে। সব মিলিয়ে দাঁড়াচ্ছে ঠিক নয় রুবল পঞ্চাশ কোপেক। ফেরত পঁয়তাল্লিশ কোপেক... পাঁচ কোপেকের তামার পয়সায়... এই যে অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করুন। তাহলে রোদিয়া, এখন পুরো স্যুটেবুটে তোমাকে পুনরুদ্ধার করা গেছে আর তোমার ওভারকোট আমার মতে এখনও তোমাকে সেবা করতে পারে। এমনকি তার একটা নিজস্ব অভিজাত চেহারাও আছে। শার্মারের কাছে ফরমাস দিয়ে বানানোর অর্থ কী বুঝতে পারছ এখন? মোজাটোজার ব্যাপার আমি ছেড়ে দিচ্ছি তোমার নিজের ওপর। আমাদের টাকা থেকে যাচ্ছে পঁচিশ রুবল। পাশেন্‌কা বা বাড়িভাড়ার ব্যাপারে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি তো তোমাকে বলেইছি— ঋণ শোধের কোন বাঁধাধরা মেয়াদ নেই। আচ্ছা, এখন ভাই, অনুমতি দিলে তোমার ভেতরের জামাটা পালটাই। বলা তো যায় না হয়ত গায়ের ওই জামাটাই তোমার রোগের ডিপো।..."

"রাখো দেখি! আমার বয়ে গেছে!" রাজুমিখিনের মুখে জামাকাপড় কেনার উত্তেজনাপূর্ণ ও কৌতুকাবহ বৃত্তান্ত শুনে বিরক্ত রাস্‌কোল্‌নিকভ্ হাত নেড়ে প্রস্তাবটা বাতিল করে দিয়ে বলল।

"তা হয় না ভাই। তাহলে আর জুতো ক্ষয় করলাম কেন।" রাজুমিখিন নাছোড়বান্দা। "নাস্তাসিয়া, লক্ষ্মীটি আমার, লজ্জা না করে আমায় একটু সাহায্য কর দেখি— এই যে, এভাবে!" বলতে-বলতে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বাধা দেওয়া সত্ত্বেও সে তার জামা পালটে ফেলল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ধপ করে বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল। মিনিটদুয়েক গোঁজ হয়ে রইল।

'আর কতক্ষণ লেগে থাকবে এরা।' সে মনে-মনে ভাবল। শেষকালে দেয়ালের

দিকে তাকিয়েই জিগ্‌গেস করল, "কোন্ টাকায় এসব কেনা হল?"

"টাকা? নাও ঠ্যালা! তোমার নিজেরই টাকা থেকে। এই যে কিছু আগে ভাখ্রুশিনের কাছ থেকে সমবায়ের একজন লোক এসেছিল না! তোমার মা পাঠিয়েছেন। এটাও ভুলে গেলে নাকি?"

"এখন মনে পড়ছে..." গুম হয়ে বেশ খানিকক্ষণ চিন্তা করার পর রাস্‌কোল্‌নিকভ বলল। রাজুমিখিন উদ্বিগ্ন হয়ে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগল তাকে।

দরজা খুলে গেল। ঘরে এসে ঢুকল হৃষ্টপুষ্ট গড়নের এক দীর্ঘকায় পুরুষ। একে দেখেও রাস্‌কোল্‌নিকভের কেমন যেন চেনাচেনা মনে হল।

"জোসিমভ্! শেষকালে এলে তাহলে!" সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল রাজুমিখিন।

চার

জোসিমভ দীর্ঘকায়, মেদবহুল। ফেকাসে বিবর্ণ ফোলা মুখ—নিখুঁত কামানো। মাথার চুল সিধে, পাটরঙা। চোখে চশমা, হাতের পুরুষ্টু একটা আঙুলে বেশ বড়সড় একটা সোনার আঙটি। তার বয়স বছর সাতাশ। গায়ে গরমকালের হাল্‌কা ওভারকোট—ঢিলেঢালা, কায়দাদুরস্ত। পাতলুনও গরমকালের, হালকা রঙের। মোটকথা, তার পরনে যা যা ছিল সবই ঢিলেঢালা, কায়দা দুরস্ত, আনকোরা। ভেতরের জামাটাও নিখুঁত, পকেটঘড়ির চেইনটা বেশ ভারী। তার ভাবভঙ্গি ধীরস্থির—খানিকটা যেন শ্লথ, অথচ পরিশীলিত, সহজ স্বচ্ছন্দ। দাম্ভিকতা সে কষ্ট করে চাপা দেয়, তবুও প্রতি মুহূর্তেই প্রকট। তার চেনাজানা সকলেই তাকে জানে কড়া ধাঁচের লোক বলে, তবে স্বীকার করে যে সে তার নিজের কাজ জানে।

"আমি ভাই তোমার কাছে দু'বার গিয়েছিলাম।... দেখছ, জ্ঞান ফিরে এসেছে!" রাজুমিখিন চেঁচিয়ে উঠল।

"দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এখন কেমন বোধ হচ্ছে?" রাস্‌কোল্‌নিকভের ওপর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে লক্ষ করে এই কথা বলতে-বলতে জোসিমভ্ সোফার একপ্রান্তে তার পায়ের দিকটায় বসে পড়ল, সঙ্গে-সঙ্গে সেখানেই যতদুর সম্ভব গাও এলিয়ে দিল।

"সব সময় মনমরা হয়ে আছে," রাজুমিখিন বলল। "ওর গায়ের জামা পালটেছি আমরা, তখন প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি।"

"বুঝলাম। নিজে যখন চাইছিল না তখন জামাটা পরে পালটালেও চলত।... নাড়ি চমৎকার চলছে। মাথা এখনও একটু ব্যথা করছে কি?"

"আমি সুস্থ। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ!" গোঁ ধরে বিরক্তির সুরে এই বলে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ হঠাৎ চোখ পাকিয়ে ধড়মড় করে সোফায় উঠে বসল, কিন্তু পরক্ষণেই

আবার বালিশের ওপর গড়িয়ে পড়ে দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে পড়ল। জোসিমভ্ একাগ্র দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ করতে লাগল।

"খুব ভালো কথা।... সব যেমন হওয়া উচিত তেমনি চলছে দেখছি," আল্‌স্যজড়িত কণ্ঠে সে বলল। "কিছু খাওয়া হয়েছে কি ?"

রোগীকে কী কী খেতে দেওয়া হয়েছিল রাজুমিখিন তার ফিরিস্তি দিল, কী দেওয়া যায় তাও জিগ্‌গেস করল।

"যা খুশি দেওয়া যেতে পারে।... স্যুপ, চা... যা খুশি।... তবে হ্যাঁ, বলাই বাহুল্য শসা, মাশরুম— এসব চলবে না। আর মাংসও দরকার নেই... তাছাড়া হ্যাঁ, অত বলারই বা কী আছে! " কথা বলতে-বলতে তার দৃষ্টিবিনিময় হল রাজুমিখিনের সঙ্গে। "মিক্‌সচার- টিক্‌সচার ওসব এখন থাক। কাল এসে একবার দেখে যাব।... হয়ত বা আজই... ঠিক আছে, দেখা যাবে।"

"কাল সন্ধ্যায় ওকে নিয়ে একবার বেড়াতে বের হব ভাবছি," রাজুমিখিন তার সিদ্ধান্ত জানাল। "প্রথমে ইউসুপভ্‌দের বাগান, তারপর 'পালে দ্য ক্রিস্টাল' যাব।"

"আগামীকাল আমার মতে, ওকে না নড়ানোই ভালো। তবে একটু-আধটু...তা... অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।"

"ইস কী আফসোসের কথা! আজকেই আমি গৃহপ্রবেশ করছি। এখান থেকে দুপা দূরে।... ওকেও পেলে মন্দ হত না। সোফায় আমাদের মাঝখানে না হয় শুয়েই থাকত! তুমি আসছ তো?" হঠাৎ জোসিমভের দিকে ফিরে বলল রাজুমিখিন। "দেখো, ভুলে যেও না, কথা দিয়েছ কিন্তু।"

"সম্ভবত একটু দেরি করে আসব, কেমন? কী আয়োজন করেছ বল দেখি।"

"বিশেষ কিছু না। চা, ভোদকা, হেরিং মাছ, মাছ-মাংসের পুর দেওয়া কিছু খাবার। যারা আসবে সবই নিজেদের লোক।"

"কারা, শুনি না?"

"সবই স্থানীয়, প্রায় সবই নতুন, অবশ্য আমার কাকা বাদে... পুরানো লোক বলতে একমাত্র তিনি। তবে তাঁকেও নতুন বলতে পার। সবে গতকাল সেন্ট পিটার্সবুর্গে এসেছেন কী একটা কাজের উপলক্ষে। আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয় পাঁচ বছরে একবার।"

"উনি কী করেন?"

"সারাটা জীবন মফস্বলে পোস্টমাস্টারের চাকরি করে শুয়ে-বসে কাটিয়েছেন। সামান্য একটা পেনশন পান। পঁয়ষট্টি বছর বয়স। তাঁর সম্পর্কে বলার মতো বিশেষ কিছু দেখছি না।... তবে আমি ওঁকে ভালোবাসি। আসবেন পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ্। তিনি এখানকার তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট, ... আইনজ্ঞ। আরে তুমি তো জানই তাঁকে..."

"তিনিও তোমার কোন আত্মীয় নাকি?"

"খুবই দূর সম্পর্কের কিছু একটা। কিন্তু তুমি অমন ভুরু কোঁচকাচ্ছ কেন? একবার তোমার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল, এই কারণে তুমি আসবে না তা কি হতে পারে?"

"থোড়াই পরোয়া করি ওর..."

"তাহলে তো আরও ভালো কথা। এছাড়া থাকবে জনাকয়েক ছাত্র, একজন স্কুল টিচার, একজন সরকারি আমলা, একজন বাজিয়ে, পুলিস অফিসার জামিওতভ্..."

"আচ্ছা, দয়া করে আমাকে বলবে কি তোমার এবং এই ওর..." মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে রাস্কোল্নিকভ্কে দেখিয়ে সে বলল, "... কী এমন সাধারণ যোগসূত্র থাকতে পারে জামিওতভের মতো মানুষের সঙ্গে?"

"না, তোমাদের মতো খুঁতখুঁতেদের নিয়ে আর পারা গেল না! আর হয়েছে ওই তোমাদের যত নীতি!... তুমি নিজে তো আষ্টেপৃষ্ঠে ওই নীতির সঙ্গে আঁটা—নীতির বাইরে নিজের ইচ্ছেমতো ঘাড় পর্যন্ত ঘোরানোর সাধ্যি নেই। আমার মতে, একজন লোক যদি ভালো হয় নীতি বলতে তার চাইতে বেশি আর কী চাই! এর বেশি কিছু জানারও দরকার নেই আমার। জামিওতভ্ চমৎকার মানুষ।"

"ধান্দাবাজ বটে।"

"হোক গে ধান্দাবাজ। তাতে আমার কী? ধান্দাবাজ যদি হয়েই থাকে তাতে কী?" হঠাৎ রাজুমিখিন যেন আস্বাভাবিকরকম ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে উঠল। "ও যে ধান্দাবাজ এই বলে কি আমি তোমার কাছে ওর গুণকীর্তন করেছি? আমি শুধু বলেছি লোকটা তার নিজস্ব ধরনে ভালো! তাছাড়া সরাসরি সবদিক থেকে বিচার করতে গেলে ভালো লোক ক'টা পাওয়া যায় বল তো? আমার তো দৃঢ়বিশ্বাস সেক্ষেত্রে আমার দেহের ভেতরের সমস্ত যন্ত্রপাতি সমেত আমার জন্যে একটা পিঁয়াজির বেশি দাম কেউ দিতে রাজি হবে না — তাও সেইসঙ্গে তোমাকে ফাউ পেলে!..."

"এটা কম হল। আমি তোমার জন্যে দুটো দিতে পারি।..."

"আমি তোমার জন্যে একটার বেশি দিতে পারি না। কর আরও রসিকতা! জামিওতভ্ এখনও বাচ্চা ছেলে। আমি সময়মতো ওর চুলের মুঠি ধরে টেনে উদ্ধার করব। ওকে ঠেলে দূরে সরিয়ে না দিয়ে কাছে টানা দরকার । কাউকে দূরে সরিয়ে দিলে তাকে শোধরানো যায় না, বিশেষ করে সে যদি অল্পবয়সী হয়। অল্পবয়সীদের সঙ্গে দ্বিগুণ সাবধানী হতে হয়। আরে ছোঃ, তোমরা যত মাথামোটা প্রগতিশীলের দল— কিছুই বোঝ না! মানুষকে শ্রদ্ধা করতে শেখোনি, নিজেকেও অশ্রদ্ধা কর।... তবে নেহাতই যদি জানতে চাও তাহলে বলি এক ব্যাপারে আমাদের দুজনেরই একটা স্বার্থ আছে বটে।"

"সেটা কী? জানতে পারি কি?"

"রং আর চুনকামের মিস্ত্রিকে নিয়ে সেই ব্যাপারটা।... লোকটাকে বের করে আনবই আমরা! তাছাড়া হ্যাঁ, এখন আর কোন বিপদ নেই। মামলাটা এখন একেবারে পরিষ্কার, জলের মতো পরিষ্কার! আমাদের শুধু একটু চাপ দিতে হবে এই যা।"

"কিসের রং আর চুনকামের মিস্ত্রি?"

"কেন, আমি বলিনি তোমাকে? না? ও হ্যাঁ... কেবল শুরুটা তোমাকে বলেছিলাম।... ওই যে সেই কেরানির বিধবা স্ত্রী বন্ধকের কারবারি বুড়ির খুন হওয়ার ঘটনাটা... তা এখন একজন রংয়ের মিস্ত্রিকে তার সঙ্গে জড়ান হয়েছে।..."

"আরে সেই খুনের কথা তুমি বলার-আগেই আমি শুনেছি। ব্যাপারটাতে আমার আগ্রহও আছে... বিশেষত একটা কারণে... তাছাড়া কাগজেও পড়েছি! কিন্তু এটা..."

"জান, লিজাভেতাও খুন হয়েছে!" রাস্‌কোলনিকভ্‌কে লক্ষ করে নাস্তাসিয়া ফস্‌ করে বলে উঠল, এতক্ষণ সে ঘরের ভেতরেই ছিল। দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিল।

"লিজাভেতা?" বিড়বিড় করে এত নিচু গলায় রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ বলল যে তার কথা প্রায় শোনাই গেল না।

"সেই যে পুরানো জামাকাপড় বেচত লিজাভেতা— তাকে জানতে তো? আমাদের এখানে নিচে আসত। তোমার একটা জামাও একবার রিফু করে দিয়েছিল।"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। সেখানে ছোট-ছোট সাদা ফুলে ছাপা হলদে নোংরা ওয়ালপেপারটা থেকে রঙের হিজিবিজি কাটা একটা বিতিকিচ্ছিরি ধরনের ফুল বেছে নিয়ে সেটাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল : গুনতে শুরু করল ওটার কটা পাপড়ি, পাতায় কটা খাঁজ আছে, ক'টাই বা রেখা আছে তার গায়। সে অনুভব করছিল যে তার হাত-পা অবশ হয়ে আসছে, যেন খসে পড়ে যাচ্ছে, তবু নড়াচড়ার এতটুকু চেষ্টা না করে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ফুলটার দিকে।

"তা কী হল সেই রঙের মিস্ত্রির?" বেশ খানিকটা বিরক্তির সঙ্গে জোসিমভ্‌ বলে উঠতে নাস্তাসিয়া তার বকবকানিতে বাধা পেল। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপ করে গেল।

"কী আবার হবে? তাকেও খুনির দলে ফেলেছে!" উত্তেজিত হয়ে রাজুমিখিন বলল।

"কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে কি?"

"কচুর সাক্ষ্যপ্রমাণ! সাক্ষ্যপ্রমাণের কথাই যদি উঠল তো বলি।.. সাক্ষ্যপ্রমাণ বলে যাকে ধরা হচ্ছে সেটা কোন সাক্ষ্যপ্রমাণই নয়। প্রমাণ করে দেখাতে হবে তো ! হুবহু এরকমটাই হয়েছিল গোড়ায়, যখন তারা সন্দেহবশত ধরেছিল ওই ওদের... কী যেন ওদের নাম... হ্যাঁ, কোখ্‌ আর পেস্ত্রিয়াকভ্‌কে। ছি! এমন মূর্খের মতো সব কাজকর্ম করে! এমন কি এর সঙ্গে যার কোনও সম্পর্ক নেই তারও গা রি-রি করে উঠবে!

পেস্ত্রিয়াকভ্ আজ আমার ওখানে একবার আসতেও পারে। ... হ্যাঁ, প্রসঙ্গত বলি রোদিয়া, তুমি নিশ্চয়ই ঘটনাটা জান। ... তুমি অসুখে পড়ার আগেই ঘটেছিল। যেদিন পুলিস স্টেশনে এই নিয়ে আলোচনার সময় তুমি অজ্ঞান হয়ে গেলে ঠিক তার আগের দিনের ঘটনা।..."

জোসিমভ্ কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল রাস্‌কোল্‌নিকভের দিকে। কিন্তু রাস্‌কোল্‌নিকভের নড়াচড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

"বুঝলে রাজুমিখিন, তোমাকে দেখি আর ভাবি অন্যের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে তুমি ওস্তাদ," জোসিমভ্ মন্তব্য করল।

"তা হোক, যাই বল না কেন ঠিক বের করে আনব লোকটাকে!" টেবিলে ঘুষি মেরে রাজুমিখিন গলা ফাটাল। "এখানে সবচেয়ে আপত্তিকর বিষয়টা কী জান? তারা যে মিছে কথা বলছে এটা নয়। মিথ্যেকে যে কোন সময় ক্ষমা করা যেতে পারে। মিথ্যেটা বেশ ভালো জিনিসই বলব বরং, যেহেতু তা তোমাকে সত্যের সন্ধান দেয়। না না, দুঃখের বিষয় এই যে তারা মিথ্যে তো বলেই আবার নিজেদের সেই মিথ্যেকে পুজোও করে। আমি পর্‌ফিরিকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু... যেমন ধর, একেবারে গোড়াতে কিসে তারা সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে গেল? দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, অথচ ওরা যখন দারোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে এলো, দেখা গেল খোলা। তার মানে দাঁড়াচ্ছে কোখ্ আর পেস্তিয়াকভ্ই খুন করেছে! এই হল ওদের যুক্তি।

"আরে অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? ওদের স্রেফ হাজতে ধরে রাখা হয়েছিল। তাতে তো আর... ও হ্যাঁ বলি ... এই কোখের সঙ্গে কিন্তু আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। লোকটা বুড়ির কাছ থেকে মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়া বন্ধকের জিনিস কিনত, ঠিক কিনা?"

"ঠিক তাই। মহাধড়িবাজ। তমসুকও কেনে লোকটা। খালি ধান্ধা। তা মরুক গে ব্যাটা! কিন্তু আমার রাগ কী জন্যে বুঝতে পারছ? ওদের ওই ঝরঝরে ওঁছা গতানুগতিক রুটিনে আমার গা জ্বালা করে।... অথচ দেখ একমাত্র এই কাজটাতেই একটা নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। একমাত্র মনস্তাত্ত্বিক তথ্য কাজে লাগিয়েই দেখান যেতে পারে কী উপায়ে সঠিক সূত্র পাওয়া যেতে পারে। ওরা বলবে, 'আমাদের কাছে তথ্য আছে!' কিন্তু তথ্যই তো আর সব নয়। কাজের অর্ধেক অন্তত্পক্ষে নির্ভর করছে তথ্যকে ব্যবহার করতে জানার ওপর!"

"তুমি কি তথ্যকে ব্যবহার করতে জান?"

কিন্তু যখন উপলব্ধি করছ, ভেতরে-ভেতরে অনুভব করছ মামলায় হয়ত কাজে লাগতে পার, যদি... ওঃ!... তখন কী করে মুখ বুজে বসে থাকা যায় বল?...তুমি মামলাটার খুঁটিনাটি জান তো?"

"না, ওই যে রঙের মিস্ত্রির কথা বললে, সে সম্পর্কে শোনার অপেক্ষায় আছি।"

"ও, হ্যাঁ! তাহলে বলি শোন ঘটনাটা। 'খুন যেদিন হল তার ঠিক তিনদিন পরে, সকালে, তখনও ওরা কোখ্ আর পেস্ত্রিয়াকভ্‌কে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত— যদিও তারা দুজনে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের উপযুক্ত কারণ দর্শিয়েছে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে— এমন সময় প্রকাশ পেল এক অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত তথ্য। ওই বাড়ির ঠিক উলটো দিকের এক শুঁড়িখানার মালিক, দুশ্‌কিন নামে একটা লোক একজোড়া দুল সমেত গয়নার দোকানের একটা বাক্স নিয়ে পুলিস স্টেশনে এসে হাজির। সে যা বলল তা দস্তুরমতো এক কাহিনী : 'গত পরশুদিন সাঁঝের বেলায় আটটায় ঠিক পর পর কোন একসময়...' দিন আর সময়! বুঝতে পারছ? '...আমার কাছে এসেছিল এক মিস্তিরি, অঙের মিস্তিরি— মিকোলাই তার নাম— এর আগেও কয়েকবার এসেছিল দিনের বেলায়। তা সে আমার কাছে সেদিন নিয়ে এলো এই ছোট্ট বাক্সটা, সেটার ভেতরে পাথর বসানো এই সোনার দুলজোড়া। বন্ধক রেখে আমার কাছে দুটো উবল ধার চাইল। আমি যখন জিগেস করলুম : পেলি কোথায়? —তখন বললে, ফুটপাতে কুড়িয়ে পেয়েছে। এ ব্যাপারে আমি ওকে আর কিছু জিগেসবাদ করলুম না" এটা দুশ্‌কিনের মুখের কথা— 'কথা না বাড়িয়ে আমি ওর হাতে ধরিয়ে দিলুম একখানা লোট।'... একটা রুবল আর কি... 'কেননা ভাবলুম, আমার কাছে যদি বন্ধক না রাখে তো আর কারও কাছে রাখবে, একই কথা— মদ খেয়ে উড়িয়ে দেবে। তার চেয়ে বরং আমার কাছেই থাক জিনিসটা : ওই যে কথায় বলে না, রাখ দূরে, পাবে কাছে। কিছু যদি ঘটে, বা কানাঘুষো শোনা যায় তাহলে হাজির করব তক্ষুনি।' বোঝাই যাচ্ছে, যতসব গাঁজাখুরি কথা! মিথ্যে কথার জাহাজ! কেননা এই দুশ্‌কিনকে আমি জানি, নিজে বন্ধকের কারবার করে, চোরাই মাল লুকিয়ে রাখে। ত্রিশ রুবল দামের জিনিসটা সে মিকোলাইয়ের কাছ থেকে হাতিয়েছে 'হাজির করার' জন্য মোটেই নয়। আসলে ঘাবড়ে গিয়েছিল। সে মরুক গে! শোনো, দুশ্‌কিন আরও কী বলল : 'এই চাষীর ব্যাটা মিকোলাই দেমেন্‌তিয়েভকে আমি এইটুকুন বয়স থেকে জানি— আমাদের জেলার, আমাদের একই সদর— জারাইস্কের লোক— কেননা আমরা দুজনাই এসেছি রিয়াজান থেকে। মিকোলাই অবিশ্যি মাতাল বলতে ঠিক যা বোঝায় তা নয়, তবে দু'এক ফোঁটা খেতে ভালোবাসে। আমরা এও জানতুম যে ও আর মিত্রি একই সঙ্গে এই বাড়িতে কাজ করে, অঙের কাজ করে। মিত্রি আর ও আবার এক জায়গার লোক। লোটটা পেয়ে ও তক্ষুনি ভাঙিয়ে ফেলে চটপট দু গেলাস ভোদ্‌কা খেয়ে ফেললে। খুচরো পয়সাগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল। মিত্রিকে আমি সেই সময় ওর সঙ্গে দেখিনি। পরদিন আমরা শুনতে পেলুম আলিওনা ইভানোভ্‌না আর তার বোন লিজাভেতা ইভানোভ্‌নাকে কেউ কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে। ওদের জানতাম বটে। তক্ষুনি দুলের ব্যাপরাটা নিয়ে আমার ধন্ধ লেগে গেল, কেননা জানতাম যে বুড়ি জিনিস রেখে টাকা ধার দিত। গেলুম সেই বাড়িতে। খুব সাবধানে, পা টিপে-

টিপে সেখানে গিয়ে ভেতরে-ভেতরে জানার চেষ্টা করলুম, গোড়াতে জিগেস করলুম মিকোলাই ওখানে আছে কিনা। মিত্রি আমায় বললে যে মিকোলাই বাইরে আমোদ-ফুর্তি করে ঘরে ফেরে ভোরের দিকে— একেবারে মাতাল অবস্থায়। বাড়িতে ছিল আন্দাজ দশ মিনিট, তারপর আবার বেরিয়ে যায়। মিত্রি তাকে পরে আর দেখেনি, অঙের কাজ তখন সে একা শেষ করছে। ওদের কাজটা আবার সেই একই সিঁড়িতে, দোতলায়, যেখানে খুনটা হয়েছিল! এসব শোনার পর আমি কারও কাছে কিছু ফাঁস করলুম না তখনকার মতো...' —এটা দুশ্‌কিনের কথা— 'খুনের ব্যাপারে যা যা জানা যায় ভালোমতো জেনে নিলুম। বাড়ি ফিরে আবার সেই ধন্দ। তারপর আজ সকালে, আটটার সময়,' অর্থাৎ কিনা, ঘটনার দু দিন পরে... বুঝতে পারছ? 'দেখি আমার দোকানে এসে ঢুকল মিকোলাই। প্রিকিতিস্ত নয়, আবার মাতাল যে তাও বলা চলে না, কথাবার্তা বোঝার মতো জ্ঞানগম্যি দিব্যি আছে। একটা বেঞ্চিতে বসল, মুখে কোন কথা নেই। ও ছাড়া দোকানে তখন বাইরের লোক বলতে ছিল মাত্তর একজন, আর হ্যাঁ আরও একজন। সে ঘুমোচ্ছিল একটা বেঞ্চিতে। আমাদের জানাশুনো। তাছাড়া, আমাদের দুটো ছোঁড়া। জিগেস করলুম, মিত্রিকে দেখেছিস? —না, দেখিনি, সে বললে। এদিকেও আসিসনি এর মধ্যে? — না, আসিনি, তিনদিন হতে চলল, সে বললে। —গতকাল কোথায় রাত কাটালি? —পেস্‌কিতে কলোমনার কিছু ইয়ারবক্সির সঙ্গে। —ওই দুলজোড়া তখন কোথায় পেয়েছিলি ঠিক করে বল তো। —ফুটপাতে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম —আমার দিকে না তাকিয়ে কেমন যেন বেয়াড়াভাবে বলে উঠল। —বললুম, অমুক দিন সাঁঝের বেলায়, অমুক সময় ওবাড়ির ওই সিঁড়িতে কী কাণ্ড হয়েছিল, শুনেছিস? —বললে, না, শুনিনি— এদিকে শুনে ওর নিজেরই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। হঠাৎ ওর মুখ ফেকাসে হয়ে গেল ছাইয়ের মতো। তা আমি সব বেত্তান্ত ওকে বললুম । দেখি, টুপিটা তুলে নিয়ে ওঠার উদ্যুগ করছে। তখন আমি চেষ্টা করলুম ওকে আটকে রাখার।— বললুম, দাঁড়া মিকোলাই, এক পাত্তর খাবি? —সঙ্গে-সঙ্গে ছোঁড়াটাকে ইশারা করলুম দরজার পাল্লাটা আগলে রাখতে— ওপাশ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে তো আমাকে। কিন্তু তক্ষুনি ও আমার কাছ থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ল সদর রাস্তায়, তারপর ছুটে একেবারে পাশের গলিতে— সেই শেষ দেখা। তখনই আর কোন সন্দ রইল না আমার মনে, বুঝতে বাকি রইল না পাপকাজটা ও-ই করেছে।..."

"তাতে আর সন্দেহ কি!" জোসিমভ্ বলল।

"দাঁড়াও, দাঁড়াও! শেষপর্যন্ত শোন! ফলে, বলাই বাহুল্য মিকোলাইকে খুঁজে বের করার জন্যে ওরা উঠেপড়ে লাগল। দুশ্‌কিনকে আটক করল, তার বাড়িতে তল্লাশি চালাল, মিত্রিও বাদ পড়ল না। কলোম্‌নার সেই ইয়ারবক্সির ওপর দিয়েও একচোট হল। তারপর দিনদুয়েক বাদে হঠাৎ খোদ মিকোলাইও ধরা পড়ে গেল।... ধরা পড়ল

শহরের টোল গেটের কাছে এক সরাইখানায়। সেখানে এসে গলা থেকে ক্রুশটা খুলল — ওটা ছিল রুপোর— তার বদলে এক পাত্তর মদ চাইল। পেলও। এর মিনিট কয়েক বাদে একজন মেয়েমানুষ গোয়ালে ঢুকতে দেয়ালের একটা ফাটল দিয়ে দেখে কি পাশের একটা চালাঘরে মিকোলাই তার কোমরের পেটিটা খুলে কড়িকাঠে ঝুলিয়ে একটা ফাঁস তৈরি করেছে। একখণ্ড কাটা গুঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে ফাঁসটা গলায় জড়ানোর মতলব করছে। তাই দেখে মেয়েমানুষটি যা নয় তাই বলে চিৎকার জুড়ে দিল, সঙ্গে-সঙ্গে চারদিক থেকে লোকজন ছুটে এসে জড় হল। 'এই তোমার কারবার!' মিকোলাইয়ের কথা, 'আমাকে অমুক থানায় নিয়ে চল, সব কবুল করব।' ওকে সসম্মানে যথাবিহিত সমাদর সহকারে নিয়ে হাজির করা হল সেই অমুক থানায়, অর্থাৎ কিনা আমাদের থানায়। তারপর এটা-সেটা, কোথা থেকে, কে, বয়স কত— 'বাইশ' ইত্যাদি ইত্যাদি। জেরার পর জেরা... মিত্রির সঙ্গে যখন কাজ করছিলে তখন অমুক সময় সিঁড়িতে কাউকে দেখেছ কিনা। উত্তর : তা লোকজন যাওয়া-আসা হয়ত করে থাকবে, করাটা স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের সেদিকে নজর দেবার অবসর ছিল না। — কোনও শব্দ-টব্দ শুনতে পেয়েছিলে কি? —সে ধরনের বিশেষ কিছু শুনতে পাইনি। —আচ্ছা মিকোলাই, তুমি কি ঠিক ওইদিনই জানতে পেরেছিলে যে অমুক দিন অমুক সময় অমুক বিধবা আর তার বোনের ওপর লুঠতরাজ হয়েছে, তাদের খুন করা হয়েছে? —কিছু জানি না, কিছুই দেখিনি। প্রথম শুনতে পেলাম দুদিন পরে, আফানাসি পাভ্‌লভিচের কাছে— মানে, দুশ্‌কিনের কাছে, তার শুঁড়িখানায়। —দুল কোথা থেকে পেয়েছিলে? —ফুটপাতে কুড়িয়ে পাই। —পরদিন মিত্রির সঙ্গে কাজ করতে গেলে না কেন? —কারণ, একটু আমোদফুর্তি করছিলাম।— কোথায় গিয়েছিলে আমোদফুর্তি করতে— অমুক জায়গায়, তারপর তমুক জায়গায়।— দুশ্‌কিনের কাছ থেকে পালিয়ে গেলে কেন?—কেননা বড্ড ঘেবড়ে গেস্‌লাম তখন। — ঘাবড়ানোর কী কারণ থাকতে পারে? — যদি কোর্ট-কাছারি হয়... —তুমি যদি মনেই কর তোমার কোন দোষ নেই তাহলে ভয় পাবার কী আছে?... তুমি বিশ্বাস কর আর না কর জোসিমভ্‌, এই প্রশ্ন করা হয়েছিল ওকে —ঠিক যেমন-যেমন তোমাকে বললাম আক্ষরিক অর্থে, আমি ঠিকই জানি, আমার কাছে সঠিক তথ্য আছে! কী তথ্য? বলছ, কী তথ্য?"

"না, না, হাজার হোক, কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ তো আছে।"

"আমি এখন ওই সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রসঙ্গে আসছি না। আমি বলতে চাই ওদের জেরা করার ধরন সম্পর্কে। ওরা নিজেদের দিকটা বোঝে ভালো! মরুক গে যা!... ওকে এমন চাপ দিতে লাগল, এত বেশি চাপ দিতে লাগল, চাপতে-চাপতে এমন অবস্থা করে ছাড়ল যে শেষপর্যন্ত কবুল করল— বলল— না ফুটপাতে নয়, পেয়েছিনু ওই ফেলাটে যেখানে মিত্রি আর আমি অঙের কাজ করছিলুম। —কী ভাবে,

শুনি?— কী ভাবে? তা'লে বলি : আমি আর মিত্রি তো সারাটা দিন ঘর অং করলুম, সেই সন্ধে আটটা অব্দি। যাবার জন্যে তৈরিও হচ্ছি, এমন সময় মিত্রি অঙের বুরুশ তুলে নিয়ে দিলে আমার মুখে অং বুলিয়ে, আচ্ছা করে অনেকটা লাগিয়ে দিলে আমার সারা মুখে, দিয়েই ছুটে পালাল। আমিও ছুটলুম ওর পেছন-পেছন। ওকে যা নয় তাই বলে গালাগাল দিতে-দিতে ছুটছি। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এসে যখন ফটকের তলা দিয়ে বেরুচ্ছি, এমন সময় পুরোদমে ছুটতে-ছুটতে দড়াম করে ধাক্কা খেলাম দারোয়ানের সঙ্গে— একদল ভদ্দরনোক ছিলেন সেখানে-তাদের সঙ্গেও ধাক্কা লেগে গেল। কতজন ভদ্দরনোক যে ছিলেন দারোয়ানের সঙ্গে তা মনে নেই। দারোয়ান এ জন্যে আমায় গালিগালাজ করে তুলোধুনো করে ছাড়লে। আরও একজন দারোয়ান ছিল— সেও গালিগালাজ করলে। দারোয়ানের বৌ বেরিয়ে এলো— তা সেও দিলে একচোট গালাগালি। তারপর এক ভদ্দরনোক বেরিয়ে আসছিলেন ফটক দিয়ে— তার সঙ্গে আবার এক ভদ্দরমহিলা-– তার কাছ থেকেও জুটল গালাগাল, কেননা আমি আর মিত্রি তখন ছুটতে-ছুটতে ফটকের সামনে ওদের পথ জুড়ে আড়াআড়ি পড়ে গেছি। মিত্রিকে চুলের মুঠো ধরে টেনে আমি কাত করে মাটিতে ফেলে দিলুম, দমাদম কিলচড় ঝাড়তে লাগলুম ওর ওপর, মিত্রিও আমার তলায় চাপা পড়ে গেলে কী হবে ওই তলা থেকেই আমার চুলের মুঠি ধরে দুমদাম চালিয়ে যেতে লাগল সমানে। এই মারপিট কিন্তু আমরা খারাপ ভেবে করিনি, করছিলুম ভালোবেসেই মজা করে। শেষকালে মিত্রিটা একসময় আমার হাত ফসকে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গেল, আমিও ছুট ওর পিছু-পিছু। তা ধরতে পারলুম না ওর নাগাল, তাই ফেলাটে ফিরে এলুম, একাই, কেননা কাজের পর ঘরদোর এট্টু সাফ করে রাখা দরকার। গোছগাছ করতে-করতে আমি অপিক্ষা করতে লাগলুম। ভাবলুম এই বুঝি মিত্রি আসে। এই সময় ঘরের দেয়ালের বাইরে, দরজার কাছে, সিঁড়ির চাতালটার এককোনায় ছোট্ট বাস্কটার ওপর পা পড়ল। তাকিয়ে দেখি কাগোজে জড়ানো কী একটা পড়ে আছে। মোড়কটা খুলে দেখি এইটুকুন ছোট্ট আংটা লাগানো— তা আংটা খুললুম— দেখি ওরে বাবা, বাস্কর ভেতরে একজোড়া দুল!...”

“দরজার বাইরে? দরজার বাইরে পড়ে ছিল? দরজার বাইরে?” হাতে ভর দিয়ে ধীরে-ধীরে শরীরটা সামান্য উঠিয়ে ভয়ার্ত ঘোলাটে দৃষ্টিতে রাজুমিখিনের দিকে তাকিয়ে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল।

“হ্যাঁ... কিন্তু তাতে কী হয়েছে? কী হল তোমার? অমন করছ কেন?” রাজুমিখিনও জায়গা ছেড়ে উঠে পড়ল।

“ও কিছু না!” অস্ফুটস্বরে মিনমিন করে উত্তরে এই কথা বলে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ আবার বালিশের ওপর গড়িয়ে পড়ল। আবার মুখ ফেরাল দেয়ালের দিকে। ঘরে উপস্থিত সকলে কিছুক্ষণ চুপচাপ।

"ঝিমোচ্ছিল! সম্ভবত আধজাগা অবস্থায়..." শেষকালে এই কথা বলে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে রাজুমিখিন তাকাল জোসিমভের দিকে। জোসিমভ্ ওর সে কথায় সায় না দিয়ে মাথাটা সামান্য নাড়াল।

"হ্যাঁ, যা বলছিলে, বলে যাও," জোসিমভ্ বলল। "তারপর কী হল?"

"তারপর আবার কী? দুলজোড়া দেখামাত্র ফ্ল্যাটের কথা, মিস্ত্রির কথা— সব ভুলে গিয়ে টুপিটা খপ্ করে তুলে নিয়ে সে ছুটল দুশ্‌কিনের কাছে, তারপর তো জানই— ওর কাছ থেকে একটা রুবল পেল, মিথ্যে করে বলল যে ফুটপাতে কুড়িয়ে পেয়েছে, তক্ষুনি মেতে গেল আমোদফুর্তিতে! এদিকে খুনের ব্যাপারে সে বারবার জোর দিয়ে বলছে সেই এক কথা : কিছু জানি না, কিছুই দেখিনি। খবরটা শুনতে পেয়েছি মাত্র দু'দিন পরে। — তা হলে আগে দেখা দাওনি কেন?— ভয়ে। — গলায় ফাঁস দিতে গিয়েছিলে কেন? —ভাবনায়। —কিসের ভাবনা? — কোর্ট-কাছারিতে টানাটানি করবে এই ভাবনায়।— তা এই হল গিয়ে তোমার পুরো বৃত্তান্ত। এখন তোমার কী মনে হয়?— এ থেকে কী সিদ্ধান্ত টানতে পারে ওরা?"

"ভাবার কী আছে আবার? সূত্র পাওয়া যাচ্ছে— ক্ষীণ হলেও আছে। তথ্যও আছে। তোমার ওই রঙের মিস্ত্রিকে তো তাই বলে বেকসুর খালাস করে দেওয়া যায় না। কী বল?"

"কিন্তু ওরা যে এখন ওকে সরাসরি খুনির তালিকায় ধরে রেখেছে। ওদের মনে এতটুকু সন্দেহ নেই..."

"কী সব আজেবাজে বকছ! খামোকা মাথা গরম করছ। দুলের ব্যাপারটা তুমি কী বলবে শুনি? তোমাকে মানতেই হবে যে দুল যদি ঠিক ওইদিন, ওইসময় বুড়ির ট্রাঙ্ক থেকে মিকোলাইয়ের হাতে গিয়ে পড়ে— তাহলে তোমাকে হ্যাঁ, আলবত মানতে হবে যে ওগুলো সেখানে কী করে গেল তার একটা ভালো ব্যাখ্যা চাই— তাই না? এরকম তদন্তের ক্ষেত্রে এটা নগণ্য নয়।"

"কী করে গেল! কী করে গেল?" রাজুমিখিন চেঁচিয়ে উঠল। "তুমি তাহলে ডাক্তার হয়েছ কী করতে? ডাক্তার হয়ে তোমার সর্বোপরি দায়িত্ব যখন মানুষকে নিয়ে গবেষণা করা, যখন মানুষের প্রকৃতি নিয়ে তোমার চর্চা করার সুযোগ যে-কারও চেয়ে বেশি, তখন তুমি কিনা গুচ্ছের তথ্যের ভেতর থেকেও দেখতে পাচ্ছ না কী ধরনের মানুষ এই মিকোলাই? গোড়া থেকেই কিনা তুমি বুঝতে পারছ না যে জেরার সময় সে যা-যা বলেছে সব নির্ভেজাল সত্য? যেমন বলেছে ঠিক সেই ভাবেই ওর হাতে পড়েছিল। বাক্সটার ওপর পা পড়েছিল, তখন তুলে নেয়!"

"শোন তাহলে, মন দিয়ে শোন আমার কথা। দারোয়ান, কোখ্, পেস্ত্রিয়াক্‌ভ, অন্য আরেকজন দারোয়ান, প্রথম দারোয়ানের বৌ এবং সেই মহিলাটি, যে তার সঙ্গে তখন দারোয়ানের ঘরে বসে ছিল, কোর্ট কাউন্সিলর ক্রিউচ্‌কভ, যে কিনা ঠিক সেই

মুহূর্তে ঘোড়াগাড়ি থেকে নেমে একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে ফটকের তলা দিয়ে যাচ্ছিল— তারা সকলে, অর্থাৎ আট-দশজন সাক্ষী এক বাক্যে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে মিত্রিকে মাটিতে চেপে ধরে মিকোলাই তার ওপর শুয়ে পড়ে দমাদ্দম কিলচড় মারছিল, মিত্রি চেপে ধরেছিল নিকোলাইয়ের চুলের মুঠি— সেও চড়চাপড় চালিয়ে যাচ্ছিল। ওরা পড়ে ছিল পথ জুড়ে, অন্যদের যাতায়াতে ব্যাঘাত ঘটেছিল। এর জন্যে চারদিক থেকে লোকে ওদের বকাবকি করছিল। কিন্তু ওরা দুটিতে 'বাচ্চা ছেলেপুলের মতো'— সাক্ষীদের নিজেদের মুখের কথায়— একজন আরেকজনের ওপর শুয়ে হুড়োহুড়ি মারামারি করছিল, অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল, দুজনেই হাসছিল অবিরাম, তাদের মুখভঙ্গিও ছিল মজার; তারপর দৌড়ে বড় রাস্তায় একজন আরেকজনের পিছু ধাওয়া করল— ঠিক বাচ্চাদের মতো। শুনলে? এবারে ভেবে দেখ : ওপরতলায় পড়ে রয়েছে দু-দুটো লাশ— তখনও টাটকা... শুনছ... একেবারে টাটকা — ওই অবস্থাতে তখন পাওয়া গেছে! যদি ওরা খুন করে থাকে, কিংবা একমাত্র মিকোলাই খুন করে থাকে এবং খুন করে ট্রাঙ্ক ভেঙে চুরি করে অথবা ওই ডাকাতির সঙ্গে যদি ওদের বিন্দুমাত্র যোগাসাজসও থাকে তাহলে দয়া করে আমার মাত্র একটি প্রশ্নের উত্তর দেবে কি? এই যে ওদের হুটোপাটি, হাসাহাসি, ফটকের তলায় বাচ্চাদের মতো এই মারপিট — এ ধরনের মেজাজ কি কুড়ুল, রক্ত, দুষ্টবুদ্ধি ও ধূর্ততা, সাবধানতা, বাটপারি— এসবের সঙ্গে এতটুকু খাপ খায়? সবে খুন করেছে, পাঁচ মিনিট, জোর দশ মিনিট আগে—ঘটনা তাই বলছে, যেহেতু দেহগুলো গরম ছিল... এই অবস্থায়, হঠাৎ মরা মানুষদুটোকে ওখানে রেখে এই কিছুক্ষণ আগেও যে লোকজন এসেছিল তা জানা সত্ত্বেও ফ্ল্যাটের দরজা খোলা রেখে এবং শিকার ফেলে রেখে ওরা বাচ্চা ছেলেদের মতো রাস্তায় গড়াগড়ি দিচ্ছে, হো হো করে হাসছে, সকলের মনোযোগের বস্তু হচ্ছে।... এই দৃশ্যটা দেখেছে বলে একবাক্যে স্বীকার করার মতো সাক্ষী আছে অন্তত দশজন।

"অদ্ভুত, সে আর বলতে! বলাই বাহুল্য, অসম্ভব, কিন্তু...."

"না ভাই, ওসব *কিন্তু-টিন্তু* নয়। ওইদিন ওইসময় দুলজোড়া মিকোলাইয়ের হাতে পড়াটাই কিনা তার বিরুদ্ধে সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ হয়ে দাঁড়াল! অথচ তার সাক্ষ্যে এর সরাসরি ব্যাখ্যাও মিলেছে। এখন পর্যন্ত তাই ব্যাপারটাকে *বিতর্কমূলক* বলা চলে। তাহলে তার অনুকূলে যে-সমস্ত তথ্য আছে সেগুলোও তো বিবেচনা করে দেখা উচিত, বিশেষত এই কারণে যে সেগুলো *অকাট্য*। আচ্ছা, তোমার কী মনে হয় বল তো, আমাদের আইনব্যবস্থার যা চরিত্র তাতে কি এমন কোন তথ্যকে তারা অকাট্য বলে গ্রহণ করবে অথবা করতে পারে যা যে-কোন ধরনের অভিযোগকে, বস্তুগত সাক্ষ্যপ্রমাণকে নস্যাৎ করে দিতে পারে একমাত্র মানুষের মানবিকতার বিচারে, একমাত্র এই ভিত্তিতে যে মনস্তত্ত্বের বিচারে সেগুলো

অসম্ভব? না, গ্রহণ করবে না, কোনভাবেই গ্রহণ করবে না; কেন? না বাক্সটা পাওয়া গেছে ওর কাছে। তাছাড়া লোকটা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল— 'অপরাধ বোধ না থাকলে কি আর তা করত?' আসল প্রশ্নটা এখানে। আর এই কারণেই আমি উত্তেজিত! বোঝার চেষ্টা কর!''

''হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছ। দাঁড়াও, একটা জিনিস জিগ্গেস করতে ভুলে গেছি : দুলের বাক্সটা যে সত্যি-সত্যিই বুড়ির ট্রাঙ্ক থেকে পাওয়া গেছে তার প্রমাণ কী?

''প্রমাণ আছে'', সামান্য ভ্রূকুটি করে খানিকটা যেন ইতস্তত করে রাজুমিখিন উত্তর দিল। ''কোখ্ জিনিসটা চিনতে পেয়েছে।... কে বন্ধক দিয়েছিল তাও বলে। বন্ধক যে দিয়েছিল সে লোকটা শেষপর্যন্ত প্রমাণ করেছে যে জিনিসটা যথার্থই তার।''

''দুঃখের কথা। এখন আরও একটা প্রশ্ন : কোখ্ আর পেস্ত্রিয়াকভ্ যখন ওপরে যায় তখন কেউ কি মিকোলাইকে দেখেছিল? এটা কোনভাবে প্রমাণ করা যায় না কি?''

''মুশকিলটা তো এখানেই যে ওকে কেউ দেখেনি'' : রাজুমিখিন বিরক্তির সঙ্গে বলল। ''গোলমাল এখানেই : এমনকি কোখ্ আর পেস্ত্রিয়াকভ্ যখন ওপরে যায় তখনও ওদের লক্ষ করেনি, যদিও ওদের সাক্ষ্যের এখন বিশেষ কোন দাম নাও থাকতে পারে। ওরা বলছে, আমরা দেখেছিলাম ফ্ল্যাটের দরজা খোলা! তার মানে নিশ্চয়ই লোকে কাজ করছে ওখানে। কিন্তু পাশ দিয়ে যাবার সময় আমরা কোন মনেযোগ দিইনি। ঠিক মনেও করতে পারছি না ঠিক ওই মুহূর্তে ওখানে কেউ কাজ করছিল কিনা।''

''হুম্। তার মানে কৈফিয়ৎ আছে মাত্র একটা,— ওরা মারামারি করছিল আর হাসাহাসি করছিল। ধরা যাক, এটা জোরাল প্রমাণ, তবু... তোমাকে জিগ্গেস করি, এখন তুমি নিজে সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা কী দেবে? দুল পাবার ব্যাখ্যা কী দেবে— যদি সত্যি-সত্যি ও তা ওইভাবে পেয়ে থাকে, যেমন ও বলছে?''

''ব্যাখ্যা কী? ব্যাখ্যা দেওয়ার কী আছে বল? ব্যাপারটা তো পরিষ্কার! অন্ততপক্ষে মামলা যে পথে চালান উচিত তা পরিষ্কার, প্রমাণিত হয়ে গেছে। ওই বাক্সই তো প্রমাণ। আসল যে খুনি তার হাত থেকে ওই দুল পড়ে গিয়েছিল। কোখ্ আর পেস্ত্রিয়াকভ্ যখন দরজা ধাক্কাধাক্কি করছিল তখন খুনি ছিল ওপরে, ভেতরে বসে ছিল দরজা বন্ধ করে। কোখ্ বোকামি করে নিচে নামল। ঠিক সেই সময় এক লাফে ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে খুনিও নিচে ছুটল, কেননা অন্য কোন উপায় তার ছিল না। সিঁড়ি দিয়ে নামার পথে খালি ফ্ল্যাটটার ভেতরে ঘাপটি মেরে থেকে সে কোখ্, পেস্ত্রিয়াকভ আর দারোয়ানের নজর এড়িয়ে যায়। এটা ছিল ঠিক সেই মুহূর্তটি যখন মিত্রি আর মিকোলাই ঘর ফাঁকা রেখে ছুটে বেরিয়ে যায়। দারোয়ান এবং অন্যেরা

যখন ওপরে যাচ্ছিল সেই সময় খুনি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে, অপেক্ষা করতে থাকে কখন তাদের পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যায়। তারপর যেন কিছুই হয়নি এইভাবে নিচে নেমে আসে। ঠিক সেই মুহূর্তটিতে মিত্রি আর নিকোলাই ফটক ছেড়ে বড় রাস্তার দিকে ছুটছে, সব লোকজন সরে গেছে, ফটকের তলায় কেউ নেই। কেউ ওকে দেখে থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু লক্ষ করেনি— কত লোকই তো ওখান দিয়ে যাতায়াত করছে! আর বাক্সটা পড়ে গিয়েছিল খুনির পকেট থেকে, খুনি যখন দাঁড়িয়ে ছিল দরজার আড়ালে— পড়ে যে গেছে তা তার নজরেও পড়েনি, যেহেতু সেদিকে মন দেওয়ার অবকাশ তার ছিল না। বাক্সটাই পরিষ্কার প্রমাণ দিচ্ছে যে খুনি ঠিক ওই জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে ছিল। পুরো ঘটনাটা আসলে এই!"

"উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত! না ভাই বড় বেশি উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত। বড় বেশি মাথা খাটিয়ে বের করা!"

"কেন অমন কথা বলছ? কেন?"

"কেন আবার? বড় বেশি ভালোভাবে মিলে যাচ্ছে। একেবারে খাপে-খাপে মিলে যাচ্ছে।... ঠিক যেন একটা নাটক!"

"ধুৎ!" রাজুমিখিনের মুখ দিয়ে কথাটা বেরোতে না বেরোতে ভেজান দরজাটা খুলে গেল, ঘরে এসে ঢুকল এক নতুন মুখ— উপস্থিত কারোরই পরিচিত নয়।

পাঁচ

ভদ্রলোক ভারিক্কি চেহারার, একটু কেতাদুরস্ত, তার চোখেমুখে বিরক্তির ভাব, চাউনি সতর্ক। যুবক তাকে বলা যায় না। শুরুতেই দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চারপাশে যেভাবে চাউনি হানল তাতে গোপন থাকছিল না শিষ্টাচারহীন আশ্চর্যের ভাব। দৃষ্টিতে যেন ঝরে পড়ছে একটি প্রশ্ন : 'এ আমি কোথায় এলাম!' এমনকি খানিকটা আশঙ্কাগ্রস্ত হয়ে, বুঝিবা একটু অপমানিত হয়েই সে রাস্‌কোল্‌নিকভের নিচু ছাদওয়ালা ঘিঞ্জি 'জাহাজি কেবিনটার' ওপর সন্দিগ্ধ নজর বুলাল। ওই একই রকম হতবাক দৃষ্টি ঘুরতে-ঘুরতে শেষকালে এসে আটকে গেল স্বল্প জামাকাপড় পরা অবস্থায় দুর্দশাগ্রস্ত নোংরা সোফায় শায়িত আলুথালু চেহারার রাস্‌কোল্‌নিকভের ওপর। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে দেখে বুঝতে বাকি থাকে না গা-হাত-পা ধোয়া-মোছার কোন বালাই তার নেই। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ নিজেও নিশ্চল হয়ে শুয়ে-শুয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল লোকটাকে। এরপর ওই একই রকম ধীরস্থির দৃষ্টিতে আগন্তুক দেখতে লাগল রাজুমিখিনের দাড়িগোঁফ-না-কামানো, আলুথালু উস্‌কোখুস্‌কো মূর্তিটা। সে দৃষ্টির উত্তরে রাজুমিখিন জায়গা থেকে এতটুকু না নড়ে উদ্ধতভাবে সরাসরি তার চোখের দিকে তাকাল প্রশ্নসূচক দৃষ্টি মেলে। মিনিটখানেকের অস্বস্তিকর নীরবতা। অবশেষে আকস্মিকভাবে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটল দৃশ্যপটের।

কিছু-কিছু লক্ষণ দেখে—প্রসঙ্গত যেগুলো এত বেশি প্রকট ছিল যে তা চোখে পড়তে আগন্তুক সম্ভবত বুঝতে পেরেছিল যে বেশি কড়াকড়িতে এবং বাড়াবাড়ি রকমের ভারিক্কি চাল দেখিয়ে এই জাহাজি কেবিনে, কোন সুবিধা হবে না। তাই জোসিমভ্‌কে লক্ষ করে প্রশ্নের প্রতিটি শব্দাংশ কাটা-কাটাভাবে উচ্চারণ করে, কড়া ধাঁচে হলেও যতদূর সম্ভব সুর নরম করে ভদ্রভাবেই সে জিজ্ঞেস করল :

"রোদিওন রমানোভিচ রাস্‌কোল্‌নিকভ—ছাত্র, না এক্‌কালের ছাত্র—কী বলে সম্বোধন করব মশায়?"

জোসিমভ্‌ অল্পস্বল্প নড়েচড়ে উঠল। উত্তরটাও সে-ই হয়ত দিত। কিন্তু প্রশ্নটা আদৌ রাজুমিখিনকে না করা হলেও সেই চটপট আগ বাড়িয়ে বলে উঠল :

"এই যে সোফায় শুয়ে আছে। কী চাই আপনার?"

'কী চাই আপনার'—এই শিষ্টাচারহীন প্রশ্নটি কেতাদুরস্ত ভদ্রলোকটিকে একেবারে বসিয়ে দিল। রাজুমিখিনের দিকে ফিরে কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু শেষপর্যন্ত নিজেকে সামলে নিয়ে আবার তাড়াতাড়ি জোসিমভের দিকেই মুখ ফেরাল।

"এই যে রাস্‌কোল্‌নিকভ!" ইঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে রোগীকে দেখিয়ে দিয়ে মিনমিন করে বলল জোসিমভ্‌। তারপর হাই তুলল, তবে কেন যেন অনেকটা বেশি হাঁ করল—সচরাচর যা সে করে না। যেভাবে বেশ খানিকক্ষণ ধরে হাঁ করে থাকল সেটাও ছিল অস্বাভাবিক। পরে ধীরে-ধীরে ওয়েস্টকোটের পকেট হাতড়ে বার করল এক বিশাল আমপাড়া পকেট-ঘড়ি—ঘড়িটা সোনার। পেটমোটা ডালাটা খুলে সময় দেখল, তারপর আবারও আগের মতো অলস মন্থরভাবে হাতড়ে-হাতড়ে যথাস্থানে রেখে দিল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ নিজে এতক্ষণ চিত হয়ে চুপচাপ শুয়ে ছিল, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল বটে আগন্তুকের দিকে, কিন্তু সে দৃষ্টি ছিল শূন্য। এবারে ওয়ালপেপারের চিত্তাকর্ষক ফুলটা থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে ছিল সে। তার অস্বাভাবিক পাণ্ডুর মুখে ফুটে উঠেছিল অবর্ণনীয় কষ্টের ছাপ—মনে হচ্ছিল একটা যন্ত্রণাদায়ক অস্ত্রোপচার থেকে সদ্য সে উঠেছে অথবা স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তার ওপর এতক্ষণ অত্যাচার চলছিল—সবে তা থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। কিন্তু আগন্তুক ভদ্রলোকটি অল্প অল্প করে উত্তরোত্তর বেশিমাত্রায় তার মনোযোগ জাগিয়ে তুলতে লাগল, পরে তার চোখেমুখে ফুটে উঠল একটি হতভম্ব ভাব, তারপরে অবিশ্বাস—এমনকি অনেকটা যেন ভয়ও। জোসিমভ্‌ যখন তাকে দেখিয়ে বলল, 'এই যে রাস্‌কোল্‌নিকভ' তখন হঠাৎ সে চটপট বিছানা থেকে শরীরটা ওঠাল, ঠিক যেন একলাফে বিছানা ছেড়ে উঠে বসল। তারপর কতকটা যুদ্ধংদেহি মনোভাব দেখান সত্ত্বেও ক্ষীণকণ্ঠে, ছাড়া-ছাড়া ভাবে বলে উঠল :

"হ্যাঁ! আমি রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌। কী চাই আপনার?"

আগন্তুক বেশ মনোযোগ দিয়ে ওকে লক্ষ করল। গম্ভীরভাবে বলল :

"আমি পিওতর পেত্রোভিচ্ লুজিন। আমার স্থির বিশ্বাস, আমার নাম আপনার কাছে একেবারে অপরিচিত নয়।"

কিন্তু রাস্‌কোল্‌নিকভ্ একেবারে অন্য একটা কিছু প্রত্যাশা করছিল, তাই ভদ্রলোকের কথা শুনে অন্যমনস্কভাবে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তার দিকে, উত্তরে কিছুই বলল না—মনে হচ্ছিল ঠিক এই এখনই, এই প্রথম পিওতর পেত্রোভিচ নামটা শুনল।

"সে কি? এখন পর্যন্ত কোন সংবাদ পাবার সুযোগ আপনার ঘটেনি?" বেশ খানিকটা হকচকিয়ে গিয়ে পিওতর পেত্রোভিচ্ জিগ্‌গেস করল।

এর উত্তরে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ধীরে-ধীরে বালিশে গা ছেড়ে দিল, দু-হাত মাথার পেছনে দিয়ে চিত হয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইল। লুজিনের চোখে-মুখে ফুটে উঠল অসহায় ভাব। জোসিমভ্ ও রাজুমিখিন আরও বেশি কৌতহল নিয়ে তাকে দেখতে লাগল। বোঝাই যাচ্ছিল, ওদের হাবভাব দেখে লুজিন ধন্ধে পড়ে গেছে।

"আমার ধারণা ছিল, আমার হিসাব মতে..." আমতা-আমতা করে সে বলতে লাগল, "আজ দশ দিনেরও বেশি হয়ে গেল, এমনকি প্রায় দুসপ্তাহ হতে চলল যে চিঠি ফেলেছি..."

"শুনুন, এতক্ষণ দরজার ধারে দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না", রাজুমিখিন হঠাৎ তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠল। "আপনার যদি কিছু বলার বা আলোচনা করার থাকে তো বসুন না। আপনি আর নাস্তাসিয়া দুজনে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকায় দুজনার পক্ষেই বড্ড ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে যাচ্ছে। নাস্তাসিয়া লক্ষ্মীটি, একটু সরে দাঁড়াও, ভদ্রলোককে ভেতরে ঢুকতে দাও। আসুন, এই যে এখানে আপনার চেয়ার। কোনরকমে গলে ঢুকে পড়ুন!"

রাজুমিখিন টেবিলের ধার থেকে তার নিজের চেয়ারটা ঠেলে খানিকটা সরিয়ে দিয়ে টেবিল আর নিজরে হাঁটুজোড়ার মাঝখানে সামান্য জায়গা খালি করে দিল, বেশ খানিকটা অস্বস্তির সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগল আগন্তুককে ওই ফাঁকের মধ্যে 'গলে' ঢোকার সুযোগ দিয়ে। সময়টি মোক্ষম বেছে নেওয়া হয়েছিল। আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার কোন উপায় নেই। অতিথি তাই তাড়াহুড়ো করে হোঁচট খেতে-খেতে সঙ্কীর্ণ পরিসরটার ভেতর দিয়ে টুক করে গলে গেল। চেয়ারের নাগাল পাবার পর বসে পড়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল রাজুমিখিনের দিকে।

"আপনার ঘাবড়ানো কোন কারণ নেই," গাঁক-গাঁক করে বলে উঠল রাজুমিখিন। "রোদিয়া গত পাঁচদিন হল অসুস্থ, তিনদিন ভুল বকেছে, এই এখন ওর জ্ঞান ফিরেছে, খিদে ভালোই ছিল, ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত করেছে। এই যে ভদ্রলোকটি বসে আছেন উনিই ওর ডাক্তার, সবে পরীক্ষা করে দেখেছেন ওকে। আমি হলেম গিয়ে

রোদিয়ার বন্ধু, আমিও এককালের ছাত্র, এখন ওর যত্নআত্তি করছি। তাই বলছিলাম কি, আমাদের কোন ধর্তব্যের মধ্যে রাখবেন না, সঙ্কোচ না করে আপনার যা বলার বলে যান।"

"ধন্যবাদ।" তারপর জোসিমভের দিকে ফিরে জিগ্‌গেস করল," আমার উপস্থিতি আর কথাবার্তায় রোগীর কি কোন অসুবিধা হতে পারে?"

"না-না," মিনমিন করে জোসিমভ্ বলল। "বলা যায় না, রোগীকে আনন্দও দিতে পারেন," বলে আবার হাই তুলল জোসমিভ্।

"অনেক আগে সেই সকাল থেকেই ওর জ্ঞান ফিরেছে।" রাজুমিখিন বলে চলল। রাজুমিখিনের গায়ে-পড়া ভাবের মধ্যে এমন একটা অকৃত্রিম সারল্য ছিল যে পিওতর পেত্রোভিচ্‌কে তা ভাবিয়ে তুলল। এই ছেঁড়া জামাকাপড় পরা বেহায়াটি যে ছাত্র বলে নিজের পরিচয় দিতে পারল এই ভেবে সে মনে-মনে খানিকটা উৎফুল্ল বোধ করতে লাগল।

"আপনার মাতৃদেবী..." লুজিন বলতে শুরু করল।

"হুম!" রাজুমিখিনের মুখ দিয়ে সশব্দে বেরিয়ে এলো। লুজিন প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

"ও কিছু নয়, অমনি। আপনি চালিয়ে যান।..."

লুজিন অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল।

"আপনার মাতৃদেবী, আমি যখন ওখানে ছিলাম, তখনই আপনাকে একটা চিঠি লিখতে শুরু করেন। এখানে আসার পর আমি ইচ্ছে করে কয়েকদিন বাদ দিয়ে আপনার কাছে এলাম কেননা সবকিছু যে আপনার গোচরীভূত হয়েছে এই ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমি অবাক হচ্ছি..."

"জানি জানি!" অপরিসীম বিরক্তি ও অধৈর্যের সঙ্গে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ হঠাৎ বলে উঠল। "আপনিই সেই পাত্র, তাই তো? জানি...অনেক হয়েছে!"

পিওতর পেত্রোভিচ্ দস্তুরমতো অপমানিত বোধ করল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না। সে কষ্ট করে বোঝার চেষ্টা করছিল এসবের অর্থ কী হতে পারে। নীরবতা মিনিটখানেক স্থায়ী হল।

উত্তর দেবার সময় রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তার দিকে সামান্য মুখ ফিরিয়েছিল, এখন আবার একদৃষ্টে তাকিয়ে-তাকিয়ে তাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল বিশেষ এক ধরনের কৌতূহল নিয়ে। ভাব দেখে মনে হচ্ছিল এর আগে লোকটাকে অতটা খুঁটিয়ে দেখার অবকাশ তার হয়নি, অথবা বুঝিবা লোকটার মধ্যে নতুন একটা কিছু বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করে সে এখন বিস্মিত। সেই উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবেই সে বালিশ থেকে শরীরটাও সামান্য তুলল। বস্তুতপক্ষে সামগ্রিকভাবে পিওতর পেত্রোভিচের চেহারার মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যা চোখে পড়ার মতো। ঠিক সেই বস্তু যা তার পাত্র

আখ্যা লাভের উপযোগী। এই আখ্যাটাই মাত্র কিছুক্ষণ আগে অশালীনভাবে তাকে দেওয়া হয়েছিল। প্রথমত, দেখা যাচ্ছিল—এমনকি রীতিমতো নজরে পড়ছিল যে ভাবী বধূর আগমন প্রত্যাশায় নিজেকে ফিটফাট ও চটকদার করে তোলার উদ্দেশ্যে পিওতর পেত্রোভিচ্ রাজধানীতে দিনকয়েক অবস্থানের সুযোগ কাজে লাগাতে বেশ উঠেপড়ে লেগেছিল। কাজটা অবশ্যই অনুমোদনযোগ্য, কোন দোষেরও নয়। এমনকি নিজের রূপবদলের মাধুর্য সম্পর্কে তার নিজেরই বড় বেশি সচেতনতা, এমনকি হয়ত বা বাড়াবাড়ি রকমের আত্মতৃপ্তি এমন ক্ষেত্রে ক্ষমার্হও, যেহেতু পিওতর পেত্রোভিচ্ এখন বিয়ের পাত্রের পর্যায়ে পড়ে। তার সমস্ত জামাকাপড় সদ্য দরজির দোকান থেকে আনা, সবই ভালো, যদিও হয়ত বড় বেশি নতুন। বড় বেশি প্রকট হয়ে উঠেছিল তার বিশেষ উদ্দেশ্য। এমনকি তার আনকোরা নতুন, সুরুচিপূর্ণ গোল টুপিটাও এর সাক্ষ্য বহন করছে—পিওতর পেত্রোভিচ্ ওটার প্রতি যেন অতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছিল, খুব যত্ন করে হাতে ধরে ছিল। ফিকে বেগনি রঙের, চমৎকার ও খাঁটি ফরাসি দস্তানাজোড়াও যে ওই একই সাক্ষ্য বহন করছিল তা অন্তত একটি ঘটনায় পরিষ্কার—ওগুলো হাতে না পরে স্রেফ দেখানোর জন্য সে হাতে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। পিওতর পেত্রোভিচের পোশাক-পরিচ্ছদে হালকা ও তারুণ্যের উপযোগী রঙের প্রাধান্য। তার পরনে গ্রীষ্মকালের উপযোগী, হালকা বাদামি আভার একটা চমৎকার কোট, হালকা ওজনের কাপড়ের হালকা রঙের পাতলুন এবং তারই সঙ্গে মিলিয়ে ওয়েস্টকোট, মিহি কাপড়ের সবেমাত্র কেনা জামা, মোলায়েম কেম্ব্রিক কাপড়ের ওপর গোলাপি ডোরাকাটা ছোট্ট একটা টাই। সবচেয়ে বড় কথা, এসবই পিওতর পেত্রোভিচের চেহারার সঙ্গে দিব্যি মানিয়েছিল। তার মুখ এত তাজা, এত সুন্দর যে অমনিতেই তাকে পঁয়তাল্লিশ বছরের তুলনায় কম দেখাচ্ছিল। গাঢ় রঙের জুলপি গালের দুদিকে অপূর্ব বাহার সৃষ্টি করেছে দুখণ্ড মাংসের চপের আকারে, বড় সুন্দরভাবে ঘন হয়ে নেমে এসেছে নিখুঁত কামানো চকচকে চিবুকের কাছটাতে। কেশে অবশ্য সামান্য প্যাক ধরেছে, কেশপ্রসাধনকারীর কারিগরিতে কেশদাম কুঞ্চিত ও বিন্যস্ত। এই পরিস্থিতিতেও তাকে কিন্তু এতটুকু হাস্যকর বা বোকা-বোকা লাগছে না, যেমন সচরাচর হয়ে থাকে, যেহেতু কোন মানুষ কেশ কুঞ্চন করলে তাকে অবধারিতভাবে বিয়ের আসরে বসার জন্য তৈরি জার্মান পাত্র বলে মনে হয়। এই রাশভারী, দিব্যসুন্দর চেহারার মধ্যে সত্যি-সত্যি অপ্রীতিকর ও বিতৃষ্ণা উদ্রেককারী যদি কিছু থাকেও তার কারণ সম্পূর্ণ অন্য। মিস্টার লুজিনকে অভদ্রের মতো নিরীক্ষণ করার পর রাস্কোল্নিকভ্ মুচকি হেসে ফের বালিশে গড়িয়ে পড়ল। আগের মতোই আবার তাকিয়ে রইল কড়িকাঠের দিকে।

কিন্তু লুজিন আত্মসংযম হারাল না। মনে হল সে যেন ঠিকই করে ফেলেছে যে আপাতত এই অদ্ভুত আচরণকে গ্রাহ্য করবে না।

"দুঃখ পেলাম, বড় দুঃখ পেলাম আমি আপনাকে এই অবস্থায় দেখে," কষ্ট করে নীরবতা ভঙ্গ করে সে আবার বলতে শুরু করল। আপনি যে অসুস্থ তা যদি জানতাম তাহলে আগেই আসতাম। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, ঝামেলার কি আর অন্ত আছে! তার ওপরে আবার আমার আইন ব্যবসা সংক্রান্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজও পড়ে গেছে সিনেটে। আর সব কাজের উল্লেখ না হয় না-ই করলাম— সেগুলো আপনি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন। প্রতিমুহূর্তে আপনাদের লোকজনের অর্থাৎ আপনার মাতৃদেবী আর ভগিনীর প্রতীক্ষায় আছি ..."

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ নড়েচড়ে উঠল, কিছু একটা যেন বলতে চাইছিল। তার চোখেমুখে খানিকটা উত্তেজনায় চিহ্ন ফুটে উঠল। পিওতর পেত্রোভিচ্ কথায় বিরতি দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, কিন্তু রাস্‌কোল্‌নিকভের মুখ থেকে কিছুই বের হল না দেখে বলে চলল :

"...প্রতিটি মূহূর্তে। এখনকার মতো একটা ফ্ল্যাট খুঁজে বার করেছি ওঁদের থাকার জন্যে।..."

"কোথায়?" ক্ষীণকণ্ঠে জানতে চাইল রাস্‌কোল্‌নিকভ্।

"এখান থেকে তেমন একটা দূরে নয়, বাকালেইয়েভের বাড়ি..."

"ভজ্‌নেসেন্‌স্কি এভিনিউতে," রাজুমিখিন বলে উঠল কথার মাঝখানে। ওই দালানের দুটো তলাতে কুঠুরি ভাড়া দেওয়া হয়। ইউশিন নামে এক বণিক ওটার মালিক। ওখানে আমি গেছি।"

"হ্যাঁ, কুঠুরি..."

"অতি জঘন্য জায়গা। নোংরা, পূতিগন্ধ...তাছাড়া সন্দেহজনকও বটে। কিছু ঘটনা ঘটেছিল। একমাত্র শয়তানই জানে ওখানে কারা বসবাস করে!...আমি নিজে যে ওখানে গিয়েছিলাম সেটাও এক কেলেঙ্কারিজনক ঘটনার সূত্রে। ভাড়াটা অবশ্য সস্তা।"

"আমি অবশ্য অতশত খোঁজখবর সংগ্রহ করতে পারিনি, যেহেতু নিজেই এখানে নবাগত', মনে-মনে আহত হয়ে প্রত্যুত্তরে পিওতর পেত্রোভিচ্ বলল। "তবে আমি ভাড়া নিয়েছি খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দুটি ঘর, আর যেহেতু এটা অতি অল্প সময়ের জন্য...আমি ইতিমধ্যে আমাদের সত্যিকারের অর্থাৎ ভবিষ্যতে বসবাসের উপযোগী একটা ফ্ল্যাটও খুঁজে বের করেছি," রাস্‌কোল্‌নিকভের দিকে ফিরে সে বলল। "এখন ঘর সাজানো হচ্ছে, আপাতত আমাকেও কষ্টেসৃষ্টে ওরকমই একটা কুঠুরিতে থাকতে হচ্ছে, এখান থেকে মাত্র কয়েক পা দূরে—ম্যাডাম লিপ্‌পেভেখ্‌জেলের বাড়িতে, আমার এক যুবক বন্ধু আন্দ্রেই সেমিওনভিচ লেবেজিয়াত্‌নিকভের ফ্ল্যাটে। সেই আমাকে বাকালেইয়েভের বাড়ির সন্ধান দেয়।..."

"লেবেজিয়াত্‌নিকভ?" যেন কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করতে-করতে

রাস্‌কোলনিকভ্ ধীরে-ধীরে উচ্চারণ করল।

"হ্যাঁ, আন্দ্রেই সেমিওনভিচ্ লেবেজিয়াত্‌নিকভ, একটা মিনিস্ট্রিতে কাজ করে। চেনেন নাকি?"

"হ্যাঁ...না...মানে..." উত্তর দিল রাস্‌কোল্‌নিকভ্।

"মাফ করবেন, আপনি যেভাবে প্রশ্ন করলেন তাতে আমার তাই মনে হল। আমি কোন একসময় তার অভিভাবক ছিলাম।...বড় মিষ্টি স্বভাবের যুবক...ওয়াকিবহাল মানুষ। আমি নিজে অল্পবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশা করে আনন্দ পাই—ওদের সঙ্গে মিশলে নূতনত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।" বলতে-বলতে পিওতর পেত্রোভিচ্ উপস্থিত সকলের ওপর নজর বুলাল।

"কোনদিক থেকে বলছেন আপনি?"

"কেন? সবচেয়ে সিরিয়াস ব্যাপারে, যাকে বলে যে কোন বিষয়ের একেবারে মূলে", প্রশ্নটা শুনে যেন খুবই খুশি হয়ে পিওতর পেত্রোভিচ্ চটপট বলে উঠল। "বুঝলেন তো, গত দশ বছরের মধ্যে আমি সেন্ট পিটার্সবুর্গে আসিনি। আমাদের এই সমস্ত সাম্প্রতিক ঘটনা, সংস্কার, নতুন-নতুন ধ্যানধারণা—এসব আমাদের মফস্বলকেও ছুঁয়ে গেছে। কিন্তু আরও পরিষ্কার চিত্র পেতে গেলে, সেসব দেখতে গেলে সেন্ট পিটার্সবুর্গে আসতে হয়। আমি ঠিক যা ভেবে কথাটা বলেছি তা হল এই যে আমাদের নবীন প্রজন্মকে লক্ষ করলে অনেক বেশি দেখা ও শেখা যায়। আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে, আমি আনন্দ পেয়েছি..."

"ঠিক কিসে, বলবেন কি?"

"আপনার প্রশ্নটির পরিসর বেশ বড়। আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় যে আমি তাদের মধ্যে অনেক বেশি স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি পেয়েছি, অনেক বেশি ...যাকে বলে সমালোচনামূলক মনোভাব...তার সন্ধান পেয়েছি, অনেক বেশি কর্মদক্ষতার পরিচয় পেয়েছি।..."

"সেটা ঠিক", জোসিমভ্ চেপে-চেপে বলল।

"বাজে কথা। কর্মক্ষমতা বলতে কিছু নেই", রাজুমিখিন বলে উঠল। "কর্মক্ষমতা অর্জন করা কঠিন, আকাশ থেকে অমনি পড়ে না। আজ প্রায় দু'শ বছর হতে চলল সমস্ত রকম বাস্তব কাজকর্ম থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন।...ভাবনাচিন্তা নিশ্চয়ই এখানে ওখানে-ঘুরছে..." এবারে পিওতর পেত্রোভিচ্‌কে উদ্দেশ্য করে বলল, "সদিচ্ছা... তাও আছে—তা সে যতই ছেলেমানুষী ধরনের হোক না কেন। খুঁজলে সততারও সন্ধান পাওয়া যাবে, যদিও জুয়াচোরের সীমাসংখ্যা নেই আমাদের মধ্যে। তবে যাই থাকুক না কেন, কর্মক্ষমতা অন্তত নেই। কর্মক্ষমতা যাদের আছে তারা দামি বুটজুতো পরে ঘুরে বেড়ায়।"

"আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না", পিওতর পেত্রোভিচ্ যেভাবে

আপত্তি জানাল তাতে বোঝা যাচ্ছিল আলোচনাটা তার কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। "এটা ঠিক যে ভাবাবেগ আছে, গলদও আছে। কিন্তু প্রশ্রয়ও থাকা চাই : লোকে যে ভাবাবেগে ভেসে যাচ্ছে তাতে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে কাজের ব্যাপারে উৎসাহের অভাব নেই। তাতে আবার এটাও প্রমাণিত হচ্ছে যে বাইরের যে পরিস্থিতিতে কাজ করা হয় তার মধ্যেও গলদ আছে। কাজে যদি কিছু ঘাটতি থাকে তাহলে এও দেখতে হবে যে তার জন্য সময়ও কম ছিল। উপকরণের কথা না হয় না-ই বললাম। আপনার মনঃপূত হবে কিনা জানি না, ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যৎসামান্য হলেও কিছু অন্তত করা হয়েছে : নতুন-নতুন প্রয়োজনীয় চিন্তার প্রসার ঘটেছে, এককালের ভাবালু ও রোমান্টিক রচনার জায়গায় কিছু নতুন-নতুন প্রয়োজনীয় লেখার প্রসার ঘটেছে। সাহিত্যে অনেক বেশি পরিপূর্ণতার রং ধরছে, বহু ক্ষতিকর বদ্ধমূল ধারণা হাস্যাস্পদ হয়েছে। সেগুলোর মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে।... এককথায়, আমরা অতীত থেকে নিজেদের যেভাবে বিচ্ছিন্ন করেছি তাতে সেখানে ফিরে যাবার কোন প্রশ্ন ওঠে না। আমার তো মনে হয় এটা একটা কাজের মতো কাজ।..."

"বুলি কপচান হচ্ছে! নিজেকে জাহির করতে চায়।" ফস করে বেরিয়ে এলো রাস্‌কোল্‌নিকভের মুখ থেকে।

"আজ্ঞে, কী বললেন?" কথাটা ঠিকমতো কানে না যেতে পিওতর পেত্রোভিচ্ জিগ্‌গেস করল। কিন্তু জবাব পাওয়া গেল না।

"যা বলেছেন।" জোসিমভ্ তাড়াতাড়ি যোগ করল।

"সত্যি বলিনি?" বিগলিত দৃষ্টিতে জোসিমভের দিকে তাকিয়ে পিওতর পেত্রোভিচ্ বলে চলল। আপনাকে মানতেই হবে..." বলতে-বলতে আলোচনার সূত্র ধরে রাজুমিখিনের দিকে মুখ ফেরাল বেশ একহাত নিতে পেরেছে ভেবে কতকটা উল্লাসের ভাব নিয়ে। এই অবস্থায় রাজুমিখিনকে 'ইয়ং ম্যান' বলে সম্বোধন করতে গিয়েও সামলে নিয়ে শেষকালে যোগ করল : "আমাদের বেশ উন্নতি হয়েছে, অথবা যাকে আজকের দিনে প্রগতি বলে তা আমরা অর্জন করেছি,—অন্তত বিজ্ঞান আর অর্থনৈতিক সত্যের বিচারে তো বটেই।..."

"মামুলি কথা!"

"না, মোটেই মামুলি নয়, মশায়। যেমন ধরুন না, আজও যদি আমাকে বলা হয় 'প্রতিবেশীকে ভালোবাস', আর আমি যদি তা-ই করতাম, তাহলে অবস্থাটা কী হত বলুন তো?..." পিওতর পেত্রোভিচের উৎসাহ এখন কে দেখে! "...হত এই যে আমি আমার গায়ের কোর্তাটা আধাআধি ছিঁড়ে পড়শির সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতাম, আর তার ফলে আমাদের দু'জনকেই অর্ধনগ্ন হয়ে থাকতে হত। কথায় বলে হাতের একটা পাখি ঝোপের দুটোর থেকে ভালো। বিজ্ঞান বলে, সবার আগে ভালোবাস নিজেকে—একমাত্র নিজেকে, যেহেতু পৃথিবীতে সমস্ত কিছুর ভিত্তি মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ।

একমাত্র নিজেকে যদি ভালোবাসতে পার তাহলে তুমি তোমার কাজও সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবে, তোমার গায়ের কোর্তাও যেমনকার তেমন আস্ত থেকে যাবে। অর্থনীতির সত্য এর সঙ্গে আরও যেটা যোগ করে তা এই যে সমাজে ব্যক্তিগত কারবারের অর্থাৎ কিনা আস্ত কোর্তার যত বেশি ভালো বন্দোবস্ত করা যায়, ততই তার ভিত বেশি পোক্ত হয়, ততই সেখানে সাধারণের কাজেরও ভালো আয়োজন করা যায়। তার মানে সম্পূর্ণভাবে, একান্তই নিজের জন্য কিছু অর্জন করার সঙ্গে-সঙ্গে তারই সাহায্যে আমি বলতে গেলে সমাজের আর দশজনের জন্যও সম্পদ অর্জন করছি, আমার নিকট প্রতিবেশীদের এমন এক পথে পরিচালনা করছি যার ফলে তারা ছেঁড়া কোর্তার চেয়ে বেশি কিছু পাবে এবং তা পাবে বিচ্ছিন্ন কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত ঔদার্যের দৌলতে নয়, সকলের সম্মিলিত সমৃদ্ধির ফলে। এটা একটা সহজ সরল আইডিয়া কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, সেখানে পৌঁছুতে আমাদের বড় বেশি সময় লাগছে, যেহেতু বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস ও ভাবালুতা। কিন্তু মনে হয়, জিনিসটা বোঝার মতো একটু বোধশক্তি দরকার..."

"মাফ করবেন, আমারও বোধশক্তি একটু কম", কঠিন স্বরে তাকে বাধা দিয়ে বলল রাজুমিখিন। "তাই বলি কি এখানেই ইতি টানা যাক। আমি কথা বলতে শুরু করেছিলাম একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। আসলে নিজেকে প্রবোধ দেবার জন্য এইসব ফাঁকা বুলি, নিত্যকার, নিরন্তর এইসব মামুলি ব্যাপার-স্যাপার এবং ঘুরে-ফিরে সেই একই জিনিস... ঈশ্বরের দিব্যি! ...আমাকে গত তিন বছর ধরে এমন ঘেন্না ধরিয়ে দিয়েছে যে আমি নই, অন্যেরাও যখন আমার সাক্ষাতে ওসব কথা বলে তখন লজ্জায় লাল হয়ে যাই...বিশ্বাস করুন। আপনি সম্ভবত আপনার জ্ঞান জাহির করার জন্য একটু তাড়াহুড়ো করে ফেলেছেন, সেটা অবশ্য ক্ষমার যোগ্য। এর মধ্যে আমি দোষের কিছু দেখি না। এখন আমার শুধু একটাই জিজ্ঞাস্য : আপনার পরিচয় কী? কেননা, আসল ব্যাপারটা কি জানেন, সম্প্রতি এত বেশি সংখ্যক নানা ধরনের ফন্দিবাজ লোকজন আমাদের সাধারণ স্বার্থের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে এবং যা কিছু তারা নিজেদের স্বার্থে স্পর্শ করছে তাকেই তারা এত বেশি বিকৃত করে ফেলছে যে পুরো কাজটা কদর্য হয়ে যাচ্ছে। যাক, অনেক হয়েছে।"

"শুনুন মশাই", থতমত খাওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট পরিমাণে আত্মসম্মান বজায় রাখার চেষ্টা করে মিস্টার লুজিন বলতে গেল, "আপনি কি এতটা অভদ্রভাবে বোঝাতে চাইছেন যে আমিও..."

"আরে না না...তাই কি আমি পারি ?...কিন্তু বলি কি, অনেক হয়েছে!"

কথাটা উড়িয়ে দিয়ে রাজুমিখিন চট করে জোসিমভের দিকে ঘুরে তাদের আগেকার কথাবার্তার খেই ধরল।

ব্যাখ্যাটা তৎক্ষণাৎ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি পিওতর

পেত্রোভিচের ছিল। যা হোক মিনিটদুয়েক বাদে সে ওঠার সঙ্কল্প করল।

রাস্‌কোল্‌নিকভের উদ্দেশ্যে সে বলল, "আমাদের যে আলাপ-পরিচয়ের সূত্রপাত হল, আপনার আরোগ্যলাভের পর বিশেষ পরিস্থিতির কারণে তা আরও ঘনিষ্ঠ হবে বলে মনে করি। আশা করি আপনি সে বিষয়ে অবহিত আছেন। ...আপনার আরোগ্য বিশেষ করে কামনা করি।..."

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ মাথা পর্যন্ত ঘোরাল না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর উদ্যোগ করল পিওতর পেত্রোভিচ্‌।

"ওর কাছে বন্ধক রেখেছিল এমন কোন খদ্দেরই নির্ঘাত খুন করেছে!" জোসিমভের সুচিন্তিত রায়।

"নির্ঘাত কোন খদ্দের!" ওকে সায় দিয়ে বলল রাজুমিখিন। "পর্‌ফিরি তার নিজের মনোভাব প্রকাশ করছে না বটে, কিন্তু বন্ধকের খদ্দেরদের জেরা করছে।..."

"বন্ধকের খদ্দেরদের জেরা করছে?" রাস্‌কোলনিকভ্‌ চেঁচিয়ে জিগ্‌গেস করল।

"হ্যাঁ, কিন্তু তাতে কী হয়েছে?"

"কিছু না।"

"ও তাদের পাচ্ছে কোথায়?" জোসিমভ্‌ জিগ্‌গেস করল।

"কারও-কারও নাম কোখ্‌ বলেছে, আবার কারও কারও নাম জিনিসের মোড়কের গায়ে লেখা ছিল। কেউ-কেউ আবার খবর শুনে নিজে থেকে এসেছে।..."

"কিন্তু যাই বল বাপু লোকটা বেশ ধূর্ত আর পাকা, নির্ঘাত কোন ঘাগু মাল! কী সাহস! কী মনের জোর!"

"আসলে কিন্তু মোটেই তা নয়!" বাধা দিয়ে রাজুমিখিন বলল। "তাইতেই তো তোমাদের সবাইকে গুলিয়ে দিচ্ছে। আমার মতে, একদম আনাড়ি, কাঁচা। সম্ভবত এটা ছিল তার প্রথম চেষ্টা! লোকটাকে যদি হিসেবি, ধূর্ত, ঘাগু বলে ধরা যায় তা হলে সমস্ত ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হবে। কিন্তু যদি ধরা যায় লোকটা আনাড়ি তাহলে দেখা যাবে যে সে নেহাত দৈবক্রমে বিপদ থেকে পার পেয়ে গেছে। আর দৈবক্রমে কীই বা না হতে পারে? তাছাড়া কী কী বাধা দেখা দিতে পারে সম্ভবত তাও সে আগে থাকতে ভেবে দেখেনি। কীভাবে সে কাজটা করেছে, তাও দেখ—দশ-বিশ রুবলের জিনিস নিয়ে পকেটে ঠাসল, ঘাঁটাঘাঁটি করল বুড়ির ট্রাঙ্ক, যত কাপড়চোপড়—অথচ আলমারির ভেতরে সবচেয়ে ওপরের দেরাজে একটি ঝাঁপিতে বন্ডের কাগজপত্রের কথা বাদ দিলেও একমাত্র নগদ টাকাই পরে পাওয়া গেছে দেড় হাজার! ডাকাতি কী করে করতে হয় তাও জানে না— কেবল খুন করতেই জানে! এটা ওর প্রথম চেষ্টা। বলছি তোমাকে, প্রথম চেষ্টা। লোকটা মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। হিসেব করে কাজ করার জন্য নয়, বেঁচে গেছে স্রেফ কপালজোরে।"

"সরকারি কর্মচারির বিধবা স্ত্রী সেই বুড়ির সম্প্রতি খুন হওয়ার ঘটনাটা নিয়ে

বলছেন বুঝি?" জোসিমভের দিকে ফিরে ওদের কথার মাঝখানে বলে উঠল পিওতর পেত্রোভিচ্। ইতিমধ্যে সে হাতের দস্তানা পরে টুপিহাতে দাঁড়িয়েও পড়েছে। কিন্তু প্রস্থানের আগে আরও গোটাকয়েক জ্ঞানগর্ভ কথা বলার লোভ সে সামলাতে পারছিল না। নিজের সম্পর্কে লোকের মনে ভালো ধারণা সৃষ্টির জন্য সম্ভবত তার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। বিচারবুদ্ধির ওপর মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তার আত্মশ্লাঘা।

"হ্যাঁ। আপনি শুনেছেন?"

"শুনব না আবার! পাশেই তো..."

"বিশদ জানেন?"

"বলতে পারছি না। তবে এক্ষেত্রে আমাকে ভাবিয়ে তুলছে অন্য একটি পরিস্থিতি, বলা যেতে পারে আস্ত একটা সমস্যা। গত বছরপাঁচেক হল নীচু শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে সে কথা না হয় না-ই বললাম; না-ই বললাম সর্বত্র লুঠতরাজ, চুরি-বাটপারির নিত্য ঘটনা। আমি সবচেয়ে অবাক হয়ে যাই এই ভেবে যে উঁচু শ্রেণীর মধ্যে অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে একইভাবে এবং বলতে গেলে, সমান্তরালভাবে। কোথাও শোনা যাচ্ছে এককালের কোন এক ছাত্র সদর রাস্তায় মেইলব্যাগ লুঠ করেছে; কোথাও সমাজের গণ্যমান্য লোকেরা নোট জাল করছে। আবার মস্কোর লটারি ও প্রিমিয়াম বন্ডের টিকিট জাল করতে গিয়ে ধরা পড়েছে গোটা একটি দল—তাদের পালের গোদা বিশ্ব ইতিহাসের একজন লেকচারার। কখনও টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে রহস্যজনকভাবে জড়িত হওয়ার ফলে বিদেশে কোথাও খুন হচ্ছে আমাদের কোন সচিব।...এখন এই সুদখোর বুড়ির হত্যাকারী যদি হয়ে থাকে ওর কাছে যারা বন্ধক রেখেছিল তাদেরই কেউ, তাহলে মানতে হবে লোকটা সমাজের বেশ ওপরের স্তরের কেউ হবে, যেহেতু চাষাভুষোরা সোনার জিনিস বন্ধক দেয় না। এখন আমাদের সমাজের সুসভ্য অংশের মধ্যে একদিক থেকে এই যে অধঃপতন, এর ব্যাখ্যা কী দেবেন?"

"অনেক অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে..." জোসিমভ্ জবাব দিল।

"ব্যাখ্যাটা কী?" রাজুমিখিন নাছোড়বান্দা। "কেন? যে অকর্মণ্যতা আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে, তাই দিয়েই কিন্তু দিব্যি ব্যাখ্যা করা যায়।"

"তার মানে? সে কী রকম?"

"আচ্ছা, মস্কোর আপনার ওই লেকচারারকে যখন প্রশ্ন করা হয় কেন সে টিকিট জাল করেছিল, তার উত্তর কী ছিল? 'সবাই বড়লোক হয় নানা উপায়ে, আমিও বড়লোক হতে চেয়েছিলাম যত তাড়াতাড়ি পারা যায়।' হুবহু কথাগুলো মনে নেই, তবে মোদ্দা কথাটা ছিল এই যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, বিনাপরিশ্রমে, সহজ উপায়ে বড়লোক হওয়ার সাধ হয়েছিল। ওদের অভ্যাস জীবনযাত্রার জন্য সমস্ত জিনিস তৈরি অবস্থায় হাতের কাছে পাওয়া, অন্যের হাতে ধরা রশি বাঁধা অবস্থায় হাঁটি-হাঁটি পা

ফেলা। চর্বিতচর্বণ করা। তাই আসল সময় আসতে ওদের যার-যার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ল।"

"কিন্তু তাহলে নৈতিকতা? যাকে বলে ন্যায়নীতি..."

"আরে অত ঝামেলা পাকাচ্ছেন কেন?" অপ্রত্যাশিতভাবে ওদের কথার মাঝখানে বলে উঠল রাস্কোল্নিকভ্।" "আপনার তত্ত্ব অনুযায়ীই তো হল!"

"আমার তত্ত্ব অনুযায়ী কী রকম?"

"আপনি এইমাত্র যে তত্ত্ব প্রচার করছিলেন তা থেকে যদি কোন যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত টানা যায় তাহলে দাঁড়ায় এই যে লোকের গলা কাটা যেতে পারে।..."

"কী বলছেন!" লুজিন চিৎকার করে বলে উঠল।

"না, ব্যাপারটা তা নয়!" জোসিমভ রায় দিল।

রাস্কোল্নিকভ্ শুয়ে রইল। তার মুখ বিবর্ণ, ওপরের ঠোঁটটা থরথর করে কাঁপছিল, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

"সবকিছুরই একটা সীমা আছে", সদম্ভে ঘোষণা করল লুজিন। "অর্থনৈতিক আইডিয়া মানেই খুন করার আমন্ত্রণ নয়। আর আমরা যদি কেবল ধরে নিই..."

"আচ্ছা এটা কি সত্য যে আপনি..." হঠাৎ লুজিনের কথার মাঝখানে আবার বাধা দিয়ে বলে উঠল রাস্কোল্নিকভ্। কথা বলতে-বলতে লুজিনকে অপমান করতে পারার সুযোগ পেয়ে একধরনের উল্লাসও প্রকাশ পেল তার ক্রোধকম্পিত কণ্ঠস্বরে। "...এটা কি সত্যি যে আপনি যখন আপনার ভাবী বধূর সম্মতি পেলেন ঠিক সেই মুহূর্তে তাকে বলেছিলেন যে আপনার আনন্দিত হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হল... সে নিঃস্ব ... কেননা নিঃস্ব ঘর থেকে স্ত্রী ঘরে আনলে আখেরে লাভ আছে, পরে তার ওপর প্রভুত্ব খাটান যায় এবং ... সে যে আপনার দাক্ষিণ্যের ওপর আছে এই বলে তাকে উঠতে-বসতে খোঁটা দেওয়া যায়?"

"কী বলছেন মশায়!" রাগে, বিরক্তিতে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে হতচকিত লুজিন গলা চড়াল। "একী কথা মশায়!...এ যে রীতিমতো কদর্য! মাফ করবেন, কিন্তু আমি আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে ওসব উড়ো কথা। আপনার কাছে যে খবর এসে পৌঁছেছে, অথবা আরও ভালোভাবে বলতে গেলে, আপনার গোচরীভূত হয়েছে তার এতটুকু সুস্থ স্বাভাবিক ভিত্তি নেই। ...আমি... আমি আঁচ করতে পারছি কে...এককথায়, কার এটা কীর্তি...এককথায়, আপনার মাতাঠাকুরানী।...প্রসঙ্গত তাঁর অন্যান্য আরও অনেক ভালো গুণ থাকা সত্ত্বেও অমনিতেই কেন যেন আমার মনে হয়েছিল উনি বেশ খানিকটা ভাবপ্রবণ এবং ওঁর মনের গড়নটা একটু রোমান্টিক ধাঁচের। ...তবু তিনি যে বিষয়টিকে কল্পনাশক্তির সাহায্যে এমন বিকৃতভাবে গ্রহণ করতে এবং উপস্থিত করতে পারেন এই ধারণা থেকে আমি সহস্র যোজন দূরে ছিলাম। শেষে কিনা... শেষে কিনা..."

"তাহলে বলব আপনাকে?" বালিশে ভর দিয়ে সামান্য উঠে, লুজিনের ওপর তীক্ষ্ণ জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে হুঙ্কার দিয়ে উঠল রাস্‌কোল্‌নিকভ! "বলব কি?"

"কী বলতে চান মশায়?" থমকে গিয়ে অপমানিত লুজিন যুদ্ধং দেহি ভঙ্গিতে অপেক্ষা করতে লাগল, উত্তরে রাস্‌কোলনিকভ কী বলে। নীরবতা কয়েক মুহূর্ত স্থায়ী হল।

"বলতে চাই এই যে আপনি যদি ফের...আমার মা'র সম্পর্কে আর একটি কথাও উচ্চারণ করার... স্পর্ধা দেখান...তাহলে আমি আপনাকে এমন এক ধাক্কা মারব যে সিঁড়ি দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে নিচে নামতে হবে আপনাকে।"

"কী হল তোমার!" রাজুমিখিন চিৎকার করে উঠল।

"দেখতেই পাচ্ছেন তো মশায়!" লুজিনের মুখ ততক্ষণে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেছে, সে ঠোঁট কামড়াল। "আমার কথা শুনে রাখুন তাহলে মশায়," চাপা ক্রোধে তার গলা বুজে আসছিল তবু প্রাণপণে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করে সুচিন্তিতভাবে সে বলতে শুরু করল, "আমার ওপর আপনার যে রাগ অনেক আমি আগে থাকতে, একেবারে গোড়াতেই টের পেয়েছিলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইচ্ছে করে আরও কিছুক্ষণ এখানে থেকেছি আরেকটু বেশি জানার উদ্দেশ্যে। আপনি অসুস্থ এবং আমার একজন আত্মীয় বলে অনেক কিছুই ক্ষমা করতে পারতাম, কিন্তু এখন...আপনাকে...না মশায়, কখনও নয়।..."

"আমি অসুস্থ নই!" রাস্‌কোল্‌নিকভ্ গর্জন করে উঠল।

"তাহলে তো আরও ভালো মশায়।..."

"কেটে পড়ুন দেখি এখান থেকে! ইচ্ছে করলে জাহান্নামে যেতে পারেন!"

লুজিন তার বক্তব্য শেষ না করে ততক্ষণে নিজেই বেরিয়ে যাচ্ছিল আবার টেবিল ও চেয়ারের মাঝখান দিয়ে কোনমতে পথ করে নিয়ে। রাজুমিখিন এবারে তার পথ করে দেবার জন্য উঠে দাঁড়াল। দরজা দিয়ে বের হওয়ার সময় সামান্য ঝুঁকে পড়ে সাবধানতার খাতিরে টুপিটা কাঁধ বরবার তুলে ধরল লুজিন। কারও দিকে তাকাল না, এমনকি যে জোসিমভ্ তাকে অনেকক্ষণ ধরে ঘাড় নেড়ে ইশারায় রোগীকে ঘাঁটাতে নিষেধ করছিল তাকে পর্যন্ত ঘাড় নেড়ে অভিবাদন না জানিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। এইসময় তার পিঠ যে ভাবে নুইয়ে পড়েছিল তা থেকেও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না কী ভয়ঙ্কর অপমানের বোঝা সে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

"এটা করা কি উচিত হল? করা উচিত হল কি?" মাথা নাড়তে-নাড়তে চিন্তিতভাবে রাজুমিখিন বলল।

"আমাকে একা থাকতে দাও, একা থাকতে দাও তোমরা সবাই!" ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে বলল রাস্‌কোল্‌নিকভ্। "তোমাদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি! শেষপর্যন্ত একটু শান্তিতে থাকতে দেবে কি আমাকে? আমি তোমাদের থোড়াই ভয়

করি। আমি এখন কাউকে ভয় পাই না, কাউকে না। তফাত যাও আমার কাছ থেকে! আমি একা থাকতে চাই, একা, একা, একা!"

"চল, যাওয়া যাক!" রাজুমিখিনের দিকে মাথা নেড়ে বলল জোসিমভ্।

"কিন্তু ওকে এইভাবে ফেলে যাওয়া কি ঠিক হবে?"

"চল, চল!" জোর দিয়ে সেই একই কথা বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল জোসিমভ্। রাজুমিখিন একটু ভেবে শেষকালে ছুটে তার নাগাল ধরল।

"ওর কথা আমরা না শুনলে তার পরিণাম আরও খারাপ হতে পারত', ওরা যখন সিঁড়িতে, তখন জোসিমভ্ বলল। "ওকে উত্তেজিত করা ঠিক হবে না।..."

"কী হয়েছে ওর?"

"ওকে যদি ঠিক জায়গায় ঘা মারা যেত তাহলে কাজের কাজ হত! এখন ওর শক্তি ছিল...জান, ওর মাথার ভেতরে কিছু একটা আছে—বদ্ধমূল হয়ে আটকে আছে, যার ভার ওর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। ...এখানেই আমার ভয়—সত্যিকারের ভয়।"

ওই যে ভদ্রলোকটি, পিওতর... কী যেন নামটা... পিওতর পেত্রোভিচ্ই হয়ত বা ...কথাবার্তা শুনে মনে হল ওর বোনকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন এবং রোদিয়া আগেই চিঠিতে জানতে পেরেছিল...অসুস্থ হওয়ার ঠিক আগে..."

"হ্যাঁ, কী করতে যে ছাই লোকটা এখানে এসেছিল! হয়ত গোটা ব্যাপারটা ভণ্ডুল করে দিল। তবে তুমি লক্ষ করেছ কি, সবেতে ও উদাসীন, সব ব্যাপারে চুপচাপ, কেবল একটা বিষয় ছাড়া— সে প্রসঙ্গ উঠলে ও আর স্থির থাকতে পারে না— সেটা হল খুনের ঘটনা।..."

"হ্যাঁ, তাইতো!" রাজুমিখিন সায় দিল। খুবই লক্ষ করেছি! আগ্রহ দেখাচ্ছে, ভয় পাচ্ছে। যেদিন ও অসুস্থ হয়ে পড়ে থানার অফিসে ঠিক সেইদিন এতেই ও ভয় পেয়েছিল—অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।"

"আজ সন্ধ্যায় ঘটনাটা তুমি আমায় একটু বিশদে বোলো তো। আমিও পরে তোমায় কিছু বলব। ও আমার আগ্রহ বাড়িয়ে তুলছে, খুবই বাড়িয়ে তুলছে। আধঘন্টাখানেক বাদে এসে একবার দেখে যাব কেমন আছে। তবে বলতে পারি, জ্বরজ্বারির কোন আশঙ্কা নেই।..."

"বাঁচালে ভাই! আমি তাহলে এখনকার মতো পাশেন্কার ওখানে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি, নাস্তাসিয়ার মারফত নজর রাখব ওর ওপর।..."

সকলে চলে যাবার পর রাস্কোল্নিকভ্ ব্যাকুল ও অসহিষ্ণু দৃষ্টিতে তাকাল নাস্তাসিয়ার দিকে। কিন্তু নাস্তাসিয়ার ঘর ছেড়ে যাবার কোন তাড়া দেখা গেল না।

"এখন কি চা খাবে?" নাস্তাসিয়া জিগ্গেস করল।

"পরে! আমার ঘুম পাচ্ছে! একা থাকতে দাও আমাকে।..."

রাস্কোল্নিকভ্ কাঁপতে-কাঁপতে দেয়ালের দিকে মুখ ফেরাল। নাস্তাসিয়া বেরিয়ে গেল।

ছয়

কিন্তু নাস্তাসিয়া বেরিয়ে যেতে না যেতে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বিছানা ছেড়ে উঠে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। কিছুক্ষণ আগে রাজুমিখিনের আনা জামাকাপড়ের যে পোঁটলাটা সে নিজের হাতে বেঁধে রেখেছিল, সেটা খুলে জামাকাপড় পরতে লাগল। অদ্ভুত ব্যাপার—এই সময় মনে হচ্ছিল হঠাৎ যেন তার উদ্বেগ দূর হয়ে গেছে। খানিকক্ষণ আগেকার অর্ধোন্মত্ত বিকারের ভাবটা নেই, গত কয়েকদিন হল যে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের ভাব সর্বক্ষণ মনের মধ্যে ছিল, তাও নেই। এটা ছিল শান্তি উপলব্ধির অদ্ভুত ও আকস্মিক প্রথম কয়েকটি মুহূর্ত। তার ভাবভঙ্গি ছিল নিখুঁত, সুস্পষ্ট, তাতে পাওয়া যাচ্ছিল দৃঢ় সঙ্কল্পের আভাস। "আজ, আজই!..." সে আপন মনে বিড়বিড় করে বলল। সে অবশ্য বুঝতে পারছিল যে এখনও সে দুর্বল। কিন্তু যে প্রচণ্ড শক্তিশালী মানসিক প্রয়াস এই শান্তির উপলব্ধি এনে দিয়েছে, তাকে স্থির ভাবনায় উপনীত করেছে তা তার মধ্যে শক্তি ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ অবশ্য এমনও আশা করছিল যে রাস্তায় সে পড়ে যাবে না। আপাদমস্তক নতুন পোশাক-পরিচ্ছদে যথারীতি সজ্জিত হয়ে সে টেবিলের ওপর পড়ে থাকা টাকাগুলোর দিকে তাকাল, একটু ভেবে সেগুলো পকেটস্থ করল। সবসুদ্ধ ছিল পঁচিশ রুবল। দশ রুবল থেকে জামাকাপড় বাবদ খরচ করার পর পাঁচকোপেকের যে রেজগি তামার মুদ্রাগুলো রাজুমিখিন ফেরত এনেছিল তাও তুলে নিল। তারপর নিঃশব্দে দরজার ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে পড়ল ঘর ছেড়ে। সিঁড়ি দিয়ে নামল, নামার সময় হেঁসেলের খোলা দরজার দিকে দৃষ্টিপাত করল, দেখতে পেল নাস্তাসিয়া তার দিকে পিছন ফিরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বাড়িউলির সামোভারে আঁচ দিচ্ছে। নাস্তাসিয়া কিছু শুনতে পেল না। তা ছাড়া কে-ই বা আন্দাজ করতে পেরেছিল যে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারে? মিনিটখানেক বাদেই সে রাস্তায় এসে পড়ল।

তখন আটটা বাজে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। গুমোট সেই আগেকার মতো। কিন্তু রাস্‌কোল্‌নিকভ্ নগর-কলুষিত সেই ধুলোবালিভরা পূতিগন্ধময় বাতাসে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিল। প্রথম-প্রথম মাথা ওর সামান্য ঘুরছিল। কিন্তু ওর পাণ্ডুর বর্ণের শীর্ণ মুখে, কোটরে বসা চোখে আচমকা খেলে গেল বন্য উদ্দীপনার একটা ঝলক। সে জানে না কোথায় যাবে। এটা সে ভেবেও দেখেনি। সে জানে একটাই: *এটা* চুকিয়ে-বুকিয়ে দিতে হবে আজই, এখনই। অন্যথায় সে বাড়ি ফিরবে না, যেহেতু *এভাবে বাঁচতে সে চায় না*। কী ভাবে চুকিয়ে-বুকিয়ে দেবে? উপায়টা কী? এ বিষয়ে তার কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এ নিয়ে ভাবার ইচ্ছেও তার ছিল না। ভাবনাটা সে তাড়িয়ে দিচ্ছিল: ভাবনা তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল। সে শুধু উপলব্ধি করছিল, সে জানত যে সবকিছু পালটাতে হবে— তা সে এভাবেই হোক, ওভাবেই হোক—"কী ভাবে,

তাতে কিছু এসে যায় না," স্থির সঙ্কল্প ও দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে, মরিয়ার মতো সে আওড়াল।

পুরানো অভ্যাসবশত, আগে সচরাচর যে পথে বেড়াত, সেই পথ ধরে সোজা সে রওনা দিল সেন্নায়া স্কোয়ারের দিকে। সেন্নায়ায় পৌঁছুনোর আগেই সে দেখতে পেল সদর রাস্তার ওপরে খুচরো জিনিসপত্র বিক্রির এক দোকানের সামনে কালো চুলওয়ালা একটা অল্পবয়সী লোক দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অর্গ্যানের হাতল ঘুরিয়ে বাজারে কাটতি একটা রোমান্টিক গানের সুর বাজাচ্ছে। তার সঙ্গিনীটি—বছর পনেরোর একটি মেয়ে— দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাতে তার সামনে। পোশাক-পরিচ্ছদে মেয়েটি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের মতো— পরনে চওড়া ঘেরের ঘাগরা, মাথায় পাতলা ওড়না, গনগনে লাল রঙের পালক গোঁজা স্ট্র হ্যাট, হাতে দস্তানা— সবই অবশ্য পুরানো, রংচটা। মেয়েটা গান গাইছিল রুক্ষ ভাঙা-ভাঙা গলায়। তবে তার কণ্ঠস্বরে জোর ছিল, মাধুর্যেরও একেবারে অভাব ছিল এমন বলা যায় না। গান সে গাইছিল দোকান থেকে দু-এক কোপেক পাবার আশায়। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ দু'তিন জন শ্রোতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে শুনল, পাঁচ কোপেকের একটা মুদ্রা বার করে মেয়েটির হাতে দিল। মেয়েটি সপ্তমে সুর চড়িয়ে সবচেয়ে করুণ জায়গাটিতে আচমকা গান থামিয়ে দিল, যেন বলা নেই কওয়া নেই গান বন্ধ করে দিয়ে বাজনাদারকে হেঁকে বলে উঠল: "হয়েছে!" দুজনে পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলল পরের দোকানের উদ্দেশ্যে।

অর্গ্যান-বাজিয়ে লোকটার কাছাকাছি, রাস্‌কোল্‌নিকভের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল একজন পথচারী। লোকটাকে যুবক বলা চলে না। দেখে মনে হয় ভবঘুরে গোছের। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ হঠাৎ তার দিকে ফিরে জিগ্‌গেস করল, "আপনি রাস্তার গান পছন্দ করেন বুঝি?" লোকটা অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল তার দিকে। "আমি পছন্দ করি," রাস্‌কোলনিকভ্ বলল— কিন্তু এমন ভাব করে বলল যেন কথাটা আদৌ রাস্তার গান নিয়ে হচ্ছে না। "আমার ভালো লাগে যখন ওরা অর্গ্যানের সুরে গান গায় হেমন্তকালের স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা সন্ধ্যার অন্ধকারে— হ্যাঁ, অবশ্যই হতে হবে স্যাঁতস্যাঁতে, যখন রাস্তার লোকদের সকলের মুখে ফুটে ওঠে ফিকে সবুজের আভা, রুগী-রুগী ভাব। কিংবা আরও ভালো হয় যদি ভিজে বরফ ঝরতে থাকে— একেবারে সোজা ধারায় হাওয়ার কোন স্পর্শ ছাড়া —বুঝতে পারছেন? —আর তার ভেতর দিয়ে ঝিকমিক করে রাস্তার গ্যাসলাইটগুলো..."

"জানি না মশায়... মাফ করবেন..." রাস্‌কোল্‌নিকভের প্রশ্নে এবং বেয়াড়া ধরনের চেহারা দেখে ঘাবড়ে গিয়ে এই কথা বলে লোকটা রাস্তা পার হয়ে ওধারে চলে গেল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ সোজাসুজি হাঁটা দিল। হাঁটতে-হাঁটতে এসে পড়ল সেন্নায়ার সেই কোনাটিতে যেখানে খুচরো ব্যবসায়ী ও তার বৌকে জিনিস ফিরি করতে সে

দেখেছিল, যেখানে সেদিন লিজাভেতার সঙ্গে ওদের কথা বলতে শুনেছিল। কিন্তু তখন তারা ওখানে নেই। জায়গাটা চিনতে পেরে সে দাঁড়িয়ে পড়ল, চারপাশে নজর বুলিয়ে দেখল। আটা ভাঙানোর দোকানের মুখে লাল শার্টপরা এক ছোকরা বসে - বসে হাই তুলছে দেখে তার দিকে ফিরে তাকাল।

"এখানে এই কোনাটাতে একজন ফিরিওয়ালা আর একজন মেয়েমানুষ—তার বৌ ফিরি করে না?"

"কত রকমের লোকই তো ফিরি করে," কটমট করে রাস্‌কোল্‌নিকভের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে-করতে ছোকরা উত্তর দিল।

"কী যেন তার নাম?"

"কী নাম আবার? যে নাম তাকে দেওয়া হয়েছিল ছোটবেলায়।"

"তুমি কি জারাইস্কের লোক? কোন্ জেলায় বাড়ি বল তো?"

ছোকরা আবার তাকাল রাস্‌কোল্‌নিকভের দিকে।

"জেলা নয় হুজুর, আমাদেরটা হল জেলাসদর, তা সে যাতায়াত ছিল আমার দাদার, আমি বাড়িতেই বসে থাকতাম। তাই অতশত জানি নে হুজুর ...মাফ করবেন, অপরাধ নেবেন না।"

"ওপরে ওটা কী?— খাবারের দেকান?"

"ওটা সস্তার হোটেল। বিলিয়াড খেলারও বন্দোবস্ত আছে। ইচ্ছে করলে রাজকন্যেও পেতে পারেন... ডবকা দেখে!"

রাসকোল্‌নিকভ্ স্কোয়ারটা পার হয়ে গেল। এককোনায় ঘন ভিড়— সবই চাষাভুষো। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ লোকজনের মুখের দিকে তাকাতে-তাকাতে গুঁতোগুঁতি করে ভিড়টা যেখানে সবচেয়ে ঘন তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। কেন যেন সকলের সঙ্গে কথা বলার একটা প্রবল বাসনা সে ভেতরে-ভেতরে অনুভব করছিল। কিন্তু লোকগুলো তার দিকে কোন মনোযোগ দিল না। সকলে ছোট-ছোট দল পাকিয়ে নিজেদের মনে জটলা করছে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ একটু দাঁড়াল, তারপর কী যেন ভেবে ফুটপাথ ধরে দ্রুত পায়ে চলল ডান দিকে, ভজ্‌নেসেন্‌স্কি এভিনিউয়ের দিকে। স্কোয়ারের পাশ কাটিয়ে সে গিয়ে পড়ল একটা গলির ভেতরে।...

এর আগেও প্রায়ই সে এই ছোট গালিপথটা দিয়ে যাতায়াত করেছে। পথটা স্কোয়ার থেকে একটা বাঁক নিয়ে সাদোভায়া স্টিটের দিকে চলে গেছে। সম্প্রতি তার মন যখন খারাপ হত তখন 'মন আরও খারাপ করার জন্য' এইসব জায়গায় ঘোরাঘুরি করার বাসনা যেন তার প্রবল হয়ে উঠত। এবারে অবশ্য গলিতে ঢুকেছিল বিশেষ কিছু না ভেবেচিন্তে। এখানে আছে একটা বড় বাড়ি যার পুরোটা জুড়ে রয়েছে একটা বীয়ার পাব, নানা ধরনের খুচরো খাবার আর মদের দোকান। সেগুলোর ভেতর থেকে প্রতি মুহূর্তে ছুটে বেরিয়ে আসছে কিছু-কিছু মেয়েমানুষ। তাদের কারও

মাথায় টুপি নেই, গায়ে কোট নেই— বেশভূষা দেখে মনে হয় যেন পড়শি-বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছে। দু'তিন জায়গায় তারা ফুটপাথে দল বেঁধে ভিড় করে ছিল— বেশির ভাগই নিচতলায় ঢোকার মুখে— সেখান থেকে দুধাপ নিচে নামলে তলকুঠুরিতে নানারকম আমোদ-প্রমোদের প্রশস্ত ব্যবস্থা। ওরকম একটা ডেরাতে সেই মুহূর্তে সারা রাস্তা মাত করে চলেছে হৈ-হল্লোড়, মেঝেতে পায়ের তাল ঠোকার আওয়াজ, টুং টাং গীটারের বাজনা, গান। জোর আমোদফুর্তি চলছে। ঢোকার মুখে ভিড় করে আছে মেয়েমানুষদের একটা বড় দঙ্গল। তাদের কেউ-কেউ বসে আছে সিঁড়ির ধাপে, কেউ ফুটপাতে, কেউ বা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছে। কাছে, সদর রাস্তার ওপর সিগারেট মুখে এক মাতাল সেপাই এলোপাতাড়ি হাঁটতে-হাঁটতে জোর গলায় খিস্তি করছে। দেখে মনে হয় এখানেই কোন একটা জায়গায় তার ঢোকার ইচ্ছে, কিন্তু কোথায় তা ভুলে বসে আছে। এক লোচ্চা আরেক লোচ্চাকে গালিগালাজ করছিল, রাস্তার আড়াআড়ি পড়ে গড়াগাড়ি খাচ্ছে এক বেহুঁশ মাতাল। মেয়েমানুষদের বড় দঙ্গলটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্‌কোল্‌নিকভ্। তারা কথাবার্তা বলছিল ফ্যাঁসফেঁসে গলায়, সকলের গায়ে ছিটকাপড়ের পোশাক, পায়ে সস্তার চামড়ার জুতো, মাথায় টুপির বালাই নেই কারও। কারও-কারও বয়স চল্লিশ, তবে তাদের মধ্যে সতেরো বছরের ছুকরিও আছে। প্রায় সকলের চোখের কোলে কালি।

ওখানকার, নিচের তলার সমস্ত হৈ-হল্লোড় আর মেঝেতে তাল ঠোকার আওয়াজ এবং গান কেন যেন আগ্রহ জাগিয়ে তুলল রাস্‌কোলনিকভের।...ওখান থেকে, হো হো হাসি আর চিৎকার-চেঁচামেচি ভেদ করে শোনা যাচ্ছিল গীটারের বাজনা। অস্বাভাবিক উঁচু পর্দায় ধরা গানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কে যেন মেঝেতে জুতোর তাল ঠুকে উদ্দাম নৃত্যে মেতে উঠেছে। বাইরের দরজার সামনে ঝুঁকে ফুটপাথ থেকে ভেতরে ঢোকার মুখে কৌতূহলী দৃষ্টি ফেলতে-ফেলতে উৎকর্ণ হয়ে সে শুনতে লাগল। তার চোখেমুখে গভীর চিন্তা আর বিষাদের চিহ্ন।

পায় পড়ি গো সেপাইদাদা লক্ষ্মীটি
নিজেই তুমি মারছ আমায় অমনটি!

গায়কের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ফেটে পড়ল। লোকটা কী গাইছে তা শোনার বড় ইচ্ছে হচ্ছিল রাস্‌কোল্‌নিকভের— যেন এর মধ্যে নিহিত আছে সত্যিকারের কোন তাৎপর্য।

'গেলে হয় না?' সে মনে-মনে ভাবল। লোকজন ফুর্তি করছে! মাতাল। 'কিন্তু আমারই বা মদ খেয়ে মাতাল হতে আপত্তি কি?'

"ভেতরে ঢুকবেন নাকি একবার, কর্তা?" একটা মেয়ে জিগ্‌গেস করল। গলাটা তার বেশ খনখনে। তবে একেবারে কর্কশ নয়। বয়স কম, গোটা দঙ্গলটার মধ্যে এই একজনই দেখতে-শুনতে নেহাত মন্দ নয়।

"বা। এই তো দিব্যি সুন্দরী মেয়ে!" শরীরটা একটু চিতিয়ে তার দিকে তাকিয়ে

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ বলে উঠল।

মেয়েটি হাসল। প্রশংসটা তার বেশ মনে ধরেছে।

"আপনি নিজেই দেখতে সুন্দর", সে বলল।

"কী রোগা!" ভারী গলায় আরেকজনের মন্তব্য। "হাসপাতাল থেকে সবে ছাড়া পেয়েছেন বুঝি?"

"সবাই যেন একেকটি লাটসাহেবের মেয়ে, কিন্তু নাকগুলো সব খাঁদা!" হঠাৎ একটা চাষাভুষো গোছের লোক কোথা থেকে এগিয়ে এসে ওদের কথার মাঝখানে বলে উঠল। তার বিকট মুখে ফুটে উঠেছে ধূর্ত হাসি। মোটা সুতি কাপড়ের লম্বা কোর্তাটার সবগুলো বোতাম খোলা। বেশ মৌজে আছে।

"জোর ফুর্তি হচ্ছে, অ্যাঁ?"

"এসেছ যখন তখন ভেতরে যেতে পার!"

"যাবই তো। আহা কি মজা!"

এই বলে লোকটা একরকম ডিগবাজি খেয়ে তলকুঠুরিতে গড়িয়ে পড়ল।

রাস্‌কোলনিকভ্‌ এগিয়ে চলল।

"এই যে কর্তা শুনুন!" পেছন থেকে ওকে চেঁচিয়ে ডাকল মেয়েটি।

"কী ব্যাপার?"

মেয়েটি থতমত খেয়ে গেল।

"আপনি বড় ভালোমানুষ কর্তা, আপনি যখন বলবেন তখনই আপনার জন্যে সময় দিতে পারলে আমি খুশি হব। কিন্তু এখন কেন যেন আপনার সামনে আমার বড় লজ্জা করছে। ভারি মিষ্টি মানুষটি গো আপনি, ছয়টা কোপেক দিন না—মদ খাব!"

রাস্‌কোলনিকভ্‌ পকেট হাতড়ে যা উঠল তাই দিয়ে দিল—তিনটে পাঁচ কোপেকের মুদ্রা।

"ওঃ কী দয়ার শরীর আপনার!"

"তোমার নাম কী?"

"দুক্‌লিদা বললেই হবে।"

"ছি, ছি, কেমনধারা ব্যাপার!" দলের ভেতর থেকে একজন দুক্‌লিদার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়িয়ে হঠাৎ মন্তব্য করে উঠল। "আমি তো বুঝতেই পারি না লোকে কী ভাবে ওরকম চাইতে পারে। আমার তো লজ্জায় মাথা কাটা যাবার মতো অবস্থা হত।..."

যে মেয়েটি এই কথা বলছিল, রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ কৌতূহলবশে তার দিকে তাকাল। মেয়েটির বয়স বছর তিরিশেক। মুখময় বসন্তের দাগ, কালশিটে, ওপরের ঠোঁটটা ফোলা। গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে, শান্তকণ্ঠে সে ধিক্কার দিয়ে বলল।

রাস্কোলনিকভ্ চলতে-চলতে মনে-মনে ভাবল, "কোথায়, মনে পড়ছে না, কোথায় যেন পড়েছি, একজন ফাঁসির আসামি মৃত্যুর এক ঘণ্টা আগে বলছে, অথবা হতে পারে ভাবছে, তাকে যদি অনেক উঁচুতে, খাড়া পাহাড়ের কোন শিলাখণ্ডের ওপর এমন একটা চিলতে জায়গায় থাকতে দেওয়া হয় যেখানে কোনরকমে দুটো পা রাখা যায় মাত্র, যার চারধারে শুধুই অতল গহ্বর, মহাসাগর, অনন্ত আঁধার, চিরনিঃসঙ্গতা, নিরন্তর ঝড়ঝঞ্ঝা— সেখানে যদি হাতখানেক জমির ওপর সারা জীবন, হাজার বছর, অনন্তকাল একপায়ে খাড়া হয়ে থাকতে হয়—তাও সই—এখন মরার চেয়ে ওভাবে জীবন কাটানোও ভালো! বাঁচতে হবে, বাঁচতে হবে, বাঁচতে হবেই! কী ভাবে সেটা বড় কথা নয়—আসল কথা, বাঁচতে হবে।...কত বড় সত্যি এটা! ওঃ ভগবান, কত বড় সত্যি! মানুষ কত ইতর! আবার এর জন্য যে তাকে ইতর বলে সে নিজেও ইতর", কয়েক মুহূর্ত পরে সে যোগ করল।

রাস্কোলনিকভ্ এবারে গিয়ে পড়ল আরেকটা রাস্তায়। "আরে! এ যে দেখছি 'ক্রিস্টাল প্যালেস'! এই 'ক্রিস্টাল প্যালেসের' কথাই না রাজুমিখিন তখন বলছিল! কিন্তু আমি কী চাইছিলাম যেন? ও হ্যাঁ, পড়তে হবে!... জোসিমভ্ বলছিল, কাগজে পড়েছে।..."

"খবরের কাগজ আছে?" একটা হোটেলে ঢুকে সে জিগ্গেস করল। বেশ কয়েকটা ঘর নিয়ে হোটেলটা বেশ প্রশস্ত, এমনকি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, যথেষ্ট ফাঁকা বটে। দু'তিনজন খদ্দের চা পান করছে, দূরের একটা ঘরে বসে আছে জনাচারেকের একটি দল—শ্যাম্পেনে চুমুক দিচ্ছে। রাস্কোল্নিকভের মনে হল তাদের মাঝখানে যেন জামিওতভ্ও আছে। দূর থেকে অবশ্য ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না।

"থাকলে থাক!" সে মনে-মনে ভাবল।

"ভোদ্কা ফরমাস দেবেন কি হুজুর?" ওয়েটার জিগ্গেস করল।

"চা দাও। আর নিয়ে এসো দেখি আমার জন্যে খবরের কাগজ—পুরনো খবরের কাগজ—এই গত দিনপাঁচেকের পরপর। বখশিস দেব'খন।"

"যে আজ্ঞে। এই যে আজকেরটা। তা ভোদকার ফরমাস হবে কি হুজুর?"

পুরনো কাগজ এলো, সেই সঙ্গে চা-ও। রাস্কোল্নিকভ্ জাঁকিয়ে বসে চোখ বুলিয়ে খুঁজতে লেগে গেল : ইভান ইজ্লের ...ইজ্লের...অ্যাজ্টেক সভ্যতা...অ্যাজটেক...ইজ্লের...অ্যাজটেক বংশের শেষ নিদর্শন...বার্তোলা. মাসিমো... অ্যাজ্টেক...ইজ্লের। ধুত্তোর! হ্যাঁ, এই যে স্থানীয় সংবাদ : সিঁড়ি হইতে মহিলার পতন... অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে দোকানির মৃত্যু... পেস্কিতে অগ্নিকাণ্ড... সেন্ট পিটার্সবুর্গ জিলায় অগ্নিকাণ্ড...আরও একটি অগ্নিকাণ্ড...ইজ্লের... ইজ্লের... ইজ্লের... ইজ্লের মাসিমো... আরে, এই তো..."

অবশেষে এতক্ষণ যা খুঁজছিল তা পাওয়া গেল। পড়তে শুরু করল। লাইনগুলো

নাচতে লাগল তার চোখের সামনে। তবু কষ্টেসৃষ্টে পড়ে ফেলল আগাগোড়া সংবাদটা, অধীর আগ্রহে পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে খুঁজতে লাগল পরের আরও খবর। পাতা ওলটাতে গিয়ে হাত কাঁপছিল, অস্থিরতার দরুন সর্বাঙ্গ কাঁপছিল থরথর করে। এমন সময় কে একজন এসে বসল এই টেবিলের ধারে, তারই পাশে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ চোখ তুলে তাকাল: জামিওতভ্‌, সেই জামিওতভ্‌ তার আদি-অকৃত্রিমরূপে। আঙুলে পাথর বসানো বড় বড় আঙটি। সেই চেইন, ক্রিমচর্চিত কালো কোঁকড়া চুলে সেই পরিপাটি সিঁথি, ফ্যাশনদুরস্ত ওয়েস্টকোট, সামান্য রংচটা ফ্রককোট আর বাসি জামা। তাকে খুশি-খুশি দেখাচ্ছে, মুখের হাসিটা তার অমায়িক আর বেশ খুশি-খুশি। শ্যাম্পেন পান করার ফলে তার তামাটে মুখে সামান্য রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে।

"এ কি! আপনি এখানে?" রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে এখানে দেখে হতবুদ্ধি জামিওতভ্‌ এমন সুরে কথাগুলি বলল যেন কতকালের পরিচিত। "অথচ গতকালই রাজুমিখিন আমাকে বলল যে আপনার জ্ঞান নাকি এখনও ফেরেনি। কি আশ্চর্য! আমি কিন্তু আপনার ওখানে গিয়েছিলাম।..."

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ জানত যে ওকে দেখতে পেয়ে জামিওতভ্‌ ঠিক এগিয়ে আসবে। রাসকোল্‌নিকভ্‌ খবরের কাগজগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে জামিওতভের দিকে মুখ ফেরাল। কিন্তু তার ঠোঁটে ছিল বিদ্রূপের হাসি, আর সেই হাসির মধ্য দিয়ে ফুটে বের হচ্ছিল এক নতুন ধরনের বিরক্তি ও অধৈর্যের ভাব।

"আপনি যে গিয়েছিলেন তা আমি জানি," রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ উত্তর দিল। "শুনেছি। আপনি আমার জন্যে মোজা খুঁজে বের করে দিয়েছিলেন।... জানেন, রাজুমিখিন আপনি বলতে অজ্ঞান। ও বলে আপনারা দুজনে নাকি লাভিজা ইভানোভ্‌নার কাছে গিয়েছিলেন— সেই লাভিজা ইভানোভ্‌না, যাকে আপনি তখন সাহায্য করার চেষ্টা করেন, ওই যে সেই লেফটেনান্ট বারুদকে চোখ টিপে ইশারা করেন, কিন্তু উনি কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না... মনে আছে? কিন্তু, না বোঝার কী ছিল বলুন তো? ব্যাপারটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার... তাই না?"

"লোকটা যা খেপা!"

"কে? বারুদ তো?"

"না, আপনার বন্ধু রাজুমিখিন।...

"আপনি কিন্তু দিব্যি আছেন মিস্টার জামিওতভ। সব ভালো-ভালো জায়গায় অবারিত দ্বার— এক পয়সাও খরচ নেই! তা এই এখন আপনাকে শ্যাম্পেন ঢেলে কে ভেজাচ্ছিল বলুন তো?"

"শ্যাম্পেন?... এই আমরা... খেলাম।... ও, যা ঢেলেছে!"

"দক্ষিণা। সবেরই সদ্ব্যবহার করে থাকেন!" রাস্‌কোলনিকভ্‌ হাসল। "ও কিছু

না। আপনি বড় ভালো ছেলে।... ও কিছু না।" জামিওতভের কাঁধে চাপড় মেরে সে বলল। "আমি কিন্তু খারাপ ভেবে বলিনি, বলেছি ভালোবেসে, মজা করে"— এই যেমন বলেছিল আপনাদের রঙের মিস্ত্রিটি—দমিত্রিকে দুমদাম মারার প্রসঙ্গে। সেই যে বুড়ির ব্যাপারে— জানেনই তো।"

"কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?"

"আরে, আমি হয়ত আপনার চেয়ে বেশিই জানি।"

"আপনি যেন কেমন অদ্ভুত লোক।... মনে হয় আপনি এখনও অসুস্থ। কেন যে খামোকা রাস্তায় বেরোলেন..."

"আমাকে দেখে অদ্ভুত মনে হচ্ছে বুঝি আপনার?"

"হ্যাঁ। কী পড়ছেন? খবরের কাগজ?

"হ্যাঁ, খবরের কাগজ।"

"অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে অনেক কথা লিখছে..."

"না, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা আমি পড়ছি না," এই বলে রহস্যময় দৃষ্টিতে তাকাল জামিওতভের দিকে। তার ঠোঁটে আবার ফুটে উঠল বিদ্রূপের বাঁকা হাসি। "না, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নয়," জামিওতভের দিক চোখ টিপে সে বলল! "তা বৎস, আমি কী পড়ছিলাম জানার জন্যে যে ভীষণ আগ্রহ তা স্বীকার করতে বাধা আছে কি?"

"বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। অমনি জিগ্‌গেস করেছিলাম। জিগ্‌গেস করাটা কি অন্যায়? আপনি কেন যে সব ব্যাপারে অমন..."

"শুনুন আপনি একজন পড়াশুনা জানা, শিক্ষিত লোক, তাই না?"

"আমি ইনটারমিডিয়েট অব্দি পড়েছি," জামিওতভের কথায় বেশ খানিকটা গর্বের ভাব। "ইনটারমিডিয়েট অব্দি! আহা আমার চড়ুই ছানা! মাথায় সিঁথির পরিপাটি, আঙুলে পাথর বসানো ভারী আংটির বাহার— বড়লোক তো বটেই! ছো, এ যে একটা মিষ্টি খোকা।" বলতে-বলতে জামিওতভের একেবারে মুখের ওপর খ্যাপার মতো খ্যাকখ্যাক করে হাসতে লাগল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌। জামিওতভ্‌ পিছিয়ে গেল— অপমানিত হয়ে ততটা নয়, যতটা ভড়কে গিয়ে।

"ভারি অদ্ভুত লোক তো!" জামিওতভ্‌ আবার বলল, বেশ গম্ভীরভাবে। "আমার মন বলছে আপনি এখনও ভুল বকছেন।"

"ভুল বকছি? মিছে কথা গো চড়ুই ছানা!... বলতে চান আমি অদ্ভুত? আচ্ছা, আপনাদের কৌতূহলের বস্তু— তাই না? কৌতূহলের বস্তু?"

"তা বটে।"

"তাহলে বলতে হবে আমি কী পড়ছিলাম, কী খুঁজছিলাম? ওঃ কতগুলো পুরনো কাগজই না আনিয়েছি! সন্দেহজনক, তাই না?"

"তা বলুন না!"

"ও, সঙ্গে-সঙ্গে কান খাড়া হয়ে উঠল বুঝি?"

"কিসের কান?"

"কিসের?— পরে বলব'খন। এখন তাহলে, বৎস আমার, ঘোষণা করছি, ... না বরং 'স্বীকার করছি'... না, তাও নয়, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি টুকে নিন' এভাবে বলাই ঠিক হবে!... সাক্ষ্য দিচ্ছি এই যে পড়ছিলাম, আমার আগ্রহ ছিল... আমি খুঁজছিলাম... খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলাম..." রাস্‌কোল্‌নিকভ চোখ কুঁচকে ইচ্ছে করে একটু থামল, তারপর বলল, "খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলাম এবং এই উদ্দেশ্যেই আমার এখানে আসা... সরকারি আমলার বিধবা স্ত্রী সেই বুড়ির খুন হওয়ার সংবাদ," শেষকালে সে উচ্চারণ করল প্রায় ফিসফিসিয়ে, নিজের মুখটা জামিওতভের মুখের খুব কাছে এনে? জামিওতভ্ তার নিজের মুখ রাস্‌কোল্‌নিকভের মুখের কাছ থেকে সরিয়ে না নিয়ে স্থির দৃষ্টিতে সরাসরি তাকিয়ে রইল তার দিকে। পরে যে ঘটনাটা জামিওতভের কাছে সবচেয়ে অদ্ভুত মনে হয়েছিল তা এই যে তাদের নীরবতা স্থায়ী হয়েছিল পুরো এক মিনিট— ঠিক এই পুরো এক মিনিট তারা ওইভাবে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে ছিল।

"বেশ তো আপনি যদি পড়ে থাকেন, তাতে আমার কী?" ভেবাচেকা খেয়ে হঠাৎ ধৈর্য হারিয়ে চিৎকার করে উঠল সে। "আমার তাতে কী? বয়েই গেছে আমার!"

জামিওতভের প্রতিক্রিয়ায় এতটুকু বিচলিত না হয়ে আগের মতোই ফিসফিসিয়ে বলে চলল রাস্‌কোল্‌নিকভ: "তা এ হল সেই বুড়ি, সেই একই বুড়ি, যার কথা... মনে আছে, আপনারা যখন পুলিস স্টেশনে বলাবলি করছিলেন, তখন আমি অজ্ঞান হয়ে যাই? এখন বুঝতে পারছেন তো?"

"বলি, এসবের মানে কী?... 'বুঝতে পারছেন' বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?" জামিওতভের কণ্ঠে উদ্বেগের আভাস।

রাস্‌কোল্‌নিকভের মুখের অকম্পিত ও গম্ভীর ভাব মুহূর্তের মধ্যে পালটে গেল। হঠাৎ সে আবার ফেটে পড়ল এই কিছুক্ষণ আগেকার মতো খ্যাপাটে হাসিতে। মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা চেপে রাখার শক্তি তার এতটুকু নেই। পলকের মধ্যে তার মনে পড়ে গেল, সে রীতিমতো স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারল মাত্র দিনকয়েক আগের একটি মুহূর্ত : সে কুড়ুল হাতে দাঁড়িয়ে আছে দরজার পেছনে, দরজার আগল সমানে খট-খট করে নড়ছে, লোকগুলো দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে গালিগালাজ করে চলেছে, দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। ঠিক এই সময় তার ইচ্ছে হচ্ছিল ওদের চিৎকার করে কিছু বলে, গালিগালাজ করে, জিভ দেখিয়ে ভেংচি কাটে, ওদের রাগায়, হাসে, অট্টহাসি হাসতে থাকে, কেবলই হাসতে থাকে!

"আপনি হয় পাগল, নয়ত..." বলতে-বলতে জামিওতভ্ অর্ধপথে এমনভাবে

থেমে গেল যেন অপ্রত্যাশিতভাবে কোন চিন্তা তার মাথায় এসে যেতে হঠাৎ সে চমকে গেছে।

"নয়ত? নয়ত কী? কী হল? যা বলছিলেন বলেই ফেলুন না!"

"কিছু না!" রাগতস্বরে উত্তর দিল জামিওতভ্। "সব বাজে কথা!"

দুজনেই চুপ। বিকারগ্রস্তের মতো ঘন-ঘন অতর্কিত হাসির প্রকোপের পর রাস্‌কোল্‌নিকভ্ হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে চিন্তায় ডুবে গেল। টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে হাতের ওপর মাথার ভর দিল। মনে হচ্ছিল বুঝি বিলকুল ভুলে গেছে জামিওতভের উপস্থিতি। নীরবতা বড় বেশি দীর্ঘস্থায়ী হল।

"কী হল? চা খাচ্ছেন না যে? জুড়িয়ে যাচ্ছে..." অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করে জামিওতভ্ বলল।

"অ্যাঁ? কী? চা?... ও হ্যাঁ..." রাস্‌কোল্‌নিকভ্ গেলাস থেকে এক ঢোক চা খেয়ে একটুকরো রুটি মুখে ফেলে দিল, তারপর জামিওতভের দিকে তাকাতে হঠাৎ যেন তার সব কথা মনে পড়ে গেল। সেই মুহূর্তে যেন তার হুঁশ ফিরে এলো। সঙ্গে-সঙ্গে তার মুখে ফিরে এলো আগেকার সেই বিদ্রূপের হাসি। সে চা পান করতে লাগল।

"আজকাল জুয়াচুরির ঘটনা বড় বেড়ে গেছে," জামিওতভ্ বলল। এই কিছুদিন আগেই, 'মস্কো সমাচারে' পড়ছিলাম, মস্কোয় টাকা জালিয়াতদের পুরো একটা দঙ্গল ধরা পড়েছে। বলতে গেলে সমাজের সব স্তরের লোকই ছিল সেখানে। সরকারি বন্ডও জাল করছিল।"

"ও, সে তো অনেককাল আগের কথা! আমি এক মাস আগেই পড়েছি" শান্ত কণ্ঠে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ উত্তর দিল। "তা এদের আপনি জুয়াজোর বলতে চান?" বাঁকা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

"জুয়াচোর না! তাহলে কী?"

"এরা? আরে এরা কিসের জুয়াচোর! নেহাত দুগ্ধপোষ্য শিশু! এরকম একটা কাজের জন্যে পঞ্চাশ জন লোক কখনও একসঙ্গে জড় হয়! এটা কী করে হয়? তিনজন যদি হয় তাও তো বলব অনেক বেশি, যেহেতু সেক্ষেত্রে ওদের প্রত্যেকের নিজের ওপর যতটা আস্থা আছে তার চেয়ে ঢের বেশি আস্থা রাখতে হবে অন্যদের ওপর! নয়ত একজন কেউ মাতাল অবস্থায় বকবক করে ফাঁস করে দিলেই খেল খতম! দুগ্ধপোষ্য! তা না হলে ব্যাঙ্কে বন্ড ভাঙানোর জন্যে এমন সমস্ত লোককে কেউ ভাড়া নেয় যাদের মোটে নির্ভরযোগ্য বলা যায় না? প্রথম যাকে চোখে পড়ল তাকেই কি বিশ্বাস করে দেওয়া যায় এরকম একটা কাজের দায়িত্ব? আচ্ছা, ধরা যাক, দুগ্ধপোষ্যদের ক্ষেত্রেও না হয় আপনারা সাফল্য লাভ করেছেন, ধরা যাক ওদের প্রত্যেকে ইতিমধ্যে জাল বন্ড ভাঙিয়ে কয়েক লাখ করে হাতিয়েছে। কিন্তু তারপর? সারাটা জীবন? ওদের প্রত্যেকে এখন সারা জীবন একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল!

আরে, এর চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরাও তো ভালো! তাছাড়া কী করে ভাঙাতে হয় তাও ওরা ভালোমতো জানত না: ওদের একজন কাউন্টারে ভাঙিয়ে পাঁচ হাজার পেল— তার হাত কাঁপতে লাগল। চার পর্যন্ত কোনরকমে গুনল, পাঁচ আর গুনলই না— বিশ্বাসের ওপর ছেড়ে দিল— কোনমতে পকেটে পুরে সেখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। তাইতেই সন্দেহ জাগিয়ে তুলল। একমাত্র একটা আহাম্মকের জন্যে ওদের পুরো আয়োজন মাঠে মারা গেল! এটা কী ভাবে হয়?''

''কিসের কথা বলছেন? হাত-কাঁপার কথা তো?'' জামিওতভ্ তৎক্ষণাৎ বলে উঠল। ''না, হয়, খুবই হয়। না মশায়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ব্যাপারটা সম্ভব। কোন-কোন সময় মানুষ ঠিক সামলাতে পারে না।''

''এমন একটা কাজ করার সময়?''

''আপনি হলে সামলাতে পারতেন? আমি তো বাপু পারতাম না! একশ রুবল বখশিসের লোভে এত বড় ঝুঁকি নেওয়া! জাল বন্ড নিয়ে যাও ভাঙাতে— কোথায়? — না, ব্যাঙ্কে, যেখানকার কর্মচারীরা এসব ব্যাপারে গুলে খেয়ে বসে আছে। না, আমি মাথা ঠিক রাখতে পারতাম না। আপনি? আপনি কি পারতেন?''

'জিভ দেখানোর' একটা অদম্য বাসনা যেন হঠাৎ আবার পেয়ে বসল রাসকোল্‌নিকভ্‌কে। কয়েক মুহূর্তের জন্য তার শিরদাঁড়ায় শিহরন খেলে গেল।

''আমি হলে অমন করতাম না,'' রাস্‌কোল্‌নিকভ্ দূরত্ব বজায় রেখে বলতে শুরু করল। ''আমি হলে ভাঙানোর সময় কী করতাম বলি: প্রথম এক হাজার খুব যত্ন নিয়ে গুনতাম— এদিক-ওদিক থেকে বারচারেক, প্রতিটি নোট খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতাম; তারপর পড়তাম পরের হাজার নিয়ে। এই কিস্তির টাকা গুনতে-গুনতে মাঝখান পর্যন্ত আসার পর ফস করে ভেতর থেকে একটা পঞ্চাশ রুবলের নোট টেনে নিয়ে আলোর সামনে তুলে ধরতাম, তারপর উলটে আবারও তুলে ধরতাম আলোর সামনে— নোটটা জাল কিনা দেখার জন্য। বলতাম, 'আমি একটু আশঙ্কা বোধ করছি: এই কিছুদিন আগে আমার এক আত্মীয়ার এইভাবে পঁচিশ রুবল খোয়া যায়।' এখানে পুরো একটি গল্পও বানিয়ে বলতাম। তারপর যেই তৃতীয় হাজার গুনব বলে ধরেছি...'না, মাফ করবেন, আমার মনে হয়, দু-হাজারের বেলায় সাতশ'র জায়গায় কোথায় যেন গোনায় একটু ভুল হয়ে গেছে, সন্দেহ জাগছে মনে,' এই বলে তৃতীয় হাজারে হাত না দিয়ে আবার দ্বিতীয় ধরতাম। ...মোট যে পাঁচ হাজার আছে তার সবগুলো নিয়েই এরকম চালিয়ে যেতাম। পাঁচ হাজার নিয়ে কারবার শেষ হয়ে গেলে পাঁচের এবং দ্বিতীয় হাজারের তাড়ার ভেতর থেকে একটি করে নোট বের করে আমি আবার আলোর সামনে ধরতাম। আবার আমার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ...নোটদুটো কাউন্টারে বাড়িয়ে ধরে বলতাম: 'দয়া করে পালটে দিন।' এইভাবে কেরানিকে এমন নাস্তানাবুদ করে ছাড়তাম যে সে তখন আমার হাত থেকে কোন

মতে পার পেতে পারলে বাঁচে। শেষপর্যন্ত সব চুকেবুকে যাবার পর চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতাম, দরজাও খুলতাম।... 'ও হ্যাঁ, মাফ করবেন'... আবার ফিরে এসে কিছু একটা জিগ্‌গেস করতাম, কোন একটা কিছুর ব্যাখ্যা বা ওইগোছের কিছু চাইতাম।... এ-ই করতাম আমি হলে!"

"ওঃ কী দুর্দান্ত কথা আপনি বলছেন।" হাসতে-হাসতে বলল জামিওতভ্। "তবে এসব নিছক আপনার কথার কথা। কাজের সময় নির্ঘাত হোঁচট খেতেন। এখানে আমি আপনাকে বলি, আমার মতে, শুধু আপনি আমি কেন, এমনকি একজন পোড় খাওয়া বেপরোয়া লোকও এতটা আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিতে পারবে না। বেশি দূর যাই কেন? আমাদের হাতের সামনেই তো দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমাদেরই থানার এক্তিয়ারের মধ্যে বৃদ্ধা খুন হয়ে গেল। ... অমনিতে মনে হতে পারে খুব বেপরোয়া লোকের মাথার কাজ। দিনেদুপুরে সমস্ত রকম ঝুঁকি নিয়েছে, একমাত্র দৈববলে পার পেয়ে গেছে— তার কিন্তু হাত কেঁপেছিলঃ ডাকাতি পুরোপুরি সারতে পারেনি, সামলাতে পারেনি— কেসটা দেখে তাই মনে হচ্ছে..."

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ যেন এই মন্তব্যে একটু ক্ষুব্ধই হল।

"তাই মনে হচ্ছে! তাহলে যান না, পারেন তো ধরুন না কেন তাকে!" জামিওতভকে উস্‌কে দিয়ে হিংস্র উল্লাসে ফেটে পড়ল সে।

"চিন্তার কারণ নেই, ধরা ঠিকই পড়বে।"

"কে ধরবে? আপনি? আপনি ধরবেন নাকি? চেষ্টা করে দেখুন। লম্ফঝম্ফই সার হবে! আপনাদের কাছে সবচেয়ে বড় সূত্র কী তাও বলে দিচ্ছি— লোকটা টাকা পয়সা ওড়াচ্ছে কিনা। টাকাকড়ি একদম ছিল না, এখন হঠাৎ খরচ করতে শুরু করে দিয়েছে... অতএব এ নয় তো আর কে? অথচ দেখুন, একটা শিশুও কিন্তু ইচ্ছে করলে ঠিক এখানেই আপনাদের ঘোল খাইয়ে দিতে পারে!"

"কিন্তু আসলে তো তা-ই। সবাই সেটাই করে থাকে," জামিওতভ্ উত্তর দিল। "খুন করার সময় ধূর্ত, জীবনের ঝুঁকিও নেয়, কিন্তু তারপর— সোজা গিয়ে হাজির শুঁড়িখানায়। টাকা ওড়ানোর সময়ই তো ওদের ধরা হয়। সবাই তো আর আপনার মতো অত চালাক নয়। আপনি হলে হয়ত শুঁড়িখানায় যেতেন না। ঠিক বলিনি?"

রাসকোল্‌নিকভ্ ভুরু কোঁচকাল, জামিওতভের দিকে স্থির দৃষ্টি হানল।

"আমার মনে হয় একবার স্বাদ পেয়ে যাবার পর আপনার এখন জানার সাধ হয়েছে আমি হলে এক্ষেত্রে কী করতাম, তাই না?" রাস্‌কোল্‌নিকভের প্রশ্নে অসন্তোষ ফুটে উঠল।

"জানতে পারলে মন্দ হত না," দৃঢ়স্বরে গম্ভীরভাবে জবাব দিল সে। সে কিন্তু এর মধ্যে বেশ গুরুত্ব দিয়ে তাকে দেখতে এবং তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে।

"খুবই ইচ্ছে করছে বুঝি?"

"খুব।"

"বেশ। কী করতাম তাহলে বলি," বলতে-বলতে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ এবারেও হঠাৎ নিজের মুখটা জামিওতভের মুখের কাছে এগিয়ে নিল। আবারও স্থির দৃষ্টিতে সোজাসুজি তাকাল তার দিকে, আবারও কথা বলতে শুরু করল ফিসফিসিয়ে, এমনভাবে যে জামিওতভ্ এখানে কেমন যেন একটু চমকেই উঠল। "আমি হলে করতাম এইরকম : টাকাকড়ি জিনিসপত্র সমস্ত নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে সেখান থেকে সরে পড়তাম, পথে কোথাও না গিয়ে তৎক্ষণাৎ চলে যেতাম এমন একটা নির্জন জায়গায় যার এখানে-ওখানে কেবল পাঁচিল আর পাঁচিল... আশেপাশে জনপ্রাণী বলতে প্রায় কেউ নেই... বাড়ির পেছনে কোন উঠোন বা ওইগোছের কোন জমি। আরও আগে থাকতে আমি ওই জমিতে ভালো করে দেখে রাখতাম কোন একটা পাথরের চাঁই ও ...আধ-মনখানেক ওজন হবে... ধরুন পড়ে আছে ঘরবাড়ি যখন তৈরি হচ্ছিল তখন থেকে... এককোণে, পাঁচিলের ধারে কোথাও। পাথরের চাঁইটা তুলতাম। তার তলায় ছোটখাটো একটা গর্ত নির্ঘাত থাকবে... ওই গর্তের মধ্যেই জিনিসপত্র, টাকাপয়সা সব ডাঁই করে রাখতাম। রাখার পর পাথরের চাঁইটা ঠিক যেমনভাবে পড়ে ছিল তেমনভাবে যথাস্থানে গড়িয়ে রেখে দিতাম, পায়ের চাপ দিয়ে চারপাশের মাটি সমান করে দিয়ে চটপট সরে পড়তাম। এক বছর দু'বছর ধরলামই না, এমনকি তিন বছরও না— এবার খুঁজে মরুন! কর্পূরের মতো উবে গেছ জলজ্যান্ত লোকটা।"

"আপনি পাগল!" জামিওতভ্ নিজেও কেন যেন বলে উঠল ফিসফিসিয়ে এবং কেন যেন হঠাৎই রাস্‌কোল্‌নিকভের কাছ থেকে খানিকটা সরে গেল। রাস্‌কোল্‌নিকভের দুচোখ ঝলকে উঠল। তার মুখ অস্বাভাবিক ফেকাসে হয়ে গেল, ওপরের ঠোটটা কেঁপে উঠল, থরথর করে কাঁপতে লাগল সে। জামিওতভের যতদূর কাছাকাছি পারা যায় ঝুঁকে পড়ল। তার ঠোঁট নড়তে লাগল, কিন্তু মুখ দিয়ে কোন আওয়াজ বের হল না। এইভাবে আধ-মিনিটখানেক কেটে গেল। সে বুঝতে পারছিল কী করছে, কিন্তু নিজেকে সামলানোর ক্ষমতা তার ছিল না। ভয়ঙ্কর সেই কথাটি তখনকার সেই দরজার খিলের মতোই তার ঠোঁটের ডগায় লাফাতে শুরু করে দিয়েছে... এই বুঝি খসে বেরিয়ে আসে... এই তো একটু ছেড়ে দিলেই হল, এই এখুনি মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল বলে!

"আচ্ছা, যদি এমন হয় যে আমিই বুড়ি আর লিজাভেতাকে খুন করেছি?" হঠাৎ সে বলে ফেলল। বলার সঙ্গে-সঙ্গে তার হুঁশ হল।

জামিওতভ্ অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে রাস্‌কোল্‌নিকভের দিকে তাকাল। তার মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল এবং কৃত্রিম হাসিতে বিকৃত হয়ে উঠল।

"না, না, তা কী করে হয়?" অর্ধস্ফুট স্বরে সে বলল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে।

"আপনি স্বীকার করুন যে আমার কথা বিশ্বাস করছেন! তাই তো? তাই না?"

"একদম না! এখন তো আরও করি না! আগে যা-ও বা বিশ্বাস করতাম এখন আরও করি না!" জামিওতভ্ তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

"হুঁ হুঁ ধরা পড়ে গেছেন! চড়ুই ধরা পড়েছে। এখন যখন 'আগে যা-ও বা বিশ্বাস করতেন' তাও করেন না, তার মানে আগে বিশ্বাস করতেন?"

"না না আদৌ নয়!" অনেকটা যেন হকচকিয়ে বলে উঠল জামিওতভ্। আমাকে ঘাবড়ে দেবার জন্যেই কি আপনি কথার মোড় এইদিকে ঘুরিয়ে নিয়েছেন?"

"তাহলে বিশ্বাস করছেন না? আচ্ছা পুলিস স্টেশন থেকে সেই সময় যে আমি বেরিয়ে এলাম তখন আমার অনুপস্থিতিতে কী নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল আপনাদের মধ্যে? আমি অজ্ঞান হয়ে যাবার পর লেফ্‌টেনান্ট বারুদ কেন আমাকে জেরা করতে লাগলেন বলুন তো?... এই কে আছ?..." টুপিটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে সে হাঁক পাড়ল ওয়েটারের উদ্দেশে। "কত পাওনা হয়েছে?"

"মোট তিরিশ কোপেক, কর্তা", উত্তরে এই বলে ছুটে এলো ওয়েটার।

"এই নাও আরও বিশ কোপেক। তোমার বখশিস।" "ওঃ কত টাকা!" বলতে-বলতে কাঁপা কাঁপা হাতে জামিওতভের দিকে বাড়িয়ে ধরল নোটগুলো। "লালে নীলে পঁচিশ রুবল। কোত্থেকে? আর গায়ের নতুন জামাকাপড়— এসবই বা এলো কোত্থেকে? জানেনই তো, আমার কাছে একটা কোপেক পর্যন্ত ছিল না। বাড়িউলিকে নিশ্চয় জিগ্‌গেসবাদ করেছেন। ... যাক, অনেক হয়েছে! Assez cause— অনেক হয়েছে বাজে বুকনি! চলি, আবার দেখা হবে... দেখাটা আশা করি বেশ মধুর হবে!..."

সে যখন বেরিয়ে এলো তখন তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে হিস্টিরিয়া-গ্রস্তের মতো যদিও তার উপলব্ধির একটা অংশ জুড়ে ছিল অসহনীয় পুলকের ভাব। তবে তাকে বিষণ্ন ও ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। মুখ বেঁকে গেছে— যেন সবে মূর্ছাভঙ্গ হয়েছে। দ্রুত বেড়ে চলেছে তার ক্লান্তি। তার মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার হতে চলছিল, শক্তি ফিরে আসছিল হঠাৎ-হঠাৎ— প্রথম ধাক্কা খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে, বিরক্তিকর কোন উপলব্ধির সঙ্গে-সঙ্গে। পরক্ষণেই সে দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ছিল উপলব্ধি মিলিয়ে যেতে না যেতে।

রাসকোলনিকভ্ চলে যাবার পর জামিওতভ্ একা-একা আরও অনেকক্ষণ বসে রইল ওই একই জায়গায়। গভীর চিন্তা তাকে পেয়ে বসেছে। রাসকোল্‌নিকভ্ অপ্রত্যাশিতভাবে একটা বিশেষ জায়গায় তার সমস্ত ভাবনাচিন্তা ওলট-পালট করে দিয়ে গেছে, চূড়ান্তভাবে তার নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করেছে।

"লেফটেনান্টটা একটা বুদ্ধু!" শেষপর্যন্ত সে সিদ্ধান্ত করল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ রাস্তায় বের হওয়ার জন্য সবে দরজাটা খুলেছে অমনি ঠিক

দেউড়িতে রাজুমিখিনের একেবারে মুখোমুখি। সে তখন ভেতরে ঢুকছিল। দুজনের কেউই এক পা দূরে থাকতেও একে অন্যকে দেখতে পায়নি, তাই আরেকটু হলেই মাথায় ঠোকাঠুকি লেগে যেত। কয়েক মুহূর্ত দুজনে, দৃষ্টি বিনিময় করল, একে অন্যের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল। রাজুমিখিন হতবাক। কিন্তু হঠাৎ একটা ক্রোধের ভাব, সত্যিকার ভয়ঙ্কর ক্রোধের ভাব ফুটে উঠল তার দৃষ্টিতে।

"বটে, তুমি তাহলে এখানে!" গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে। "বিছানা ছেড়ে পালান! এদিকে আমি কিনা ওখানে সোফার তলায় পর্যন্ত তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছি। চিলেকোঠাও ঘুরে দেখে এসেছি! তোমার জন্যে নাস্তাসিয়াকে শুধু মারতে বাকি রেখেছি!..এদিকে উনি কিনা এখানে! কী ব্যাপার রোদিয়া? এর মানে কী? সত্যি কথা বল দেখি! স্বীকার কর! শুনছ?"

"মানে এই যে তোমরা সকলে মিলে আমার জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছ। আমি একা থাকতে চাই", শান্ত কণ্ঠে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ বলল।

"একা? এখন তুমি হাঁটতেই পার না, তোমার ওই শ্রীমুখখানা চাদরের মতো সাদা, ফেকাসে হয়ে গেছে, তুমি হাঁপাচ্ছ! আহাম্মক!...'ক্রিস্টাল প্যালেসে' তুমি কী করছিলে? ঠিক করে বল দেখি এক্ষুনি!"

"ছাড!" এই বলে রাস্‌কোলনিকভ্‌ পাশ কাটিয়ে সরে পড়ার চেষ্টা করল। তাতে রাজুমিখিন ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল : খপ্‌ করে চেপে ধরল ওর কাঁধ।

"ছাড় বললেই হল? 'ছাড়' বলার মতো সাহস আছে তোমার? জান আমি তোমাকে নিয়ে কী করতে পারি এখন? পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যাব, পোঁটলা বেঁধে বগলদাবা করে বাড়ি নিয়ে গিয়ে তালাচাবি বন্ধ করে রেখে দেব!"

"শোন, রাজুমিখিন", বাইরে সম্পূর্ণ শান্ত ভাব বজায় রেখে নিচু গলায় বলল রাসকোলনিকভ্‌। "তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে তোমার উপকারে আমার দরকার নেই? আমি বুঝি না, উপকারে যাদের... থোড়াই এসে যায়, সাধ করে তাদের উপকার করতে যাওয়া কেন? সবচেয়ে বড় কথা, যাদের পক্ষে এটা বরদাস্ত করা বাস্তবিকই বড় কঠিন? আচ্ছা, আমার অসুস্থতার শুরুতে আমাকে খুঁজে বের করতে গিয়েছিলে কেন বল তো? হয়ত আমি মরতে পারলে বড় খুশি হতাম? আমি কি আজ তোমাকে যথেষ্ট ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারিনি যে তুমি আমায় কষ্ট দিচ্ছ, তোমার ওপর আমার... ঘেন্না ধরে গেছে? মানুষকে কষ্ট দিয়ে কী সুখটা পাওয়া যায় বলতে পার? বিশ্বাস কর, এসব আমার সুস্থ হয়ে ওঠার পথে রীতিমতো বাধা সৃষ্টি করছে, কেন না এতে আমি অনবরত বিরক্তি বোধ করছি। এই তো দেখ না, জোসিমভ্‌ কেমন নিজে থেকে চলে গেল যখন দেখল আমি বিরক্ত হচ্ছি! ভগবানের দোহাই, তুমিও রেহাই দাও ভাই আমাকে! তাছাড়া জোর করে আমাকে ধরে রাখার কী অধিকার তোমার আছে? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না আমি এখন তোমাকে যা যা বলছি সব সম্পূর্ণ সুস্থ

মস্তিষ্কেই বলছি? আমাকে শিখিয়ে দাও কীভাবে...কীভাবে হাতে-পায়ে ধরে তোমাকে বিশ্বাস করাতে পারি যে তোমার উপকার নিয়ে আমার ওপর পীড়াপীড়ি না করাই ভালো? বলতে পার আমি অকৃতজ্ঞ, বলতে পার আমি নীচ, কিন্তু শুধু একটিই অনুরোধ, ভগবানের দোহাই, আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা সবাই! একা থাকতে দাও! একা থাকতে দাও!"

সে শুরু করেছিল শান্তভাবে। প্রচুর পরিমাণ বিষোদ্গারের সম্ভাবনায় সে আগে থাকতে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শেষকালে উত্তেজনায় ক্রোধে দিশেহারা হয়ে পড়ল, হাঁপাতে লাগল। ঠিক এরকমই ঘটেছিল লুজিনের সঙ্গে কথা বলার সময়।

রাজুমিখিন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কী যেন ভেবে তার হাত ছেড়ে দিল।

"গোল্লায় যাও!" খানিকটা অন্যমনস্কভাবে অস্ফুটস্বরে সে বলল। "দাঁড়াও!" এবারে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ চলে যাবার উদ্যোগ নিতে আচমকা সে গর্জন করে উঠল। "আমার কথাটা শোন। তোমাকে জানিয়ে রাখছি, তোমরা সবাই, তোমার মতো লোকেরা সবাই এক্কেকটি বাচাল, চালবাজ! তোমাদের যখন এতটুকু বিপদ দেখা দেয় তখন তোমরা তাই নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে তোল! কিন্তু সেখানেও তোমাদের মৌলিকতা নেই—অন্যের কাছ থেকে চুরি করা বিদ্যে তোমাদের। আত্মনির্ভরতার এতটুকু চিহ্ন তোমাদের জীবনে নেই। তোমরা সব এক্কেকটি চর্বিজাতীয় বস্তুর পিণ্ড, তোমাদের শিরায় রক্তের বদলে আছে কিছু জলীয় পদার্থ! তোমাদের কাউকে আমার বিশ্বাস নেই! যে কোন পরিস্থিতিতে তোমাদের প্রথম চিন্তার বিষয় হল কী করলে মানুষের মতো না দেখায়! দাঁ-ড়াঁ-ও বলছি!..." রাস্‌কোল্‌নিকভ আবার সরে পড়ার উদ্যোগ করছে দেখে দ্বিগুণ ক্ষিপ্ত হয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল। "শেষপর্যন্ত শুনে যাও! তুমি জান, আজ আমার বাড়িতে গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে কিছু লোকজন আসছে—হয়ত ইতিমধ্যে এসেও গেছে—অবশ্য কাকাকে রেখে এসেছি। এই এখুনি কিছুক্ষণের জন্য ছুটে এসেছি, এগিয়ে এসে অতিথিদের ঘরে নিয়ে যাব বলে। তাই বলছিলাম কি, তুমি যদি নেহাত বুদ্ধু না হও, যাচ্ছেতাই রকমের বোকা বা একদম গবেট না হও, যদি কোন বিদেশী ভাষার নাটক-নভেলের অনুবাদ না হও... দেখ রোদিয়া, আমি স্বীকার করছি তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, কিন্তু তুমি একটা আহাম্মক!...তাই বলি, তুমি যদি আহাম্মক না হয়ে থাক তাহলে বরং আজ আমার বাড়িতে চলে এসো; মিছিমিছি জুতো ক্ষয় না করে বরং সন্ধেটা দিব্যি কাটাবে আনন্দ করে। বেরিয়েই যখন পড়েছ তখন আর কিছু করার নেই! আমি তোমার জন্যে একটা সুন্দর আরামের চেয়ার এনে রেখে দেব, বাড়িওয়ালাদের আছে একটা ওরকম চেয়ার... একটু ভালো চা, লোকজনের সঙ্গ। ...তাতে যদি না পোষায়, গদিতে শুইয়ে রেখে দেব— যা হোক, আমাদের মাঝখানে শুয়ে থাকবে।... জোসিমভ্‌ও থাকবে। আসছ তো?"

"না।"

"বা-জে বোকো না!" অসহিষ্ণু হয়ে রাজুমিখিন চেঁচিয়ে বলল। "তুমি জানবে কী করে? নিজের ভালোমন্দ বোঝার ক্ষমতা তোমার নেই! তাছাড়া এসব ব্যাপারের তুমি কিছুই বোঝ না।...আমি হাজার বার ঠিক এইভাবে লোকজনকে দূর ছাই করে ভাগিয়ে দিয়েছি, আবার তাদের কাছেই ফিরে আসতে হয়েছে আমাকে।... পরে তোমার নিজেরই লজ্জা লাগবে—আবার ফিরে আসবে মানুষের কাছে! মনে রেখো পচিন্‌কভ্‌দের বাড়ি, তিন তলা।..."

"দেখেশুনে মনে হচ্ছে একমাত্র উপকার করার তৃপ্তি লাভের খাতিরে আপনি কারও হাতে মার খেতেও রাজি আছেন, মিস্টার রাজুমিখিন।"

"কে? আমি? কেউ যদি ওরকম স্বপ্নেও কল্পনা করে থাকে তার নাক টেনে ছিঁড়ে ফেলব। পচি্‌ন্‌কভ্‌দের বাড়ি, সাতচল্লিশ নম্বর, সরকারি অফিসের কেরানি বাকুশ্‌কিনের ফ্ল্যাট..."

"বললাম তো আসছি না, রাজুমিখিন!" রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ উলটো দিকে ঘুরে হাঁটা দিল।

"বাজি ফেলে বলতে পারি, আসবেই!" রাজুমিখিন তার পেছন-পেছন চেঁচিয়ে বলল। "নইলে...নইলে তোমাকে আমি চিনতেও চাই না! এই দাঁড়াও! জামিওতভ্‌ কি এখানে আছে?"

"হ্যাঁ, আছে।"

"দেখেছ?"

"দেখেছি।"

"কথা বলেছ?"

"বলেছি।"

"কী নিয়ে কথা হল? মরুক গে যা! থাক, বলে কাজ নেই। মনে রেখো, পচিন্‌কভ্‌, সাতচল্লিশ, বাকুশ্‌কিন!"

রাস্‌কোল্‌নিকভ সাদোভায়া স্ট্রিট পর্যন্ত গিয়ে কোনায় মোড় নিল। রাজুমিখিন চিন্তিতভাবে তাকিয়ে রইল তার যাবার পথের দিকে। অবশেষে হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে ভেতরে ঢুকল, কিন্তু সিঁড়ির অর্ধপথে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"ধুত্তোর!" প্রায় মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো তার মনের ভাবনা। "কথা বলার সময় মনে হচ্ছে বেশ ভাবনাচিন্তা করেই বলছে, অথচ মনে হয়...আরে আমিও তো আচ্ছা বোকা দেখছি! উন্মাদের কথার মধ্যেও কি ভাবনাচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় না? তাছাড়া জোসিমভ্‌ তো আমার মনে হয় ঠিক এই জিনিসটাকেই ভয় পাচ্ছে!" বলতে-বলতে সে আঙুল দিয়ে কপালে টোকা মারল "তাহলে, যদি...এখন ওকে একা ছেড়ে দেওয়া যায় কী বলে? হয়ত জলে ডুবে মারা যাবে।...ইস্‌, কেন যে ছেড়ে দিলাম! না ঠিক হয়নি!" এই ভেবে ছুটে বেরিয়ে এলো রাস্‌কোল্‌নিকভের পিছু

ধাওয়া করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ততক্ষণে তার সমস্ত চিহ্ন লোপাট হয়ে গেছে। নিজের ওপর নিদারুণ বিরক্তিতে সে থুতু ফেলল। তারপর তড়বড়িয়ে ফিরে গেল 'ক্রিস্টাল প্যালেসে'। ...যত তাড়াতাড়ি পারা যায় জামিওতভ্‌কে জিগ্‌গেসবাদ করে ব্যাপারটা জেনে নিতে হবে।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ সোজা গিয়ে উঠল—ব্রিজের ওপর। ব্রিজের মাঝামাঝি গিয়ে রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে দুটো কনুই রেলিং-এ ঠেকিয়ে খাল বরাবর তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। রাজুমিখিনের কাছ থেকে বিদায় নেবার পর থেকে সে এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে এখানেও সে এসেছে অনেক কষ্টে। তার ইচ্ছে করছিল পথে কোথাও বসে অথবা শুয়ে পড়ে। জলের ওপর ঝুঁকে পড়ে যন্ত্রচালিতের মতো সে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগল—সূর্যাস্তের শেষ গোলাপি আভা, ঘনায়মান গোধূলির অন্ধকারে ধীরে-ধীরে ছেয়ে যাচ্ছে বাড়িঘরের সারি, দূরে বাঁ তীরে কোথাকার এক ছাদের মাথায় একটা ঘুলঘুলি— মুহূর্তের মধ্যে সূর্যাস্তের শেষ রশ্মির ছোঁয়ায় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল ঠিক অগ্নিশিখার মতো। কালো হয়ে আসছে খালের জল। মনে হচ্ছিল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখছে এই দৃশ্য। অবশেষে সে চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগল—ঘরবাড়িগুলো টলে উঠল, পথচারী, খালের পাড়, ঘোড়ার গাড়ি—সব ঘুরপাক খেতে লাগল, নাচানাচি করতে লাগল চারধারে। হঠাৎ সে শিউরে উঠল। হয়ত আরও একবার বেঁচে গেল মূর্ছা যাবার কবল থেকে। ...ওকে বাঁচিয়ে দিল একটা অদ্ভুত, বিশ্রী দৃশ্য। মনে হল তার কাছাকাছি, ডান দিকে, ঠিক পাশটাতে কে যেন এসে দাঁড়াল। চোখ তুলে তাকাতে দেখতে পেল একজন মহিলা! দীর্ঘকায়, মাথায় ওড়না, হলদে বিবর্ণ, লম্বাটে শীর্ণ মুখ, লালচে চোখদুটো— কোটরে বসা। মহিলা তার দিকে সরাসরি তাকাল, কিন্তু দেখে বোঝাই যাচ্ছিল কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কাউকে তফাত করতে পারছে না। হঠাৎ ডান হাতে রেলিং-এ ভর দিয়ে সে ডান পা'টা তুলে এক ঝট্‌কায় রেলিং-এর ওপর ওঠাল, তারপর বাঁ পা'টাও, অবশেষে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল খালে। নোংরা ঘোলা জলরাশি দুভাগ হয়ে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে শিকারকে গ্রাস করে নিল। কিন্তু মিনিটখানেক বাদে ডুবন্ত মহিলা ভেসে উঠল। জোয়ারের স্রোত তাকে ধীরে-ধীরে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। মাথা আর পা জলের তলায়, পিঠটা ওপরে জেগে আছে, গায়ের জামাটা বালিশের মতো ফুলে ফেঁপে রয়েছে জলের ওপরে।

" গেল গেল! ডুবে গেল!" ডজন কয়েক কণ্ঠের আর্তনাদ। লোকে ছুটে আসতে লাগল চারধার থেকে, খালের দুই পাড় দেখতে-দেখতে ছেয়ে গেল কৌতূহলী দর্শকদের ভিড়ে, ব্রিজের ওপরে রাস্‌কোল্‌নিকভের চারপাশেও জমে গেল জনতার ভিড়, পেছন থেকে তারা চাপ আর ধাক্কা দিতে শুরু করল।

"একী! এযে আমাদের আফ্রোসিনিয়া!" কাছাকাছি কোথা থেকে যেন কাঁদতে-

কাঁদতে আর্তচিৎকার করে উঠল এক মহিলা। "ওগো কে আছ? বাঁচাও! বাছারা আমার, ওকে টেনে তোল!"

"নৌকো চাই! একটা নৌকো চাই!" ভিড়ের মধ্য থেকে চিৎকার উঠল।

কিন্তু নৌকোর আর দরকার হল না। পুলিসের এক সেপাই ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে গেল, গায়ের ওভারকোটটা আর পায়ের জুতোজোড়া খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। খুব একটা বেশি চেষ্টা করতে হল না—ডুবন্ত মহিলাটি স্রোতে ঘাট থেকে হাতখানেকের বেশি দূরে ভেসে যেতে পারেনি। সেপাই ডান হাতে মহিলার জামা চেপে ধরল, বাঁ হাতে ততক্ষণে সে ধরে ফেলেছে একটা লগি, যেটা তারই সঙ্গী আরেক সেপাই বুদ্ধি করে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। মহিলাকে জল থেকে টেনে তুলতে দেরি হল না। গ্র্যানিট পাথরে বাঁধানো ঘাটের ওপর শুইয়ে রাখা হল তাকে। দেখতে-দেখতে তার জ্ঞানও ফিরে এলো, সামান্য উঠল, উঠে বসলও, তারপর হাত দিয়ে ভিজে জামাকাপড় মোছার বৃথা চেষ্টা করতে-করতে ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে হাঁচতে লাগল, ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজ করল নাক টানার। কোন কথা বলল না।

"হা ভগবান, মদ খেয়ে-খেয়ে শেষকালে এই হাল, মদ খেয়ে-খেয়ে এই হাল হয়েছে গো!" সেই মহিলাটি বিলাপ করতে-করতে বলল। ইতিমধ্যে সে আফ্রোসিনিয়ার কাছাকাছি চলে এসেছে। "এই সেদিন গলায় দড়ি দিয়ে মরার চেষ্টা করেছিল, শেষপর্যন্ত ফাঁস খোলা হল। আমি এই এখন একটু দোকানে বেরিয়েছিলাম, বাচ্চা মেয়েটাকে রেখে গিয়েছিলাম ওর ওপর নজর রাখার জন্যে। দেখ কাণ্ড! কোথা থেকে কী ঘটে গেল! আমাদের পাড়ার ভদ্র ঘরের মেয়ে গো! আমাদের পড়শী, কোনার দ্বিতীয় বাড়িটা, ওই যে ওখানে..."

লোকজন ততক্ষণে সরে যাচ্ছিল। পুলিসের লোক তখনও আফ্রোসিনিয়া নামে মহিলাটিকে নিয়ে ব্যস্ত। কে যেন চেঁচিয়ে পুলিস স্টেশনের কথা বলল।...রাস্‌কোল্‌নিকভ্ এসবই দেখে যাচ্ছিল একটা অদ্ভুত ঔদাসীন্য ও নিস্পৃহতা নিয়ে। বিশ্রী লাগছিল তার। "না যাচ্ছেতাই...জল...ও চলবে না", আপন মনে বিড়বিড় করে সে বলল। "ওতে হবে না," সে যোগ করল। "অপেক্ষা করে লাভ নেই। পুলিস স্টেশনের ব্যাপারটা কী?...জামিওতভ্ অফিসে নেই কেন? পুলিস স্টেশন ন'টার পরেও খোলা..." রেলিং এর দিকে পিঠ করে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে চারপাশে নজর বুলাল।

"তাহলে, আর কেন?" স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে এই বলে সে ব্রিজ থেকে পা বাড়াল পুলিস স্টেশনের দিকে। বুকের ভেতরটা কেমন ফাঁকা, শূন্য মনে হচ্ছে। চিন্তা করার মতো মানসিকতা তার ছিল না। এমনকি মনের সেই বিষণ্ণ ব্যাকুল ভাবটা আর নেই 'সব কিছু চুকিয়ে-বুকিয়ে দেব' বলে যে উৎসাহ নিয়ে কিছুক্ষণ আগে সে বাড়ি থেকে

বেরিয়েছিল তারও চিহ্নমাত্র নেই। তার জায়গায় এখন অধিকার করে আছে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য।

'তা তো হবেই! এটাই পরিণতি!' খালপাড় ধরে নিষ্প্রাণ গতিতে, ধীরে-ধীরে হাঁটতে-হাঁটতে সে ভাবল। 'যাই হোক, চুকিয়ে দিতে হবে, কেন না এটা আমার মনের ইচ্ছে।... তবে এটাই সত্যিকার পরিণতি কি? অবশ্য কিছু এসে যায় না! দু'গজ জায়গা তো মিলবে—এঃ! কী পরিণতি, অ্যাঁ! সত্যি-সত্যি এ-ই কি পরিণতি? ওদের বলব, নাকি বলে কাজ নেই? ধ্যুৎ...মরুক গে! তাছাড়া বড় ক্লান্তি লাগছে আমার—যত তাড়াতাড়ি পারা যায় কোথাও শুয়ে পড়লে অথবা বসতে পারলে ভালো হত! সবচেয়ে লজ্জার কথা এই যে ব্যাপারটা স্রেফ বোকামি। আরে ধ্যুৎ, ওসবের থোড়াই পরোয়া করি আমি! ছিঃ, কী ছাইভস্ম সব চিন্তাই না মাথায় ঢোকে!...'

পুলিস স্টেশনে যেতে হলে সোজা রাস্তা ধরে এগিয়ে বাঁদিকে দ্বিতীয় মোড় নিতে হয়। আর মাত্র দু-পা এগোলেই জায়গাটা। কিন্তু প্রথম মোড়ে পৌঁছে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কী যেন ভেবে প্রথম গলিতে মোড় নিল, তারপর ঘুরপথ ধরে আরও দুটো রাস্তা পার হয়ে গেল—হয়ত বা কোনও উদ্দেশ্য ছাড়াই। আবার হয়ত বা মিনিটখানেক কাটিয়ে আরও খানিকটা কালক্ষেপ করা তার উদ্দেশ্য ছিল। পথ চলছিল মাটির দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ মনে হল কানের কাছে কেউ যেন ফিসফিস করে কী বলে উঠল। মাথা তুলে দেখতে পেল দাঁড়িয়ে আছে সেই বাড়িটার কাছে, ঠিক তার ফটকের সামনে। *সেই* সন্ধ্যার পর সে আর এখানে আসেনি, এর পাশ দিয়ে যায়ওনি।

একটা অদম্য ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসল। ইচ্ছাটার কোনও ব্যাখ্যা মেলে না। সে ভেতরে ঢুকে পড়ল, ফটক পেরিয়ে ডান দিকের প্রথম প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকে পরিচিত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে, চারতলায় উঠতে শুরু করল। সঙ্কীর্ণ খাড়া সিঁড়ি, ঘোর অন্ধকার। সিঁড়ির প্রতিটি বাঁকে চাতালে এসে সে দাঁড়িয়ে পড়ে, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চারধার দেখতে থাকে। একতলার সিঁড়ির চাতালের জানলার ফ্রেমটা সম্পূর্ণ তুলে ফেলা হয়েছে। 'এরকম তখন ছিল না', সে মনে-মনে ভাবল। এই তো দোতলার সেই ফ্ল্যাটটা যেখানে নিকোলাই আর মিত্রি কাজ করছিল। 'তালাবন্ধ। দরজাও রং করা হয়েছে নতুন করে। তার মানে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে।' এই যে তিন তলা...এই হল চারতলা। ... 'এখানে!' একটা হতভম্ব ভাব তাকে পেয়ে বসল : এই ফ্ল্যাটটার দরজা হাঁ করে খোলা, ভেতরে লোকজন আছে, গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এটা সে একদম আশা করেনি। একটু ইতস্তত করে শেষ কয়েক ধাপ উঠে সে ভেতরে ঢুকে গেল।

এ ঘরটারও সংস্কার চলছে। ভেতরে ছিল কাজের মিস্ত্রিরা। এতে যেন সে অবাক হয়ে গেল। তার কেন যেন ধারণা ছিল যে সেই সময় সে যেমন দেখে গিয়েছিল হুবহু সেরকমই সব দেখতে পাবে। এমনকি দেখতে পাবে লাশদুটোও মেঝের সেই সেই

জায়গাতেই পড়ে আছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে খালি দেয়াল, আসবাবপত্রের কোন চিহ্ন নেই। কেমন যেন অদ্ভুত। এগিয়ে গিয়ে জানলার ধারে বসল।

মিস্ত্রি বলতে ছিল দু'জন। দুজনেই কমবয়সী ছোকরা। একজন বয়সে একটু বড়, অন্যজনের বয়স একেবারেই কম। তারা দেয়ালে নতুন ওয়াল পেপার লাগাচ্ছিল। এই ওয়াল পেপারটা সাদা—তার ওপর বেগনি ফুল। আগেরটা ছিল হলুদ, টুটোফাটা, জরাজীর্ণ। রাস্‌কোল্‌নিকভের কেন যেন এটা একদম ভালো লাগল না। সে অবসন্ন দৃষ্টিতে নতুন ওয়াল পেপার দেখতে লাগল। সবকিছু এমনভাবে বদলে গেছে দেখে তার যেন আফসোস হচ্ছিল।

মিস্ত্রিদের দেখে মনে হচ্ছিল তাদের দেরি হয়ে গেছে। তারা এখন তাড়াতাড়ি তাদের কাজ গুটিয়ে বাড়ি যাবার উদ্যোগ করছে। রাস্‌কোল্‌নিকভের আবির্ভাব ওদের প্রায় নজরেই পড়ল না। ওরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ দুহাত আড়াআড়ি বুকের ওপর ভাঁজ করে ওদের কথা মন দিয়ে শুনতে লাগল।

বড়জন ছোটজনকে বলছে : "তা এলো মেয়েটি আমার কাছে সক্কালবেলায়, সেই সাত সকালে—খুব সাজগোজ করে। আমি বললুম, 'আমার সামনে এমন ঠাটবাট কেন বল তো? এত ঠাটঠমকের কারণটা কী, অ্যাঁ?' তাতে সে বললে, 'তিত্ ভাসিলিচ, আজ থেকে আমি তোমার, একমাত্র তোমারই হতে চাই।' বোঝ কাণ্ড! কী তার সাজগোজের ঘটা! —ঠিক যেন ছবি, যাকে বলে ম্যাগ্‌জিন!"

"ম্যাগ্‌জিনটা কি জিনিস খুড়ো?" ছোটজন জিগ্‌গেস করল। বোঝাই যাচ্ছে এটি 'খুড়োর' সাকরেদ।

"ম্যাগ্‌জিন? সে হল গিয়ে ভাই নানা রকমের ছবি, রংচংয়ে ছবি— সেগুলো আসে এখানে শনিবার-শনিবার, আমাদের দরজিদের কাছে, বিদেশ থেকে ডাকে আসে রে ভাই। তাতে থাকে কার কেমন জামাকাপড় পরা উচিত— যেমন ছেলেদের, তেমনি মেয়েদেরও। মানে, ছবি আর কি। ছেলেদের ছবিগুলো বেশির ভাগ কোমরে কুঁচি দেওয়া ওভারকোট গায়ে, আর মেয়েদের যে ভাগটা... সেখানে ভাই এমন সব সোন্দর সোন্দর ছবি থাকে না যে যতই দেখ না কেন দেখে-দেখে আশ আর মিটবে না।"

"আমাদের এই পিটারের শহরে কোন্ জিনিসটা নেই বল তো!" ছোটজন সোৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল। "বাপ-মা ছাড়া আর সবই আছে দেখছি!"

"হ্যাঁ ভাই, ওটি ছাড়া আর সবই পাবে", গুরুগিরি ফলিয়ে বড়জন তার সিদ্ধান্ত জানাল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ উঠে চলে গেল পরের ঘরটায়। সেখানে আগে ট্রাঙ্ক, বিছানা আর দেরাজ ছিল। আসবাবপত্রহীন ঘরটাকে তার ভীষণ ছোট মনে হল। ওয়াল পেপার সেই আগের। কোনায় ওয়াল পেপারের গায়ে স্পষ্ট জেগে আছে সেই

জায়গাটা যেখানে ফ্রেমে বাঁধানো আইকনগুলো ছিল। রাস্‌কোলনিকভ্ তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল। তারপর আবার ফিরে গিয়ে বসল জানলার ধারে আগের জায়গাটায়। বড় মিস্ত্রিটা আড়চোখে তার গতিবিধি অনুমান করছিল।

"কী চাই আপনার?" হঠাৎ রাস্‌কোল্‌নিকভের দিকে ফিরে সে জিগ্‌গেস করল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ কোন উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়াল। দেউড়িতে বেরিয়ে এসে দরজায় ঘণ্টি ধরে টান মারল। সেই ঘণ্টি, সেই টিনের ঝনঝন আওয়াজ! দু'বার, তিনবার টান মারল, কান পেতে শুনল, মনে করার চেষ্টা করল। আগেকার সেই যন্ত্রণাদায়ক ভয়ঙ্কর, বীভৎস অনুভূতিটি উত্তরোত্তর স্পষ্ট ও সজীব হয়ে তার মনে পড়তে লাগল। প্রতিবার ঝনঝন আওয়াজে সে চমকে উঠতে থাকে। প্রতিটি চমক তার কাছে মধুর থেকে মধুরতর মনে হতে থাকে।

"আরে কী দরকার তোমার বল তো? কে তুমি?" বেরিয়ে তার কাছে এসে মিস্ত্রি চেঁচিয়ে উঠল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ আবার ভেতরে ঢুকে পড়ল।

"ঘর ভাড়া নিতে চাই", সে বলল। "তাই ভালো করে দেখে নিচ্ছি।"

"রাতদুপুরে কেউ ফেলাট ভাড়া নিতে আসে না। তাছাড়া আপনার আসা উচিত ছিল দারোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে।"

"মেঝে ধোওয়া হয়েছে দেখছি। রং করা হবে বুঝি?" রাস্‌কোল্‌নিকভ বলল। "রক্ত নেই তো?"

"কিসের রক্ত?"

"এক বুড়ি আর তার বোন তো এখানেই খুন হয়েছিল। জায়গাটা রক্তে ভাসাভাসি হয়ে গিয়েছিল।"

"কোথাকার কে হে তুমি?" অস্বস্তিভরে চেঁচিয়ে উঠল মিস্ত্রি।

"আমি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি।"

"জানার সাধ হচ্ছে বুঝি তোমার?...চল, পুলিস স্টেশনে যাই, সেখানে গিয়ে বলব।"

মিস্ত্রি দু'জন হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

"আমাদের যাবার তাড়া আছে, দেরি হয়ে গেছে। চল্ রে আলিওশা। দরজা বন্ধ করতে হবে", বড়জন বলল।

"বেশ চল!" রাস্‌কোল্‌নিকভ্ নিস্পৃহভাবে উত্তর দিয়ে ওদের আগে-আগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ধীরে-ধীরে নামতে লাগল। "এই দারোয়ান!" বেরিয়ে ফটকের নিচে আসার পর সে হাঁক দিল।

রাস্তার দিক থেকে বাড়িতে ঢোকার ঠিক মুখটাতে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে লোকজনের যাওয়া-আসার ওপর নজর রাখছিল কয়েকজন লোক। দারোয়ানদের দু'জনেই, সেই

সঙ্গে একজন মেয়েমানুষ, ঢিলে আলখাল্লা পরা ভদ্রগোছের একজন লোক এবং আরও কে একজন। রাস্‌কোলনিকভ্ সোজা তাদের দিকে এগিয়ে গেল।

"কী চাই আপনার?" দারোয়ানদের একজন জিগ্‌গেস করল।

"পুলিস স্টেশনে গিয়েছিলে?"

"এইমাত্র গিয়েছিলাম। আপনার কী দরকার?"

"খোলা আছে?"

"আছে।"

"ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট আছে?"

"এই কিছুক্ষণ আগেও ছিল। কেন? কী দরকার?"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ উত্তর না দিয়ে চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল ওদের মাঝখানে।

"ফেলাট দেখতে এসেছিল", বড় মিস্ত্রি এগিয়ে এসে বলল।

"কোন ফেলাট?"

"ওই যেখানে আমরা কাজ করছি। বলছে, 'রক্ত ধুয়ে ফেলা হল কেন? এখানে মানুষ খুন হয়েছিল।...আমি ভাড়া নিতে এসেছি...' এই সব। তারপর দরজার ঘণ্টা বাজাতে শুরু করল... সে যা বাজাল! প্রায় ভেঙে যাবার অবস্থা! তারপর বলে কি, 'পুলিস ইস্টিশনে চল, সেখানে সবকিছুর প্রমাণ দেব।' কিছুতেই ছাড়ে না।"

দারোয়ান হতবুদ্ধি হয়ে ভুরু কুঁচকে রাস্‌কোল্‌নিকভের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল।

"আপনি কে বলুন তো?" বেশ খানিকটা ধমকের সুরে সে জিগ্‌গেস করল।

"আমি রোদিওন রমানোভিচ রাস্‌কোলনিকভ্, এককালে ছাত্র ছিলাম। থাকি আমি শিলদের বাড়িতে, এখানে এই গলিটাতে, খুব একটা দূরে নয় এখান থেকে, ফ্ল্যাট নম্বর চৌদ্দ। দারোয়ানকে জিগ্‌গেস করলেই জানতে পারবে...আমায় চেনে।" কথাগুলো রাস্‌কোল্‌নিকভ্ আলস্যভরে কী যেন ভাবতে-ভাবতে বলল। কথা বলার সময় মুখ কোন দিকে না ফিরিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রাস্তার ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের দিকে।

"কিন্তু আপনি ফেলাটে এসেছিলেন কী বলে?"

"দেখতে।"

"দেখার কী আছে?"

"ধরে পুলিস স্টেশনে নিয়ে গেলে হয় না?" ভদ্রগোছের লোকটি কথার মাঝখানে হঠাৎ বলে উঠেই আবার চুপ করে গেল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ লোকটার কাঁধের ওপর দিয়ে আড়চোখে তাকিয়ে মনোযোগ দিয়ে তাকে দেখে নিল, আলস্যভারে নিচু গলায় বলল : "চলুন না!"

"নিয়ে যাওয়াই দরকার!" লোকটা উল্লসিত হয়ে সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল। "ওই

প্রসঙ্গ তুলল কেন? মতলবটা কী, অ্যাঁ?"

"মাতাল বলে তো মনে হচ্ছে না দেখে। কিন্তু কে জানে বাপু!" মিস্ত্রি বিড়বিড় করে বলল।

"কী চাই আপনার বলুন তো?" দারোয়ান আবার ঝাঁঝিয়ে উঠল। এবারে সে সত্যি-সত্যি রাগতে শুরু করে দিয়েছে। "পেছনে লেগে রইল দেখছি।"

"কী হল, পুলিস স্টেশনের নাম শুনে ঘাবড়ে গেলে নাকি?" ঠাট্টা করে রাস্‌কোলনিকভ্ বলল।

"ঘাবড়ানোর কী আছে? তুমিই বা পেছনে লেগে রইলে কেন?"

"বদমাশ কোথাকার!" চেঁচিয়ে উঠল মেয়েমানুষটি।

"আরে ওর সঙ্গে অত তক্কাতক্কির কী আছে?" অন্য দারোয়ানটি চেঁচিয়ে বলল। বিশাল দশাসই চাষাড়ে চেহারা এই লোকটার। গায়ের কোর্তার সামনের বোতামগুলো খোলা, বেল্‌টে চাবির গোছা। তেড়েফুঁড়ে গর্জন করে উঠল : "ভাগ এখান থেকে!...বদমাশ বলে বদ্‌মাশ! ভাগো বলছি!"

বলতে-বলতে সে রাস্‌কোল্‌নিকভের কাঁধটা খপ্ করে চেপে ধরে তাকে রাস্তায় ঠেলে ফেলে দিল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ প্রায় ডিগবাজি খেয়ে পড়তে-পড়তে সামলে নিল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে তাকাল উপস্থিত সকলের দিকে, আগে পা বাড়াল।

"আজব লোক", মিস্ত্রিটা বলল।

"আজকাল লোকজন সব আজব", মেয়েমানুষটি বলল।

"তবু পুলিস স্টেশনে নিয়ে যেতে পারলে ভালো ছিল," আলখাল্লা পরা ভদ্রগোছের লোকটি যোগ করল।

"কী দরকার ওসব হাঙ্গামার মধ্যে যাবার?" বিশালকায় দারোয়ানটি মন্তব্য করল। "বদমাশ যে তাতে কোন সন্দ নেই। বোঝাই যাচ্ছে গায়ে পড়ে হাঙ্গামা বাধানোর তাল। একবার জড়িয়ে পড়লে আর দেখতে হচ্ছে না—ছাড়া পাবার উপায় নেই। ও আমাদের জানা আছে।"

"তাহলে যাব কি যাব না", ভাবতে-ভাবতে বড় রাস্তার মাঝখানে চৌমাথায় থমকে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাতে লাগল রাস্‌কোল্‌নিকভ্, দেখে মনে হচ্ছিল যেন কারও কাছ থেকে শেষ কথাটা শুনতে চায়। কিন্তু কোন জায়গা থেকে কোন সাড়া মিলল না। সব অচেতন, নিষ্প্রাণ। রাস্তার এই যে পাথরগুলোর ওপর দিয়ে সে পা ফেলে চলছে সেগুলোর মতো মৃত—তার কাছে, একান্তই তার কাছে।...হঠাৎ দূরে রাস্তার শেষে, দুশ-পা-খানেক দূরে ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে সে স্পষ্ট করে চিনতে পারল লোকজনের ভিড়, শুনতে পেল কথাবার্তা, চিৎকার-চেঁচামেচি।...ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘোড়ার গাড়ি।...রাস্তার মাঝখানে দপ-দপ করে জ্বলছে একটা আলো। "কী ব্যাপার?" রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ডানপাশে ঘুরে ভিড়ের দিকে এগিয়ে

গেল। সে এখন হাতের কাছে যা কিছু পায় তা-ই আঁকড়ে ধরার জন্য প্রস্তুত—এই ভেবে মনে-মনে ম্লান হাসি হাসল। তার হাসি পেল আরও এই কারণে যে থানায় যাবার স্থির সিদ্ধান্ত সে নিয়ে ফেলেছে। সে নিশ্চিত জানে যে এখনই সবকিছুর নিষ্পত্তি ঘটবে।

সাত

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে কোন বড়মানুষের বেশ একটা ঝকমকে ঘোড়ার গাড়ি—একজোড়া টগবগে ছাইরঙা ঘোড়া জোতা। যাত্রী বলতে কেউ নেই গাড়িতে। গাড়োয়ান নিজে কোচবাক্স থেকে নেমে পাশে ঘোড়াদুটোর মুখের লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে গিজগিজ করছে অসংখ্য মানুষ, সবার আগে পুলিসের লোকজন। তাদের একজনের হাতে একটা জ্বালানো লণ্ঠন। লোকটা ঝুঁকে পড়ে সদর রাস্তার ওপর লণ্ঠনের আলো ফেলে গাড়ির চাকার ঠিক কাছটাতে কী যেন খুঁজছিল। সকলে কথা বলছে, হৈচৈ 'আহা উহু' করছে। গাড়োয়ানকে দেখে মনে হচ্ছিল সে ভেবাচেকা খেয়ে গেছে। থেকে-থেকে বলে চলেছে :

"হায় হায়, একী হল! হা ভগবান, এ কী হল!"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ যতদূর সম্ভব ভিড়ের মাঝখান দিয়ে পথ করে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। অবশেষে দেখতে পেল এতসব উত্তেজনা ও কৌতূহলের আসল কারণটি। মাটিতে পড়ে আছে ঘোড়ার খুরে সদ্য পিষ্ট একটি লোক। দেখে মনে হচ্ছে কোন চেতনা নেই তার। জামাকাপড়ের হাল খুবই খারাপ, তবে একসময় পোশাকটা যে 'সম্ভ্রান্ত' ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। আগাগোড়া রক্তাক্ত। মুখ আর মাথা থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। মুখটা ক্ষতবিক্ষত, থেঁতলে বিকৃত হয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে চোটটা মামুলি বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

"হায় হায়!" গাড়োয়ান বিলাপ করে চলেছে। "কী করে বুঝব, বলুন? আমি যদি খুব একটা জোরে চালাতাম, লোকটাকে চেঁচিয়ে না ডাকতাম তাহলে না হয় কথা ছিল। তা তো নয়—আমি চালাচ্ছিলাম আস্তে-আস্তে, সমান তালে। সবাই দেখেছে। তাহলে বলতে হয় লোকজন মিথ্যে বলছে, আমিও মিথ্যে বলছি। কে না জানে যে মাতাল সোজা পথে চলতে পারে না।... দেখতে পাচ্ছি রাস্তা পার হচ্ছে, টলছে, এই বুঝি পড়ে যায় মুখ থুবড়ে। চেঁচালাম একবার, দুবার—তিন-তিনবার, ঘোড়াদুটোর রাশ ধরে টানলামও। কিন্তু লোকটা সোজা গিয়ে পড়ল ঘোড়ার খুরের তলায়। ইচ্ছে করে কিনা কে জানে! নাকি একেবারে বদ্ধ মাতাল ছিল!...এই ঘোড়াগুলোর বয়স কম, সহজে ভড়কে যায়, তাই চমকে গা ঝাঁকানি দিল— লোকটা চেঁচিয়ে উঠল—তাইতে ওরা আরও ঘাবড়ে গেল।...ফলে বিপদ এড়ান গেল না।"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই!" ভিড়ের মধ্য থেকে একজন সাক্ষ্য দিল।

"চেঁচিয়ে ডেকেছিল এটা ঠিক। তিনবার চেঁচিয়ে ডেকেছিল", আরেকজন বলে উঠল।

"ঠিক তিনবার। সবাই শুনেছে", তৃতীয় আরেকজনের কণ্ঠস্বর।

মোটকথা, গাড়োয়ানকে দেখে মনে হয় না খুব একটা মুষড়ে পড়েছে বা ভয় পেয়ে গেছে। বুঝতে বাকি থাকে না যে গাড়ির মালিক কোন ধনাঢ্য, গণ্যমান্য ব্যক্তি —গাড়ির আগমনের প্রতীক্ষায় কোথাও আছে। পুলিস অবশ্য ভদ্রলোকের এই সাম্প্রতিক অসুবিধাটা দূর করার জন্য কম চেষ্টা করছে না। পিষ্ট লোকটিকে এখন তুলে নিয়ে থানায় এবং অতঃপর কোন হাসপাতালে স্থানান্তরের অপেক্ষা। লোকটার নামধাম কারও জানা নেই।

ইতিমধ্যে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ ভিড় ঠেলে আরও কাছে এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে দেখার চেষ্টা করল। এমন সময় লণ্ঠনের আলো আরও উজ্জ্বল হয়ে হতভাগ্য লোকটার মুখের ওপর পড়ল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ তাকে চিনতে পারল।

"আমি জানি, ওকে আমি জানি!" ভিড় ঠেলে একেবারে সামনে এগিয়ে এসে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ চেঁচিয়ে বলল।" "লোকটা সরকারি অফিসের কেরানি, একজন ছোটখাটো কেরানি... এখন অবসর নিয়েছে। মার্মেলাদভ্‌! থাকে এখানেই, কাছাকাছি। কোজেলদের বাড়িতে। ...চটপট ডাক্তার ডাকুন। আমি টাকা দেব—এই যে!" বলে সে পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে পুলিসকে দেখাল। সে দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল।

চাপাপড়া লোকটার পরিচয় জানা গেছে দেখে পুলিস সন্তুষ্ট। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ নিজের নামধাম জানাল। অচেতন মার্মেলাদভ্‌কে যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়া হয় সে জন্য ওদের এত বেশি পীড়াপীড়ি করতে লাগল যে মনে হল লোকটা যেন তার জন্মদাতা পিতা।

"এই যে এখানে, তিনটে বাড়ি পরে," সে ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়ল। কোজেলদের বাড়ি, বড়লোক জার্মানের বাড়ি। ... লোকটা এখন সম্ভবত মাতাল অবস্থায় ছিল, বাড়ি যাচ্ছিল। আমি ওকে জানি। ...মদখোর। ...বাড়িতে ওর পরিবার আছে, বৌ-বাচ্চা আছে, একটা মেয়ে আছে। হাসপাতালে টানাটানি করে কাজ নেই, ওই বাড়িতেই নির্ঘাত কোন ডাক্তার পাওয়া যাবে! টাকা আমি দেব, আমিই দেব!...অন্তত বাড়ির সেবাযত্নটা তো পাবে, এই মুহূর্তে সাহায্য পাবে। এখন টানাহেঁচড়া করলে হাসপাতালে যাবার পথেই মারা যাবে।..."

ইতিমধ্যে সে সবার অলক্ষে পুলিসের হাতে কিছু গুঁজেও দিয়েছে। ব্যাপারটা অবশ্য এখন বেশ স্পষ্ট, যুক্তিসঙ্গতও বটে। অন্ততপক্ষে সাহায্যটা এখানে হাতের কাছেই পাওয়া যাচ্ছে। লোকটাকে তুলে বয়ে নিয়ে যাওয়া হল—সাহায্য করার লোকের অভাব হল না। কোজেলদের বাড়ি তিরিশ গজ মতো দূরে! রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ সন্তর্পণে মাথাটা তুলে ধরে ওদের পথ দেখিয়ে চলল পিছন-পিছন।

"এদিকে, এদিকে! সিঁড়ি দিয়ে ওঠানোর সময় মাথাটা যেন ওপরের দিকে থাকে, ঘুরিয়ে নিন।...হ্যাঁ এই যে, ঠিক হয়েছে! আমি টাকা দেব, আপনাদের পুষিয়ে দেব", বিড়বিড় করে সে বলল।

কাতেরিনা ইভানোভ্না রোজ ফাঁকা সময় পেলে সঙ্গে-সঙ্গে যা করে আজও তেমনি বুকের ওপর দুহাত আড়াআড়ি চেপে ধরে তার ছোট্ট ঘরটার ভেতর পায়চারি করছিল— একবার জানলা থেকে চুল্লির কাছে যাচ্ছিল, আবার ফিরে আসছিল। আপন মনে কথা বলতে-বলতে কাশছিল। সম্প্রতি আরও ঘন-ঘন এবং বেশি করে তার বড় মেয়ে, দশ বছরের পোলেন্কার সঙ্গে কথা বলাটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। মেয়েটি যদিও তখনও অনেক কিছু বুঝতে পারে না, তবু বেশ ভালোই বুঝতে পারে যে তার মা'র খুব দরকার তাকে; তাই বুদ্ধিদীপ্ত বড় বড় চোখ মেলে সবসময় মা'র গতিবিধি লক্ষ করতে থাকে এবং প্রাণপণ শক্তিতে এমন ভাব করে যেন সমস্ত কিছু বুঝতে পারছে। পোলেন্কার ছোট্ট ভাইটির আজ সারাদিন শরীর খারাপ যাচ্ছে। এখন পোলেন্কা তাকে বিছানায় শোয়ানোর আগে জামাকাপড় ছাড়িয়ে দিচ্ছে। জামাটা এই রাতে কাচতে হবে। জামা বদলের অপেক্ষায় ছোট ছেলেটি চুপচাপ স্থির হয়ে সোজা বসে ছিল একটা চেয়ারে— তার মুখের ভাবভঙ্গি গুরুগম্ভীর, ছোট-ছোট পা দুটি পাশাপাশি শক্ত করে চেপে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। দু-পায়ের গোড়ালি একসঙ্গে ঠেকিয়ে লোকের মুখের সামনে উঁচিয়ে রাখা, পায়ের পাতাদুটো ছড়ান। ওর মা দিদিকে যে সমস্ত কথা বলছিল সেগুলো সে শুনছিল ঠোঁট ফুলিয়ে, চোখ বড় বড় করে। এতটুকু নড়াচড়া করছিল না। যেভাবে স্থির হয়ে বসে ছিল তা দেখে মনে হচ্ছিল জামাকাপড় ছাড়িয়ে বিছানায় শোয়ানোর আগে বুদ্ধিমান বাচ্চা ছেলেরা সচরাচর যেমন করে থাকে এ যেন তার আদর্শ দৃষ্টান্ত। তার চেয়েও ছোট মেয়েটি— তার জামাকাপড়ের অবস্থা একেবারে শোচনীয়— পরদার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল কখন তার পালা আসবে। ভেতরের অন্যান্য ঘর থেকে যে পরিমাণ তামাকের ধোঁয়া গলগল করে ভেতরে ঢুকছিল তাতে অনেকক্ষণ ধরে দমকে-দমকে কাশতে-কাশতে যক্ষ্মারোগী বেচারির অবস্থা প্রাণান্তকর হয়ে উঠছিল। ওই ধোঁয়ার হাত থেকে অন্তত কিছুটা রক্ষা পাবার জন্য সিঁড়ির দিকের দরজাটা খুলে রাখা হয়েছিল। গত এক সপ্তাহের মধ্যে কাতেরিনা ইভানোভ্না যেন আরও রোগা হয়ে গেছে। তার গালের লাল চাকাগুলো এখন আগের চেয়েও বেশি দগদগ করছে।

"তুই বিশ্বাস করতে পারবি না, তুই কল্পনা করতে পারবি না রে পোলেন্কা," ঘরের ভেতর পায়চারি করতে-করতে সে বলল,"কী ঐশ্বর্যের মধ্যেই না জীবন কাটত বাপের বাড়িতে ! তারপর এলো এই হতভাগা মাতালটা, ধ্বংস করে দিল আমার জীবনটা, তোদের সবাইকেও ধ্বংস করবে! আমার বাবা ছিলেন সিভিল সার্ভিসের কর্নেল, প্রায় গভর্নরই বলা যায়— আর মাত্র এক ধাপ ওপরে ওঠা বাকি ছিল আর

কি। কিন্তু তখনই সকলে ওঁর কাছে এসে বলত: 'আমরা কিন্তু আপনাকে আমাদের গভর্নর বলেই মনে করি ইভান মিখাইলভিচ।' যখন আমি.... খুক্- খুক্- খুক্... ওঃ মরণও হয় না ছাই!" শ্লেষ্মা তুলতে-তুলতে দুহাতে বুক চেপে ধরে সে চিৎকার করে বলল, "যখন আমি... আ, যখন রাজপুরুষপ্রধানের বাড়িতে... শেষ বল নাচের সেই আমার... রাজরানী বেজ্‌জেমেল্‌নায়া আমায় দেখতে পেলেন... পরে যখন তোর বাবার সঙ্গে আমার বিয়ে হয় তখন উনি আমাকে আশীর্বাদও করেছিলেন... তা বুঝলি রে পোলেন্‌কা, খুকি আমার, তিনি তক্ষুনি জিগ্‌গেস করলেন : 'এই মিষ্টি মেয়েটা সেই মেয়ে না, যে শাল গায় দিয়ে পরীক্ষা পাসের সোশ্যালে নেচেছিল?'... ওরে খুকি, ছেঁড়া জায়গাটা তো সেলাই করা দরকার। নে, নে, এক্ষুনি ছুঁচসুতো নিয়ে রিফু করে ফেল— যেমন দেখিয়ে দিয়েছি। নয়ত কাল... খুক্! কাল... খুক্-খুক্-খুক্!... একেবারে ফাতা-ফাতা হয়ে যাবে!" কাশির দমকের সঙ্গে-সঙ্গে সে চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে বলল।... "সেই সময় পিটার্সবুর্গ থেকে সবে এসেছেন একজন উঠতি রাজপুরুষ, রাজকুমার শ্চেগোল্‌স্কোই।... আমার সঙ্গে মাজুরকা নাচলেন। পরদিনই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। কিন্তু আমি তখন ওঁকে নানাভাবে প্রশংসা করে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষকালে বললাম যে আমি বহুকাল হল আমার মনপ্রাণ অন্য একজনকে সমর্পণ করেছি। এই অন্য লোকটি ছিল তোর বাপ, বুঝলি খুকি? শুনে আমার বাবা তো বেজায় খাপ্পা!... আরে হ্যাঁ, বলি জল তৈরি হয়েছে? আচ্ছা, দে এবারে জামাটা। আর মোজাজোড়া?... লিদা," এবারে ছোট মেয়ের দিকে ফিরে সে বলল, "তুই বাপু এই রাতটা জামাছাড়া কোনমতে কাটিয়ে দে।... হ্যাঁ মোজাজোড়াও পাশে খুলে রাখ।...একসাথে কেচে ফেলা যাবে।... হতচ্ছাড়া মাতাল কাকতাড়ুয়াটা এখনও আসছে না কেন! গায়ের জামাটা কবে ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেছে, এখন ন্যাতা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না ওটাকে।... সবগুলো একসঙ্গে দিতে পারলে হত, তাহলে আর পরপর দুটো রাত ভুগতে হত না! হা ভগবান! খুক্- খুক্- খুক্-খুক! ফের শুরু হল! একী ব্যাপার?" ঘরে ঢোকার মুখে সিঁড়ির চাতালে লোকজনের ভিড়ের দিকে দৃষ্টি পড়তে এবং কিছু লোককে একটা বোঝা ধরাধরি করে *ঠেলেঠুলে* তার ঘরের ভেতরে ঢোকাতে দেখে সে আর্তনাদ করে উঠল। "কী ওটা? কী নিয়ে আসছে ওরা? হা ভগবান!"

"কোথায় রাখতে বলেন? " রক্তাপ্লুত, সংজ্ঞাহীন মার্মেলাদভ্‌কে কোনমতে ঘরের ভেতরে এনে ফেলার পর চারধারে তাকাতে-তাকাতে পুলিসের লোকটা জিগ্‌গেস করল।

"সোফার ওপর রাখুন। সোজা সোফার ওপর শুইয়ে দিন, এই যে মাথাটা এদিকে," রাস্‌কোলনিকভ্‌ ওদের দেখিয়ে দিল।

"রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়েছে। মাতাল!" সিঁড়ির গোড়া থেকে কে একজন চেঁচিয়ে

বলল। কাতেরিনা ইভানোভ্না যেমনকার তেমন দাঁড়িয়ে রইল। আগাগোড়া ফেকাসে হয়ে গেছে তার মুখ। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। বাচ্চাগুলো ভয়ে জড়সড়। ছোট্ট লিদা চিৎকার করে কেঁদে উঠল, পোলেন্কার কাছে ছুটে গিয়ে তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

মার্মেলাদভ্কে শুইয়ে দেওয়ার পর রাস্কোল্নিকভ্ ছুটে গেল কাতেরিনা ইভানোভ্নার কাছে।

"ঈশ্বরের দোহাই, শান্ত হোন, ভয় পাবেন না!" তড়বড় করে সে বলে উঠল। "রাস্তা পার হচ্ছিল, সেই সময় গাড়িচাপা পড়ে। ঘাবড়াবেন না, ওর জ্ঞান ফিরে আসবে। আমি এখানে আনতে বলেছি।... আমি আপনাদের এখানে একবার এসেছিলাম— মনে আছে?... ওর জ্ঞান ফিরে আসবে, টাকাকড়ি যা লাগার আমি দেব।"

"এটাই বাকি ছিল ওর!" মরিয়া চিৎকার ছেড়ে কাতেরিনা ইভানোভ্না ছুটে গেল স্বামীর দিকে।

রাস্কোলনিকোভের বুঝতে দেরি হল না, কথায়-কথায় যারা মূর্ছা যায় এ মহিলা মোটেই সে গোত্রের নয়। চোখের পলকে হতভাগ্য লোকটির মাথার নিচে বালিশ এসে গেল— এটা নিয়ে এর আগে পর্যন্ত কেউ ভাবেইনি। কাতেরিনা ইভানোভ্না তার গায়ের জামা খুলে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল, মাথা ঠাণ্ডা রেখে নিজের কথা ভুলে গিয়ে স্বামীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তার ঠোঁট কাঁপছিল, বুকের পাঁজর ভেদ করে আর্তনাদ বেরিয়ে আসার উপক্রম করছিল— অনেক কষ্টে ঠোঁট কামড়ে সে নিজেকে সামলাচ্ছিল।

রাসকোল্নিকভ্ ইতিমধ্যে হাতে-পায়ে ধরে একজনকে একছুটে ডাক্তার ডেকে আনতে রাজি করাল। দেখা গেল একটা বাড়ি পরেই একজন ডাক্তার বাস করে।

"আমি ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি", কাতেরিনা ইভানোভ্নাকে আশ্বস্ত করে বলল রাসকোল্নিকভ্। "চিন্তা করবেন না, টাকাকড়ি যা লাগে আমি দেব। জল আছে? একটা ন্যাপকিন বা তোয়ালে ধরনের কিছু একটা দিন, জলদি! আঘাত কতটা গুরুতর এখনও জানা নেই।... আহত হয়েছে, মারা যায়নি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।... যা বলার ডাক্তার বলবেন!"

কাতেরিনা ইভানোভ্না ছুটে গেল জানলার কাছে। সেখানে এককোনায় একটা বিধ্বস্তপ্রায় চেয়ারের ওপরে রাতের বেলায় তার স্বামী আর ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় ধোয়ার জন্য বড় মাটির গামলায় জল রাখা ছিল। রাতের এই ধোয়াকাচার কাজটা কাতেরিনা ইভানোভ্না নিজের হাতে করত, সপ্তাহে অন্তত দুবার করে, কখনও আরও ঘন-ঘন, কেন না অবস্থা' এমন দাঁড়িয়েছিল যে বদল করার মতো জামাকাপড় বলতে গেলে একেবারে ছিল না। পরিবারের কারোই একপ্রস্থ

বেশি জামাকাপড় ছিল না। এদিকে অপরিচ্ছন্নতা কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার দু'চোখের বিষ, তাই সে ঠিক করেছে বরং রাতের বেলায় সকলে যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সে শক্তির অতিরিক্ত পরিশ্রমের কষ্ট স্বীকার করবে। রাতে সকালের মধ্যে দড়িতে টাঙানো ভিজে জামাকাপড় শুকিয়ে যায়, সকলকে সে পরিষ্কার জামাকাপড় তুলে দিতে পারে এবং ঘরের ভেতরে নোংরা তাকে আর দেখতে হয় না। রাস্‌কোল্‌নিকভের দাবিতে গামলাটা ধরে তুলে আনতে গিয়ে ভার সহ্য করতে না পেরে সে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ ততক্ষণে একটা তোয়ালে জোগাড় করে ফেলেছে, সেটা জলে ভিজিয়ে সে মার্মেলাদভের মুখের রক্ত ধুতে শুরু করল। কাতেরিনা ইভানোভ্‌না দুহাত বুকের ওপর চেপে ধরে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। যন্ত্রণায় তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তার নিজেরই এখন সাহায্য দরকার। রাসকোলনিকভ্‌ বুঝতে শুরু করেছে লোকজনকে বলে কয়ে আহতকে এখানে নিয়ে এসে হয়ত সে ঠিক করেনি। পুলিসের লোকটারও অবস্থা কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

"পোলেন্‌কা!" কাতেরিনা ইভানোভ্‌না চেঁচিয়ে ডাকল। "একছুটে গিয়ে সোনিয়াকে ডেকে নিয়ে আয়, জলদি! বাড়িতে যদি না পাস তাতেও কিছু এসে যায় না, খবর রেখে আসবি যে বাবা ঘোড়ার খুরের তলায় চাপা পড়েছে, যেন চলে আসে... ফিরে আসামাত্র। জলদি কর্‌ মা! নে, ওড়নাটা মাথায় জড়িয়ে নে!"

"এক ছুট্রে চলে যা!" চেয়ার থেকে ছোট ছেলেটা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, কিন্তু একথা বলেই আবার আগেকার মতো নিস্তব্ধতায় ডুবে গেল, দু-পায়ের গোড়ালি সামনের দিকে রেখে পায়ের পাতা ছড়িয়ে ছোট-ছোট দু-চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ারে বসে রইল সিধে হয়ে।

ইতিমধ্যে লোকজনে ঘর এমন ভরে উঠেছে যে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। পুলিসের লোকজন চলে গেছে কেবল একজন ছাড়া। সে লোকটাও রয়ে গেছে কিছু সময়ের জন্য, সিঁড়ির মুখে জড় হওয়া জনতাকে খেদিয়ে আবার সিঁড়িতে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তা হলে কী হবে, মাদাম লিপ্‌পেভেখ্‌জেলের যত ভাড়াটে তারা সবাই হুড়হুড় করে বেরিয়ে এসেছিল ভেতরের ঘরগুলো থেকে। গোড়ার দিকে তারা কেবল দোরগোড়ায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু পরে বাঁধভাঙা জলের মতো আছড়ে পড়ল একেবারে ঘরের ভেতরে। কাতেরিনা ইভানোভ্‌না দিশেহারা হয়ে পড়ল।

"লোকটাকে অন্তত শান্তিতে মরতে দেবেন তো।" ভিড়ের উদ্দেশ্যে সে চেঁচিয়ে বলল। "নাটক দেখার সাধ হয়েছে! এসেছেন সিগারেট মুখে নিয়ে!... খুক্‌-খুক্‌-খুক্‌!...ভক্তিশ্রদ্ধা দেখানোর বালাই না রেখে মাথার টুপি না খুলেই চলে আসুন না!... বাঃ,! এই তো একজনের মাথায় আবার টুপিও আছে দেখছি!... গেট আউট। মৃতদেহকে অন্তত সম্মান দেখাতে শিখুন!"

কাশিতে তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। কিন্তু ঝাঁঝে কাজ দিল। এমনকি দেখেশুনে মনে হচ্ছিল কাতেরিনা ইভানোভ্‌নাকে ওরা একটু ভয়ও পেয়েছে। ভাড়াটেরা চাপাচাপি করে একে-একে ফিরে যেতে লাগল দরজার দিকে। এই সময় ভেতরে-ভেতরে তারা উপলব্ধি করছিল এক অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ। কাছের কোন মানুষের আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটলে তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ লোকজনের মধ্যে পর্যন্ত ঠিক এধরনের আত্মপ্রসাদ দেখা যায়। একটি মানুষও এই অনুভূতি থেকে ছাড় পায় না। এ ব্যাপারে কোনও ব্যতিক্রম নেই। তা তার আক্ষেপ ও সমবেদনার উপলব্ধি যত আন্তরিকই হোক না কেন।

দরজার বাইরে অবশ্য শোনা যাচ্ছিল লোকজনের কণ্ঠস্বর, তারা বলাবলি করছিল হাসপাতালের কথা, বলছিল এখানে লোকজনকে খামোকা ব্যতিব্যস্ত করে তোলা ঠিক হবে না।

"তার মানে নিশ্চিন্তে মরাও ঠিক হবে না!" কাতেরিনা ইভানোভ্‌না ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। ইতিমধ্যে সে তাদের ওপর একচোট বর্ষণ করার উদ্দেশ্যে ছুটে গিয়ে দরজা টেনে খুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু দোরগোড়ায় ধাক্কা খেল খোদ মাদাম লিপ্‌পেভেখ্‌জেলের সঙ্গে। মহিলা সবে দুর্ঘটনার খবর পেয়েছে, খবর পেয়েই পড়িমরি করে ছুটে এসেছে শান্তি ও শৃঙ্খলা উদ্ধারের জন্য। মহিলা জাতে জার্মান, বড় ঝগড়াটে ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির।

"ওঃ মাই গড!" দু-হাত শূন্যে ছুঁড়ে সে বলল। "আপনার সোয়ামী মাতাল হোয়ে ঘোড়ার তলায় পড়েছিল। আসপাতালে দেওয়া লাগে। হামি বাড়িআলি বোলছি!"

"আমালিয়া ল্যুদ্‌ভিগোভ্‌না! দয়া করে একবার ভেবে দেখুন আপনি কী বলছেন," বেশ উদ্ধত ভঙ্গিতেই বলতে শুরু করল কাতেরিনা ইভনোভ্‌না— অবশ্য বাড়িউলির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তার কণ্ঠস্বরে সবসময় উদ্ধত ভঙ্গি ফুটে ওঠে, যেহেতু তাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে চায় সমাজে তার স্থান কোথায়। এখন, এই অবস্থাতেও এহেন আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে না পেরে সে চেঁচিয়ে উঠল: "আমালিয়া ল্যুদ্‌ভিগোভ্‌না..."

"হামি কতবার আপনাকে বুলেছি খোবুরদার কখুনও হামাকে আমাল ল্যুদ্‌ভিগোভ্‌না বোলে ডাকবেন না। হামি আমাল-ইভান।"

"আপনি আমাল-ইভান নন আপনি আমালিয়া ল্যুদ্‌ভিগোভ্‌না। ওই যে দরজার ওপাশে যে লোকটা এখন হাসছে..." দরজার ওপাশ থেকে একটুকরো হাসি আর 'লেগেছে, লেগেছে!' —উল্লসিত চিৎকার ভেসে আসতে তা লক্ষ করে কাতেরিনা ইভানোভ্‌না বলে চলল : "সেই লেবেজিয়াত্‌নিকভ মশায়ের মতো আপনার হীন তোষামোদকারীদের দলে যেহেতু আমি নেই সেই হেতু আমি চিরকাল আপনাকে আমালিয়া ল্যুদ্‌ভিগোভ্‌না বলেই ডাকব, যদিও আমি আদৌ বুঝতে পারছি না এই

নামটা আপনার এত অপছন্দ কেন।... আপনি নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছেন আমার স্বামী সেমিওন জাখারভিচ মার্মেলাদভের কী অবস্থা হয়েছে, উনি মারা যাচ্ছেন। আপনাকে অনুরোধ করছি এই মুহূর্তে দরজাটা বন্ধ করে দিন, কাউকে এখানে ঢুকতে দেবেন না। লোকটাকে অন্তত শান্তিতে মরতে দিন। তা নইলে আপনাকে বলে রাখছি, কালই আপনার দুর্ব্যবহার সম্পর্কে রিপোর্ট চলে যাবে গভর্নর জেনারেলের কাছে। প্রিন্স আমাকে জানেন বিয়ের অনেক আগে থাকতে, সেমিওন জাখারভিচ্‌কে বেশ ভালো মনে আছে তাঁর—অনেকবার ওঁর উপকার করেছেন। সকলে জানে যে সেমিওন জাখারভিচের অনেক বন্ধুবান্ধব, শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। কিন্তু নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন থাকায়, আত্মসম্মানের খাতিরে তিনি নিজে তাঁদের সম্পর্ক বর্জন করেছেন। কিন্তু এখন...'' এবারে রাস্‌কোল্‌নিকভকে দেখিয়ে সে বলল, ''আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন এক মহাপ্রাণ যুবক, যাঁর সঙ্গতি ও যোগাযোগের অভাব নেই। ওঁকে আমার স্বামী সেমিওন জাখারভিচ্‌ সেই ছোটবেলা থেকে জানতেন, তাই বলি কি, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আমালিয়া ল্যুদ্‌ভিগোভ্‌না...''

এতখানি কথা সে দ্রুত এক নিঃশ্বাসে বলে চলছিল, যত এগিয়ে যাচ্ছিল ততই বেড়ে চলছিল তার বলার গতি। কিন্তু কাশির দমকে আচমকা বন্ধ হয়ে গেল কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার বক্তৃতাবাজি। ঠিক এই মুহূর্তে মুমূর্ষু লোকটির সংজ্ঞা ফিরে আসতে সে কাতরে উঠল। তাই দেখে কাতেরিনা ইভানোভ্‌নাও ছুটে গেল তার দিকে। অসুস্থ লোকটি চোখ খুলল। তখনও কিছু চিনতে বা বুঝতে পারছিল না। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ তার ওপর ঝুঁকে পড়ে আছে দেখে ভালো করে তাকেই দেখতে লাগল। রোগী অনেকক্ষণ অন্তর-অন্তর গভীর ও ভারী নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। তার দুই কশ বেয়ে ঝরে পড়ছে রক্ত, কপালে ফুটে উঠেছে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে চিনতে না পেরে সে অস্থিরভাবে এদিক-এদিকে তাকাতে লাগল, কাতেরিনা ইভানোভ্‌না বিষণ্ণ ও কঠিন দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল স্বামীর দিকে, তার চোখ দিয়ে আঝোর ধারে অশ্রু ঝরতে লাগল।

''হা ভগবান! ওর সমস্ত বুকটাই যে থেঁতলে গেছে! ওঃ কী রক্ত, কী রক্ত!'' হতাশভাবে বলে উঠল কাতেরিনা ইভানোভ্‌না। ''ওর গা থেকে সমস্ত জামাকাপড় খোলা দরকার! একটু কাত হও দেখি সেমিওন জাখারভিচ্‌, যদি পার'' সে চেঁচিয়ে বলল তাকে।

মার্মেলাদভ্‌ তাকে চিনতে পারল।

''একজন পুরুতঠাকুর ডেকে আন!'' ভাঙা গলায় মার্মেলাদভ্‌ বলল।

কাতেরিনা ইভানোভ্‌না জানলার কাছে সরে গিয়ে জানলার ফ্রেমে কপাল ঠেকিয়ে হতাশসুরে আর্তনাদ করে উঠল: ''হায় কী অভিশপ্ত জীবন!''

''পুরুতঠাকুরকে ডাক!'' কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থাকার পর মৃত্যুপথযাত্রী আবার বলে উঠল।

"গে— ছে ডাকতে!" কাতেরিনা ইভানোভ্না চেঁচিয়ে তাকে বলল। তার চিৎকার কানে যেতে মার্মেলাদভ্ চুপ করে গেল। ভয়ার্ত কাতর দৃষ্টিতে মার্মেলাদভ্ খুঁজতে লাগল কাতেরিনা ইভানোভ্নাকে। সে আবার তার কাছে ফিরে এসে শিয়রে দাঁড়াল। খানিকটা শান্ত হয়ে এলো মার্মেলাদভ্। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়। শিগ্গিরই তার দৃষ্টি ঘুরেফিরে স্থিরনিবদ্ধ হল বড় আদরের ছোটমেয়ে লিদার ওপর। লিদা ঘরের এককোনায় থরথর করে কাঁপছিল হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো। শিশুর বিস্ময় নিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল তার বাপের দিকে।

"আ...আ..." অস্থির হয়ে মেয়েকে দেখিয়ে সে কী যেন বলতে গেল।

"কী চাই আবার?" কাতেরিনা ইভানোভ্না চেঁচিয়ে বলল।

"খালি পা, একদম খালি পা!" অর্ধোন্মত্ত দৃষ্টিতে মেয়ের খালি পায়ের দিকে ইঙ্গিত করে অস্ফুটস্বরে সে বলল।

"চো-ও -প্!" বিরক্তিভরে চেঁচিয়ে উঠল কাতেরিনা ইভানোভ্না। "খালি পা কেন তা তুমি নিজেই জান!"

"যাক বাঁচা গেল, ডাক্তার এসে গেছেন!" রাস্কোল্নিকভ্ উল্লসিত হয়ে বলল।

ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন। নিখুঁত বেশভূষা করা ছোটখাটো চেহারার এক বৃদ্ধ, জার্মান। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চারপাশে চোখ বোলালেন। রোগীর কাছে এগিয়ে গিয়ে নাড়ি টিপে দেখলেন, মনোযোগ দিয়ে মাথায় চারধারও স্পর্শ করে দেখলেন, তারপর কাতেরিনা ইভানোভ্নার সহযোগিতায় রক্তে আগাগোড়া ভেজা জামার সবগুলো বোতাম পটপট খুলে রোগীর বুকটা আলগা করে দিলেন। সমস্ত বুক ক্ষতবিক্ষত, থেঁতলে বেঁকেচুরে গেছে। ডান দিকের পাঁজরার কয়েকটা হাড় ভাঙা। বাঁ পাশে, হৃৎপিণ্ডের ঠিক ওপরটাতে একটা বিশাল ভয়াবহ আকারের হলদেটে কালো ছোপ — ঘোড়ার খুরের নৃশংস আঘাতের চিহ্ন। ডাক্তার ভুরু কোঁচকালেন। পুলিসের লোকটি তাকে বলল যে হতভাগা লোকটা গাড়ির চাকায় আটকে পড়েছিল, ওই অবস্থায় সদর রাস্তার ওপর গাড়ি তাকে প্রায় হাত দশেক টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যায়।

"জ্ঞান যে ফিরে এসেছে এটাই তো আশ্চর্যের!" ডাক্তার নিচু গলায় ফিসফিসিয়ে রাস্কোল্নিকভ্কে বলল।

"আপনার কী মনে হয়?" রাসকোল্নিকভ্ জিগ্গেস করল।

"এখুনি মারা যাবে।"

"কোনও আশাভরসা নেই বলতে চান?"

"বিন্দুমাত্র নেই! এখন শেষ নিঃশ্বাস ফেলছে।... তা ছাড়া মাথার আঘাত খুবই বিপজ্জনক।... হুম্, রক্ত খানিকটা বের করে দেওয়া যায় অবশ্য... কিন্তু... তাতে কোন লাভ হবে না। পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে নির্ঘাত মারা যাবে।"

"তা হলে বরং একটু রক্ত বের করেই দেখুন না কেন!"

"দেখি।... তবে আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, এতে এতটুকু লাভ নেই।"

এই সময় আরও পদধ্বনি শোনা গেল। সিঁড়ির মুখে ভিড়টা মাঝখান থেকে দুভাগে ভাগ হয়ে গেল, দোরগোড়ায় প্রসাদ হাতে আবির্ভাব ঘটল ছোটখাটো চেহারার এক পক্ককেশ বৃদ্ধ পুরোহিতের। রাস্তার দুর্ঘটনার পর-পরই পুলিসের একজন লোক তাকে আনতে গিয়েছিল। ডাক্তার তৎক্ষণাৎ সরে গিয়ে তাঁকে জায়গা করে দিলেন। দুজনের মধ্যে অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টি বিনিময় হল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ডাক্তারকে অনুনয় করল অন্তত আরেকটুখানি অপেক্ষা করে যেতে। ডাক্তার অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন। থেকে গেলেন।

উপস্থিত সকলে সরে দাড়াল। স্বীকারোক্তির পালাটা তেমন একটা দীর্ঘস্থায়ী হল না। মৃত্যুপথযাত্রী খুব একটা ভালোভাবে কিছু বুঝতে পারছিল কিনা সন্দেহ। সে কেবল উচ্চারণ করতে পারছিল কয়েকটি অসংলগ্ন, অস্পষ্ট ধ্বনি। কাতেরিনা ইভানোভ্‌না লিদাকে টেনে নিয়ে, ছোট ছেলেটাকে চেয়ার থেকে তুলে নিয়ে ঘরের কোনায় চুল্লির ধারে চলে গেল। নিজে নতজানু হয়ে বসল, ওদের দুজনকেও ওইভাবে বসাল নিজের সামনে। মেয়েটা শুধুই কাঁপছিল, কিন্তু ছেলেটা মোজা ছাড়া খালি পায়ে নতজানু হয়ে ধীরেসুস্থে কচি হাত তুলে নিখুঁতভাবে ক্রুশ প্রণাম করতে লাগল। মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করার সময় ব্যরবার, কপাল ঠুকে সে যেন এক বিশ্রেষ ধরনের আনন্দ উপভোগ করছিল। কাতেরিনা ইভানোভ্‌না ঠোঁট কামড়ে চোখের জল সামলাচ্ছিল। সেও প্রার্থনা করছিল, প্রার্থনা করার সময় থেকে-থেকে ছেলের গায়ের জামাটা হাত দিয়ে পাট করে দিচ্ছিল। মেয়েটার কাঁধ একেবারে খালি ছিল দেখে এরই মধ্যে নতজানু অবস্থা থেকে না উঠে, প্রার্থনা করতে-করতেই আলমারির দেরাজ থেকে একটা বড় রুমাল বের করে তার কাঁধের ওপর ফেলে দিয়েছে। ততক্ষণে ভেতরের ঘরগুলোর দরজা আবার একটু-একটু করে খুলতে শুরু করে দিয়েছে কৌতূহলী জনতা। সিঁড়ির সামনের জায়গাটাতে এবং সমস্ত সিঁড়ি জুড়ে বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেদের গাদাগাদি ভিড় সমানেই ঘন হতে থাকে। অবশ্য ঘরের চৌকাট কেউ মাড়াল না। সমস্ত দৃশ্য আলোকিত করে জ্বলছিল দগ্ধপ্রায় মোমবাতির অবশিষ্টাংশ।

এই মুহূর্তে একছুটে দিদির খোঁজ নিয়ে ফিরে আসার পর সিঁড়ির মুখ থেকে ভিড় ঠেলতে-ঠেলতে দ্রুত পায়ে ভেতরে এসে ঢুকল পোলেন্‌কা—উর্ধ্বশ্বাসে ছোটার ফলে সে কোনরকমে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। ঘরে ঢুকেই মাথা থেকে ওড়নাটা খুলে ফেলল, চোখের দৃষ্টিতে মাকে খুঁজতে লাগল, তারপর তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল: "আসছে! রাস্তায় দেখা হয়েছিল!" মা তাকেও ধরে নতজানু করে নিজের কাছটিতে বসাল। নীরবে নিঃশব্দে ভয়ে-ভয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলো অল্পবয়সী একটি মেয়ে। এই দারিদ্র্য, দৈন্যদশা, ছেঁড়া জামাকাপড়, মৃত্যু আর হতাশার মাঝখানে. এই ঘরে তার আকস্মিক আবির্ভাব ছিল বিস্ময়কর। তারও

জামাকাপড় শতচ্ছিন্ন, তার বেশভূষার দাম কানাকড়িও হবে না, কিন্তু রাস্তার মেয়েদের পোশাকের মতোই চড়া রঙের, তার নিজের বিশেষ মহলে প্রচলিত রুচি ও নিয়ম উপযোগী এবং প্রগল্ভ উদ্দেশ্যের সুস্পষ্ট সাক্ষ্যবহ। সিঁড়ির সামনের চাতালে, ঠিক চৌকাটের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সোনিয়া, কিন্তু চৌকাট পেরোল না। তাকে বিহ্বল দেখাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল আশেপাশের কোনকিছু সম্পর্কে সে সচেতন নয়, যেন ভুলে গেছে তার চার হাত ফেরতা ফুলদার সিল্কের ঘাগরার কথা, যা এখানে রীতিমতো অশোভন। ঘাগরার পেছনের ঝুলটা বেজায় লম্বা আর হাস্যকর, ঘেরটা এত চওড়া যে দরজার মুখ তাতে পুরো আটকে যায়। তাকে দেখে আরও মনে হচ্ছিল সে বুঝি ভুলে পরে এসেছে হালকা রঙের বুটজোড়া। সঙ্গে নিয়ে এসেছে রোদ বাঁচানোর ফ্যাশনদুরস্ত ছাতা, যা রাতের বেলায় নিষ্প্রয়োজন, মাথায় পরেছে উজ্জ্বল আগুনরঙের পালক গোঁজা গোলাকার এক হাস্যকর স্ট্র হ্যাট। বাচ্চা ছেলের মতো একপাশে কাত করে পরা টুপির আড়াল থেকে উঁকি মারছে শীর্ণ, পাণ্ডুর, ভয়ার্ত একফালি ছোট্ট মুখ। ভয়ে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে আছে মুখটা, স্থির দৃষ্টিতে বিভীষিকা। সোনিয়া আকারে ছোটখাটো, বয়স তার বছর আঠারো। রোগা ছিপছিপে গড়ন, মাথার চুল সোনালি। অপূর্ব নীল চোখ— দেখতে তাকে বেশ ভালোই বলা চলে। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল বিছানার দিকে, পুরোহিতের দিকে। দ্রুত পায়ে আসতে হয়েছে বলে সেও হাঁপাচ্ছে। অবশেষে কানাকানি, ভিড়ের মধ্যে টুকরো-টুকরো কয়েকটি কথা, হয়ত তার কানে পৌঁছাল। সে চোখের দৃষ্টি নামিয়ে নিল, এতক্ষণে চৌকাট পেরিয়ে ঘরে ঢুকল, কিন্তু তবু দরজার একেবারে পাশটিতেই দাঁড়িয়ে রইল।

মৃত্যুপথযাত্রীর স্বীকারোক্তি গ্রহণ ও মুখে প্রসাদ ঠেকানোর পর্ব শেষ হল। কাতেরিনা ইভানোভ্না আবার স্বামীর শয্যার দিকে এগিয়ে গেল। পুরোহিত সরে দাঁড়ালেন, কিন্তু চলে যাবার আগে কাতেরিনা ইভানোভ্নার দিকে ফিরে দু'একটি প্রবোধবাক্য বলতে গেলেন।

"কিন্তু এগুলোকে নিয়ে আমি কী করব বলুন তো?" পুরোহিতকে রূঢ়ভাবে থামিয়ে দিয়ে বাচ্চাগুলোকে দেখিয়ে বিরক্তির সঙ্গে সে বলে উঠল।

"ঈশ্বর করুণাময়। সর্বশক্তিমানের ওপর ভরসা রাখুন," পুরোহিত বলতে শুরু করলেন।

"হুঁঃ! করুণাময়! আমাদের কাছে নন!"

"একথা বলা পাপ, মহাপাপ মা," মাথা নাড়িয়ে পুরোহিত মন্তব্য করলেন।

"তাহলে এটা? এটা পাপ নয় বলতে চান?" মৃত্যুপথযাত্রীকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কাতেরিনা ইভানোভ্না।

"হয়ত বা যারা অনিচ্ছাকৃতভাবে এটা ঘটিয়েছে তারা আপনাকে ক্ষতিপূরণ

দিতে রাজি হবে— আপনার পরিবারের যে আয় চলে গেল অন্তত তার জন্যে...”

“আপনি আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছেন না!” বিরক্তিভরে হাত ছুঁড়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল কাতেরিনা ইভানোভ্‌না। “তা ছাড়া ক্ষতিপূরণ কিসের জন্যেই বা? ও নিজে মাতাল হয়ে ঘোড়ার খুরের তলায় পড়েছে! কিসের আয়ের কথা বলছেন? আয় কিছুই করত না লোকটা। কেবল দুঃখ পেয়েছি ওর কাছ থেকে। বদ্ধ মাতাল, মদ খেয়ে সব উড়িয়ে দিত। ঘর থেকে সব চুরি করে শুঁড়িখানায় ঢালত, আমার আর ওদের জীবনও ফুঁকে দিল ওই শুঁড়িখানায়! ভগবানকে ধন্যবাদ যে মারা যাচ্ছে! আমাদের লোকসান এখন কম হবে!”

“মৃত্যুপথযাত্রী একজন মানুষকে ক্ষমা করা উচিত। এটা পাপ মা, এরকম মনে করাও মহাপাপ!”

কাতেরিনা ইভানোভ্‌না ব্যস্ত হয়ে রোগীর চারধারে ঘোরাঘুরি করছে। কখনও মুখে জল দিচ্ছে, কখনও মাথা থেকে ঘাম আর রক্ত মুছে দিচ্ছে, কখনও বা মাথার বালিশ ঠিক করে দিচ্ছে। এরই মধ্যে যখন ফাঁক পাচ্ছে, কাজের মাঝখানে কখন-কখন পুরোহিতের সঙ্গে টুকটাক কথা চালিয়ে যাচ্ছে। এবারে কিন্তু সে প্রায় দিশেহারা হয়ে হঠাৎ তার ওপর রাগে ফেটে পড়ল।

“হয়েছে ঠাকুরমশায়! কেবল কথা, কথা আর কথা। ক্ষমা! দেখুন, ও যদি গাড়িচাপা না পড়ত তাহলে নির্ঘাত মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরত। গায়ের জামা বলতে তো ওই একটা— তাও আবার বহুদিনের ব্যবহারে শতচ্ছিন্ন। এসে ধপাস করে বিছানায় গড়িয়ে পড়ত, পড়ে-পড়ে ঘুমোত, আর আমাকে সেই সকাল অব্দি জল ঘাঁটাঘাঁটি করতে হত, ওর আর ছেলেমেয়েদের ছাড়া জামাকাপড় ধোয়া-কাচা করতে হত। তারপর সেগুলোকে জানলার বাইরে শুকোতে দাও, তখনই আবার ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে বসে যাও রিফু করতে— এই তো আমার রাত কাটান!... তাই বলি কি, ক্ষমার কথা বলে কী লাভ এক্ষেত্রে? তবু আমি ক্ষমা করে দিয়েছি!”

ভেতর থেকে একটা ভয়ঙ্কর কাশির ধাক্কায় মাঝপথে তার বাকরোধ হয়ে গেল। হাতের রুমালে শ্লেষ্মা ঝেড়ে সেটা দেখানোর জন্য বাড়িয়ে দিল পুরোহিতের দিকে, আরেক হাতে যন্ত্রণাকাতর বুক চেপে ধরল। রক্তে ভিজে গেছে রুমালটা।...

পুরোহিত মাথা হেঁট করলেন, একটি কথাও বললেন না।

মার্মেলাদভের তখন নাভিশ্বাস উঠছে। কাতেরিনা ইভানোভ্‌না আবার তার ওপর ঝুঁকে পড়ল। মার্মেলাদভ্‌ তার মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরাল না। তখনও তাকে কিছু একটা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল তার, অনেক কষ্টে জিভ নেড়ে সে প্রায় শুরুও করেছিল, অস্পষ্টভাবে দু-একটা কথা উচ্চারণ করল, কিন্তু কাতেরিনা ইভানোভ্‌না যখন বুঝতে পারল সে তার কাছে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছুক তখনই সে কর্তৃত্বের সুরে ধমক দিয়ে উঠল:

“চু-উ-প। দরকার নেই!... কী বলতে চাও জানি!” রোগী চুপ করে গেল। কিন্তু

ঠিক সেই মুহূর্তে তার দৃষ্টি ঘুরে-ঘুরে এসে পড়ল দরজার ওপরে, সে দেখতে পেল সোনিয়াকে।...

এর আগে পর্যন্ত সোনিয়াকে সে লক্ষ করেনি। সোনিয়া এক কোনায় ছায়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল।

"কে ? ও কে?" বিছানা থেকে ওঠার প্রাণপণ চেষ্টা করতে-করতে মেয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল দরজার সেদিকটা চোখের ইশারায় দেখিয়ে দারুণ উত্তেজনায় ও আতঙ্কে হাঁপাতে-হাঁপাতে ভাঙা গলায় হঠাৎ সে বলে উঠল।

"শুয়ে থাক! শুয়ে থাক!" কাতেরিনা ইভানোভ্‌না চেঁচিয়ে বলতে না বলতে মার্মেলাদভ্‌ অস্বাভাবিক শক্তি খাটিয়ে এক হাতে ভর দিয়ে বেশ খানিকটা উঠে পড়েছে। একটা অদ্ভুত বন্য স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল মেয়ের দিকে, যেন তাকে চিনতে পারছিল না। বাস্তবিকই এ বেশে সে তাকে আগে কখনও দেখেনি। হঠাৎ সে চিনতে পারল তাকে। চটকদার পোশাক পরে লজ্জায়-কুণ্ঠায় অনাদরে-অবহেলায় মাটিতে মিশে গিয়ে সে শান্তভাবে প্রতীক্ষা করে আছে কখন মৃত্যুপথযাত্রী বাবার কাছ থেকে তার বিদায় গ্রহণের পালা আসবে। অপরিসীম বেদনার চিহ্ন ফুটে উঠল মার্মেলাদভের মুখে।

"সোনিয়া! মা আমার! আমায় ক্ষমা করিস!" চেঁচিয়ে কথাগুলো বলে সে তার দিকে হাত বাড়াল, কিন্তু টাল সামলাতে না পেয়ে বিছানা থেকে উপুড় হয়ে দড়াম করে মেঝেতে আছড়ে পড়ে গেল। লোকজন তাকে তোলার জন্য ছুটে এলো, তুলে সোফায় শুইয়েও দিল। কিন্তু সে তখন এ জগতের মায়া কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। সোনিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কেঁদে উঠে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। সেই আলিঙ্গনের মধ্যে তার মূর্ছা যাবার উপক্রম হল। মার্মেলাদভ্‌ ওর কোলেই মারা গেল।

"এটাই বুঝি ও চেয়েছিল!" স্বামীর মৃতদেহ দেখে কাতেরিনা ইভানোভ্‌না তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। "এখন আমি কী করি? কী দিয়ে আমি ওর শেষ কাজ করব? আর এই এগুলোকে কাল আমি কী খাওয়াব?"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ এগিয়ে গেল কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার কাছে।

"কাতেরিনা ইভানোভ্‌না," সে বলতে শুরু করল। "আপনার সদ্যোমৃত স্বামী গত সপ্তাহে তাঁর জীবনের সমস্ত কাহিনী, সমস্ত পরিস্থিতি আমাকে বলেছেন।... আপনাকে এই বলে আশ্বাস দিতে পারি যে আপনার সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি অসীম শ্রদ্ধা ও আবেগ প্রকাশ করেন। সেই সন্ধ্যায় যখন আমি জানতে পারলাম আপনাদের সকলের ওপর ওঁর এত টান এবং নিজের দুর্ভাগ্যজনক দুর্বলতা সত্ত্বেও বিশেষত কাতেরিনা ইভানোভ্‌না, আপনাকে এত ভক্তিশ্রদ্ধা করেন, এত ভালোবাসেন, তখন থেকে তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব।... এখন অনুগ্রহ করে আমাকে... মৃত বন্ধুর প্রতি... আমার কর্তব্য পালনে... ঋণশোধে আমাকে সাহায্য করুন। এই

রইল এখানে... বিশ রুবল আছে মনে হয়— এতে যদি আপনাদের অন্তত কিছু সাহায্য হয় তা হলে... আমি... এককথায়, আমি ঘুরে যাব একবার— অবশ্যই ঘুরে যাব... হয়ত কালই।... এখন চলি!"

সে দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে গেল লোকাল থানার ও, সি. নিকোদিম ফোমিচের সঙ্গে। দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে সশরীরে হাজির হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে। থানার সেই দৃশ্যের পর তাদের মধ্যে আর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। তবু নিকোদিম ফোমিচ একনজরে তাকে ঠিক চিনতে পারল।

"আচ্ছা, আপনি?" সে বলল।

"মারা গেছে", উত্তরে রাস্‌কোল্‌নিকোভ্ বলল। ডাক্তার এসেছিলেন, পুরুতঠাকুরও এসেছিলেন। যা যা করার হয়ে গেছে। মহিলা বড় অভাগী, ওঁকে আর বিরক্ত করবেন না। তা ছাড়া ক্ষয়রোগে ভুগছেন। যদি কোনভাবে পারেন তো চাঙ্গা করে তুলুন ওঁকে।... আমি জানি, আপনি ভালো মানুষ..." সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হেসে সে যোগ করল।

"কিন্তু আপনার পোশাকে ভিজে রক্তের দাগ দেখছি," লণ্ঠনের আলোয় রাস্‌কোল্‌নিকভের ওয়েস্টকোটের ওপর তাজা রক্তের কয়েকটা ছোপ দেখতে পেয়ে সে মন্তব্য করল।

"হ্যাঁ তাই দেখছি।... এখানে-ওখানে রক্তের দাগ।" অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকিয়ে সে বলল, তারপর মৃদু হেসে মাথা নেড়ে নমস্কার জানিয়ে নিচে যাবার জন্য সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল ধীরে-ধীরে, কোন তাড়াহুড়ো না করে। জ্বরের প্রকোপে তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু সেদিকে তার কোন হুঁশ নেই। তখন সে পরিপূর্ণ, বিপুল জীবনের আকস্মিক প্রবল উচ্ছ্বাসে, এক নতুন ধরনের অবাধ উপলব্ধিতে আপ্লুত। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কোন আসামীকে যখন অকস্মাৎ, অপ্রত্যাশিতভাবে জানান হয় যে তাকে ক্ষমা করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে তখন তার যে উপলব্ধি হয় এই উপলব্ধির সঙ্গে তার তুলনা চলতে পারে। সিঁড়ির অর্ধেক পথ যেতে দেখতে পেল পুরোহিতও অর পেছন-পেছন আসছেন— ফিরে চলেছেন। রাসকোলনিকভ্ বিনা বাক্যব্যয়ে সরে গিয়ে তাঁকে পথ করে দিল, নীরবে মাথা নেড়ে দুজনে নমস্কার বিনিময় করল। কিন্তু শেষ ধাপে পা ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ কার যেন দ্রুত পদশব্দ শুনতে পেল। মনে হল কেউ তার পিছন-পিছন ছুটে আসছে। আসছিল পোলেন্‌কা। পিছন-পিছন ছুটতে-ছুটতে সে ডাকছিল তাকে: "শুনুন। একটু শুনে যান।"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ ফিরে তাকাল তার দিকে। পোলেন্‌কা ততক্ষণে সিঁড়ির শেষ ধাপে পা ফেলে ওর ঠিক সামনে, এক ধাপ ওপরে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বাইরের আঙিনা থেকে টিমটিমে আলো এসে পড়ছিল। রাসকোল্‌নিকভ্‌ ভালো করে তাকিয়ে দেখল ছোট্ট মেয়েটির শীর্ণ কিন্তু বড় মিষ্টি কচি মুখখানা তার দিকে তাকিয়ে খুশিভরে মিটিমিটি হাসছে। শিশুর নির্মল হাসি। সে ছুটে এসেছে কোন একটা কাজের দায়িত্ব নিয়ে। দায়িত্বটা তার বেশ ভালোই লাগছিল।

"শুনুন, আপনার নামটা কী?... আর কোথায় আপনি থাকেন?" হাঁপাতে-হাঁপাতে রিনরিনে গলায় সে তাড়াতাড়ি জিগগেস করল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ তার কাঁধের ওপর দুহাত রেখে তার দিকে তাকাল, তাকিয়ে যেন একধরনের সুখানুভূতিতে ভরে উঠল তার মনটা। তার এত ভালো লাগছিল ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে— সে নিজেই জানে না কেন।

"কে পাঠিয়েছে তোমাকে?"

"আমাকে পাঠিয়েছে আমার দিদি, সোনিয়া," মেয়েটি উত্তর দিল। আরও খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ।

"আমি ঠিক ধরেছি, তোমাকে পাঠিয়েছে তোমার দিদি, সোনিয়া।"

"আমাকে আমার মাও পাঠিয়েছে। দিদি যখন আমাকে পাঠাচ্ছিল তখন মাও এগিয়ে এসে বলল, 'শিগ্‌গির ছুটে যা পোলেন্‌কা!"

"তোমার দিদিকে তুমি খুব ভালোবাস বুঝি?"

"আমি ওকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি!" বেশ জোর দিয়ে সে বলল, সঙ্গে-সঙ্গে তার হাসিতে বেশ খানিকটা গাম্ভীর্যের ছায়া খেলে গেল।

"আমাকে? আমাকে ভালোবাসবে তো?"

প্রত্যুত্তরে সে দেখতে পেল বালিকার ছোট্ট মুখখানা তার কাছাকাছি চলে এসেছে, সরল মনে সে তার ফোলা-ফোলা ঠোঁটজোড়া বাড়িয়ে দিয়েছে রাস্‌কোলনিকভ্‌কে চুমো দেবে বলে। কাঠির মতো সরু দুহাত বাড়িয়ে সে তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। মাথাটা এলিয়ে পড়ল রাসকোল্‌নিকভের কাঁধের ওপর। রাসকোল্‌নিকভের গায়ে মুখ লেপ্‌টে, ক্রমে বেশি শক্ত করে চাপতে-চাপতে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

"বাবার জন্যে কষ্ট হচ্ছে!" কয়েক মুহূর্ত বাদে চোখের জলে ভেজা মুখ তুলে হাত দিয়ে চোখের জল মুছতে-মুছতে সে বলল। "আজকাল আমাদের কপাল এত খারাপ যাচ্ছে," বলতে-বলতে আচমকা তার মুখের ভঙ্গি যেরকম গম্ভীর হয়ে এলো সে গাম্ভীর্য শিশুরা চেষ্টা করে আনে যখন হঠাৎ তাদের বড়দের মতো কথা বলতে ইচ্ছে হয়।

"বাবা তোমাদের ভালোবাসতেন?"

"আমাদের সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসত ছোট বোন লিদাকে," এবারে ঠিক

বড়দের মতো এতটুকু না হেসে গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে সে বলল। "ভালোবাসত এই জন্যে যে ও ছোট, তা ছাড়া ওর শরীরও খারাপ। ওর জন্য সবসময় মিষ্টি আনত। বাবা আমাদের পড়তে শেখাত, আমাকে ব্যাকরণ আর ধর্মশাস্ত্রও শিখিয়েছে," বেশ গর্বের সঙ্গে সে বলল। "মা কিন্তু কিছু বলত না, তবে আমরা জানি যে এটা তার ভালো লাগত, বাবাও জানত। মা আমাকে ফরাসী ভাষা শেখাতে চায়, কেননা আমার এখন লেখাপড়া করার সময়।"

"তোমরা প্রার্থনা করতে জান?

"তা আর জানি না! অনেক কাল হল জানি। আমি এখন বড় হয়েছি বলে নিজে -নিজে মনে-মনে প্রার্থনা করি। সোনিয়া আর লিদা মার সঙ্গে-সঙ্গে মুখে-মুখে বলে। প্রথমে বলে 'হে ঈশ্বরজননী ,' তারপর আরও একটি প্রার্থনা: ঈশ্বর আমাদের বোন সোনিয়াকে আশীর্বাদ কর, তাকে ক্ষমা কর,' তারপর আর একটা 'হে ভগবান আমাদের অন্য বাবাকে আশীর্বাদ কর, তাকে ক্ষমা কর,' কেননা আমাদের প্রথম বাবা আগেই মারা গেছে, এ আমাদের অন্য বাবা। আমরা অবিশ্যি তার জন্যেও প্রার্থনা করি।"

"পোলেন্‌কা আমার নাম রোদিওন। আমার জন্যেও কোন একসময় প্রার্থনা কোরো: 'এবং তোমার দাসানুদাস রোদিওনের ভালোর জন্যে'... প্রার্থনার সময় একথা বললেই হবে।"

"আমি এরপর সারা জীবন আপনার জন্যে প্রার্থনা করব," উত্তেজিত হয়ে বালিকা বলল। তারপর হঠাৎ আবার হাসতে-হাসতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বেশ করে জড়িয়ে ধরে আদর করল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তার নিজের নাম বলল, ঠিকানাও দিল। কথা দিল কাল ঠিক একবার আসবে। মেয়েটি চলে গেল। রাস্‌কোল্‌নিভের ব্যবহারে সে দস্তুরমতো মুগ্ধ। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ যখন রাস্তায় নামল তখন দশটা বেজে গেছে। পাঁচ মিনিট পরে দেখা গেল সে দাঁড়িয়ে আছে ব্রিজের ওপর, ঠিক সেই জায়গায়, যেখান থেকে কিছু সময় আগে মহিলাটি জলে ঝাঁপ দিয়েছিল। "অনেক হয়েছে। আর না!" গুরুগম্ভীরভাবে সে তার স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল। "দূর হয়ে যাক এই মরীচিকা, দূর হোক এই মনগড়া বিভীষিকা, নেমে যাক ঘাড় থেকে এই ভূত!...জীবন আছে! এই এখন কি আমি বেঁচে ছিলাম না? ওই থুত্থুরে বুড়ির সঙ্গে-সঙ্গে আমার জীবনও ফুরিয়ে গেল এ হতে পারে না! ওর আত্মার শান্তি হোক! অনেক হয়েছে বুড়ি মা, এবারে শান্তিতে নিদ্রা যাও। এখন যুক্তি আর আলোকের রাজত্ব, মানুষের মুক্তি স্বাধীনতা আর তার ইচ্ছাশক্তির রাজত্ব... এখন দেখা যাবে! এখন দেখব শক্তিপরীক্ষা করে!" ক্রুদ্ধস্বরে সে যোগ করল— যেন কোন অশুভ শক্তির সঙ্গে কথা বলছে, তাকে সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছে। "তা ছাড়া আমি তো দু-গজ জমির ওপর থাকতেও রাজি হয়ে গিয়েছিলাম!"

''...ঠিক এই মুহূর্তে আমি দুর্বল, খুবই দুর্বল। কিন্তু... আমার মনে হচ্ছে আমার সমস্ত রোগ সেরে গেছে। সেরে যে যাবে এই কিছুক্ষণ আগে বেরোবার সময়ই আমি টের পেয়েছিলাম। আরে, পচিনকোভ্‌দের বাড়ি তো দেখছি এখান থেকে মাত্র দু পা দূরে!... অবশ্যই এখুনি যেতে হয় রাজুমিখিনের ওখানে— দু-পা যদি নাও হত তবু যেতাম।... জিতুক ও বাজি!... মজা পেলে পাক গে তাতে কোন ক্ষতি নেই।... করুক না মজা। ...শক্তি চাই, যা দরকার তা হল শক্তি : শক্তি ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। আর শক্তি অর্জন করতে হয় শক্তি দিয়েই— এই জিনিসটাই তো লোকে জানে না,'' সদর্পে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলো যোগ করে সে কোনমতে পা ঠেলে-ঠেলে হাঁটা দিল ব্রিজ ছাড়িয়ে। তার অহঙ্কার ও আত্মবিশ্বাস প্রতি মুহূর্তে বেড়ে চলল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে হয়ে যাচ্ছিল সম্পূর্ণ অন্য মানুষ—আগের মুহূর্তে সে যা ছিল তার চেয়ে একেবারে আলাদা। কিন্তু কী এমন বিশেষ ঘটনা ঘটল যাতে ওর ভেতরে এরকম ওলটপালট হয়ে গেল? ওর নিজেরই কি ছাই জানা আছে? খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো হঠাৎ তার মনে হয়েছিল যে তার পক্ষেও 'বাঁচা সম্ভব, জীবন আছে, এখনও আছে, ওই থুত্থুড়ে বুড়ির সঙ্গে-সঙ্গে ওর জীবনও ফুরিয়ে গেল এ হতে পারে না।' হয়ত সিদ্ধান্তটা সে বড় বেশি তাড়াতাড়ি করে ফেলেছে, কিন্তু এ নিয়ে সে ভাবেনি।

'কিন্তু দাসানুদাস রোদিওনকে মনে করতে তো খুব বলে এলে!' হঠাৎ তার মাথার মধ্যে ঝলক দিয়ে উঠল। 'হুঁ, কিন্তু তা হল ... সাবধানের মার নেই — এই ভেবে!' সে যোগ করল, আবার সঙ্গে-সঙ্গে বাচ্চা ছেলের মতো চালাকির আশ্রয় নেওয়ায় তার নিজেরই হাসি পেয়ে গেল। সে তখন তুরীয়ানন্দে আছে।

রাজুমিখিনকে খুঁজে পেতে তার অসুবিধে হল না। পচিন্‌কভ্‌দের বাড়িতে নতুন বাসিন্দাটি ইতিমধ্যে পরিচিত। দারোয়ান তৎক্ষণাৎ তাকে পথ দেখিয়ে দিল। সিঁড়ির অর্ধপথে উঠতে না উঠতে শোনা যাচ্ছিল এক বড়সড় সমাবেশের হৈ-হল্লা ও উত্তেজিত কথাবার্তা। সিঁড়ির দিককার দরজা হাঁ খোলা। সেখান থেকে ভেসে আসছে লোকজনের চিৎকার চেঁচামেচি, তর্কবিতর্কের আওয়াজ। রাজুমিখিনের ঘরটা বেশ বড়। লোক জড় হয়েছে জনা পনেরো। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ সামনের ঘরে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেখানে পার্টিশনের আড়ালে বাড়িওয়ালার দুজন চাকরানী বিশাল বিশাল দুই সামোভার, পানীয়ের বোতল আর বাড়িওয়ালার হেঁশেল থেকে সরবরাহ করা নানা ধরনের ভাজা ও চাটজাতীয় খাবারদাবারে ভরতি থালা-প্লেট নিয়ে ব্যস্ত। রাজুমিখিনকে ডেকে দিতে বলল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌। খুশিতে ডগমগ হয়ে ছুটে এলো রাজুমিখিন। প্রথম দৃষ্টিতে বুঝতে বাকি থাকে না যে মদের মাত্রাটা তার স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়ে গেছে। যদিও রাজুমিখিনকে মদ খেয়ে মাতাল হতে প্রায় কখনও দেখা যেত না, তবু তার হাবভাব লক্ষ করার মতো।

"শোন", রাস্‌কোলনিকভ্ তাড়াতাড়ি বলে উঠল। "আমি শুধু একথাই বলতে এসেছি যে তুমি বাজি জিতেছ। বাস্তবিকই কার কখন কী ঘটতে পারে কেউ জানে না। তবে ভেতরে ঢুকতে আমি পারছি না। আমি এত দুর্বল হয়ে পড়েছি যে এক্ষুনি পড়ে যেতে পারি। তাই নমস্কার জানিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে বিদায় নিচ্ছি। কাল আমার কাছে এসো।..."

"তাহলে তোমাকে আমি বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। তুমি নিজেই যখন বলছ দুর্বল বোধ করছ, তখন..."

"তাহলে অতিথিদের কী হবে? কোঁকড়ান চুল যে লোকটি এইমাত্র এখানে উঁকি মেরে চলে গেল, সে কে?"

"ও, ওই লোকটা? কে জানে ছাই! কাকার জানাশোনা কেউ হবে, এমনও হতে পারে যে নিজে থেকে এসে জুটেছে। ...কাকাকে ওদের সঙ্গে রেখে যাচ্ছি। কাকার কোন তুলনা হয় না। আফসোসের কথা, এখন আলাপ করার মতো অবস্থা তোমার নেই। যাক গে, চুলোয় যাক ওরা সব! ওদের এখন আমাকে নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই, তাছাড়া আমার একটু খোলা হাওয়া দরকার। তুমি কিন্তু ভাই ঠিক সময় এসে গেছ—আর মিনিট দুয়েক হলেই, ভগবানের দিব্যি বলছি, ওদের সঙ্গে আমার হাতাহাতি হয়ে যেত! এমন সব ডাহা মিথ্যে আর আবোল-তাবোল বকে...তুমি ধারণা করতে পারবে না লোকে শেষপর্যন্ত কতদূর মিথ্যে বলতে পারে! তবে হ্যাঁ, ধারণা করা যাবে না তাই বা বলি কেন? আমরা নিজেরাও কি আর মিথ্যে বলি না? তা বলুক গে মিথ্যে যত খুশি। এখন বলুক, পরে আর বলবে না।...মিনিটখানেক বসে যাও, আমি জোসিমভ্‌কে ডেকে আনি।

জোসিমভ্ কেমন যেন লোভী শিকারির মতো প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল রাস্‌কোল্‌নিকভের ওপর। বিশেষ এক ধরনের কৌতূহলের ভাব লক্ষ করা যাচ্ছিল তার মধ্যে। শিগ্‌গিরই স্বাভাবিক হয়ে এলো তার চোখমুখ।

"আর দেরি না করে ঘুমান দরকার", ওই অবস্থায় যতদূর সম্ভব ভালো করে রোগীকে দেখে সে রায় দিল। "রাতে এটা একমাত্রা খেয়ে নেবেন। ঠিক খাবেন তো? আমি এই কিছু আগে তৈরি করে রেখেছি...একটা পুরিয়া।"

"দুটো খেতেও আপত্তি নেই", রাস্‌কোল্‌নিকভ্ জবাব দিল।

পাউডারটার তৎক্ষণাৎ সদ্‌গতি হল।

"তুমি নিজে ওকে পৌঁছে দিয়ে আসছ এটা খুব ভালো কথা", জোসিমভ্ বলল রাজুমিখিনকে। "কাল কী হয় দেখা যাবে। তবে আজকের অবস্থাটা নেহাত মন্দ নয়। তখনকার চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষ যতদিন বাঁচে ততদিন শেখে..."

"আমরা যখন বেরিয়ে আসছিলাম তখন জোসিমভ্ আমাকে কানে-কানে কী বলল জান?" রাস্তায় বের হওয়ামাত্র রাজুমিখিন ফস করে বলে উঠল। "আমি ভাই,

তোমাকে সব কথা সোজাসুজি বলব, কেননা ওরা সব বুদ্ধু। জোসিমভ্ আমাকে বলে দিল পথে যেতে-যেতে আমি যেন তোমার সঙ্গে বকবক করি আর তোমাকেও বকবক করতে দিই, পরে ওকে সব বলি, কেননা ওর একটা ধারণা হয়েছে... যে তুমি...হয় পাগল নয়ত তার কাছাকাছি। একবার ভেবে দেখ! প্রথমত, তুমি ওর চেয়ে তিন গুণ বেশি বুদ্ধিমান, দ্বিতীয়ত, তোমার যদি মাথার গোলমাল না হয়ে থাকে তাহলে ওর মাথায় যে অমন উদ্ভট ধারণা ঢুকেছে তাতে তোমার ভারি বয়েই গেল। তৃতীয়ত, ওই মাংসপিণ্ডটা পেশায় হল গিয়ে একজন সার্জন— এখন কিনা মানসিক রোগ নিয়ে খেপে উঠেছে! তোমার ক্ষেত্রে ওর ভাবনাচিন্তার মোড় একেবারে ঘুরিয়ে দিয়েছে জামিওতভের সঙ্গে তোমার আজকের কথাবার্তা।"

"জামিওতভ্ তোমায় সব বলেছে?"

"সব বলেছে, আর বলে খুব ভালোই করেছে। আমি এখন যা যা বোঝার সব বুঝতে পেরেছি, জামিওতভ্ও বুঝতে পেরেছে।...তা হ্যাঁ, রোদিয়া...এক কথায়...ব্যাপারটা হল...আমি এখন একটু নেশার ঘোরে আছি...তবে ও কিছু নয়...ব্যাপারটা হল এই যে এই চিন্তাটা...বুঝতে পারছ? সত্যি-সত্যি ওদের মনে ধরেছে...বুঝতে পারছ তো আমি কী বলতে চাইছি? অর্থাৎ কিনা, ওদের কারোরই মুখ ফুটে বলার সাহস হয়নি, যেহেতু উদ্ভট, অর্থহীন চিন্তা। বিশেষত যখন রঙের মিস্ত্রি ধরা পড়েছে, তাই পুরো ব্যাপারটা ফেঁসে গেছে, চুকে গেছে চিরদিনের জন্যে। কিন্তু ওরা এমন বোকা কেন বল তো? আমি তখন বেশ খানিকটা কড়কে দিয়েছি ওকে—তবে কথাটা তোমার-আমার মধ্যে—মনে রেখো ভাই। দোহাই তোমার, কখনও ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দিও না যে তুমি জান। আমি লক্ষ করে দেখেছি ও বড় স্পর্শকাতর। ঘটেছিল লাভিজার ওখানে— তবে আজ, আজই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। সবচেয়ে বড় মুশকিল হয়েছিল আমাদের সেই লেফটেনান্ট ইলিয়া পেত্রোভিচ্কে নিয়ে। সেই যে তুমি থানায় তখন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে সেই ঘটনার সুযোগ নিয়েছিল আর কি। পরে অবশ্য নিজেই লজ্জিত হয়। আমার তো আর জানতে বাকি নেই...."

রাস্কোলনিকভ্ সাগ্রহে গিলছিল তার কথাগুলো। রাজুমিখিন মাতাল অবস্থায় বলে ফেলেছে।

"আমি যে তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম তার কারণ ঘরের গুমোট আবহাওয়া আর কাঁচা রঙের উৎকট গন্ধ", রাস্কোল্নিকভ্ বলল।

"ও আর বুঝিয়ে বলার কী আছে? একমাত্র রঙই ওর কারণ নয়। তোমার জ্বরের প্রকোপও টানা একমাস ধরে চলছিল। তা প্রমাণ করার জন্যে জোসিমভ্ই আছে! তবে ওই ছোকরার থোঁতামুখ এখন কেমন ভোঁতা হয়ে গেছে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না! 'আমি ওর কড়ে আঙুলেরও যুগ্যি নই!' ও বলছে। মানে, তোমার আর

কি। ও অনেক সময় রীতিমতো ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ে, ভাই। কিন্তু আজ যে শিক্ষা সে 'ক্রিস্টাল প্যালেসে' পেয়েছে তার কোন তুলনা হয় না। তুমি ওকে প্রথমে যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে! ভয়ে ওর শরীর শিরশির করে ওঠে। প্রথমে তুমি ওই সমস্ত অর্থহীন আজগুবিতে আবার প্রায় বিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিলে ওর মনে। তারপর হঠাৎই জিভ বের করে ভেংচি কেটে বসলে—ভাবটা এই যে 'যা চাইছিলে পেলে তো! তারপর?' চূড়ান্ত! একেবারে বসে পড়েছে। ভেঙে পড়েছে এখন! মাইরি বলছি, গুরু মানতে হবে তোমাকে! ওদের ওরকমই হওয়া দরকার! ইস্, আমি যদি থাকতাম ওখানে! তোমার জন্যে এখন অপেক্ষা করছিল ভীষণভাবে। পর্‌ফিরিও তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।..."

"ও...সেও।...কিন্তু পাগলের দলে আমাকে ফেলেছে কেন বল তো?"

'না, ঠিক পাগলের দলে না। আমার মনে হচ্ছে ভাই, আমি বড্ড বেশি বাজে কথা বলে ফেলেছি।... বুঝলে কিনা, হালে যেটা ওকে অবাক করেছে তা হল এই একটি মাত্র বিষয়ে তোমার আগ্রহ। আগ্রহের কারণটা যে কী এখন তা পরিষ্কার, সমস্ত পরিস্থিতি জেনে...এবং তখন তা তোমাকে যে রকম উত্তেজিত করে তুলেছিল, তোমার অসুস্থতার সঙ্গে মিলে যে তালগোল পাকিয়ে তুলেছিল তা জানার পর ... আমার ভাই একটু নেশা ধরেছে, তবে কে জানে বাপু, ওর মাথায় ওর নিজের কোন্ আইডিয়া ঘুরছে। ...আমি তোমাকে বলছি, মানসিক রোগ নিয়ে ও মেতে উঠেছে। তা ওসবে একদম আমল দিও না।..."

আধ-মিনিটখানেক দুজনেই চুপচাপ।

"শোন রাজুমিখিন", রাস্‌কোল্‌নিকভ্ শুরু করল। "আমি তোমাকে সরাসরি একটা কথা বলতে চাই। আমি এইমাত্র একজনের বাড়িতে ছিলাম— লোকটা একজন কেরানি। ...মারা গেছে। ...আমার সমস্ত টাকাপয়সা ওখানে দিয়ে দিয়েছি...তাছাড়া আমি এইমাত্র একজনের কাছ থেকে চুমো পেয়েছি, যে কিনা, আমি যদি কাউকে খুনও করে থাকি তবু...এককথায়, আমি ওখানে আরও একজনকে দেখেছি যার মাথার টুপিতে আগুন রঙের পালক গোঁজা...আরে, আমি কী সব আবোল-তাবোল বকছি!.... আমি বড় দুর্বল বোধ করছি, আমাকে ধর...এখন এই যে সিঁড়ি..."

"কী হল তোমার? কী হল?" রাজুমিখিন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল।

"মাথাটা একটু ঘুরছে। তবে আসল ব্যাপারটা তা নয়। আসলে আমার মন খারাপ লাগছে, খুবই খারাপ লাগছে। ঠিক মেয়েদের যেমন হয়ে থাকে...সত্যি বলছি! আরে দেখ, দেখ, এ কী! তাকিয়ে দেখ না!"

"কী?"

"দেখতে পাচ্ছ না? আমার ঘরে আলো জ্বলছে, দেখতে পাচ্ছ? ফাটল দিয়ে দেখা যাচ্ছে।..."

ওরা ততক্ষণে সিঁড়ির শেষ সারির নিচে, বাড়িউলির দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বাস্তবিকই নিচ থেকে চোখে পড়ছে রাস্‌কোল্‌নিকভের খুপরিতে আলো জ্বলছে।

"আশ্চর্য! নাস্তাসিয়া হতে পারে", রাজুমিখিন বলল।

"এই সময় কখনও আমার ঘরে আসে না, তাছাড়া সেই কখন ঘুম লাগিয়েছে! যাক গে...ওতে কিছু এসে যায় না! চলি!"

"বল কি! আরে চল, আমিও যাচ্ছি। আমরা দুজনে একসঙ্গে ঢুকব!"

"একসঙ্গে ঢুকব তা জানি, কিন্তু আমার ইচ্ছে করছে এখানেই তোমার হাতে হাত মিলিয়ে তোমাকে বিদায় জানিয়ে রাখি। কী হল?-হাত বাড়িয়ে দাও—বিদায় জানাই!"

"হল কি তোমার, রোদিয়া?"

"কিছু না, চল। তুমি সাক্ষী থাকবে।..."

ওরা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। এমন সময় রাজুমিখিনের মাথায় বিদ্যুতের মতো ঝলক দিয়ে উঠল একটা চিন্তা : হয়ত জোসিমভ্ ঠিকই ধরেছে। "এঃ, করলাম কী! বাজে বকে ওর মেজাজ খারাপ করে দিলাম!" আপন মনে বিড়বিড় করে সে বলল। দরজার দিকে এগোতে হঠাৎ ওরা ঘরের ভেতরে শুনতে পেল একাধিক কণ্ঠস্বর।

"সত্যিই তো, এ কী কাণ্ড!" রাজুমিখিন চেঁচিয়ে উঠল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ প্রথমে দরজাটা ধরল, ধরে একটানে হাঁ করে খুলে দিল। কিন্তু খুলে দিয়েই চৌকাটের ওপরে স্থির মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পড়ল।

ঘরের ভেতরে সোফার ওপর বসে আছে ওর মা আর বোন। দেড়ঘণ্টা হয়ে গেছে অপেক্ষা করছে ওর জন্য। ওরা যে রওনা দিয়েছে, আসছে এবং আজই আসবে সে সংবাদ এমনকি এই আজও আবার পাওয়া সত্ত্বেও কেন যে তাদের আগমন ওর কাছে এত কম প্রত্যাশিত ছিল, কেন যে ওদের কথা এত কম ভেবেছিল! এই দেড়ঘণ্টা ধরে ওরা দুজনে পাল্লা দিয়ে নাস্তাসিয়াকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলেছে। এখনও নাস্তাসিয়া ওদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ইতিমধ্যে পুরো ঘটনার সবিস্তার বর্ণনাও ওদের কাছে দিয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় এবং নাস্তাসিয়ার বর্ণনা অনুসারে, নিঃসন্দেহে বিকারের ঘোরে, আজ 'ঘর ছেড়ে পালিয়েছে' শোনার পর ওরা ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। "হা ভগবান! ওর কী হল কে জানে?"—বলে দুজনেই কান্নাকাটি করছিল। এই দেড়ঘণ্টা প্রতীক্ষা তাদের কাছে যমযন্ত্রণা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রাস্‌কোল্‌নিকভের আবির্ভাবকে তারা উল্লসিত চিৎকারে স্বাগত জানাল। দুজনেই ছুটে গেল তার দিকে। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে রইল মড়ার মতো। একটা অসহনীয় উপলব্ধির আকস্মিক ধাক্কায় সে যেন বজ্রাহত। ওদের জড়িয়ে ধরার জন্য দুহাত তুলে এগিয়েও গেল না। সে ক্ষমতাই তার ছিল না। মা, বোন দুজনেই ওকে জড়িয়ে বুকে

চেপে ধরল, চুমু খেল, হাসল, কাঁদল। ...এক পা এগিয়ে গিয়েই সে টলে জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

উত্তেজনা, ভয়ার্ত চিৎকার-চেঁচামেচি, আর্তনাদ।...রাজুমিখিন এতক্ষণ চৌকাটে দাঁড়িয়ে ছিল, এবারে ছুটে ঘরের ভেতরে ঢুকে তার পেশীবহুল দুহাতে রোগীকে ঝট করে পাঁজাকোলা করে তুলে মুহূর্তের মধ্যে সোফায় শুইয়ে দিল।

"ও কিছু নয়, ও কিছু নয়!" রাজুমিখিন চেঁচিয়ে বলল। "ও অজ্ঞান হয়ে গেছে। এটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়! এইমাত্র ডাক্তার বলেছে এর অবস্থা অনেক ভালো হয়ে এসেছে, ও রীতিমতো সুস্থ! জল! এই তো এখনই জ্ঞান ফিরে আসছে। এই যে ফিরে এসেছে!..."

বলতে-বলতে দুনিয়া যাতে দেখতে পায় যে জ্ঞান ফিরে এসেছে এই উদ্দেশ্যে তাকে সামনের দিকে ঝুঁকানোর জন্য তার হাতটা রাজুমিখিন শক্ত করে চেপে ধরে মুচড়ে ভেঙে ফেলার উপক্রম করল। রাস্‌কোল্‌নিকভের মা, বোন দুজনেই এমন আবেগ-বিহ্বল ও কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে রাজুমিখিনের দিকে তাকাল যেন সে ওদের পরিত্রাতা। ওরা ইতিমধ্যে নাস্তাসিয়ার কাছ থেকে জানতে পেরেছে যে তাদের রোদিয়া যতদিন হল অসুস্থ ততদিন থেকে এই 'ছটফটে ছেলেটা' তার জন্য কীই না করেছে! মেয়ে দুনিয়ার সঙ্গে একান্তে কথাবার্তার সময় ওইদিন সন্ধেবেলাই পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না রাস্‌কোল্‌নিকভা নিজে রাজুমিখিনকে 'ছটফটে ছেলেটা', বলে উল্লেখ করেছিল।

তৃতীয় পর্ব

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল।

রাজুমিখিন উত্তেজিত হয়ে অসংলগ্নভাবে মা আর বোনকে প্রবোধ দিয়ে যাচ্ছে দেখে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ দুর্বলভাবে হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিল। তারপর ওদের দুজনের হাত ধরে মিনিট দুয়েক একবার এর আরেকবার ওর মুখ নিরীক্ষণ করতে লাগল। তার দৃষ্টিতে মা ভয় পেয়ে গেল। সেই দৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছিল এমন এক প্রচণ্ড আবেগ যাকে যন্ত্রণার নামান্তর বলা চলে, আবার সেই সঙ্গে ছিল স্থিরনিবদ্ধ এমন একটা কিছু যা অনেকটা অপ্রকৃতিস্থতার মতো। পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না কেঁদে ফেলল।

দুনিয়ার মুখ বিবর্ণ, ভাইয়ের হাতের ভেতরে তার হাতটা কাঁপছে থরথর করে।

"এবারে তোমরা বাড়ি চলে যাও...ওর সঙ্গে যাও", রাজুমিখিনকে দেখিয়ে দিয়ে স্খলিতকণ্ঠে সে বলল। "আজকের মতো এসো। বাকি সব কাল হবে।...কতক্ষণ হল এসেছ তোমরা?"

"সন্ধেবেলা এসেচি রে খোকা", পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না উত্তর দিল। "ট্রেন ভয়ঙ্কর দেরি করেছে। কিন্তু রোদিয়া, বাবা, আমি এখন তোকে কোনমতে ছেড়ে যেতে পারব না। রাতটা এখানেই তোর পাশে কাটিয়ে দেব..."

"আমাকে জ্বালাতন কোরো না!" বিরক্তির সঙ্গে হাত নেড়ে সে বলল।

"আমি থাকব'খন ওর পাশে!" রাজুমিখিন চেঁচিয়ে উঠল। এক মুহূর্তের জন্যেও ছেড়ে যাব না ওকে। আমার অতিথি-টতিথি সব চুলোয় যাক। অপরাধ নিলে নিক গে—কিছু করার নেই। কাকাকে ওখানে সভাপতি করে রেখে এসেছি।"

"ওঃ কী বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাব বাবা!" রাজুমিখিনের দুহাত আবার চেপে ধরে পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না কথাগুলো বলতে না বলতে রাস্‌কোল্‌নিকভ আবার তাকে থামিয়ে দিল।

"আমি পারছি না, আর পারছি না", বিরক্তির সঙ্গে আবার সে বলল। "আমাকে জ্বালিও না। অনেক হয়েছে, এবারে যাও।...আর পারছি না!..."

"চল যাই, মামণি, অন্তত মিনিটখানেকের জন্যে এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাই," দুনিয়া ভয় পেয়ে ফিসফিসিয়ে বলল। "দেখা যাচ্ছে আমরা থাকলে ওর খারাপই হচ্ছে।"

"তিন-তিনটে বচ্ছর ওকে দেখিনি— বলতে চাস, এখন একটু চোখের দেখাও দেখতে পারব না!" বলতে-বলতে কেঁদে ফেলল পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না।

"একটু দাঁড়াও!" আবার সে ওদের থামিয়ে দিল। "তোমরা সব কথার মাঝখানে কথা বলে আমার ভাবনাচিন্তা গুলিয়ে দিচ্ছ। ...লুজিনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তোমাদের?"

"না রোদিয়া, তবে উনি আমাদের আসার কথা জানেন। আমরা শুনেছি রোদিয়া, পিওতর পেত্রোভিচের অশেষ দয়া, আজ তোকে দেখতে এসেছিলেন", খানিকটা কুণ্ঠিতভাবে যোগ করল পুল্খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না।

"হ্যাঁ...অশেষ দয়া...দুনিয়া, আজ আমি লুজিনকে বলেছি সিঁড়ি দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দেব। চুলোয় পাঠিয়ে দিয়েছি ওকে।..."

"বলিস কি রোদিয়া! তুই নিশ্চয়...তুই বলতে চাস.." আঁতকে উঠে কিছু বলতে যাচ্ছিল পুল্খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না, কিন্তু দুনিয়ার দিকে চোখ পড়াতে থতমত খেয়ে থেমে গেল।

দুনিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাকাল ভাইয়ের দিকে, অপেক্ষা করতে লাগল এরপর কী বলে। মা-মেয়ে দুজনকেই বিবাদের ঘটনাটা ইতিমধ্যে নাস্তাসিয়া জানিয়েছে। জানাতে পেরেছে ততটাই যতটা বোঝার মতো ক্ষমতা এবং জানানোর সাধ্য তার ছিল। হতবুদ্ধি হয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করার সময় এই নিয়ে ওদের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না।

"দুনিয়া", অতি কষ্টে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বলল, "এ বিয়েতে আমার মত নেই। তাই কালই লুজিনের সঙ্গে প্রথম কথাতেই ওকে বাতিল করে দিবি। আমাদের ত্রিসীমানায় যেন ওকে দেখতে না পাই।"

"হা ভগবান!" আর্তনাদ করে উঠল পুল্খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না।

"ভেবে দ্যাখ ভাই, তুই কী বলছিস!" দুনিয়ার কণ্ঠস্বরে ঝাঁঝ ফুটে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নিল। "তোর মনের অবস্থা হয়ত এখন ভালো নেই, তুই ক্লান্ত," সংক্ষেপে সে বলল।

"প্রলাপ বকছি? মোটেই না।...তুই লুজিনকে বিয়ে করতে যাচ্ছিস আমার কথা ভেবে। আমার জন্য তোর ওই ত্যাগ আমি গ্রহণ করতে পারব না। তাই কালই চিঠি লিখে...না করে দে।...সকালে আমাকে পড়তে দিবি—আর কোন কথা নয়।"

"এটা সম্ভব নয় আমার পক্ষে!" রাগে অপমানে চিৎকার করে উঠল দুনিয়া। "কোন্ অধিকারে..."

"ওরে দুনিয়া, তুইও বড় রগচটা। থাক না, কাল...তুই কি দেখতে পাচ্ছিস না..." মা রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়ে দুনিয়ার দিকে ছুটে গেল। "আঃ, চল্, বরং চলে যাই!"

"প্রলাপ বকছে।" নেশাগ্রস্ত রাজুমিখিন গলা চড়াল। "তা নইলে ওর এত সাহস হয়! কালই এসব রাবিশ মাথা থেকে বেরিয়ে যাবে।...আজ সত্যি-সত্যি ও তাড়িয়ে দিয়েছিল ভদ্রলোককে। ঠিক তাই-ই ঘটেছিল। তা ভদ্রলোকও রেগে গেলেন।....এখানে বক্তৃতাবাজি শুরু করে দিলেন, নিজের জ্ঞান জাহির করতে গেলেন। শেষকালে পালিয়ে গেলেন লেজ গুটিয়ে।:.."

''এটা তাহলে সত্যি?'' পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নার কণ্ঠস্বরে আর্তনাদ ফুটে উঠল।

''আজ তাহলে আসি রে,'' সমবেদনার সুরে বলল দুনিয়া।'' ''চল গো মামণি।...চলি, কেমন?''

''যা বলি শোন্‌, বোনটি,'' ওরা চলে যাচ্ছে দেখে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ পেছন থেকে আবার বলে উঠল। ''আমি প্রলাপ বকছি না। এই বিয়ে নীচতা ছাড়া আর কিছু নয়। আমি নীচ হতে পারি, কিন্তু তোর হওয়া সাজে না।...একজনই যথেষ্ট। ...আমি যদি নীচও হই, অমন বোনকে বোন বলে স্বীকার করব না। হয় আমি, নয় লুজিন। এবারে যাও...''

''আরে তুমি পাগল হয়ে গেলে দেখছি! খামখেয়ালি আর কাকে বলে!'' গর্জন করে উঠল রাজুমিখিন। কিন্তু রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ আর জবাব দিল না। হয়ত জবাব দেবার মতো শক্তিও তার ছিল না। দেয়ালের দিকে মুখ করে, সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অবস্থায় সে সোফায় শুয়ে পড়েছে। দুনিয়া কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল রাজুমিখিনের দিকে। তার কালো চোখজোড়া ঝিলিক দিয়ে উঠল। রাজুমিখিন চমকেই উঠল সে দৃষ্টির সামনে। পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না দাঁড়িয়ে রইল একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে।

''আমি কোনমতে যেতে পারছি না!'' প্রায় মরিয়া হয়ে অর্ধস্ফুট স্বরে রাজুমিখিনকে বলল। ''আমি এখানেই কোথাও থেকে যাব। ...দুনিয়াকে বাড়ি রেখে এসো।''

''এতে কিন্তু সব পণ্ড হবে।'' দিশেহারা হয়ে রাজুমিখিনও মৃদুগলায় বলল ''অন্তত চলুন, সিঁড়িতে যাই।...নাস্তাসিয়া, আলোটা দেখাও! হলফ করে বলছি আপনাকে...'' সিঁড়িতে আসার পর নিচু গলায় প্রায় ফিসফিসিয়ে সে বলল, ''কিছু আগে আমাকে আর ডাক্তারকে প্রায় মেরেই বসেছিল! বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? এমনকি ডাক্তারকে! তা ডাক্তার ওকে আর ঘাঁটাল না—কিছু না বলে সরে পড়ল, আমি নিচে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগলাম। এরই মধ্যে ও জামাকাপড় পরে কোথা দিয়ে সুট করে বেরিয়ে পড়ল। ওকে উত্যক্ত করলে এখনও সটকান দিতে পারে, এই রাতদুপুরে, বলা যায় না নিজের কোন ক্ষতিই বা করে বসে...''

''ওঃ, বল কি!''

''তাছাড়া আপনাকে ছাড়া আপনার মেয়ে আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার পক্ষে একা হোটেলের ঘরে থাকা সম্ভব নয়! একবার ভেবে দেখুন, কোথায় আপনারা উঠেছেন! ওই ইতর লোকটা, পিওতর পেত্রোভিচ্‌ লুজিন কি এর চেয়ে ভালো কোন ঘর আপনাদের জন্যে খুঁজে পেল না।...যাক গে, আমি আবার একটু নেশার ঘোরে আছি, তাই...মুখ খারাপ করলাম—কিছু মনে করবেন না।...''

''তাহলে আমি যাই, এখানকার বাড়িউলির সঙ্গে কথা বলে দেখি'', পুল্‌খেরিয়া

আলেক্সান্দ্রভ্‌না ছাড়বার পাত্রী নয়। "আমি তাঁকে হাতে-পায় ধরে বলব যেন এই রাতটার জন্যে আমাকে আর দুনিয়াকে থাকার একটা কোন বন্দোবস্ত করে দেন' আমি এইভাবে ওকে ছেড়ে দিতে পারি না, সেটা সম্ভব নয়!"

কথাগুলো তারা বলছিল সিঁড়িতে, বাড়িউলির দরজার ঠিক সামনের চাতালে দাঁড়িয়ে। নিচের ধাপ থেকে নাস্তাসিয়া ওদের আলো দেখাচ্ছিল। রাজুমিখিন অস্বাভাবিক উত্তেজিত। এই আধঘণ্টাখানেক আগেও রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে ঘরে পৌঁছে দেবার সময় যদিও সে বাড়াবাড়ি রকমের বাজে বকছিল—তা অবশ্য সে স্বীকারও করেছিল—তবু ওই সন্ধ্যায় ভয়ঙ্কর রকমের বেশি মাত্রায় সুরাপান করা সত্ত্বেও তাকে রীতিমতো প্রফুল্ল ও প্রায় সতেজ দেখাচ্ছিল। কিন্তু এখন তার অবস্থাটা এমনই যে মনে হয় বুঝি একধরনের ভাবের ঘোরে আছে। তাছাড়া যে পরিমাণ মদ সে খেয়েছে তার সবটা যেন আবার, একসঙ্গে দ্বিগুণ শক্তিতে হু হু করে তার মাথার ভেতরে এসে ঢুকছে। সে দাঁড়িয়ে রইল দুজন মহিলার সঙ্গে, দুহাতে দুজনের হাত চেপে ধরে। নানাভাবে বোঝাতে লাগল তাদের, আশ্চর্যরকম খোলামনে নানা ধরনের যুক্তিজাল বিস্তার করে। সম্ভবত আরও বেশি করে তাদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য প্রতি কথায় সাঁড়াশির মতো যেভাবে শক্ত মুঠোয় তাদের দুজনের হাতে চাপ দিচ্ছিল তাতে তাদের হাত ব্যথায় টনটন করে উঠছিল। তাছাড়া এও মনে হচ্ছিল যেন রাস্‌কোল্‌নিকভের বোন আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নাকে দুচোখে গিলে খাচ্ছে, কিন্তু তাতে যে বিন্দুমাত্র লজ্জিত হাবভাব দেখে তা মনে হল না। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ওরা মাঝে-মাঝে তার মোটা হাড়ের হাতের বিশাল থাবা থেকে ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পারা দূরের কথা, ওদের সে আরও জোরে নিজের দিকে টেনে ধরছিল। ওরা যদি তখন ওদের নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরে মাথা নিচের দিকে করে সিঁড়ি থেকে ঝাঁপ দিতে বলত তাহলে ভাবনাচিন্তা না করে, সন্দেহ প্রকাশ না করে সে তৎক্ষণাৎ তাদের সেই আজ্ঞা পালন করত। ছেলে রোদিয়ার চিন্তায় বড় বেশি বিপর্যস্ত পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না যদিও বুঝতে পারছিল যে যুবকটি বেশ খানিকটা ছিটগ্রস্ত, যদিও তার মুঠোর চাপে হাতে বড় বেশি যন্ত্রণা হচ্ছিল, তবু যেহেতু সেই সঙ্গে সে তার কাছে ঈশ্বর-প্রেরিত বলে মনে হয়েছিল সেই হেতু ওসব ছোটখাটো পাগলামিকে সে তেমন আমল দিতে চাইল না। কিন্তু মনের মধ্যে সেই একই রকমের উদ্বেগ সত্ত্বেও রাস্‌কোল্‌নিকভের বোন দুনিয়া—আভ্‌দোতিয়া ইভানোভ্‌না— ভীরুস্বভাবের মেয়ে না হলেও দাদার বন্ধুটির আগুনের মতো ঝলক দেওয়া বন্য দৃষ্টির সামনে কেমন যেন হতবাক। এমনকি ভয়ই লাগছিল তার। তবু এই অদ্ভুত মানুষটি সম্পর্কে নাস্তাসিয়ার মুখে গল্প শুনে তার প্রতি একটা অপরিসীম আস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। একমাত্র সেই কারণেই হাত ছেড়ে পালানোর এবং মাকেও ছিনিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার প্রয়াস থেকে বিরত হল। সে

নাও বুঝতে পারছিল যে এখন তার কাছ থেকে পালানোও সম্ভবত তাদের পক্ষে অসম্ভব। যা হোক, মিনিট দশেক বাদে সে বেশ খানিকটা স্বস্তি বোধ করল : রাজুমিখিনের একটা গুণ ছিল মুহূর্তের মধ্যে মনের সব কথা খুলে বলা— তা সে যে মেজাজেই থাকুক না কেন, তার ফলে লোকে চট করে বুঝে ফেলে কার সঙ্গে তাদের লেনদেন হচ্ছে।

"বাড়িউলির কাছে যাওয়া একদম চলবে না— সেটা হবে একটা খুবই যা তা ব্যাপার!" পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নাকে সে বোঝানোর চেষ্টা করল। "আপনি মা হতে পারেন, কিন্তু যদি থেকে যান তাহলে ওর ক্ষিপ্ত হতে আর বাকি থাকবে না, তখন কে জানে কী ঘটতে পারে! আমি যা করব বলি, শুনুন : এখন নাস্তাসিয়া বসবে ওর কাছে, আমি আপনাদের দুজনকে আপনাদের ঘরে পৌঁছে দেব, কেননা রাস্তায় আপনাদের একা বের হওয়া ঠিক হবে না। এ ব্যাপারে আমাদের পিটার্সবুর্গে... সে যাক গে!...তারপর আপনাদের ওখান থেকে সঙ্গে-সঙ্গে একছুটে চলে আসব এখানে, মিনিট পনেরো বাদে, আমি কথা দিচ্ছি, বিশ্বাস করুন, আপনাদের খবর এনে দেব ওর অবস্থা কেমন, ঘুমোচ্ছে কিনা ইত্যাদি। তারপর শুনুন! তারপর আপনাদের কাছ থেকে সঙ্গে-সঙ্গে আমি চলে যাব আমার ঘরে। সেখানে আছে আমার অতিথিরা— সবাই মাতাল হয়ে আছে।... জোসিমভ্‌কে ডেকে নিয়ে আসব। জোসিমভ্‌ হল ডাক্তার। ওর চিকিৎসা করছে। সে এখন আমার ওখানে বসে আছে। জোসিমভ্‌ মাতাল নয়, মাতাল হয়নি, কখনও হয় না! ওকে টেনে নিয়ে আসব রোদিয়ার কাছে, তারপর সোজা চলে যাব আপনাদের কাছে— তার মানে, এক ঘণ্টার মধ্যে আপনারা ওর সম্পর্কে পেয়ে যাবেন দুটো খবর : একটা পাবেন ডাক্তারের কাছ থেকে। বুঝতে পারছেন... খোদ ডাক্তারের কাছ থেকে! আমার কাছ থেকে আর ডাক্তারের কাছ থেকে পাওয়া তো আর এক কথা নয়! যদি অবস্থা খারাপ হয়, হলফ করে বলছি আমি নিজে আপনাদের এ বাড়িতে নিয়ে আসব, আর যদি ভালো হয় তাহলে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে যেতে পারবেন। আমি সারা রাত এখানে সিঁড়ির মুখটাতে কাটিয়ে দেব, ও টেরও পাবে না। জোসিমভ্‌কে বলব বাড়িউলির ওখানে রাত কাটাতে। ফলে হাতের কাছে ডাক্তার থাকছে। বলুন তাহলে ওর পক্ষে এখন কোনটা ভালো— আপনারা, না ডাক্তার? ডাক্তার অনেক বেশি উপকারী—তাই না? তাহলে আর কি?—বাড়ি যান! বাড়িউলির কাছে অসম্ভব। আমার পক্ষে সম্ভব, কিন্তু আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আপনাদের ঢুকতেই দেবে না, কেননা... কেননা মহিলা হদ্দ বোকা। যদি জানতে চান তো বলি, আমার সঙ্গে আভ্‌দোতিয়া ইভানোভ্‌নাকে দেখতে পেলে মনে-মনে হিংসে করবে...আপনাকে দেখেও।...তবে আভ্‌দোতিয়া ইভানোভ্‌নাকে দেখলে তো নির্ঘাত। এ এক অদ্ভুত, বিচিত্র চরিত্র, তার মাথামুণ্ডু বোঝার উপায় নেই! অবশ্য আমিও একটা বুদ্ধু। ...যাক গে, ও নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই! চলুন! আপনারা আমাকে বিশ্বাস করেন তো? কী? বিশ্বাস করেন, কি করেন না?"

"চল যাই মামণি", দুনিয়া বলল। "উনি যা বলছেন ঠিকই তা করবেন। উনি এর মধ্যে ভাইকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন। আর ডাক্তার যদি সত্যি-সত্যি এখানে রাত কাটাতে রাজি হন তার চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে?"

"এই তো আপনি...আপনি আমাকে বুঝতে পারছেন, কেননা আপনি হলেন স্বর্গের দেবী!" উচ্ছ্বসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল রাজুমিখিন। "চলুন! নাস্তাসিয়া, এই মুহূর্তে ওপরে চলে যাও, ওর পাশে গিয়ে বসে থাক বাতি নিয়ে। আমি মিনিট পনেরো বাদে ঘুরে আসছি।..."

পুল্খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না পুরোপুরি বিশ্বাস করতে না পারলেও আর বাধা দিল না। রাজুমিখিন ওদের দুজনকে হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে হিড়হিড় করে টেনে নামাল। তবে রাজুমিখিন সম্পর্কে তার দুশ্চিন্তা রয়েই গেল : 'বেশ চটপটে আর ভালোমানুষ হলে কী হবে, কথা রাখার মতো অবস্থা কি ওর আছে? এই তো ওর অবস্থা দেখছি।...'

বিশাল বিশাল দানবীয় পদক্ষেপে রাজুমিখিন ফুটপাত ধরে যেভাবে গটগট করে চলতে লাগল তাতে দুই মহিলার পক্ষে তাকে অনুসরণ করা কঠিন হয়ে পড়ছিল। কিন্তু সেটা লক্ষ না করে যেন পুল্খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্নার মনোভাব আঁচ করতে পেরে তাকে বাধা দিয়ে সে বলে উঠল: "আমি বুঝতে পারছি, আপনি ভাবছেন আমার অবস্থার কথা! রাবিশ! মানে... আমি বেহেড মাতাল হয়ে আছি ঠিকই, কিন্তু আসল ব্যাপারটা তা নয়। আমি মদ-মাতালে মাতাল হইনি। যে মুহূর্তে আপনাদের দেখতে পেলাম সেই মুহূর্তে নেশাটা যেন মাথায় চড়ে বসল। ...তা আপনারা আমাকে যা ইচ্ছে তাই ভাবতে পারেন। ওসবে আমল দেবেন না। আমি মিথ্যে কথা বলছি, আমি আপনাদের যোগ্য নই।... আমি আপনাদের একেবারে যোগ্য নই!... আপনাদের পৌঁছে দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে এখানকার এই নালা থেকে বালতি দুয়েক জল নিয়ে মাথায় ঢালব— ব্যস্, আর দেখতে হবে না!... আপনারা যদি জানতেন, আপনাদের দুজনকেই আমি কত ভালোবাসি!... না না, হাসবেন না, রাগও করবেন না!... সবার ওপর রাগ করতে পারেন, আমার ওপর করবেন না! আমি ওর বন্ধু, তার মানে আপনাদেরও বন্ধু। আমি তাই চাই... এটা আমি আগে থাকতে উপলব্ধি করতে পেরেছি... গত বছর, একটা মুহূর্ত এসেছিল যখন... কিন্তু না, আগে থেকে উপলব্ধি করার কোন ব্যাপারই ছিল না, কেননা আপনাদের আসাটাই একটা চমক। আমি সম্ভবত সারারাত ঘুমোতে পারব না।... এই জোসিমভ্টা আবার সম্প্রতি আশঙ্কা করছিল ওর মাথার গোলমাল না হয়।...এই কারণেই বলছিলাম, ওকে উত্যক্ত করার দরকার নেই।..."

"বল কী!" মা চেঁচিয়ে উঠল।

"ডাক্তার নিজে এই কথা বলেছেন?" ভয়ে আঁতকে উঠল দুনিয়া।

"বলেছিল ঠিকই। কিন্তু আসলে ঠিক বলেনি, একেবারে ঠিক বলেনি। সে অবশ্যই ওষুধ দিয়েছে একটা— পাউডার। আমি দেখেছি। তারপরই তো এসে পড়লেন আপনারা।... ইস্, আপনারা যদি আগামীকাল আসতেন তা হলে কত ভালো হত বলুন দেখি! ভালো যে আমরা চলে এসেছি। এক ঘণ্টা পরে জোসিমভ্ নিজে আপনাদের পুরো বৃত্তান্ত দেবে। ও কিন্তু এমন মাতাল হয়নি। আমাকেও আর মাতাল অবস্থায় দেখতে পাবেন না।... আমি অতটা গিলেছি কেন? গিলেছি এই কারণে যে ওই হারামজাদাগুলো আমাকে তর্কাতর্কির মধ্যে টেনে নামায়। অথচ আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে তর্কবিতর্কের মধ্যে যাব না! কী যে উলটোপালটা বকে! প্রায় হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম! আমি ওখানে আমার কাকাকে সভাপতি করে রেখে এসেছি।... তা, বিশ্বাস করবেন কি— ওদের দাবি হল সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকতা, তাতেই ওদের পরম সুখ! যে ভাবে হোক, নিজে নিজের মতো না হলেই হল, নিজেকে যতদূর সম্ভব কম নিজের মতো করে দেখাতে পারলেই হল! এটা নাকি ওদের কাছে উন্নতির সবচেয়ে বড় লক্ষণ! তাও যদি ওদের ওই মিথ্যেগুলো ওদের নিজেদের হত! তা তো নয়..."

"শোন..." পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না একটু ভয়ে-ভয়ে ওকে বাধা দিয়ে কিছু বলতে গেল, কিন্তু তাতে ওর উত্তেজনা আরও বেড়েই গেল।

"তাহলে আপনি কী মনে করেন?" আরও বেশি গলা চড়িয়ে রাজুমিখিন চিৎকার করে উঠল। "আপনি কি মনে করেন ওরা মিথ্যে বলে দেখে আমি বিরক্ত? রাবিশ! মিথ্যে আমার ভালোই লাগে! মিথ্যাচার আর সব সৃষ্টির মধ্যে মানুষের একমাত্র বিশেষ সুবিধা। মিথ্যাচার করতে-করতেই না একসময় সত্যে পৌঁছান যায়। আমি মানুষ এই কারণে যে আমি মিথ্যে বলি। আগে বার চৌদ্দ, এমনকি হয়ত বা একশ চৌদ্দবার মিথ্যাচার না করে একটা সত্যেও পৌঁছুন সম্ভব হয়নি।... আর এটা একধরনের শ্লাঘার ব্যাপারও বটে। কিন্তু মিথ্যে বলার জন্যে যে বুদ্ধির দরকার হয় সে বুদ্ধিও তো আমাদের ঘটে নেই! তুমি যদি আমার কাছে মিথ্যে বলতে আস তা বল না নিজের মতো করে! তাহলে আমিই তোমাকে আদর করে চুমু খাব। নিজের মতো করে মিথ্যে বলতে পারা— সে তো বলতে গেলে পরের মতো করে সত্যি বলার চেয়েও ভালো। প্রথম ক্ষেত্রে, আপনি মানুষ, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তোতাপাখি ছাড়া আর কিছু নন! সত্য পালিয়ে যাবে না, কিন্তু জীবন চাপা পড়ে যেতে পারে। এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে। এই দেখুন না, আমরা এখন কী? বিজ্ঞান বলুন, উন্নতি বলুন, ভাবনা-চিন্তা, আবিষ্কার, আদর্শ, কামনা-বাসনা, উদারপন্থা, আমাদের যুক্তি, আমাদের অভিজ্ঞতা— সমস্ত ক্ষেত্রে, সর্বক্ষেত্রে, সবেতে, সবেতেই— কোন বাছবিচার না করে বলা চলে— আমরা সবাই এখনও হাইস্কুলের একেবারে জুনিয়র ক্লাসে বসে আছি। অন্যের বুদ্ধিতে চলা আমাদের পছন্দ— সেটাই আমাদের কাছে

রুচিকর! ঠিক কিনা? ঠিক বলছি কিনা?" দুই মহিলারই হাতে চাপ দিয়ে জোরে ঝাঁকুনি দিতে-দিতে চেঁচিয়ে বলল রাজুমিখিন, "তাই কিনা?"

"হা ভগবান! আমি জানি নে," পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না কাচুমাচু হয়ে বলল।

"ঠিক, ঠিক... যদিও আমি আপনার সঙ্গে পুরো একমত নই", গম্ভীরভাবে যোগ করার সঙ্গে-সঙ্গে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না— এবারে রাজুমিখিন বড় বেশি চাপ দিয়েছিল তার হাতে।

"ঠিক? আপনি বলছেন, ঠিক? বেশ, এখন, এরপর আপনি... আপনি..." আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল। "আপনি... হলেন করুণা, বিশুদ্ধতা, শুভবুদ্ধি আর... আর পরিপূর্ণতার উৎস! দিন, দিন আপনার হাত দিন... আপনিও দিন আপনার হাতটা। আমি এখানে এই মুহূর্তে আপনাদের হাতে চুমু খেতে চাই। এই এখুনি আমি হাঁটু গেড়ে বসছি।"

বলতে-বলতে ফুটপাতের মাঝখানে সে নতজানু হয়ে বসে পড়ল। সৌভাগ্যবশত রাস্তাঘাট এইসময় জনশূন্য।

"থামুন দোহাই আপনার! এসব কী শুরু করেছেন?" রীতিমতো উৎকণ্ঠিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল পুলখেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না।

"উঠুন, উঠুন!" হাসতে-হাসতে বললেও দুনিয়ার মুখেও ফুটে উঠেছিল উদ্বেগের চিহ্ন।

"হাত যতক্ষণ বাড়িয়ে না দিচ্ছেন ততক্ষণ উঠছি না— কোনমতেই না! হ্যাঁ, এই তো, অনেক হয়েছে। এবারে উঠলাম, চলুন! আমি একটা অতি হতভাগা, মোদো-মাতাল, আমি আপনাদের যোগ্য নই, আমি যে মাতাল তার জন্যে আমার লজ্জা হচ্ছে।... আপনাদের ভালোবাসার যোগ্যতা নেই আমার, কিন্তু নত হয়ে আপনাদের শ্রদ্ধা জানান প্রতিটি মানুষের কর্তব্য —যদি অবশ্য সে একেবারে গোরু-ভেড়া জাতীয় না হয়। তাই আমি নতজানু হলাম।... আর এই যে আপনাদের আস্তানা। একদিক থেকে রোদিওন ঠিকই করেছে আপনাদের পিওতর পেত্রোভিচ্‌কে ভাগিয়ে দিয়ে! লোকটার এতদূর স্পর্ধা যে এরকম একটা হোটেলে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করেছে! কেলেঙ্কারির একশেষ! কী ধরনের লোকজন এখানে ঘর ভাড়া নেয় জানেন কি? কিন্তু আপনি তো ওর বাগ্‌দত্তা! আপনি ওর ভাবী বধূ, তাই তো? তাহলে শুনুন, আপনাকে বলি, আপনার ভাবী বরটি যা করেছে এরপর তাকে ইতর ছাড়া আর কিছু বলা যায় না!"

"শুনুন মিস্টার রাজুমিখিন, আপনার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে..." পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না মুখ খুলল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে। আমি লজ্জিত!" রাজুমিখিনের টনক নড়ল। "কিন্তু... কিন্তু... আমি অমন বলছি বলে

আমার ওপর রাগ করা আপনাদের উচিত হবে না, কেননা আমার কথাগুলো আমার মনের কথা। এই নয় যে... হুম্! তাহলে সেটা হত নীচতা। এককথায়, বলার কারণ এই নয় যে আমি... হুম্! ... আচ্ছা, তাই হোক, দরকার নেই, বলব না কী কারণে। বলার মতো মুখ নেই!... কিন্তু আজ বিকেলে লোকটা যখন ঘরে ঢুকল তখন আমাদের কারও বুঝতে বাকি রইল না যে এ আমাদের সমাজের লোক নয়। কারণ এই নয় যে হেয়ার ড্রেসারের কাছ থেকে চুল কোঁকড়া করে এসেছে, এই নয় যে নিজের বিদ্যেবুদ্ধি জাহির করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল। আসল কারণ— লোকটা স্বভাবে গোয়েন্দা, ধান্ধাবাজ, কারণ— স্বভাবে ইহুদী— কঞ্জুস, একটা ভণ্ড... তা সে দেখলে বোঝা যায়। আপনারা ভাবছেন বুদ্ধিমান? আদৌ নয়, বোকা, হদ্দ বোকা! বলি, আপনার সঙ্গে কি মানায়? হা ভগবান! দেখুন ম্যাডাম...'' সিঁড়ি দিয়ে তাদের ঘরের দিকে উঠতে-উঠতে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ''আমার ওখানে যারা আছে তারা সবাই যদিও মাতাল, তবু সকলেই সৎ এবং যদিও মিথ্যে আমরাও বলি— কেননা দেখুন, আমিও মিথ্যে বলি, তবু মিথ্যাচারের মধ্য দিয়েই শেষপর্যন্ত আমরা সত্যে উপনীত হই, কেননা আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্তু লুজিন— আপনাদের পিওতর পেত্রোভিচ্... ওর উদ্দেশ্যটা মহৎ নয়। যদিও আমি এইমাত্র ওদের যা নয় তাই বলে গালিগালাজ করেছি তবু আমি কিন্তু ওদের সকলকে শ্রদ্ধা করি। এমনকি জামিওতভ্‌কেও। ...শ্রদ্ধা না করলেও ভালোবাসি, কেননা ও একটা দুগ্ধপোষ্য কুকুরছানা! এমনকি ওই গোরু জোসিমভ্‌টাকেও, কেননা ও সৎ, কাজের লোক।... যাক, অনেক হয়েছে, ক্ষমাঘেন্না করে দেবেন। ক্ষমা করে দিচ্ছেন? তাই তো? আচ্ছা চলুন! জানি আমি এই করিডরটা। আগেও এসেছি। এই যে এখানে, তিন নম্বর ঘরে একটা যা-তা কাণ্ড হয়েছিল।... তা এখানে আপনাদের ঘরটা কোথায়? কত নম্বর ঘর? আট? বেশ, দেখবেন, রাতে ভেতর থেকে ভালো করে বন্ধ করে রাখবেন, কাউকে ঢুকতে দেবেন না। মিনিট পনেরো বাদে খবর নিয়ে ফিরছি, তারপর আরও আধঘণ্টা পরে জোসিমভ্‌কে নিয়ে—দেখবেন! চলি! এখন ছুটতে হবে।''

''হায় হায় দুনিয়া! এখন কী হবে?'' আশঙ্কায় উদ্বেগে আকুল হয়ে মেয়ের দিকে ফিরে জিগ্‌গেস করল পুল্‌খেরিয়া আলক্সান্দ্রভ্‌না।

''স্থির হও মা,'' মাথার টুপি আর গায়ের ঢিলে কোটটা খুলতে-খুলতে দুনিয়া উত্তর দিল। ''স্বয়ং ঈশ্বর এই ভদ্রলোককে পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে, যদিও সরাসরি উঠে এসেছেন কোন মদের আসর থেকে। এঁর ওপরে ভরসা করা যায়, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। তা ছাড়া ভাইয়ের জন্যে উনি যা করেছেন...''

''ওঃ দুনিয়া, ভগবান জানেন, আসবে কিনা! রোদিয়াকে ফেলে আসতে পারলাম কী বলে!... ওকে এই অবস্থায় দেখব তা কল্পনা করতে পারিনি, একেবারে কল্পনা

করতে পারিনি! কী ভয়ঙ্কর ওকে দেখাচ্ছিল! মনে হচ্ছিল আমাদের দেখে মোটে খুশি হয়নি।...''

বলতে-বলতে ওর চোখে জল এসে গেল।

''না, ঘটনাটা তা নয় মা। তুমি ঠিকমতো লক্ষ করনি, তুমি সারা সময় কাঁদছিলে। একটা গুরুতর রোগে ভুগছে বলে ওর মন-মেজাজ বেজায় বিগড়ে আছে— কারণ এটাই।''

''ওঃ কী রোগে ওকে ধরল! কিছু একটা না ঘটে যায় না, না ঘটে যায় না! আর তোর সঙ্গেই বা কী ভাবে কথা বলল, দুনিয়া!'' ভয়ে-ভয়ে মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলে মা ওর মনোভাবটা পুরোপুরি ধরার চেষ্টা করল। দুনিয়া যে তার ভাইকে সমর্থনই করছে এই ভেবে ইতিমধ্যে অর্ধেক সান্ত্বনা পেল, বুঝতে পারল যে ভাইকে সে ক্ষমা করেছে। ''আমার স্থির বিশ্বাস, কাল ওর হুঁশ ফিরে আসবে,'' কথাগুলো সে যোগ করল মেয়ের কাছ থেকে শেষ কথা জানার উদ্দেশ্যে।

''আমার কিন্তু স্থির বিশ্বাস, কালও একই কথা বলবে... ওই বিষয়ে,'' মাকে নস্যাৎ করে দিয়ে দুনিয়া বলল। আসল খিঁচটা অবশ্য এখানেই ছিল, যেহেতু এ ছিল এমন একটা বিষয় যা নিয়ে কথা বলতে পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না বড় বেশি ভয় পাচ্ছিল এখন। দুনিয়া এগিয়ে এসে মাকে চুমু খেল। মা কোন কথা না বলে তাকে জড়িয়ে বুকে চেপে ধরল। তারপর বসে উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগল রাজুমিখিন কখন ফিরে আসে, ভয়ে-ভয়ে লক্ষ করতে লাগল মেয়ের গতিবিধি। সেও রাজুমিখিনের প্রতীক্ষায় আছে। দুহাত আড়াআড়িভাবে বুকের ওপর জড় করে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে ঘরের এধার-ওধার পায়চারি করছে। দুনিয়া যখন কোন গভীর চিন্তায় ডুবে থাকে তখন এভাবে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পদচারণা করা তার বরাবরের অভ্যাস। এরকম সময়ে মা তার ধ্যান ভঙ্গ করতে সাহস পেত না।

মাতাল অবস্থায় আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার প্রতি রাজুমিখিনের আকস্মিক ভাবাবেগের প্রকাশ নিঃসন্দেহে হাস্যকর ছিল। কিন্তু আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নাকে দেখলে, বিশেষত এখন যেভাব দু-হাত বুকের ওপর রেখে চিন্তায় আকুল হয়ে ম্লান মুখে ঘরের মধ্যে সে পায়চারি করছে তা দেখলে হয়ত অনেকেই লোকটাকে ক্ষমা করত— এমনকি তার ওই ছিটগ্রস্ত অবস্থার কোন উল্লেখও করত না। আভ্‌দোতিয়া দেখতে-শুনতে দস্তুরমতো ভালো।— দীর্ঘাঙ্গিনী। আশ্চর্য তার দেহসৌষ্ঠব, বেশ শক্তসমর্থ, আত্মবিশ্বাসী। আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পায় তার প্রতিটি ভঙ্গিতে, অথচ তাতে তার চালচলনে নম্রতা ও মাধুর্য এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। ভাইয়ের মুখের সঙ্গে তার মুখের আদল আসে, কিন্তু তাকে সুন্দরীই বলা চলে। চুলের রং হালকা বাদামি— তার ভাইয়ের চুলের তুলনায় একটু বেশি হালকা। চোখ, প্রায় কালো, ঝকঝকে, দৃষ্টিতে দর্পের আভাস থাকলেও সেখানে সময়-সময়, কোন-কোন মুহূর্তে অসাধারণ দরদেরও

অভাব দেখা যায় না। তার বর্ণ পাণ্ডুর, কিন্তু সেই পাণ্ডুরতার মধ্যে অসুস্থতার চিহ্ন নেই। মুখ সতেজ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। মুখবিবর একটু ছোট, নিচের ঠোঁট আলতারঙের, তাতে সতেজ ভাব—চিবুকের সঙ্গে সামান্য বেরিয়ে আছে সামনের দিকে— ওই সুন্দর মুখের এটাই একমাত্র খুঁত। তবে এর ফলে তার মুখমণ্ডলে ফুটে উঠেছে নিজস্ব চরিত্রবৈশিষ্ট্য—হয়ত বা কিঞ্চিৎ অহঙ্কারের আভাস। তার মুখভঙ্গিতে সবসময় খুশির চেয়ে গাম্ভীর্য ও চিন্তার ছাপ বেশি। তবে এই মুখে কী চমৎকারই না মানায় মৃদু হাসি! কী দারুণ মানায় যখন সে ফেটে পড়ে যৌবনের খুশিতে ভরপুর, প্রাণোচ্ছল উচ্ছ্বসিত হাসিতে। অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ, সাদাসিধে, সচ্চরিত্রের ও খোলামনের মানুষ, অসাধারণ শক্তি ধরে। নেশাগ্রস্ত রাজুমিখিন জীবনে কখনও এ ধরনের নারীর সংস্পর্শে আসেনি। তাই প্রথম দৃষ্টিতেই যে তার মাথা ঘুরে যাবে তাতে আর বিচিত্র কি। পরন্তু দৈবের ইচ্ছায়, যেন উদ্দেশ্যমূলকভাবেই দুনিয়ার সঙ্গে রাজুমিখিনের প্রথম দেখা হয়ে গেল ভাইয়ের সঙ্গে তার মিলনের— ভালোবাসা ও আনন্দের এক রমণীয় মুহূর্তে। পরে রোদিয়ার দুর্বিনীত নির্দেশের মধ্যে রূঢ়তা ও কৃতঘ্নতার পরিচয় পেয়ে ক্রোধে ঘৃণায় যখন তার অধর কেঁপে উঠেছিল তখন তা দেখে রাজুমিখিন সহ্য করতে পারেনি।

কিছুক্ষণ আগে সিঁড়িতে মাতাল অবস্থায় রাজুমিখিন যে মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল যে তার সঙ্গে আভ্দোতিয়া রমানোভ্নাকে দেখে তো বটেই, এমনকি সম্ভবত পুল্খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্নাকে দেখেও রাস্কোল্নিভের ছিটগ্রস্ত বাড়িউলি প্রাস্কোভিয়া পাভ্লোভ্নার হিংসে হবে—কথাটা কিন্তু সে মিথ্যে বলেনি। পুল্খেরিয়া আলক্সান্দ্রভ্নার বয়স তেতাল্লিশ হলেও এককালের লাবণ্যের রেশ তখনও তার মুখে রয়ে গেছে পরন্তু বয়সের তুলনায় তাকে অনেক কম দেখায়। যে সমস্ত নারী বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মনের স্বচ্ছতা, উপলব্ধির সজীবতা এবং হৃদয়ের সততা ও নির্মল উচ্ছ্বাস বজায় রাখতে পারে তাদের ক্ষেত্রে এ বৈশিষ্ট্যটা প্রায় সবসময় লক্ষ করা যায়। এখানে বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এ সমস্ত বজায় রাখাই বার্ধক্যেও নিজের সৌন্দর্য না হারানোর একমাত্র উপায়। তার মাথার চুল ইতিমধ্যে পাকতে এবং ফাঁকা হতে শুরু করেছে, চোখের কোলে আজ বহুকাল হতে চলল সূক্ষ্ম বলিরেখা দেখা দিয়েছে, গাল অনেকটা তুবড়ে গেছে, সংসারের যাবতীয় ঝামেলায়, শোকে-দুঃখে শুকিয়েও গেছে, তবু সে মুখ কমনীয়। বলা যেতে পারে দুনিয়ার মুখের প্রতিচ্ছবি— আজ থেকে কুড়ি বছর পরে দুনিয়াকে দেখতে যেমন হতে পারে। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে অধরের অভিব্যক্তিতে— দুনিয়ার মতো তার অধর সামনের দিকে ওলটান নয়। পুল্খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না আবেগপ্রবণ কিন্তু তার আবেগ মাত্রা ছাড়িয়ে যায় না। সম্ভবত সে ভীরু, অন্যের কাছে সহজে নতিস্বীকার করে— তবে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত। অনেক ব্যাপারে সে নতিস্বীকার করতে পারত , অনেক

কিছুতে রাজিও হয়ে যেতে পারত— এমনকি নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গেলেও। কিন্তু সেক্ষেত্রেও সবসময় সততা, নীতি ও দৃঢ় বিশ্বাসের এমন একটা সীমারেখা থাকত যা কোন পরিস্থিতিতেই সে অতিক্রম করত না।

রাজুমিখিন চলে যাবার ঠিক কুড়ি মিনিট পরে দরজায় আস্তে করে ঘন-ঘন দুবার টোকা পড়ল। রাজুমিখিন ফিরে এসেছে।

"ঢুকব না, সময় নেই!" ওরা দরজা খুলতে সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল। "ঘুমিয়ে একেবারে কাদা! দিব্যি ঘুমোচ্ছে, শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। ঘণ্টা দশেক ঘুমোবে, আশা করা যেতে পেরে। নাস্তাসিয়া আছে ওর কাছে— আমি না আসা পর্যন্ত বেরোতে মানা করে দিয়েছি। এবারে টেনে আনব জোসিমভ্‌কে। ওর মুখ থেকে খবর শুনবেন। তারপর আপনারাও গড়িয়ে নেবার সুযোগ পাবেন। দেখতেই পাচ্ছি, আপনাদের ওপর দিয়ে চূড়ান্ত ধকল গেছে।"

বলেই সে তাদের ছেড়ে দিয়ে করিডর ধরে এগিয়ে চলল।

"কী চটপটে আর... কী বিশ্বাসী ছেলেটা!" পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না পরম পুলকিত।

"দেখাই যাচ্ছে বড় ভালো লোক!" ঘরের ভেতরে আবার সামনে-পেছনে পায়চারি শুরু করে বেশ খানিকটা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উত্তরে দুনিয়া বলল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে করিডরে আবার পদশব্দ। আরেকবার টোকা পড়ল দরজায়। রাজুমিখিনের প্রতিশ্রুতিতে পুরোপুরি বিশ্বাস করে এবারে ওরা দুজনেই এর প্রতীক্ষায় ছিল। সত্যি-সত্যি জোসিমভ্‌কে টেনে আনতে পেরেছে। জোসিমভ্ তৎক্ষণাৎ ভোজসভা ছেড়ে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে দেখতে যেতে রাজি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মহিলা দুজনের কাছে সে আসে অনিচ্ছাভরে। তার মনে রীতিমতো সন্দেহ ছিল, নেশাগ্রস্ত রাজুমিখিনের কথায় তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিন্তু আসার সঙ্গে-সঙ্গে নিজের মান-মর্যাদা রক্ষা পেয়েছে দেখে সে স্বস্তি বোধ করল, এমনকি আত্মপ্রসাদ লাভ করল। বুঝতে বাকি রইল না যে ওরা সত্যি-সত্যি তার অপেক্ষায় ছিল, তার কথাগুলো ওদের কাছে ছিল দৈববাণীর মতো। সে ওদের সঙ্গে ঠিক দশ মিনিট বসেছিল, এই সময়ের মধ্যে পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নাকে বেশ ভালোভাবে বুঝিয়ে তাকে আশ্বস্ত করল। তার কথার মধ্যে অপরিসীম সমবেদনার পরিচয় ছিল। তবে তাতে প্রকাশ পাচ্ছিল সংযম এবং একধরনের চেষ্টাকৃত গাম্ভীর্য— ঠিক যেমন দেখতে পাওয়া যায় গুরুত্বপূর্ণ ডাক্তারি পরামর্শদানের সময়, সাতাশ বছর বয়সের এক ডাক্তারের বেলায় ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত। বাড়তি অপ্রাসঙ্গিক একটি কথাও সে উচ্চারণ করল না, মহিলাদের কারও জীবনের অপেক্ষাকৃত ব্যক্তিগত ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক নিয়ে বিন্দুমাত্র কৌতূহলও প্রকাশ করল না। এমনকি ঢোকার সময়ই আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার চোখ ধাঁধান সৌন্দর্যের দিকে নজর পড়ায় সে তৎক্ষণাৎ চেষ্টা করে তার দিকে

একবারও নজর না দেবার। যতক্ষণ সেখানে ছিল তার কথা চলে একান্তভাবে পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নার সঙ্গে। এ সবেই সে মনে-মনে দারুণ আত্মপ্রসাদ লাভ করে। বিশেষত রোগী সম্পর্কে তার অভিমত হল, এই মুহূর্তে অবস্থা বেশ সন্তোষজনক। তার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, রোগী গত কয়েক মাস ধরে যে আর্থিক অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল তার অসুস্থতার মূলে এ ছাড়াও আছে আরও কিছু মানসিক সমস্যা। "বলা যেতে পারে এ হল বহু জটিল ও বৈষয়িক কিছু প্রভাব, উদ্বেগ, আশঙ্কা, দুশ্চিন্তা এবং রোগীর নিজস্ব কিছু-কিছু ধ্যানধারণ... ইত্যাদির যোগফল।" চোরা চাউনি হেনে যখন লক্ষ করল যে আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না বিশেষ মনোযোগ দিয়ে তার বিবরণ শুনছে, তখনই জোসিমভ্ বিষয়টিকে আরও বিশদ করে বলল। 'মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে বলে যেন সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে'— পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না ভয়ে-ভয়ে, উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলে উত্তরে শান্তভাবে অকপট হেসে সে বলল তার কথাগুলো বড় বেশি অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। এটা অবশ্য ঠিক যে একধরনের বদ্ধমূল চিন্তা রোগীর মনে গেঁথে বসে গেছে। এটা অনেকটা মনোম্যানিয়ার লক্ষণাক্রান্ত। জোসিমভ্ নিজে বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই পরম কৌতূহলোদ্দীপক শাখা নিয়ে বিশেষভাবে চর্চা করছে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে রোগী বলতে গেলে প্রায় আজ পর্যন্ত একটা আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে ছিল এবং...এবং অবশ্যই পরিবারের লোকজন আসার ফলে এখন রোগী মনে জোর পাবে, তার মনের মেঘ কেটে যাবে। এতে তার উপকারই হবে 'অবশ্য যদি অপ্রত্যাশিত নতুন শকগুলো এড়ানো সম্ভব হয়'— বিশেষ তাৎপর্যের সঙ্গে সে যোগ করল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ভারিক্কিচালে, খুশিমনে, মাথা নুইয়ে তাদের নমস্কার জানাল। সঙ্গে-সঙ্গে তার ওপর বর্ষিত হল আশীর্বাদ, অসংখ্য সাধুবাদ শুভাকাঙ্ক্ষা। এমনকি সে না চাইতেই আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না পর্যন্ত করমর্দনের জন্য তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। জোসিমভ্ এই সাক্ষাতে রীতিমতো সন্তুষ্ট, এবং তার চেয়েও বেশি সন্তুষ্ট নিজের ওপর।

"ঠিক আছে, যা কথা বলার কাল হবে। এখন আর দেরি না করে শুয়ে পড়ুন!" জোসিমভের সঙ্গে স্থানত্যাগ করার সময় রাজুমিখিন ওদের বলল। "কাল যত সকালে পারা যায় আমি খবর নিয়ে আপনাদের কাছে চলে আসব।"

"আহা, কী দারুণ মেয়ে মাইরি এই আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না!" ওরা দুজনে রাস্তায় বেরিয়ে আসার পর প্রায় ঠোঁট চাটতে-চাটতে জোসিমভ্ বলল।

"কী? কী বললে? বললে, দারুণ!" রাজুমিখিন গর্জে উঠে হঠাৎ জোসিমভের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলা টিপে ধরল। "ফের যদি আস্পর্ধা হয়...বুঝলে? বুঝতে পারছ?" জোসিমভের জামার কলার ধরে দেয়ালের গায়ে ওকে চেপে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সে চিৎকার করে উঠল, "শুনছ?"

"আরে ছাড়, মাতাল কোথাকার!" ছাড়া পাবার জন্য ছটফট করতে-করতে জোসিমভ্ বলল। রাজুমিখিন ওকে ছেড়ে দেওয়ার পর জোসিমভ্ স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল। তারপর হাসতে-হাসতে গড়িয়ে পড়ল। রাজুমিখিন তখন দুহাত ঝুলিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ম্লানমুখে। তাকে দেখে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছিল।

"দেখা যাচ্ছে আমি একটা গাধা", মেঘের মতো মুখ কালো করে সে বলল। "তবে.. তবে তুমিও।"

"না রে ভাই না, আমি তা নই। মূর্খের স্বপ্ন আমি দেখি না।"

ওরা নীরবে চলল। কেবল রাস্‌কোল্‌নিকভের আস্তানার কাছাকাছি চলে আসার পর নীরবতা ভঙ্গ করল দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রাজুমিখিন।

"শোন", জোসিমভ্‌কে সে বলল। "তুমি অমনিতে বেশ ভালো, কিন্তু তোমার আর সমস্ত দোষের কথা যদি বাদও দিই, তুমি একটা লম্পটবিশেষ।... সে আমি জানি। তাছাড়া বড় নোংরা। তুমি একটা দুর্বল মেরুদণ্ডহীন নার্ভাস ধরনের জঘন্য চিজ, উচ্ছৃঙ্খল। ধরাকে সরা জ্ঞান কর। নিজের স্বার্থে কোন কিছুতেই তুমি পিছপা নও—এটাকেই আমি বলি নোংরামি, কেননা এভাবে চলার অর্থ সরাসরি নোংরামিতে গিয়ে পৌঁছুন। তুমি নিজেকে এতদূর প্রশ্রয় দিয়ে এসেছ যে আমাকে মানতেই হবে আমি ভেবে কূল পাই না এসব সত্ত্বেও তুমি কী করে এত ভালো, এমনকি একজন নিষ্ঠাবান বদ্যি হতে পার। শোও তুমি পালকের গদিতে—এই কিনা ডাক্তারের নমুনা!—অথচ রাতদুপুরে আরামের শয্যা ছেড়ে উঠে ছুটে যাও রোগীর কাছে! আরও বছর তিনেক যাক না—তখন আর রোগীর জন্যে তুমি শয্যাত্যাগ করবে না। ...মরুকগে যা, আসল ঘটনা তা নয়। ঘটনা এই যে তুমি আজ বাড়িউলির ফ্ল্যাটে রাত কাটাবে—অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছি ওকে!— আর আমি রাত কাটাব হেঁসেলে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তোমাদের আলাপ-পরিচয়ের এই হল সুযোগ! না, না, তুমি যা ভাবছ তা নয়। এখানে ভাই, তার ছায়ামাত্র নেই।..."

"কিন্তু আমি মোটেই কিছু ভাবছি না।"

"এক্ষেত্রে ভাই তুমি দেখতে পাবে লজ্জা-সঙ্কোচ, বাক্‌সংযম আর কঠোর সতীত্বের পরাকাষ্ঠা, আবার সেইসঙ্গে দীর্ঘশ্বাস, গলে যায় সহজেই, গলে যায় একেবারে মোমের পুতুলের মতো। আমাকে ওর হাত থেকে বাঁচাও ভাই, তোমার দুটি পা'য় পড়ি! মায়াবিনী!... তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব! দরকার হলে মাথা দিয়ে শোধ করব তোমার ঋণ!"

জোসিমভ্ আগের চেয়েও জোরে হেসে উঠল।

"ইস্, কী দুর্দশা তোমার ! কিন্তু ওকে দিয়ে আমি কী করব?"

"বিশ্বাস কর, ঝামেলা বিশেষ নেই আবোল-তাবোল যা খুশি বকে যাও, শুধু ওর পাশটিতে বসে বল। তাছাড়া তুমি একজন ডাক্তার, কোন একটা কিছুর চিকিৎসা

দিয়ে শুরু কর। হলফ করে বলছি, তোমাকে পস্তাতে হবে না। ওর ঘরে একটা সেকেলে পিয়ানো আছে। তুমি তো জান, আমি একটু-আধটু টুং টাং বাজাতে পারি। আমার একটা গান জানা আছে — খাঁটি রুশী গান: 'অশ্রুধারায় নয়ন ভেসে যায়...'। খাঁটি জিনিস ওর পছন্দ— ওই গান দিয়েই তো শুরু হয়েছিল। তুমি তো আবার পিয়ানোতে ওস্তাদ, গুরু, রুবেনস্টাইন বলা যেতে পারে।... বিশ্বাস কর; পস্তাতে হবে না!"

"আহা, তুমি ওকে কোন কথা দিয়েছিলে নাকি? লিখেপড়ে কোন কাগজপত্রে সই করেছ কি? বলা যায় না, হয়ত বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিলে..."

"না, না, ওসব কিছু হয়নি, একদম না! তাছাড়া ও সেরকম নয়ও। চেবারোভ্ চেষ্টা করেছিল..."

"তা হলে আর কি, ছেড়ে দিলেই তো হয়!"

"না না, ওভাবে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়— এই আর কি। এক্ষেত্রে একটা শোষণযন্ত্র কাজ করছে, ভাই।"

"তুমি ওকে ফুসলালে কেন?"

"আমি ওকে ফুসলাইনি। বরং আমি নিজেই ফেঁসে গেছি আমার বোকামির দরুন। কিন্তু আমি হই আর তুমিই হও ওর তাতে এতটুকু এসে যায় না— ওর পাশে বসে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ার যে -কেউ একজন থাকলেই হল। এক্ষেত্রে আমি ভাই,... আমি জানি না বিষয়টা কী ভাবে তোমার সামনে রাখব... এক্ষেত্রে... আচ্ছা হ্যাঁ, তুমি তো অঙ্ক বেশ ভালো জান, এখনও তার চর্চা আছে তোমার, আমি জানি... তাই বলছিলাম কি ওর সঙ্গে শুরু করে দাও ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস দিয়ে। ভগবানের দিব্যি, ঠাট্টা করছি না, সিরিয়াসলি বলছি, ওর তাতে একদম কিচ্ছু এসে যায় না। তোমার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়বে— এক নাগাড়ে পুরো একটা বছর এভাবে চালিয়ে দিতে পারবে। প্রসঙ্গত বলি, পর পর দুদিন একটানা অনেকক্ষণ ধরে আমি ওকে প্রাশিয়ার হাউস অফ লর্ডসের বৃত্তান্ত বলি— যেহেতু আর কী নিয়েই বা ওর সঙ্গে কথা চলতে পারে?— কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর গলগল করে ঘামতে থাকে! প্রেম-ট্রেম নিয়ে কিছু বলতে যেও না। বড্ড লাজুক কিনা... তবে এমন ভাব দেখাবে যে ছাড়তে পারছ না— তা হলেই হবে। দারুণ আরাম পাবে— ঠিক বাড়ির মতন। পড়, বসে থাক, শুয়ে থাক, লেখ।... এমনকি চুমুও খেতে পার— তবে সাবধানে।..."

"কিন্তু ওকে আমার কী দরকার?"

"না, তোমাকে কোনমতেই বোঝাতে পারছি না দেখছি! দেখ, তোমাদের দুজনের মধ্যে দারুণ মিল আছে। আমি আগেও তোমার কথা ভেবে দেখেছি।... তাছাড়া তোমার পরিণতিও তো ওখানেই। তাই আজ হোক কাল হোক— তোমার কাছে কি সমান নয়? অথচ দেখ ভাই এখানে তোমার সূচনা হিসাবে দিব্যি পালঙ্কের শয্যাটি

তৈরি... আঃ... শুধু পালকের শয্যাই বা বলি কেন, এখানে আছে একটি শোষণযন্ত্র। এখানে পৃথিবীর শেষ, এখানে নোঙর ফেল। এ এক শান্ত নিরাপদ আশ্রয়, আমাদের ধরণীর নাভিচক্র, জগতের শক্ত খুঁটি। এখানে মালপো'র মোচ্ছব! চাই কি পেতে পার তেলে ডোবা মাংসের বড়া, সন্ধ্যায় চায়ের জন্য সামোভার, স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস, আরামের কোর্তা, চুল্লির মাথার ওপরে আরামে ঘুমানোর ব্যবস্থা— উষ্ণ শয্যা— ঠিক যেন মনে হবে তুমি মরে গেছ, আবার সেইসঙ্গে বেঁচেও আছ— একই সঙ্গে দুটো অবস্থা ভোগ করার সুযোগ! আরে ধ্যাৎ, আজেবাজে কতকগুলো বকলাম ভাই। এখন শোবার সময়। শোন, রাতে অনেক সময় আমি জেগে উঠি, তখন গিয়ে দেখে আসব। চিন্তা কোরো না, ওসব রাবিশ, সব ঠিক আছে। বিশেষ করে তোমারও ব্যস্ত হয়ে কাজ নেই, তবে যদি চাও একবার দেখে যেতে পার। কিন্তু ভুল বকা বা জ্বর— ওইধরনের কিছু লক্ষ করলে সঙ্গে-সঙ্গে আমায় জাগিয়ে দেবে। অবশ্য সেরকম হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।...''

দুই

পরদিন সকাল সাতটার পরে একসময় রাজুমিখিনের ঘুম ভাঙল। তাকে চিন্তিত ও গম্ভীর দেখাচ্ছিল। এই সকালে হঠাৎ এমন কতকগুলো নতুন জটিলতা তার দেখা দিয়েছে যা সে আগে কখনও কল্পনা করতে পারেনি। এভাবে কখনও তার ঘুম ভাঙবে তা এর আগে স্বপ্নেও সে ভাবতে পারেনি। গতকাল যা যা ঘটেছিল তার সমস্ত খুঁটিনাটি সে মনে করতে পারল, বুঝতে পারল যে তার জীবনে এমন কিছু ঘটেছে যাকে সাধারণের পর্যায়ে ফেলা যায় না, সে এমন এক গভীর অনুভূতির অধিকারী হয়েছে যা এ পর্যন্ত তার অজানা ছিল, যার সঙ্গে আগেকার কোনটারই কোন তুলনা চলে না। সে পরিষ্কার এও উপলব্ধি করতে পারছিল যে-স্বপ্ন তার মনকে উদ্দীপিত করে তুলেছে তা বাস্তবে রূপায়িত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। সম্ভব যে নয় তা ভেবে তার সঙ্কোচই হল। তাই দ্রুত সেখান থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিল — মনোনিবেশ করল আরও জরুরি ও জটিল সমস্ত সমস্যায়, যা 'নিদারুণ বিড়ম্বনাময় গতকালের' পর চরম প্রাপ্তি হিশেবে তার কপালে জুটেছিল।

যে কথা মনে হতে সে সবচেয়ে বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়ল তা এই যে গতকাল অমন 'নীচ ও জঘন্য' আচরণ করতে পারল কী বলে— শুধুমাত্র মাতাল হয়ে পড়েছিল বলেই নয়, আরও কারণ এই যে মেয়েটির অবস্থার সুযোগ নিয়ে দুজনের পারস্পরিক সম্পর্ক কী, কী তাদের মধ্যে নৈতিক বাধ্যবাধ্যকতা সেসব না জেনেশুনে, এমনকি লোকটাকেও ভালোমতো না জেনে বোকার মতো তাড়াহুড়ো করে স্রেফ ঈর্ষার বশে মেয়েটির সামনেই তার হবু বর সম্পর্কে যা-তা মন্তব্য করেছে। ঠিকই তো, ঝোঁকের মাথায় অমন হুটহাট করে লোকটার নিন্দা করার কোন্ অধিকার তার

আছে? কে তাকে দিয়েছে বিচারের ভার? আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার মতো একজন মানুষ অর্থের বিনিময়ে একজন অপদার্থ লোকের হাতে নিজেকে সঁপে দেবে তা কী করে হয়? তার মানে লোকটার মধ্যে নিশ্চয় কোন ভালো গুণ আছে। হোটেলের ঘর? কিন্তু সত্যিই ওটা যে আসলে এরকম হোটেল তা সে জানবে কী করে? তাছাড়া একটা ফ্ল্যাটও তো সাজাচ্ছে।... ছিঃ, এ কী নীচতা! আর সে যে নেশার ঘোরে ছিল এটাই বা কী ধরনের কৈফিয়ত? একটা বাজে অছিলা। এ যে আরও অপমানজনক! কথায় বলে মদে সত্য আছে। তা মদের ঝোঁকে তো বেরিয়ে পড়ল সব সত্য, 'অর্থাৎ বেরিয়ে পড়ল ঈর্ষাকাতর, অমার্জিত মনের যত নোংরামি!' তাই তার পক্ষে, রাজুমিখিনের পক্ষে এরকম স্বপ্নের এতটুকু প্রশ্রয় কি মনের মধ্যে দেওয়া উচিত? অমন একটা মেয়ের তুলনায় সে কে? একটা বেহেড মাতাল, গতকাল যে মিথ্যে বড়াই করেছিল! — 'এরকম একটা হাস্যকর ও নিন্দনীয় তুলনার প্রশ্রয় দেওয়া কি উচিত?' চিন্তাটা মাথায় আসতে নিদারুণ লজ্জায় লাল হয়ে গেল রাজুমিখিন। আর মনে পড়বি তো পড় ঠিক এই মুহূর্তেই তার মনে পড়ে গেল গতকাল সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ওদের বলেছিল যে আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নাকে তার সঙ্গে দেখতে পেলে বাড়িউলির হিংসে হবে... না, এটা অসহ্য! ভাবতেই সজোরে ঘুষি মেরে বসল রান্নার চুল্লির গায়ে, হাতে চোট লাগল, চুল্লির একটা ইটও খসে পড়ল।

পরের মুহূর্তে নিজেই নিজের কাছে ছোট হয়ে যাবার একধরনের উপলব্ধির তাড়নায় আপন মনে বিড়বিড় করে সে বলল: "অবশ্য... অবশ্যই আমার এতসব নোংরামি মুছে ফেলার বা চাপা দেওয়ার কোন অবকাশ এখন আর নেই... অতএব এ নিয়ে ভাবার কোন মানে হয় না। তাই আমাকে ওদের সামনে হাজির হতে হবে নীরবে... পালন করে যেতে হবে নিজের কর্তব্য... তাও নীরবে এবং... হ্যাঁ মাফ চাওয়া চলবে না, কিছু বলা চলবে না এবং... এবং এখন অবশ্য সবই গেছে! সব বরবাদ হয়ে গেছে।"

তা সত্ত্বেও বেশভূষা করার সময় কিন্তু সে অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি যত্ন নিয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল গায়ের জামাকাপড়। বাড়তি আর কোন জামাকাপড় তার ছিল না। যদি থাকতও তবু সম্ভবত সে পরত না— 'ইচ্ছে করেই পরতাম না।' কিন্তু সে যাই হোক, উদাসীন, অগোছাল ও নোংরা থাকাটা ঠিক হবে না। অন্যের অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার কোন অধিকার তার নেই, বিশেষত সেই অন্যেরা নিজেরাই যখন তার সাহায্যার্থী এবং নিজেরাই তাকে আসতে বলছে তাদের কাছে। পোশাকটা সে সযত্নে ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করল। জামা সে সবসময়ই পরত চলনসই গোছের। এ ব্যাপারে সে বিশেষভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মেনে চলত।

আজ সকালে সে মহা উৎসাহে স্নান সারল— নাস্তাসিয়ার কাছ থেকে সাবান পাওয়া গিয়েছিল। মাথার চুল ধুলো, ঘাড় বিশেষ করে দু -হাত রগড়ে ধুলো।

বাড়িউলি প্রাস্‌কোভিয়া পাভ্‌লোভ্‌নার কাছে যদিও তার পরলোকগত স্বামী মিস্টার জার্‌নিৎসিনের ক্ষুর তখনও দিব্যি ভালো অবস্থায় আছে, তবু মুখের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি কামিয়ে ফেলবে কিনা এই প্রশ্নের সামাধান করতে গিয়ে সে তিক্ততার সঙ্গে নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করল। 'যেমন আছে তেমনই থাক! নয়ত আবার ভেবে বসবে যে আমি দাড়ি কামিয়েছি কেন না... হ্যাঁ, নির্ঘাত তাই ভাববে! না, তা কোনমতে হতে দেওয়া যায় না!'

'আর... আসল কথা হল সে বড় অমার্জিত, নোংরা ধরনের, তার আচার-আচরণও শুঁড়িখানার লোকের মতো; এবং... এবং না হয় ধরেই নেওয়া হল সে জানে যে সেও, অতি সামান্য পরিমাণে হলেও, একজন ভদ্রলোক... বেশ তো, ভদ্রলোক হলেই বা গর্ব করার কী আছে? ভদ্র সকলেরই হওয়া উচিত, বরং আরও বেশি করে হওয়া উচিত, যেহেতু... যেহেতু হাজার হোক...' এটা তার মনে আছে, 'সে এমন কাণ্ডকারখানা করে রেখেছে যা... ঠিক অসৎ যদি নাও হয়, তবু... কী সব চিন্তাভাবনাই না মাথার মধ্যে ঘুরছিল। হুম্... আর আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার মতো একজন মহিলার পাশে কিনা সেগুলোর স্থান দেওয়া! 'ধুত্তোর! যা হবার তাই হবে! ইচ্ছে করেই অমন নোংরা, তেলকালি মাখা আর শুঁড়িখানার লোকের মতো হব। খোড়াই কেয়ার করি! আরও বেশি করে হব। ...'

বাড়িউলির বাইরের ঘরে রাত কাটানোর পর জোসিমভ্ তাকে এই একক সংলাপরত অবস্থায় দেখতে পেল।

জোসিমভ্ বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল। যাবার আগে সে একবার তাড়াহুড়ো করে রোগীকে দেখে আসতে গেল। রাজুমিখিন তাকে জানাল যে রোগী অসাড় হয়ে ঘুমোচ্ছে। জোসিমভ্ নির্দেশ দিল নিজে থেকে না জাগলে ঘুম যেন ভাঙানো না হয়। কথা দিল সে নিজে এগারোটার একটু পরে এসে দেখে যাবে।

"যদি অবশ্য ও বাড়ি থাকে," সে যোগ করল। "ধুৎ! এ কি পোষায়? নিজের রোগীর ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, অথচ যাও, তার চিকিচ্ছে কর গিয়ে! তুমি কি জান ও তাদের কাছে যাবে, নাকি *ওরা* এখানে আসবে?"

"আমার মনে হয় ওরা", প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে রাজুমিখিন উত্তর দিল। "অবশ্যই কথা হবে তাদের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে। আমি চলে যাব। তুমি ডাক্তার বলে অবশ্য আমার চেয়ে তোমার বেশি অধিকার আছে।"

"আমি তো আর রোগীর কানের কাছে মন্ত্র পড়ার পুরোহিত নই। এসেই চলে যাব। ওরা ছাড়াও আমার অনেক কাজ।"

"আমার দুশ্চিন্তা একটাই," রাজুমিখিন ওর কথার মাঝখানে ভুরু কুঁচকে বলে উঠল। "গতকাল আমি রাস্তায় চলতে-চলতে মদের ঝোঁকে মুখ ফসকে বোকার মতো অনেক কথা বলে ফেলেছি ওকে... অনেক কথা... এই যেমন, তোমার আশঙ্কা... ওর ঝোঁকটা যেন... পাগলামির দিকে..."

"তুমি গতকাল মহিলাদেরও একথা বলে দিয়েছ।"

"জানি, বোকাব মতো কাজ করে ফেলেছি! ইচ্ছে হয় মার, ইচ্ছে হয় কাট! আচ্ছা বল তো, সত্যি-সত্যি কি এই চিন্তার কোন দৃঢ় ভিত্তি ছিল তোমার কাছ?"

"না না কিসের দৃঢ় ভিত্তি? একেবারে রাবিশ! তুমি যখন আমাকে ওর কাছে নিয়ে এলে তখন নিজেই তো আমাকে বললে একটা বদ্ধমূল ধারণা ওর মনের মধ্যে গেঁথে বসায় ও বিকারগ্রস্ত।... আগুনে ইন্ধনও যুগিয়েছিলাম আমরা, মানে তুমি আর কি, ওই যে... যখন রংয়ের মিস্ত্রির গল্প বললে। গল্প করার মতো বিষয় বটে! — এতেই যে ওর মাথা বিগড়ে যায়নি তা কে বলতে পারে! আমি যদি সঠিক জানতাম সেদিন থানায় কী ঘটেছিল, যদি জানতাম যে কোন এক স্কাউন্ড্রেল এই সন্দেহবশত ওকে অপমান করেছিল... হুম্... তাহলে আমি গতকাল তোমাকে ও ধরনের কথা বলতে দিতাম না। কারণ এই যে এ ধরনের মানসিক বিকারে যারা ভোগে তারা তিলকে তাল করে, গাজাঁখুরি গল্পকেও সত্যি বলে মনে করে।... আমার যতদূর মনে পড়ে, জামিওতভের ওই বৃত্তান্ত থেকে, বিষয়টার অর্ধেক আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। আর, হ্যাঁ! একটা ঘটনা তো আমিই জানি: চল্লিশ বছর বয়সের এক বিষাদ-বায়ুগ্রস্ত রোজ রোজ আট বছরের একটা বাচ্চা ছেলের হাসিঠাট্টা সহ্য করতে না পেরে শেষপর্যন্ত একদিন টেবিলের ওপর তাকে ছুরি দিয়ে জবাই করে ফেলল। তবে দেখ শতচ্ছিন্ন জামাকাপড় পরা হতদরিদ্র একটা লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, এদিকে কোথাকার কোন এক বেয়াড়া পুলিস অফিসার তার ওপর এরকম সন্দেহ শুরু করে দিয়েছে! সন্দেহ কার ওপর? না, বিষণ্ণতায় ভোগার ফলে যার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে এমন একজন রোগীর ওপর। লোকটার অহংবোধ যখন কিনা একান্তভাবে বাতুলতার পর্যায়ে পৌঁছেছে তখনই কিনা এই ঘটনা। রোগের সূচনা যে এখানে নয় এমন কথাই বা কে হলফ করে বলতে পারে? মরুক গে!... হ্যাঁ, ওই জামিওতভ্ ছেলেটা আসলে ভালো, তবে... হুম্... গতকাল এসব বলা ঠিক হয়নি। বড্ড বাজে বকে!"

"বলেছে আর কাকে? তোমাকে আর আমাকে?"

"পর্‌ফিরিকেও।"

"পর্‌ফিরিকে বলেছে তো কী হয়েছে?"

"ভালো কথা, ওদের ওপর, ওর মা আর বোনের ওপর তোমার অন্তত খানিকটা প্রভাব তো আছে ? ওরা যেন একটু হুঁশিয়ার হয়ে ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে।..."

"সে ওরা ঠিক ব্যবস্থা করে নেবে," অনিচ্ছাভরে রাজুমিখিন উত্তর দিল।

"ওই লুজিনের সঙ্গে অমন করল কেন বল তো? লোকটার টাকাপয়সা আছে, মহিলাও তার ওপর বিরূপ নন... অথচ দেখ ওদের নিজেদের তো কানাকড়িও নেই। তাই না?"

"কী মুশকিল! আমাকে অত জেরা করছ কেন?" বিরক্ত হয়ে রাজুমিখিন চেঁচিয়ে উঠল। "কানাকড়ি আছে না কী আছে আমি জানব কোত্থেকে? নিজে জিগ্‌গেস করে দেখ না, হয়ত জানতে পারবে..."

"ধুত্তোর। সময়-সময় তোমাকে এত বোকা মনে হয় না! গতকালের নেশা এখনও কাটেনি দেখছি।... আচ্ছা আসি। রাতের আশ্রয়ের জন্য আমার হয়ে তোমার প্রাস্‌কোভিয়া পাভ্‌লোভ্‌নাকে ধন্যবাদ জানাবে। দরজা বন্ধ করে ভেতরে বসে রইলেন, দরজার ভেতর দিয়ে 'বন্‌জুর' বলে শুভেচ্ছা জানাতে কোন উত্তর পেলাম না। এদিকে নিজে সাতটার সময় উঠে পড়েছেন, রান্নাঘর থেকে করিডর দিয়ে তার জন্য সামোভার বয়ে নিয়ে যাওয়া হল তাও দেখলাম।... ভদ্রমহিলাকে চোখে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি।..."

কাঁটায়-কাঁটায় নয়টার সময় বাকালেইয়েভের হোটেলে এসে হাজির হল রাজুমিখিন। মহিলারা দুজনেই অনেকক্ষণ হল ছটফট করছিল, অধীর হয়ে তার প্রতীক্ষায় ছিল। ঘুম থেকে ওরা উঠে পড়েছিল সাতটা নাগাদ, এমনকি সাতটার একটু আগেও হতে পারে। রাজুমিখিন ঢুকল রাতের আঁধারের মতো মুখ কালো করে, মাথা নুইয়ে ওদের নমস্কার জানানোর ধরনটি বেয়াড়া হয়ে গেল। তাতে রাগও হল— স্বাভাবিকভাবেই নিজের ওপর। কিন্তু তার অনুমানে ভুল ছিল না। পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে তার দু-হাত চেপে ধরল, মনে হচ্ছিল যেন চুমুই খাবে তার হাতে। রাজুমিখিন সলজ্জ দৃষ্টিতে তাকাল আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার দিকে। রাজুমিখিন আশঙ্কা করেছিল সেই দৃষ্টিতে বিশেষ রাখঢাক না করে স্বতঃস্ফূর্ত অবজ্ঞা এবং বিদ্রুপের প্রকাশ ঘটবে। কিন্তু তার বদলে সেই মুহূর্তে আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার অহঙ্কারী মুখে এত বেশি কৃতজ্ঞতা ও সৌহার্দ্য, এমনই পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার ভাব অপ্রত্যাশিতভাবে ফুটে উঠেছিল যে রাজুমিখিনের মনে হল দর্শনমাত্র তাকে যদি ওরা গলাগাল দিত তাহলে হয়ত সে অনেক বেশি স্বস্তি বোধ করত। এতে বরং সে রীতিমতো দিশেহারা হয়ে পড়ল। সৌভাগ্যবশত, কথাবার্তার বিষয়বস্তু তাদের হাতের কাছে তৈরি থাকায় সেই ভাব থেকে নিস্তার লাভ করার উদ্দেশ্যে রাজুমিখিন তাড়াতাড়ি সেটাকেই আঁকড়ে ধরল।

তখনও 'ঘুম ভাঙেনি', তবে 'অবস্থা খুবই ভালো' জানতে পেরে পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না জানাল যে ভালোই হল, 'কেননা ওর সঙ্গে প্রাথমিকভাবে কিছু আলোচনা করা খুব দরকার, একান্ত দরকার।' এরপর তাকে ওরা চায়ের কথা জিগ্‌গেস করল, একসঙ্গে চা পানের আমন্ত্রণ জানাল। ওরা নিজেরা তখনও চা পান করেনি— রাজুমিখিনের প্রতীক্ষাতেই ছিল। আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না ঘণ্টা বাজাল, ঘণ্টার আওয়াজ শুনে এসে হাজির হল নোংরা জামাকাপড় পরা এক লোচ্চা ছোকরা। তাকে চায়ের ফরমাস দেওয়া হল। শেষপর্যন্ত চা পরিবেশিতও হল— কিন্তু

এত নোংরা আর যাচ্ছেতাইভাবে যে মহিলা দুজন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। রাজুমিখিন সোৎসাহে জায়গাটা সম্পর্কে একটা যা-তা মন্তব্য করতে যাচ্ছিল, কিন্তু লুজিনের কথা মনে হতে থতমত খেয়ে চুপ করে গেল। শেষকালে পুলখেরিয়া আলক্সান্দ্রভ্‌নার একের পর এক অবিরাম প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে সে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিল। কথার মাঝখানে অবিরাম বাধা আর প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন চলতে লাগল। এই পরিস্থিতিতে রোদিওন রমানোভিচের জীবনের গত এক বছরের যতটুকু ঘটনা তার জানা ছিল এবং যা যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জানানোর উপযোগী সেগুলির কোনটাই সে জানাতে বাকি রাখল না। পরিশেষে তার ব্যাধির একটা বিশদ বিবরণও তাদের দিল। অবশ্য এটাও ঠিক যে থানার সেই দৃশ্য এবং তার পরিণতির মতো বেশ কিছু ঘটনার বিবরণ তাকে বাদ দিতে হল। প্রয়োজনেই বাদ দিতে হল। তার মুখের কথা ওরা গোগ্রাসে গিলতে লাগল। কিন্তু যখন তার মনে হল আর কিছু বলার নেই এবং শ্রোতাদের সে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে তখন আবিষ্কার করল যে ওদের জন্য বৃত্তান্ত যেন এখনও শুরুই হয়নি।

"আচ্ছা, আমাকে বল তো, বল দেখি, তোমার কী মনে হয়... ইস্, মাফ করবে বাবা, তোমার পুরো নামটা এখন পর্যন্ত জানা হয়নি," পুলখেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

"দ্‌মিত্রি প্রকোফিচ রাজুমিখিন।"

"তা শোন বাবা দ্‌মিত্রি আমার বড় জানার ইচ্ছে, জানার খুবই ইচ্ছে... মোটের ওপর কোন কোন বিষয় এখন ও কী দৃষ্টিতে দেখে... অর্থাৎ আমাকে বোঝার চেষ্টা কর ও কী ভাবে ... মানে, আর কত ভালোভাবে তোমাকে বলব ... কী ওর পছন্দ কী-ই বা অপছন্দ? ও কি বরাবরই এমন খিটখিটে? কী ওর মনের ইচ্ছে ... কিংবা বলা যেতে পারে ওর আশা-আকাঙ্ক্ষা— যদি কিছু মনে না কর? ঠিক এই মুহূর্তে ওর ওপর বিশেষ প্রভাব কিসের? এককথায়, আমার ইচ্ছে ছিল..."

"আচ্ছা, মামণি, কী করে হঠাৎ এত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় বল তো?" দুনিয়া মন্তব্য করল।

"হা ভগবান! আমি ওকে এমন দেখব আশা করিনি, কখনও আশা করিনি, কিন্তু বাবা দ্‌মিত্রি।"

"সেটা খুবই স্বাভাবিক," দ্‌মিত্রি প্রকোফিচ্ উত্তর দিল। "আমার মা নেই, আত্মীয় বলতে আছেন এক কাকা, প্রতি বছর এখানে আসেন, প্রায় প্রতিবারই এসে আমাকে আর চিনতে পারেন না— এমনকি চেহারায়ও। অথচ উনি বেশ বুদ্ধিমান লোক। তা আপনাদের ছাড়াছাড়ি তো তিন বছরের— এর মধ্যে জল অনেক দূর গড়িয়েছে। কী

বলব আপনাদের, বলুন তো? রোদিওনকে আমি জানি দেড় বছর হল। একটু মনমরা, বিষণ্ণ, মেজাজি, দেমাকিও। সম্প্রতি— তাই বা বলি কেন, অনেক আগে থাকতেও হতে পারে— হয়ে পড়েছিল সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, বিষণ্ণতায় ভুগছিল। কিন্তু ওর মনটা দরাজ, মনে দয়ামায়াও আছে। নিজের উপলব্ধি প্রকাশ করতে ভালোবাসে না। মনের ভাব মুখ ফুটে তো বলবেই না বরং নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেবে। কখনও-কখনও অবশ্য আদৌ মনে হয় না বিষণ্ণতায় ভুগছে— দেখে মনে হয় স্রেফ উদাসীন, অমানুষিক ধরনের অনুভূতিহীন। সত্যি কথা বলতে গেলে কি ওর মধ্যে ঠিক যেন আছে দুটি পরস্পরবিরোধী চরিত্র— পালা করে স্থান বদল করে। অনেক সময় ভীষণ মুখচোরা। কোন কিছুর জন্য সময় নেই, সকলেই যেন ওর ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। এদিকে শুয়ে থাকে, কোনও কাজকর্ম করে না। রসিকতা করে না, তার কারণ রসিকতাবোধের অভাব না। মনে হয় এসব এলেবেলে ব্যাপারে সময় নষ্ট করার অবকাশ ওর নেই। অন্যে কী বলে শেষপর্যন্ত শোনার মতো ধৈর্য ওর নেই। লোকে যখন কোন বিষয়ে আগ্রহ দেখায় তখন ও তাতে এতটুকু আগ্রহ প্রকাশ করে না। নিজের সম্পর্কে ধারণা ভীষণ উঁচু —ওরকম ধারণা থাকার অধিকার যে ওর একেবারে নেই তা অবশ্য বলছি না। আর... আর কীই বা বলা যায়?... আমার মনে হয়, আপনারা যে এসেছেন তাতে ওর মঙ্গল হবে।”

“ওঃ ভগবান করুন!” তার রোদিয়া সম্পর্কে রাজুমিখিনের মন্তব্য শুনে বিপর্যস্ত পুল্‌খেরিয়া আলক্সান্দ্রভ্‌না চেঁচিয়ে উঠল।

এতক্ষণে রাজুমিখিন খানিকটা উৎফুল্ল হয়ে আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার দিকে দৃষ্টিপাত করল। কথা বলার সময় রাজুমিখিন ঘন-ঘন তার দিকে তাকাচ্ছিল বটে, তবে সেটা ওই দ্রুত একপলকের দৃষ্টিপাত— পরক্ষণেই চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল। আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না সেই সময় কখনও টেবিলের ধার ঘেঁষে এসে বসে মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছিল, কখনও বা উঠে দাঁড়িয়ে বুকের ওপর দু-হাত আড়াআড়ি জড় করে, ঠোঁট কামড়ে তার চিরকালের অভ্যাসবশত ঘরের এক কোনা থেকে আরেক কোনায় পায়চারি করছিল, পায়চারিরত অবস্থাতেই গভীর চিন্তায় ডুবে যচ্ছিল, থেকে-থেকে প্রশ্ন করছিল। অন্যের কথা শেষপর্যন্ত না শোনার বদভ্যাস তারও ছিল। তার পোশাকটা ছিল গাঢ় রঙের একধরনের হালকা কাপড়ের। গলায় জড়ান ছিল ফিনফিনে কাপড়ের সাদা স্কার্ফ। বেশ কিছু লক্ষণ দেখে রাজুমিখিনের সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে বাকি রইল না যে দুজন মহিলারই অবস্থা চরম দৈন্যদশাগ্রস্ত। আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার সাজগোজ যদি রানির মতো হত তাহলে হয়ত তাকে দেখে সে এতটুকু ভয় পেত না। কিন্তু এখন তার পোশাক যে দৈন্যদশাগ্রস্ত এবং রাজুমিখিন যে তাদের দুঃস্থ অবস্থার সম্পূর্ণ পরিচয় পেয়ে গেছে, হয়ত ঠিক এই কারণেই তার বুকের ভেতরে আতঙ্ক বাসা বাঁধল এবং নিজের প্রতিটি কথার জন্য,

প্রতিটি ভাব-ভঙ্গির জন্য তার ভয় করতে লাগল। বলাই বাহুল্য, যার আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে এই আবিষ্কারের ফলে তার অস্বস্তি যে আরও বেড়ে যাবে তাতে আর বিচিত্র কি!

"আপনি আমার ভাইয়ের চরিত্র সম্পর্কে অনেক আগ্রহজনক কথা বলেছেন এবং... বলেছেন কোনরকম পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে। ভালোই বলেছেন। আমার ধারণা ছিল ওকে আপনি পুজো করেন," মৃদু হেসে মন্তব্য করল আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না। "মনে হয় এটাও সত্যি যে ওর পাশে কোন মেয়ে থাকলে ভালো হত," চিন্তিতভাবে সে যোগ করল।

"আমি অমন কথা বলিনি, অবশ্য হতে পারে, এক্ষেত্রে আপনি সত্যি কথাই বলেছেন, তবে..."

"তবে কী?

"আসলে ও কাউকে ভালোবাসে না, হয়ত কখনও ভালোবাসতে পারবেও না।"

"তার মানে, ভালোবাসার ক্ষমতা ওর নেই বলতে চান?"

"দেখুন আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না, আপনার ভাইয়ের সঙ্গে আপনার ভয়ঙ্কর মিল আছে— এমনকি সমস্ত ব্যাপারে!" কথাটা এমনভাবে ফস করে বলে ফেলল যে নিজের কাছেই অপ্রত্যাশিত মনে হল। কিন্তু এই মাত্র তাকেই তার ভাই সম্পর্কে যা বলেছে তৎক্ষণাৎ তা মনে পড়ে যেতে সে লজ্জায় লাল হয়ে গেল, ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়ল। আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না তার দিকে তাকিয়ে না হেসে পারল না।

"রোদিয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের দুজনেরই ভুল হতে পারে," একটু যেন ঝাঁঝাল সুরেই পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না বলে উঠল। "আমি এখনকার কথা বলছি না রে দুনিয়া। পিওতর পেত্রোভিচ এই চিঠিতে যা লিখছেন... এবং আমি আর তুই— আমরা দুজনে যা অনুমান করছিলাম, তা মিথ্যেও হতে পারে; কিন্তু রোদিয়া যে কী ধরনের কল্পনাপ্রবণ— বলা যেতে পারে, খামখেয়ালি স্বভাবের সে তুমি ধারণা করতে পারবে না দ্মিত্রি। ওর স্বভাব-চরিত্রের ওপর আমি কোনদিন আস্থা রাখতে পারিনি —এমনকি যখন ওর বয়স ছিল মাত্র পনেরো বছর, তখনও না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও তখনও নিজের ওপর দুম্ করে এমন কিছু করে বসতে পারে যা করার কথা কোনও মানুষ কস্মিনকালে ভাবতে পারে না।... তাছাড়া বেশি দূর যেতেও হবে না: তোমার কি জানা আছে যে বছর দেড়েক আগে ওর ওই বাড়িউলির... কী যেন নামটা? ...জার্‌নিৎসিনার মেয়েকে বিয়ে করার চিন্তা যখন ওর মাথায় ঢোকে তখন আমি একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আর যে দারুণ আঘাত ও তখন আমাকে দিয়েছিল তাতে আর একটু হলে আমি মারাই যেতাম?"

"ওই ঘটনা সম্পর্কে আপনি বিশদ জানেন কি?" দুনিয়া জিগ্‌গেস করল।

নিদারুণ উত্তেজিত হয়ে পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না বলে চলল, "তুমি কি মনে

কর আমার চোখের জল, আমার অনুনয়-বিনয়, আমার অসুস্থতা, এই শোকে যদি আমার মৃত্যু হত, তাও... এবং আমাদের দারিদ্র্য— এগুলোর কোনটাই ওকে তখন নিবৃত্ত করতে পারত? ও পরম নিশ্চিন্তে সমস্ত বাধাবিপত্তি ডিঙিয়ে যেতে পারত, অথচ ও কি আমাদের ভালোবাসে না, সত্যি-সত্যি ভালোবাসে না?''

''ও কখনও নিজে ঘুণাক্ষরেও এই ঘটনা নিয়ে আমার সঙ্গে কোন কথা বলেনি,'' হুঁশিয়ার হয়ে উত্তর দিল রাজুমিখিন, '' তবে কিছুটা শুনেছি ম্যাডাম জারনিৎসিনার নিজের মুখে। তাকে অবশ্য খুব একটা ভালো বলিয়ে-কইয়ে বলা যায় না, তবু যেটুকু শুনেছি তা সম্ভবত খানিকটা অদ্ভুতও...''

'' সেটা কী?'' দুজনেই যুগপৎ জিগ্গেস করল।

''না, তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। একমাত্র যেটুকু জানতে পেরেছি তা এই যে পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল বিয়ের। শুধু কনের মৃত্যুর জন্যই হতে পারল না, ম্যাডাম জারনিৎসিনার নিজেরও নাকি খুব একটা মত ছিল না এতে।... তাছাড়া লোকে বলে যে কনে দেখতে-শুনতে মোটে ভালো ছিল না। এমনকি তাকে কুৎসিতের পর্যায়েই ফেলা যায়... বেশ রুগ্ণ আর... আর অদ্ভুত প্রকৃতির। তবে মনে হয় কিছু গুণ তার ছিল, তা না হলে জিনিসটা বোঝা দুষ্কর... যৌতুক বলতেও কিছু ছিল না, আর থাকলেও তার ওপর রোদিয়া ভরসাও করত না।... মোটের ওপর ব্যাপারটা এমনই যে কোন রায় দেওয়া কঠিন।''

''আমার নিশ্চিত ধারণা যে মেয়েটা গুণের ছিল,'' দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত মন্তব্য।

''ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন, আমি কিন্তু তখন মেয়েটার মৃত্যুতে মনে-মনে খুশি হয়েছিলাম, যদিও আমি জানি না ওদের দুজনের মধ্যে কে কার সর্বনাশ ডেকে আনত : ও মেয়েটার সর্বনাশ করত, নাকি মেয়েটা ওর করত।'' পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না রায় দিল। তারপর আবার রোদিয়া ও লুজিনের মধ্যে গতকালের সেই দৃশ্য নিয়ে প্রশ্ন শুরু করে দিল। প্রশ্ন করার সময় বেশ সন্তর্পণে, ইতস্তত করে বারবার দৃষ্টিপাত করতে লাগল দুনিয়ার দিকে। ব্যাপারটাকে দুনিয়া যে আদৌ খুশিমনে নিতে পারছিল না তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। দেখাই যাচ্ছিল এই ঘটনা তাকে সবচেয়ে বেশি উতলা করে তুলছিল, সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল, আতঙ্কে শিউরে উঠছিল। রাজুমিখিন আবার শুরু থেকে সবিস্তারে ঘটনার পুরো বিবরণ দিল। কিন্তু এবারে নিজের সিদ্ধান্তও যোগ করল: সে সরাসরি রাস্‌কোল্‌নিকভের বিরুদ্ধে পূর্বপরিকল্পিতভাবে পিওতর পেত্রোভিচ্‌কে অপমান করার অভিযোগ আনল। এমনকি এবারে আর অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে তাকে রেয়াত করল না।

''অসুস্থ হওয়ার অনেক আগে থাকতে ও এটা ভেবে রেখেছিল,'' সে যোগ করল।

''আমার তা-ই ধারণা,'' পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না বলে উঠল। তাকে একেবারে

বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। রাজুমিখিন এবারে বেশ হুঁশিয়ার হয়ে এমনকি অনেকটা যেন শ্রদ্ধার সঙ্গেই পিওতর পেত্রোভিচের উল্লেখ করল দেখে সে খানিকটা অবাকই হয়ে গেল। দুনিয়াও অবাক।

"তা হলে পিওতর পেত্রোভিচ্ সম্পর্কে তোমার এই অভিমত?" জিজ্ঞাসা করার লোভ সামলাতে পারল না পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না।

"আপনার কন্যার ভাবী স্বামী সম্পর্কে আমি অন্য কোন অভিমত পোষণ করতে পারি না," বেশ জোর দিয়ে সোৎসাহে উত্তর দিল রাজুমিখিন। "একথা আমি নিছক ভদ্রতার খাতিরে বলছি না, বলছি এই কারণে... এই কারণে... তা, অন্তত একমাত্র এই কারণে যে আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না নিজে, স্বেচ্ছায় বরণ করেছেন এই মানুষটিকে। গতকাল যদি আমি ভদ্রলোকের অমন বদনাম করে থাকি তার কারণ এই যে গতকাল আমি বিচ্ছিরি রকম মাতাল অবস্থায় ছিলাম, আরও কারণ... আমার মাথা বিগড়ে গিয়েছিল, হ্যাঁ, বিগড়ে গিয়েছিল, আমার জ্ঞান-হুঁশ ছিল না, একদম পাগল হয়ে গিয়েছিলাম আমি।... আজ এই ভেবে আমার লজ্জা হচ্ছে!" বলতে-বলতে সে লজ্জায় লাল হয়ে চুপ করে গেল। দুনিয়াও লাল হয়ে গেল, কিন্তু নীরবতা ভঙ্গ করল না। লুজিন সম্পর্কে কথা শুরু হওয়ার পর থেকে একটি কথাও সে উচ্চারণ করেনি।

এদিকে পুলখেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নাকে দেখে মনে হচ্ছিল মেয়ের সমর্থন ছাড়া কী বলবে তা সে স্থির করতে পারছিল না। অবশেষে, মেয়ের দিকে অনবরত তাকাতে-তাকাতে আমতা-আমতা করে সে জানাল তার এখন বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ একটি বিষয়।

"দেখ দ্‌মিত্রি প্রকোফিচ্..." সে শুরু করল। "তুই কী বলিস মা দুনিয়া, দ্‌মিত্রি প্রকোফিচ্‌কে কি আমরা সব খুলে বলব?"

"অবশ্যই মামণি," গম্ভীরভাবে দুনিয়া বলল।

নিজের দুঃখের কথা বলার অনুমতি পেয়ে তার বুকের বোঝা যেন হালকা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি করে সে বলতে শুরু করল: "ব্যাপারটা তাহলে বলি। গতকাল আমাদের আসার সংবাদ দিয়ে পিওতর পেত্রোভিচ্‌কে যে চিরকুট আমরা পাঠিয়েছিলাম আজ খুব ভোরে তার উত্তর পেয়েছি। জানেন, উনি আমাদের যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই অনুযায়ী আমাদের জন্য স্টেশনে তাঁর নিজের উপস্থিত থাকার কথা ছিল। তার বদলে এই হোটেলের ঠিকানা দিয়ে, রাস্তা দেখিয়ে আমাদের এখানে নিয়ে আসার জন্য তিনি তাঁর চাকর-বাকর সম্প্রদায়ের একজনকে স্টেশনে পাঠিয়ে দেন। সেই লোকটাকে পিওতর পেত্রোভিচ্ আমাদের এও জানিয়ে দিতে বলেন যে উনি আজ সকালে আমাদের এখানে আসবেন। তার বদলে আজ সকালে তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি এই যে এই চিরকুটটা।... তুমি নিজেই বরং পড়ে দেখ।

এখানে একটা জায়গা আছে যা নিয়ে আমি রীতিমতো চিন্তিত।... সেটা কী তুমি নিজেই দেখতে পাবে।... এ বিষয়ে এতটুকু রাখঢাক না করে তোমার মতামত জানাও দ্‌মিত্রি! রোদিয়ার চরিত্র তোমার খুব ভালো জানা আছে, তুমিই সবচেয়ে ভালো পরামর্শ দিতে পার। আমি আগে থাকতে তোমাকে বলে রাখি, দুনিয়া ইতিমধ্যে তার মন স্থির করে ফেলেছে— একেবারে গোড়াতেই। কিন্তু আমি... আমি এখনও বুঝতে পারছি না কী করব।... এতক্ষণ তোমার অপেক্ষাতে ছিলাম।"

রাজুমিখিন গতকালের তারিখ দেওয়া চিরকুটটা খুলে পড়ল:

"পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না সমীপেষু—

শ্রদ্ধেয়া মহাশয়া, যথাবিহিত সম্মান নিবেদনপূর্বক আপনার জ্ঞাতার্থে জানাইতেছি যে আকস্মিক বিলম্বের কারণে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আপনাদিগের সহিত আমার সাক্ষাৎকার সম্ভব না হওয়ায় আমি এক অতি উপযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলাম। উচ্চ আদালতের অতীব গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় কার্যব্যাপদেশে এবং আপনার পুত্রের সহিত আপনার, অপিচ আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার ভ্রাতার সহিত তাঁহার পারিবারিক সাক্ষাৎকারে যাহাতে ব্যাঘাত না ঘটে, তদুদ্দেশ্যে, অনুরূপভাবে আগামীকল্য প্রত্যূষেও আপনাদিগের সহিত দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ হইতে আমি বিরত থাকিতে বাধ্য হইতেছি। আপনাদিগের বাসস্থানে উপস্থিতক্রমে দর্শনলাভের এবং আমার শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের দুর্লভ সুযোগ আগামীকল্য সায়াহ্নে, যথাযথ আট ঘটিকায় ব্যতিরেকে সম্ভব নহে। প্রসঙ্গত, আমি আমার একান্ত, পরন্তু সনির্বন্ধ এই অনুরোধও যোগ করিবার স্পর্ধা রাখি যে আমাদিগের সাধারণ সাক্ষাতের সময় রোদিওন রমানোভিচ্‌ যেন আদৌ তথায় উপস্থিত না থাকেন, যেহেতু তাঁহার অসুস্থতার সময় গতকল্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি আমার সহিত দুর্ব্যবহার করেন, আমাকে চূড়ান্ত অপমান করেন। পরন্তু, বিশেষভাবে এমন একটি বিষয়ের উপর ব্যক্তিগতভাবে আপনার সহিত আমার বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে, যাহার সম্পর্কে আপনার নিজস্ব ব্যাখ্যা আমি জানিতে ইচ্ছুক। আপনার অবগতির উদ্দেশ্যে পূর্বাহ্ণে আমার নিবেদন এই যে আমার অনুরোধ সত্ত্বেও রোদিওন রমানোভিচের সহিত যদি আমার সাক্ষাৎকার ঘটে তাহা হইলে অবিলম্বে স্থানত্যাগে বাধ্য হইব এবং সেক্ষেত্রে ফলাফলের দায়ভাগ আপনার উপরই বর্তাইবে। আমার এমত অনুমানের হেতু এই যে ওইদিন আমার সাক্ষাতের সময় রোদিওন রমানোভিচ্‌কে অতিমাত্রায় অসুস্থ মনে হইলেও দুই ঘণ্টা পরে তিনি অকস্মাৎ সুস্থ হইয়া উঠেন, অতএব গৃহ পরিত্যাগপূর্বক আপনার বাসস্থানেও দর্শন দিতে পারেন। ইহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় অশ্বক্ষুরে পিষ্ট হইবার ফলে মরণাপন্ন এক মদ্যপের বাসস্থানে তাঁহাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার পর। গতকল্য উক্ত স্থানে তিনি ওই ব্যক্তির নষ্ট চরিত্রের যুবতী কন্যাকে মৃতের শেষকৃত্যের অজুহাতে পঁচিশ রুবল প্রদান করিলে আমি অত্যন্ত বিস্ময়

বোধ করি. যেহেতু ওই পরিমাণ অর্থ আপনি কত কষ্টে সংগ্রহ করেন তাহা আমার অবিদিত নাই। পরিশেষে শ্রদ্ধেয়া আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নাকে বিশেষ প্রীতির সাক্ষ্য এবং আপনাদের প্রতি আমার একান্ত ভক্তি ও অনুরাগের আশ্বাসসহ

আপনার একান্ত অনুগত
পিওতর লুজ্জিন"

"এখন আমি কী করি, দ্‌মিত্রি?" কাঁদ-কাঁদ স্বরে পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না বলল। "রোদিয়াকে না আসতে আমি কী করে বলি? কাল ও এত মিনতি করে বলল পিওতর পেত্রোভিচের প্রস্তাব বাতিল করে দিতে, সেক্ষেত্রে এখন ওকেই উপস্থিত না থাকতে বলা হচ্ছে! তাছাড়া জানতে পারলে ও নিজে থেকে ঠিক এসে উপস্থিত হবে... তখন কী হবে?"

"আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই অনুসারে কাজ করুন," শান্তকণ্ঠে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল রাজুমিখিন।

"হা ভগবান! ও বলছে... ভগবান জানে কী বলছে!... আমাকে ওর উদ্দেশ্যও ব্যাখ্যা করে বলছে না! ও বলছে বরং ভালো হয়, অর্থাৎ ভালো হয় বলাটা ঠিক হবে না,... কিন্তু কী কারণে নাকি অবশ্যই দরকার যে রোদিয়াও যেন ইচ্ছে করেই আটটার সময় এখানে আসে.. ওদের দুজনের দেখা হওয়াটা নাকি একান্ত জরুরি। ... কিন্তু আমি ওকে চিঠিটা মোটে দেখাতে চাই না, বরং তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে চালাকি খাটিয়ে এমন একটা ব্যবস্থা করতে চাই যাতে ও এখানে না আসে... কেন না ও বড় বদমেজাজি।... তাছাড়া, কোথায় কোন্ মাতাল মারা গেছে, কে তার মেয়ে, কী ভাবে সেই মেয়েকে ও দিয়ে দিতে পারল শেষ কপর্দক,... যা কিনা..."

"যা অনেক মূল্যে তোমাকে পেতে হয়েছে, মামণি," আভ্‌দোতিয়া ইভানোভ্‌না যোগ করল।

"গতকাল ওর মাথার ঠিক ছিল না," চিন্তিতভাবে রাজুমিখিন বলল। "আপনারা যদি জানতেন গতকাল শুঁড়িখানায় ও কী কাণ্ড বাধিয়েছিল... যদিও কাজটা বেশ বুদ্ধিমানের মতোই হয়েছিল, তবু... হুম্! হ্যাঁ, গতকাল যখন আমরা বাড়ি ফিরছিলাম তখন কোন্ একটা লোকের মরার কথা, কোন্ একটা মেয়ের কথা বাস্তবিকই আমাকে বলছিল, কিন্তু তার মাথামুণ্ডু কিছু আমি বুঝতে পারিনি।... অবশ্য আমি নিজেই গতকাল..."

"শোন মা, সব থেকে ভালো হয় আমরা নিজেরা ওর কাছে গেলে। আমি তোমাকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে, ওখানে যাবার পর একটা কোন উপায় ঠিক খুঁজে বের করা যাবে। তাছাড়া সময়ও হয়েছে। ওমা, এখনই দশটা বেজে গেছে দেখছি!" সরু ভেনেশিয়ান চেইনে গলায় ঝুলান সোনার ওপর মিনা করা চোখ

ধাঁধান ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল। রাজুমিখিন লক্ষ করল রমানোভ্‌নার বাদবাকি বেশভূষার সঙ্গে ঘড়িটা একেবারে খাপ খায় না। মনে-মনে ভাবল 'হবু বরের কাছ থেকে পাওয়া উপহার।'

"ওঃ তাই তো! আর দেরি নয়! দুনিয়া, মা, আর দেরি নয়!" উদ্বেগে ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়ল পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না। "আমাদের দেরি দেখে আবার ভেবে না বসে যে কাল থেকে আমরা ওর ওপর রেগে আছি. ওঃ ভগবান!"

বলতে-বলতে সে চটপট ওপরের আংরাখাটা গায়ে চড়াল, টুপি মাথায় দিল। দুনিয়াও তৈরি হয়ে নিল। রাজুমিখিন লক্ষ করল তার হাতের দস্তানাজোড়া শুধু পুরানোই নয় একেবারে টুটোফাটা। তবু পোশাকের প্রত্যক্ষ দৈন্যদশা এত প্রকট হওয়া সত্ত্বেও তারই মধ্যে থেকে ওদের দুজনের চেহারায় ফুটে উঠেছে এক বিশেষ ধরনের আভিজাত্য। দুর্দশাগ্রস্ত জামাকাপড় কী করে পরতে হয় এটা যাদের জানা আছে, তাদের মধ্যে এ ভাবটা সবসময় লক্ষ করা যায়। রাজুমিখিন ভক্তিগদগদ চিত্তে তাকাল দুনিয়ার দিকে। দুনিয়াকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে এই ভেবেই সে কৃতার্থ। মনে-মনে ভাবল, 'রূপকথার সেই যে রানি বন্দিশালায় নিজের ছেঁড়া মোজা সেলাই করছিল সেই মুহূর্তে তাকে নিশ্চয়ই দেখাচ্ছিল সত্যিকারের রানির মতো! এমনকি সবথেকে জমকালো পোশাক পরে রাজসভায় বা কোন রাজকীয় উৎসব-অনুষ্ঠানে উপস্থিত কোন রানিকেও বোধহয় অমন দেখায় না।'

"হা ভগবান!" পুলখেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না চিৎকার করে উঠল, "কী ভয় যে এখন করছে! কখনও কি ভাবতে পেরেছিলাম আমার আদরের ছেলের সঙ্গে, আমার বড় আদরের খোকা রোদিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এত ভয় আমি পাব!... আমার ভয় করছে দ্‌মিত্রি।" ভীত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে সে যোগ করল।

"ভয় পেয়ো না মামণি," তাকে চুমু খেয়ে দুনিয়া বলল। "বরং ওর ওপর বিশ্বাস রাখ। আমার বিশ্বাস আছে।"

"হা ভগবান। আমারও তো বিশ্বাস আছে, তবু সারা রাত ঘুমোতে পারিনি!" বেচারি মা বলে উঠল।

ওরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

"জানিস দুনিয়া, ভোরের দিকে আমার যেই একটু তন্দ্রামতো এসেছিল অমনি স্বর্গত মার্ফা পেত্রোভ্‌নাকে স্বপ্নে দেখলাম।... আপাদমস্তক সাদা পোশাক পরা।... আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার একটা হাত ধরল, কিন্তু মাথা নাড়তে লাগল আমার দিকে তাকিয়ে—তার মুখ এত ফেকাসে যে মনে হচ্ছিল বুঝি আমাকে দুষছেন।... এটা কি কোন ভালো লক্ষণ হতে পারে? হা ভগবান! দ্‌মিত্রি, তুমি এখনও জান না যে মার্ফা পেত্রোভ্‌না মারা গেছে!"

"না, জানি না। কোন্ মার্ফা পেত্রোভ্না।"

"মারা গেল হঠাৎ করে! ধারণা করতে পার..."

"পরে হবে, মা," দুনিয়া ওদের কথার মাঝখানে বলে উঠল। "মার্ফা পেত্রোভ্না কে, ওঁর এখনও জানাই নেই।"

"ও, জান না বুঝি? আমি তো ভেবেছিলাম, সবই তোমার জানা আছে। মাফ করবে দ্মিত্রি, গত কয়েকদিন হল আমার মাথার ভেতরে সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সত্যি বলতে কি, আমরা তোমাকে স্বর্গ থেকে পাঠানো আমাদের ত্রাণকর্তা বলে মনে করি।... আমার তাই দৃঢ়বিশ্বাস ছিল তুমি সবকিছুই জান। আমি তোমাকে আপনজন বলে মনে করি।... অমন কথা বলছি বলে রাগ কোরো না কিন্তু। একী, তোমার ডান হাতে কী হয়েছে? চোট লেগেছে নাকি?"

"হ্যাঁ চোট লেগেছে," খুশিতে ডগমগ রাজুমিখিন বিড়বিড় করে বলল।

"আমি অনেক সময় বড্ড বেশি প্রাণের কথা বলে ফেলি, তাই দুনিয়া আমায় শুধরে দেয়।... কিন্তু হা ভগবান! এ কিরকম কুঠুরিতে ও বাস করছে? ভাবছি, ওর ঘুম কি এখনও ভেঙেছে? আর ওই যে মহিলা, ওর বাড়িউলি, সে কি ওটাকে একটা ঘর বলে মনে করে? শোন, তুমি বলছ, ও মন খুলে কথা বলতে ভালোবাসে না— তাহলে তো এমনও হতে পারে যে আমার উপস্থিতি... আমার দুর্বলতা ওর বিরক্তিরই উদ্রেক করবে? ওর সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করা ঠিক হবে একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে দাও আমাকে, দ্মিত্রি। দেখতে পাচ্ছ, আমি কেমন দিশেহারা হয়ে পড়েছি।"

"যদি দেখেন ও ভুরু কোঁচকাচ্ছে তাহলে ওকে কোন বিষয়ে বেশি জিগ্গেসবাদ করবেন না। বিশেষত স্বাস্থ্য সম্পর্কে বেশি প্রশ্ন করবেন না— পছন্দ করে না।"

"ওঃ দ্মিত্রি, মা হওয়ার যে কী জ্বালা! এই তো সেই সিঁড়ি।... কী ভয়ঙ্কর সিঁড়ি রে বাবা!"

"মামণি, তোমাকে একেবারে ফেকাসে দেখাচ্ছে। মা গো, শান্ত হও," সোহাগভরে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দুনিয়া বলল। "তোমাকে দেখলে ও খুশিই হবে, অথচ তুমি কিনা যা তা ভেবে অযথা কষ্ট পাচ্ছ," কথাগুলো যোগ করার সঙ্গে-সঙ্গে তার চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠল।

"দাঁড়ান, আমি আগে দেখে আসি ঘুম ভেঙেছে কিনা।"

রাজুমিখিন সিঁড়ি দিয়ে আগে চলে গেল, মহিলা দুজন পা টিপে-টিপে তাকে অনুসরণ করল। চারতলায় বাড়িউলির দরজার কাছাকাছি আসতে ওরা লক্ষ করল দরজাটা ভেজান, তবে সামান্য একচিলতে ফাঁক করা। সেই ফাঁক দিয়ে অন্ধকার ভেদ করে একজোড়া কালো চোখের ছটফটে দৃষ্টি তাদের দুজনকে নিরীক্ষণ করছে। চোখে চোখ পড়ে যাওয়ামাত্র দরজা এত জোর দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল যে পুল্খেরিয়া আলক্সান্দ্রভ্না চমকে উঠে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল।

তিন

"ভালো আছে, ভালো আছে!" ওদের ভেতরে ঢুকতে দেখে সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল জোসিমভ্। মিনিট দশেক হয়ে গেল সে এসে বসে আছে তার গতকালের জায়গায়— সোফার এক কোনায়। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বসেছিল উলটো দিকের কোনায়। পুরোদস্তুর পোশাক পরা, এমনকি সযত্নে সর্বাঙ্গ ধুয়ে-মুছে সাফসুতরো, চুল আঁচড়ান— বহুকাল তাকে এমন অবস্থায় দেখা যায়নি। ঘরটা সঙ্গে-সঙ্গে লোকজনে ভরে গেল, কিন্তু তা সত্ত্বেও নাস্তাসিয়া অতিথিদের পেছনে-পেছনে ঠিক ঢুকে পড়ে কান পেতে ওদের কথাবার্তা শুনতে শুরু করে দিয়েছে।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ সত্যি-সত্যি প্রায় সুস্থ— বিশেষ করে গতকালের তুলনায় তো বটেই। তবে বড় ফেকাসে, অন্যমনস্ক ও বিষণ্ণ দেখাচ্ছে তাকে। বাইরে থেকে তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন আহত অথবা কোন ভয়ঙ্কর শারীরিক যন্ত্রণায় সে কষ্ট পাচ্ছে: ভুরুজোড়া কোঁচকান, ঠোঁট কামড়ে আছে, দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে উত্তেজনা। কথা সে কম বলছিল, যতটুকু বলছিল তাও অনিচ্ছাভরে— যেন সাধ্যাতিরিক্ত চেষ্টায় কিংবা নেহাত দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে এমন ভাব করে। থেকে-থেকে তার ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ পাচ্ছে কেমন যেন এক ধরনের অস্থিরতা।

আঙুলে ফোঁড়া হয়ে ভীষণ কষ্ট পেলে কিংবা হাতে আঘাত লাগলে বা ওই ধরনের কোন চোট লাগলে লোকের যেমন অবস্থা হয় ওর অবস্থা এখন ঠিক সেই রকম। তবে, ওই অবস্থায় হাতে যেমন ব্যান্ডেজ বা আঙুল পাতলা কাপড়ের পটিতে জড়ান থাকার কথা একমাত্র সেটারই অভাব ছিল তার।

কিন্তু এহেন পাণ্ডুর ও বিষণ্ণ মুখও মা আর বোনকে ঘরে ঢুকতে দেখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল যেন হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে। কিন্তু এর ফলে আগে যে একটা ব্যাকুল উদ্‌ভ্রান্ত ভাব ছিল তার জায়গায় কেবল যেন আরও একধরনের নিবিড় যন্ত্রণারই ভাব ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে। আলোর উদ্ভাস দেখতে-দেখতে নিভে গেল, কিন্তু যন্ত্রণার চিহ্ন থেকে গেল। সদ্য প্রাক্‌টিস শুরু করা ডাক্তারের যুবোচিত উৎসাহে ভরপুর জোসিমভ্ তার রোগীর হাবভাবের ওপর বেশ ভালোমতো নজর রাখছিল, তাকে বেশ খুঁটিয়ে দেখছিল। একটি ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেল জোসিমভ্: পরিবারের লোকজনের সঙ্গে দেখা হওয়াতে কোথায় খুশি হবে তা নয়, বরং ঘণ্টাদুয়েকের জন্য জেরার উৎপীড়ন সহ্য করতে হবে এই ভেবে তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে সেই অত্যাচার সহ্য করার একটা কঠিন চাপা সঙ্কল্প। পরে সে লক্ষ করল, এরপর যত আলোচনা চলল তার প্রায় প্রতিটি কথা যেন রোগীর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো লেগে তার জ্বালাযন্ত্রণা বাড়িয়ে তুলতে লাগল। কিন্তু সেই সঙ্গে বদ্ধমূল ধারণার ফলে বাতিকগ্রস্ত যে রোগী গতকাল কথায়-কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল, আজ কতকাংশে তার নিজের উপলব্ধি গোপন করার ও আত্মসংযমের ক্ষমতা দেখে সে অবাক হয়ে গেল।

"হ্যাঁ আমি নিজেই এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমি প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছি," চুমু দিয়ে মা আর বোনকে এই বলে স্বাগত জানাতে দেখে তৎক্ষণাৎ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না। "এটা কিন্তু আমি *কালকের মতো* ক'রে বলছি না," এবারে রাজুমিখিনের দিকে ফিরে বন্ধুভাবে তার করমর্দন করে সে যোগ করল।

"আজ ওকে যেমন দেখছি তাতে আমিও অবাক হয়ে যাচ্ছি," আগন্তুকদের আগমনে বেজায় খুশি হয়ে জোসিমভ্ বলতে শুরু করল, কেননা গত দশ মিনিটে রোগীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গিয়ে সে খেই হারিয়ে ফেলেছিল। "দিন তিন-চার এরকম চললে একদম আগের অবস্থায় ফিরে যাবে— মানে, যেমন ছিল মাসখানেক আগে... অথবা দুমাস... হয়ত বা তিন মাস আগে? কেননা এর সূচনা আর প্রস্তুতি অনেক আগে থেকে... তাই না? আপনাদের এখন স্বীকার করতে হবে হয়ত দোষ আপনাদের নিজেদেরই," সাবধানী হাসি হেসে সে যেভাবে কথাগুলো যোগ করল তাতে মনে হল এখনও তার ভয় আছে পাছে কোন কারণে রোগীর বিরক্তি উদ্রেক করে।

"খুবই সম্ভব," নিস্পৃহভাবে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ উত্তর দিল।

"এর সঙ্গে আমি যোগ করছি..." রাস্‌কোল্‌নিকভের উত্তর উপভোগ্য হয়ে উঠছে দেখে জোসিমভ বলে চলল, "আপনার পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠা এখন অনেকাংশে নির্ভর করছে একা আপনার ওপর, আপনার নিজের ওপর। এখন আপনার সঙ্গে যেহেতু কথা বলা যাচ্ছে, আমি আপনাকে এটাই ভালো করে বোঝাতে চাই যে প্রাথমিক—যাকে বলে মূল— যে সমস্ত কারণ আপনার ব্যাধির উৎপত্তিস্থল সেগুলোকে নির্মূল করা একান্ত দরকার। তাহলেই আপনি সেরে উঠবেন, তা যদি না হয় তাহলে অবস্থা আরও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা। প্রাথমিক কারণগুলো যে কী, আমার জানা নেই, কিন্তু আপনার জানা থাকা স্বাভাবিক। আপনি বুদ্ধিমান মানুষ, ইতিমধ্যে অবশ্যই নিজেকে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন। আমার মনে হয় আপনার গোলযোগের সূত্রপাত অংশত আপনার ইউনিভার্সিটি ছাড়ার সঙ্গে যুক্ত। কোন কাজকর্ম ছাড়া বসে থাকা আপনার পক্ষে ঠিক হবে না, তাই বলছি, কঠিন পরিশ্রম এবং জীবনের কোন স্থির লক্ষ্য আপনাকে অনেকখানি সাহায্য করতে পারে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনি একেবারে ঠিক ধরেছেন।... এই শিগ্‌গিরই আমি আবার ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হব। তখন সব ঠিক হয়ে যাবে—*স্বচ্ছন্দে* চলবে।..."

জোসিমভ্ তার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শুরু করেছিল অংশত মহিলাদের ওপর একটা প্রভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, কিন্তু বক্তৃতা শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গে শ্রোতার ওপর নজর পড়তে তার মুখে বিদ্রুপের সুস্পষ্ট আভাস লক্ষ করে স্বভাবতই খানিকটা হকচকিয়ে গেল। তবে এই অবস্থার স্থায়িত্ব ছিল একটি মুহূর্ত। পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না তৎক্ষণাৎ জোসিমভ্‌কে ধন্যবাদ জানাতে শুরু করল বিশেষত গতকাল রাতে হোটেলে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য।

"সে কি! রাতেও তোমাদের কাছে গিয়েছিলেন উনি?" কিছুটা বিচলিত হয়েই রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ জিগ্‌গেস করল। "তার মানে, পথের পরিশ্রমের পর তোমরা আর ঘুমোওনি?"

"আহা, রোদিয়া, ওসব যা হওয়ার সে তো রাত দুটোর মধ্যে হয়ে গেছে। আমি আর দুনিয়া তো বাড়িতেও রাত দুটোর আগে কখনও ঘুমোতে যেতাম না।"

"আমিও জানি না কী বলে ওঁকে ধন্যবাদ জানাব," হঠাৎ ভুরু কুঁচকে, চোখের দৃষ্টি নামিয়ে আগের কথার জের টেনে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ বলল। "টাকার কথাটা বাদ দিলেও..." এবারে জোসিমভের দিকে ফিরে সে বলল, "...টাকার উল্লেখ করলাম বলে আপনি আমাকে মাফ করবেন, কিন্তু আমি সত্যি-সত্যি জানি না আমার এমন কোন্‌ যোগ্যতা আছে যার ফলে আপনার বিশেষ মনোযোগের অধিকারী হলাম। স্রেফ বুঝতে পারছি না... তাই... তাই এতে আমি মনে-মনে ভারি কষ্ট পাচ্ছি, যেহেতু আমার বোধগম্য হচ্ছে না... আমি আপনাকে অকপটে খুলে বললাম আমার মনের কথা।"

"না না আপনি অত বিচলিত হয়ে পড়বেন না," চেষ্টা করে হাসতে-হাসতে জোসিমভ্‌ বলল। "ধরুন না কেন, আপনি আমার প্রথম রুগী, আর এটা তো ঠিক যে আমাদের মতো যারা সবে প্রাক্‌টিস শুরু করেছে, তারা তাদের গোড়ার দিককার রুগীদের আপন সন্তানের মতো ভালোবাসে, অনেকে আবার তাদের প্রায় প্রেমেই পড়ে যায়। তাছাড়া রুগীর তেমন প্রাচুর্যও আমার নেই।"

"ওর কথা না হয় না-ই বললাম," রাজুমিখিনকে দেখিয়ে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ যোগ করল। "এর কপালেও অপমান আর ঝামেলা ছাড়া আমার কাছ থেকে আর কিছু জোটেনি।"

"ধুৎ, বাজে বোকো না তো! আজ তুমি বড় বেশি ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ছ মনে হচ্ছে?" রাজুমিখিন চেঁচিয়ে উঠল।

ওর যদি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি থাকত তাহলে ও দেখতে পেত যে সেখানে ভাবপ্রবণতার লেশমাত্র ছিল না, বরং যা ছিল তা তার একেবারে বিপরীত কিছু। কিন্তু আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার দৃষ্টিতে তা এড়ায়নি। সে অস্থির হয়ে একদৃষ্টে ভাইয়ের হাবভাব লক্ষ করে যাচ্ছিল।

"আর মা, মামণি, তোমার কথা আর কী বলব! কিছু বলার মতো স্পর্ধা আমার নেই," রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ যেন আজ সকাল থেকে মুখস্থ করা কোন পাঠ আউড়ে যেতে লাগল। "গতকাল সন্ধ্যায় আমার ফেরা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করার সময় তুমি যে মানসিক কষ্ট ভোগ করেছ মাত্র এখনই তার অন্তত কিছুটা আমি ধারণা করতে পারছি," এই বলে সে মৃদু হেসে হঠাৎ নীরবে বোনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু এবারের এই হাসিতে ঝলকে উঠল খাঁটি অকৃত্রিম উপলব্ধি। দুনিয়া আনন্দে ও

কৃতজ্ঞতায়, উত্তেজনাভরে তৎক্ষণাৎ নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরল তার হাত। গতকালের কথা কাটাকাটির পর বোনের সঙ্গে এই তার প্রথম কথা। শেষপর্যন্ত ভাইবোনের আবার মিলনের এই দৃশ্য দেখে আনন্দে উচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মা'র চোখমুখ।

"ঠিক এই কারণেই তো আমি ওকে ভালোবাসি!" অতিরঞ্জনে স্বভাবসিদ্ধ রাজুমিখিন চেয়ারে বসা অবস্থায় সোৎসাহে মুখ ঘুরিয়ে অর্ধস্ফুট স্বরে বলল। "এই ভাবগুলো কিন্তু ওর মধ্যে আছে!..."

'আর এগুলো কী চমৎকারই না ওর আসে!' মা মনে -মনে ভাবল। 'কী মহত্ত্বই না আছে ওর আবেগের মধ্যে, কী সহজে সুস্থভাবে বোনের সঙ্গে গতকালের সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে দিল— সেই মুহূর্তটিতে কেবল হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে দরদভরা চোখে তাকাল— তাতেই সব বলা হয়ে গেল।... কী সুন্দর ওর চোখদুটো, কী সৌন্দর্যই না ছড়িয়ে আছে ওর সারা মুখে।... এমনকি ও দেখতে দুনিয়ার চেয়েও ভালো।... কিন্তু, হা ভগবান, একী জামাকাপড়ের ছিরি, কী ভয়ঙ্কর ওর বেশবাস! ভাখ্রুশিনের দোকানে ফুটফরমাস খাটে যে ভাসিয়া তারও জামাকাপড় ওর চেয়ে ভালো!... এখন, ঠিক এই মুহূর্তে ইচ্ছে হচ্ছে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরি, কেঁদে বুকের বোঝা হালকা করি। ওঃ আমার ভয় করছে, বড় ভয় করছে... ও যেন কেমন, ভগবান!... এখন অবশ্য দরদভরা কথা বলছে। তবু আমার ভয় করছে। কিন্তু ভয়টা আমার কিসের?...'

"ওঃ রোদিয়া, তুই বিশ্বাস করতে পারবি না," রাস্‌কোল্‌নিকভের মন্তব্যের তাড়াতাড়ি জবাব দিতে গিয়ে সে হঠাৎ বলে উঠল, "গতকাল কী দুঃখই না পেয়েছিলাম... দুনিয়া আর আমি! এখন যখন সেসব কেটে গেছে, সব চুকে-বুকে গেছে, আমরা সকলে আবার সুখী— তখন বলা যেতে পারে। একবার ভেবে দেখ, আমরা এখানে ছুটে এসেছি তোকে জড়িয়ে ধরব বলে— এসেছি বলতে গেলে সোজা ট্রেনের কামরা থেকে, এখন এই মহিলা— হ্যাঁ এই যে সে! এই যে নাস্তাসিয়া... হঠাৎ আমাদের বলল অতিরিক্ত মদের নেশার ফলে তোর নাকি বায়ু চড়ে গেছে, তাইতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলি, সবে চুপিসারে ডাক্তারের নজর এড়িয়ে বাড়ি ছেড়ে জ্বর আর বিকার নিয়েই বেরিয়ে পড়েছিস রাস্তায়। তোকে নাকি ওরা সব খুঁজতে বেরিয়েছে। তুই ধারণা করতে পারবি না আমাদের তখন মনের কী অবস্থা! আমার তখনই মনে পড়ে গেল আমাদের পরিচিত, তোর বাবার বন্ধু লেফটেনান্ট পতান্‌চিকভের শোচনীয় পরিণতি। ...তোর অবশ্য তাঁকে মনে নেই রোদিয়া।... তিনিও অতিরিক্ত পানদোষের ফলে বায়ুগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, সেই অবস্থায় এভাবেই ঘর ছেড়ে পালিয়ে যান, তারপর উঠোনের ইঁদারার মধ্যে পড়ে

যান। মাত্র পরের দিন তাঁকে ওখান থেকে তোলা সম্ভব হল। আমরা অবশ্য একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলছিলাম— ভাবছিলাম তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গিয়ে পিওতর পেত্রোভিচ্‌কে খুঁজে বার করি, যাতে অন্তত তাঁর সাহায্যে... কেননা বুঝতেই পারছিস আমরা একা, সম্পূর্ণ একা," করুণ স্বরে, বিলাপের সুরে কথাগুলো বলতে-বলতে হঠাৎ তার টনক নড়ল। খেয়াল হল যে এই মুহূর্তে সকলে আবার পরম সুখ উপভোগ করলেও পিওতর পেত্রোভিচের নাম উল্লেখ করা এখনও রীতিমতো বিপজ্জনক।

"তা ঠিক, তা ঠিক... যা যা ঘটেছে সেসব অবশ্যই দুঃখজনক..." উত্তরে বিড়বিড় করে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ বলল। কিন্তু তাকে এত অন্যমনস্ক ও উদাসীন দেখাল যে দুনিয়া অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

"ও হ্যাঁ আমি আরও বলতে চেয়েছিলাম..." চেষ্টা করে মনে আনতে-আনতে সে বলল, "হ্যাঁ, মা আর দুনিয়া, তুইও, দোহাই তোমাদের, মনে করো না যে আজ তোমাদের কাছে প্রথম যাবার ইচ্ছে আমার ছিল না এবং তোমরা প্রথম আসবে সেই আশায় আমি ছিলাম।"

"আরে না না। এসব তুই কী বলছিস রোদিয়া!" পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না বলল। সেও অবাক হয়ে গিয়েছিল।

দুনিয়া মনে-মনে ভাবল, 'ওর আসল মতলবটা কী? কর্তব্যের খাতিরে আমাদের উত্তর দিচ্ছে নাকি? মিটমাট করা আর ক্ষমা চাওয়ার যা নমুনা তাতে তো মনে হয় যেন গির্জায় মন্ত্র পড়ছে নয়ত মুখস্থবিদ্যা আওড়াচ্ছে।'

"এইমাত্র ঘুম ভাঙতে ভাবলাম এখনই যাই, কিন্তু পোশাকটার জন্যে দেরি হয়ে গেল। ওকে... নাস্তাসিয়াকে কাল বলতে ভুলে গিয়েছিলাম... এই রক্তের দাগটা... ধুয়ে তুলে ফেলতে। এই সবে জামাকাপড় পরা হল।"

"রক্ত! কিসের রক্ত?" তটস্থ হয়ে বলল পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না।

"ও কিছু নয়।... চিন্তার কোন কারণ নেই। রক্ত লাগার কারণ এই যে কাল যখন আমি জ্বরের ঘোরে, অনেকটা বেহুঁশ অবস্থায় রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম সেই সময় ঘোড়ার গাড়িতে চাপা পড়া একজন লোকের ওপর এসে পড়ি... লোকটা একজন কেরানি..."

"বেহুঁশ অবস্থায়? কিন্তু তোমার তো দিব্যি সব মনে আছে," রাস্‌কোল্‌নিকভের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে রাজুমিখিন বলে উঠল।

"তা ঠিক," এর উত্তরে যেন খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে রাসকোল্‌নিকভ্‌ বলল। "সব মনে আছে, সামান্যতম খুঁটিনাটি পর্যন্ত মনে আছে, অথচ দেখ কাণ্ড!— কোন্‌ কাজ কেন করেছিলাম, কেন সেখানে গিয়েছিলাম, কোন্‌ কথা কেনই বা বলেছিলাম— তার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারব না।"

"খুবই পরিচিত উপসর্গ," জোসিমভ্ বলে উঠল মাঝখান থেকে। "এই অবস্থায় লোকে অনেক সময় খুব দক্ষতার সঙ্গে, চালাকি খাটিয়ে কোন কাজ করে ফেলতে পারে, কিন্তু কাজের ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ এবং তার মূল অভিসন্ধির কোন ঠিক-ঠিকানা থাকে না, তা নির্ভর করে অসুস্থ মনের নানা প্রভাবের ওপর। লোকে যাকে নিশিতে পাওয়া বলে অনেকটা তাই।"

'ও যে আমাকে প্রায় পাগল বিবেচনা করছে এটা একদিক থেকে ভালো বলতে হবে!' রাস্‌কোলনিকভ্ মনে-মনে ভাবল।

"আচ্ছা, এরকম তো সুস্থ লোকের ক্ষেত্রেও হতে পারে— তাই না?" উদ্বিগ্ন হয়ে জোসিমভের দিকে তাকিয়ে দুনিয়া জিগ্‌গেস করল।

"আপনার মন্তব্যটা খুবই যুক্তিসঙ্গত," জোসিমভ্ উত্তরে বলল। "এই অর্থে বস্তুত আমরা সকলে প্রায় অনেক সময় কম-বেশি বিকৃতমস্তিষ্কের মতো আচরণ করে থাকি। তবে সামান্য একটা হেরফের আছে: যারা 'অসুস্থ' তারা আমাদের চেয়ে একটু বেশি বিকৃতমস্তিষ্ক, তাই সীমারেখা স্থির করার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা আছে। এটা ঠিক যে সামঞ্জস্যপূর্ণ মানুষ প্রায় নেই বললেই চলে। কয়েক হাজারে, হয়ত বা লাখে একটি মেলে... তাও আবার খুব একটা উঁচুদরের নমুনা নয়।..."

নিজের প্রিয় বিষয় নিয়ে বড় বেশি বকবক করতে গিয়ে জোসিমভের মুখ ফসকে অসতর্কভাবে 'বিকৃতমস্তিষ্ক' কথাটি বেরিয়ে যেতে উপস্থিত সকলে অস্বস্তিভরে চোখ -মুখ কোঁচকাল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ম্লান ঠোঁটে অদ্ভুত একটা হাসি নিয়ে নিজের চিন্তায় ডুবে গিয়ে এমনভাবে বসেছিল যেন কোনকিছুতে তার মনোযোগ নেই। মনে-মনে সে কিছু একটা মতলব ভাঁজছিল।

"হ্যাঁ, তা সেই চাপাপড়া কেরানির কথা কী বলছিলে যেন? আমি তোমাকে কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে ফেলেছিলাম!" রাজুমিখিন তাড়াতাড়ি করে বলে উঠল।

"কী?" যেন সবে নিদ্রাভঙ্গ হল রাস্‌কোল্‌নিকভের। "ও, হ্যাঁ, ... লোকটাকে বয়ে নিয়ে তার ফ্ল্যাটে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করতে গিয়ে পোশাকে রক্ত লেগে যায়।.... প্রসঙ্গত বলে রাখি মামণি, গতকাল আমি এমন একটা কাজ করে ফেলেছি যা ক্ষমার অযোগ্য। আসলে আমার মাথার ঠিক ছিল না। তুমি আমাকে যে টাকা পাঠিয়েছিলে গতকাল আমি তার সবটা দিয়ে দিয়েছি ওর স্ত্রীকে... শেষকৃত্যের জন্যে। মহিলা এখন বিধবা, ক্ষয়রোগে ভুগছে, বড় করুণ অবস্থা তার।... তিনটি ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে, অনাথ, খেতে পায় না... ঘরে কিছুই নেই...আর একটি মেয়েও আছে। ... সে দৃশ্য যদি নিজের চোখে দেখতে তাহলে তুমি নিজেও হয়ত দিতে।... সে যাই হোক, এটা করার যে আমার কোন অধিকার ছিল না তা আমি স্বীকার করছি— বিশেষত যখন জানি যে এ-টাকা কত কষ্টে তোমাদের জোগাড় করতে হয়েছে। কাউকে সাহায্য করতে গেলে প্রথমে নিজের সেই অধিকার থাকতে হয়, তা না হলে 'crevez

chiens, si vous n'etes pas contents!' —ওহে কুকুরের দল, যদি সন্তুষ্ট না হও তো টেঁসে যাও!" হাসতে-হাসতে সে বলল। "ঠিক কিনা দুনিয়া?"

"না, ঠিক নয়," দৃঢ়স্বরে দুনিয়া বলল।

"বা! তোরও তাহলে দেখছি সঙ্কল্প আছে!"... বিদ্রূপের হাসি হেসে, প্রায় ঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল রাস্‌কোল্‌নিকভ্। "এটা আমার ভেবে দেখা উচিত ছিল।... তা বেশ তো, প্রশংসার যোগ্য। এতে তোরই ভালো।... যেতে-যেতে এমন একটা সীমারেখায় এসে যাবি যেটা না ডিঙোলে সুখ পাবি না, আবার যদি ডিঙোস তা হলে আরও অসুখী হবি।... তবে এ সবই রাবিশ!" নিজের অনিচ্ছায় এভাবে আবেগে ভেসে যেতে আক্ষেপ হওয়ায় বিরক্তির সঙ্গে সে যোগ করল। "আমি শুধু একথাই বলতে চাই মামণি যে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি," পরিশেষে তীক্ষ্ণস্বরে, আচমকা সে বলে উঠল।

"হয়েছে রোদিয়া, হয়েছে! আমি নিশ্চিত জানি, তুই যা করিস সবই চমৎকার!" উল্লসিত হয়ে মা বলল।

"অতটা নিশ্চিত হতে যেও না," বাঁকা হেসে সে বলল। এরপর নেমে এলো নীরবতা। এইসব কথাবার্তার মধ্যে, এই নীরবতায়, এই মিটমাট আর মার্জনার মধ্যে উদ্বেগজনক কিছু একটা ছিল। সকলেই সেটা উপলব্ধি করতে পারছিল।

'একী ওরা সত্যি-সত্যি আমাকে ভয় পাচ্ছে মনে হচ্ছে!' আড়চোখে মা আর বোনের দিকে তাকিয়ে রাসকোল্‌নিকভ্ মনে-মনে ভাবল। পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না বাস্তবিকই যত বেশিক্ষণ চুপ করে থাকছিল তত বেশি করে ভীরুতা তাকে পেয়ে বসছিল।

'ওরা যখন কাছে ছিল না তখন তো আমি ওদের ভালোবাসতাম বলেই মনে হয়,' তার মনে হল।

"জানিস রোদিয়া, মার্ফা পেত্রোভ্‌না মারা গেছে!" হঠাৎ বলে উঠল পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না।

"কোন মার্ফা পেত্রোভ্‌না?"

"সে কি রে! আরে মার্ফা পেত্রোভ্‌না— স্‌ভিদ্রিগাইলভা! কেন, ওর সম্পর্কে কত কথা লিখলাম না তোকে, চিঠিতে!"

"ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে।... মারা গেছে বলছ? সত্যি?" সবে নিদ্রাভঙ্গ হতে যেন হঠাৎ সে চমকে উঠল। "সত্যি মারা গেছে বলছ? কী হয়েছিল?"

"ধারণা কর, একেবারে হঠাৎ!" ওর কৌতূহলে উৎসাহিত হয়ে পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না তাড়াতাড়ি বলে উঠল। "ঠিক সেই সময়, যখন আমি তোকে চিঠি পাঠাই— এমনকি ঠিক সেইদিনই! ভেবে দ্যাখ, সেই ভয়ঙ্কর লোকটাই মনে হয় তার মৃত্যুর কারণ। শোনা যায়, ওকে খুব পেটাত!"

"ওরা কি সত্যিই এইভাবে জীবন-যাপন করত?" বোনের দিকে ফিরে সে জিগ্‌গেস করল।

"না, বরং তার উলটো। মার্ফা পেত্রোভ্‌নার সঙ্গে ব্যবহারে বরাবর রীতিমতো ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন, এমনকি তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারই করতেন। বহু ক্ষেত্রে পুরো সাত বছর তার আচরণকে প্রশ্রয়ও দিয়েছেন।... হঠাৎ কিন্তু কেন যেন ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন।"

"সাত বছর যদি নিজেকে অমন সংযত রাখতে পারে তাহলে বলতে হবে লোকটা আদৌ ভয়ঙ্কর নয়? তুই যেন ওকে সমর্থন করছিস, দুনিয়া?"

"না, না, লোকটা ভয়ঙ্কর কোন সন্দেহ নেই! তার চেয়ে ভয়ঙ্কর কাউকে আমি কল্পনাই করতে পারি না," বলতে-বলতে দুনিয়া শিউরে উঠল, ভুরু কোঁচকাল, চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল।

"ঘটনাটা ঘটেছিল সকালে," পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না তাড়াহুড়ো করে বলতে লাগল। "খাওয়া-দাওয়ার পর তৎক্ষণাৎ গাড়িতে ঘোড়া জুততে বললেন শহরে যাবেন বলে, কেননা এসব ক্ষেত্রে উনি সচরাচর শহরে বেরিয়ে পড়তেন। শোনা যায়, দস্তুরমতো ভালো খাওয়া-দাওয়া করেছিলেন..."

"মারধর খাওয়ার পরেও?"

"...ওঁর কিন্তু এটা বরাবরের একটা... অভ্যেস। খাবার পর সঙ্গে-সঙ্গে একটা স্নানের জায়গায় যেতেন। শহরে সঙ্গে-সঙ্গে না গেলে আবার বের হতে দেরি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।... জল-চিকিৎসা বা ওরকম কোন একটা চিকিৎসা করাতেন। ওদের ওখানে ঠাণ্ডা জলের একটা ঝরনা আছে, সেখানে রোজ স্নান করতেন। জলে নামার সঙ্গে-সঙ্গে স্ট্রোক!

"তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে!" জোসিমভ্ বলল।

"মারটা কি বেশিরকম হয়ে গিয়েছিল?"

"ওতে কিছু এসে যায় না," দুনিয়া বলল।

"হুম্! তা মা, এসব হাবিজাবি বৃত্তান্ত তোমার বলতেও ভালো লাগে।" ইচ্ছে তেমন না থাকলেও হঠাৎ বিরক্তি প্রকাশ করে ফেলল রাস্‌কোল্‌নিকভ্।

"ওরে বাছা আমার, আসলে আমি বুঝতে পারছিলাম না কী দিয়ে কথা শুরু করব!" পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না মুখ ফসকে বলে ফেলল।

"কী ব্যাপার বল তো? তোমরা সকলে আমাকে ভয় পাও নাকি?" বাঁকা হাসি হেসে সে বলল।

"কথাটা কিন্তু সত্যি," ভাইয়ের দিকে সোজা কঠিন দৃষ্টি হেনে দুনিয়া বলল। "মা তো সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ভয়ে ক্রুশ প্রণাম করছিল।"

রাস্‌কোল্‌নিকভের মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। তার মুখে ফুটে উঠল যন্ত্রণাকাতর ভাব।

"আঃ কী যে বকিস দুনিয়া! দোহাই তোর রোদিয়া, রাগ করিস না।... কেন তুই অমন কথা বলছিস দুনিয়া?" বিব্রত হয়ে পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না বলে উঠল। "এটা সত্যি যে আমাদের দেখাটা কী রকম হতে পারে, কী ধরনের হতে পারে আমাদের নিজেদের মধ্যে খবরাখবর দেয়া-নেয়া, এই নিয়ে ট্রেনে আসতে-আসতে সমস্ত রাস্তাটা আমি ভেবে দেখেছি।... আমার নিজেকে তখন এত সুখী মনে হচ্ছিল যে পথ কখন শেষ হল টেরও পেলাম না! কিন্তু আমি কী বলছি? আমি সুখী, এখনও সুখী।... মিছিমিছি ওসব কী বলছিস, দুনিয়া! আমি যে তোকে দেখতে পাচ্ছি, রোদিয়া, শুধু এতেই আমি সুখী রে।..."

"হয়েছে মামণি, আর নয়!" মায়ের হাত চেপে ধরে তার দিকে না তাকিয়ে বিব্রত রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ অর্ধস্ফুট স্বরে বলল। "প্রাণভরে কথা বলার অনেক সময় পাব আমরা।"

একথা বলতে না বলতে হঠাৎ সে থতমত খেয়ে গেল, তার মুখ ফেকাসে হয়ে গেল। আবার কিছু আগের এক ভয়াবহ উপলব্ধি, প্রাণহীন শীতলতার একটা স্রোত বয়ে গেল তার সমস্ত সত্তা জুড়ে। আবার হঠাৎই তার কাছে এটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও বোধগম্য হয়ে উঠল যে এখন সে একটা ডাহা মিথ্যে কথা বলেছে— আসলে এখন থেকে আর কখনও প্রাণভরে কথা বলার অবকাশ তো তার হবেই না, এমনকি আর কখনও কারও সঙ্গে কোনরকম কথা বলার ক্ষমতাও তার থাকবে না। এই বেদনাদায়ক চিন্তা, এই উপলব্ধি ছিল এতই প্রবল যে মুহূর্তের মধ্যে তার প্রায় সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি ঘটল, সে জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কারও দিকে দৃকপাত না করে সোজা দরজার দিকে পা বাড়াল।

"এ কী করছ? কী ব্যাপার?" রাজুমিখিন ওর হাত চেপে ধরে চেঁচিয়ে বলল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ আবার বসে পড়ল। নীরবে চারদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল। সকলে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগল তাকে।

"কী বিরক্তিকর তোমরা সকলে!" একেবারে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌। "কিছু একটা বল। অমন ভাবে বসে থাকার কোন মানে হয়? কী হল? আরে, কথা বল। কথাবার্তা শুরু হোক।... সবাই একসঙ্গে মিললাম, অথচ চুপচাপ।... আরে কিছু একটা বলবে তো!"

"ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। আমি তো ভেবেছিলাম গতকালের মতো ব্যাপার শুরু হয়ে গেল বুঝি," ক্রুশ-প্রণাম ঠুকতে-ঠুকতে পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না বলল।

"কী হল তোর, রোদিয়া?" সন্দেহের সুর আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার কণ্ঠে।

"ও কিছু না, একটা কথা মনে পড়ে গেল," উত্তরে এই বলে হঠাৎ সে হেসে উঠল।

"তাও ভালো! এদিকে আমি আবার ভাবতে শুরু করেছিলাম..." সোফা জুড়ে

উঠতে-উঠতে জোসিমভ্ বিড়বিড় করে বলল। "যা হোক, আমাকে এখন যেতে হয়। আমি আরও একবার আসব, এসে দেখে যাব হয়ত... এসে যদি অবশ্য দেখতে পাই..."

মাথা নুইয়ে নমস্কার জানিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

"কী চমৎকার লোক!" পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না মন্তব্য করল।

"হ্যাঁ, চমৎকার, অপূর্ব, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান..." রাস্‌কোল্‌নিকভের কথার মধ্যে ফুটে উঠল এক অসাধারণ সজীবতা, যা এর আগে কখনও লক্ষ করা যায়নি। অপ্রত্যাশিতভাবে, অতি দ্রুত উচ্চারণে সে বলতে শুরু করল, "ঠিক মনে করতে পারছি না, অসুস্থতার আগে কোথায় ওকে দেখেছি... কিন্তু মনে হচ্ছে কোথায় যেন দেখেছি।... আর এই যে এ—এও ভালো লোক!" রাজুমিখিনের দিকে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল। "দুনিয়া, তোর পছন্দ হয় ওকে?" জিগ্‌গেস করেই সে কোন্ কারণে কে জানে আচমকা হো-হো করে হেসে উঠল।

"খুবই," দুনিয়া উত্তর দিল।

"ছি, এ কি ইতরামি!" দারুণ হকচকিয়ে গিয়ে লজ্জায় লাল হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল রাজুমিখিন। পুলখেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। কিন্তু রাস্‌কোল্‌নিকভ্ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

"আরে চললে কোথায়?"

"আমিও যাই... দরকার আছে।"

"না, মোটেই দরকার নেই তোমার, এখানেই থাক! জোসিমভ্ চলে গেল, অমনি তোমারও দরকার পড়ে গেল। যেও না।... ক'টা বাজে এখন? বারোটা হয়েছে? কী সুন্দর তোর ঘড়িটা রে, দুনিয়া! কী হল? আবার চুপ মেরে গেলে যে তোমরা? আমি একাই দেখছি সমানে বকবক করে যাচ্ছি!..."

"ঘড়িটা মার্ফা পেত্রোভ্‌নার দেওয়া উপহার," দুনিয়া উত্তর দিল।

"খুব দামি," পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না যোগ করল।

"তা ঠিক। কিন্তু বড্ড বেশি বড়। মেয়েদের ঘড়ি ঠিক বলা যায় না।"

"ওরকমই আমার পছন্দ," দুনিয়া বলল।

'তাহলে দেখা যাচ্ছে হবু বরের দেওয়া উপহার নয়,' মনে-মনে এই ভেবে কেন কে জানে, রাজুমিখিনের বেশ আনন্দ হল।

"আমি তো ভেবেছিলাম বুঝি লুজিনের কাছ থেকে পাওয়া," রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বলল।

"না, উনি এখনও আমাদের দুনিয়াকে কোন উপহার দেননি।"

"ও! আচ্ছা, মা, তোমার মনে আছে, আমি একবার প্রেমে পড়ে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম," হঠাৎ সে মা'র দিকে তাকিয়ে বলল। অপ্রত্যাশিতভাবে প্রসঙ্গ পালটে

যে ভঙ্গিতে এখন সে কথা বলতে শুরু করল তাতে বিস্মিত হয়ে গেল পুলখেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না।

"মনে আছে রে, মনে আছে," বলতে-বলতে দুনিয়া এবং রাজুমিখিন— দুজনের সঙ্গেই দৃষ্টিবিনিময় হল পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নার।

"হুম্! হ্যাঁ! কিন্তু সে বিষয়ে কীই বা বলতে পারি তোমাদের? আমি নিজেও তো তেমন ভালো মনে করতে পারছি না। রুগণ মেয়ে," আবার যেন হঠাৎ গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়ে চোখ নামিয়ে সে বলতে শুরু করল। "একেবারে অসুস্থ ছিল। ভিখিরিদের টাকাপয়সা দিতে ভালোবাসত, সন্ন্যাসী হয়ে মঠে চলে যাবার স্বপ্ন দেখত চিরকাল। একবার তো এবিষয়ে আমাকে বলতে গিয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ... মনে আছে... খুব মনে আছে। নেহাত সাদামাঠা গোছের একটা মেয়ে।... অবশ্য জানি না, কেন তখন তার ওপর আমার একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। মনে হয় চিররুগ্‌ণ বলেই।... ও যদি তার ওপরে খোঁড়া বা কুঁজো হত তাহলে আমার মনে হয়, আরও বেশি ভালোবাসতাম ওকে..." অন্যমনস্কভাবে মৃদু হেসে সে বলল। "বসন্তকালে অনেক সময় যেমন ধুম জ্বর হয় না,... এও অনেকটা সেরকম।..."

"না, স্রেফ বসন্তকালের জ্বর বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না," উৎসাহিত হয়ে দুনিয়া বলল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ গভীর মনোযোগ দিয়ে বোনের দিকে তাকাল, কিন্তু তাকে দেখে মনে হল সে কথাগুলো শুনতে পায়নি, এমনকি হয়ত বা বুঝতেই পারেনি। তারপর বিষণ্ণ চিন্তায় অন্যমনস্কভাবে জায়গা ছেড়ে উঠে মা'র দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাতে চুমু খেল, আবার ফিরে এসে বসল যথাস্থানে।

"তুই এখনও ওকে ভালোবাসিস!" আবেগে বিচলিত হয়ে পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না বলল।

"কাকে? ওকে? এখন? ও হ্যাঁ,... ওর কথাই তো বলছ! না। ওসব এখন অন্য জগতের ব্যাপার... কতকাল আগের! তাছাড়া চারধারে যে সমস্ত কাণ্ডকারখানা ঘটছে দেখেশুনে মনে হয় যেন আদৌ এ জগতের নয়।..."

বেশ মনোযোগ দিয়ে সে তাকাল ওদের দিকে।

"এই যে তোমরা... ঠিক যেন হাজার-হাজার মাইল দূর থেকে দেখছি তোমাদের।... ধুত্তোর, এই নিয়ে আমরা কথা বলছি কেন, কে জানে! অত জিগ্‌গেসবাদ করারই বা কী আছে?" আক্ষেপের সুরে বলতে-বলতে থেমে গিয়ে হাতের নখ কাটতে লাগল। আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

"তোর ঘরটা কী যাচ্ছেতাই রে রোদিয়া— একেবারে কফিনের মতো," অস্বস্তিকর নীরবতা ভঙ্গ করে পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না হঠাৎ বলে উঠল। "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোর মন খারাপের অর্ধেক কারণ তোর এই ঘর।"

"ঘর?" উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে উত্তর দিল। "হ্যাঁ ঘর অনেকটা সাহায্য করেছে... কথাটা যে আমিও ভাবিনি, তা নয়।... কিন্তু মা, তুমি যদি জানতে কী অদ্ভুত একটা চিন্তা তুমি এইমাত্র প্রকাশ করলে।" অদ্ভুতরকম কাষ্ঠহাসি হেসে সে হঠাৎ যোগ করল।

তিন বছরের ছাড়াছাড়ির পর আত্মীয়স্বজনের এই সংসর্গ, কথাবার্তায় আত্মীয়তার সুর, অথচ নিজেদের মধ্যে কথা বলার উপযুক্ত কোন বিষয় খুঁজতে গিয়ে সম্পূর্ণ হালছাড়া অবস্থা— আরেকটু হলেই শেষপর্যন্ত ওর কাছে চূড়ান্ত রকমের অসহ্য মনে হত। তবে একটা জরুরি বিষয় ছিল, যার নিষ্পত্তি যেমন করে হোক আজই অবিলম্বে হওয়া চাই, কিছুক্ষণ আগে ঘুম ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গে সে এটা ঠিক করে ফেলেছিল। এখন এই *বিষয়টিকেই* উদ্ধারের উপায় হিসাবে পেয়ে সে খুশি হল।

"আমি যা বলি, শোন্ দুনিয়া," শুষ্ক কণ্ঠে, গম্ভীরভাবে সে শুরু করল, "গতকালের ঘটনার জন্যে আমি তোর কাছে অবশ্যই ক্ষমা চাইছি, কিন্তু আমি মনে করি আমার কর্তব্য আবার তোকে মনে করিয়ে দেওয়া যে আমার মূল নীতি থেকে আমি সরছি না। হয় আমি, নয় লুজিন। আমি নীচ হতে পারি, কিন্তু তোর নীচ হওয়া সাজে না। দুজনের মধ্যে একজন কেউ। তুই যদি লুজিনকে বিয়ে করিস সেই মুহূর্তে আমি তোকে আর বোন হিসেবে গণ্য করব না।"

"রোদিয়া! রোদিয়া! এযে গতকাল যা বলেছিলি হুবহু তাই," বিলাপের সুর ফুটে উঠল পুলখেরিয়া আলক্সান্দ্রভ্‌নার কণ্ঠে। "তাছাড়া তুই নিজেকে বারবার নীচ বলছিস কেন? এ আমি সহ্য করতে পারছি না। গতকালও তাই হয়েছিল..."

দুনিয়াও বেশ দৃঢ় ও শুষ্ককণ্ঠে জবাব দিল: "ভাই, এখানে তোর দিক থেকে একটা ভুল আছে। আমি সারা রাত ভেবে-ভেবে তোর ভুল বের করেছি। আসলে তোর মনের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে আমি কারও জন্যে কারও কাছে নিজেকে বলি দিচ্ছি। আদৌ তা নয়। আমি বিয়ে করছি *স্রেফ* নিজের স্বার্থে, কেননা নইলে আমার নিজের জীবনই আমার কাছে দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে। তাছাড়া আমাদের পরিবারের উপকারে যদি আসতে পারি আমি অবশ্যই খুশি হব। তবে আমার সঙ্কল্পের পেছনে এটাই আসল প্রেরণা নয়।..."

'মিছে কথা।' রাগে দাঁত দিয়ে নখ কাটতে-কাটতে মনে-মনে ভাবল রাস্‌কোল্‌নিকভ্। 'দেমাক দেখ। উপকার করার ইচ্ছে— এটা স্বীকার করতে চাইছে না! ওঃ কী নীচতা। ওদের ভালোবাসা ঘৃণার নামান্তর।... ওঃ আমি ঘৃণা করি... ওদের ঘৃণা করি।'

"সংক্ষেপে বলতে গেলে, পিওতর পেত্রোভিচের সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে", দুনিয়া বলতে লাগল, হচ্ছে এই কারণে যে দুটো অনিষ্টের মধ্যে যেটা কম আমি সেটাকে বেছে নিচ্ছি। আমার কাছে ওঁর যা যা প্রত্যাশা সে সবই আমি সততার সঙ্গে

পূরণ করব। তার মানে আমি ওঁকে বঞ্চনা করছি না।... তুই এখন হাসলি কেন অমন?”

রাগে ফুঁসে উঠল দুনিয়া, তার দুই চোখে ক্রোধের ঝলক।

“সব পূরণ করবি বলছিস?” বিষ ঝরে পড়ল তার বাঁকা হাসিতে।

“একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত। আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেবার সময় পিওতর পেত্রোভিচের যেধরনের ভাবভঙ্গি ও আদবকায়দার পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে আমি তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলি কী তাঁর দরকার। নিজের সম্পর্কে ধারণা তার উঁচু, হয়ত বড় বেশি উঁচু, কিন্তু আমার আশা, উনি আমারও কদর করেন।... আবার হাসছিস যে বড়?”

“তুইই বা লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছিস কেন? তুই মিথ্যে বলছিস বোন, ইচ্ছে করে মিথ্যে বলছিস, স্রেফ গোঁয়ার্তুমি করছিস— মেয়েদের যেমন স্বভাব আর কি— আমাকে আমল না দিয়ে নিজের মতটাই আঁকড়ে ধরে থাকছিস।... লুজিনের ওপর কোন শ্রদ্ধা তোর থাকতে পারে না। আমি তাকে দেখেছি, তার সঙ্গে কথাও বলেছি। দাঁড়াচ্ছে এই যে টাকার জন্যে নিজেকে বিকিয়ে দিচ্ছিস অর্থাৎ নীচতার পরিচয় যে দিচ্ছিস তাতে সন্দেহ নেই। আমি দেখে খুশি হলাম, তুই অন্তত লজ্জায় লাল হতে পারিস!”

“মোটেই না, মিথ্যে বলছি না!” ধৈর্যের বাঁধ সম্পূর্ণ ভেঙে যেতে চেঁচিয়ে উঠল দুনিয়া। “উনি আমাকে কদর দেবেন, আমার দাম দেবেন এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত না হয়ে আমি ওঁকে বিয়ে করতে যাচ্ছি না। নিজে ওঁকে সম্মান করতে পারব এ বিষয়েও স্থির নিশ্চিত না হয়ে যে ওঁকে বিয়ে করতে যাচ্ছি তাও না। সৌভাগ্যবশত এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হতে পারি সম্ভবত আজই। তুই যে নীচতার কথা বলছিস এই বিয়ের মধ্যে তা নেই। আর তোর কথা যদি সত্যিও হয় আমি যদি সত্যি-সত্যি নীচতার আশ্রয় গ্রহণের সঙ্কল্প নিয়ে থাকি, তাহলে আমার সঙ্গে অমনভাবে তোর কথাবার্তা বলা কি তোর দিক থেকে নিষ্ঠুরতার সামিল নয়? যে বীরত্ব হয়ত তোর নিজের মধ্যেও নেই, আমার কাছ থেকে তা দাবি করছিস কেন? একে বলে স্বেচ্ছাচার, অন্যের ওপর জোর খাটান! আমি যদি কারও জীবন নষ্ট করি সে তো একমাত্র নিজের।... আমি এখনও কাউকে খুন করিনি!... অমন করে তাকাচ্ছিস কেন আমার দিকে? অমন ফেকাসে হয়ে গেলি কেন? রোদিয়া, কী হল তোর? তোর কী হল, ভাই?”

“হা ভগবান! এ তুই কী দশা করলি ওর? ভিরমি লেগে গেল যে!” পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না আর্তনাদ করে উঠল।

“না, না... রাবিশ... ও কিছু না!... মাথাটা একটু ঘুরে গিয়েছিল আর কি। ভিরমি মোটে লাগেনি।... যত ভিরমি সব তোমাদের মাথার মধ্যে।... হুম্! হ্যাঁ... কী যেন

বলছিলাম? ও হ্যাঁ, আজই তুই কীভাবে নিশ্চিত হতে পারবি যে ওকে সম্মান করতে পারিস এবং ও... তোকে কদর করবে তাই তো বললি তুই? আমার মনে হচ্ছে, তুই বললি আজ? নাকি আমি ভুল শুনেছি?''

''পিওতর পেত্রোভিচের চিঠিটা রোদিয়াকে দেখাও, মামণি,'' দুনিয়া বলল।

পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না কাঁপা-কাঁপা হাতে চিঠিটা দিল। রাস্‌কোল্‌নিকভ বেশ আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করল। কিন্তু ভাঁজ খোলার আগে কেমন যেন একটু অবাক হয়ে তাকাল দুনিয়ার দিকে।

''অদ্ভুত!'' হঠাৎ যেন কোন নতুন চিন্তা তার মাথায় এসেছে, এমন ভাব করে ধীরে-ধীরে সে বলে উঠল। ''এই নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি কেন? কেন এত চিৎকার-চেঁচামেচি? যাকে খুশি বিয়ে করগে যা!''

তার কথাগুলো ছিল স্বগতোক্তির মতো, তবে বলল সে জোরে, সকলকে শুনিয়ে। কিছুক্ষণের জন্য চিন্তিতভাবে তাকিয়ে রইল বোনের দিকে।

অবশেষে সে চিঠি খুলল, যদিও অদ্ভুত একধরনের বিস্ময়ের ভাব তার মুখে লেগে রইল। তারপর ধীরে-ধীরে মনোযোগ দিয়ে শুরু করল, দুবার পড়ল। পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নাকে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। অবশ্য সকলেই অপেক্ষা করছিল বিশেষ একটা কিছুর।

চিঠিটা মা'র হাতে তুলে দিতে-দিতে, বিশেষভাবে কাউকে লক্ষ না করে, একটু চিন্তা করে সে বলতে শুরু করল: ''আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, লোকটা কেস নিয়ে ঘোরাঘুরি করে, একজন উকিল, এমনকি তার কথাবার্তারও এমন ধরনধারণ... অথচ লেখে তো দেখি একেবারে অশিক্ষিতের মতো!

সকলে নড়েচড়ে বসল। এটা একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল।

''তা ওরা সবাই অমন লেখে,'' রাজুমিখিনের কাটা মন্তব্য।

''তুমি কি পড়েছ?''

''হ্যাঁ।''

''আমরা দেখিয়েছিলাম, রোদিয়া, আমরা... আজ এই কিছু আগে ওর সঙ্গে পরামর্শ করছিলাম,'' পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নাকে বিব্রত দেখা গেল।

''এসব আসলে কোর্ট-কাছারির ভাষা,'' রাজুমিখিন কথার মাঝখানে বলে উঠল। ''কোর্ট-কাছারির কাগজপত্র এখনও এই ভাষাতে লেখা হয়ে থাকে।''

''কোর্ট-কাছারির? ঠিক কথা, কোর্ট-কাছারির, দলিলের ভাষা। খুব একটা অশিক্ষিতের মতো লেখা নয়, আবার কেতাবি ভাষাও ঠিক নয়— দলিল লেখার ভাষা আর কি!''

''পিওতর পেত্রোভিচ্ একথা গোপন করেন না যে লেখাপড়ার পেছনে তাঁর অভিভাবক খরচ করেছেন যৎসামান্য। এমনকি তিনি যে নিজেই নিজের পথ করে

নিয়েছেন এর জন্য গর্বও করেন," ভাইয়ের কথার নতুন সুরে একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে মন্তব্য করল আভ্দোতিয়া রমানোভ্না!

"বেশ তো, গর্ব করার মতো কিছু থাকলে করুক না কেন— আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। আমার মনে হয় তুই রাগ করেছিস এই কারণে যে গোটা চিঠি থেকে বেছে-বেছে তুচ্ছ একটা কী বার করে আমি মন্তব্য করলাম। তুই ভাবলি তোকে খোঁচানোর উদ্দেশ্যে আমি ইচ্ছে করে এ রকম ছোটখাটো ব্যাপারের উল্লেখ করছি। ঠিক তার উলটো— লেখার ভঙ্গি নিয়েই বলি। একটা জিনিস আমি অন্তত এখানে লক্ষ করেছি যা বর্তমান ক্ষেত্রে মোটে অপ্রাসঙ্গিক নয়। চিঠিতে আছে একটি উক্তি: 'দায়ভাগ আপনার উপর বর্তাইবে'— অত্যন্ত পরিষ্কার ও অর্থপূর্ণ। এছাড়াও আছে একটা হুমকি— আমি এলে সঙ্গে-সঙ্গে স্থানত্যাগের হুমকি। স্থানত্যাগের এই হুমকির অর্থ একটাই— ওর অবাধ্য হলে তোদের দুজনকেই ছেড়ে দেবে। আর ছেড়ে দিচ্ছে কখন? —না, পিটার্সবুর্গে তোদের ডেকে আনার পর! তা তোর কী মনে হয়? লুজিনের এই মন্তব্যে কি ঠিক একইভাবে রাগ করা যায়, যেমন রাগ করা যেতে পারত যদি ধর লিখত এই ও..." বলতে-বলতে সে ইঙ্গিতে রাজুমিখিনকে দেখাল "...নয়ত জোসিমভ্, নয়ত বা আমাদের মধ্যে কেউ?"

"না না," উদ্দীপিত হয়ে দুনিয়া উত্তর দিল, আমি বেশ ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি যে প্রকাশটা বড় বেশি স্থূল হয়ে গেছে, তার কারণ এই হতে পারে যে লেখার ব্যাপার ওঁর তেমন দক্ষতা নেই।... তুই ঠিক ধরেছিস ভাই। আমি আশাই করতে পারিনি..."

"বিষয়টা প্রকাশ করা হয়েছে আইনের ভাষায়, আইনের ভাষায় এছাড়া অন্য কোনভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে হয়ত ওর যা অভিপ্রায় ছিল তার চেয়ে একটু বেশি স্থূল হয়ে গেছে। যা হোক, আমি তোর খানিকটা মোহভঙ্গ করতে বাধ্য হচ্ছি: এই চিঠিতে আরও একটি বক্তব্য আছে, আমার বিরুদ্ধে একটা কুৎসা আছে যা অতি নীচ ধরনের। আমি গতকাল টাকা দিয়েছিলাম একজন নিহত ব্যক্তির ক্ষয়রোগগ্রস্ত বিধবাকে। টাকা আমি দিয়েছিলাম মৃতের 'শেষকৃত্যের অজুহাতে' নয়— শেষকৃত্যের জন্যই, এবং যাকে সে 'নষ্ট চরিত্রের' বলে উল্লেখ করেছে, যাকে আমি গতকালই জীবনে প্রথম দেখি তার হাতে নয়, মৃতব্যক্তির মেয়ের হাতে নয়— দিয়েছিলাম বিধবাকেই। এসবের মধ্যে আমি যা দেখতে পাচ্ছি তা হল আমার বদনাম রটানোর এবং তোদের সঙ্গে আমার ঝগড়া বাধানোর বড় বেশি আগ্রহ। এটাও কিন্তু প্রকাশ করা হয়েছে আইনের ভাষায়, অর্থাৎ এর মধ্যে উদ্দেশ্য বড় বেশি প্রকট এবং আগ্রহ অত্যন্ত স্থূলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। লোকটা বুদ্ধিমান, কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো আচরণ করতে হলে একমাত্র বুদ্ধিই যথেষ্ট নয়। এ সবই প্রকট করে তুলছে লোকটার আসল চেহারা এবং... আমার মনে হয় না ওর কাছে তোর বিশেষ দাম আছে।

কথাগুলো জানাচ্ছি একমাত্র তোরই ভালোর জন্য, কেননা আমি অন্তর থেকে তোর মঙ্গল কামনা করি।"

দুনিয়া উত্তর দিল না। ওর সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হয়ে গেছে , এখন কেবল সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা।

"তাহলে তুই কী ঠিক করেছিস বল তো রোদিয়া?" ছেলের কথার মধ্যে অকস্মাৎ নতুন ধরনের *ব্যবহারিক* সুরের নতুন আভাস পেয়ে আরও বেশি বিচলিত হয়ে উঠল পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না।

"কী বোঝাচ্ছ 'ঠিক করা' বলতে?"

"এই যে ধর, পিওতর পেত্রোভিচ্‌ লিখছেন যে সন্ধ্যাবেলায় তুই যেন ওখানে না থাকিস, যদি আসিস... তাহলে ওখান থেকে চলে যাবেন। তাহলে... তাহলে কী হবে? তুই কি আসছিস?"

"সেটা অবশ্য আমি স্থির করব না। করবে প্রথমত তুমি। যদি পিওতর পেত্রোভিচের দাবি তোমার কাছে অপমানজনক মনে না হয়। দ্বিতীয়ত, স্থির করবে দুনিয়া— যদি তার কাছেও অপমানজনক মনে না হয়। আর আমি? তোমরা যা ভালো মনে কর তাই করব," শুষ্ককণ্ঠে সে যোগ করল।

"দুনিয়া ইতিমধ্যে ঠিক করে ফেলেছে, আমিও ওর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত," পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

"তোর কাছে আমার অনুরোধ, রোদিয়া, আমার একান্ত অনুরোধ, আমাদের এই সাক্ষাতের সময় তুই উপস্থিত থাকবি, অবশ্যই থাকবি। আসবি?"

"আসব।"

"আমি আপনাকেও অনুরোধ করছি আটটার সময় আমাদের ওখানে থাকতে," রাজুমিখিনের দিকে ফিরে সে বলল। "আমি ওঁকেও আসতে বলছি মামণি।"

"চমৎকার, দুনিয়া মা," পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না যোগ করল, "তোরা যা ঠিক করলি তা-ই হোক। আমার পক্ষেও স্বস্তিকর। মিথ্যে কথা আর ভড়ং আমার দুচক্ষের বিষ। তার চেয়ে বরং মন খুলে সত্যি কথা বলব।... তাতে পিওতর পেত্রোভিচ্‌ রাগ করুন আর যাই করুন।

চার

এমন সময় নিঃশব্দে ঘরের দরজা খুলে গেল। ভিতচকিত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে-তাকাতে ঘরে এসে ঢুকল এক তরুণী। সকলে বিস্মিত ও কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। রাস্‌কোল্‌নিকভ প্রথম দৃষ্টিতে তাকে চিনকে পারেনি। তরুণীটি মার্মেলাদভের কন্যা সোনিয়া। গতকাল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ প্রথম তাকে দেখে। কিন্তু সে এমন এক মুহূর্তে, এমনই এক পরিস্থিতিতে এবং তার বেশভূষাও তখন ছিল এমনই,

যে রাস্‌কোল্‌নিকভের স্মৃতিতে তার সম্পূর্ণ অন্য চিত্র গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। এখন সেই মেয়েটিরই বেশভূষা অনাড়ম্বর এমনকি হতশ্রী। বয়সে একেবারে বাচ্চা, প্রায় বালিকাই বলা চলে। চালচলন ভদ্র ও নম্র, তবে চোখেমুখে কেমন যেন ভীতির-ছাপ। গায়ের জামাটা সাদাসিধে, আটপৌরে। মাথার টুপি পুরানো, সাবেকি। শুধু হাতে ছিল গতকালের সেই ছাতাটা। অপ্রত্যাশিতভাবে একঘর ভরতি লোক দেখে সে শুধু বিব্রতই হল না, হকচকিয়ে গেল, ছোট শিশুর মতো ভয় পেয়ে চলে যাবার জন্য পাও বাড়াল।

"ও...আপনি?..." দস্তুমতো অবাক হয়ে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বলল। তারপর হঠাৎ নিজেও বিব্রত হয়ে পড়ল।

সঙ্গে-সঙ্গে তার খেয়াল হল যে লুজিনের চিঠি থেকে তার মা ও বোন কোন এক 'নষ্ট চরিত্রের' মেয়ের কথা ইতিমধ্যে একটু-আধটু জেনেছে। তখন সবেমাত্র লুজিনের কুৎসার প্রতিবাদ করে জানিয়েছে যে মেয়েটিকে সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই প্রথম দেখে। এমন সময় কিনা সে নিজেই এসে হাজির! এও মনে পড়ল যে 'নষ্ট চরিত্র' কথাটারও কোন প্রতিবাদ সে করেনি। এসবই মুহূর্তের মধ্যে অস্পষ্টভাবে তার মাথায় ঝলক দিয়ে গেল। কিন্তু ভালো করে তাকিয়ে দেখার পর তার হঠাৎ মনে হল মেয়েটি যেন উপেক্ষিতা, আর এখন তাকে এতটা উপেক্ষিতা দেখাচ্ছে যে সঙ্গে-সঙ্গে রাস্‌কোল্‌নিকভের দুঃখ হল ওর জন্য। মেয়েটা যখন ভয় পেয়ে চলে যাবার উদ্যোগ করল তখন রাস্‌কোল্‌নিকভের বুকের ভেতরে মোচড় দিয়ে উঠল।

"আমি আপনাকে একদম আশা করতে পারিনি," চোখের ইশারায় ওকে থামিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল রাস্‌কোল্‌নিকভ্। " দয়া করে বসুন। আপনি নিশ্চয় কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার কাছ থেকে এসেছেন? না না এখানে নয়, ওই ওখানে বসুন।..."

সোনিয়া ঘরে ঢোকার সময় রাস্‌কোল্‌নিকভের ঘরের তিনটি চেয়ারের একটিতে দরজার একেবারে কাছে রাজুমিখিন বসে ছিল। এখন সে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে ভেতরে ঢোকার পথ করে দিল। প্রথমে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ আরেকটু হলে তাকে বসার জায়গা দেখাতে যাচ্ছিল সোফার কোনায় যেখানে জোসিমভ্ বসত। কিন্তু সোফা বড় বেশি অন্তরঙ্গ জায়গা এবং তার শয্যাও বটে— একথা মনে হতে সে তাড়াতাড়ি তাকে রাজুমিখিনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিল।

"তুমি এখানে বোসো," বলে জোসিমভের বসার জায়গা সেই কোনায় রাজুমিখিনকে বসতে দিল।

সোনিয়া বসল, তখনও ভয়ে প্রায় থরথর করে কাঁপছে। ভয়ে-ভয়ে তাকাল মহিলা দুজনের দিকে। দেখে মনে হচ্ছিল ওদের পাশে সে কী করে বসতে পারে তা নিজেই বুঝে উঠতে পারছিল না! এটা মনে হতে সে এত ঘাবড়ে গেল যে হঠাৎ আবার উঠে দাঁড়াল, রীতিমতো বিব্রত হয়ে রাস্‌কোল্‌নিকভের দিকে ফিরে তাকাল।

"আমি... আমি... এসেছি মিনিটখানেকের জন্যে। আপনাদের যদি বিরক্ত করে থাকি তাহলে মাফ করবেন," আমতা-আমতা করে সে বলল। "আমি এসেছি কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার কাছ থেকে। আর কাউকে পাঠানোর উপায় ছিল না তাঁর।.. কাতেরিনা ইভানোভ্‌না বার-বার করে আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছেন আপনি যেন আগামীকাল সকালে,... সকালের উপাসনার পর... মেত্রোফানিয়েভ্‌স্কি কবরখানায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অবশ্যই উপস্থিত থাকেন। ওখান থেকে যাবেন আমাদের বাড়িতে... ওঁর বাড়িতে.... সেখানে সামান্য আয়োজন করা হয়েছে... দুটি মুখে দেবেন।... উনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করবেন।... উনি বলে দিয়েছেন।"

সোনিয়া আমতা-আমতা করে শেষকালে চুপ করে গেল।

"চেষ্টা করব... অবশ্যই চেষ্টা করব," রাসকোল্‌নিকভ্‌ জবাব দিল। সেও উঠে দাঁড়াল এবং সেও আমতা-আমতা করতে লাগল, কোন কথা শেষ করতে পারছিল না। "দয়া করে বসুন," হঠাৎ সে বলে উঠল, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। মাফ করবেন, আপনার হয়ত তাড়া আছে, কিন্তু দোহাই আপনার, দুটো মিনিট সময় আমার পেছনে খরচ করুন।..."

এই বলে চেয়ারটা সে এগিয়ে দিল সোনিয়ার দিকে। সোনিয়া আবার বসে পড়ল। আবার ভীরু, বিভ্রান্ত তার চোখের দৃষ্টি। দ্রুত চোখ বুলাল মহিলা দুজনের ওপর। পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিল।

রাস্‌কোল্‌নিকোভের পাণ্ডুর মুখে রক্তিমাভা দেখা দিল। একটা শিহরন খেলে গেল তার সর্বাঙ্গে। চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

"মা", নাছোড়বান্দার মতো রাস্‌কোল্‌কিভ্‌ বলল, "এ হল সোনিয়া— সোনিয়া মার্মেলাদভা, সেই যে মার্মেলাদভ্‌ নামে বেচারা ভদ্রলোকটি গতকাল আমার চোখের সামনে ঘোড়ার খুরের তলায় চাপা পড়লেন, যাঁর কথা আমি আগেই তোমাদের বলেছি, এ তাঁরই মেয়ে।"

পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না একটু চোখ কুঁচকে সোনিয়ার দিকে তাকাল। রোদিয়ার নাছোড়বান্দা ও উদ্ধত দৃষ্টির সামনে বিব্রত বোধ করা সত্ত্বেও এই আনন্দ থেকে সে নিজেকে কোনমতে বঞ্চিত করতে পারল না। দুনিয়া গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে সরাসরি বেচারি মেয়েটির মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, হতবুদ্ধি হয়ে তাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। পরিচয়দানের পালাটা শোনার পর সোনিয়া আবার চোখ তুলে তাকাতে গেল, কিন্তু আগের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে গেল তার অস্বস্তি।

"আমি আপনাকে যেটা জিগ্‌গেস করতে চাই, তা এই যে..." রাস্‌কোল্‌নিকভ তাড়াতাড়ি তার দিকে ফিরে জিগ্‌গেস করল, "আপনারা আজ কী ভাবে ব্যবস্থাদি করলেন? কেউ কোন অসুবিধে ঘটায়নি তো আপনাদের?... এই যেমন, পুলিস?"

"না, সবই ভালোয়-ভালোয় হয়ে গেছে। ...কিসে মারা যায় এটা তো একেবারে

স্পষ্ট। কোনো বিরক্ত করেনি। শুধু বাড়ির বাসিন্দারা রাগারাগি করছে, এই যা।"

"কারণ?"

"কারণ এই যে মড়া বড় বেশি সময় হল পড়ে আছে।... এখন তো আবার গরম, গন্ধ... তাই আজ সন্ধ্যার উপাসনার সময় নাগাদ কবরখানা নিয়ে যাওয়া হবে, তারপর কাল সকালের আগে শেষ কাজের জন্যে গির্জার মণ্ডপে রাখা হবে। কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার গোড়ায় ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু এখন নিজেই দেখতে পাচ্ছেন যে এটা দরকার..."

"তাহলে বলছেন আজকে?"

"ওঁর অনুরোধ, আগামীকাল শেষ কাজের সময় গির্জায় উপস্থিত থেকে আমাদের বাধিত করবেন। তারপর যাবেন ওঁর ঘরে পরলোকগত আত্মার শান্তিকামনায় পারিবারিক অনুষ্ঠানে।"

"অনুষ্ঠানও করছেন নাকি আবার?"

"হ্যাঁ, এই সামান্য জলখাবার আর কি। গতকাল আপনি যে আমাদের সাহায্য করেছিলেন তার জন্যে উনি বারবার আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে বলেছেন।... আপনি না থাকলে কী দিয়ে যে কাজ হত আমরা জানি না," বলতে-বলতে ওর ঠোঁট আর চিবুক হঠাৎ কেঁপে উঠল। কিন্তু সে তার আত্মসংযম ফিরে পেল, নিজেকে সামলে নিল। তারপর তাড়াতাড়ি আবার মাটিতে চোখ নামিয়ে নিল।

কথার ফাঁকে-ফাঁকে রাস্‌কোল্‌নিকভ ভালো করে তাকে নিরীক্ষণ করছিল। অতিমাত্রায় শীর্ণ, চোখা গড়নের একফালি ছোট্ট পাণ্ডুর মুখ, তাতে সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষণীয়, ছোট্ট নাক আর চিবুকটাও চোখা। ওকে সুন্দরী মোটে বলা চলে না, কিন্তু ওর চোখদুটো নীল আর বড় স্বচ্ছ— যখন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে তখন ওর মুখের ভাবে এত প্রসন্নতা ও করুণা প্রকাশ পায় যে তার দিকে আকৃষ্ট না হয়ে পারা যায় না। ওর মুখে এবং ওর সমস্ত আকৃতির মধ্যে সর্বোপরি ছিল আরও একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য: আঠারো বছর বয়স হলে কী হবে, ওকে এখনও দেখায় প্রায় একটি বাচ্চা মেয়ের মতো, আসল বয়সের থেকে অনেক কম, নেহাতই শিশু। এর ফলে ওর কতকগুলো ভাবভঙ্গির প্রকাশ পর্যন্ত হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়।

"কিন্তু কাতেরিনা ইভানোভ্‌না এই সামান্য সঙ্গতির মধ্যে কী করে এত আয়োজন করতে পারলেন? এমনকি আবার জলখাবারেরও ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন?..." কথার জের ধরে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ নাছোড়বান্দার মতো জিগ্‌গেস করল।

"কফিনটা হবে সাধারণ,... সমস্ত আয়োজন সাধারণ, বেশি টাকাকড়ি খরচ হবে না।... আমি আর কাতেরিনা ইভানোভ্‌না মিলে আজ হিসাব করে দেখেছি— পারবারিক অনুষ্ঠানের জন্যেও যৎসামান্য থেকে যাবে।... কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার খুব ইচ্ছে এটা করা। এ না করে... ওঁর কাছে একটা সান্ত্বনা।... উনি এরকমই! আপনি তো জানেন..."

"বুঝতে পারছি, বুঝতে পারছি... সে আর বলতে!...আমার ঘরটাতে অত নজর বুলিয়ে কী দেখছেন? এই যে আমার মাও বলেন, কফিনের মতো দেখতে।"

"আপনি গতকাল আপনার শেষ কপর্দক আমাদের দিয়ে দিয়েছেন।" উত্তরে সোনিয়া হঠাৎ দ্রুত ফিসফিসিয়ে বেশ খানিকটা জোরেই বলে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে আবার চট করে চোখ নামিয়ে নিল। ওর ঠোঁট আর চিবুক আবার কাঁপতে লাগল থরথর করে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ যে এমন দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে থাকে তা দেখে অনেকক্ষণ হল সে অবাক হয়ে গেছে, এখন কথাগুলো আচমকা আপনা-আপনি তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। এরপর নেমে এলো নীরবতা। দুনিয়ার চোখে একটা স্বচ্ছতার আভাস দেখা দিল, পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না পর্যন্ত সোনিয়ার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

এবারে জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না বলল: "রোদিয়া, দুপুরের খাওয়াটা আমরা নিশ্চয় একসঙ্গে সারব, তাই না? চল রে দুনিয়া।... আর তুই, রোদিয়া, বাইরে একটু বেড়িয়ে এলে পারতিস। তারপর বিশ্রাম কর, একটু শুয়ে থাক, পরে ঠিক সময়, তাড়াতাড়ি আমাদের ওখানে এসে যাস। আমার ভয় হচ্ছে, আমাদের জন্য তোর ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেল।..."

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসব," উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল। আমার অবশ্য একটু কাজও আছে এখন।..."

"কিন্তু তাই বলে দুপুরের খাবার নিশ্চয়ই আলাদা খাচ্ছ না?" অবাক হয়ে রাস্‌কোল্‌নিকভের দিকে তাকিয়ে রাজুমিখিন চেঁচিয়ে বলল, "কী বলতে চাও তুমি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ আসব, অবশ্যই আসব।... তবে তুমি একটু থেকে যাও। ওকে এই মুহূর্তে তোমাদের দরকার নেই তো মা? নাকি আমি তোমাদের বঞ্চিত করছি ওর সঙ্গ থেকে?"

"আরে না না! দ্‌মিত্রি প্রকোফিচ, আপনি আসছেন তো আমাদের সঙ্গে দুপুরের খাবার খেতে? দয়া করে আসবেন কিন্তু।"

"প্লিজ আসুন," দুনিয়া অনুরোধ করল।

রাজুমিখিন মাথা নুইয়ে নমস্কার জানাল। খুশির রেশ ছড়িয়ে পড়ল তার চোখেমুখে। এক মুহূর্তের জন্য হঠাৎ সকলকে অদ্ভুত রকম বিব্রত দেখাল।

"চলি রোদিয়া, মানে, আসি। 'চলি' বলতে আমার ভালো লাগে না। চলি, নাস্তাসিয়া... ওঃ, আবার সেই 'চলি' বলে ফেললাম..."

পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না সোনিয়াকেও বিদায় সম্ভাষণ জানাতে যাচ্ছিল, কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক সেটা তার পক্ষে সম্ভব হল না। ব্যস্তসমস্ত ভাব দেখিয়ে বেরিয়ে পড়ল ঘর ছেড়ে।

কিন্তু আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না যেন তার নিজের পালা কখন আসবে সেই

প্রতীক্ষায় ছিল। মাকে অনুসরণ করে সোনিয়ার পাশ দিয়ে যাবার সময় এতটুকু হেলাফেলা না করে, ভদ্রভাবে, দস্তুরমতো মাথা নুইয়ে তাকে নমস্কার জানাল। বিব্রত হয়ে সোনিয়াও মাথা নোয়াল, কিন্তু কেমন যেন তাড়াহুড়ো করে, ভীতসন্ত্রস্তভাবে। এমনকি তার মুখে ফুটে উঠল বেদনার চিহ্ন— মনে হল আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার ভদ্রতা ও মনোযোগ তার কাছে দুর্বিষহ, পীড়াদায়ক।

"দুনিয়া, আয় তাহলে," ইতিমধ্যে দরজার কাছে এসে চেঁচিয়ে বলল রাস্‌কোল্‌নিকভ। "দে, তোর হাতটা বাড়িয়ে দে, বিদায় নিই।"

"বাঃ, তখন দিলাম না। ভুলে গেলি নাকি?" আনাড়ির মতো ওর দিকে ফিরে তাকিয়ে দরদভরা গলায় দুনিয়া বলল।

"তাতে কী হয়েছে? আরেকবার দে।"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ সজোরে ওর আঙুলে চাপ দিল। দুনিয়া হাসল ওর দিকে তাকিয়ে। লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, ঝটপট হাত ছাড়িয়ে মা'কে অনুসরণ করল। কোন কারণে তাকেও এখন বেশ সুখী মনে হচ্ছিল।

"বেশ, তাহলে তো চমৎকার।" যথাস্থানে ফিরে এসে সোনিয়ার দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল। "হে প্রভু, মৃতদের আত্মার শান্তি হোক, যারা জীবিত তাদের জীবনধারণ করতে দাও। তাই না? ঠিক বলেছি কিনা? তাই তো?"

বলতে-বলতে রাস্‌কোল্‌নিকভের চোখ-মুখ আচম্বিতে এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল যে সোনিয়া পর্যন্ত তা দেখে অবাক হয়ে গেল। রাস্‌কোল্‌নিভ্ কয়েক মুহূর্ত নীরবে একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমকের মতো তার স্মৃতিতে হঠাৎ জেগে উঠল সোনিয়ার সমস্ত বৃত্তান্ত যা সোনিয়ার পরলোকগত পিতার মুখে সে শুনেছিল।

"হা ভগবান। একী জ্বালা, দুনিয়া, মা আমার।" রাস্তায় বের হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পুল্‌খেরিয়া আলক্সান্দ্রভ্‌না বলে উঠল। "বেরিয়ে এসে যেন সত্যি-সত্যি বাঁচলাম। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম বাপু। গতকাল যখন ট্রেনে ছিলাম তখন কি ভাবতে পেরেছিলাম যে এই দেখেও আনন্দ পেতে হবে।"

"আঃ, মা, কতবার বলব তোমাকে যে ও এখনও অসুস্থ। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না? হয়ত আমাদের কথা ভেবে-ভেবেই ওর মনের এই অবস্থা। একটু উদার হলে কিন্তু অনেক কিছু ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে পেতে... অনেক কিছুই।"

"কিন্তু তুই তো তেমন উদার মনের পরিচয় দিসনি।" পুলখেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না সঙ্গে-সঙ্গে হিংসায় ফেটে পড়ে উত্তেজিতভাবে তাকে বাধা দিয়ে বলল। "জানিস, দুনিয়া, তোদের দুজনকে আমি দেখছিলাম— আমার মনে হচ্ছিল কি, তুই ওর অবিকল ছবি— চেহারায় ততটা নয়, যতটা স্বভাবে। তোরা দুজনেই সব

সময় মনমরা, দুজনেই গোমড়া আর বদমেজাজি, তোদের দুজনেরই নাক উঁচু, আবার মনও বেশ বড়।... এমন তো হতে পারে না যে ও স্বার্থপর? তাই না দুনিয়া?... কিন্তু আজ সন্ধ্যায় আমাদের ভাগ্যে কী ঘটতে পারে তা ভেবে আমার বুক কাঁপছে।"

"কিছু ভেবো না গো মামণি, যা হবার তাই হবে।"

"ওরে দুনিয়া, একবার ভেবে দ্যাখ আমাদের এখনকার অবস্থাটা! পিওতর পেত্রোভিচ্ যদি বেঁকে বসেন তখন কী হবে?" বেচারি পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নার মুখ দিয়ে হঠাৎ অসতর্কভাবে বেরিয়ে গেল।

"তা এরপরে ওঁর কী মূল্য থাকবে বল?" উত্তরে অবজ্ঞার ভঙ্গিতে তীক্ষ্নস্বরে বলল দুনিয়া।

"আমরা যে এখন বেরিয়ে এসেছি সেটা ভালোই করেছি," কথার মাঝখানে পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না তাড়াতাড়ি বলে উঠল। "ওর আবার কোথায় কাজে বের হওয়ার তাগিদ ছিল। যাক গে, একটু ঘোরাঘুরি করে আসুক, কিছুটা হাওয়া খাক অন্তত।...ওঃ কী সাঙ্ঘাতিক গুমোট ওর ঘরে!... কিন্তু এখানে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো হাওয়াই বা কোথায়? এখানে তো রাস্তায়ও দেখছি বদ্ধ ঘরের মতো অবস্থা! হা ভগবান, এ কী শহর!... দাঁড়া, সরে দাঁড়া। ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাবি কিন্তু। কী একটা যেন বয়ে আনছে লোকে ধরাধরি করে! ও, এযে দেখছি একটা পিয়ানো! বাব্বা, যা ধাক্কাধাক্কি!... আর হ্যাঁ, ওই মেয়েটার ব্যাপারেও আমার বড় ভয়।...."

"কোন্ মেয়েটা, মা?"

"ওই যে সেই সোফিয়া নামে মেয়েটা, যে সবে ঢুকল..."

"তাতে কী হল?"

"আমার মনের মধ্যে কেমন যেন খচখচ করছে রে দুনিয়া। বিশ্বাস করিস আর না করিস, মেয়েটা যে মুহূর্তে ঘরে ঢুকল অমনি আমার মনে হল মূল কারণ তা হলে এখানে!..."

"ওখানে মোটেই কিছু নেই মা!" বিরক্ত হয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল দুনিয়া। "তুমি কী! আর কী সব তোমার উদ্ভট আশঙ্কা, মা! মেয়েটার সঙ্গে ওর পরিচয় মাত্র গতকাল, তখন ঘরে ঢুকতে রোদিয়া ওকে চট্ করে চিনতে পর্যন্ত পারেনি— দেখলে তো!"

"বেশ, দেখবি তখন!... আমি সহ্য করতে পারছি না। দেখবি, পরে টের পাবি! যা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি! আমার দিকে চেয়ে আছে তো আছেই... এমন চোখ করে... আমার তো চেয়ার থেকে পড়ে যাবার মতো অবস্থা! আর রোদিয়া পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল কী ভাবে, মনে আছে? আমার অদ্ভুত ঠেকছে— পিওতর পেত্রোভিচ্ মেয়েটার সম্পর্কে যা লিখেছেন তার পরেও ও কিনা আমাদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল, আবার তোর সঙ্গেও! তার মানে মেয়েটাকে ও ভালোবাসে!"

"লিখলেই হয়ে গেল! আমাদের সম্পর্কেও লোকে কত কথা বলেছে, লিখেছেও—এর মধ্যে ভুলে গেলে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস,... মেয়েটা বেশ ভালো, ওসব রাবিশ!"

"ভগবান করুন, তাই যেন হয়!"

"আর পিওতর পেত্রোভিচ্ একটা অতি বাজে ধরনের কুৎসারটনাকারী!" আচমকা বলে উঠল দুনিয়া।

পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না সঙ্গে-সঙ্গে দমে গেল। কথাবার্তায় ছেদ পড়ল।

"হ্যাঁ শোন, তোমার সঙ্গে আমার দরকারি কথাটা সেরে নিই..." বলতে-বলতে রাজুমিখিনকে জানলার কাছে টেনে নিয়ে গেল রাস্‌কোল্‌নিকভ্।

"তাহলে কাতেরিনা ইভানোভ্‌নাকে আমি এই কথাই বলব যে আপনি আসছেন..." বিদায় নেবার উদ্দেশ্যে নিচু হয়ে নমস্কার জানিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল সোনিয়া।

"একটু অপেক্ষা করুন, আমাদের কোন গোপনীয়তা নেই, আপনার জন্যে আমাদের কোন ব্যাঘাত ঘটছে না।... আরও দু-একটা কথা বলার ছিল আপনাকে।... আচ্ছা, হ্যাঁ..." কথাটা শেষ না হতেই আচমকা বন্ধ করে দিয়ে রাজুমিখিনের দিকে ফিরে সে বলল, "তুমি তো জান... ওকে...ওই যে কী বলে নামটা?... পর্‌ফিরি পেত্রোভিচকে?... তাই না?"

"জানি না আবার! আত্মীয় হয়। কিন্তু কী ব্যাপার বল তো?" কৌতূহলে তার তখন ফেটে পড়ার মতো অবস্থা।

"ওই মামলাটা... আরে ওই যে খুনের মামলাটা...যার কথা তোমরা গতকাল বলাবলি করছিলে.... সেটা ওর হাতে আছে, তাই না?"

"হ্যাঁ... তো কী?" রাজুমিখিনের চোখ সঙ্গে-সঙ্গে বড়-বড় হয়ে গেল।

"যারা যারা বন্ধক দিয়েছিল পর্‌ফিরি তাদের জিগ্‌গেস করেছিল, কিন্তু বুড়ির কাছে আমারও কিছু জিনিস বন্ধক ছিল। অবশ্য তেমন দামি কোন জিনিস নয়—তবে, বোনের দেওয়া একটা আংটি... স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে আমাকে দিয়েছিল। আর বাবার রুপোর ঘড়ি। সব মিলিয়ে রুবল পাঁচ-ছয় দাম হবে। কিন্তু আমার কাছে দামি কেননা স্মৃতিচিহ্ন। এখন কী করা যায় বল দেখি। জিনিসগুলো হাতছাড়া হয়ে যায় এটা চাই না— বিশেষ করে ঘড়িটা। এইমাত্র, যখন দুনিয়ার ঘড়ি নিয়ে কথা হচ্ছিল, তখন এই ভেবে ভয়ে আমার বুক দুরদুর করছিল যে মা এখনই ওটা একবার দেখতে চাইবে। বাবার এই একটামাত্র জিনিসই স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রয়ে গেছে। ওটা খোয়া গেলে মার মনের অবস্থা সঙ্গীন হবে। হাজার হোক মেয়েমানুষের মন! তাই বলছিলাম, কী করা যায় একটা পরামর্শ দাও! জানি যে পুলিসের কাছে রিপোর্ট করা উচিত। তার চেয়ে ভালো হয় না কি সরাসরি পর্‌ফিরির কাছে গেলে? কী বল?

তোমার কী মনে হয়? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার। দেখা যাবে হয়ত খেতে বসার আগেই মা চেয়ে বসবে!"

"না থানা-পুলিস মোটে নয়। অতি অবশ্য পর্‌ফিরির কাছে যেতে হয়!" অস্বাভাবিক রকম উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল রাজুমিখিন। "ওঃ কী খুশিই না আমি হলাম! তাহলে আর দেরি করা কেন? এখান থেকে মাত্র দু পা। ওকে ঠিক পেয়ে যাব!"

"তাহলে আর কি? চল।..."

"তাছাড়া তোমার সঙ্গে আলাপ হলে ও বড় খুশি হবে। বেজায় খুশি হবে। ওঃ কী খুশিই যে হবে! তোমার সম্পর্কে অনেক কথা আমি ওকে বলেছি, নানা সময়ে।... গতকালও বলেছি। চল!... তুমি তাহলে জানতে ওই বুড়িকে? বটে, বটে!... বা, চ-মৎ- কার দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা!... ও, হ্যাঁ... সোফিয়া ইভানোভ্‌না..."

"সোফিয়া সেমিওনভ্‌না," শুধরে দিল রাস্‌কোল্‌নিকভ। "সোফিয়া সেমিওনভ্‌না, এ আমার বন্ধু রাজুমিখিন। বড় ভালো লোক..."

"আপনার যদি এখন যেতেই হয়..!" রাজুমিখিনের দিকে একেবারে না তাকিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সোনিয়া, কিন্তু তার ফলে আরও বেশি বিব্রত হয়ে পড়ল।

"চল তাহলে," রাস্‌কোল্‌নিকভ্ স্থির করল। "আমি আজই আপনার ওখানে একবার যাব, সোফিয়া সেমিওনভ্‌না। আমাকে শুধু বলুন, আপনি কোথায় থাকেন।"

সে যে ঠিক বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল তা নয়, কিন্তু এমনভাবে কথা বলছিল যেন তার তাড়া আছে। সোনিয়ার দৃষ্টি সে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। সোনিয়া ওকে তার ঠিকানা দিল। ঠিকানা দিতে গিয়ে লজ্জায় লাল হয়ে গেল। সকলে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

"দরজা তালা বন্ধ কর না নাকি?" ওদের পেছন-পেছন সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রাজুমিখিন জিগ্‌গেস করল।

"কখনই করি না!... অবশ্য তালা কিনব-কিনব করে দু-বছর কেটে গেল," তাচ্ছিল্যভরে সে যোগ করল। যাদের তালাবন্ধ করে রাখার মতো কিছু থাকে না তাদের মতো ভাগ্যবান আর কে আছে?" হাসতে-হাসতে সোনিয়ার দিকে ফিরে সে বলল।

বাইরে ফটকের কাছে এসে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল।

"আপনি ডান দিকের রাস্তা ধরবেন তাই না সোফিয়া সেমিওনভ্‌না? হ্যাঁ, ভালো কথা, আমাকে খুঁজে বার করলেন কী করে?" যেন সম্পূর্ণ অন্য একটা কিছু বলার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এই প্রশ্নটি করল। তার বড় ইচ্ছে হচ্ছিল ওর শান্ত উজ্জ্বল দু চোখের খেলা তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে। কিন্তু সে,ব্যাপারে তেমন সফল সে হল না।...

"কিন্তু আপনি তো গতকাল পোলিয়াকে ঠিকানা দিয়েছিলেন!"

"পোলিয়া? ও হ্যাঁ... পোলেন্‌কা! ওই যে সেই... ছোট্ট মেয়েটি... আপনার বোন? ওকে আমি ঠিকানা দিয়েছিলাম বুঝি?"

"কেন, আপনি ভুলে গেলেন নাকি?"

"না... মনে আছে..."

"আমি কিন্তু আমার বাবার কাছ থেকে আগেই শুনেছি আপনার কথা।... তখন অবিশ্যি আপনার নাম জানতাম না, উনি নিজেও জানতেন না।... এখন এলাম... গতকাল আপনার নাম জানার পর... আজ জিগ্‌গেস করলাম: এখানে মিস্টার রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ কোথায় থাকেন?... আমার জানা ছিল না যে আপনিও ভাড়াটেদের কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া এরকম একটা বাড়িতে থাকেন।... চলি।... আমি তাহলে কাতেরিনা ইভানোভ্‌নাকে..."

শেষপর্যন্ত ছাড় পাওয়ায় সোনিয়া ভারি খুশি। চোখ নিচু করে সে দ্রুত পা চালাল। তার উদ্দেশ্য ছিল কোনমতে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের দৃষ্টির আড়ালে সরে যাওয়া । যে কোন ভাবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাস্তার ডান দিকের মোড় পর্যন্ত এই দশ পা পেরোলেই সে একা... তারপর আপন মনে দ্রুত পথ চলতে পারে। তখন কারও দিকে না তাকিয়ে... কোনকিছুর দিকে নজর না দিয়ে ওর এই সাক্ষাতের প্রতিটি পরিস্থিতি এবং এইসময় বলা প্রতিটি কথা সে মনে আনার চেষ্টা করতে পারে, তাই নিয়ে ভাবতে পারে, মনে-মনে জল্পনা-কল্পনা করতে পারে। কিছুক্ষণ আগে যেন পুরোপুরি একটা নতুন জগতের ছায়া-ছায়া রূপ তার অজ্ঞাতসারে কোন সুযোগে মনের ভেতরে এসে বাসা বেঁধে বসেছে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ নিজে আজ তার ওখানে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে— হয়ত এই সকালবেলাতেই, হয়ত বা এই কিছুক্ষণের মধ্যে!

"না না, আজ নয়, দোহাই আপনার, আজকের দিনটা বাদ দিয়ে!" দুরু-দুরু বুকে বিড়বিড়িয়ে সে বলল— যেন কোন শিশু ভয় পেয়ে কারও কাছে অনুনয়-বিনয় করছে। "হায়, হায়! আমার কাছে... এই ঘরে... উনি দেখে ফেলবেন... হা ভগবান!"

বলাই বহুল্য একজন অপরিচিত লোক যে তার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে এবং পদে-পদে তাকে অনুসরণ করছে তখন, সেই মুহূর্তে লক্ষ করার মতো মনের অবস্থা তার ছিল না। সোনিয়া যখন ফটক থেকে বেরিয়ে এলো তখন থেকে সে তাকে অনুসরণ করছিল। ওরা তিনজন— রাজুমিখিন, রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ ও সোনিয়া যখন দুটো কথা বলার জন্য ফুটপাতে দাঁড়িয়ে পড়ল, তখন তাদের পাশ কাটিয়ে যেতে-যেতে 'আজ জিগ্‌গেস করলাম: এখানে মিস্টার রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ কোথায় থাকেন...' এই কথাগুলো দৈবাৎ কানে যেতে পথচারীটি যেন হঠাৎ চমকে উঠল। যেতে-যেতে সে চটপট হলেও বেশ মনেযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করল ওদের তিনজনকেই— বিশেষত রাসকোল্‌নিকভ্‌কে, যাকে উদ্দেশ্য করে সোনিয়া কথাগুলো বলেছিল। তারপর বাড়ির দিকে তাকিয়ে সেটা চিনে রাখল। সমস্ত

কাজটা সে করে ফেলল মুহূর্তের মধ্যে, চলতে-চলতে। এমনকি অভিসন্ধি যাতে ধরা পড়ে না যায় সেই উদ্দেশ্যে পায়ের গতি কিছুটা কমিয়ে দিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। মনে হচ্ছিল কিছু একটার প্রতীক্ষায় আছে। সে সোনিয়ার অপেক্ষায় ছিল। দেখতে পাচ্ছিল ওরা সোনিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে এবং সোনিয়া তখন হয়ত নিজের বাড়ির দিকেই কোথাও যাবে।

'নিজের বাড়ি বলতে কোথায়? কোথায় যেন দেখেছি এই মুখ,' সোনিয়ার মুখটা কোথায় দেখেছে মনে করার চেষ্টা করতে-করতে সে ভাবল... 'জানা দরকার।'

মোড় পর্যন্ত গিয়ে লোকটা রাস্তার উলটো দিকে চলে গেল। ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেল সোনিয়া এবারে চলছে তার পেছন-পেছন, একই রাস্তা ধরে। কোন কিছু ওর নজরে পড়ছে না। মোড় পর্যন্ত গিয়ে সেও ঘুরে ঠিক এই রাস্তাটাই ধরেছে। লোকটা উলটো দিকের ফুটপাত থেকে সোনিয়ার ওপর ক্রমাগত নজর রাখতে-রাখতে তাকে অনুসরণ করতে লাগল। পঞ্চাশ গজ মতন যাবার পর সে আবার রাস্তা পেরিয়ে, সোনিয়া যে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সেই পাশে চলে এলো, তার নাগাল ধরে ফেলল। পাঁচ পা মতন দূরত্ব বজায় রেখে তাকে অনুসরণ করে চলল।

লোকটার বয়স বছর পঞ্চাশেক। উচ্চতায় সে মাঝারি গড়নের একটু ওপরে হবে। ভারী গোছের শরীর, চওড়া কাঁধজোড়া ঢালু হয়ে দুধারে নেমে গেছে, ফলে তাকে খানিকটা কোলকুঁজো দেখায়। পোশাক-পরিচ্ছদ কায়দাদুরস্ত, ফিটফাট। চালচলন দেখে বড় ঘরের মানুষ বলেই মনে হয়। হাতে আনকোরা একজোড়া দস্তানা, চমৎকার একটা বেতের ছড়ি, প্রতিপদক্ষেপে ফুটপাতের ওপর ঠুকছিল। গালের হাড় বার করা প্রশস্ত মুখখানা— বেশ ভালো লাগার মতো দেখতে। মুখের ত্বকে এমন একটা সজীবতা আছে যা পিটার্সবুর্গের লোকদের মধ্যে দেখা যায় না। মাথার চুল এখনও বেশ ঘন, সম্পূর্ণ বাদামি, তাতে সামান্য পাক ধরেছে। চওড়া ঘন দাড়িটা কোদালের আকারে নেমে এসেছে বুকের ওপর, মাথার চুলের চেয়েও হালকা তার রং। চোখজোড়া নীল, চোখের দৃষ্টি স্থির, নিস্পৃহ, চিন্তাচ্ছন্ন। ঠোঁটজোড়া লাল টকটকে। মোট কথা, ভদ্রলোক অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী, বয়সের তুলনায় তাকে অনেক কম দেখায়।

সোনিয়া যখন খালপাড়ে এসে পড়ল তখন ফুটপাতে ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। সেই সময় সোনিয়াকে ভালোমতো দেখার সুযোগ পাওয়ায় সে তার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত ও অন্যমনস্ক ভাব লক্ষ করল। সোনিয়া তার বাড়ির কাছে এসে ফটকের ভেতরে মোড় নিলে সে যেন খানিকটা আশ্চর্য হয়েই তার পেছন-পেছন চলল। আঙিনায় ঢুকে সোনিয়া পা বাড়াল ডান দিকের কোনায়, যেখানে তার ঘরে যাবার সিঁড়ি। 'বাঃ!' অজানা ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে অস্ফুটস্বরে বেরিয়ে এলো। সোনিয়ার পেছন-পেছন সেও সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। একমাত্র তখনই

সোনিয়া তাকে দেখতে পেল। তিনতলায় উঠে লম্বা করিডর ধরে ডান দিকে ঘুরে গিয়ে সোনিয়া ঘণ্টা বাজাল নয় নম্বর ঘরে। দরজার গায়ে চক দিয়ে লেখা: 'কাপেরনাউমভ-টেইলর'। "বাঃ!" —এবারেও ঘটনাচক্রে এই অদ্ভুতরকম যোগাযোগ দেখে বিস্ময়োক্তি বেরিয়ে এলো অচেনা ব্যক্তিটির মুখ থেকে। সে ঘণ্টা বাজাল পাশের আট নম্বর ঘরে। দুটো ঘরের দরজার মাঝখানের ব্যবধান বড়জোর ছয় পা।

"আপনি কাপেরনাউমভের এখানে উঠেছেন বুঝি?" সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসতে-হাসতে সে বলল। "গতকাল আমার ওয়েস্টকোটটা অলটার করে দিয়েছে। আমি আছি এখানে, আপনার পাশে, মাদাম গের্ট্রুড কার্লভ্না রেস্‌লিখের ঘরে। কেমন যোগাযোগ দেখুন!"

সোনিয়া মনোযোগ দিয়ে ভদ্রলোককে দেখল।

"আমরা তাহলে পড়শী," আগন্তুকের কণ্ঠে খুশির আভাস। "আমি আজ সবে তিন দিন হল শহরে এসেছি। আচ্ছা, আপাতত এই পর্যন্ত। পরে আবার দেখা হবে।"

সোনিয়া কোন জবাব দিল না। দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে সে ভেতরে চলে গেল। লজ্জায় কেন যেন জড়সড় হয়ে পড়ল।...

পর্‌ফিরির কাছে যাবার পথে রাজুমিখিনকে বিশেষভাবে উৎসাহিত দেখাচ্ছিল।

"এটা ভাই, চমৎকার," সে বারকয়েক বলল। "আমি খুশি, আমি খুব খুশি।"

'খুশির কী কারণ থাকতে পারে তোমার?' রাস্‌কোল্‌নিকভ মনে-মনে ভাবল।

"আমি তো জানতামই না যে বুড়ির কাছে তোমারও জিনিস বন্ধক দেওয়া ছিল। আচ্ছা... আচ্ছা কবেকার ঘটনা? মানে, তুমি কবে গিয়েছিলে ওর কাছে?"

'একেবারেই নিরেট দেখছি!' রাস্‌কোল্‌নিকভ মনে-মনে ভাবল। মুখে বলল: "কবে?"... তারপর একটু থেমে মনে করার চেষ্টা করতে-করতে বলল, "ও হ্যাঁ বুড়ি মারা যাবার দিনতিনেক আগে ওর ওখানে গিয়েছিলাম মনে হচ্ছে। ভালো কথা, আমি কিন্তু এখন বন্ধকের জিনিস ছাড়াতে যাচ্ছি না," জিনিসগুলোর সম্পর্কে একটু বেশিরকমের উদ্বেগ আর কেমন যেন একটা তাড়াহুড়োর ভাব দেখিয়ে সে হঠাৎ বলে উঠল। "আমার অবস্থা আবার সেই আগের মতো— আছে সাকুল্যে একটা রুপোর রুবল!... গতকাল সেই যা-তা একটা বিকারের মধ্যে থাকার ফলে..."

বিকার কথাটার ওপর সে বিশেষ জোর দিল।

"হ্যাঁ, তা ঠিক, তা ঠিক," বোঝা গেল না ঠিক কী কারণে সায় দিয়ে রাজুমিখিন চটপট বলে উঠল। " তাই বল, এইজন্যেই না তখন... তুমি খানিকটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলে...জান, প্রলাপ বকার সময়ও তুমি কোথাকার কোন্ আংটি আর চেইনের কথা বারবার বলছিলে।... হুঁ, বুঝেছি, বুঝেছি,... এখন পরিষ্কার হল, সব পরিষ্কার হল।"

'বোঝ কাণ্ড! এই চিন্তাটা তাহলে ওদের মাথায় এসেছে! এখানে এই যে মানুষটা, এ কিন্তু আমার জন্যে জান দিয়ে দেবে অথচ দেখ, প্রলাপ বকার সময় আংটির উল্লেখ আমি কেন করেছিলাম সেটা *পরিষ্কার হয়ে গেল* ভেবে ও কেমন খুশি! জিনিসটা তাহলে ওদের সকলের মাথাতেই বেশ গেঁথে বসেছে!...'

"ওকে পাওয়া যাবে তো?" সে মুখে বলল।

"পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে," রাজুমিখিন তাড়াতাড়ি বলে উঠল। ভারি চমৎকার ছোকরা, ভাই, দেখবে'খন। একটু উদ্ভট গোছের। মানে, বৈষয়িক জ্ঞান অবশ্য ওর বেশ টনটনে। আমি উদ্ভট গোছের বলছি অন্য অর্থে। বুদ্ধিমান, রীতিমতো বুদ্ধিমান, বোকা আদৌ নয়। কিন্তু ওর চিন্তা-ভাবনা কেমন যেন অদ্ভুত।... কারও ওপরে আস্থা নেই। সন্দেহবাদী... বিশ্বনিন্দুক।... লোকের মাথা গুলিয়ে দিতে ওস্তাদ।, মানে, মাথা গুলিয়ে দিতে ঠিক বলব না— লোককে বোকা বানাতে ওস্তাদ।...ওই সেই পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ আদায়ের পুরনো পদ্ধতি আর কি।... তবে নিজের কাজ জানে, বেশ ভালোই জানে।... গত বছর এমন একটা খুনের কেসের কিনারা করে, যেখানে সমাধানের সূত্র বলতে কিছু ছিল না— সব লোপাট হয়ে গিয়েছিল।.... তোমার সঙ্গে আলাপ করার ভারি ইচ্ছে, ভীষণ ইচ্ছে!"

"অত বেশি ইচ্ছে হওয়ার কারণ কী বল তো?"

"না, আমি বলছি না যে... মানে, ইদানীং তুমি যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে তখন প্রায়ই নানা প্রসঙ্গে তোমার উল্লেখ করতাম।... তা, ও শুনত।... তারপর যখন জানতে পারল যে তুমি আর্থিক অনটনের জন্য ল' পড়া শেষ করতে পারছ না, তখন বলল: 'বড় দুঃখের কথা।' তা থেকে আমি সিদ্ধান্ত করলাম... অর্থাৎ, শুধু এটাই নয়— সব কিছু মিলে আমার এই ধারণা। গতকাল জামিওতভ্... দেখ, রোদিয়া আমি কাল বাড়ি যাবার পথে মাতাল অবস্থায় আবোল-তাবোল অনেক কিছু বলেছি তোমাকে।... তাই, এখন আমার আশঙ্কা হচ্ছে ভাই তুমি হয়ত ওসব জিনিস বড় করে দেখতে পার। বুঝলে কিনা..."

"কী বলতে চাও? আমাকে লোকে পাগল ভাবে নাকি? বলা যায় না, সত্যিই হয়ত তাই।"

সে জোর করে হাসল।

"হ্যাঁ...হ্যাঁ... ধুত্তোর, কী বলছি... মানে, না!... তবে আমি যা যা বলেছি... আরও অন্যান্য জিনিসের কথাও বলছি... সে সবই রাবিশ... মদের ঘোরে।"

"কিন্তু তোমার ক্ষমা চাইবার কী আছে? ওঃ এ কী জ্বালা!" ভীষণ বিরক্ত হয়ে রাসকোল্‌নিকভ্ চিৎকার করে উঠল। তার এই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে খানিকটা ভানও ছিল।

"জানি, জানি, বুঝি। বিশ্বাস কর ভাই আমি বুঝি। মুখে বলতে পর্যন্ত লজ্জা হয়..."

"লজ্জা যখন হয় তখন আর বোলো না!"

দুজনেই চুপচাপ। রাজুমিখিন আনন্দে ডগমগ। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ সেটা অনুভব করতে পারছিল। দেখে তার গা জ্বালা করছিল। রাজুমিখিন এইমাত্র পর্‌ফিরি সম্পর্কে যে কথা বলল সেটাও ওর কাছে উদ্বেগজনক।

'এই লোকটার কাছেও কাঁদুনি গাইতে হবে' ভাবতে-ভাবতে তার মুখ ফেকাসে হয়ে গেল, বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল। '...গাইতে হবে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক ক'রে। সবচেয়ে স্বাভাবিক হয় একেবারে না গাইলে, যাতে কিছু না গাইতে হয় সে চেষ্টা করা! উঁহু *চেষ্টা করাটাও* আবার স্বাভাবিক হবে না। ... যাক গে, ওখানে গিয়ে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।... দেখব'খন... এখন...এই যে আমি যাচ্ছি, এটা ভালো, না খারাপ? এ যে পতঙ্গ নিজে থেকে প্রদীপের আলোর পানে উড়ে চলেছে। বুক কেমন ধড়ফড় করছে। ...এটা তো ভালো কথা নয়।...'

"এই যে এই ছাইরঙা বাড়িটাতে", রাজুমিখিন বলল।

আবার রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ ডুবে গেল তার নিজের চিন্তায়। 'সবচেয়ে বড় কথা, পর্‌ফিরি জানে কিনা যে গতকাল আমি ডাইনীটার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম... এবং রক্তের কথা জিগ্‌গেস করেছিলাম। সেটা জানতে হবে পলকের মধ্যে, ঘরে প্রথম পা ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে, জানতে হবে মুখ দেখে। নইলে... না, জানতে আমাকে হবেই— যে কোন মূল্যে!'

"একটা জিনিস জান কি," ধূর্ত হাসি হেসে রাজুমিখিনের দিকে ফিরে হঠাৎ সে বলল, "আমি, ভাই আজ সকাল থেকে একটা ভীষণ অস্থির-অস্থির ভাব লক্ষ করছি তোমার মধ্যে। ঠিক বলিনি?"

"কিসের অস্থিরতা? এতটুকু নেই, একেবারে নেই," রাজুমিখিন চমকে উঠল।

"না ভাই, সত্যি-সত্যি লক্ষ করার মতো। ওই যে তখন তুমি চেয়ারে বসে ছিলে, বলতে গেলে চেয়ারের একেবারে ধারে, অমনভাবে তুমি কিন্তু কখনও বস না বাপু। তাছাড়া তোমার সারা শরীরও কেমন যেন থেকে-থেকে কাঁপছিল একটু-একটু করে। কারণে-অকারণে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠে পড়ছিলে। কী কারণে কে জানে, কখনও রেগে যাচ্ছিলে, কখনও বা তোমার ওই শ্রীমুখখানা মিছরির মতো মিষ্টি দেখাচ্ছিল। বিশেষ করে দুপুরের খাওয়ার নেমন্তন্ন পেয়ে তোমার মুখখানা যা লাল হয়ে উঠল!"

"মোটেই না। একদম বাজে কথা।... কী সব যা তা বলছ?"

"বলছি এই যে তুমি ঠিক একটা স্কুলের ছেলের মতো ঘুরঘুর করছ! ছিঃ। ওই দেখ, আবার লাল হয়ে গেল!"

"ওঃ সত্যি। তুমি... তুমি একটা শুয়োর।"

"আহা, অত ঘাবড়ানোর কী আছে... রোমিও? দাঁড়াও, আজই এটা চাউর করতে

হবে কোথাও-কোথাও। হাঃ- হাঃ- হাঃ! মা'কে তো ঠিক হাসিয়ে ছাড়ব।... তাছাড়া আরও কারও-কারও কাছে গল্প করব।..."

"শোনো, শোনো বলছি, ব্যাপারটা কিন্তু গুরুতর। সত্যি বলছি!... এরপর আমার আর কী করার আছে! দূর ছাই!" আতঙ্কে শিউরে উঠে দিশেহারা হয়ে রাজুমিখিন বলল। "কী বলবে তুমি ওদের? আমি, ভাই... ধুত্তোর! তুমি একটা আস্ত শুয়োর!"

"আহা, বসন্তের গোলাপ আমার! কী চমৎকার মানায় তোমাকে, যদি তুমি জানতে! ছয় ফুট ঢ্যাঙা রোমিও! বাঃ, বেশ সাফসুতরো হয়েছ তো হে আজ! হাতের নখও সাফ করেছ, অ্যাঁ? এর আগে কবে এমন দেখা গেছে! মাইরি, মাথায় আবার ফুলেল তেল দেওয়া হয়েছে! আহা, মাথাটা একটু নোয়াও দেখি!"

"শুয়োর কোথাকার!"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ প্রাণভরে হাসতে লাগল, মনে হল সে যেন আর নিজেকে সামলাতে পারছে না। হাসতে-হাসতেই ঢুকল পর্‌ফিরি পেত্রোভিচের ফ্ল্যাটে। এটাই দরকার ছিল রাস্‌কোল্‌নিকভের। ওরা যখন ঢোকার মুখে তখনও হো হো করে হাসছে। ভেতরের ঘর থেকে শোনা যাচ্ছিল সে হাসি।

"এখানে কিন্তু একটি কথাও নয়। কিছু বলেছ কি মাথার খুলি উড়িয়ে দেব!" রাসকোল্‌নিকভের কাঁধদুটো খপ্ করে চেপে ধরে ফিসফিসিয়ে বলল ক্ষিপ্ত রাজুমিখিন।

পাঁচ

ততক্ষণে ঘরের চৌকাট পেরিয়েছে রাস্‌কোলনিকভ্। ভেতরে ঢোকার সময় এমন ভাব করল যেন হাসির দমক চাপার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। পেছন-পেছন লেং-লেঙে পা ফেলে আনাড়ির মতো কাঁচুমাচু হয়ে ঢুকল রাজুমিখিন। সিঁদুরের মতো লাল টকটকে। সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ভয়ঙ্কর মূর্তি। আপাদমস্তক তার চেহারার মধ্যেই সেই মুহূর্তে ফুটে উঠেছিল সত্যি-সত্যি একটা হাস্যকর ভাব। ফলে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ যে সঙ্গত কারণেই হাসছিল তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। গৃহকর্তা ততক্ষণে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে এবং প্রশ্নসূচক দৃষ্টি মেলে তাদের দিকে তাকাচ্ছে দেখে রাসকোল্‌নিকভ্ পরিচিত হওয়ার অপেক্ষা না রেখেই মাথা নুইয়ে নমস্কার জানিয়ে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল নিজের পরিচিতি হিসাবে অন্তত দু'একটা কথা মুখ ফুটে বলার জন্য তখনও উল্লাসের ভাবটা চাপা দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সবে চেহারায় গাম্ভীর্য ফিরিয়ে এনে অস্ফুটস্বরে কিছু একটা বলতে যাবে এমন সময় যেন অনিচ্ছাকৃতভাবেই আবার রাজুমিখিনের দিকে দৃষ্টি পড়ে গেল— সঙ্গে-সঙ্গে সে বেসামাল হয়ে পড়ল: এতক্ষণ যাও বা আয়ত্তের মধ্যে ছিল সেই চাপা হাসি যেন সুযোগ পেয়ে আগের চেয়েও অসংযত উচ্ছ্বাসে ছুটে বেরিয়ে

এলো। যে রকম ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে এই 'দিলখোলা' হাসিকে রাজুমিখিন স্বাগত জানাল তাতে আগাগোড়া দৃশ্যটিতে রীতিমতো স্বতঃস্ফূর্ত খুশির ভাব এবং সবচেয়ে বড় কথা, স্বাভাবিকতা প্রকাশ পাচ্ছিল। রাজুমিখিন যেন উদ্দেশ্যমূলকভাবে আরও বেশি সাহায্য করল এ ব্যাপারে।

"ধুত্তোর! গোল্লায় যাক!" রাজুমিখিন হাত নাড়িয়ে গর্জন করে উঠে দুম্ করে চাপড় মেরে বসল ঘরের ছোট্ট গোল টেবিলটায়। টেবিলের ওপর যে খালি চায়ের গেলাসটা পড়ে ছিল সেটা ছিটকে ঝনঝন করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

"আহা টেবিল-চেয়ার ভাঙচুর করছেন কেন ভদ্রমহোদয়রা? এতে যে সরকারের ক্ষতি!" কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ্।

দৃশ্যটা দাঁড়াল এরকমঃ রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তখনও হেসে চলেছে। হাতটা যে গৃহকর্তার হাতের মধ্যেই ধরা আছে সে খেয়াল তার নেই। তবে মাত্রাজ্ঞানের অভাব তার ছিল না, তাই যত তাড়াতাড়ি পারা যায় স্বাভাবিকভাবে এর নিষ্পত্তি ঘটানোর উপযোগী মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল সে। টেবিলটা শেষ অবধি উলটে পড়ে যেতে টেবিলের ওধারে রাখা গেলাস চুরমার হয়ে গেল দেখে হতবুদ্ধি রাজুমিখিন মুখ কালো করে ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে বিরক্তিভরে থুতু ফেলল। তারপর ঝট করে ঘুরে জানলার কাছে সরে গেল। সকলের দিকে পিঠ করে চোখমুখ ভয়ঙ্কর পাকিয়ে আর কোনদিকে দৃকপাত না করে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ্ হাসল, পারলে আরও হাসত। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছিল, এর জন্য একটা ব্যাখ্যা তার দরকার ছিল। কোনায় একটা চেয়ারে বসে ছিল জামিওতভ্। অতিথিরা ঘরে ঢুকতে সে উঠে দাঁড়িয়েছিল। তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে প্রত্যাশার ভাব। মুখ হাসিতে বিস্ফারিত, কিন্তু সমস্ত দৃশ্যটাকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে হতভম্ব হয়ে, এমনকি কেমন যেন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে। বিশেষ করে অস্বস্তি হচ্ছে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে দেখে। অপ্রত্যাশিতভাবে এখানে জামিওতভের উপস্থিতি রাসকোল্‌নিকভের কাছে একটা অপ্রীতিকর চমক হয়ে দেখা দিল।

'এ দিকটাও ভেবে দেখতে হচ্ছে!' সে মনে-মনে ভাবল!

"মাফ করবেন, আমি... রাস্‌কোল্‌নিকভ্," চেষ্টা করে দিশেহারা ভাব ফুটিয়ে তুলে সে বলল।

"আহা, তাতে কী আছে! খুব খুশি হলাম। তাছাড়া আপনি যে ভাবে ঘরে ঢুকলেন তাতেও আনন্দ পেলাম।... এর আবার কী হল?... কাউকে নমস্কার-টমস্কার জানানোরও তোয়াক্কা রাখে না দেখছি," ইশারায় রাজুমিখিনেকে দেখিয়ে শেষ কথাগুলো বলল পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ্।

"ভগবানের দিব্যি, জানি না আমার ওপর অমন ক্ষেপে গেল কেন। পথে আসতে আসতে শুধু বলেছিলাম যে ওকে রোমিও-রোমিও দেখাচ্ছে আর... আর তার প্রমাণও দিয়েছি। এর বেশি কিছু হয়নি বলে মনে হচ্ছে।"

"শুয়োর কোথাকার!" মুখ না ফিরিয়েই প্রত্যুত্তরে বলে উঠল রাজুমিখিন।

"অতটুক একটা কথার জন্যে যখন অত রাগ তার মানে বুঝতে হবে খুব গুরুতর কোন কারণ আছে," পর্‌ফিরি হাসল।

"হুঃ! ভারি আমার গোয়েন্দা এসেছেন!... ধুত্তোর! নিকুচি করেছি তোমাদের সকলের!" তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল রাজুমিখিন। তারপর হঠাৎ নিজেই হেসে ফেলল। এমনভাবে হাসি-হাসি মুখ করে পিওতর পেত্রোভিচের দিকে এগিয়ে গেল, যেন কিছুই হয়নি।

"অনেক হয়েছে! আমরা সবাই একেকটি আহাম্মক। এবারে কাজের কথায় আসা যাক। এ হল আমার বন্ধু রোদিওন রমানোভিচ রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌, যার কথা অনেক শুনেছ। প্রথমত, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়, দ্বিতীয়ত, তোমার সঙ্গে একটা ছোটখাটো কাজও আছে ওর। আরে, এই যে! জামিওতভ্‌! তুমি আবার এখানে কী বলে? তোমাদের মধ্যে জানাশুনো আছে নাকি? অনেক দিনের চেনা?"

'এ আবার কী ব্যাপার?' রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল।

জামিওতভ্‌কে কেমন যেন বিব্রত দেখা গেল— তবে খুব একটা নয়।

"কাল, তোমার ওখানেই তো আলাপ হল," গা-ছাড়াভাবে সে বলল।

"তাহলে ভগবান আমাকে একটা দায় থেকে মুক্তি দিয়েছেন।" গত সপ্তাহে পর্‌ফিরি আমাকে অনেক করে বলছিল তোমার সঙ্গে যে ভাবে হোক আলাপ করিয়ে দিতে। এখন দেখছি, আমার সাহায্য ছাড়াই ব্যবস্থা করে নিয়েছ।... তোমার তামাক কোথায় রেখেছ?"

পর্‌ফিরি পেত্রোভিচের পরনে ঘরোয়া পোশাক— ড্রেসিংগাউন। গায়ের জামাকাপড় নিখুঁত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পায়ে একজোড়া ক্ষয়ে যাওয়া চটি। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, উচ্চতায় মাঝারির চেয়েও খাটো। মোটাসোটা, একটু ভুঁড়িও আছে। দাড়িগোঁফ কামানো, জুলফিও মোটা নয়। বিরাট গোল মাথার পেছন দিকটা অদ্ভুতরকম গোলাকার ও স্ফীত। মাথার চুল খুব ছোট-ছোট করে ছাঁটা। নাকটা একটু খাঁদা, গোলগাল ফোলাফোলা মুখ। মুখে অস্বাস্থ্যকর পাণ্ডুরতার প্রলেপ, তবে সেখানে প্রফুল্ল ভাব ও বিদ্রুপের হাসি সবসময় লেগে আছে। এমনকি সে মুখকে প্রসন্নও বলা যেত যদি না তার অন্তরায় হত চোখের প্রকাশভঙ্গি। চোখের সাদাটে পাতাদুটো অবিরাম পিটপিট করছে, দেখে মনে হয় যেন কাউকে চোখ টিপছে। পাতার নিচে চোখজোড়ায় চিকচিক করছে একধরনের জলীয় পদার্থ। এমনকি তার সমস্ত চেহারার মধ্যে যে একটা মেয়েলি ভাব আছে, চোখের এই দৃষ্টি যেন অদ্ভুতভাবে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন, আর এর ফলে প্রথম দৃষ্টিতে যেমন আশা করা যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুগম্ভীর দেখায় তাকে।

পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ্‌ যেইমাত্র শুনল যে আগন্তুকের একটা 'ছোটখাটো কাজ' আছে তার সঙ্গে, অমনি সে তাকে সোফায় এসে বসতে বলল, নিজে বসল আরেক প্রান্তে, তারপর আগন্তুকের ওপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তার মুখ থেকে কাজের বিবরণ শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল। তার মনোযোগ এত বেশি গভীর, এত তীব্র হয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল যে প্রথমবারে তা আপত্তিকর, এমনকি অসহ্য ঠেকে— বিশেষত অচেনা লোকের কাছে এবং বিশেষ করে সেই ক্ষেত্রে যখন সাক্ষাৎকারীর নিজেরই ধারণা তার বক্তব্যের ওপর যে অসাধারণ গুরুত্ব ও মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে সেটা তার আদৌ উপযুক্ত নয়। তবে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ সংক্ষেপে, গুছিয়ে, পরিষ্কার ও সঠিক ভাষায় তার কাজের কথাটা ব্যাখ্যা করার পর মনে-মনে বেশ খুশিই হল। শুধু তা-ই নয়, এই ফাঁকে পর্‌ফিরিকে সে ভালোমতো খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছে। পর্‌ফিরি পেত্রোভিচের চোখও বরাবর তার ওপর আটকে ছিল। একবারও চোখের দৃষ্টি তার ওপর থেকে সে সরায়নি। রাজুমিখিন জায়গা করে নিয়েছিল ওদের মুখোমুখি, সেই টেবিলটার ধারে। প্রবল উৎসাহে ছটফট করতে-করতে শুনে যাচ্ছিল ওদের বৃত্তান্ত। থেকে-থেকে যেভাবে একবার এর আরেকবার ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল তা যেন একটু মাত্রা ছাড়াই হয়ে যাচ্ছিল।

'বুদ্ধু!' মনে-মনে গালাগাল দিল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌।

"আপনাকে পুলিসের কাছে এজাহার দিতে হবে," কাজের লোকের মতো যতদূর সম্ভব গুরুগম্ভীর ভাব করে পর্‌ফিরি জানাল। "এই মর্মে জানাতে হবে যে অমুক ঘটনা সম্পর্কে... অর্থাৎ, এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে... অবগত হওয়ার পর আপনি উক্ত মামলার ভারপ্রাপ্ত তদন্তকারীর অবগতার্থে এতদ্দ্বারা অনুরোধ জানাচ্ছেন যে আপনি আপনার অমুক-অমুক জিনিস অর্থের বিনিময়ে ছাড়িয়ে নিতে ইচ্ছুক... এই গোছের কিছু একটা।... অবশ্য ওখানে...ওরাই আপনাকে লিখে দেবে।"

"কিন্তু ঘটনা এই যে..." যতদূর সম্ভব দিশেহারা ভাব ফুটিয়ে তুলে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ বলল, "আমার আদৌ কোন টাকাপয়সা নেই... এমনকি ওই সামান্য পরিমাণ খরচ করার মতো সঙ্গতিও আমার নেই।... দেখুন, আমি আপনাদের শুধু এটাই জানাতে চাই যে জিনিসগুলো আমার এবং যখন আমার সামর্থ্য হবে..."

"একই কথা," আর্থিক অবস্থার ব্যাখ্যার উত্তরে নিস্পৃহভাবে বলল পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ। "অবশ্য হ্যাঁ আপনি যদি চান তো সরাসরি আমাকেও লিখতে পারেন ওই একই মর্মে অর্থাৎ অমুক বিষয়ে অবগত হওয়ার পর ঘোষণা করছি যে অমুক-অমুক জিনিস আমার এবং আমার প্রার্থনা..."

"এটা সাধারণ কাগজে লিখলেই তো হবে?" এবারেও কাজের আর্থিক দিকটার প্রতি আগ্রহবশত ব্যস্ত হয়ে কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল রাস্‌কোল্‌নিকভ।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, একেবারে সাধারণ কাগজে!" বলতে-বলতে পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ্‌ হঠাৎ

একরকম প্রকাশ্যেই কেমন যেন বাঁকা হেসে তার দিকে তাকিয়ে চোখ কোঁচকাল, এমনকি মনে হল যেন তাকে চোখ টিপল। অবশ্য এটা রাস্‌কোল্‌নিকভের মনের ভুলও হতে পারে, কেননা এর স্থায়িত্ব ছিল মাত্র একটি মুহূর্ত। কিন্তু অন্ততপক্ষে ওইধরনের কিছু একটা যে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ হলফ করে বলতে পারে যে পর্‌ফিরি তার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপেছিল— কে জানে কেন।

'ও জানে কেন!' বিদ্যুৎ চমকের মতো তার মনে উদয় হল।

"এমন তুচ্ছ ব্যাপারে আপনাকে ব্যতিব্যস্ত করার জন্যে মাফ করবেন," খানিকটা হকচকিয়ে গিয়ে সে বলল। "জিনিস বলতে যা আছে তার দাম সাকুল্যে পাঁচ রুবল, কিন্তু আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান— যাদের কাছ থেকে পাওয়া, তাদের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। আমাকে তাই স্বীকার করতে হচ্ছে যে মুহূর্তে আমি জানতে পারলাম, আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম..."

"ও, তাই বল, সেইজন্যেই গতকাল যখন আমি কথায়-কথায় জোসিমভ্‌কে বলে ফেলি যে যারা-যারা বন্ধক দিয়েছিল পর্‌ফিরি তাদের জেরা করছে, তখন তুমি ধড়মড় করে উঠে বসেছিলে!" সুস্পষ্ট অভিসন্ধি নিয়ে রাজুমিখিন মন্তব্য করে বসল।

এটা একেবারে অসহ্য। রাগে রাস্‌কোল্‌নিকভের পিত্তি জ্বলে উঠল। আর সহ্য করতে না পেরে কালো চোখের ক্রুদ্ধ জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে তাকাল তার দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে সামলে নিল নিজেকে।

"তুমি আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছ নাকি ভাই?" বেশ কায়দা করে কৃত্রিম বিরক্তির সঙ্গে তাকে সে বলল। "আমি স্বীকার করছি, তোমার চোখে যা রাবিশ সেসব জিনিস নিয়ে আমি বড্ড বেশি উদ্বেগ প্রকাশ করছি। কিন্তু এই কারণে আমাকে স্বার্থপর বা লোভী মনে করাও ঠিক হবে না। ওই দুটো তুচ্ছ জিনিস আমার চোখে একেবারে রাবিশ নাও তো হতে পারে। আমি তোমাকে আগেই বলেছি যে ওই রুপোর ঘড়ি যার দাম হয়ত কানাকড়ি— আমার বাবার রেখে যাওয়া একমাত্র জিনিস। আমাকে নিয়ে মজা করতে হয় কর, কিন্তু আমার কাছে আমার মা এসেছে," এবারে হঠাৎ পর্‌ফিরির দিকে ঘুরে সে বলল, "মা যদি জানতে পারে..." আবার দ্রুত রাজুমিখিনের দিকে ফিরে বিশেষ চেষ্টা করে গলা কাঁপিয়ে বলল, "...যদি জানতে পারে যে ঘড়িটা খোয়া গেছে, তাহলে হলফ করে বলতে পারি তার মনের অবস্থা কী হবে! মেয়েমানুষের মন বলে কথা!"

"না না মোটেই নয়! আমি মোটেই সে অর্থে বলিনি! আমি যা বলতে চাইছিলাম তা একেবারে উলটো!" মনে দুঃখ পেয়ে রাজুমিখিন চেঁচিয়ে বলল।

'ঠিক আছে তো? স্বাভাবিক হচ্ছে তো? বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কি?' রাস্‌কোল্‌নিকভ্ পুলকিত হয়ে মনে-মনে ভাবল। 'মেয়েমানুষের মন' একথাটাই বা কেন বললাম?'

"ও, আপনার কাছে আপনার মা এসেছেন বুঝি?" কী কারণে যেন পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ অনুসন্ধিৎসু হয়ে পড়ল।

"হ্যাঁ।"

'কবে'?

"গতকাল সন্ধ্যায়।"

পর্‌ফিরি একটু চুপ করে থেকে কী যেন ভাবল।

"আপনার জিনিস কোন পরিস্থিতিতেই খোয়া যেত না," শান্ত ও নিরুত্তাপ কণ্ঠে সে বলে চলল। "আমি এখানে বেশ কিছুদিন হল আপনার অপেক্ষায় আছি।"

তারপর রাজুমিখিনকে নির্মমভাবে গালিচার ওপর যত্রতত্র সিগারেটের ছাই ঝাড়তে দেখে যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে সযত্নে ছাইদান এগিয়ে দিল তার দিকে। পর্‌ফিরির শেষ কথায় রাস্‌কোল্‌নিকভ্ চমকে উঠেছিল। কিন্তু তখনও রাজুমিখিনের সিগারেটের ছাই নিয়ে ব্যস্ত পর্‌ফিরির যেন তা চোখেই পড়ল না।

"কী বললে? অপেক্ষায় ছিলে বলছ! তুমি কি তাহলে জানতে যে ও *ওখানে* বন্ধক দিয়েছিল?" রাজুমিখিন চেঁচিয়ে উঠল।

পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ সরাসরি রাসকোল্‌নিকভকে উদ্দেশ্য করে বলল:

"আপনার দুটো জিনিসই— আংটি আর ঘড়ি— একটা কাগজে মুড়ে *ওর ওখানে* রাখা ছিল। কাগজের ওপর পেন্সিল দিয়ে স্পষ্ট করে লেখা ছিল আপনার নাম, সেই সঙ্গে যেদিন আপনার কাছ থেকে জিনিসগুলো পেয়েছিল সেই তারিখ আর মাসও।..."

"দারুণ নজর তো আপনার!" বিশেষ করে সরাসরি তার চোখের দিকে তাকানোর চেষ্টা করতে-করতে আনাড়ির মতো হাসতে গেল রাস্‌কোল্‌নিকভ্। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারল না— হঠাৎ যোগ করল: "আমি এইমাত্র যে মন্তব্য করলাম তার কারণ এই যে বন্ধক দিয়েছিল নিশ্চয়ই অনেক লোক... তাই সকলের নামধাম মনে রাখা সোজা নয়... অথচ আপনি সকলকে ঠিক মনে রেখেছেন, আর... আর..." তারপর মনে-মনে বলল, 'না, স্রেফ বোকামি! বড় দুর্বল! কেন যে এটা যোগ করতে গেলাম!'

"যারা যারা বন্ধক দিয়েছিল তাদের প্রায় সকলকে আমরা এখন জানি। বলতে গেলে একমাত্র আপনিই আসেননি," পরফিরির উত্তরের মধ্যে বিদ্রুপের আভাস প্রায় প্রচ্ছন্ন থাকল না।

"আমি খুব একটা সুস্থ ছিলাম না।"

"তা আমি শুনেছি। এও শুনেছি যে কোন একটা কারণে আপনি অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছিলেন। আপনাকে এখনও যেন ফেকাসে দেখাচ্ছে!"

"আদৌ না।... বরং একেবারে সুস্থ!" হঠাৎ সুর পালটে অভদ্রভাবে রাগতস্বরে বলে উঠল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌। ভেতরে-ভেতরে রাগে সে ফুঁসছিল, কিছুতেই রাগ চেপে রাখতে পারছিল না। 'কিন্তু রাগলেই তো মুখ দিয়ে সব বেরিয়ে যেতে পারে!' আবার বিদ্যুৎ চমকের মতো তার টনক নড়ল। 'কিন্তু ওরাই বা আমাকে অমন যন্ত্রণা দিচ্ছে কেন?'

"শোন কথা! খুব একটা সুস্থ ছিল না!" ওর কথার খেই ধরে রাজুমিখিন বলল। "যা খুশি বললেই হল! গতকাল পর্যন্ত বেহুঁশ অবস্থায়, ঘোরের মধ্যে ছিল।... বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, পর্‌ফিরি, দু-পায়ে খাড়া হতে পারে না এমন অবস্থা— অথচ যেই আমরা— মানে, আমি আর জোসিমভ্‌ চোখের আড়াল হলাম, অমনি জামাকাপড় পরে চুপচাপ হাওয়া, প্রায় মাঝরাত অবধি কোথায়-কোথায় মজা করে বেড়াল কে জানে, আর এসবই করে বেড়িয়েছে, আমি তোমাকে বলতে পারি, সম্পূর্ণ ঘোরের মধ্যে— ভাবতে পার! খুবই অসাধারণ ঘটনা— তাই না?"

"সত্যিই কি *সম্পূর্ণ ঘোরের মধ্যে? ঠিক* বলুন তো!" কেমন যেন মেয়েলি ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল পর্‌ফিরি।

"একদম রাবিশ! বিশ্বাস করবেন না ওর কথা। অবিশ্যি আপনি অমনিতেও বিশ্বাস করছেন না!" ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মুখ ফসকে বলে ফেলল রাসকোল্‌নিকভ্‌। কিন্তু এই অদ্ভুত কথাগুলো যেন পর্‌ফিরি পেত্রোভিচের কানে গেল না।

"ঘোরের মধ্যে যদি না-ই হয় তাহলে তুমি বের হলে কী করে?" হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল রাজুমিখিন। "কেন বেরিয়েছিলে? কিসের জন্য?... আর বেরোলেই যদি, তো গোপনে কেন? তখন তোমার মাথায় কি সুস্থ চিন্তা ছিল? এখন সমস্ত বিপদ কেটে গেছে বলে আমি তোমাকে সরাসরি জিগ্‌গেস করছি।"

"কাল ওরা আমাকে একেবারে তিতিবিরক্ত করে ছেড়েছে," তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ও হঠাৎ পর্‌ফিরির দিকে ফিরে উদ্ধতস্বরে রাস্‌কোলনিকভ্‌ বলল। "আমি ওদের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম অন্য একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেব বলে, যাতে ওরা আমাকে খুঁজে না পায়। সেই উদ্দেশ্যে একগাদা টাকাকড়িও সঙ্গে নিয়েছিলাম। এই যে মিস্টার জামিওতভ্‌ও আমার কাছে টাকা দেখেছেন। আপনি কী বলেন, মিস্টার জামিওতভ্‌, গতকাল আমার মাথা ঠিক ছিল, নাকি আমি বিকারগ্রস্ত ছিলাম? আপনিই বিচার করে রায় দিন না হয়।"

এই মুহূর্তে মনে হয় পারলে সে জামিওতভ্‌কে টুঁটি টিপেই মেরে ফেলে। লোকটার চোখের দৃষ্টি আর তার মৌনভাব রাস্‌কোল্‌নিকভের আদৌ ভালো লাগছিল না।

"আমার মনে হয় আপনি রীতিমতো সুস্থ মস্তিষ্কে কথা বলছিলেন— এমনকি,

বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে। তবে হ্যাঁ, বড় বেশি উত্তেজিত দেখাচ্ছিল আপনাকে'' শুষ্ককণ্ঠে জানাল জামিওতভ।

''সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিকোদিম ফোমিচ আজ আমাকে বলছিলেন,'' ওদের কথার মাঝখানে বলে উঠল পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ্ ''গতকাল আপনাকে দেখেছেন, বেশ রাতে — গাড়ির তলায় চাপা পড়েছিল এক কেরানি — তারই ফ্ল্যাটে ...''

''এই যে, ওই কেরানির ঘটনাটাই ধরা যাক না কেন!'' রাজুমিখিন সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল। ''কেরানির বাড়িতে যখন গিয়েছিলে তখন কি তোমার মাথার ঠিক ছিল বলতে চাও? শেষ কপর্দকটুকু কেরানির বিধবাকে দিয়ে দিলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচের জন্য! সাহায্য করার ইচ্ছে?— তা বেশ তো, না হয় দাও পনেরো, কুড়িই দাও— আরে, অন্তত গোটা তিনেক রুবল তো নিজের জন্য রাখ! তা নয়, যে পঁচিশ রুবল হাতে ছিল তার সবটাই হাত উপুড় করে দিয়ে এলে।''

''হয়ত আমি কোন গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি, যেটা তোমার জানা নেই। তাইতে না গতকাল অমন দিলদরিয়া হয়ে গিয়েছিলাম!... এই যে, মিস্টার জামিওতভ্ জানেন যে আমি গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি! ... দোহাই আপনার, মাফ করবেন,'' পর্‌ফিরির দিকে ফিরে শেষ কথাগুলো বলার সময় তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। ''এমন একটা তুচ্ছ জিনিস নিয়ে বাদবিতণ্ডা বাধিয়ে আধঘণ্টা ধরে আপনাকে উত্যক্ত করার জন্য মাফ চাইছি। আপনি নিশ্চয়ই মনে-মনে বিরক্ত হচ্ছেন, তাই না?''

''না, না, মোটেই না। বরং তার উল্‌টো, একেবারে উল্‌টো! আপনি যদি জানতেন, আপনি আমার কী আগ্রহই না বাড়িয়ে তুলছেন! আমি রীতিমতো কৌতূহল নিয়ে আপনাকে দেখছি, আপনার কথা শুনছি এবং স্বীকার করতে বাধা নেই, আপনি যে শেষপর্যন্ত সশরীরে এখানে হাজির হয়েছেন তাতে আমি ভারি খুশি হয়েছি...''

''আরে, অন্তত একটু চায়ের ব্যবস্থা তো কর! গলা যে শুকিয়ে গেল!'' রাজুমিখিন খেঁকিয়ে উঠল।

''চমৎকার আইডিয়া! মনে হয় সকলেই যোগ দেবেন। তা চায়ের আগে... কড়া গোছের কিছু হবে নাকি?''

''ভাগ!''

পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ্ চায়ের ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে গেল। রাস্‌কোল্‌নিকভের মাথার ভেতর চিন্তাস্রোত ঘুরপাক খেতে লাগল ঘূর্ণির মতো। ভীষণ খিটখিটে হয়ে পড়েছে সে।

'সবচেয়ে বড় কথা, ওরা গোপন পর্যন্ত করছে না, তার কোন পরোয়াও করছে না! আচ্ছা তুমি যদি আমাকে আদৌ না জান, তবে কোন্ আক্কেলে নিকোদিম ফোমিচের সঙ্গে আমাকে নিয়ে কথা বলতে গেলে? দাঁড়াচ্ছে এই যে একপাল কুকুরের মতো ওরা যে আমার পিছু নিয়েছে সেটাও এখন আর গোপন করতে চাইছে না!

একেবারে খোলাখুলি মুখের ওপর থুতু ছিটোচ্ছে!' একথা মনে হতে প্রবল ক্রোধে সে কাঁপতে লাগল। ' বেশ তো, মারতে হয় সোজাসুজি মার— তোমাদের এই ইঁদুর নিয়ে বেড়ালের খেলা আর সহ্য হয় না! এটা কিন্তু অভদ্রতা, পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ! সম্ভবত আমি বরদাস্ত করব না!... উঠে দাঁড়িয়ে সকলের মুখের ওপর সব সত্যি উজাড় করে দেব। তখন দেখতে পাবে, আমি তোমাদের কতটা তাচ্ছিল্য করে থাকি!...' অতি কষ্টে সে নিঃশ্বাস নিল। 'কিন্তু যদি এমন হয় যে ধারণাটা আমার মনগড়া? যদি এমন হয় এটা মরীচিকা, পুরোটাই আমার মনের ভুল, নিজের অনভিজ্ঞতার দরুন খামোকা মেজাজ খারাপ করছি, যে ইতর ভূমিকায় আমি নেমেছি তা আমার আর পোষাচ্ছে না বলে? এমনও তো হতে পারে যে এসবের পেছনে আসলে কোন অভিসন্ধি নেই? ওদের সব কথা স্বাভাবিক, অথচ তারই মধ্যে কী একটা যেন আছে। কেন ও সরাসরি বলল যে জিনিসগুলো *ওর ওখানে* ছিল? কেন জামিওতভ্ যোগ করল যে আমি *বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে* কথা বলছিলাম? কেন ওরা এই সুরে কথা বলছে? হ্যাঁ... সুরটা কিন্তু...আচ্ছা রাজুমিখিন তো এখানেই বসে ছিল— ওর তাহলে সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না কেন? ধুৎ, এই নিষ্পাপ মাথামোটাটার কখনই কিছু মনে হয় না! আবার সেই কেমন জ্বর-জ্বর লাগছে!... আচ্ছা, এই কিছুক্ষণ আগে পর্‌ফিরি আমাকে চোখ টিপল নাকি? সম্ভবত বাজে চিন্তা। চোখ টিপতে যাবে কেন? আমার স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করার মতলব, নাকি আমাকে খেপাচ্ছে ওরা? হয় সমস্তটা মরীচিকা, নয়ত ওরা সব *জানে*!... এমনকি জামিওতভেরও স্পর্ধা দেখ!... স্পর্ধা কি? জামিওতভ রাতারাতি মত বদল করে ফেলেছে। আমারও কেমন যেন মনে হয়েছিল, মত বদল করবে! ওকে এখানে দেখে মনে হচ্ছে যেন নিজের বাড়িতে আছে, অথচ এসেছে এই প্রথম। পর্‌ফিরি ওকে অতিথি বলে বিবেচনা করছে না, ওর দিকে পিঠ করে বসে আছে। গন্ধে-গন্ধে ঠিক এসে মিলেছে। আর মিলেছে যে *আমারই কারণে* তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিঃসন্দেহে আমরা আসার আগে আমাকে নিয়েই কথা হচ্ছিল ওদের দুজনের মধ্যে!... আচ্ছা, ফ্ল্যাটের কথাটা জানে কি?... ওঃ কখন যে শেষ হবে! যত তাড়াতাড়ি হয় তত ভালো!... যখন আমি বললাম যে গতকাল ফ্ল্যাট ভাড়া করার জন্য ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম তখন কিন্তু ও তাতে আমল দিল না। আমার কথাটা বুঝতে পারেনি!... ফ্ল্যাটের কথাটা ঠিক সময়মতো বলে আমি কিন্তু বেশ চালাকির কাজ করেছি— পরে কাজে লাগবে!... বলা যাবে অসুস্থ অবস্থায়, জ্বরের ঘোরে... হাঃ হাঃ হাঃ! গতকাল সন্ধ্যার সমস্ত ঘটনা ও জানে! মা যে এসেছে সেটা জানা ছিল না!... ডাইনী বুড়িটার কাণ্ড দেখ! তারিখ পর্যন্ত লিখে রেখেছে পেন্সিলে!...তোমাদের যত মিথ্যে কথা। আমি তোমদের কাছে ধরা দিতে যাচ্ছি না। এগুলো কোন তথ্য নয়— নিছক মরীচিকা! না, না, সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির কর আগে! ফ্ল্যাটের ব্যাপারেও কিছু প্রমাণিত হয় না— সে তো জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকা! ওদের

কাছে কী বলতে হয় আমার জানা আছে।... আচ্ছা ফ্ল্যাটের কথাটা জানে কি? না, যতক্ষণ জানতে না পারছি ততক্ষণ নড়ছি না। আমি এসেছি কেন? কিন্তু এই যে এখন আমি রেগে যাচ্ছি, এটাও সম্ভবত একটা তথ্য হতে পারে! ছিঃ, কী খিটখিটে আমি হয়ে পড়েছি! বলা যায় না, একজন অসুস্থ মানুষের ভূমিকা... এটা হয়ত ভালোই।... ও আমাকে বাজিয়ে দেখছে। গুলিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। কিন্তু কেন আমি এসেছিলাম? কিসের জন্য?'

এসব চিন্তা পাক খেতে লাগল তার মাথার মধ্যে।

পর্ফিরি পেত্রোভিচ মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এলো। হঠাৎ কেন যেন তাকে উৎফুল্ল মনে হল।

"ওঃ তোমার সেই গতকালের আসরের পর থেকে আমার মাথাটা, ভাই... মনে হচ্ছে মাথার স্ক্রুগুলো যেন সব আল্‌গা হয়ে গেছে," রাজুমিখিনের দিকে তাকিয়ে যেভাবে হাসতে-হাসতে সে বলল তাতে দেখা যাচ্ছে কথা বলার সুরই তার সম্পূর্ণ পালটে গেছে।

"তা কেমন? কেমন জমেছিল? সবে যখন আলোচনা জমে উঠেছিল ঠিক সেই মুহূর্তে আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাই। জিত কার হল?"

"অবশ্যই কারও নয়। সেই চিরন্তন প্রশ্নে আমরা চলে এলাম, সবই হাওয়ার ওপর।"

"ভেবে দেখ রোদিয়া, গতকাল আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল অপরাধ বলে কিছু আছে কিনা। আমি তোমাকে বলিনি যে মিথ্যের একেবারে হদ্দমুদ্দ করে ছেড়েছি!"

"এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে? একটা সাধারণ সামাজিক সমস্যা," অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌।

"প্রশ্নটা অবশ্য ঠিক সেভাবে রাখা ছিল না," পর্‌ফিরি মন্তব্য করল।

"ঠিক সেভাবে নয়, তা বটে," রাজুমিখিন তৎক্ষণাৎ সায় দিল, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তার স্বাভাবিক ব্যস্ততা ও উত্তেজনার ভাব প্রকাশ করে বলল, " দেখ রোদিয়া, আগে শোন, তারপর বল তোমার কী মত। এটা আমার ইচ্ছে। কাল ওদের বোঝাতে গিয়ে আমার হাঁড়ির হাল হয়েছিল। তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। আমি ওদের বলেওছিলাম তোমার কথা, বলেছিলাম যে তুমি আসবে।... শুরু হয়েছিল সমাজতন্ত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। দৃষ্টিভঙ্গিটা সুপরিচিত: অপরাধ হল সমাজব্যবস্থার অস্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে একধরনের প্রতিবাদ— এটাই শেষ কথা, এর বেশি কিছু নয়, আর কোন কারণ থাকতে পারে না — আর কোন কারণকে স্বীকার করা যায় না!..."

"এই যে, এখানেই মিথ্যে বলা হল!" পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ্ চেঁচিয়ে উঠল। তাকে দেখে বেশ উৎসাহিত মনে হচ্ছিল। রাজুমিখিনের দিকে তাকিয়ে থেকে-থেকে সে হাসতে লাগল, ফলে রাজুমিখিন আরও খাপ্পা হয়ে উঠল।

"আর কোন কারণকে স্বীকার করা যায় না!" উত্তেজিত হয়ে তাকে বাধা দিয়ে বলল রাজুমিখিন। "মিথ্যে বলছি না! আমি তোমাকে ওদের বই দেখাতে পারি; ওদের মতে এসব 'পরিবেশের শিকার'— এ ছাড়া আর কিছু নয় ! ওদের লব্‌জ! এ থেকে সরাসরি যেটা বেরিয়ে আসছে তা হল এই যে সমাজকে যদি স্বাভাবিক করে গড়ে তোলা যায় তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত অপরাধও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, যেহেতু প্রতিবাদ করার কিছু থাকবে না, রাতারাতি সকলে সৎ হয়ে যাবে। মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতিকে উপেক্ষা করা হচ্ছে, তাকে একেবারে বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে, যেন তার কোন অস্তিত্বই নেই! মানবজাতি ইতিহাসের *সজীব* পথ ধরে শেষপর্যন্ত বিকশিত হয়ে পরিণামে আপনা-আপনি স্বাভাবিক সমাজে রূপান্তরিত হবে —এ মত তারা মানে না। বরং তারা মনে করে কোন গণিতবিদের মস্তিষ্কপ্রসূত এক সমাজব্যবস্থা এক নিমেষে সমস্ত মানবজাতিকে সংগঠিত করে ফেলবে এবং পলকের মধ্যে তাদের করে তুলবে সৎ ও নিষ্পাপ। সেটা ঘটবে যে কোন সজীব প্রক্রিয়ার চেয়ে দ্রুত, ইতিহাসের কোন সজীব পথ ছাড়াই। এই কারণেই তো ইতিহাসের প্রতি তাদের সহজাত অনীহা: 'ওর মধ্যে আছে রাজ্যের কদাচার আর মূর্খামি'— সবকিছুরই ব্যাখ্যা চলছে একমাত্র মূর্খামি দিয়ে! এই কারণে জীবনের *সজীব* প্রক্রিয়া তাদের মোটে পছন্দ নয়: বলে, *সজীব আত্মা* ওদের দরকার নেই। সজীব আত্মার জন্য দরকার জীবন, সজীব আত্মা যান্ত্রিক নিয়ম মানে না, সজীব আত্মা সন্দেহজনক, সজীব আত্মা পশ্চাদগামী। কিন্তু ওদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় মড়া গন্ধ ছাড়লে কী হবে তাকে রবার দিয়ে গড়া যায়। তা অবশ্য জীবন্ত হবে না, তার কোন ইচ্ছাশক্তি থাকবে না, তা হবে দাসমনোভাবাপন্ন। তার বিদ্রোহ করার কোন ক্ষমতা থাকবে না! ফলে দাঁড়াচ্ছে এই যে ওদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হচ্ছে ইঁটের পরে ইঁটের গাঁথুনি সাজানো এবং সঙ্ঘের কুঠুরি আর অলিন্দ গড়ার পেছনে। সঙ্ঘ তো তৈরি হল, অথচ তোমার প্রকৃতি সঙ্ঘের জন্য এখনও তৈরি নয়, তার চাই জীবন, জীবনের প্রক্রিয়া এখনও সমাপ্ত হয়নি— কবরে যাবার সময় এখনও আসেনি। শুধু যুক্তি দিয়ে প্রকৃতিকে ডিঙিয়ে যাওয়া যায় না! যুক্তি আগে থেকে গুটি তিনেক ক্ষেত্রের কথা ভাবতে পারে, কিন্তু জীবনে এর বাইরে ক্ষেত্র আছে লক্ষ লক্ষ! ওই লক্ষ লক্ষকে ছেঁটে বাতিল করে দিয়ে সবকিছুকে একটিমাত্র প্রশ্নে— স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্নে নামিয়ে আনা! সমস্যার সবচেয়ে সহজ সমাধান। প্রলোভনজনক, পরিষ্কার— ভাবনাচিন্তার কোন দরকার নেই। সবচেয়ে বড় কথা— ভাবনাচিন্তার দরকার নেই! জীবনের সমস্ত রহস্য ছাপার দুটো পৃষ্ঠার মধ্যে দিব্যি এঁটে যাচ্ছে!"

"বা বা, কথার কী তোড়! একেবারে ঢাকের বাদ্যি! ওকে আটকাতে হয়!" হাসতে -হাসতে বলল পর্‌ফিরি। তারপর রাস্‌কোল্‌নিকভের দিকে ফিরে বলল, "ধারণা করুন একবার, গতকাল সন্ধেবেলা একটা ঘরে ছয়জনের গলাবাজি তায় আবার আগে

থেকে ভালোমতো পাঞ্চও পেটে পড়েছিল— ধারণা করতে পারেন? না ভাই, তুমি বাজে বকছ। যা-ই বল না কেন, অপরাধে 'পরিবেশের' তাৎপর্য অনেক— আমি তোমাকে জোর দিয়ে বলতে পারি।"

"আমি নিজেই জানি যে বড় স্থান আছে। কিন্তু তুমি আমাকে একটা কথা বল তো, চল্লিশ বছরের একটা লোক দশ বছরের একটা মেয়ের শ্লীলতাহানি করল— পরিবেশ তাকে এ কাজে প্রবৃত্ত করল বলতে চাও?"

"তাছাড়া কী? এক অর্থে হয়ত তা-ই," আশ্চর্যরকমের ভারিক্কি চালে মন্তব্য করল পর্‌ফিরি। "বালিকার বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কাজের জন্য 'পরিবেশকে' দায়ী করাই যায়— খুবই করা যায়।"

রাজুমিখিন প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

"চাও তো আমি এক্ষুনি তোমাকে *প্রমাণ* করে দিচ্ছি," গর্জে উঠল সে। "তোমার চোখের পাতার রোম যে সাদা তার একমাত্র কারণ এই যে ইভান দি গ্রেটের গির্জা আড়াইশ ফুট উঁচু। সেটা প্রমাণ করে দিতে পারি পরিষ্কার, নির্ভুলভাবে, প্রগতিশীল পন্থায়, এমনকি উদারনীতির মিশেল দিয়ে। দেখাব প্রমাণ করে? বাজি?"

" বেশ তো! দেখি কী ভাবে ও প্রমাণ করে।

"ধুত্তোর! যত ভণ্ডামি!" রাজুমিখিন জায়গা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে হাত নেড়ে চিৎকার করে বলল। " তোমার সঙ্গে কথা বলার কোন মানে হয়! এ সবই ও করছে স্রেফ ইচ্ছে করে, তুমি ওকে এখনও জান না রোদিওন! গতকালও ওদের পক্ষ নিয়েছিল। ওর একমাত্র উদ্দেশ্য হল সকলকে বোকা বানান। গতকাল যে সমস্ত কথা ও বলেছে... হা ভগবান! তাইতেই তো ওরা ভারি খুশি!... এই নিয়ে ও সপ্তাহ দুয়েক মেতে থাকতে পারে। গত বছর আমাদের মনে এই বিশ্বাস ঢুকিয়ে ছাড়ল যে ও সন্ন্যাস নিতে যাচ্ছে— দু-মাস ওই গোঁ নিয়েই পড়ে রইল! ইদানীং কী খেয়াল ওর মাথায় চেপেছে কে জানে— আমাদের খুব করে বলে যাচ্ছে যে বিয়ে করতে যাচ্ছে, বিয়ের সমস্ত আয়োজনও নাকি ইতিমধ্যে প্রস্তুত। এমনকি নতুন একপ্রস্থ পোশাকও তৈরি করে আনল। আমরাও ওকে অভিনন্দন জানাতে লাগলাম। কিন্তু কোথায় বিয়ের কনে, কোথায় কী? —সবটাই মরীচিকা।"

"এই যে, এখানেই মিথ্যে কথা। পোশাক আমি বানিয়েছি আগে। এই নতুন পোশাকের দরুনই আমার মাথায় এলো তোমাদের নিয়ে একটু মজা করে দেখি।"

"আপনি কি সবসময় এরকম ধোঁকা দেন?" অসতর্কভাবে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ প্রশ্ন করে বসল।

"তা নয় তো কী? আপনি কী ভেবেছিলেন? দাঁড়ান, আপনাকেও বোকা বানাব এখন। হাঃ- হাঃ- হাঃ! না, দেখুন, আমি আপনাকে যা যা বলব সব সত্যি। এ সমস্ত প্রশ্নে— অপরাধ, পরিবেশ, নাবালিকা ইত্যাদি প্রসঙ্গে আমার এখন মনে পড়ে

গেল... হ্যাঁ, প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমার কাছে সবসময়ই আকর্ষণীয় মনে হয়েছে আপনার একটা ছোট লেখা: 'অপরাধ প্রসঙ্গে'... বা ওইগোছের কিছু নাম হবে—সঠিক মনে করতে পারছি না। মাসদুয়েক আগে 'সাময়িক সমীক্ষায়' পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল।"

"আমার লেখা? 'সাময়িক সমীক্ষায়'? অবাক হয়ে জিগ্‌গেস করল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌। আমি বাস্তবিকই লিখেছিলাম, মাস ছয়েক আগে, যখন ইউনিভারসিটির পড়া ছেড়ে দিই। ...সে ছিল কোন একটা বইয়ের ওপর লেখা একটা আলোচনা। কিন্তু সেটা তো আমি তখন দিয়ে এসেছিলাম 'সাপ্তাহিক সমীক্ষায়'—'সাময়িক সমীক্ষায়' তো নয়!"

"অথচ দেখুন, বের হল 'সাময়িকে'।

"ও হ্যাঁ, 'সাপ্তাহিক সমীক্ষা' উঠে যাওয়ায় তখন আর ছাপান হয়নি..."

"এটা ঠিক, তবে উঠে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে 'সাপ্তাহিক সমীক্ষা' 'সাময়িক সমীক্ষার'। সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, এই কারণে আপনার লেখাটাও বের হয় 'সাময়িক সমীক্ষায়'। আপনি কি জানতেন না?"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ বাস্তবিকই কিছু জানত না।

"দেখুন দেখি, প্রবন্ধের জন্য তো আপনি ওদের কাছ থেকে টাকা চাইতে পারেন! কী মানুষ আপনি বলুত তো! সকলের কাছ থেকে আলাদা হয়ে এমনভাবে জীবন কাটাচ্ছেন যে আপনার নিজের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক আছে এমন সমস্ত জিনিসও আপনি জানেন না। এটা কিন্তু ঘটনা।"

"বাহবা, রোদিয়া! আমিও কিন্তু জানতাম না!" রাজুমিখিন বিস্ময় প্রকাশ করল। "আজই রিডিং রুমে গিয়ে ওই সংখ্যাটার খোঁজ করতে হবে। দু-মাস আগে? কোন তারিখের? যাই হোক, সে খুঁজে বার করা যাবে! বোঝ কাণ্ড! ঘুণাক্ষরেও বলেনি!"

"আপনি কী করে জানলেন-যে ওটা আমার লেখা? লেখাটার নিচে তো নামের আদ্যক্ষর ছিল।"

"ঘটনাচক্রে, তাও কয়েকদিন আগে। সম্পাদকের মাধ্যমে। আমি তাকে চিনি.... আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল।"

"আমার মনে পড়ছে অপরাধ সংঘটনের সমস্তটা সময়ব্যাপী একজন অপরাধীর মানসিক অবস্থা কী হতে পারে তাই আমার আলোচনার বিষয় ছিল।"

"হ্যাঁ, আপনি যেটার ওপর জোর দিয়েছেন তা এই যে মানসিক বিকার অপরাধ সংঘটনের নিত্যসঙ্গী। মৌলিক, খুবই মৌলিক, তবে... আমার কাছে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে আপনার লেখার এই অংশটি নয়, অন্য একটি চিন্তা যা প্রবন্ধের শেষে উপস্থাপিত। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে সে-চিন্তা আপনি প্রকাশ করেছেন অস্পষ্টভাবে, তার আভাসমাত্র দিয়েছেন।... এককথায় আপনি হয়ত মনে

করতে পারেন... এই মর্মে একটা ইঙ্গিত সেখানে দিয়েছেন যে পৃথিবীতে এমন কিছু-কিছু ব্যক্তি আছে যারা সমস্ত রকম অনাচার ও অপরাধ করতে পারে... অর্থাৎ, শুধু পারে, তা-ই নয়, করার সম্পূর্ণ অধিকারও রাখে এবং কোন আইনই, বলতে গেলে, তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ তার আইডিয়ার অতিরঞ্জিত ও চেষ্টাকৃত বিকৃতিতে কাষ্ঠহাসি হাসল।

" সে কী? এটা কী রকম? অপরাধ সংঘটনের অধিকার? কিন্তু 'পরিবেশের শিকার'— এই যুক্তিতে নিশ্চয়ই নয়?" রাজুমিখিনের জিজ্ঞাসার মধ্যে কতকটা যেন ভীতিও প্রকাশ পেল।

"না, না, আদৌ সেই যুক্তিতে নয়," পর্‌ফিরি উত্তরে বলল। "এই ভদ্রলোকের প্রবন্ধ থেকে মনে হচ্ছে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ 'সাধারণ' ও 'অসাধারণ'— এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যারা সাধারণ, তাদের নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে, আইন লঙ্ঘনের কোন অধিকার তাদের নেই, কেননা দেখতেই পাচ্ছেন, তারা হল সাধারণ। আর যারা অসাধারণ তারা যে কোন রকম অপরাধ সংঘটনের এবং যে কোন উপায়ে আইন লঙ্ঘনের অধিকারী, একমাত্র এই কারণে যে তারা অসাধারণ। আমার যদি কোন ভুল না হয়ে থাকে, এটাই তো আপনার বক্তব্য— তাই না?"

"বা, সে কী করে হয়? এ হতেই পারে না।" হতভম্ব রাজুমিখিন বিড়বিড় করে বলল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ আবার সেই কাষ্ঠহাসি হাসল। সে সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পারল আসল ব্যাপারটা কী এবং কোথায় তাকে ঠেলে নিয়ে যাবার চেষ্টা চলছে। প্রবন্ধটা মনে করতে পারছিল সে। ঠিক করল এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা সে করবে।

"আমার বক্তব্য আদৌ এটা নয়," বিনা আড়ম্বরে বিনীতভাবে সে শুরু করল। "প্রসঙ্গত স্বীকার করছি, আপনার উপস্থাপনা প্রায় নির্ভুল।... এমনকি, যদি চান তো এও বলতে পারি যে সম্পূর্ণ নির্ভুল।" মনে মনে তার ভাবতে বেশ ভালোই লাগছিল যে সম্পূর্ণ নির্ভুল। ..."তবে একমাত্র তফাত এই যে আমি আদৌ জোর দিয়ে এমন কথা বলিনি যে যারা অসাধারণ তারা অবধারিতভাবে সবসময় সবরকম অনাচার করবে এবং করতে বাধ্য থাকবে... যেটা আপনি বলছেন। আমার এমনও মনে হয় যে সে ধরনের কোন লেখা ছাপার অক্ষরে প্রকাশই পেতে পারে না। আমি স্রেফ এই আভাস দিয়েছিলাম যে 'অসাধারণ' ব্যক্তির এমন অধিকার আছে... অর্থাৎ কিনা আনুষ্ঠানিক অধিকার নয়... সে নিজেই নিজেকে, নিজের বিবেককে মাত্রা লঙ্ঘনের অধিকার দিতে পারে, যে কোন বাধা অতিক্রমের অধিকার দিতে পারে...একমাত্র সেই ক্ষেত্রে, যেখানে তার আইডিয়া তা দাবি করে। আর তার সে সমস্ত আইডিয়া অনেক সময় সমগ্র মানবজাতির পক্ষেও মঙ্গলজনক হতে পারে। জানি না, কেন আমার

প্রবন্ধের বক্তব্য আপনার অস্পষ্ট মনে হয়েছে। আমি আমার সাধ্যমতো ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে প্রস্তুত। আশা করি আমার এমন অনুমান করা ভুল হবে না যে সেটাই আপনার মনোগত অভিপ্রায়। আজ্ঞা হয় তো বলি। আমার মতে, যদি পরিস্থিতি-বিপাকে দেখা যেত যে নিউটন বা কেপ্লারের আবিষ্কারের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে অথবা ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে একজন, দশজন বা একশজন মানুষ... এমনকি তার চেয়েও বেশি সংখ্যক মানুষের প্রাণবলি না দিয়ে সে আবিষ্কার কোনমতে জনসমক্ষে প্রচারিত হতে পারছে না, তাহলে সে আবিষ্কারকে সমগ্র মানবজাতির কাছে সুপরিচিত করে তোলার উদ্দেশ্যে সেই দশজন, এমনকি একশজন মানুষকেও উৎখাত করার অধিকার ...শুধু অধিকার... নয়, আমি বলব কর্তব্যও ... নিউটনের থাকত। তা থেকে কিন্তু আদৌ এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে ডাইনে বাঁয়ে সামনে যাকে খুশি তাকে খুন করার অথবা বাজারে নিত্য চুরি করার অধিকার নিউটনের ছিল। এর পরে আমার মনে পড়ছে যে আইডিয়াটা আমি আমার প্রবন্ধে বিস্তার করেছি সেটা এইরকমঃ সকলে... এই ধরুন না কেন, সুপ্রাচীন কাল থেকে শুরু করে অন্তত লাইকার্গাস, সোলন, মোহম্মদ, নেপোলিয়ন প্রমুখের মতো মানবজাতির যাঁরা কারিগর, স্বীকৃত আইন প্রণেতা... তাঁরা সকলেই ছিলেন এক্কেকটি দুর্বৃত্ত , নিদেনপক্ষে এই একটি কারণে তো বটেই যে নতুন আইন প্রণয়ন করতে গিয়ে তাঁরা লঙ্ঘন করেছেন পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত প্রাচীন আইন, যা এর আগে পর্যন্ত সমাজে পবিত্র বলে গণ্য হত। তাছাড়া, রক্তপাতে যদি কার্যসিদ্ধি সম্ভব হত তাতেও অবশ্য তাঁরা পিছপা হতেন না। রক্ত অনেক সময়ই ঝরত নিরপরাধ লোকজনের। প্রাচীন আইন রক্ষার জন্য তারা বীরত্বের সঙ্গে বুকের রক্ত ঢালত। এটাও রীতিমতো উল্লেখযোগ্য যে এই মানবহিতৈষী এবং মানবজাতির এই কারিগরদের অধিকাংশই ছিলেন বিশেষভাবে ভয়ঙ্কর প্রকৃতির, রক্তপিপাসু। এককথায়, আমার সিদ্ধান্ত এই যে এঁরা সকলে— যাঁরা মহামানব কেবল তাঁরাই নন—এমনকি যারা সাধারণের একটু বাইরে, অর্থাৎ যারা নতুন কিছু বলার অন্তত সামান্য ক্ষমতা রাখেন, তাঁরাও স্বভাবে দুর্বৃত্ত না হয়ে যান না। ...বলাই বাহুল্য, আমি বলতে চাই, অল্পবিস্তর। তা না হলে বাঁধাধরা পথ ছেড়ে বেরিয়ে আসা তাঁদের পক্ষে কঠিন। বাঁধাধরা পথে চলতে তাঁরা অবশ্যই রাজি হতে পারেন না... আবারও তাদের স্বভাবের দরুন। এবং আমি মনে করি রাজি না হওয়াটাই তাঁদের কর্তব্য। এককথায়, দেখতেই পচ্ছেন, এখন পর্যন্ত যা যা বললাম তার মধ্যে নূতনত্ব বিশেষ কিছু নেই। এ জিনিস হাজার বার ছাপা হয়েছে, লোকে পড়েছে। আর আমি যে মানুষকে সাধারণ ও অসাধারণ— এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছি সে প্রসঙ্গে আমি মানতে রাজি আছি যে এই শ্রেণীবিভাগ খানিকটা নির্বিচার হয়ে গেছে। তবে আমি তো সঠিক কোন সংখ্যার ওপরও জোর দিচ্ছি না। এর পেছনে যে মূল চিন্তা আমার আছে আমি শুধু তাতে বিশ্বাসী। সেটা আসলে এই যে

প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী মানুষকে *সাধারণত* ভাগ করা যায় দুটি শ্রেণীতে : নিম্নশ্রেণীর অথবা সাধারণ মানুষ অর্থাৎ যারা একমাত্র নিজেদের প্রতিরূপ পুনরুৎপাদনের উপযোগী বস্তু। এবং আসলে মানুষ বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ নিজ-নিজ পরিবেশের মধ্যে *নতুন কথা* বলার মতো ক্ষমতা বা প্রতিভা যাদের আছে। বলাই বাহুল্য এর মধ্যে অসংখ্য উপবিভাগ থাকতেই পারে, কিন্তু দুই শ্রেণীরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথমোক্ত শ্রেণীর অর্থাৎ যারা বস্তু পদবাচ্য তারা, মোটের ওপর বলতে গেলে, স্বভাবে রক্ষণশীল, ধীরস্থির। তারা বাধ্যবাধকতার মধ্যে জীবন যাপন করে এবং অনুগত হয়ে চলা পছন্দ করে। আমার মতে তারা অনুগত হয়ে চলতে বাধ্যও বটে, যেহেতু এটাই তাদের কাজ, তাই এর মধ্যে তাদের পক্ষে অবমাননাকর কিছুই নেই। যারা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত তারা সকলে আইনের সীমানা অতিক্রম করে। তারা বিধ্বংসকারী। অথবা ক্ষমতার দিক থেকে বিচার করলে ধ্বংসের দিকে তাদের প্রবণতা আছে। এসব মানুষের সংঘটিত অপরাধ, বলাই বাহুল্য, আপেক্ষিক, বহুবিধ ও বিচিত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা যতরকমভাবে সম্ভব, উন্নততর কিছুর স্বার্থে বর্তমান ব্যবস্থার ধ্বংস দাবি করে থাকে। কিন্তু নিজের আইডিয়ার খাতিরে যদি তাকে মৃতদেহ ডিঙিয়ে, রক্তবন্যার মধ্য দিয়েও যেতে হয় তবু, আমার মনে হয় ভেতরে-ভেতরে সে তার বিবেকবুদ্ধিমতে রক্তবন্যার মধ্য দিয়ে যাবার অধিকার মেনে নেবে— অবশ্য সেটা হবে আইডিয়া ও তার গুরুত্বের মাত্রা অনুপাতে— খেয়াল রাখবেন কিন্তু। একমাত্র এই অর্থে আমি আমার প্রবন্ধে অপরাধ সংঘটনে তাদের অধিকারের কথা বলেছি। আপনি মনে করে দেখবেন, আমরা শুরু করেছিলাম কিন্তু বৈধতার প্রশ্ন দিয়ে। তবে হ্যাঁ, তেমন উদ্বেগের কোন কারণ নেইঃ জনসাধারণ অসাধারণদের এই অধিকার ক্বচিৎ মেনে নেয়, তাদের প্রাণদণ্ড দেয়, ফাঁসিকাঠে ঝোলায়— অল্পবিস্তর যেটা ঘটে, তাই বলছি— এরই মধ্য দিয়ে তারা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গতভাবে পালন করে তাদের রক্ষণশীল কার্যপ্রণালী। তা সত্ত্বেও কিন্তু দেখা যায় এই জনসাধারণেরই পরবর্তী প্রজন্ম প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতদের উচ্চাসনে বসাচ্ছে, তাদের শ্রদ্ধাও জানাচ্ছে অল্পবিস্তর। প্রথম শ্রেণীভুক্তরা সবসময় বর্তমানের প্রভু, দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্তরা— ভবিষ্যতের। প্রথমোক্তরা জগৎসংসার রক্ষা করে, সংখ্যাগতভাবে তার বৃদ্ধি ঘটায়; দ্বিতীয়োক্তরা জগৎকে নাড়া দেয়, তাকে লক্ষ্যের দিকে চালায়। দুয়েরই অস্তিত্বরক্ষার সম্পূর্ণ সমান অধিকার আছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমার কাছে সব মানুষের অধিকার সমান।... তাই, Viva La guerre eternelle —দীর্ঘজীবী হোক যুগযুগান্তরের যুদ্ধ —বলাই বাহুল্য যতদিন পর্যন্ত নতুন জেরুসালেমের প্রতিষ্ঠা না ঘটছে!"

" সে কি ! আপনি তাহলে নতুন জেরুসালেমে বিশ্বাস করেন?"

"হ্যাঁ, বিশ্বাস করি," দৃঢ়স্বরে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ উত্তর দিল। এই কথাগুলো বলার সময় এবং নিজের এই দীর্ঘ ভাষণের সময় সর্বক্ষণ সে তাকিয়ে ছিল মাটিতে, কার্পেটের একটি বিন্দুতে স্থির দৃষ্টি রেখে।

"আর...আর...ভগবানেও বিশ্বাস করেন? মাফ করবেন আমার এই কৌতূহলের জন্য।"

"বিশ্বাস করি", চোখ তুলে পরফিরির দিকে তাকিয়ে এবারেও বলল রাস্‌কোল্‌নিকভ্।

"আর ল্যাজারাসের পুনরুত্থান? তাতেও?"

"বি-বিশ্বাস করি। কিন্তু আপনি এত কথা জিগ্‌গেস করছেন কেন?"

"অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করেন?"

"অক্ষরে অক্ষরে।"

"বটে।... আমার একটু কৌতূহল হয়েছিল আর কি। মাফ করবেন। যদি আপনার অনুমতি হয় তো ...এখনকার এই আলোচনা প্রসঙ্গে বলি। ওদের কিন্তু সবসময় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না। কারও কারও ক্ষেত্রে তো বরং উলটো..."

"জীবদ্দশাতেই জয়ের মুখ দেখে—তাই তো? হ্যাঁ তা ঠিক, ওঁদের মধ্যে কেউ-কেউ জীবদ্দশাতেই তাঁদের প্রাপ্য সম্মান পেয়ে থাকেন। তখন..."

"তখন কি তাঁরা নিজেরাই অন্যদের প্রাণদণ্ড দিতে থাকেন?"

"দরকার হলে তাও দেন। আর জানেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই। মোটের ওপর আপনার মন্তব্যটা কিন্তু বেশ বিচক্ষণ।"

"ধন্যবাদ। কিন্তু বলুন তো কোন্ লক্ষণ দেখে আপনি এই অসাধারণদের থেকে সাধারণদের পার্থক্য নির্ণয় করবেন? জন্মগত বা ওই জাতীয় কোন লক্ষণ আছে কি? কথাটা আমি বলছি এই অর্থে যে এখানে বেশ খানিকটা নির্ভুলতা, বলতে গেলে বাইরে থেকে অনেকখানি নির্ধারণ করা যায় এমন কিছু লক্ষণ থাকা দরকার। মাফ করবেন, আমার উদ্বেগ কিন্তু সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন একজন মানুষের স্বাভাবিক উদ্বেগ। এক্ষেত্রে কি...কথার কথাই বলছি... বিশেষ কোন ধরনের পোশাক প্রচলন করা, অথবা কোনভাবে কোন ছাপ মেরে দেওয়া বা ওইগোছের কিছু ব্যবস্থা করা সম্ভব?...কারণ, আপনাকে মানতেই হবে যে তালেগোলে একই শ্রেণীর কেউ যদি আরেকজনকে অন্য শ্রেণীভুক্ত মনে করে— আপনি বেশ লাগসইভাবে যাকে 'সমস্ত রকম বাধা অপসারণ' বলেছেন— তা করতে লেগে পড়ে, তাহলে... বলুন দেখি..."

"ও, সেটা কিন্তু আকছার হয়ে থাকে! আপনার এই মন্তব্য আগেরটার চেয়েও বেশি বিচক্ষণ দেখছি..."

"ধন্যবাদ।"

"না, না, তার দরকার নেই। তবে এটা মনে রাখবেন যে ভুল হতে পারে একমাত্র প্রথম শ্রেণীর দিক থেকে, অর্থাৎ যাদের আমি 'সাধারণ' আখ্যা দিয়ে হয়ত খুব একটা সুবিচার করিনি, সেই লোকগুলোর দিক থেকে। মেনে চলার সহজাত প্রবৃত্তি তাদের

থাকা সত্ত্বেও, প্রকৃতির যে লীলা একটা গোরুর মধ্যে পর্যন্ত দেখা যায় তারই ফলে তাদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক মানুষ মনে-মনে 'বিধ্বংসকারী', অগ্রগামী বলে নিজেদের ভাবতে ভালোবাসে, 'নতুন কথার' চর্চা করতে ভালোবাসে। সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকও বটে। সেই সঙ্গে, *নতুনদের* কিন্তু বস্তুতপক্ষে অধিকাংশক্ষেত্রে তারা বিন্দুমাত্র আমল দেয় না। এমনকি পশ্চাৎপদ ও অবক্ষয়ী চিন্তার বাহক হিসাবে তাদের দেখে থাকে, তাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। কিন্তু আমার মতে, এতে তেমন উল্লেখযোগ্য বিপদের সম্ভাবনা নেই। সত্যি বলতে গেলে কি, আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই, কেননা ওদের দৌড় কখনও খুব বেশিদূর হয় না। অত্যুৎসাহবশত অবশ্য ওদের কখন-কখন ধোলাই দিয়ে মনে করিয়ে দিতে হবে ওদের স্থান কোথায়।... এর বেশি কিছু দরকার নেই। আসলে কিন্তু এখানে শাস্তিবিধানকারীরও দরকার নেই—ওরা নিজেরাই নিজেদের শাস্তি দেবে, যেহেতু ওদের স্বভাব-চরিত্র খুবই ভালো। কেউ-কেউ এই কাজটা একে অন্যের ওপর সম্পাদন করবে, বাকিরা স্বহস্তে নিজেদের ওপর করবে। ...প্রকাশ্যে, সর্বসমক্ষে নানা ধরনের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করবে। এর ফলটা দাঁড়াচ্ছে চমৎকার, শিক্ষামূলক।... এককথায়, আপনার চিন্তা করার কোন কারণ নেই। ... এটাই নিয়ম।"

"বেশ, অন্ততপক্ষে এইদিক থেকে আপনি আমাকে খানিকটা আশ্বস্ত করলেন। কিন্তু তবু, আরেকটি বিপদ থেকেই যাচ্ছে। আচ্ছা, বলুন তো, অন্যদের হত্যা করার অধিকার যাদের আছে, মানে যারা 'অসাধারণ আর কি তাদের সংখ্যা কি বেশি? আমি অবশ্য তাদের সম্মান দেখাতে রাজি আছি, কিন্তু আপনাকে মানতে হবে যে সংখ্যায় যদি তারা খুবই বেশি হয়ে থাকে, তাহলে ভয়ের কথা। ঠিক কিনা?"

"আরে না না, এ নিয়েও চিন্তার কোন কারণ নেই", ওই একই সুরে বলে চলল রাস্‌কোলনিকভ্‌। "যারা নতুন চিন্তাভাবনা করে, এমনকি যাদের *নতুন* কিছু বলার অন্তত সামান্য ক্ষমতাও আছে, সেরকম মানুষ মোটের ওপর জন্মায় খুবই কম—এমনকি এত কম যে ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। মাত্র একটা জিনিস পরিষ্কার— সেটা হল এই যে মানুষের , এইসমস্ত শ্রেণী ও উপবিভাগের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত মানুষের জন্মের একটি শৃঙ্খলা আছে যা নিশ্চয়ই অত্যন্ত সঠিক ও নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করছে কোন এক প্রাকৃতিক নিয়ম। সে নিয়ম, বলাই বাহুল্য, আপাতত আমাদের জানা নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস সে নিয়ম আছে এবং উত্তরকালে তা প্রকাশও পেতে পারে। এই পৃথিবীতে বিপুল সংখ্যক জনসমষ্টি আর বস্তু আছে একমাত্র এই কারণে যে শেষপর্যন্ত কোন বৃহৎ প্রয়াসের মাধ্যমে, আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত, রহস্যজনক কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন জাতি-প্রজাতির মধ্যে সঙ্কর ঘটিয়ে পরিণামে বেরিয়ে আসবে, পৃথিবীতে জন্ম নেবে স্বাবলম্বী মানুষ—তার সংখ্যা যত কমই হোক না কেন, হোক না কেন হাজারে একটি। হয়ত আরেকটু বেশি মাত্রায় স্বাবলম্বী হয়ে জন্মাতে পারে দশ হাজারে

একজন—সংখ্যাটা আমি অবশ্য বলছি মোটামুটিভাবে, দৃষ্টান্ত হিসেবে। হতে পারে তার চেয়েও কম সংখ্যায়— লাখে এক। প্রতিভাবান মানুষ হয় দশ লাখে একজন, আর মহাপ্রতিভাধর, ক্ষণজন্মা মানুষ— সে হয়ত কোটি-কোটি মানুষের জন্ম ও মৃত্যুর পর পৃথিবীতে একবারই হয়ে থাকে। এককথায়, যে পাতনযন্ত্রে এ সমস্ত প্রক্রিয়া ঘটে তার ভেতরে উঁকি মারার সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নিঃসন্দেহে আছে, থাকতে বাধ্য। এখানে দৈবঘটনার কোন স্থান নেই।"

"ধুত্তোর! তোমরা দুজনে কী শুরু করে দিয়েছ বল দেখি! মজা পেয়ে গেছ নাকি?" রাজুমিখিন শেষপর্যন্ত ফেটে পড়ল। "একজন আরেকজনকে ধোঁকা দিচ্ছ নাকি বল তো? বসে-বসে কোন কাজ নেই—নিজেদের মধ্যে মস্করা করছে! তুমি কি নিজের মন থেকে কথাগুলো বলছ, রোদিয়া?"

রাস্‌কোলনিকভ্ নীরবে বিষণ্ণপ্রায়, পাণ্ডুর মুখখানা তুলে তার দিকে তাকাল, কোন জবাব দিল না। এই শান্ত ও বিষণ্ণ মুখের পাশাপাশি পর্‌ফিরির প্রকাশ্য, অবাঞ্ছিত, বিরক্তিপূর্ণ ও *অভদ্রজনোচিত* বক্রোক্তি রাজুমিখিনের কাছে অদ্ভুত *ঠেকল*।

"তা ভাই, কথাগুলো যদি সত্যি-সত্যি তুমি নিজের মন থেকে বলে থাক... তুমি ঠিকই বলেছ যে এর মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই এবং যে-সমস্ত জিনিস আমরা হাজার বার পড়েছি, শুনেছি এও অনেকটা তাই। কিন্তু এ সবের মধ্যে সত্যিকার *মৌলিকতা* যা আছে এবং যেটা বাস্তবিকই তোমার নিজস্ব, যার পরিচয় পেয়ে আমি শিউরে উঠছি, সেটা এই যে তবু *বিবেকের খাতিরে* অনুমোদন করছ— এরকম অন্ধ গোঁড়ামি নিয়ে তো...আমাকে মাফ করবে এ মন্তব্য করার জন্য। ... দেখা যাচ্ছে তোমার প্রবন্ধের মূল কথা এটাই, তাই না? *বিবেকের খাতিরে* রক্তপাতের এই যে অনুমতি...এতো...এতো আমার মনে হয় রক্তপাতের আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের চেয়ে, বৈধ অনুমোদনের চেয়েও ভয়াবহ।..."

"এতটুকু ভুল বলনি। ...আরও বেশি ভয়াবহ", পর্‌ফিরি সায় দিল।

"না, তুমি কেমন যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছ মনে হচ্ছে। এখানে গলদ আছে। পড়ে দেখতে হবে।...তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে চলে গেছ! অমন ভাবনাচিন্তা তোমার হতে পারে না।...পড়ে দেখতে হবে।"

"লেখার মধ্যে এসব কিছুই নেই। সেখানে আছে শুধু আভাস", রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বলল।

"হুঁ, তাই বটে," পর্‌ফিরি জায়গায় বসে উসখুস করতে লাগল। অপরাধকে যে আপনি কী চোখে দেখেন এখন কিন্তু আমার কাছে তা প্রায় পরিষ্কার হয়ে এসেছে। অপরাধ নেবেন না। ...মাফ করবেন আমার একগুঁয়েমির জন্যে। আপনাকে এত বেশি উত্ত্যক্ত করছি বলে আমার নিজেরই লজ্জা করছে। কিন্তু দেখুন, এইমাত্র ভুলক্রমে দুই শ্রেণীর মধ্যে মিশ্রণের বিভ্রান্তিকর ঘটনার উল্লেখ করে আপনি আমাকে বেশ আশ্বস্ত

করেছিলেন, তা সত্ত্বেও এখানে ভিন্ন-ভিন্ন আরও কতকগুলো বাস্তব পরিস্থিতি আছে যা আমার চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে! ধরুন কোন এক ব্যক্তির, কোন এক যুবকের মাথায় ঢুকেছে যে সে লাইকারগাস বা মোহম্মদ অথবা ওইগোছের কিছু—বলাই বাহুল্য, ওইরকম কোন ভাবী মহাপুরুষ বলে নিজেকে ভাবলে সঙ্গে-সঙ্গে তার কাজ হবে পথের সমস্ত কাঁটা একে-একে দূর করা।... তার কথায়, সামনে দীর্ঘ অভিযান, এর জন্য চাই অর্থ—অতএব সে শুরু করে দিল তার অভিযানের জন্য যা যা দরকার সে সব অর্জনের চেষ্টা। ...বুঝতে পারছেন আমি কী বলতে চাইছি?"

জামিওতভ্ হঠাৎ তার কোনার জায়গা থেকে নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে আওয়াজ করে উঠল। রাস্কোল্নিকভ্ তার দিকে চোখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত।

"আমি মানছি যে এ ধরনের ঘটনা সত্যি-সত্যি ঘটতে বাধ্য," শান্ত কণ্ঠে সে উত্তর দিল। "একটু বোকা ধরনের হামবড়া গোছের লোকজনই বিশেষ করে এই টোপ গিলবে। বিশেষত যুব সম্প্রদায়।"

"তাহলেই দেখুন। সেক্ষেত্রে কী উপায়?"

"কী আবার উপায়?" ম্লান হাসি হাসল রাস্কোল্নিকভ্। "সেটা তো আর আমার দোষ নয়। ঘটনা যা চিরকাল থাকবেও তা-ই। এই যে ও..." ঘাড় নেড়ে রাজুমিখিনের দিকে ইশারা করে সে বলল, "এইমাত্র বলল যে আমি নাকি রক্তপাত অনুমোদন করছি। তাহলেই বা কী? সমাজে কি নির্বাসন, কারাগার, তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট, সশ্রম কারাদণ্ড—এসব ব্যবস্থার কোন কমতি আছে?... "এত চিন্তার কী আছে? যান না, অপরাধীকে খুঁজে বার করুন না!..."

"যদি খুঁজে বার করতে পারি?"

"তাহলে আর কী? ধরে নিতে হবে লোকটার ওটাই গতি।"

"আপনার কথার মধ্যে যুক্তি আছে যা হোক। কিন্তু তার বিবেক সম্পর্কে আপনি কী বলবেন?"

"ওর বিবেক দিয়ে আপনার কী কাজ?"

"ওই অমনি, মানবিকতার খাতিরে আর কি।"

"যার ওটা আছে সে যদি ভুল স্বীকার করে তাহলে তাকে কষ্ট পেতে দিন। সেটাই তার শাস্তি—সশ্রম কারাদণ্ডের ওপরে শাস্তি।"

"আচ্ছা, সত্যিকার প্রতিভাধররা কী করবে?" ভুরু কুঁচকে জিগ্‌গেস করল রাজুমিখিন, "ওই যে তারা, যারা খুন করার অধিকার পেয়েছে—তাদের কি আদৌ কষ্ট পাওয়া উচিত হবে না? এমনকি যে রক্তপাত তারা ঘটিয়েছে তার জন্যও না?"

"আচ্ছা, ওই উচিত-অনুচিতের কথাটা আবার কেন? এখানে নিষেধ বা অনুমতি কোনটারই প্রশ্ন আসছে না। নিজের বলি দেখে যদি কারও করুণা হয় তাহলে পাক না কষ্ট।... বোধশক্তি যাদের প্রশস্ত, যাদের উপলব্ধি গভীর, কষ্ট ও যন্ত্রণা তো তারা

ভোগ করবেই। আমার মনে হয়, যাঁরা সত্যি-সত্যি মহামানব তাঁরা এ জগতে অপরিসীম বিষণ্ণতা উপলব্ধি না করে পারেন না," হঠাৎ অন্যমনস্কভাবে সে যোগ করল। কেমন যেন বেসুরো শোনাল ওর এই শেষ কথাগুলো, যা কথাবার্তার সঙ্গে ঠিক প্রাসঙ্গিক নয়।

রাস্‌কোলনিকভের চোখে মুখে চিন্তার ছাপ। সকলের দিকে মৃদু তাকিয়ে সে টুপিটা তুলে নিল। কিছুক্ষণ আগে যে ভাব নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল তার তুলনায় সে তখন রীতিমতো শান্ত। এটা সে নিজেও বুঝতে পারছিল। তার যাবার উদ্যোগ দেখে উপস্থিত সকলে উঠে দাঁড়াল।

"আমাকে গালাগাল করুন আর যাই করুন, আমার ওপর রাগ করুন আর যাই করুন, আমি কিন্তু নিজেকে দমন করতে পারছি না," পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ আবার বলে উঠল, "আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে। বড় বেশি জ্বালাতন করছি আমি আপনাকে! কিন্তু শুধু একটিমাত্র ছোট্ট আইডিয়া বলার ইচ্ছে ছিল। এখনই বলছি একমাত্র এই কারণে, পাছে পরে ভুলে যাই..."

"বেশ বলুন আপনার সেই ছোট্ট আইডিয়াটা।" পাণ্ডুর মুখে, গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। অপেক্ষা করতে লাগল পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ কী বলে।

"মানে, দেখুন... সত্যি বলতে গেলে কি, জানি না কী ভাবে প্রকাশ করাটা যথাযথ হবে।... আইডিয়াটা আসলে বড় বেশি খামখেয়ালি গোছের... মনস্তাত্ত্বিক বলতে পারেন।... আচ্ছা, আপনি যখন প্রবন্ধটা লিখছিলেন... এমন তো হতে পারে না... হতে পারে কি... হে-হে... যে আপনি নিজে যৎসামান্য পরিমাণে হলেও নিজেকে ফেলেছিলেন এক মহাপুরুষের পর্যায়ে... যে মহাপুরুষ কিনা... আপনার নিজেরই ধারণা অনুযায়ী... *নতুন কথা* বলে থাকে?... হতে পারে কি?"

"খুবই হতে পারে", তাচ্ছিল্যভরে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ উত্তর দিল।

রাজুমিখিন নড়েচড়ে উঠল।

"তা-ই যদি হয়, তাহলে এই ধরুন না কেন, দৈনন্দিন জীবনে কোন ব্যর্থতা বা বঞ্চনার কারণে অথবা কোন না কোনভাবে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের স্বার্থে সেই বাধা অতিক্রমে আপনার এতটুকু বাধত না?...মানে ধরুন, খুন বা বাটপারিও করতে পারতেন?"

বলতে-বলতে হঠাৎ সে রাস্‌কোল্‌নিকভের দিকে তাকিয়ে আবার কেমন যেন অদ্ভুতভাবে বাঁ চোখটা টিপল, চাপা হাসি হাসল— ঠিক সেই কিছুক্ষণ আগের মতো।

"আমি যদি সে বাধা ডিঙোতাম তাহলে নিশ্চয়ই আপনাকে তা বলতাম না," উত্তরে রাস্‌কোল্‌নিকভের কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল তাচ্ছিল্য, দম্ভ ও চ্যালেঞ্জের আভাস।

"না না, এটা আমার নিছক একটা কৌতূহল। আসলে আপনার লেখাটা আরেকটু ভালো করে বোঝার উদ্দেশ্যে, নিছক সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে..."

'দেখ কী সরাসরি, কী নির্লজ্জ!' মনে-মনে দারুণ বিরক্ত হল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌।

"যদি অনুমতি হয় তো বলি," শুষ্ককণ্ঠে সে উত্তর দিল, "নিজেকে আমি মোহম্মদ বলে ভাবি না, নেপোলিয়ন বলেও ভাবি না... ওইধরনের কোন ব্যক্তি বলে আদৌ ভাবি না। সেই কারণে, আমি তাদের কেউ নই বলে, আমার আচরণ কী রকম হতে পারত তার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যাও আপনাকে দিতে পারছি না।"

"অনেক হয়েছে! আমাদের এই রাশিয়াতে আজকাল কে না নিজেকে নেপোলিয়ন বলে মনে করে বলুন তো?" পর্‌ফিরির কণ্ঠস্বরে আচমকা ফুটে উঠল এমন একটা অন্তরঙ্গ ভাব যা ভীতিজনক। এমনকি এবারে তার কথার টানেও যেন বিশেষ একটা কিছুর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল।

"আচ্ছা, গত সপ্তাহে কুড়ুলের ঘায়ে আমাদের আলিওনা ইভানোভ্‌নাকে যে খতম করা হল সেটাও কোন ভাবী নেপোলিয়নের কাজ নয় তো?" কোনা থেকে জামিওতভ্‌ ফস্‌ করে বলে বসল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ চুপ করে রইল, কঠোর স্থির দৃষ্টিতে তাকাল পর্‌ফিরির দিকে। রাজুমিখিন মুখ কালো করে ভুরু কোঁচকাল। এর আগেও মনে হচ্ছিল সে যেন কিছু একটা অনুমান করতে শুরু করে দিয়েছি। চারপাশে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। মিনিটখানেক কেটে গেল বিষণ্ণ নীরবতার মধ্যে। রাসকোল্‌নিকভ্‌ প্রস্থানের উদ্দেশ্যে ঘুরে দাঁড়াল।

"আপনি এখনই চলে যাচ্ছেন!" বড় বেশি অমায়িক ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিয়ে গদগদস্বরে পর্‌ফিরি বলল। "আলাপ করে খুশি হলাম। খুবই খুশি হলাম। হ্যাঁ, আপনার অনুরোধের ব্যাপারে, এতটুকু সন্দেহ রাখবেন না মনে। আপনাকে যেমন-যেমন বললাম ঠিক তেমনি লিখুন। আর হ্যাঁ, সবচেয়ে ভালো হয় যদি আমার অফিসে নিজে একবার এসে দেখা করেন... এই ধরুন , দিনদুয়েকের মধ্যে।... পারলে কালই আসুন না। এগারোটা নাগাদ আমি ঠিক ওখানে থাকব। তখন না হয় সব ব্যবস্থা করা যাবে... একটু-আধটু কথাবার্তাও হবে। ওখানে যারা-যারা একেবারে শেষে গিয়েছিল আপনি তাদের একজন, তাই হয়ত আমাদের কিছু বলতে পারতেন..." মুখে সদাশয় ভাব ফুটিয়ে তুলে সে বলল।

"আপনি আমাকে আনুষ্ঠানিক নিয়মকানুন অনুযায়ী, বিধিমতে জেরা করতে চান, এই তো?" রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ রূঢ়স্বরে জিগ্‌গেস করল।

"না না তা কেন? আপাতত তার কোনও প্রয়োজন নেই। আমার কথাটা আপনি ঠিক ধরতে পারেননি। আসল কথাটা কি জানেন, আমি কোন সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নই। তাই... তাই যারা-যারা বন্ধক দিয়েছিল তাদের সকলের সঙ্গেই কথা

বলেছি..: তাদের সাক্ষ্য জোগাড় করেছি... কিন্তু আপনি শেষ ব্যক্তি বলে... ও হ্যাঁ প্রসঙ্গত, এইমাত্র মনে পড়ে গেল। আরে, কী যে হয়েছে আমার!..." এবারে রাজুমিখিনের দিকে ফিরে বলল, "এই যে তুমি তখন ওই নিকোলাইয়ের ব্যাপারটা আমার কানে ঢুকিয়েছিলে... কিন্তু আমি জানি, আমি নিজেই জানি...' বলতে-বলতে রাস্কোল্নিকভের দিকে মুখ ঘোরাল। "ও ছোকরা নির্দোষ। কিন্তু আমি কী করতে পারি? দ্মিত্রিকেও তো কষ্ট দিতে হল... আসল ব্যাপারটা এখানেই কিনা.... ওইসময় সিঁড়ি দিয়ে যেতে-যেতে...মাফ করবেন, সাতটার পর-পরই তো আপনি ওখানে গিয়েছিলেন, তাই না?

"হ্যাঁ, সাতটার ঠিক পর পর," উত্তর দেবার সঙ্গে-সঙ্গে রাস্কোল্নিকভ্ অস্বস্তি বোধ করল এই ভেবে যে কথাটা সে নাও বলতে পারত।

"আচ্ছা, সাতটা থেকে আটটার মধ্যে ওইসময় সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে আপনি অন্তত দোতলার একটা ফ্ল্যাটের দরজা খোলা দেখেছিলেন কি? মনে করতে পারছেন কি? —দুজন মিস্ত্রিকে, নিদেনপক্ষে ওদের একজনকে? ওরা ওখানে ঘর রং করছিল। লক্ষ করেছিলেন? ব্যাপারটা ওদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, খুবই গুরত্বপূর্ণ।..."

"রংয়ের মিস্ত্রি? না, দেখিনি..." ধীরে-ধীরে, যেন স্মৃতি হাতড়াতে-হাতড়াতে রাস্কোল্নিকভ্ উত্তর দিল। পরক্ষণেই যন্ত্রণায় মুষড়ে পড়া সত্ত্বেও সমস্ত সত্তা টান-টান করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে খুঁজে বার করার চেষ্টা করতে লাগল ফাঁদটা আসলে ঠিক কোথায় এবং কী তার নজর এড়িয়ে যেতে পারে। দেখতে-দেখতে ফাঁদ পুরোপুরি আন্দাজ করতে পেরে আনন্দে উল্লসিত হয়ে সে বলল, " না দেখিনি। তাছাড়া ওরকম খোলা কোন ফ্ল্যাটও কেন যেন লক্ষ করিনি... তবে চারতলার... এটা মনে আছে, একজন সরকারি আমলা গোছের কেউ ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যাচ্ছিল... আলিওনা ইভানোভ্নার উলটো দিকের ফ্ল্যাট... মনে আছে... এটা আমার পরিষ্কার মনে আছে... কিছু সেপাই সোফা বা ওইধরনের কিছু ঘর থেকে বের করছিল, ফলে আমি দেয়ালের গায়ে লেপটে গিয়েছিলাম। কিন্তু রংয়ের মিস্ত্রি?— না, রংয়ের মিস্ত্রি ছিল বলে মনে করতে পারছি না ... কোথাও কোন খোলা ফ্ল্যাটও ছিল বলে মনে হয় না। না, ছিল না..."

"কিন্তু এ তুমি কী বলছ?" যেন হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে এবং কিছু একটা উপলব্ধি করতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল রাজুমিখিন। "আরে রংয়ের মিস্ত্রিরা তো রং করছিল ঠিক খুনের দিনটাতে, কিন্তু ও ওখানে গিয়েছিল তার তিন দিন আগে। তুমি কী জিগ্গেস করছ বল তো?"

"ধুত্তোর! সব গুলিয়ে গেছে!" পর্‌ফিরি কপাল চাপড়াল। "চুলোয় যাক! এই কেসটা হাতে নিয়ে আমার সমস্ত বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেতে চলেছে দেখছি!" এমনকি অনেকটা ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতেই রাস্কোল্নিকভের দিকে ফিরে সে বলল। "আসলে

সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটার মধ্যে কোনসময়ে কেউ ওদের ফ্ল্যাটে দেখেছে কিনা এটা আমাদের জানা খুব দরকার, তাইতে এই এখন মনে হয়েছিল, আপনিও বোধহয় এব্যাপারে আমাদের কিছু বলতে পারেন।... একদম গুলিয়ে ফেলেছি।"

"আরেকটু মনোযোগী হওয়া দরকার কিন্তু বাপু," রাজুমিখিন ক্ষুব্ধ হয়ে মন্তব্য করল।

শেষ কথাগুলো যখন বলা হল ততক্ষণে ওরা সামনের ঘরে চলে এসেছে। পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ দরজার একেবারে সামনে পর্যন্ত এসে তাদের এগিয়ে দিয়ে অত্যন্ত ভদ্রতার পরিচয় দিল। ওরা দুজনে যখন রাস্তায় বেরিয়ে এলো তখন দুজনেরই মুখ গম্ভীর, থমথমে। একটি কথাও না বলে বেশ কয়েক পা ফেলল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ জোরে নিঃশ্বাস নিল।...

ছয়

"বিশ্বাস করি না! বিশ্বাস করতে পারছি না!" রাস্‌কোল্‌নিকভের যুক্তিগুলো উড়িয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করল রাজুমিখিন কথাটা কয়েকবার আউড়ে। তারা দুজনে ততক্ষণে হাঁটতে-হাঁটতে চলে এসেছিল বাকালেইয়েভের হোটেলের কাছাকাছি। পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না আর দুনিয়া অনেকক্ষণ হল তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল সেখানে। কথা বলতে-বলতে উত্তেজনাবশত— সে থেকে-থেকে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। *এটা* নিয়ে যে এই প্রথম তাদের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনা হচ্ছে একমাত্র এই ভেবেই সে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল, মনে-মনে অস্বস্তি বোধ করছিল।

"বিশ্বাস কোরো না!" উদাসীন ভাব দেখিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ উত্তর দিল। "তোমার যেমন স্বভাব, তুমি সেরকম কিছু লক্ষ করনি, কিন্তু আমি প্রতিটি কথা ওজন করে দেখেছি।"

"তুমি সন্দেহপ্রবণ, তাই ওজন করে দেখেছ।... হুম্‌... বাস্তবিকই আমি মানছি, পর্‌ফিরির কথা বলার ধরনটা ছিল রীতিমতো অদ্ভুত, বিশেষ করে ওই হারামজাদা জামিওতভ্‌টা!... তুমি ঠিকই বলেছ, ওর মধ্যে সন্দেহজনক কিছু একটা ছিল। ...কিন্তু কেন? কী কারণে?"

"রাতারাতি মত পালটে ফেলেছে।"

"কিন্তু না, তার উলটো। আমি বলব বরং তার উলটো। ওদের মাথার ভেতরে যদি এই অর্থহীন চিন্তাটা থাকত তাহলে যতরকম ভাবে সম্ভব ওরা চেষ্টা করত তা গোপন রাখার... হাতের সবগুলো তাস লুকিয়ে রাখত যাতে পরে তোমাকে ধরা যায়।.... কিন্তু এখন এটাকে ঔদ্ধত্য আর অসতর্কতা ছাড়া আর কী বলা যায়!"

"ওদের কাছে যদি তথ্য থাকত অর্থাৎ সত্যিকারের তথ্য অথবা সন্দেহ করার মতো অন্তত যৎসামান্য ভিত্তিও এদের থাকত তাহলে বাস্তবিকই ওরা ওদের আসল উদ্দেশ্য গোপন করার চেষ্টা করত। চেষ্টা করত এই আশায় যে তাতে আখেরে আরো

বেশি লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। প্রসঙ্গত বলি, সেক্ষেত্রে অনেক আগেই তারা খানাতল্লাসি করত! কিন্তু ওদের হাতে একটি তথ্যও নেই। ...যা আছে সবই ভাসা-ভাসা, মরীচিকার মতো। সেগুলোর অর্থ এও হতে পারে ও-ও হতে পারে। উড়ো-উড়ো একটা আইডিয়া। ...ওরা তাই দেখিয়ে ঘায়েল করতে চাইছে। হয়ত তথ্য হাতে নেই বলে ওর নিজেরই মেজাজ খিঁচড়ে গেছে, তাই রাগে ফুঁসছে। এমনও হতে পারে যে পেছনে কোন দুরভিসন্ধি আছে।... অমনিতে তো আমার মনে হয় লোকটা বুদ্ধিমান।... হয়ত জানার ভান করে আমাকে ভয় দেখানোর তালে ছিল।... এ ভাই ওর নিজস্ব একধরনের মনস্তত্ত্ব।... যাক গে, এ নিয়ে কচকচি করতেও গা জ্বালা করে। রাখ দেখি।"

"কিন্তু হাজার হোক অপমানজনক, রীতিমতো অপমানজনক! আমি তোমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারি। কিন্তু...আমরা এখন এ নিয়ে খোলাখুলি কথা বলতে শুরু করেছি— আর আমরা যে শেষপর্যন্ত খোলাখুলি আলোচনা শুরু করেছি সেটা চমৎকার। তাতে আমি খুশি! তাই সরাসরি তোমার কাছে এখন স্বীকারও করছি যে ওদের মধ্যে অনেকদিন হল লক্ষ করে আসছি এই চিন্তাটা।... সারা সময়ই এটা ওদের মাথার মধ্যে ছিল। ...বলাই বাহুল্য, অতি সামান্য মাত্রায়, ভাসা-ভাসা। কিন্তু আমার কথা হল, ভাসা-ভাসা যদি হয়ও, তা-ই বা থাকবে কেন? এ সাহস ওদের আসে কোথা থেকে? কোথায় এর মূল? কোথায়? তুমি যদি জানতে কী ভয়ানক ক্ষেপেই না আমি গিয়েছিলাম! এ কী কাণ্ড! চরম দারিদ্র্য-বিপর্যস্ত আর বিষণ্ণতার ফলে মানসিক ভারসাম্যহীন এক গরিব ছাত্র কঠিন রোগে বেহুঁশ হয়ে পড়ার ঠিক আগে-আগে— লক্ষ করে দেখ— যখন তার মধ্যে সবে ভয়ঙ্কর উদ্বেগ, স্পর্শকাতরতা আর নিজের মূল্য সম্পর্কে সচেতনতার সূত্রপাত ঘটেছে, যখন ছয় মাস ধরে সে নিজের ঘরের কোনাটিতে পড়ে আছে, কারও সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাতের কোনও নাম নেই, যখন তার গায়ের জামাকাপড় ছিন্নভিন্ন, পায়ের জুতোজোড়ার শুকতলা ক্ষয়ে নষ্ট হয়ে গেছে... এই যখন তার অবস্থা তখন কিনা তাকে উপস্থিত হতে হচ্ছে কোথাকার কোন্ দারোগা-পুলিসের সামনে! তাদের হাতে তাকে সহ্য করতে হচ্ছে অপমান! তারপর তার নাকের সামনে তারা আচমকা বাড়িয়ে ধরছে ঋণ পরিশোধের দাবি, কোর্ট কাউন্সিলার চেবারোভের অনুকূলে একটা হ্যান্ডনোট, যার মেয়াদ পেরিয়ে গেছে। ঘরে কাঁচা রঙের উগ্র ঝাঁঝাল গন্ধ, ত্রিশ ডিগ্রির ওপর গরম, শ্বাসরোধকারী আবহাওয়া, একগাদা লোকজন, এই সেদিন যার বাড়িতে সে গিয়েছিল তার খুন হওয়ার গল্প— এইসমস্ত অত্যাচার কিনা খালি পেটের ওপরে! তা মূর্ছা সে যাবে তাতে আর বিচিত্র কি! এর ওপর, এরই ওপর ভিত্তি করে কিনা ওদের সিদ্ধান্ত! চুলোয় যাক! আমি বুঝি যে সব মিলিয়ে একটা বিরক্তিকর অবস্থা। কিন্তু রোদিয়া, আমি ভাই তোমার জায়গায় হলে সকলের মুখের ওপর হো-হো-করে হাসতাম নয়ত

আরও ভালো একটা কাজ করতাম: ওদের ওই কুৎসিত মুখগুলোর ওপর থুতু ফেলতাম— আচ্ছা করে থুতু ফেলতাম— তাছাড়া এদিক-ওদিক যে ক'টাকে হাতের কাছে পাওয়া যায় কষে তাদের কান মলে দিয়ে হাতের সুখ করে নিয়ে ওখানেই ঘটনার নিষ্পত্তি ঘটাতাম। ওদের সঙ্গে এরকমই ব্যবহার করা উচিত। তাই বলি কি, একদম ভুলে যাও! চুলোয় যাক ওরা! ওদের কথা ভাবাটাও লজ্জার!"

'যা হোক, ও দেখছি বিষয়টার একটা ভালো ব্যাখ্যাই তৈরি করেছে।' রাস্‌কোল্‌নিকভ্ মনে-মনে ভাবল।

"বলছ ভুলে যেতে? কিন্তু কাল আরেক দফা জেরা হবে!" তিক্তকণ্ঠে সে বলল। "ওদের কাছে আমি কৈফিয়ত দিতে যাব কোন্ দুঃখে? গতকাল হোটেলে যে আমি জামিওতভের স্তরে নেমে গিয়েছিলাম এই ভেবেই তো আমার দুঃখ হচ্ছে..."

"চুলোয় যাক। আমি নিজে পর্‌ফিরির কাছে যাব! একজন *আত্মীয়ের সঙ্গে* যতটা সম্ভব সেইভাবে আমি ওকে চেপে ধরব। গোড়াসুদ্ধ টেনে বার করার চেষ্টা করব ওর কাছ থেকে— দেখা যাক কী বলে। আর জামিওতভের কথা যদি বল তো আমি..."

'যাক শেষপর্যন্ত ধরতে পেরেছে।' রাস্‌কোল্‌নিকভ ভাবল।

"দাঁড়াও!" রাজুমিখিন হঠাৎ ওর কাঁধ চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল। "দাঁড়াও! তুমি ভুল বলছ! আমি ভালো করে ভেবে দেখলাম: তুমি ভুল বলছ! এর মধ্যে কী চালটা তুমি দেখলে? তুমি বলছ, মিস্ত্রিদের সম্পর্কে প্রশ্নটা ছিল আসলে একটা চাল? একটু তলিয়ে দেখার চেষ্টা কর— *এটা* যদি তোমার কীর্তি হত তাহলেও কি তোমার মুখ ফসকে কখনও এমন কথা বেরোতে পারত যে ফ্ল্যাটটা রং করতে তুমি দেখেছিলে... মিস্ত্রিদেরও দেখেছিলে? বরং তার উলটোটাই বলতে: কিছুই দেখিনি— এমনকি, যদি দেখেও থাক নিজের বিরুদ্ধে কে সাক্ষ্য দিতে যাবে বল?"

"আমি যদি ও *কাজ* করতাম, তাহলে অবশ্যই বলতাম যে ফ্ল্যাটটাও দেখেছি, রংয়ের মিস্ত্রিদেরও দেখেছি," বিরক্তির ভাব গোপন না করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও উত্তর দিল রাস্‌কোল্‌নিকভ্।

"কিন্তু নিজের বিরুদ্ধে বলতে যাওয়া কেন?"

"তার কারণ এই যে একমাত্র অজ্ঞ চাষাভুষো লোকজন অথবা একেবারে অনভিজ্ঞ আনকোরা লোকেরা জেরার সময় সবকিছু সরাসরি অস্বীকার করে থাকে, মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে। যে মানুষ একটু বেশি ঝানু, যার ঘটে সামান্য বুদ্ধিসুদ্ধি আছে সে অবশ্যই, বাইরের যে-সমস্ত তথ্য কোনমতে উড়িয়ে দেওয়া যায় না সেগুলো যতদূর সম্ভব স্বীকার করার চেষ্টা করে। তবে তাদের পেছনে সে ঠিক খুঁজে-খুঁজে বের করে দেখবে অন্যসব কারণ। নিজস্ব ধারায়, বিশেষ ধরনে এমন অপ্রত্যাশিত মোচড় দেবে যার ফলে ঘটনার তাৎপর্য সম্পূর্ণ পালটে যাবে, ঘটনা অন্য আলোকে প্রকাশ পাবে। পর্‌ফিরি সম্ভবত ঠিক এটার ওপরই ভরসা করেছিল। ...ওর ধারণা ছিল

আমিও ওরকম জবাব দেব, বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার খাতিরে অবশ্যই বলব যে দেখেছি এবং সেই প্রসঙ্গে কোন একটা কৈফিয়তও জাহির করব।...''

''কিন্তু তাহলে তো ও সঙ্গে-সঙ্গে চেপে ধরত, বলত যে দুদিন আগে ওখানে রংয়ের মিস্ত্রিদের থাকার কথা নয়।... তার মানে, তুমি খুনের সেই দিনটিতে সন্ধে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে ওখানে ছিলে। একটা তুচ্ছ সূত্র ধরে তোমাকে কাত করে দিত।''

''হ্যাঁ এটার ওপরই ও ভরসা করেছিল, ভেবেছিল আমি চিন্তাভাবনা করার সময় পাব না, তাড়াহুড়ো করে উত্তরটাকে বেশ বিশ্বাসযোগ্য করতে গিয়ে ভুলে যাব যে দুদিন আগে সেখানে রংয়ের মিস্ত্রি থাকতে পারে না।''

''সে ভুলে যাবে কী করে?''

''খুব সহজে : এই ধরনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসেই তো ধূর্ত লোকেরা অতি সহজে কাত হয়ে যায়! যে মানুষ যত বেশি ধূর্ত হয় তার মনে এই সন্দেহ তত কম দেখা যায় যে সামান্য একটা সূত্র তাকে ধরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। অতি চালাকদের ঠিক অতি সাধারণ উপায়েই কাত করতে হয়। পর্‌ফিরিকে তুমি যেমন বোকা ভাবছ আসলে সে আদৌ তা নয়...''

''এরপর ওকে ইতর ছাড়া আর কী বলা যায়!''

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ওর কথা শুনে না হেসে পারল না। কিন্তু সেইসঙ্গে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আগ্রহ নিয়ে শেষ যে ব্যাখ্যাটা ও দিল তা ওর নিজের কাছেই অদ্ভুত ঠেকল কেননা এর আগে কথাবার্তার সময় সে সর্বক্ষণ অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করছিল, মুখ গোমড়া করে ছিল। অবশ্য তার উদ্দেশ্য ছিল, প্রয়োজনীয়তাও ছিল।

'এর মধ্যে কোন-কোন বিষয় বেশ ভালো লাগতে শুরু করেছে দেখছি,' সে মনে-মনে ভাবল।

কিন্তু প্রায় সেই মুহূর্তেই হঠাৎ যেন অস্থিরতা তাকে পেয়ে বসল, যেন একটা আকস্মিক উদ্বেগজনক চিন্তায় সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। তার অস্থিরতা বাড়তে শুরু করল। ততক্ষণে, কথা বলতে-বলতে তারা বাকালেইয়েভের অতিথিশালার ঢোকার মুখে চলে এসেছে।

''তুমি একাই যাও,'' হঠাৎ রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বলে উঠল। ''আমি কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসছি।''

''কোথায় চললে তুমি? দেখ কাণ্ড! আমরা তো চলেই এসেছি!''

''আমার দরকার আছে, দরকার আছে। কাজ আছে।... আধঘণ্টা বাদে আসছি।... ওদের বোলো।''

''সে তোমার যা ইচ্ছে, তবে আমি তোমার সঙ্গে যাব!''

''কী? তুমিও আমাকে যন্ত্রণা দিতে চাও!'' তিতিবিরক্ত হয়ে সে চেঁচাল, তার

দৃষ্টিতে ফুটে উঠল এমন এক মরিয়া ভাব যে রাজুমিখিন দমে গেল। কিছুক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল দেউড়ির সামনে, মুখ গোমড়া করে তাকিয়ে দেখল রাস্‌কোল্‌নিকভ্ হনহন করে পা চালিয়ে যাচ্ছে তার বাড়ির গলির দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে, হাতের মুঠো পাকিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে সে প্রতিজ্ঞা করল আজই লেবুর মতো নিংড়ে সব বার করে নেবে পর্‌ফিরির কাছ থেকে। এদিকে ওরা অনেকক্ষণ ধরে আসছে না দেখে পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে ভেবে তাকে আশ্বস্ত করার জন্য অবশেষে সে ওপরে উঠে গেল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ যখন নিজের আস্তানায় ফিরে এলো ততক্ষণে তার কপালের দুপাশের জুলপি ঘামে ভিজে গেছে, তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে খোলা দরজা দিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকে তৎক্ষণাৎ ভেতর থেকে খিল এঁটে দিল। তারপর আতঙ্কে পাগল-পাগল হয়ে ছুটে গেল ঘরের কোনাটায়— উঠে যাওয়া ওয়ালপেপারের তলাকার সেই ফোকরটার দিকে, যার ভেতরে এর আগে জিনিসগুলো পড়ে ছিল। ভেতরে হাত গলিয়ে মিনিট কয়েক ফোকরটা তন্ন-তন্ন করে হাতড়ে দেখল। ...ওয়ালপেপারের সমস্ত ভাঁজ, আনাচে-কানাচে কোনটাই বাদ রাখল না। কিছু না পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গভীর শ্বাস নিল। আসলে এর আগে বাকালেইয়েভের দেউড়ির কাছাকাছি আসতে ওর হঠাৎ মনে হয়েছিল যে কোন একটা জিনিস— হয়ত বা কোন চেইন, জামার হাতার শৌখিন বোতাম বা ওইধরনের কিছু...এমনকি কোন কাগজ, যাতে ওসব জিনিস মোড়া ছিল, যার ওপর বুড়ির হাতে লেখা কিছু মন্তব্য ছিল... ওইদিন কোনমতে তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে কোন একটা ফাটলের মধ্যে থেকে গেলেও যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ওটাই পরে হঠাৎ তার বিরুদ্ধে একটা অপ্রত্যাশিত ও অকাট্য প্রমাণ হিসেবে দেখা দিতে পারে।

সে দাঁড়িয়ে রইল। মনে হচ্ছিল যেন গভীর ভাবনায় পড়ে গেছে। তার ঠোঁটে দেখা দিল অদ্ভুত ধরনের এক বিনীত, বোকা-বোকা হাসি। শেষকালে টুপিটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দে সে বেরিয়ে পড়ল ঘর ছেড়ে। তার ভাবনাচিন্তাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছিল। ভাবতে-ভাবতেই সে চলে এলো ফটকের নিচে।

"এই তো, এই লোক!" উঁচু গলায় কে একজন বলে উঠল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ মাথা তুলে তাকাল।

দারোয়ান তার কুঠুরির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সরাসরি তাকে দেখিয়ে একজন লোককে বলছিল। লোকটা ছোটখাটো গড়নের, দেখে মনে হয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর। গায়ে লম্বা ঢিলে পোশাক, ওয়েস্টকোট— দূর থেকে দেখে স্ত্রীলোক বলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা। মাথায় তেলচিটে টুপি। নিচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে মাথাটা, তাছাড়া সমস্ত শরীরটাই যেন ঝুঁকে পড়া। তার বলিরেখা আঁকা লোলচর্ম মুখ দেখে মনে হয় বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে। কোটরে বসা খুদে-খুদে চোখের দৃষ্টিতে প্রকাশ পাচ্ছে রূঢ়তা, কঠোরতা ও অসন্তোষের ভাব।

"কী ব্যাপার?" দারোয়ানের দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ জিগ্‌গেস করল।

আগন্তুক চোখ টেরিয়ে তার দিকে তাকাল। এতটুকু ব্যস্ততার ভাব না দেখিয়ে আড়চোখে, স্থির দৃষ্টিতে, বেশ মনোযোগ দিয়ে তাকে নিরীক্ষণ করল; তারপর ধীরে-ধীরে মুখ ঘুরিয়ে একটি কথাও না বলে বাড়ির ফটক দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

"এই যে একজন জিগ্‌গেস করছিল, এখানে কোন ছাত্র থাকে কিনা— আপনার নাম করে জিগ্‌গেস করল কার বাড়িতে আপনি থাকেন। তখনই আপনি চলে আসতে আমি আপনাকে দেখিয়ে দিলাম। দেখিয়ে দিতেই চলে গেল। এই হল ব্যাপার।"

দারোয়ানও খানিকটা ভড়কে গিয়েছিল। তবে ততটা নয়। আরও একটুখানি দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবল, তারপর ফের নিজের ডেরায় সেঁধিয়ে গেল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ ছুটে গিয়ে লোকটার পিছু নিল। সঙ্গে-সঙ্গে তাকে দেখতেও পেল — রাস্তার উলটো দিক ধরে হেঁটে চলে যাচ্ছে আগের মতো ধীর পদক্ষেপে— চোখের দৃষ্টি মাটিতে নামান। দেখে মনে হচ্ছিল কিছু একটা ভাবছে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ শিগ্‌গিরই তার নাগাল ধরে ফেলল। কিছুক্ষণ চলল তার পেছন-পেছন। অবশেষে তার পাশাপাশি চলে এসে পাশ থেকে তার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করল। লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে ওকে লক্ষ করল, দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, কিন্তু পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিল। এইভাবে ওরা দুজনে একটি কথাও না বলে, চুপচাপ পাশাপাশি পথ চলল মিনিটখানেক।

"আপনি কি... দারোয়ানের কাছে আমার কথা জিগ্‌গেস করছিলেন?" শেষকালে রাসকোল্‌নিকভ্‌ বলল। তার কণ্ঠস্বর কেন যেন তেমন ওপরে উঠল না।

লোকটা কোন উত্তর দিল না, এমনকি তার দিকে তাকালও না। আবারও দুজনে চুপচাপ।

"ব্যাপারটা কী বলুন তো?... এলেন জিগ্‌গেস করতে... এখন কিনা চুপ করে আছেন!... এর অর্থ কী?" রাস্‌কোল্‌নিকভের কণ্ঠস্বরে বাধ্‌-বাধ ভাব— কথা যেন আর স্পষ্টভাবে মুখ দিয়ে সরতে চায় না।

লোকটা এবারে চোখ তুলে তাকাল। কটমট করে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে দেখল রাসকোল্‌নিকভ্‌কে।

"খুনে!" হঠাৎ সে বলে উঠল। কণ্ঠস্বর নিচু হলেও বেশ পরিষ্কার, স্পষ্ট।...

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ চলতে লাগল লোকটার পাশাপাশি। হঠাৎ তার পাদুটো ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ল, শিরদাঁড়া সিরসির করে উঠল, মুহূর্তের জন্য হৃদ্‌পিণ্ডের গতি যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর ঠিক যেন আগল ছুটে আচমকা আবার ধড়াস করে উঠল। এভাবে ওরা শ খানেক পা পাশাপাশি হাঁটল। এবারেও সম্পূর্ণ নীরবে।

লোকটা তার দিকে তাকাল না।

"আপনি কী বলতে চাইছেন?... কী বলছেন?... কে খুনি?" অস্ফুটস্বরে বিড়বিড় করে বলল রাস্‌কোল্‌নিকভ্।

"*তুমি* খুনে," আরও স্পষ্টভাবে, আরও বেশি জোর দিয়ে লোকটি উচ্চারণ করল। তার মুখে যেন ফুটে উঠল এক ধরনের ঘৃণামিশ্রিত উল্লাসের হাসি। আবারও সে সরাসরি তাকাল রাস্‌কোল্‌নিকভের পাণ্ডুর মুখ আর নিষ্প্রভ চোখের দিকে। দুজনে ততক্ষণে চলে এসেছে চৌরাস্তার মোড়ে। লোকটা এবারে রাস্তার বাঁ দিকে মোড় নিয়ে ফিরে না তাকিয়ে চলতে লাগল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল তার চলার পথের দিকে। সে দেখল লোকটা ইতিমধ্যে পঞ্চাশ পা মতন এগিয়ে যাবার পরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে তাকে দেখছে। রাস্‌কোলনিকভ্ তখনও স্থির হয়ে একঠায় দাঁড়িয়ে। ঠিক নিরীক্ষণ করার উপায় ছিল না, কিন্তু মনে হল লোকটা যেন এবারেও তার সেই নিস্পৃহ ধরনের ঘৃণামিশ্রিত উল্লাসের হাসি হাসল।

রাস্‌কোল্‌নিকভের হাঁটু কাঁপতে লাগল, একটা শীতল স্রোত তার সর্বাঙ্গে ভীষণভাবে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। এই অবস্থায় দুর্বল পায়ে ধীরে-ধীরে সে ফিরে চলল, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে নিজের আস্তানাতে গিয়ে ঢুকল। টুপিটা মাথা থেকে খুলে টেবিলের ওপর রাখল। মিনিট দশেক সেটার পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর শক্তি হারিয়ে সোফায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। যন্ত্রণায় ক্ষীণকণ্ঠে কাতরাতে-কাতরাতে সোফার ওপর শরীরটা টান-টান করে ছড়িয়ে দিল। চোখ বন্ধ করে এইভাবে আধঘণ্টাখানেক পড়ে রইল।

নেকানকিছুই সে ভাবছিল না। অমনিতে মাথার ভেতরে ঘুরছিল একধরনের কিছু চিন্তা— বলা যেতে পারে, টুকরো-টুকরো কিছু চিন্তা, শৃঙ্খলাহীন অসংলগ্ন কিছু ছবি—এমন সব মানুষের মুখ, যাদের সে দেখেছিল সেই ছোটবেলায় অথবা যাদের সঙ্গে জীবনে মাত্র একবারই কোথাও তার সাক্ষাৎ হয়েছিল, যাদের কথা অন্য পরিস্থিতিতে কখনই তার মনে হত না। মনে পড়ল ভজ্‌নেসেন্‌স্কি গির্জার ঘণ্টামিনার, কোন এক হোটেলের বিলিয়ার্ড টেবিল, টেবিলের সামনে এক আর্মি অফিসার, কোন এক তামাকের দোকানের তলকুঠুরিতে সিগারের গন্ধ, শুঁড়িখানা, খিড়কির সিঁড়ি— ঘুটঘুটে অন্ধকার, খাবারের এঁটোকাটায় আগাগোড়া থিকথিক করছে, সর্বত্র ডিমের খোলার ছড়াছড়ি, কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে রবিবারের উপাসনার ঘণ্টাধ্বনি। ...বিষয়বস্তু একের পর এক পালটাতে থাকে—দ্রুত, ঘূর্ণিঝড়ের মতো। কোন-কোনটা তার কিন্তু ভালোই লাগছিল, সে চেষ্টা করছিল ধরে রাখার, কিন্তু সেগুলো ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল। মোটের ওপর, ভেতরে-ভেতরে কিসের যেন একটা চাপ সে উপলব্ধি করছিল, তবে সেটা তেমন দুঃসহ নয়। এমনকি সময়-সময় বেশ লাগছিল। ...সামান্য শীত-শীত ভাবটা কাটল না—এই অনুভূতিটাও কিন্তু একেবারে মন্দ লাগছিল না।

রাজুমিখিনের দ্রুত পদশব্দ ও কণ্ঠস্বর কানে যেতে সে চোখ বুজে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকল। রাজুমিখিন দরজা খুলে বেশ খানিকক্ষণ চৌকাটের ওপাশে দাঁড়িয়ে রইল— বোধহয় ভাবছিল কী করা যায়। তারপর নিঃশব্দে পা ফেলে ঘরে ঢুকে সোফার দিকে এগিয়ে গেল। শোনা গেল নাস্তাসিয়ায় ফিসফিসানি।

"ওকে জাগিও না। ভালোমতো ঘুমোতে দাও। পরে যাবে'খন।"

"যা বলেছ", উত্তরে রাজুমিখিন বলল।

দুজনেই দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে গেল। আরও আধঘণ্টাখানেক কেটে গেল। রাস্‌কোলনিকভ্ চোখ খুলল। দুহাত মাথার নিচে রেখে চিত হয়ে শুল।...

'লোকটা কে? কে এই ভুঁইফোঁড় লোকটা? কোথায় ছিল? কী দেখেছে? সব যে দেখেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেসময় তাহলে কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল? কোথা থেকেই বা দেখছিল? একমাত্র এখনই বা কেন ভুঁই ফুঁড়ে উঠে এলো? কী ভাবে দেখতে পেল? সেটা কি সম্ভব? হুম...' ভাবতে-ভাবতে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ হিম হয়ে গেল। তার সর্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরল। আর দরজার পেছনে গয়নার যে ছোট্ট বাক্সটা নিকোলাই পেয়েছিল— সেটাও কি সম্ভব? প্রমাণ? নেহাতই তুচ্ছ একটা সূত্র, চোখ এড়িয়ে গেল—ব্যস, দেখতে-দেখতে আকার নিল মিশরের পিরামিডের। কী? না একটা মাছি উড়ে যেতে-যেতে দেখতে পেয়েছিল। এমন কি সম্ভব?'

বড় বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছে, শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে—এই ভেবে হঠাৎ সে শিউরে উঠল।

'আমার এটা জানা উচিত ছিল', তিক্ত হেসে সে মনে-মনে ভাবল। 'নিজেকে জানা সত্ত্বেও, নিজেকে *আগে থাকতে* জানা সত্ত্বেও কোন সাহসে আমি কুড়ুল হাতে নিলাম, রক্তপাত ঘটাতে গেলাম? অবশ্যই আগে আমার এটা বোঝা উচিত ছিল...উঃ! কিন্তু , না, আমি তো আগে থাকতে জানতামই!' হতাশ হয়ে ফিসফিসিয়ে সে বলল।

মাঝে-মাঝে কোন একটা ভাবনার সামনে হোঁচট খেয়ে সে যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছিল।

'না, ওসব মানুষ অন্য ধাতুতে গড়া। তাঁরা সত্যি-সত্যি *প্রভুত্বকারী*, তাঁদের সবেতে অধিকার আছে। ওঁরা তুলোঁ ধ্বংস করেন, পারীতে মারদাঙ্গা বাধান, মিশরে *ভুলবশত* সেনাবাহিনী ফেলে আসেন, মস্কো অভিযানে পাঁচ লক্ষ লোকক্ষয় করার পরও মহৎ থেকে হাস্যকরের ব্যবধান মাত্র একটি পদক্ষেপ—এই মর্মে ভিলনোতে জমকাল শ্লেষোক্তি করে সবকিছু থেকে পার পেয়ে যান, তাঁর মৃত্যুর পর লোকে তাঁরই প্রতিমূর্তি গড়ে, তাঁকে পুজো করে—তার মানে, *সবেতে* তাঁর অধিকার ছিল। না, এটা পরিষ্কার যে এসব মানুষ স্রেফ ব্রোঞ্জে তৈরি। ...এঁরা রক্তমাংসের মানুষ নন!"

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও অপ্রাসঙ্গিক একটা কথা ভেবে হঠাৎ তার প্রায় হাসি পেয়ে গেল।

'কোথায় নেপোলিয়ান, পিরামিড, ওয়াটারলু আর কোথায় রেজিস্ট্রি ক্লার্কের বিধবা সেই কুৎসিত হাড়জিরজিরে সুদখোর বুড়ি, তার খাটের নিচের সেই লাল ট্রাঙ্ক।...এমনকি পরফিরি যে পরফিরি সে-ই বা এটা হজম করবে কী বলে?...সত্যিই তো ওদের সাধ্য আছে কি হজম করার... ওদের রুচিতে বাধবে না? একবার ভেবে দেখ দেখি, নেপোলিয়ান কিনা হামা দিয়ে এক 'থুখুড়ে বুড়ির' খাটের তলায় ঢুকছেন! কোন দুঃখে ঢুকবেন? ধ্যুৎ, রাবিশ!...'

সময়-সময় তার মনে হচ্ছিল সে যেন ভুল বকছে—বুঝি প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে, একটা আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে আছে।

'বুড়ি— ও একটা বাজে ব্যাপার!' উত্তেজনা ও উচ্ছ্বাসের বশে সে মনে-মনে ভাবল, 'বুড়ি সম্ভবত একটা ভুল! আসল ব্যাপার তাকে নিয়ে নয়! বুড়ি ছিল স্রেফ একটা ব্যাধি...আমি একটু তাড়াহুড়ো করে বাধা পেরোতে গিয়েছিলাম...আমি মানুষ খুন করিনি—খুন করেছি একটি নীতিকে। নীতিকে খুন করলাম বটে, কিন্তু বাধা ডিঙিয়ে ওপারে যেতে পারলাম কোথায়? —রয়ে গেলাম এধারেই। ...একমাত্র যেটা প্রাপ্তি ঘটেছে তা হল হত্যা। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সে কাজটাও ঠিকমতো করতে পারিনি।...নীতি? আচ্ছা আহাম্মক রাজুমিখিনটা! তখন সমাজতন্ত্রীদের নিন্দা করল কেন? কঠোর পরিশ্রমী আর কারবারি মানুষ—এরা 'সর্বসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের' জন্য কাজ করে। ...না, জীবন আমি একবারই পাচ্ছি—জীবন আর কখনও ফিরে আসবে না—তাই 'সর্বসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য' কবে আসবে তার প্রত্যাশায় বসে থাকলে আমার চলবে না। আমি নিজে আমার জীবন উপভোগ করতে চাই। সেটা না পারলে বেঁচে না থাকাই ভালো। তাহলে কী করা? কবে 'সর্বসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য' আসবে সেই আশায় পকেটে নিজের রুবলখানা চেপে ধরে রেখে আমার ক্ষুধার্ত মা-বোনের পাশ কাটিয়ে চলে যাব— ঠিক এই জিনিসটাই আমি চাইনি। ওরা বলে, 'সর্বসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য গড়ে তোলার জন্য ইট বয়ে নিয়ে চলেছি, তাইতে মনে-মনে প্রশান্তি পাচ্ছি'। হাঃ হাঃ! তাই যদি হয় তাহলে আমাকে উপেক্ষা করে চলে গেলে কেন? জীবন তো আমার মোটে একটা... আমিও তো চাই...নাঃ রুচির বিচারে আমি একটা নোংরা উকুনমাত্র— এর বেশি কিছু নই', হঠাৎ ক্ষ্যাপার মতো হাসতে-হাসতে সে মনে মনে বলল। 'হ্যাঁ বাস্তবিকই আমি একটা উকুন,' হিংস্র উল্লাসে চিন্তাটা আঁকড়ে ধরে, তার রহস্যোদঘাটনের চেষ্টা করতে-করতে তাই নিয়ে খেলার মজা উপভোগ করতে-করতে সে ভাবল, 'যদি তা-ই হয়, তাহলে একমাত্র এই কারণে যে প্রথমত এখন আমি নিজেকে উকুন বলে বিবেচনা করছি। দ্বিতীয়ত এই কারণে যে পুরো এক মাস ধরে পরম করুণাময়কে কত না উত্ত্যক্ত করে এসেছি, তাঁর দৈবশক্তিকে সাক্ষী মেনে বারবার তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি করে বলেছি যে নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার উদ্যোগের পেছনে আছে

এক মহৎ ও সৎ উদ্দেশ্য। হাঃ হাঃ! তৃতীয়ত, এই কারণে যে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সম্ভাব্য ন্যায়বিচারের ভরসায় আমি সমস্ত কিছু নিক্তিতে ওজন করে, মেপে, আঁকজোক করে দেখেছি যে যত নোংরা উকুন থাকতে পারে তাদের মধ্য থেকে আমি বেছে নিয়েছি সবচেয়ে অপকারীটিকে। আমি ঠিক করে রেখেছিলাম তাকে খুন করে আমার প্রথম পদক্ষেপের জন্য যতটা দরকার ঠিক ততটাই তার কাছ থেকে নেব—এর বেশিও নয় কমও নয়। বাকিটা অমনিতেই যেত মঠে—তার অন্তিম ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী—হাঃ-হাঃ! শেষপর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে এই যে আমিই একটা উকুন, নোংরা উকুন,' দাঁতে দাঁত ঘষতে-ঘষতে সে যোগ করল, 'আমি উকুন এই কারণে যে উকুন বলে যাকে খুন করেছি, আমি নিজে সম্ভবত তার চেয়েও অনেক বেশি নোংরা, আরও জঘন্য। *আগে থাকতে* আমার মন বলছিল যে খুন করার *পরে* আমি নিজেকে ঠিক এটাই বলব। এরকম একটা বিভীষিকার সঙ্গে আর কিসেরই বা তুলনা হতে পারে! ওঃ নীচতা আর কাকে বলে! কি বীভৎস! ওঃ, আমি মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করতে পারছি তলোয়ার হাতে, ঘোড়সওয়ার 'পয়গম্বরকে'। আল্লাহর মর্জি, তাই ওহে 'ভীরু' তোমাকে নতিস্বীকার করতেই হবে। 'পয়গম্বর' ঠিক, একশ বার ঠিক বলতে হবে তাঁকে যখন তিনি রাস্তার ওপর চ-ম-ৎ-কা-র একটা গোলন্দাজ দল আড়াআড়ি বসিয়ে কাউকে কিছু কৈফিয়তদানের অবকাশমাত্র না দিয়ে দোষী-নির্দোষ নির্বিশেষে সকলের ওপর নির্বিচারে গোলাবর্ষণ করেন। তাই, ওহে ভীরু প্রাণী স্বীকার কর তোমার অপরাধ এবং...মনের মধ্যে কোন *বাসনার* স্থান দিও না, কেননা এতে তোমার কোন অধিকার নেই!...ওঃ, কোনভাবেই... কোনমতেই ওই বুড়িটাকে আমি ক্ষমা করতে পারছি না!...''

তার চুল ঘামে ভিজে সপসপ করছে। ঠোঁট শুকিয়ে চড়চড় করছে, কাঁপছে। স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ ছাদের কড়িকাঠে।

'মা বোন...ওদের কত ভালোই না বাসতাম আমি! এখন যে আমি ওদের ঘৃণা করছি তার কারণ কী? হ্যাঁ, আমি ওদের ঘৃণা করি, মনেপ্রাণে ঘৃণা করি, নিজের পাশে ওদের সহ্য করতে পারছি না।...এই তো কিছু আগে আমি মার কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে চুমু খেয়েছিলাম, আমার মনে আছে।...তাকে জড়িয়ে ধরা, সেইসঙ্গে মনে-মনে ভাবা যে যদি জেনে থাকে, তাহলে...তখন কি তাকে বলতে পারতাম? আমার কাছ থেকে সেটা অপ্রত্যাশিত হবে না...হুম্! সম্ভবত *সেও* আমারই মতো', বিকার ও আচ্ছন্নতার ভাব আসন্ন হয়ে উঠতে থাকায় যেন তার সঙ্গে যুঝতে-যুঝতে অনেক চেষ্টা করে ভাবতে লাগল। 'ওঃ কি ঘৃণাই না আমি এখন করি ওই বুড়িটাকে। মনে হচ্ছে ওর সংজ্ঞা যদি ফিরে আসত তাহলে আরও একবার ওকে খুন করতাম। বেচারি লিজাভেতা! মরতে কেন যে ওখানে আসতে গেল ওইসময়! ...আশ্চর্য, কেন যেন ওর সম্পর্কে আমি প্রায় ভাবছিই না, যেন ওকে আমি খুনই করিনি! লিজাভেতা!

সোনিয়া! বড় নিরীহ ওরা! নিরীহ ওদের চোখের দৃষ্টিও। ...বড় মায়া হয়। ওরা কাঁদে না কেন? কেন কাতরোক্তি করে না মুখ ফুটে? ...ওরা সর্বস্ব দিয়ে দেয়, তাকায় নিরীহ নম্র শান্ত দৃষ্টিতে। ... সোনিয়া, সোনিয়া! আহা, কি শান্ত মেয়ে!...'

তার বাহ্যজ্ঞান লোপ পেল। ঘোরের মধ্যে কখন কী ভাবে সে রাস্তায় এসে পড়েছে ভাবতে তার আশ্চর্য লাগল। ততক্ষণে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। গোধূলির আলো-আঁধারি ঘন হয়ে নামছে, আকাশে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে পূর্ণিমার চাঁদ। কিন্তু বাতাসে কেমন যেন একটা গুমোট ভাব। রাস্তায় লোকের ভিড়—কারিগর, ছুতোর মিস্ত্রি, দোকানদার আর নানা ধরনের কাজের লোকজন দলে-দলে চলেছে যে যার বাড়ির মুখে। কেউ-কেউ অমনি ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাতাসে চুন ধুলো আর বদ্ধ জলের গন্ধ। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বিষণ্ণ ও চিন্তিত মুখে হাঁটছে। তার বেশ মনে পড়ছিল কোনও একটা উদ্দেশ্য নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, কী যেন একটা করা দরকার ছিল, তাড়াও ছিল। কিন্তু সেটা যে ঠিক কী, সে ভুলে গেছে। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, দেখতে পেল রাস্তার উলটো দিকের ফুটপাতে কে একজন দাঁড়িয়ে ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। রাস্তা পার হয়ে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তার দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে, যেন কিছুই হয়নি, তাকে যেন আদৌ ডাকেনি এমন ভাব করে মাথা নামিয়ে মুখ ঘুরিয়ে হাঁটতে লাগল, একবার ফিরেও তাকাল না। 'যাক গে, আমাকে ডেকেছিল কিনা তা-ই বা কে জানে?' মনে-মনে একথা ভাবলেও রাস্‌কোল্‌নিকভ্ কিন্তু তার নাগাল ধরার জন্য দ্রুত পা বাড়াল। দশ-পা-খানেক যেতে না যেতে সে হঠাৎ চিনতে পারল লোকটাকে। সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ে আঁতকে উঠল। আগের দেখা কুঁজো ধরনের সেই লোকটা—যাকে দেখে মধ্যবিত্তশ্রেণীর বলে মনে হয় পরনে সেই ঢিলে লম্বা আচকান। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ দূরত্ব বজায় রেখে চলতে লাগল। তার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। দুজনে গলির ভেতরে মোড় নিল। তখনও লোকটা পিছন ফিরে তাকাল না। 'আচ্ছা ও কি জানে যে আমি ওর পিছু নিয়েছি?' রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ভাবল। লোকটা একটা বিশাল বাড়ির ফটকের মধ্যে ঢুকে পড়ল। রাসকোল্‌নিকভ্ তাড়াতাড়ি ফটকের কাছে এগিয়ে এসে দেখতে লাগল লোকটা ফিরে তাকায় কিনা এবং তাকে ডাকে কিনা। বাস্তবিকই তাই— ফটক পেরিয়ে বাড়ির আঙিনায় ঢুকে পড়ার পর লোকটা চট করে মাথা ঘোরাল, এবারেও মনে হল ঠিক যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তৎক্ষণাৎ ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল, কিন্তু লোকটাকে দেখতে পেল না। তার মানে প্রথমে যে সিঁড়িটা পড়ছে সেটা দিয়েই গেছে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ছুটে তার পিছু নিল। যা ভেবেছিল তা-ই—সিঁড়ির দুটো পাক ওপরে তখনও শোনা যাচ্ছিল কারও সমান তালে ধীরেসুস্থে পা ফেলার আওয়াজ। আশ্চর্য, সিঁড়িটা যেন কেমন চেনা-চেনা! ওই তো একতলার সেই জানলাটা— জানলার কাচ ভেদ করে ঝরে পড়ছে জ্যোৎস্নার আলো— বিষণ্ণ,

রহস্যজনক। এবারে দোতলা। বা, এ তো সেই ফ্ল্যাটটা যেখানে মিস্ত্রিরা রং লাগাচ্ছিল.... কী করে এমন হল যে সঙ্গে-সঙ্গে সে চিনতে পারেনি? সামনের সেই লোকটির পদশব্দ মিলিয়ে গেছে। 'তার মানে, সে থেমে গেছে অথবা এখানেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে।' এই যে তেতলা। আর দূরে যাওয়া কি ঠিক হবে? কী নিস্তব্ধ! গা ছমছম করছে।... তবু সে এগিয়ে গেল। নিজের পদশব্দে নিজেই ভয় পেয়ে যাচ্ছিল, চমকে উঠছিল। ওঃ কী অন্ধকার! লোকটা সম্ভবত এখানেই কোথাও কোনও কোনাঘুপচিতে ঘাপটি মেরে আছে। আঃ! এই ফ্ল্যাটটার সামনের দরজা দেখা যাচ্ছে উদোম খোলা। একটু ইতস্তত করে সে ভেতরে ঢুকে পড়ল। ঘরের সামনের খালি জায়গাটায় ঘুটঘুটে অন্ধকার, ফাঁকা। জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই— মনে হয় যেন ঘরের যাবতীয় সামগ্রী সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আস্তে-আস্তে পা টিপে-টিপে সে গিয়ে ঢুকল বসার ঘরে। সমস্ত ঘর জুড়ে জ্যোৎস্নার প্রখর আলোর বন্যা। চেয়ার, আয়না, হলুদ রঙের সোফা, ফ্রেমে বাঁধান ছবি সবই সেই আগের মতন। লালচে তামাটে বিশাল গোল থালার মত চাঁদটা সরাসরি উঁকি মারছে জানলা দিয়ে। 'এই চাঁদের আলোর জন্যই এমন নিস্তব্ধতা,' রাস্‌কোল্‌নিকভ্ মনে-মনে ভাবল। 'চাঁদ এখন নির্ঘাত কোন রহস্য সমাধানে মেতেছে।' সে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। চাঁদের আলো যত মৃদু হতে থাকে ততই তীব্র হয়ে ওঠে তার বুকের স্পন্দন— এমনকি ব্যথায় টনটন করতে থাকে বুকের ভেতরটা। এই নিস্তব্ধতার যেন কোন শেষ নেই। হঠাৎ মুহূর্তের জন্য শোনা গেল শুকনো ডাল ভাঙার মতো মট্ করে একটা আওয়াজ। তারপর আবার চারদিক নিস্তব্ধ। একটা মাছি জেগে উঠে হঠাৎ উড়তে-উড়তে কাচের ঘায়ে ধাক্কা খেয়ে করুণ সুরে গুঞ্জন করছে। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের কোনায় আর ছোট আলমারির মাঝখানের দেয়ালে সে যেন ঝুলতে দেখল মেয়েদের গায়ের একটা ঢিলে কোর্তা। 'এই কোর্তাটা এখানে কেন?' সে মনে-মনে ভাবল। 'এটা তো আগে এখানে ছিল না...' সে ধীরে-ধীরে সেদিকে এগিয়ে গেল, তার মনে হচ্ছিল কোর্তার আড়ালে বুঝি কেউ লুকিয়ে আছে। সন্তর্পণে হাত দিয়ে কোর্তাটা একপাশে সরাতে দেখতে পেল সেখানে দাঁড় করান আছে একটা চেয়ার, চেয়ারের এক কোনায় সর্বাঙ্গ কুঁকড়ে গুটিসুটি মেরে বসে আছে সেই বুড়ি। মাথাটা একপাশে হেলে আছে— ফলে ভালো করে মুখটা সে দেখতে পেল না। কিন্তু এ যে সেই বুড়ি তাতে কোন সন্দেহ নেই। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রইল। 'হুঁ হুঁ ভয় পাচ্ছে।' মনে-মনে এই ভেবে আস্তে করে কুড়ুলটা ফাঁস থেকে আলগা করে এনে বুড়ির চাঁদি লক্ষ করে ঘা বসিয়ে দিল। ...একবার, আরও একবার। কিন্তু আশ্চর্য! কুড়ুলের আঘাতে এতটুকু নড়ল না— যেন কাঠের পুতুল। রাস্‌কোলনিকভ্ ভয় পেয়ে গেল। আরও কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে তাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। কিন্তু বুড়ি মাথাটা আরও নিচে নামিয়ে ফেলল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্

এবারে মেঝের একেবারে কাছাকাছি ঝুঁকে পড়ে মাথা উলটো দিকে ঘুরিয়ে তলা থেকে দেখার চেষ্টা করল তার মুখ। দেখে আতঙ্কে তার শরীর হিম হয়ে গেল। বুড়ি বসে-বসে হাসছে— নিঃশব্দ চাপা হাসি উপচে পড়ছে তার চোখেমুখে— প্রাণপণ চেষ্টা করছে যাতে তার হাসি রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ শুনতে না পায়। হঠাৎ রাস্‌কোল্‌নিকভের মনে হল শোবার ঘরের দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে গেল— ওখানেও কারা যেন হাসাহাসি করছে, নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছে। একটা ক্ষিপ্ততা তাকে পেয়ে বসল, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বুড়ির মাথায় সমানে ঘা মারতে শুরু করল, কিন্তু কুড়ুলের প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে-সঙ্গে শোবার ঘর থেকে হাসি আর ফিসফিস কথাবার্তার আওয়াজ ক্রমেই বেশি জোরাল হয়ে বাজতে লাগল। এদিকে বুড়ি যেমনকার তেমন হাসছে তো হাসছেই। হাসতে-হাসতে তার সমস্ত শরীর দুলছে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ এবারে পালানোর উদ্যোগ করল, কিন্তু সামনের ঘরটা ইতিমধ্যে লোকজনে উপচে পড়েছে। সিঁড়ির দিকের দরজাটা উদোম খোলা। ঘরের বাইরে, সিঁড়িতে, সিঁড়ির নিচ অবধি সমস্ত জায়গা জুড়ে শুধু লোক, লোক আর লোক, মাথার পর মাথা। সকলে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে, কিন্তু সবাই চুপ, অপেক্ষা করছে নীরবে।... রাস্‌কোল্‌নিকভের বুকের ভেতরটা দমে গেল। তার পা চলে না, যেন মাটিতে শেকড় গজিয়ে গেছে।... সে চেঁচাতে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে তার চটক ভেঙে গেল।

ভারী নিঃশ্বাস টানল। কিন্তু আশ্চর্য। স্বপ্নটা যেন তখনও শেষ হয়নি। তার ঘরের দরজা হাঁ করে খোলা। চৌকাটে দাঁড়িয়ে আছে একেবারে অচেনা একজন লোক। স্থির দৃষ্টিতে তাকে নিরীক্ষণ করছে।

রাস্‌কোলনিকভ্‌ তখনও চোখ পুরোপুরি খোলার অবকাশ পায়নি, সঙ্গে-সঙ্গে আবার বুজে ফেলল। সে চিত হয়ে শুয়ে রইল, নড়াচড়া করল না। 'স্বপ্নটা কি এখনও চলছে?' মনে-মনে এই ভেবে অলক্ষে চোখের পাতা সামান্য ফাঁক করে সে তাকিয়ে দেখতে গেল। অচেনা লোকটি সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাকে নিরীক্ষণ করে চলছে। আচমকা লোকটা সন্তর্পণে ঘরের চৌকাট পেরোল, ঘরে ঢুকে সাবধানে দরজাটা ভেজিয়ে দিল, টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে মিনিটখানেক অপেক্ষা করল— এর মধ্যে একবারও রাস্‌কোল্‌নিকভের ওপর থেকে চোখের দৃষ্টি সে সরায়নি। এতটুকু শব্দ না করে আস্তে সোফার কাছের চেয়ারে সে বসল, মাথার টুপিটা খুলে একপাশে মেঝের ওপর রাখল। তারপর হাতের ছড়ির মাথায় দুহাত রেখে তার ওপর থুতনি ভর দিল। দেখাই যাচ্ছিল দীর্ঘসময় অপেক্ষা করার জন্য তৈরি হয়েই এসেছে। বন্ধপ্রায় চোখের পাতার সামান্য ফাঁক দিয়ে পিটপিট করে যতদূর দেখতে পাওয়া সম্ভব তাতে রাসকোল্‌নিকভের মনে হল লোকটাকে যুবক বলা চলে না, বেশ বলিষ্ঠ গড়নের, মুখে চাপদাড়ি—দাড়ির রং হালকা, প্রায় সাদা।...

মিনিট দশেক কেটে গেল। তখনও দিনের আলো আছে, তবে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। ঘরের মধ্যে অখণ্ড নীরবতা। এমনকি সিঁড়ি থেকেও কারও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। কেবল একটা বড় মাছি উড়তে-উড়তে জানলার কাচে ধাক্কা খাচ্ছে, গুনগুন করে চলেছে। শেষকালে ধৈর্য হারিয়ে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ এক ঝটকায় উঠে বসল।

"কী ব্যাপার? কী চাই আপনার, বলুন দেখি!"

"আমি ঠিকই ধরেছি, আপনি ঘুমোচ্ছেন না, ঘুমের ভান করছেন মাত্র," শান্ত হাসি হেসে অদ্ভুতভাবে উত্তর দিল অচেনা লোকটি। "মহাশয়ের আজ্ঞা হয় তো আমার পরিচয় দিই— আর্কাদি ইভানোভিচ স্‌ভিদ্রিগাইলভ।..."

চতুর্থ পর্ব

'এও কি হতে পারে যে এখনও সেই স্বপ্নই চলছে?' রাস্‌কোল্‌নিকভের আরও একবার মনে হল। সাবধানী ও সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগল অপ্রত্যাশিত আগন্তুকটিকে।

"স্‌ভিদ্রিগাইলভ্? বাজে কথা! হতেই পারে না!" হতচকিত রাস্‌কোল্‌নিকভের মুখ দিয়ে শেষকালে বেরিয়ে পড়ল।

মনে হল আগন্তুক এই মন্তব্যে এতটুকু অবাক হল না।

"আপনার কাছে আমার আসা দু'টো কারণে। প্রথমত, ব্যক্তিগতভাবে আপনার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে, যেহেতু বহুকাল হল আপনার সম্পর্কে আগ্রহ জাগিয়ে তোলার মতো অনেক ভালো-ভালো কথা শুনে এসেছি। দ্বিতীয়ত, আমি মনে-মনে এই আশা পোষণ করি যে আপনার ভগিনী আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার স্বার্থের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত আমার একটা প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে আপনি সম্ভবত অসম্মত হবেন না। আমার সম্পর্কে কতকগুলো প্রতিকূল ধরণাবশত আপনার সুপারিশ ছাড়া আমাকে একা সম্ভবত উনি ওঁর ধারে-কাছেও ঘেঁষতে দেবেন না। অন্যদিকে, আমার ধারণা আপনার সাহায্য পেলে..."

"ভুল ধারণা আপনার," রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বাধা দিয়ে বলল।

"ওঁরা মাত্র গতকাল এসে পৌছেছেন, তাই না?"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ জবাব দিল না।

"আমি জানি, গতকাল। আসলে, আমি নিজেই সবে গতকাল এসে পৌছেছি। যা হোক, রোদিওন রমানোভিচ—এ ব্যাপারে আমি আপনাকে যা বলতে চাই শুনুন। আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলতে চাওয়া আমার মনে হয়, সময়ের অপচয়মাত্র। কিন্তু অনুগ্রহ করে আমাকে একথাও জানানোর সুযোগ দিন : সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে সুস্থবুদ্ধিতে যদি বিচার করতে যান তাহলে সমস্ত ঘটনাটির মধ্যে আমার দিক থেকে আসলে অপরাধজনক কী এমন ছিল বলতে পারেন?"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ আগের মতোই একটি কথাও না বলে তাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

"আমি আমার নিজের বাড়িতে একটি অবলা মেয়ের ওপর নির্যাতন করেছি, 'ন্যক্কারজনক প্রস্তাব দিয়ে তাকে অপমান করেছি'— এই তো? দেখছেন তো আমি আপনার মনোভাব আগে থাকতেই ধরে ফেলেছি! কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখুন —

আমিও একজন মানুষ— et nihil humanum... এককথায়, আমারও আকর্ষণ করার ক্ষমতা আছে, প্রেমে পড়ার ক্ষমতা আছে যেটা অবশ্যই সবসময় আমাদের নিজেদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না— তাহলেই দেখবেন, সমস্ত ব্যাপারটার একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। এখানে গোটা প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে এই যে আমি একটা পাষণ্ড, না আমি নিজেই পরিস্থিতির শিকার? পরিস্থিতির শিকার কীভাবে, জিগ্গেস করবেন তো? দেখুন, আমার মনোযোগের বস্তুকে যে আমার সঙ্গে আমেরিকায় বা সুইজারল্যান্ডে পালিয়ে যাবার প্রস্তাব আমি দিয়েছিলাম তার মূলে হয়ত তাঁর প্রতি আমার পরম শ্রদ্ধাবোধই কাজ করেছিল, তাছাড়া আমি আমাদের পারস্পরিক সুখের কথাও ভেবেছিলাম!... যুক্তি তো আসলে আবেগের দাস। মাফ করবেন, যদি বলি সম্ভবত আমি নিজেরই বেশি ক্ষতি করেছি!..."

"কিন্তু আসল ব্যাপারটা একেবারে অন্য," তাকে বাধা দিয়ে বিতৃষ্ণার সুরে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বলল। "আপনি ঠিক বলুন আর বেঠিকই বলুন মোদ্দা কথাটা এই যে আপনি বাজে লোক। তাই ওরা আপনাকে পাত্তা দিতে চায় না, আপনাকে খেদিয়ে দেয়। অতএব কেটে পড়ুন।..."

স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল!

"যাই বলুন না কেন... আপনাকে কিন্তু ফাঁকি দেওয়া মুশকিল!" যতদূর সম্ভব অন্তরঙ্গ ভাব দেখিয়ে হাসতে-হাসতে সে বলল। "আমি ভেবেছিলাম একটু চালাকি খাটিয়ে দেখা যাক, কিন্তু না, আপনি ঠিক জায়গায় ঘা দিয়েছেন!"

"কিন্তু আপনি এই এখন, এই মুহূর্তেও চালাকি খাটিয়ে যাচ্ছেন।"

"যদি তাই হয় তাতে দোষ কী? তাতেই বা কী?" স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ প্রাণ খুলে হাসতে-হাসতে আওড়াল। "এই না হলে ন্যায়যুদ্ধ! —যাকে বলে bonne guerre!... এবং চালাকিরও চূড়ান্ত অনুমোদন আছে!... কিন্তু তাহলেও আপনি আমার কথার মাঝখানে বাধা দিয়েছেন। যে দিক থেকেই বলুন না কেন, আমি আবার জোর দিয়ে বলছি: বাগানের সেই ঘটনাটি ছাড়া অপ্রীতিকর আর কিছুই ঘটেনি। মার্ফা পেত্রোভ্‌না..."

"লোকে বলে, মার্ফা পেত্রোভ্‌নাকেও নাকি আপনি সরিয়েছেন?" রূঢ়ভাবে তার কথার মাঝখানে বলে উঠল রাস্‌কোল্‌নিকভ্।

"ও, আপনি সে কথাও শুনেছেন? অবশ্য হ্যাঁ, শুনবেনই বা না কেন?...তা আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে কী বলব আমি সত্যিই জানি না, যদিও এব্যাপারে আমার বিবেক পূর্ণমাত্রায় শান্ত। অর্থাৎ কিনা, ভাববেন না যে ওইধরনের কোন আশঙ্কা আমার আছে। সবই ঠিক নিয়মমতো এবং সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়েছে — ময়না তদন্তে কারণ হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে প্রায় এক বোতল সুরা সহযোগে ভরপেট আহারের ঠিক পরপর স্নান করার ফলে সন্ন্যাসরোগের আক্রমণ —অন্য কিছু বের

হওয়া সেখানে সম্ভব ছিল না।... না কোন একসময়— বিশেষ করে পথে— ট্রেনের কামরায় বসে আমি মনে-মনে চিন্তা করে দেখেছি মানসিক শান্তির ব্যাঘাত বা ওইধরনের কিছু ঘটিয়ে আমি কিছু পরিমাণে এই পুরো ব্যাপারটার... এই দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়াইনি তো? কিন্তু আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে এ প্রশ্ন অবান্তর।"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ হেসে উঠল।

"এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করা কি সাজে!"

"কিন্তু আপনি হাসছেন যে? ভেবে দেখুন, আমি ওকে মোটে দুবার চাবুক মেরেছিলাম— তাতে ওর গায়ে এতটুকু আঁচড় পড়েনি।... দয়া করে আমাকে সিনিক ভাববেন না। বলবেন আমার আচরণ জঘন্য ধরনের ছিল, আরও কত কি... সে আমি নিজেই ভালোভাবে জানি। কিন্তু আমি এও জানি, যেটাকে আমার এক ধরণের শখই বলা যেতে পারে আমার স্ত্রী মার্ফা পেত্রোভ্‌না তাতে সম্ভবত খুশিই ছিলেন। আপনার ভগিনীকে নিয়ে যে ঘটনা তা নিঃশেষে চুকেবুকে গেল। ইতিমধ্যে দু'দিন হয়ে গেল, মার্ফা পেত্রোভ্‌নাকে বাধ্য হয়ে ঘরে বসে থাকতে হচ্ছে। শহরের লোকজনের কাছে আর কী নিয়ে হাজির হবেন? তিনি তাঁর ওই চিঠি দিয়ে সকলকে জ্বালিয়ে খেয়েছেন।... ঢিঢি পড়ার কথা নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন?... তারপরই হঠাৎ ওই দু'ঘা চাবুক... এ যেন ঈশ্বর-প্রেরিত!... তার প্রথম কাজ হল গাড়িতে ঘোড়া জোতার হুকুম দেওয়া!... এ কথার উল্লেখ না হয় না-ই করলাম যে মেয়েদের ক্ষেত্রে এমন ঘটনাও ঘটে থাকে যখন বাইরে সবরকমভাবে প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ করলেও অপমানিত হয়ে সুখ পায়, রীতিমতো সুখ পায়। এটা সকলের মধ্যে আছে... মানে, এ ধরনের ঘটনা আর কি। আপনি লক্ষ করে দেখেছেন কি, মানুষ মোটের ওপর অপমানিত হতে ভালোবাসে— খুব ভালোবাসে, এমনকি, ভীষণ ভালোবাসে? কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এমনকি, বলা যেতে পারে যে একমাত্র এর মধ্যেই তারা বেঁচে থাকার সুখ খুঁজে পায়।

একবার রাস্‌কোল্‌নিকভ্ এই সাক্ষাৎকারের পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য উঠে চলে যাবার কথাও ভাবছিল। কিন্তু খানিকটা কৌতূহল এমনকি, এক ধরনের বিবেচনাবোধ মুহূর্তের জন্য তাকে আটকে রেখে দিল।

"আপনি কি মারধর পছন্দ করেন?" অন্যমনস্কভাবে সে জিগ্‌গেস করল।

"না, খুব একটা করি না," শান্তভাবে উত্তর দিল স্‌ভিদ্রিগাইলভ্। মার্ফা পেত্রোভ্‌নার সঙ্গে মারামারি প্রায় কখনও হত না। আমাদের মধ্যে বেশ মিলমিশ ছিল, আমাকে নিয়ে তাঁকে সবসময় বেশ সন্তুষ্ট থাকতে দেখেছি। আমাদের মোট সাত বছরের বিবাহিত জীবনে চাবুক আমি ব্যবহার করেছি মোটে দুবার— যদি অবশ্য না ধরা হয় তৃতীয় আরেকটি ঘটনার কথা। ...প্রসঙ্গত সেটা দ্ব্যর্থব্যঞ্জক বটে, প্রথম ব্যবহার করেছিলাম আমাদের পরিণয়ের দু'মাস পরে— গ্রামে আসার সঙ্গে-সঙ্গে।

তারপর এই এখনকার, শেষ ঘটনা। অথচ দেখুন, আপনি কিনা ভাবলেন আমি একটা পাষণ্ড, পশ্চাদ্‌গামী, জমিদারি মেজাজের লোক! হে- হে!... আচ্ছা হ্যাঁ, আপনার মনে আছে কি, রোদিওন রমানোভিচ, কয়েক বছর আগেকার একটা ঘটনা... জনসাধারণের মঙ্গলের স্বার্থে সব ঘটনাই প্রকাশ করার তখনও চল ছিল... সেই সময় কোন এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক... নামটা তাঁর আমি ভুলে গেছি... ট্রেনের কামরায় একটা জার্মান মেয়েকে চাবকেছিলেন বলে তখনকার পত্রপত্রিকাগুলো সাহিত্যের সবরকম মারপ্যাঁচ কষে সর্বসাধারণ্যে তাঁকে কী তুলোধুনো করেই না ছেড়েছিল! মনে আছে? আমার মনে হয় সেই সময়, সেই একই বছরে এক সাহিত্যের আসরে কোন এক বিশিষ্ট মহিলা পুশকিনের 'মিশরীয় রজনী' আবৃত্তি করায় তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রুপ প্রকাশ করে কী 'কুৎসিত আচরণেরই' না পরিচয় দিয়েছিল 'যুগ' পত্রিকা! সেই প্রথম প্রকাশ্য আবৃত্তি একজন মহিলার! —মনে আছে তো? আহা, সেই কালো চোখ। হায় রে, কোথায় গেল আমাদের যৌবনের সেই সোনার দিনগুলো! তা যাই হোক মশায়, আমার মত এই: জার্মান মেয়েটিকে যিনি চাবকান সেই ভদ্রলোকের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই, কেননা, সত্যিই তো... সহানুভূতির কী আছে বলুন? কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও না জানিয়ে পারছি না যে সময়-সময় এমন সব বজ্জাত 'জার্মান মেয়ের' পাল্লায় পড়তে হয় যে আমার মনে হয় যত বড় প্রগতিবাদীই হোক না কেন, কারও পক্ষে হলফ করে নিজেকে সামলানোর কথা বলা সম্ভব নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তখন কেউই মনোযোগের বস্তুটিকে দেখেনি, অথচ এটাই কিন্তু সত্যিকার, খাঁটি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি!"

এই কথা বলে স্‌ভিদ্রিগাইলভ হঠাৎ আবার হেসে উঠল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ স্পষ্ট বুঝতে পারল যে লোকটা ভালোমতো কোন মতলব এঁটে এসেছে, সেটা ফাঁস করছে না।

"আপনি নিশ্চয়ই পরপর বেশ কয়েক দিন কারও সঙ্গে কোনও বাক্যালাপ করেননি?" সে জিগ্‌গেস করল।

"প্রায় তাই। কিন্তু তাতে কী? আমি এরকম একজন সপ্রতিভ লোক— এই ভেবে অবাক হচ্ছেন কি?"

"না, আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে আপনি বড্ড বেশি সপ্রতিভ।"

"কারণ এই যে আপনার অভদ্র প্রশ্নে আমি অসন্তোষ প্রকাশ করিনি— তাই তো? কিন্তু অসন্তুষ্ট হওয়ার কী আছে বলুন তো? যেমন প্রশ্ন করেছেন তেমনি উত্তরও পেয়েছেন," মুখে একটা আশ্চর্যরকমের খোলামেলা ভাব প্রকাশ করে সে যোগ করল। "দেখুন, প্রায় কোন কিছুতেই আমার বিশেষ কোন আগ্রহ নেই, বিশ্বাস করুন, মাইরি বলছি," অনেকটা যেন আপন মনে ভাবতে-ভাবতে সে বলল। "এখন বিশেষ কোন কাজে ব্যস্ত আছি, তাও বলা চলে না।... যা হোক, আপনার অবশ্য

একথা ভাবতে কোন বাধা নেই যে আমার তোষামোদের পেছনে আসলে কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে... বিশেষত আমি যখন আগেই বলেছি যে আপনার ভগিনী সম্পর্কে আমার কিছু আলোচনার আছে। কিন্তু আমি খোলাখুলিভাবে আপনাকে বলছি— বড় একঘেয়ে লাগছিল। —বিশেষত গত তিনদিন হল। তাই আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি বরং খুশিই হয়েছি।... রাগ করবেন না, রোদিওন রমানোভিচ, কিন্তু আপনাকে আমার কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে ভারি অদ্ভুত লাগছে। যাই বলুন না কেন, আপনার মধ্যে কী যেন একটা আছে— ঠিক এখনই, অর্থাৎ কিনা ঠিক এই মুহূর্তে নয়— মোটের ওপর, এখন...যাক গে, যাক গে, আর কথা বাড়াতে চাই না। ...আপনি মুখ ভার করবেন না! আপনি আমাকে যেমন জানোয়ার ভাবছেন আমি কিন্তু তা নই।"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ মুখ গোমড়া করে তার দিকে তাকাল।

"আপনি হয়ত আদৌ জানোয়ার নন," সে বলল। "এমনকি, আমার মনে হয় আপনি খুবই ভদ্র পরিবার থেকে এসেছেন, কিংবা অন্ততপক্ষে প্রয়োজন হলে ভদ্র হওয়ার মতো বুদ্ধিও আপনার আছে।"

"সে যাক গে, কারও মতামতের আমি তেমন তোয়াক্কা করি না,"নীরস কণ্ঠে, উদ্ধত ভঙ্গিতে উত্তর দিল স্‌ভিদ্রিগাইলভ, "আর ভুল না হওয়ারই বা কী আছে যখন এই বেশটা আমাদের আবহাওয়ায় পরার এমন উপযোগী এবং... এবং বিশেষত সেদিকে যদি স্বাভাবিক ঝোঁকও থাকে," আবার হাসতে-হাসতে সে যোগ করল।

"আমি কিন্তু শুনেছি এখানে আপনার অনেক চেনাজানা লোক আছে। একেবারে 'যোগাযোগহীন লোক' বলতে যা বোঝায় আপনি অবশ্যই সে পর্যায়ে পড়েন না। সে ক্ষেত্রে, কোন উদ্দেশ্য না থাকলে আমাকে আপনার কী দরকার?"

"আমার অনেক চেনাজানা লোক আছে, আপনি ঠিকই ধরেছেন," রাস্‌কোল্‌নিকভের কথার মূল সুরটিকে উপেক্ষা করে স্‌ভিদ্রিগাইলভ বলে উঠল, "ইতিমধ্যে লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেওছি। ঘোরাঘুরি করছি তো তিনদিন হতে চলল। আমি তাদের চিনতে পারছি, তারাও আমাকে চিনতে পারছে মনে হয়। দেখতেই পাচ্ছেন আমার পোশাক-পরিচ্ছদ রীতিমতো ভদ্র এবং আমাকে দরিদ্র মোটে বলা যায় না। এমনকি ভূমিদাস প্রথা উঠে গিয়ে যে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে তাতেও আমাদের গায় লাগেনি। বনজঙ্গল, ঘাসজমি— যেমনকার তেমন আমাদের রয়ে গেছে, সেসব থেকে যা আয় হওয়ার তা তো মার খাচ্ছে না। কিন্তু... ওখানে আমি আর যাচ্ছি না। আগেই ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। আমি আজ তিনদিন হল এখানে ঘোরাফেরা করছি, কিন্তু কারও কাছে এখন পর্যন্ত এটা বলিনি।... একবার চেয়ে দেখুন, আমাদের এই শহরটা! মানে, একবার চেয়ে দেখুন কী ভাবে এটা গড়ে উঠেছে! কেরানিদের শহর, রাজ্যের যত ধর্মীয় পাঠশালার পড়ুয়াদের শহর! এটা ঠিক যে বছর আষ্টেক আগে আমার যখন এখানে যাতায়াত ছিল তখন এখানকার অনেক

কিছু আমার নজরে পড়েনি।... এখন আমার একমাত্র ভরসা অ্যানাটমি, সত্যি বলছি!"

"কিসের অ্যানাটমি?"

"এই আপনাদের সব ক্লাব, এই দুসোতের হোটেল, আপনাদের এইসব আমোদ-প্রমোদের জায়গা— এগুলোর কথা বলছি আর কি। কিংবা যদি চান তো ধরতে পারেন উন্নতির কথাও। ...যাক গে, ওসব আমাদের ছাড়াই হোক," এবারেও প্রশ্নটাকে আমল না দিয়ে সে বলে চলল। "তাছাড়া সাধ করে কে-ই বা জুয়া খেলে বলুন?"

"আপনি তা হলে জুয়াও খেলেছেন?"

"আলবাৎ! আমাদের পুরো একটা দল ছিল, দস্তুরমতো সম্ভ্রান্ত সব লোকজন। বছর আষ্টেক আগেকার কথা। সময় কাটাতাম আমরা। চমৎকার আচার-ব্যবহার সকলের— তাদের মধ্যে কবি ছিল, পুঁজিপতি লোকজনও ছিল। তাছাড়া, মোটের ওপর আমাদের রুশীদের সমাজে দেখবেন যারা ঘা খাওয়া লোকজন তাদের আচরণ সবচেয়ে ভালো। এটা আপনি লক্ষ করেছেন কি? এই এখন না হয় আমি হড়কে পাড়াগাঁয়ে এসে পড়েছি। কিন্তু সেই সময় নেজিনের এক ব্যাটা নোংরা গ্রিক ঋণের দায়ে আমাকে জেলে পুরে দিয়েছিল আর কি! ঠিক এই সময় আমার ভাবী স্ত্রী মার্ফা পেত্রোভ্‌নার উদয়। অনেক দর কষাকষির পর তিরিশ হাজার চাঁদি দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে আনেন। মোট ঋণের পরিমাণ ছিল সত্তর হাজার। আমরা আইনসম্মতভাবে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলাম। উনি আমাকে তৎক্ষণাৎ দামি সম্পদের মতো তাঁর নিজের গাঁয়ে নিয়ে গেলেন। জেনে রাখুন আমার চেয়ে বয়সে উনি পাঁচ বছরের বড়। খুবই ভালোবাসতেন। সাত বছর গ্রামের বাইরে যেতে পারিনি। আর লক্ষ করুন, সারা জীবন অন্য আরেক জনের নামে আমার বিরুদ্ধে তিরিশ হাজারের ওই দলিলটা ধরে রেখেছিলেন। বুঝতেই পারছেন, আমি কোনরকম ট্যাঁ ফোঁ করার চেষ্টা করলে আর দেখতে হত না— সোজা ফাঁদে গিয়ে পড়তাম! দরকার হলে তা তিনি করতেনও। মেয়েদের মধ্যে এ জিনিসটা কিন্তু সহজাত।"

"ওই দলিল না থাকলে আপনি কি পার পেতেন?"

"জানি না কী বলব। এই দলিল আমার তেমন কোন অসুবিধা সৃষ্টি করেনি। কোথাও যেতে আমার ইচ্ছে হত না। আমার একঘেয়ে লাগছে দেখে মার্ফা পেত্রোভ্‌না দু'একবার নিজে থেকে যেচে আমাকে বিদেশে ঘুরে আসার পরামর্শও দিয়েছিলেন। কিন্তু ওতে কীই বা লাভ। বিদেশে আমি আগেও গেছি বারকয়েক, বরাবরই আমার বাজে লাগত। জানি না, কেন। কিন্তু সূর্যোদয় দেখুন, দেখুন নেপ্‌লস উপসাগর, সমুদ্র— যা-ই দেখুন না কেন, বড় বেজার লাগে। সবচেয়ে বিচ্ছিরি লাগে তখনই যখন সত্যি-সত্যি কোন কারণে বিষণ্ণতা আপনাকে পেয়ে বসে। না, নিজের দেশেই ভালো— এখানে অন্তত সব ব্যাপারে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারেন, নিজের

সাফাই গাইতে পারেন। আমার পক্ষে এখন সবচেয়ে ভালো হত উত্তর মেরুতে কোন অভিযানে যেতে পারলে, কেন না j'ai le vin mauvais— মাতাল অবস্থায় আমি ভালো নই। মদ খেতেও আমার বিচ্ছিরি লাগে, অথচ মদ ছাড়া আমার আর কিছু থাকছে না। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, জানি। আচ্ছা, লোকের মুখে এসব কী শুনছি?— কোন, এক বের্গ না কে, রবিবার ইউসুপভ্ গার্ডেন্‌স্ থেকে বিশাল এক বেলুনে চড়ে আকাশে উড়বে? ভালো দক্ষিণার বিনিময়ে সহযাত্রী হওয়ার জন্য নাকি লোকজনকে ডাকাডাকি করছে? সত্যি নাকি?"

"কেন, আপনি যেতেন নাকি?"

"আমি? না... এই অমনি..." স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ যেভাবে বিড়বিড় করে বলল তাতে মনে হল যেন সত্যি-সত্যি এই নিয়ে সে ভাবছে।

'লোকটা কি বাস্তবিকই তাই ভাবছে নাকি?' রাস্‌কোল্‌নিকভ্ মনে-মনে ভাবল।

"না দলিল আমার কোন অসুবিধা সৃষ্টি করেনি," স্‌ভিদ্রিগাইলভ অন্যমনস্কভাবে বলল। "আমি নিজেই ইচ্ছে করে গ্রাম ছেড়ে বের হইনি। তাছাড়া বছরখানেক আগে আমার জন্মতিথিতে মার্ফা পেত্রোভ্‌না দলিলটা আমায় ফেরত দেন, শুধু তাই নয়— সেইসঙ্গে একটা মোটা অঙ্কের টাকাও উপহার দেন। ওঁর বেশ ভালো পুঁজি ছিল কিনা।" 'আমি আপনাকে কেমন বিশ্বাস করি দেখুন আর্কাদি ইভানভিচ'— উনি আমাকে বলেন— ঠিক এই কথাই বলেন। আপনার বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না যে এই কথা বলেন? জানেন কি, গ্রামে আমি বেশ ভদ্র জমিদার বলে পরিচিত হই? সকলে আমাকে একডাকে চেনে। ডাকে বইপুথিও আনাতাম। গোড়ার দিকে মার্ফা পেত্রোভ্‌নার সায় ছিল, কিন্তু পরে তার মনে ভয় ঢুকে গেল পাছে আমি বাড়াবাড়ি রকমের পড়াশুনো করে ফেলি।"

"মার্ফা পেত্রোভ্‌নার জন্যে আপনার বড় মন খারাপ করছে যেন।"

"আমার? তা হতে পারে। হ্যাঁ, তা তো হতেই পারে। আচ্ছা হ্যাঁ, আপনি প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করেন?"

"কী ধরনের প্রেতাত্মা?"

"সাধারণ— যেমন হয়ে থাকে!"

"আপনি বিশ্বাস করেন?"

"বলতে গেলে, সম্ভবত না। Pour vous plaire— আপনার মন পাবার জন্য... মানে, একেবারে যে বিশ্বাস নেই তাও নয়..."

"দেখেছেন নাকি কখনও?"

স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

"আমার স্ত্রী আমাকে দেখা দিতে শুরু করেছেন," মুখ বেঁকিয়ে একধরনের অদ্ভুত হাসি হেসে সে বলল।

"দেখা দিতে শুরু করেছেন কী রকম?"

"তাহলে আর কী বলছি! ইতিমধ্যে তিনবার দেখা দিয়ে গেছেন। প্রথমবার দেখেছিলাম ঠিক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিনে, কবরখানা থেকে ফেরার এক ঘণ্টা বাদে। সেটা ছিল আমার এখানে রওনা হওয়ার আগের দিন। দ্বিতীয়বার —গত পরশু দিন, এখানে আসার পথে, খুব ভোরে, মালায়া ভিশেরা স্টেশনে। তৃতীয়বার —দু'ঘণ্টা আগে যে ফ্ল্যাটে আমি এসে উঠেছি সেখানে, আমার ঘরে। আমি একা ছিলাম।"

"আপনি কি জেগে ছিলেন?"

"পুরোমাত্রায়। তিনবারই আমি জেগে ছিলাম। উনি এসে মিনিটখানেক কথা বলে দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। সবসময় দরজা দিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি শোনাও যাচ্ছে আওয়াজটা।"

"আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল যে এই ধরনের কিছু একটা আপনার জীবনে অবশ্যই ঘটে থাকে!" হঠাৎ রাসকোল্‌নিকভ্ বলে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে একথা বলায় সে নিজেই অবাক হয়ে গেল। তাকে ভয়ঙ্কর উত্তেজিত দেখাল।

"কী-ই? আপনি এটা ভেবেছিলেন?" স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ অবাক হয়ে জিগ্‌গেস করল, "সত্যি বলছেন? কেমন? আমি আপনাকে বলিনি যে আমাদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল আছে? অ্যাঁ?"

"আপনি কস্মিনকালে একথা বলেননি!" উত্তরে তীব্রকণ্ঠে ঝাঁঝিয়ে উঠল রাস্‌কোল্‌নিকভ্।

"বলিনি?"

"না!"

"আমার মনে হল যেন বলেছিলাম। এইমাত্র ঘরে ঢুকে যখন আমি দেখতে পেলাম আপনি চোখ বুজে ঘুমের ভান করে শুয়ে আছেন তখনই আমি মনে-মনে বললাম, 'ইনিই সেই!' "

"ইনিই সেই মানে? আপনি কী বলতে চান?" চিৎকার করে বলে উঠল রাস্‌কোল্‌নিকভ্।

"কী বলতে চাই? সত্যি বলতে গেলে কি, জানি না..." মনে হল কতকটা হকচকিয়ে গিয়ে বিড়বিড় করে অকপটে স্বীকার করল স্‌ভিদ্রিগাইলভ্।

মিনিটখানেক দুজনেই চুপচাপ। দুজনেই দুজনের দিকে তাকাল চোখ বড়-বড় করে।

"যত সব বাজে কথা!" রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বিরক্ত হয়ে বলে উঠল। "তা আপনার স্ত্রী যখন আসেন তখন তিনি আপনাকে কী বলেন?"

"ওঁর কথা বলছেন? একবার ভেবে দেখুন: তুচ্ছাতিতুচ্ছ সমস্ত বিষয়— ভাবলে অবাক হয়ে যাবেন। এতেই তো আমার গা জ্বালা করে। প্রথমবার যখন দেখা

দিয়েছিলেন, আমি তখন অত্যন্ত ক্লান্ত: অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, আত্মার সদ্‌গতির জন্য প্রার্থনা, তারপর আত্মার শান্তি কামনায় তরলদ্রব্য ঢালাঢালি ও কিঞ্চিৎ জলযোগের পর্ব—শেষকালে নিজের কাজের ঘরে একা— তখন একটা সিগার ধরিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছি, এমন সময় দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। বললেন, 'আজ আপনি নানা ব্যস্ততার মধ্যে খাবার ঘরে ঘড়িতে দম দিতে ভুলে গেছেন দেখছি, আর্কাদি ইভানভিচ্।' বাস্তবিকই ওই ঘড়ি আমি গত সাত বছর হল প্রতি হপ্তায় দম দিয়ে আসছি। ভুলে গেলে উনি সবসময় মনে করিয়ে দিতেন। পরের দিন, আমি তখন এখানে আসার পথে—ভোরবেলায় স্টেশনে নামলাম—সারারাত শুধু ঝিমিয়েছি, শরীর ভেঙে পড়ছে ক্লান্তিতে, চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। কফি অর্ডার দিলাম। চোখ তুলে তাকাতে দেখি মার্ফা পেত্রোভ্‌না হঠাৎ আমার পাশে এসে বসছেন, তাঁর হাতে একসেট তাস। বললেন, 'এ যাত্রায় আপনার ভাগ্যে কী আছে তাস গুনে আপনাকে বলব নাকি আর্কাদি ইভানভিচ্?' ভাগ্যগণনায় তিনি একজন বিশারদ। কিন্তু আমি যে আমার ভাগ্য গুনতে দিলাম না এই ভেবে আমার এখন বড় আফসোস হচ্ছে! ভয়ে পালিয়ে গেলাম সেখান থেকে, ঠিক এইসময় অবশ্য গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টাও পড়ল। আজ কোথাকার কোন্ এক হোটেল থেকে আনা অতি অখাদ্য খাবার দিয়ে ভোজনপর্ব সারার পর পেটটা বেশ ভার-ভার লাগছিল—বসে-বসে ধূমপান করছি—এমন সময় আবার আমার স্ত্রী মার্ফা পেত্রোভ্‌না ঘরে ঢুকলেন। পোশাকের কী বাহার! সিল্কের নতুন পোশাক—সবুজ রং, পোশাকের পেছন দিকটা অনেকখানি লম্বা হয়ে মাটিতে লুটোচ্ছে। 'কেমন আছেন, আর্কাদি ইভানভিচ্? আমার নতুন পোশাকটা আপনার কেমন লাগছে? আনিস্‌কা এরকম সেলাই করতে পারে না।' আনিস্‌কা আমাদের গাঁয়ের দরজি। এক ভূমিদাসের মেয়ে, একসময় বেগার খাটত। মস্কোয় ট্রেনিং নিয়েছিল। চমৎকার মেয়ে! যা হোক, মার্ফা পেত্রোভ্‌না আমার সামনে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক পাক খাচ্ছেন। আমি পোশাকটা ভালো করে দেখলাম, তারপর মনোযোগ দিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। 'এমন সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আমার কাছে আসতে, আমার শান্তি ভঙ্গ করতে আপনার ভালোও লাগে মার্ফা পেত্রোভ্‌না!' 'ওরে বাবা, এক মুহূর্তের জন্যেও ওনার শান্তি ভঙ্গ করা যাবে না! হা ভগবান!' আমি ওকে খেপানোর উদ্দেশ্যে বললাম : 'মার্ফা পেত্রোভ্‌না, আমি বিয়ে করতে চাই।' 'আপনার কাছ থেকে এটা অপ্রত্যাশিত নয় আর্কাদি ইভানভিচ্। তবে প্রথম স্ত্রীকে সমাধিস্থ করতে না করতে তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে যাওয়া—এতে আপনার গৌরব বৃদ্ধি হবে না। ভালো পছন্দ করতে পারলেও না হয় বুঝতাম। তা না হলে, আপনার নিজের বা তার—কারোই সুখ হবে না—এটা আমি ঠিক জানি। শুধুই লোক হাসাবেন।' এই বলে বেরিয়ে চলে গেলেন। আমার মনে হল তাঁর পোশাকের পেছনের লুটিয়ে পড়া আঁচলটার মেঝেতে ঘষটানোর খসখস আওয়াজ যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম। কী যা তা ব্যাপার বলুন তো!"

"হুঁ, বলা যায় না, আপনি হয়ত আমাকে গুচ্ছের মিথ্যে কথা বলে গেলেন", রাস্‌কোল্‌নিকভ্ উত্তরে বলল।

"আমি কদাচিৎ মিথ্যে বলি", স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল। রাস্‌কোল্‌নিকভের মন্তব্যের স্থূলতা যেন সে গায়েই মাখল না।

"আচ্ছা এর আগে আপনি কি কখনও ভূত দেখেছেন?"

"ন্‌না।...হ্যাঁ, জীবনে আর মাত্র একবারই দেখেছিলাম, ছয় বছর আগে। আমাদের এক চাকর ছিল ফিল্‌কা। সবে তাকে কবর দেওয়া হয়েছে— সেকথা ভুলে গিয়ে আমি হাঁক দিলাম : 'ফিল্‌কা আমার পাইপটা দে!' বলার সঙ্গে-সঙ্গে সে এসে ঢুকল, সোজা এগিয়ে গেল কুলুঙ্গিটার দিকে, যেখানে আমার পাইপ থাকে। আমি তখন বসে-বসে ভাবছি : 'ব্যাটা এখন আমার ওপর প্রতিশোধ নেবে।' কারণ এই যে ও মারা যাওয়ার ঠিক আগে-আগে আমাদের মধ্যে তুমুল বচসা হয়েছিল। আমি বললাম, 'তোর এত সাহস ছেঁড়া কনুই নিয়ে আমার সামনে এসেছিস! বেরিয়ে যা হতভাগা!' তৎক্ষণাৎ মুখ ঘুরিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। আর আমার কাছে আসেনি। মার্ফা পেত্রোভ্‌নাকে তখন আর ঘটনাটা বলিনি। ভেবেছিলাম ওর আত্মার সদ্‌গতির জন্য একটা প্রার্থনার ব্যবস্থা করব, কিন্তু বিবেকে বাধল।"

"ডাক্তার দেখান।"

"সে তো আপনি না বললেও বুঝতে পারি যে আমি সুস্থ নই, যদিও সত্যি বলতে গেলে কি অসুখটা কী তা জানি না। আমার মনে হয় আমি সম্ভবত আপনার চেয়ে পাঁচগুণ বেশি সুস্থ। আমি আপনাকে একথা জিগ্‌গেস করিনি যে ভূতপ্রেতের আবির্ভাবে আপনি বিশ্বাস করেন কিনা। আমি জিগগেস করেছিলাম আপনি প্রেতাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন কিনা।"

"না; কখনও বিশ্বাস করব না।" বেশ খানিকটা রাগতস্বরেই রাস্‌কোল্‌নিকভ্ চেঁচিয়ে উঠল।

"সচরাচর লোকে কী বলে?" মাথাটা সামান্য কাত করে অন্য দিকে তাকিয়ে অনেকটা যেন আপন মনেই বিড়বিড় করে বলল স্‌ভিদ্রিগাইলভ্। "লোকে বলে, 'তুমি অসুস্থ, অর্থাৎ তুমি যা দেখছ বলে ভাবছ তা কল্পনামাত্র, বিকারবশত মনের ভুল।' অথচ দেখুন এর পেছনে কিন্তু অকাট্য কোন যুক্তি নেই। আমি মানতে রাজি আছি যে ভূতপ্রেত একমাত্র অসুস্থদেরই দেখা দিয়ে থাকে। কিন্তু দেখুন, তাতে শুধু এটাই প্রমাণিত হয় যে অসুস্থ লোক ছাড়া আর কাউকে তারা দেখা দেয় না। ভূতের কোন অস্তিত্বই নেই একথা কিন্তু প্রমাণিত হচ্ছে না।"

"অবশ্যই নেই!" রাস্‌কোল্‌নিকভ্ জিদ ধরে বিরক্তির সঙ্গে বলল।

"নেই? আপনি তাই মনে করেন?" ধীরে-ধীরে চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে বলল স্‌ভিদ্রিগাইলভ্। "আচ্ছা, ধরুন আমরা যদি এইভাবে বিচার করি...এক্ষেত্রে

আপনি আমাকে সাহায্যও করতে পারেন : 'প্রেতাত্মা—এ হল, বলতে গেলে আমাদের ইহজগতের বাইরের অন্য কোন জগতের খণ্ডাংশ, টুকরোটাকরা, সৃষ্টির সূচনাপর্ব। বলাই বাহুল্য, একজন সুস্থ মানুষের তা দেখতে পাবার কোন কারণ নেই, যেহেতু সুস্থ মানুষ অল্পবিস্তর পার্থিব মানুষ। অর্থাৎ ইহলোকের জীবন, সেই জীবনের পরিপূর্ণতা ও অনুশাসনই তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। আবার দেখুন, যেই একটু অসুস্থ হয়ে পড়ল, সেই মুহূর্তে তার দেহের অভ্যন্তরে পার্থিব অনুশাসনের সামান্য বিচ্যুতি ঘটল অমনি অন্য জগতের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠতে থাকল। যে মানুষ যত বেশি অসুস্থ, তত বেশি সে অন্য জগতের সংস্পর্শে আসে, ফলে মানুষ যখন একেবারে মারা যায় তখন সে এ জগৎ অতিক্রম করে সোজা চলে যায় অন্য জগতে। এ নিয়ে আমি অনেক আগে ভাবনা-চিন্তা করে দেখেছি। পরকালে যদি বিশ্বাস করেন তাহলে এই যুক্তিকেও বিশ্বাস করতে হয়।"

"আমি পরকালে বিশ্বাস করি না", রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বলল।

স্‌ভিদ্রিগাইলভ চিন্তিতভাবে বসে রইল।

"আচ্ছা যদি সেখানে কেবল মাকড়সা বা ওইধরনের কিছু থাকে তাহলে?" হঠাৎ সে বলে উঠল।

'লোকটা উন্মাদ', রাস্‌কোল্‌নিকভ মনে-মনে ভাবল।

"অসীম, অনন্ত—এই সমস্ত ধারণাকে আমরা সবসময় আমাদের উপলব্ধির বাইরে বিপুল, বিশাল কিছু একটা বলে ধরে নিই! কিন্তু তাকে বিশাল বা বিপুলই হতে হবে তার কী মানে আছে? ভেবে দেখুন এ সবের জায়গায় আপনি হঠাৎ পাচ্ছেন একটা ছোট্ট ঘর— পাড়াগাঁয়ে শরিকী স্নানঘর যেমন হয়—কালিঝুলিপড়া, কোনায়-কোনায় মাকড়সা—ওখানেই তো সমগ্র অসীম! বুঝলেন, আমি অনেক সময় এইভাবে কল্পনা করে থাকি।"

"এর থেকে বেশি সান্ত্বনাদায়ক, আরও যুক্তিসঙ্গত কিছু কি আপনি ভাবতে পারেন না? সত্যিই পারেন না!" যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ করে উঠল রাস্‌কোল্‌নিকভ্।

"আরও যুক্তিসঙ্গত বলছেন? সে কী করে জানব? হয়ত এটাই যুক্তিসঙ্গত। জানেন, আমি হলে ঠিক এটাই করতাম!" রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল স্‌ভিদ্রিগাইলভের মুখে।

এমন একটা বেয়াড়া ধরনের উত্তর পেয়ে রাস্‌কোল্‌নিকভের সর্বাঙ্গ হঠাৎ সিরসির করে উঠল। স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ মাথা তুলে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে, আচমকা ফেটে পড়ল অট্টহাসিতে।

"না, ভেবে দেখুন একবার", সে চেঁচিয়ে বলল, আধঘণ্টা আগেও আমাদের মধ্যে কোন সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল না, আমরা একে অন্যকে শত্রু বলে ভাবি। আমাদের দুজনের মধ্যে একটা বিষয় এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। অথচ দেখুন, সেসব

কাজ ছেড়ে কিসের কি কচকচানি শুরু করে দিয়েছি! দেখুন, আমি ঠিক বলিনি যে আমরা আসলে একই গোত্রের মানুষ?"

"এবারে আমাকে একটি অনুগ্রহ করুন," বিরক্তির সুরে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বলল, "আমার বিনীত নিবেদন এই যে দয়া করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি আমাকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলুন দেখি এই দর্শন দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করার পেছনে আপনার আসল উদ্দেশ্যটা কী...তাছাড়া...তাছাড়া আমার তাড়া আছে, আমার সময় নেই, আমি বাড়ির বাইরে যেতে চাই।..."

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আপনার বোন আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার বিয়ে হতে যাচ্ছে পিওতর পেত্রোভিচ লুজিনের সঙ্গে, ঠিক কিনা?"

"আচ্ছা, আমার বোন সম্পর্কে প্রশ্ন-ট্রশ্নগুলো কোনভাবে বাদ দিলে এবং তার নামের উল্লেখ না করলে কি চলে না? তার নাম আপনি মুখেই বা আনেন কোন্ সাহসে—এটাও তো আমি বুঝতে পারি না—অবশ্য যদি আপনি বাস্তবিকই স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ হয়ে থাকেন!"

"কিন্তু উল্লেখ না করে আমি পারি কী করে বলুন তো, যখন আমি তাঁকে নিয়েই কথা বলব বলে এসেছি?"

"বেশ, বলুন তাহলে। তবে যা বলার তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন!"

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার স্ত্রীর সূত্রে আমার আত্মীয় এই মিস্টার লুজিন সম্পর্কে ইতিমধ্যে আপনার একটা নিজস্ব মতামত গড়ে উঠেছে, যদি আপনি তাকে দেখে থাকেন—অন্তত আধঘণ্টার জন্যেও, অথবা নিদেনপক্ষে যদি তার সম্পর্কে বিশ্বাসজনক ও সঠিক কিছু শুনে থাকেন। উনি আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার উপযুক্ত পাত্র হতে পারেন না। আমার মতে আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না এই ব্যাপারে তাঁর...তাঁর নিজের পরিবারের লোকজনের খাতিরে বড় বেশি মহত্ত্ব দেখিয়ে এবং সব দিক খতিয়ে না দেখে আত্মত্যাগ করতে যাচ্ছেন। আপনার সম্পর্কে আমি যতদূর শুনেছি, তাতে আমার এই ধারণা হয়েছে যে আপনাদের স্বার্থের হানি না ঘটিয়ে এ বিয়ে যদি ভেঙে যায় তাহলে আপনার দিক থেকে সেটা অত্যন্ত সুখের হবে। এখন ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে জানার পর এতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই।"

"এটা আপনার বড় বেশি সরলতা—মাফ করবেন, আমি বলতে চাইছিলাম—বেহায়াপনা", রাস্‌কোল্‌নিকভ বলল।

"তার মানে, আপনি বলতে চাইছেন যে আমি আমার নিজের লাভটাই দেখছি। চিন্তা করবেন না রোদিওন রমানোভিচ, আমি যদি আমার নিজের স্বার্থসিদ্ধির মতলবে থাকতাম, তাহলে নিজের মনের কথা আপনাকে এমন খোলাখুলি বলতাম না। হাজার হোক আমি আকাট মুখ্যু নই। এই বিষয়ে আমি একটা অদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক দিক আপনাকে খুলে বলব। কিছুক্ষণ আগে আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার প্রতি আমার

ভালোবাসার কৈফিয়ত হিসেবে আমি বলেছিলাম যে আমি নিজেই আসলে পরিস্থিতির শিকার। তাহলে জেনে রাখুন, এখন তার প্রতি আমার কোন ভালোবাসার উপলব্ধি নেই—বিন্দুমাত্র নেই— দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি, অথচ দেখুন, একটা উপলব্ধি সত্যি-সত্যিই আমার ছিল..."

"বিলাসব্যসন আর লাম্পট্য থেকে", রাস্‌কোল্‌নিকভ বাধা দিয়ে বলল।

"বাস্তবিকই আমি বিলাসী আর লম্পট। সে যাই হোক আপনার বোনের এমন কতকগুলো গুণ আছে যে আমিও তাতে কতকটা মুগ্ধ না হয়ে পারিনি। কিন্তু এখন আমি যা দেখতে পাচ্ছি, ওসব কথা অর্থহীন র‍্যাবিশ।"

"অনেক আগেই দেখতে পেয়েছিলেন কি?"

"এটা আমি আগেও লক্ষ করেছিলাম, তবে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ দৃঢ় প্রত্যয় হয় গত পরশু দিন, বলতে গেলে ঠিক যে মুহূর্তে আমি সেন্ট পিটার্সবুর্গে এসে পৌঁছাই। প্রসঙ্গত, মস্কোতে যখন ছিলাম তখনও কিন্তু মনে-মনে কল্পনা করেছিলাম যে মিস্টার লুজিনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার পাণিপ্রার্থনা করতে যাচ্ছি।"

"মাফ করবেন, আপনার কথার মাঝখানে বাধা দিচ্ছি। দয়া করে একটু সংক্ষেপে সেরে সরাসরি আপনার আগমনের উদ্দেশ্যটা প্রকাশ করা কি সম্ভব নয়? আমার তাড়া আছে, বাইরে যাওয়া দরকার।..."

"সানন্দে। খুবই খুশি হব তা করতে পারলে। এখানে এসে এক ধরনের...অভিযানের উদ্যোগ নেব স্থির করার পর কতকগুলো অবশ্যপ্রয়োজনীয় প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বনের বাসনা আমার হল। আমার ছেলেমেয়েরা তাদের এক মাসির কাছে আছে। তারা বড়লোক, ব্যক্তিগতভাবে আমাকে তাদের প্রয়োজনও নেই। তাছাড়া কী ধরনেরই বা বাবা আমি, বলুন? এক বছর আগে মার্ফা পেত্রোভ্‌না আমাকে যে পরিমাণ অর্থ উপহার দিয়েছিলেন কেবল ততটাই আমি নিজের জন্যে নিয়েছি। আমার পক্ষে সেটা যথেষ্ট। মাফ করবেন, এবারে আসল কাজের প্রসঙ্গে আসছি। এই যে অভিযানে আমি নামতে যাচ্ছি এবং যাতে সম্ভবত আমি সফল হবও, তার আগে আমি মিস্টার লুজিনের ব্যাপারটাও নিকেশ করতে চাই। কারণ এই নয় যে তাঁকে আমি একেবারে বরদাস্ত করতে পারি না, কিন্তু মার্ফা পেত্রোভ্‌নার সঙ্গে আমার ঝগড়া বাধে তাঁকে নিয়েই, যখন আমি জানতে পারি যে এ বিয়ে তাঁরই কারসাজি। আমি এখন আপনার মধ্যস্থতায় আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার সঙ্গে দেখা করতে চাই এবং সম্ভবত আপনার উপস্থিতিতেই তাঁকে বোঝাতে চাই যে প্রথমত মিস্টার লুজিনের কাছ থেকে তাঁর সামান্যতম লাভ তো হবেই না, বরং নিদারুণ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তারপর সাম্প্রতিক ওইসব অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আমি তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁকে দশ হাজার রুবল দেওয়ার

প্রস্তাব রাখতাম। এইভাবে মিস্টার লুজিনের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদে আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার নিজেরও কোন আপত্তি থাকবে না—একমাত্র যদি তা সম্ভব হয়।"

"কিন্তু আপনি বাস্তবিকই পাগল, বদ্ধ উন্মাদ।" যতটা না ক্রুদ্ধ তার চেয়ে বেশি আশ্চর্য হয়ে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ বলল। "কোন্‌ সাহসে আপনি এমন কথা বলতে পারেন।"

"আমি ঠিক জানতাম যে আপনি চেঁচামেচি শুরু করে দেবেন। কিন্তু প্রথমত, আমি বড়লোক না হলেও এই দশহাজার রুবল আমার বাড়তি। অর্থাৎ এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই, একেবারে প্রয়োজন নেই। আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না যদি গ্রহণ না করেন তা হলে সম্ভবত আরও মূর্খের মতো কোন কাজে লাগিয়ে ফেলব। এটা প্রথম কথা। দ্বিতীয়ত, আমার বিবেক সম্পূর্ণ পরিষ্কার। আমার প্রস্তাবের পেছনে কোন গোপন অভিসন্ধি নেই। বিশ্বাস করুন আর না করুন, পরে আপনি জানতে পারবেন, আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নাও জানতে পারবেন। আসল ঘটনা এই যে আমি বাস্তবিকই আমার অশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী আপনার ভগিনীর বেশ খানিকটা ঝামেলা ও বিরক্তির কারণ হয়েছিলাম। ফলে আন্তরিকভাবে অনুতাপের বশবর্তী হয়ে সর্বান্তঃকরণে আমার এই কামনা—এটা কোন প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা নয়, অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য মূল্য পরিশোধ নয়, আমি চাই স্রেফ তাঁর জন্য ভালো একটা কিছু করতে— এই ভিত্তিতে যে লোকের কেবল মন্দ করারই যে বিশেষ সুবিধা আমার আছে এমন নয়। আমার এই প্রস্তাবের মধ্যে যদি অন্তত লক্ষভাগের এক ভাগও হিসাবের ব্যাপার থাকত তাহলে আমি এমন সরাসরি প্রস্তাব রাখতাম না। তাছাড়া মাত্র দশ হাজার রুবলের প্রস্তাবও দিতাম না, যেখানে মাত্র পাঁচ সপ্তাহ আগে আরও বেশি দিতে চেয়েছিলাম তাঁকে। উপরন্তু, খুব সম্ভব শিগ্‌গির, খুবই শিগ্‌গির আমি একটি বাচ্চা মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছি, ফলে আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার ওপর কোন ধরনের হামলা হয়েছে বলে যে সমস্ত সন্দেহ আছে তাও এই উপায়ে ঘুচান দরকার। পরিশেষে আমি বলতে চাই যে মিস্টার লুজিনকে বিয়ে করলে আভ্‌দোতিয়া রামানোভ্‌নার এই একই পরিমাণ অর্থপ্রাপ্তি ঘটছে। তবে অন্যদিক থেকে...না, না, আপনি রাগ করবেন না রোদিওন রমানোভিচ। শান্ত মনে ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করে দেখুন।"

স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ নিজে কিন্তু অত্যন্ত শান্ত মনে ঠাণ্ডা মাথায় কথাগুলো বলল।

"দয়া করে শেষ করুন", রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ বলল। "যাই বলুন না কেন, আপনার ঔদ্ধত্য ক্ষমার অযোগ্য।"

"মোটেই না। তাই যদি হত তাহলে এই জগতে মানুষ মানুষের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু করতে পারত না এবং স্রেফ ফাঁকা কতকগুলো প্রচলিত সামাজিকতার কারণে অন্যের ছিটেফোঁটা উপকার করারও অধিকার তার থাকত না। এটা অর্থহীন। আচ্ছা ধরুন না কেন, আমি মারা গেলাম, মারা যাবার আগে এই টাকাটা অপানার ভগিনীর

নামে উইল করে দিয়ে গেলাম, তখনও কি উনি তা নিতে অস্বীকার করতেন?"

"খুবই সম্ভব।"

"না, যাই বলুন না কেন, তা হয় না। যাক গে, না হয় না-ই হল। তা-ই মেনে নিলাম। কিন্তু দশ হাজার রুবল দরকারের সময় হেলাফেলার বস্তু নয়। মোটের ওপর, আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আমি যা বললাম দয়া করে সেটা আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নাকে জানিয়ে দেবেন।"

"না, জানাব না।"

"সেক্ষেত্রে, রোদিওন রমানোভিচ, আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করব। অর্থাৎ তাঁকে বিরক্ত করতে বাধ্য হব।"

"আমি যদি তাঁকে জানাই তাহলে কি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবেন না?"

"আপনাকে কী বলব, ঠিক জানি না। একবার দেখা করার আমার খুবই ইচ্ছে ছিল "

"সে গুড়ে বালি।"

"দুঃখের কথা। তবে, আপনি আমাকে জানেন না। আপনার সঙ্গে আমার কিন্তু ভালো বনিবনা হলেও হতে পারে।"

"আপনি মনে করেন আমাদের মধ্যে বনিবনা সম্ভব?"

"সম্ভব নয়ই বা কেন?" টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে-হাসতে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ বলল। "আপনাকে বিরক্ত করা কিন্তু আমার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না, এখানে আসার সময়ও আমার তেমন একটা ভরসা ছিল না, যদিও, প্রসঙ্গত, আজ সকালেই আপনার চেহারা দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম..."

"আজ সকালে আপনি আমাকে কোথায় দেখলেন?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌।

"আকস্মিকভাবে।...আমার কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে আপনার মধ্যে আমার কিছু ধরন আছে।...আপনি চিন্তা করবেন না, আমি বিরক্তিকর লোক নই। আমি জুয়াড়িদের সঙ্গে দিব্যি কাটিয়েছি। আমার দূর সম্পর্কের এক সম্ভ্রান্তবংশীয় আত্মীয় আছেন প্রিন্স স্‌ভিদ্রেই—তারও কখনও বিরক্তি উদ্রেক করিনি। শ্রীমতী প্রিলুকোভার এলবামে রাফাএলের ম্যাডোনা সম্পর্কে লেখার ক্ষমতা ছিল আমার। সাত বছর পাড়াগাঁয়ের বাইরে কোথাও না গিয়ে মার্ফা পেত্রোভ্‌নার সঙ্গে বাস করেছি, এককালে সেন্নায়া স্কোয়ারের কুখ্যাত ভিয়াজেম্‌স্কি ভবনে রাত কাটিয়েছি, সম্ভবত বের্গের বেলুনে করে আকাশেও উড়ব।"

"বেশ, ভালো কথা। আপনাকে জিগ্‌গেস করতে পারি কি কবে আপনি যাত্রায় বের হচ্ছেন? শিগ্‌গিরই কি?"

“কিসের যাত্রা?”

“বাঃ এই যে “অভিযানের” কথা... সে তো আপনি নিজেই বললেন!”

“অভিযান? ও, হ্যাঁ!.. সত্যি বটে, অভিযানের কথা আমি আপনাকে বলেছিলাম। তা সেটা একটা বেশ বড় প্রশ্ন বটে।...আপনি যদি জানতেন কী প্রশ্ন আপনি আমাকে করছেন!” আচমকা দরাজ গলায় সংক্ষেপে হেসে সে যোগ করল, “অভিযানের বদলে আমি সম্ভবত বিয়ে করতে চলেছি। একটি পাত্রীর সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে।”

“এখানে?”

“হ্যাঁ।”

“সে সময় আপনি কখন পেলেন?”

“কিন্তু আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার সঙ্গে একবারটি দেখা করার বড় সাধ। আপনাকে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ। আচ্ছা, আসি। ...ও হ্যাঁ, একটা কথা বলতেই ভুলে গেছি! রোদিওন রমানোভিচ, আপনার ভগিনীকে জানিয়ে দেবেন যে মার্ফা পেত্রোভ্‌নার উইলে তাঁর নামে তিন হাজার রুবলের উল্লেখ আছে। এতে কোন ভুল নেই। মার্ফা পেত্রোভ্‌না মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগে বন্দোবস্ত করে গেছেন, আমার উপস্থিতিতেই তা হয়েছিল। সপ্তাহ দু-তিন বাদে আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না ইচ্ছে করলে পেতে পারেন।”

“আপনি কি সত্যি বলছেন?”

‘সত্যি। জানিয়ে দেবেন। অধমকে মনে রাখবেন। আমি আপনার খুব কাছাকাছিই আছি।”

বের হওয়ার সময় দরজার মুখে রাজুমিখিনের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লেগে গেল স্‌ভিদ্রিগাইলভের।

দুই

প্রায় আটটা বাজে। লুজিনের আগে যাতে গিয়ে পৌঁছুন যায় সেই উদ্দেশ্যে দুজনে তাড়াতাড়ি পা চালাল বাকালেইয়েভের বাড়ির দিকে।

“ কে ওই লোকটা?” রাস্তায় নামার সঙ্গে-সঙ্গে রাজুমিখিন জিগ্‌গেস করল।

“এ সেই স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌, সেই জমিদার যার বাড়িতে গভর্নেসের কাজ করার সময় আমার বোনকে ঝামেলা পোয়াতে হয়েছিল। তার লোভে পড়ার ফলে অতিষ্ঠ হয়ে ওকে সে বাড়ি ছাড়তে হয়, ভদ্রলোকের স্ত্রী মার্ফা পেত্রোভ্‌না ওকে বাড়ি থেকে দূর করে দেয়। এই মার্ফা পেভোভ্‌না আবার পরে দুনিয়ার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। সম্প্রতি হঠাৎ মারাও গেছে। এর সম্পর্কেই তখন কথা হচ্ছিল। জানি না কেন, এই লোকটাকে আমার বড় ভয়। স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সারার সঙ্গে-সঙ্গে সে এখানে এসে

হাজির। লোকটা খুব অদ্ভুত ধরনের, কিছু একটা মতলব ওর আছে। ...ভাব দেখে মনে হয় কিছু একটা ও জানে।...ওর কাছ থেকে দুনিয়াকে আগলে রাখা দরকার...এই কথাটাই আমি তোমাকে বলতে চাইছিলাম, শুনছ?"

"আগলে রাখা! আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার কী করতে পারে লোকটা? তবে রোদিয়া তুমি আমাকে যে কথা বললে তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। ...আগলে রাখব, অবশ্যই আগলে রাখব!...থাকে কোথায়?"

"জানি না।"

"জিগ্‌গেস করলে না কেন? এঃ, আফসোসের কথা! যাকগে, সে জেনে নেব।"

"তুমি দেখেছ ওকে?" কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ জিগ্‌গেস করল।

"তা দেখেছি, ভালো করে দেখে রেখেছি।"

"ঠিক দেখেছ? পরিষ্কার দেখেছ তো?" রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ ব্যগ্র হয়ে বলল।

"অবশ্যই। পরিষ্কার মনে আছে। হাজার লোকের মাঝখানেও ঠিক চিনতে পারব। লোকের মুখের ব্যাপারে আমার স্মৃতিশক্তি ভালো।"

আবার নীরবতা।

"হুম্‌... তা হলে তো কথাই নেই..." রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ বিড়বিড় করে বলল। " তা নয়ত জান...আমার মনে হয়েছিল...এসব নেহাত আমার মনের ভুল... হয়ত আমার মনগড়া।"

"ধ্যুৎ, এ তুমি কী বলছ? আমি তোমাকে ভালোমতো বুঝতে পারছি না।"

"এই যে তোমরা সবাই বল..." মুখ বাঁকিয়ে হেসে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ বলল, "আমি নাকি উন্মাদ। এখন আমার তাই এমনও মনে হল যে হয়ত সত্যিই আমি উন্মাদ... তাই আসলে আমি ভূতই দেখেছি!"

"কী যে বল!"

"কে জানে বাপু! হয়ত আমি বদ্ধ উন্মাদ, গত কয়েকদিন হল যা-যা ঘটেছে সে সব হয়ত আমার কল্পনামাত্র..."

"ওঃ রোদিয়া! আবার তুমি বিচলিত হয়ে পড়ছ!... কী বলল সে, কী বারতা নিয়ে এসেছিল?"

রাস্‌কোল্‌নিকভ জবাব দিল না। রাজুমিখিন মিনিটখানেক চিন্তা করল।

"আচ্ছা এবারে আমার বিবরণ শোন," সে শুরু করল। "আমি তোমার কাছে এসেছিলাম, তুমি ঘুমোচ্ছিলে। তারপর খাওয়া-দাওয়া সারলাম আমরা, তারপর আমি গেলাম পর্‌ফিরির কাছে। জামিওতভ্‌ তখনও ওখানে। আমি শুরু করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু কিছু সুবিধে করতে পারলাম না। আসলে যেভাবে কথা বলব ভেবেছিলাম তা কিছুতেই হয়ে উঠল না। মনে হল ওরা বুঝতে পারছে না, বোঝার ক্ষমতাও ওদের নেই, কিন্তু তাতে এতটুকু অস্বস্তিও নেই ওদের। আমি পর্‌ফিরিকে আলাদা করে

জানলার কাছে নিয়ে এসে বলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু এবারেও কেন জানি না, তেমন সুবিধে করতে পারলাম না। ও একদিকে তাকিয়ে রইল, আমিও আরেক দিকে। শেষকালে আমি ওর মুখের কাছে ঘুষি বাগিয়ে ধরে একজন আত্মীয় আরেকজন আত্মীয়কে যেমন বলতে পারে সেইভাবে বললাম যে আমি ওর মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। ও কেবল আমার দিকে তাকাল। আমি 'ধুত্তোর' বলে চলে এলাম। এখানেই শেষ। কাজটা একেবারে বোকার মতো হল। জামিওতভের সঙ্গে একটি কথাও বলিনি। তবে দেখ, আমি ভেবেছিলাম ভণ্ডুল পাকিয়ে দিয়েছি, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে আমার মাথায় হঠাৎই খেয়াল হল—আমরা এই নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি কেন? তোমার যদি কোন বিপদ বা ওই ধরনের কোন সম্ভাবনা থাকত তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু এতে তোমার কী বল তো? তুমি এখানে আসছ কী করে? তাহলে মরুকগে ওরা! আমরা পরে ওদের নিয়ে প্রাণভরে হাসাহাসি করব। তোমার জায়গায় আমি হলে তো ওদের আরও গুলিয়ে দিতাম। ওঃ ভগবান, পরে লজ্জায় ওদের মাথা কাটা যাবে! মরুক গে, পরে ওদের একহাত নেওয়া যাবে, আপাতত মজা করা যাক!"

"যা বলেছ!" রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ মুখে বলল। 'কিন্তু আগামীকাল তুমি কী বলবে?' মনে-মনে সে ভাবল। অদ্ভুত ব্যাপার, এখন পর্যন্ত একবারও ওর মাথায় আসেনি যে 'রাজুমিখিন জানতে পারলে কী ভাববে'। একথা ভাবার পর রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ স্থির দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। পর্‌ফিরির সঙ্গে এখনকার সাক্ষাতের যে বিবরণ রাজুমিখিন তাকে দিল তাতে ওর তেমন আগ্রহ ছিল না : ইতিমধ্যে জল অনেকদূর গড়িয়েছে।

হোটেলের করিডরে সরাসরি লুজিনের মুখোমুখি পড়ে গেল ওরা। লুজিন এসেছে কাঁটায়-কাঁটায় আটটায়। ঘরের নম্বর খুঁজছিল সে। ফলে তিনজনেই ঘরে ঢুকল একসঙ্গে, তবে দুপক্ষের কেউ কারও দিকে তাকাল না, সৌজন্য দেখিয়ে মাথাও নোয়াল না। দুই যুবা আগে ঢুকল। পিওতর পেত্রোভিচ শিষ্টাচার বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সামনের ঘরে ওভারকোটটা খুলে রাখার নাম করে খানিকটা কালক্ষেপ করল। পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এসে দরজার চৌকাটে তাকে স্বাগত জানাল। দুনিয়া তার ভাইয়ের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করল।

পিওতর পেত্রোভিচ দ্বিগুণ গাম্ভীর্যের ভাব নিয়ে ভেতরে ঢুকলেও যথেষ্ট সৌজন্য দেখিয়ে মাথা নুইয়ে দুই মহিলাকে অভিবাদন জানাল। তবে সে এমনভাবে তাকাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল বুঝি একটু ভেবাচেকা খেয়ে গেছে এবং এখনও ঠিক ধাতস্থ হতে পারেনি। পুলখেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নাও যেন বিব্রত—সঙ্গে-সঙ্গে গোল টেবিলটার চারধারে ওদের সকলকে বসানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। টেবিলের ওপর চায়ের আয়োজনস্বরূপ সামোভারে জল ফুটছিল। দুনিয়া আর লুজিন টেবিলের দু'ধারে মুখোমুখি আসন গ্রহণ করল। রাজুমিখিন আর রাস্‌কোল্‌নিকভের জায়গা হল

পুলখেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নার মুখোমুখি—রাজুমিখিন বসল লুজিনের পাশে আর রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ তার বোনের পাশে।

মুহূর্তের নীরবতা নেমে এলো। পিওতর পেত্রোভিচ ধীরেসুস্থে কেম্ব্রিকের রুমালটা বের করল—চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল সেন্টের ভুরভুরে গন্ধ। রুমাল দিয়ে নাক ঝাড়ল। তার হাবভাবে সদাশয়তার অভাব না থাকলেও তাকে দেখে মনে হচ্ছিল মর্যাদাহানির জন্য যেন সে বেশ খানিকটা ক্ষুণ্ণ এবং এর কৈফিয়ত দাবি করবে বলে সে মনে-মনে স্থিরসঙ্কল্প করে রেখেছে। ভেতরে ঢোকার মুখে সামনের ছোট ঘরে থাকতেই তার মনে হয়েছিল ওভারকোট গা থেকে না খুলে ঘর ছেড়ে চলে যায়—তাতে দুই মহিলারই উচিত শিক্ষা হবে, তারা সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পারবে কত ধানে কত চাল। কিন্তু এ বিষয়ে সে মনস্থির করতে পারেনি। পরন্তু লুজিন লোকটি এমনই যে অনিশ্চয়তা তার পছন্দ নয় এবং এখানে তাকে একটা জিনিস বুঝেও নিতে হবে। তার নির্দেশ যখন এমন খোলাখুলিভাবেই অমান্য করা হয়েছে তখন মানতে হবে পেছনে কোন কারণ আছে। আর তা-ই যদি হয় তাহলে সেটা আগে থাকতে জেনে নেওয়া ভালো। শাস্তি যে-কোন সময় দেওয়া যেতে পারে— সেটা তার হাতের মুঠোর মধ্যেই আছে।

"আশা করি পথে কোন অসুবিধে হয়নি?" আনুষ্ঠানিকভাবে পুলখেরিয়া অলেক্সান্দ্রভ্‌নাকে সে জিগ্‌গেস করল।

"ভগবানের আশীর্বাদে কোন অসুবিধে হয়নি, পিওতর পেত্রোভিচ।"

"শুনে খুবই খুশি হলাম। আর আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না, আপনিও ক্লান্তি বোধ করছেন না তো?"

"আমার তো বয়স কম, শক্তিও আছে, ক্লান্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। তবে মার পক্ষে অবশ্যই বেশ কষ্টকর ছিল", দুনিয়া উত্তর দিল।

"কী করা যাবে বলুন? আমাদের জাতীয় রেলপথগুলো বড় বেশি দীর্ঘ। আমাদের দেশ, যাকে আমরা 'জননী রাশিয়া' বলে থাকি, বিরাট। ...আমার শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গতকাল কিছুতেই স্টেশনে আপনাদের সঙ্গে দেখা করার সময় করে উঠতে পারলাম না। যা হোক, আশা করি বিশেষ কোন ঝামেলায় পড়তে হয়নি?"

"ও, না, পিওতর পেত্রোভিচ। আমরা খুব দমে গিয়েছিলাম", বিশেষ এক ধরনের বাচনভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি বলে উঠল পুলখেরিয়া অলেক্সান্দ্রভ্‌না, "আমার মনে হয় যদি স্বয়ং ভগবান গতকাল দ্‌মিত্রিকে আমাদের কাছে না পাঠিয়ে দিতেন, তাহলে আমাদের দুর্দশার একশেষ হত। এই যে দ্‌মিত্রি প্রকোফিচ রাজুমিখিন," বলে রাজুমিখিনের পরিচয় দিল লুজিনের কাছে।

"তা আলাপের সৌভাগ্য হয়েছে বৈকি...গতকাল", আড়চোখে বিদ্বেষভরা দৃষ্টিতে রাজুমিখিনের দিকে তাকিয়ে সে বিড়বিড় করে বলল। তারপর ভুরু কুঁচকে চুপ করে

রইল। মোটের ওপর পিওতর পেত্রোভিচ সেই শ্রেণীর লোকদের একজন, যাদের দেখলে মনে হয় বন্ধুমহলে অতিমাত্রায় অমায়িক, যারা অমায়িক হওয়ার জন্য বিশেষভাবে মুখিয়ে থাকে, কিন্তু পান থেকে চুন খসল কি অমনি সমস্ত নৈপুণ্য হারিয়ে ফেলে—তখন বন্ধুমহলের প্রাণসঞ্চারকারী সহজ স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির রসিকপ্রবরের চেয়ে সম্ভবত ময়দার বস্তার সঙ্গে তাদের বেশি মিল দেখতে পাওয়া যায়। সকলেই আবার চুপ করে গেল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ জেদ ধরে চুপ করে রইল। আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না আপাতত নীরবতা ভঙ্গ করার কোন লক্ষণ প্রকাশ করল না। রাজুমিখিনের বলার মতো কিছু ছিল না। ফলে পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না আবার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল।

"মার্ফা পেত্রোভ্‌না মারা গেছেন, আপনি শুনেছেন কি?" সে তার নিজের পুঁজি কাজে লাগাল।

"তা আর শুনিনি? প্রথম যারা জানতে পারে তাদের মধ্যে আমি একজন। আমি এখন আপনাদের এও জানাতে এসেছি যে আর্কাদি ইভানভিচ স্‌ভিদ্রিগাইলভ তাঁর সহধর্মিনীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তড়িঘড়ি সেন্ট পিটার্সবুর্গ যাত্রা করেন। বিশ্বস্তসূত্রে আমি যে সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছি তাতে অন্তত তাই বলে।"

"সেন্ট পিটার্সবুর্গে? এখানে?" উদ্বিগ্ন হয়ে দুনিয়া প্রশ্ন করল। মা'র সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল।

"ঠিক তাই। বলাই বাহুল্য বিনা উদ্দেশ্যে নয়। যেরকম ব্যস্তসমস্ত হয়ে তিনি যাত্রা করেছেন এবং মোটের ওপর তার অব্যবহিত পূর্বমুহূর্তের যে পরিস্থিতি সে-কথা ভাবতে গেলে তো তাই মনে হয়।"

"হা ভগবান! উনি কি আমাদের দুনিয়াকে এখানেও শান্তিতে থাকতে দেবেন না?" পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল।

"আমার মনে হয় আপনার বা আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার—কারোই বিশেষ চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই, অবশ্য যদি নিজে থেকে তাঁর সংস্পর্শে আসার কোন বাসনা আপনাদের আদৌ না থাকে । আমার দিক থেকে আমি বলতে পারি তাঁর ওপর নজর রাখছি। এসে কোথায় উঠেছেন এখন খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।"

"ওঃ পিওতর পেত্রোভিচ, আপনি বিশ্বাস করবেন না, কী ভয়টাই না আপনি এখন আমাকে পাইয়ে দিলেন!" পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না বলল। "আমি ওঁকে মোটে দুবার দেখেছি। দেখে আমার মনে হয়েছে ভয়ঙ্কর, অতি ভয়ঙ্কর! আমার দৃঢ়বিশ্বাস, মার্ফা পেত্রোভ্‌নার মৃত্যুর জন্য উনি দায়ী।"

"এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত করা ঠিক হবে না। আমি সঠিক খবর রাখি। আমি তর্ক করতে যাচ্ছি না, এমনও হতে পারে যে দুর্ব্যবহারের নৈতিক প্রভাব বলতে যা বোঝায়, তা ঘটনার দ্রুত পরিণতিতে তাকে সাহায্য করেছে। আর মানুষটির আচরণ

এবং সাধারণভাবে তাঁর নৈতিক চরিত্রের কথা যদি বলেন তো আমি আপনার সঙ্গে একমত। জানি না এখন উনি ধনী হয়েছেন কিনা, মার্ফা পেত্রোভ্‌না তাঁর জন্যে ঠিক কী রেখে গেছেন তাও জানি না। সে সংবাদ আমি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জানতে পারব। কিন্তু এটা জানা কথা যে তিনি যখন সেন্ট পিটার্সবুর্গে এসেছেন তখন যে পরিমাণ অর্থই তাঁর হাতে থাকুক না কেন, সঙ্গে-সঙ্গে পুরোনো চালে চলা শুরু করে দেবেন। এই গোত্রের যত মানুষ আছে তাদের মধ্যেও এমন দুশ্চরিত্র ও কলুষিত মানুষ আর দুটি দেখা যায় না। আমার এমন অনুমান করারও যথেষ্ট ভিত্তি আছে যে আট বছর আগে তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসার এবং ঋণমুক্ত করার দুর্ভাগ্য যাঁর হয়েছিল তিনি— সেই মার্ফা পেত্রোভ্‌না আরও একভাবে তাঁর কাজে লেগেছিলেন। একমাত্র মার্ফা পেত্রোভ্‌নার প্রচেষ্টায়, তাঁরই ত্যাগের ফলে স্‌ভিদ্রিগাইলভের বিরুদ্ধে একটা ফৌজদারী মামলা একেবারে শুরুতে চেপে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। নৃশংস ও অবিশ্বাস্য ধরনের খুনের অভিযোগ বলতে যা বোঝায় সেই অভিযোগই ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। মামলায় দোষী সাব্যস্ত হলে সাইবেরিয়ায় ঘানি টানার খুব একটা ভালো সম্ভাবনা তাঁর ছিল। আপনাদের জ্ঞাতার্থে বললাম কী ধরনের চিজ এই স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌।

"ওঃ ভগবান!" পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না আঁতকে উঠল। রাস্‌কোলনিকভ্‌ মনোযোগ দিয়ে শুনছিল।

"আপনি কি সত্যিই বলছেন যে এ সম্পর্কে আপনি সঠিক খবর রাখেন?" গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে ও কঠিন স্বরে দুনিয়া জিগ্‌গেস করল।

"স্বর্গীয়া মার্ফা পেত্রোভ্‌না আমাকে গোপনে যা বলেছিলেন, যা আমার নিজের কানে শোনা একমাত্র সে কথাই আমি আপনাদের বলছি। এখানে বলা দরকার যে আইনের দৃষ্টিতে মামলাটা বড়ই ঘোলাটে। এখানে বাস করত... আমার বিশ্বাস, এখনও বাস করে... রেস্‌লিখ নামে এক মহিলা। জাতে বিদেশী। তার ওপর ছোটখাটো ধরনের সুদখোর— এছাড়া আরও কিছু ব্যবসা তার আছে। এই রেস্‌লিখের সঙ্গেই মিস্টার স্‌ভিদ্রিগাইলভের বহুদিনের সম্পর্ক— অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও রহস্যজনক সম্পর্ক। মহিলার কাছে থাকত তার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়া—যতদূর মনে হয় সম্পর্কে তার ভাইঝি। বোবা কালা, বয়স বছর পনেরো— এমনকি চৌদ্দও হতে পারে। রেস্‌লিখ দু'চক্ষে দেখতে পারত না মেয়েটিকে, প্রতিটি গ্রাস খাবারের জন্য তাকে উঠতে-বসতে কথা শোনাত, নির্দয়ভাবে প্রহারও করত। একদিন দেখা গেল মেয়েটা চিলেকোঠায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। আদালতের রায়— আত্মহত্যা। মামুলি শুনানির পর মামলার পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু পরবর্তীকালে কানাঘুষোয় শোনা গেল স্‌ভিদ্রিগাইলভ বাচ্চা মেয়েটির... চরম সর্বনাশ করে ছেড়েছিল। অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটাই ঘোলাটে, অভিযোগটা আসে আরেক জার্মান মহিলার কাছ থেকে। সে

মহিলাও সন্দেহাতীত নয়, তার কথায় ঠিক বিশ্বাসও করা যায় না। মার্ফা পেত্রোভ্‌নার চেষ্টায় আর তাঁর অর্থের জোরে শেষ অবধি সে অভিযোগ চেপে দেওয়া সম্ভব হয়। গুজবের মধ্যেই তা সীমিত থাকে। তবে গুজবটা অশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল বৈকি। তা, আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না ওদের ওখানে থাকার সময় আপনি নিশ্চয়ই ফিলিপ নামে একটা লোক সম্পর্কে একটা ঘটনাও শুনে থাকবেন। বছর ছয়েক আগের ঘটনা।... তখনও ভূমিদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। ...নৃশংস অত্যাচারের ফলে লোকটা মারা যায়।"

"আমি শুনেছি, কিন্তু যা শুনেছি তা বিপরীত— লোকটা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে।"

"ঠিক তাই। কিন্তু মিস্টার সভিদ্রিগাইলভের নিয়মিত নির্যাতন ও নিত্য শাস্তি বিধানের ফলে লোকটা নিষ্ঠুর উপায়ে নিজের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটানোর দিকে ঝুঁকে পড়ে অথবা বলা যেতে পারে, উক্ত পন্থা গ্রহণে বাধ্য হয়।"

"তা আমি জানি নে," শুষ্ককণ্ঠে দুনিয়া জবাব্ দিল। "আমি শোনার মধ্যে যা শুনেছি তা হল এই মর্মে বড় অদ্ভুত এক কাহিনী যে ফিলিপ নামে লোকটি নাকি এক ধরনের মানসিক রুগী ছিল, বিষণ্ণতায় ভুগত, ভুঁইফোঁড় দার্শনিক গোছের বলা যায় তাকে। লোকে বলত, বইপুথি পড়ে নাকি তার 'মাথাটা বিগড়ে গিয়েছিল'। আর গলায় দড়ি যে সে দিয়েছিল তার কারণ মিস্টার স্‌ভিদ্রিগাইলভের প্রহার ততটা নয় যতটা তার উপহাস। আমার উপস্থিতিতে কাজের লোকজনের সঙ্গে সে ভালোই ব্যবহার করত, এমনকি তারা তাকে ভালোও বাসত, যদিও ফিলিপের মৃত্যুর জন্য যে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এও সত্যি।"

"আমি দেখতে পাচ্ছি, আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না, আপনি যেন হঠাৎ তাঁর হয়ে কৈফিয়ত দেবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন," দ্ব্যর্থব্যঞ্জক হাসিতে মুখ বাঁকিয়ে লুজিন মন্তব্য করল। "এটা ঠিক যে লোকটা ধূর্ত এবং মহিলাদের মন গলাতে ওস্তাদ। তার শোচনীয় দৃষ্টান্ত মার্ফা পেত্রোভ্‌না, যাঁর মৃত্যুর পরিস্থিতি বড়ই অদ্ভুত। লোকটা শিগগিরই নতুন কোন মতলব আঁটছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই কথা ভেবে আমার পরামর্শ দিয়ে আপনাকে ও আপনার মাতৃদেবীকে সাহায্য করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমি যতদূর জানি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লোকটাকে নিঃসন্দেহে আবার ঋণের দায়ে জেলে যেতে হবে। মার্ফা পেত্রোভ্‌না তাঁর সন্তানদের কথা বিবেচনা করে ওর নামে বিষয়সম্পত্তি লিখে দেবার কোনও অভিপ্রায় কস্মিনকালে প্রকাশ করেননি। তিনি যদি কিছু তাঁকে দিয়েও থাকেন সেটা নিশ্চয়ই অতি সামান্য, ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর উপযুক্ত, ধর্তব্যের মধ্যে নয়— এমনই পরিমাণ যে তাঁর মতো চালচলনের লোকের তাতে এক বছরও চলবে না।"

দুনিয়া বলল, "দোহাই আপনার, পিওতর পেত্রোভিচ, মিস্টার স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌কে নিয়ে আলোচনা থামান। এই আলোচনা আমার কাছে পীড়াদায়ক।"

"উনি কিছু আগে আমার কাছে এসেছিলেন," এই প্রথম হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌।

চাপা বিস্ময়ের গুঞ্জন উঠল। সকলে তার দিকে ফিরে তাকাল। এমনকি পিওতর পেত্রোভিচও উত্তেজিত।

"আধ-ঘণ্টাখানেক আগে, যখন আমি ঘুমোচ্ছিলাম, উনি ঘরে ঢুকে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন, নিজের পরিচয় দিলেন," রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ বলল। "বেশ খুশি-খুশি ঢিলেঢালা ভাব। ওঁর খুবই আশা যে ওঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হবে। প্রসঙ্গত, দুনিয়া, তোর সঙ্গে দেখা করার জন্যে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, পীড়াপীড়ি করছেন। দেখা করিয়ে দেবার জন্যে আমাকে মধ্যস্থ ধরেছেন। তোর কাছে ওঁর একটা প্রস্তাব আছে। সেটা কী তা আমাকে জানিয়েছেন। তাছাড়া উনি সুনিশ্চিতভাবে একথাও আমাকে জানিয়েছেন যে মৃত্যুর সপ্তাহখানেক আগে মার্ফা পেত্রোভ্‌না সময় করে তাঁর উইলে তোর নামে তিন হাজার রুবল লিখে দিয়ে গেছেন। ওই টাকা তুই খুব অল্প সময়ের মধ্যে পেতে পারিস।"

"ভগবানের অসীম কৃপা!" পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না উল্লসিত হয়ে ক্রুশ-প্রণাম ঠুকে বললেন। "মার্ফা পেত্রোভ্‌নার আত্মার সদ্‌গতির জন্যে প্রার্থনা কর দুনিয়া, প্রার্থনা কর!"

"কথাটা বাস্তব সত্য," লুজিনের মুখ থেকে ফস করে বেরিয়ে এলো।

"বেশ, তারপর?" দুনিয়ার যেন ত্বর সইছিল না।

"তারপর তিনি বললেন তিনি নিজে ধনী নন, সমস্ত ভূসম্পত্তির মালিক হবে তাঁর সন্তানরা। তারা এখন ওদের মাসির কাছে আছে। তারপর বললেন, আমাদের ধারেকাছেই কোথাও উঠেছেন। কোথায়? —জানি না, জিগ্‌গেস করিনি।..."

"কিন্তু কী, কী প্রস্তাব উনি দিতে চান দুনিয়াকে?" রীতিমতো আশঙ্কিত হয়ে জিগগেস করল পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না। "তোকে বলেছেন?"

"হ্যাঁ, বলেছেন।"

"কী বলেছেন?"

"পরে বলব", রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ আর কথা না বাড়িয়ে নিজের চায়ের দিকে মনোযোগ দিল।

পিওতর পেত্রোভিচ পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখল।

"কাজে বেরিয়ে পড়া একান্ত দরকার, তাই আপনাদের আর ব্যাঘাত ঘটাব না," কতকটা তিক্তভাবে এই বলে সে চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেল।

"যাবেন না, পিওতর পেত্রোভিচ," দুনিয়া বলল। "আপনি সন্ধেটা আমাদের সঙ্গে কাটাবেন বলেই তো মনস্থ করেছিলেন, তাই না? পরন্তু আপনি নিজেই লিখেছিলেন যে মা'র সঙ্গে আপনার কিছু আলোচনা আছে।"

"ঠিকই বলেছেন, আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না," টুপিটা আগের মতোই হাতে ধরে রেখে আবার চেয়ারে বসে পড়ে গম্ভীরভাবে বলল পিওতর পেত্রোভিচ। "বাস্তবিকই আপনার সঙ্গে এবং আপনার পরম শ্রদ্ধেয়া মাতৃদেবীর সঙ্গেও আমার কিছু আলোচনার ছিল— এমনকি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই আলোচনা করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আপনার সহোদর যেমন আমার উপস্থিতিতে মিস্টার স্‌ভিদ্রিগাইলভের প্রস্তাবিত কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারছেন না তেমনি... অন্যের উপস্থিতিতে... খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনায় আমি অনিচ্ছুক এবং অপারগ। পরন্তু আমার মূল এবং অত্যন্ত সনির্বন্ধ অনুরোধ রক্ষিত হয়নি।..."

লুজিনের ভঙ্গিতে তিক্ততা ফুটে উঠল। সে গম্ভীরভাবে চুপ করে রইল।

"আমাদের সাক্ষাতের সময় আমার ভাই যেন উপস্থিত না থাকে— এই অনুরোধ একমাত্র আমার সনির্বন্ধ অনুরোধের ফলেই রক্ষিত হয়নি," দুনিয়া বলল। "আপনি লিখেছিলেন যে আমার ভাই আপনাকে অপমান করেছে। আমার মনে হয় এটা অবিলম্বে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার এবং আপনাদের মধ্যে মিটমাট হয়ে যাওয়া উচিত। রোদিয়া যদি সত্যি-সত্যি আপনাকে অপমান করে থাকে তাহলে তার উচিত আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং সে তা করবে।

পিওতর পেত্রোভিচ তৎক্ষণাৎ ফেটে পড়ল।

"আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না, কোন-কোন অপমান এমন হয়ে থাকে যে সমস্ত রকম সদিচ্ছাসত্ত্বেও ভোলা সম্ভব নয়। সবকিছুর একটা সীমা আছে, যা লঙ্ঘন করা বিপজ্জনক। একবার লঙ্ঘন করলে সেখান থেকে ফিরে আসা অসম্ভব।"

"আমি আসলে ঠিক সেকথা বলছিলাম না, পিওতর পেত্রোভিচ," একটু অসহিষ্ণু হয়ে তাকে বাধা দিয়ে বলল দুনিয়া। "ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন, আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ এখন নির্ভর করছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আলাপ-আলোচনা করে মীমাংসা বা মিটমাট করে নেবার ওপর। আমি গোড়াতেই সরাসরি বলে রাখছি যে বিষয়টিকে আমি অন্য কোন দৃষ্টিতে দেখতে পারছি না। তাই আমার যদি এতটুকুও দাম থাকে আপনার কাছে তাহলে অসুবিধা হলেও আজকেই এই ঘটনার নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া উচিত। আপনাকে আবারও বলছি ভাই যদি অপরাধী হয়ে থাকে তাহলে আপনার কাছে ক্ষমা চাইবে।"

"প্রশ্নটা যে আপনি এভাবে রাখছেন তা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি কিন্তু আভদোতিয়া রমানোভ্‌না," উত্তরোত্তর বেশি বিরক্ত হয়ে লুজিন বলল। " আপনার মূল্য দিলেও, বলতে গেলে, আপনাকে যথেষ্ট মর্যাদা দিলেও আপনার বাড়ির কোন একজনকে আমার অপছন্দ এমন তো হতেই পারে। আপনার পাণিগ্রহণের সৌভাগ্য দাবি করার অর্থ নয় যে অসঙ্গত কোন দায়িত্ব আমি গ্রহণ করব।..."

"আঃ, এসব মান-অভিমান ছাড়ুন পিওতর পেত্রোভিচ," আবেগভরে তাকে বাধা

দিয়ে বলল দুনিয়া, " আপনাকে বরাবর যেমন বুদ্ধিমান ও মহৎ লোক বলে গণ্য করে এসেছি এবং এখনও গণ্য করতে চাই, আপনি তেমনি থাকুন। আমি পরম গুরুত্ব দিয়ে আপনাকে কথা দিয়েছি যে আমি আপনার বাগদত্তা। এ ব্যাপারে আমার ওপর আস্থা রাখুন, বিশ্বাস করুন, কোনওরকম পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে বিচার করার ক্ষমতা আমার আছে। আমি যে বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করছি এটা আপনার কাছে যেমন আশ্চর্যের তেমনি আমার ভাইয়ের কাছেও। আপনার চিঠি পাবার পরও আমি যখন ওকে বললাম যে আমাদের সাক্ষাতের সময় ওকে আসতেই হবে তখন আমি ওকে আমার অভিপ্রায় সম্পর্কে কিছু জানাইনি। দয়া করে বোঝার চেষ্টা করুন, আপনাদের মধ্যে যদি মিটমাট না হয় তা হলে আমাকে বেছে নিতে হবে আপনাদের দুজনের একজনকে— হয় আপনাকে না হয় আমার ভাইকে। ওর দিক থেকে এবং আপনার দিক থেকেও প্রশ্নটা এরকমই দাঁড়াচ্ছে। নির্বাচনের ব্যাপারে আমি ভুল করতে চাই না, ভুল করা উচিতও হবে না। আপনার জন্যে ভাইয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, ভাইয়ের জন্যে আপনার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। এখন আমি যেটা জানতে চাই এবং যে বিষয়ে সুনিশ্চিত হতে চাই তা এই যে ও আমার ভাই কিনা। আর আপনার সম্পর্কে— আমি আপনার প্রিয় কিনা, আপনার কাছে আমার মূল্য কতখানি এবং আপনি আমার স্বামী হতে পারেন কিনা।"

"আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না," বিকৃত কণ্ঠে লুজিন বলল, "আপনার কথাগুলো আমার কাছে বড় বেশি বহু অর্থদ্যোতক মনে হচ্ছে, এমনকি আমি এও বলব আপনার জীবনে যে স্থান গ্রহণের সৌভাগ্যের অধিকারী আমি হতে চলেছি সে দিক থেকে দেখতে গেলে অপমানজনকও বটে। তাছাড়া আমাকে এবং... উদ্ধত প্রকৃতির এক যুবককে একই আসনে বসিয়ে যে আপত্তিকর ও অদ্ভুতরকম তুলনা আপনি করলেন তার উল্লেখ না হয় না-ই করলাম। আপনার কথার মধ্যে কিন্তু আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা ভঙ্গ করার সম্ভাবনাই প্রকাশ পাচ্ছে। আপনি বলছেন: 'হয় আপনি না হয় ভাই?'— এর দ্বারা আপনি আমাকে এটাই দেখাতে চাইছেন যে আপনার কাছে আমার মূল্য কত সামান্য!... আমাদের যে সম্পর্ক এবং... আমাদের দুজনের মধ্যে যে নৈতিক বাধ্যবাধকতা আছে সে কথা চিন্তা করলে এটা আমি বরদাস্ত করতে পারি না।"

"মানে?" দুনিয়া ফেটে পড়ল। "এ পর্যন্ত জীবনে যা যা আমার কাছে মহা মূল্যবান ছিল, এ পর্যন্ত যা যা নিয়ে আমার *সমগ্র* জীবন গড়ে উঠেছে, আমি আপনার স্বার্থকে সে সবের সঙ্গে এক স্তরে রাখছি অথচ আপনি কিনা উলটে এই বলে রাগ করছেন যে আমি আপনাকে *সামান্য* মূল্য দিচ্ছি!"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ নিঃশব্দে জ্বালাধরান হাসি হাসল। রাজুমিখিন শিউরে উঠল। কিন্তু পিওতর পেত্রোভিচ আপত্তিটা ধর্তব্যের মধ্যে আনল না। বরং তার উল্‌টো— প্রতিটি

কথার সঙ্গে-সঙ্গে তার বিরক্তি ও কলহপ্রবণতা উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। মনে হল পরিস্থিতিটা তার কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

"ভাবী জীবনসঙ্গীর প্রতি ভালোবাসা , স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ভ্রাতৃপ্রেমের উর্ধ্বে থাকা উচিত', নৈতিক উপদেশদানের ভঙ্গিতে সে বলল "যাই হোক না কেন, আমি ওর সঙ্গে একাসনে নিজেকে দেখতে রাজি নই।... এইমাত্র যদিও জিদ ধরে বলেছিলাম যে আমি যে-সমস্ত বিষয় আলোচনার উদ্দেশ্যে এসেছি সে-সব আপনার সহোদরের উপস্থিতিতে প্রকাশে আমি অনিচ্ছুক এবং অপারগ, তবু এখন কিন্তু আমি আপনার পরম শ্রদ্ধেয়া মাতৃদেবীর কাছ থেকে এমন একটি বিষয়ের একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা শুনতে চাই যা আমার পক্ষে অপমানজনক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার পুত্র..." এবারে পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নাকে উদ্দেশ করে সে বলল:... "গতকাল আপনার পুত্র এই মিস্টার রাস্‌সুদকিনের উপস্থিতিতে...না কি... তাই তো মনে হচ্ছে? মাফ করবেন, ভুলে গেছি আপনার পদবিটা..." রাজুমিখিনের দিকে তাকিয়ে ভদ্রভাবে মাথা নুইয়ে শেষ কথাগুলো উচ্চারণ করার পর পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নাকে সে বলল "... আমাকে অপমান করেছেন। অপমান করেছেন ইতিপূর্বে একবার আপনাদের বাড়িতে কফির আসরে আলোচনার সময় ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনাকে আমার যে নিজস্ব চিন্তা ব্যক্ত করেছিলাম তার কদর্থ করে। আমি যা বলেছিলাম তা এই যে আমার মতে, প্রাচুর্যের মধ্যে যে মানুষ হয়েছে এমন মেয়েকে বিয়ে করার চেয়ে যে দরিদ্র এবং জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা যার আছে, দাম্পত্য সম্পর্কের দিক থেকে বিচার করলে তাকে বিয়ে করা বেশি লাভজনক, যেহেতু তা নৈতিক উন্নতির সহায়ক। আপনার পুত্র ইচ্ছাকৃতভাবে আমার কথাগুলির তাৎপর্য অতিরঞ্জিত করে হাসির পর্যায়ে নামিয়ে আমার বিরুদ্ধে দুরভিসন্ধির অভিযোগ এনেছেন এবং আমার ধারণা সেটা তিনি করেছেন আপনারই লেখা চিঠির ভিত্তিতে। আমি নিজেকে সুখী গণ্য করব যদি আপনার পক্ষে এর উলটোটা প্রমাণ করা সম্ভব হয়। তাহলে আমি মনে বড় স্বস্তি পেতাম। দয়া করে আমাকে বলুন, আপনি রোদিওন রমানোভিচের কাছে লেখা চিঠিতে ঠিক কী ভাষায় আমার বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন।"

"আমার মনে নেই," বিভ্রান্ত হয়ে পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না বলল। "আমি নিজে যেমন বুঝেছিলাম তেমনি জানিয়েছি। রোদিয়া আপনাকে কী ভাবে জানিয়েছে আমার জানা নেই।... ও কিছু অতিরঞ্জন করলেও করতে পারে।"

"আপনার প্রশ্রয় ছাড়া উনি অতিরঞ্জন করতে পারেন না।"

পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না আত্মমর্যাদা বজায় রেখে বলল, "আমি আর দুনিয়া যে আপনার কথাগুলো খুব একটা মন্দ অর্থে গ্রহণ করিনি আমরা যে *এখানে* এটাই তার প্রমাণ।"

"ঠিক বলেছ মামণি।" দুনিয়া সায় দিয়ে বলল।

"তার মানে এখানেও যত দোষ আমার!" লুজিন ক্ষুব্ধ হয়ে বলল।

"দেখুন পিওতর পেত্রোভিচ, আপনি খালি আমার ছেলের দোষ দেখছেন, কিন্তু আজ সকালের চিঠিতে আপনি ওর সম্পর্কে অসত্য কথা লিখেছেন," পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না এবারে উৎসাহ পেয়ে যোগ করল।

"আমি অসত্য কিছু লিখেছি বলে মনে পড়ে না..."

লুজিনের দিকে না ফিরে তীক্ষ্ণস্বরে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বলে উঠল, "গতকাল রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ে একজনের মৃত্যু হয়, আমি টাকা দিয়েছিলাম আসলে তার সদ্য বিধবা স্ত্রীকে, কিন্তু আপনি চিঠিতে লিখেছেন আমি নাকি টাকা দিয়েছি তার মেয়েকে, অথচ গতকালের আগে আমি মেয়েটিকে কখনও চোখেও দেখিনি। আপনি একথা লিখেছেন আমার মা-বোনের সঙ্গে আমার বিবাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ইতর ভাষায় মেয়েটির আচরণের নিন্দা করেছেন, যদিও তাকে আপনি জানেন না। এ সবই গালগল্প, ন্যক্কারজনক।"

"মাফ করবেন মশায়," রাগে কাঁপতে-কাঁপতে লুজিন উত্তর দিল। "আমার চিঠিতে আপনার গুণাগুণ ও আচার-আচরণ সম্পর্কে আমি যে সবিস্তারে লিখেছিলাম তা একমাত্র আপনার ভগিনী ও মাতৃদেবীর অনুরোধক্রমে। আপনাকে কী অবস্থায় দেখলাম এবং আপনার সম্পর্কে আমার কী ধারণা হল বিস্তারিত জানাতে তাঁরা আমায় অনুরোধ করেছিলেন। আমার চিঠিতে যে কথার উল্লেখ করা হয়েছে সে প্রসঙ্গে আপনাদের বলি, এমন একটি ছত্র অন্তত খুঁজে বার করুন যেখানে আমি অন্যায় কোন কথা বলেছি— প্রমাণ করুন যে আপনি বাজে টাকা খরচ করেননি এবং যে পরিবারের কথা হচ্ছে তার অবস্থা দুর্ভাগ্যজনক হলেও সেখানে এমন কেউ নেই যার বাজারে দুর্নাম আছে।"

"কিন্তু আমার মতে আপনি যাবতীয় গুণের আধার হওয়া সত্ত্বেও যাকে লক্ষ করে ঢিল ছুঁড়ছেন সেই বেচারি মেয়েটির কড়ে আঙুলের যুগ্যি আপনি নন।"

"তার মানে আপনার মা আর বোনের সমাজে তাকে পরিচয় করিয়ে দিতে আপনি ইতস্তত করবেন না!"

"আপনার যদি জানতে ইচ্ছে হয় তো বলি, ইতিমধ্যে তা করেওছি। আজ আমি তাকে মা আর দুনিয়ার পাশে বসিয়েছিলাম।"

"রোদিয়া!" চিৎকার করে উঠল পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না।

দুনিয়া লজ্জায় লাল হয়ে গেল। রাজুমিখিন ভুরু কোঁচকাল। লুজিনের মুখে শ্লেষ ও দম্ভের হাসি ফুটে উঠল।

"আপনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন, আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না," সে বলল, "এখানে কি কোন মিটমাট সম্ভব? আশা করি এখন বিষয়টির পরিসমাপ্তি ঘটেছে, চিরকালের জন্য নিষ্পত্তি হয়েছে। আমি তাহলে চলি। আপনাদের সুখের পারিবারিক মিলনে এবং

নিজেদের মধ্যে একান্ত ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনায় আমি আর বিঘ্ন ঘটাব না।" টেবিল থেকে টুপিটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে যোগ করল, "তবে যাবার সময় আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আশা করি ভবিষ্যতে এ ধরনের সাক্ষাৎকার থেকে এবং মিটমাটের চেষ্টা বলতে যা বোঝায় তা থেকে আমাকে অব্যাহতি দেবেন। এই প্রসঙ্গে, আবেদনটা বিশেষ করে আপনাকে করছি, পুল্খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না, যেহেতু চিঠিটা একান্তভাবে আপনাকেই লেখা হয়েছিল— অন্য কাউকে নয়।"

পুল্খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হলেন।

"পিওতর পেত্রোভিচ, আপনি ভাবছেন বুঝি আমাদের পুরোপুরি আপনার বশে এনে ফেলেছেন। আপনার অনুরোধ কেন রাখা হয়নি তার কারণ তো দুনিয়া আপনাকে বলেছে। ওর কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল না। তা ছাড়া আপনি আমাকে যে ভাবে লিখছেন তাতে মনে হয় যেন হুকুম দিচ্ছেন। আপনি কি মনে করেন আপনার প্রতিটি ইচ্ছা হুকুম বলে গণ্য করতে হবে আমাদের? কিন্তু আমি তো বলর তার উলটোটা— এখন থেকে আমাদের সঙ্গে আপনার আচরণ বিশেষ মার্জিত ও সহনশীল হওয়া উচিত, যেহেতু আমরা সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আপনাকে বিশ্বাস করে এখানে এসেছি, অর্থাৎ অমনিতেই আমরা প্রায় আপনার বশে আছি।"

"এটা কিন্তু আপনার খুবই অন্যায়, পুল্খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না— বিশেষত এই মুহূর্তে, যখন মার্ফা পেত্রোভ্নার উইল করে যাওয়া তিন হাজার রুবলের কথা সবে ঘোষিত হয়েছে। যে নতুন ঢঙে আমার সঙ্গে আপনি কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন সেদিক থেকে বিচার করলে তা রীতিমতো সময়োচিত বলেও মনে হচ্ছে," খোঁচা দিয়ে সে যোগ করল।

"আপনার এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবিকই অনুমান করা যেতে পারে যে আপনি আমাদের অসহায়তার ওপর ভরসা করেছিলেন," তিক্তকণ্ঠে দুনিয়া মন্তব্য করল।

"কিন্তু এখন অন্তুতপক্ষে সে ভরসা আর করতে পারছি না। তাছাড়া আর্কাদি ইভানোভিচ স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ তাঁর যে গোপন প্রস্তাব জানানোর ভার বিশ্বাস করে আপনার প্রিয় সহোদরের ওপর ন্যস্ত করেছেন এবং যা, আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনাদের কাছে পরম গুরুত্বপূর্ণ— এমনকি হয়ত বা সুমধুর অর্থবহ, আপনাদের ব্যাঘাত ঘটিয়ে তা শোনার ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।"

"হা ভগবান!" পুল্খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না আর্তনাদ করে উঠল।

রাজুমিখিন চেয়ারে বসে উস্খুস করতে লাগল।

"তোর এখন লজ্জা করছে না দুনিয়া?" রাস্কোল্নিকভ্ জিগ্গেস করল।

"লজ্জা করছে রোদিয়া," দুনিয়া বলল। "বেরিয়ে যান, পিওতর পেত্রোভিচ!" ক্রোধে মুখ পাণ্ডুর হয়ে গেল দুনিয়ার।

এ ধরনের পরিণতি বোধহয় পিওতর পেত্রোভিচের আদৌ প্রত্যাশিত ছিল না। তার বড় বেশি আশা ছিল নিজের ওপর, নিজের ক্ষমতার ওপর এবং যারা তার শিকার তাদের অসহায়তার ওপর। এখনও তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। তার মুখ ফেকাসে হয়ে গেল, ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে লাগল।

"আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না, এহেন বিদায় সম্ভাষণের পর আমি যদি এখন এই দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে যাই, তাহলে জেনে রাখবেন যে আমি আর কখনই ফিরে আসছি না। ভালো করে ভেবে দেখুন! আমার কথার কোন নড়চড় হবে না"

"এ কি বেহায়াপনা!" দ্রুত আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দুনিয়া চেঁচিয়ে বলল। "হ্যাঁ, আমি চাই না যে আপনি ফিরে আসুন!"

"কী? এই ব্যাপার!" ঘটনা যে এরকম মোড় নিতে পারে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত একেবারে বিশ্বাস করতে পারছিল না লুজিন, তাই এখন সম্পূর্ণ খেই হারিয়ে ফেলে সে চিৎকার করে বলল, " বটে বটে! কিন্তু জানেন কি আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না, আদালতে প্রতিবাদ করার অধিকার আমার আছে!"

"ওর সঙ্গে এভাবে কথা বলার কী অধিকার আছে আপনার!" পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না উত্তেজিত হয়ে ওদের কথার মাঝখানে বলে উঠল। "কী নিয়ে আপনি অভিযোগ করতে পারেন? কী অধিকার থাকতে পারে আপনার? আপনি কি মনে করেন, আপনার মতো লোকের হাতে দুনিয়াকে তুলে দেব? চলে যান! আর আসবেন না আমাদের কাছে! এরকম একটা অন্যায় কাজ করতে যে আমরা এগিয়েছিলাম তার জন্যে দোষ আমাদের নিজেদেরই— সর্বোপরি আমার।..."

"যাই বলুন না কেন, পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না," ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত হয়ে লুজিন বলল, "আপনারা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাকে বেঁধে রেখেছিলেন, এখন তা ভঙ্গ করছেন... এবং... এবং সর্বোপরি এর পেছনে আমাকে অর্থব্যয় করতে হয়েছে।..."

এই শেষ অভিযোগটি পিওতর পেত্রোভিচের চরিত্রের পক্ষে এতই স্বাভাবিক যে ক্রোধে এবং ক্রোধ সংবরণের চেষ্টা করতে গিয়ে ফেকাসে হয়ে গেল রাস্‌কোল্‌নিকভের মুখ। শেষকালে নিজেকে আর সামলাতে না পেরে হঠাৎ সে ফেটে পড়ল অট্টহাসিতে। কিন্তু পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল।

"অর্থব্যয়ের কথা বলছেন? কিসের অর্থব্যয়? আমাদের ট্রাঙ্কের কথা বলছেন কি আপনি? সে তো রেলের গার্ড মাগনা আপনাকে বয়ে এনে দিয়ে গেছে। হা ভগবান, আমরা কিনা আপনাকে বেঁধে রেখেছি! আপনার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে পিওতর পেত্রোভিচ! আমরা আপনাকে বেঁধে রাখিনি, বরং আপনিই আমাদের হাত-পা বেঁধে রেখেছেন!"

"অনেক হয়েছে মামণি, ছাড়, অনেক হয়েছে!" অনুনয় করে বলল আভ্‌দোতিয়া

রমানোভ্‌না। "দয়া করে চলে যান, পিওতর পেত্রোভিচ!"

"চলে যাব, কিন্তু আর মাত্র একটি কথা আছে— শেষ কথা!" এবারে আত্মসংযম প্রায় সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে সে বলল। "আপনার মাতৃদেবী, মনে হয়, বিলকুল ভুলে গেছেন যে বলতে গেলে সারা তল্লাট জুড়ে আপনার বদনাম ছড়িয়ে পড়ার পর আমি আপনার পাণিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আপনার খাতিরে সমাজের মতামত উপেক্ষা করে আমি যে আপনার খ্যাতি পুনরুদ্ধার করেছি তার প্রতিদানস্বরূপ আমি অবশ্যই, অত্যন্ত সঙ্গত কারণে, কিছু আশা করতে পারতাম, এমনকি আপনার কাছ থেকে কৃতজ্ঞতাও দাবি করতে পারতাম।... মাত্র এই এখুনি আমার চোখ খুলল! আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি সমাজের মতামত উপেক্ষা করে আমি খুব সম্ভব ভুল করেছি, খুব বড় ভুল করেছি।..."

"ওঁর ঘাড়ে কি দুটো মাথা আছে নাকি!" লুজিনের সঙ্গে হেস্তনেস্ত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল রাজুমিখিন।

"আপনি একজন নীচ ও খলস্বভাবের লোক!" দুনিয়া বলল।

"একটি কথাও নয়! হাতাহাতি নয়!"রাজুমিখিনকে আটকে দিয়ে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ বলে উঠল, তারপর লুজিনের একেবারে মুখোমুখি এগিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে স্পষ্ট উচ্চারণ করে বলল, "দয়া করে বেরিয়ে যান। আর একটি কথাও নয়। নইলে কিন্তু..."

রাগে, বিদ্বেষে পাণ্ডুর ও বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল পিওতর পেত্রোভিচের মুখ। কয়েক মুহূর্ত জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল রাস্‌কোল্‌নিকভের দিকে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল। বলাই বাহুল্য, রাস্‌কোল্‌নিকভের ওপর যে পরিমাণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ এই মানুষটি বুকে করে বয়ে নিয়ে গেল, তেমন কদাচিৎ কেউ কারও বিরুদ্ধে পোষণ করে থাকে। সমস্ত ঘটনার জন্য তাকে, একমাত্র তাকেই সে দোষী সাব্যস্ত করল। লক্ষণীয় এই যে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়ও তার মনে হতে লাগল এখনও পুরোপুরি হতাশ হওয়ার মতো হয়ত কিছু ঘটেনি এবং একমাত্র মহিলা দুজনের কথা ভাবলে শোধরানের সম্ভাবনা খুবই প্রবল।

তিন

আসল ব্যাপারটা এই যে একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে পর্যন্ত ঘটনার এমন পরিণতি আদৌ তার কাছে প্রত্যাশিত ছিল না। দম্ভের শেষ সীমানায় পৌঁছেও তার মনে এমন সম্ভাবনার উদয় হয়নি যে দুই নিঃস্ব ও অসহায় নারী তার কবল থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। তার এই বিশ্বাস আরও জোরদার করে তোলে তার অহঙ্কার এবং মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, যাকে বরং নিজের প্রতি এক ধরনের মোহ বলাই ভালো। পিওতর পেত্রোভিচ নগণ্য অবস্থা থেকে কষ্ট করে ওপরে উঠেছে। নিজের

সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করা তার বরাবরের অভ্যাস, এক ধরনের রোগবিশেষ। নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতা সম্পর্কে তার উচ্চ ধারণা তো ছিলই এমনকি একা থাকলে অনেক সময় সে ক্ষুব্ধ হয়ে আয়নায় নিজের মুখও দেখত। কিন্তু পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি যা ভালোবাসত, যার মূল্য দিত তা হল কঠিন পরিশ্রম এবং অন্যান্য নানা উপায়ে অর্জিত নিজের অর্থসম্পদ, যেহেতু অর্থসম্পদই তার উর্ধ্বে স্থিত সমস্ত কিছুর সমস্তরে তাকে উন্নীত করতে পারত।

এইমাত্র পিওতর পেত্রোভিচ যখন তিক্ততার সঙ্গে দুনিয়াকে মনে করিয়ে দিল যে তার দুর্নাম রটে যাওয়া সত্ত্বেও সে তাকে গ্রহণ করবে বলে মনস্থ করেছিল তখন সে সম্পূর্ণ আন্তরিকভাবেই তা বলে, এমনকি দুনিয়ার এমন 'নিষ্ঠুর কৃতঘ্নতা' তার মনে প্রবল ঘৃণার উদ্রেক করে। অথচ যখন সে দুনিয়ার পাণিপ্রার্থনা করে তখন সেইসমস্ত গালগল্পের অসারতা সম্পর্কে তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। যেহেতু ইতিমধ্যে মার্ফা পেত্রোভ্‌না নিজে সর্বসমক্ষে তা মিথ্যা বলে প্রতিপাদন করেছে এবং অনেককাল হল শহরের লোকজন ওই অপপ্রচার ছেড়েও দিয়েছিল, এখন তারাই বরং মনেপ্রাণে দুনিয়ার পক্ষ সমর্থন করছিল।...তাছাড়া সে নিজেও এখন অস্বীকার করতে পারে না যে তখনই সব জানত। তা সত্ত্বেও দুনিয়াকে নিজের স্তরে উন্নীত করার যে সিদ্ধান্ত সে নিয়েছিল তাকে সে উচ্চ মূল্য দেয় এবং নিজের একটা কীর্তি বলে গণ্য করে। নিজের গোপন ও সযত্নে লালিত যে চিন্তায় বারবার সে মুগ্ধ হয়ে যেত এখন দুনিয়ার কাছে তা প্রকাশ করে ফেলে তাই ফাঁস করে দেয়। এবং ধারণায়ই আনতে পারে না এটা কীভাবে সম্ভব যে অন্যেরা তার এই কীর্তিকে প্রশংসা করতে পারল না। রাস্‌কোল্‌নিকভের কাছে যখন সে দর্শন দেয় তখন নিজের প্রয়াসের ফসল সংগ্রহ এবং প্রশংসাসূচক মিষ্টি কথা শোনার জন্য প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিল। তাই এখন সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে নিজেকে যে দস্তুরমতো অপমানিত ও অবহেলিত তার মনে হবে তাতে আর সন্দেহ কি!

দুনিয়াকে তার খুব প্রয়োজন ছিল। দুনিয়া তার হাতছাড়া হয়ে যাবে এটা তার কাছে অকল্পনীয়। অনেক আগে থেকে, বেশ কয়েক বছর আগেই বিবাহ করার বাসনা তার ছিল। কিন্তু এতদিন ধরে সে অর্থ সঞ্চয় করেছে, সেই পরমক্ষণটির জন্য অপেক্ষা করে থেকেছে। নিবিষ্ট চিত্তে সংগোপনে সে ধ্যান করে এসেছে এক নিষ্কলঙ্ক কুমারীর, যাকে হতে হবে দরিদ্র—অবশ্যই দরিদ্র। তার বয়স হওয়া চাই খুবই কম, তাকে দেখতে-শুনতে বেশ ভালো হতে হবে, ভদ্র, শিক্ষিত ও অত্যন্ত ভীরু স্বভাবের হতে হবে, জীবনের অনেক ঝড়ঝাপটার অভিজ্ঞতা তার থাকতে হবে এবং তাকে স্বামীর ইচ্ছার সম্পূর্ণ বশবর্তী হতে হবে—অর্থাৎ চাই এমন একজনকে যে সারা জীবন তাকে তার পরিত্রাতা বলে গণ্য করবে, তাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করবে, তার বশ্যতা স্বীকার করবে, তাকে দেখে— একমাত্র তাকে দেখেই মুগ্ধ ও বিস্মিত হবে। দৈনন্দিন কাজের শেষে

শান্তিতে অবকাশযাপনের সময় এই প্রলোভনজনক ও কৌতুকাবহ বিষয় নিয়ে কল্পনায় কত দৃশ্য, কত মধুর উপাখ্যানই না সে গড়ে তুলেছে। অবশেষে তার এতদিনের স্বপ্ন বাস্তবে·পরিণত হতে চলেছিল। আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার রূপে, তার শিক্ষায় সে মুগ্ধ, বিস্ময়াভিভূত। তার অসহায় অবস্থা তাকে চূড়ান্ত প্ররোচনা দিয়েছে। তাছাড়া ওর মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা লুজিনের স্বপ্নকেও বেশ খানিকটা ছাড়িয়ে গেছে। মেয়েটির মধ্যে গর্ববোধ আছে, নিজস্ব চরিত্র আছে। সে নিষ্কলঙ্ক এবং শিক্ষায়-দীক্ষায় তার নিজের চেয়ে উঁচুতে—এটা সে উপলব্ধি করতে পারছিল। এ ধরনের জীবই তো তার বীরত্বপূর্ণ কীর্তির জন্য তার কাছে কেনা বাঁদীর মতো কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে, পরম ভক্তিভরে মাথা নিচু করে থাকবে। তখন সে নিজে হবে 'অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন সর্বময় প্রভুত্বের অধিকারী!'... যেন এক অদ্ভুত দৈব যোগাযোগের ফলেই অল্প কিছুকাল আগে, বহুকালের ভাবনাচিন্তা ও প্রতীক্ষার পর শেষকালে সে তার কর্মজীবন চূড়ান্তভাবে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং নিজের কার্যকলাপের পরিধি আরও প্রসারিত করে। পরিণামে সে ধীরে-ধীরে সমাজের আরও উঁচু মহলে উঠতে থাকে। এটা ছিল তার বহুকালের লালিত স্বপ্ন। ...এককথায়, সেন্ট পিটার্সবুর্গে এসে সে তার ভাগ্যপরীক্ষা করবে বলে স্থির করেছে। সে জানত যে নারীদের সাহায্য 'প্রভূত পরিমাণে' লাভজনক হতে পারে। ভালো শিক্ষাদীক্ষার অধিকারিণী, সচ্চরিত্রের কোন সুন্দরী নারীর আকর্ষণ তার চলার পথের শোভা আশ্চর্যজনকভাবে বৃদ্ধি করতে পারে, তার প্রতি লোকজনকে আকৃষ্ট করতে পারে, জীবনকে রঙিন করে তুলতে পারে।...এখন সব গেল! এখনকার এই ভাঙন বড় ভয়ঙ্কর, বড়ই আকস্মিক। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। এক ধরনের নিষ্ঠুর পরিহাস, যার কোন অর্থ হয় না। সে নিজের ওজন সামান্য বাড়িয়েছিল মাত্র। নিজের মনের সব কথা বলার অবকাশ পর্যন্ত সে পেল না। সামান্য তামাসামাত্র করেছিল, বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল, তার ফল কিনা হল এমন মারাত্মক! তাছাড়া দুনিয়াকে সে এর মধ্যে ভালোও বেসে ফেলেছিল—নিজের মতন করে। ইতিমধ্যে সে কল্পনায় নিজেকে তার প্রভু বলে ভাবতে শুরু করেছিল। এক নিমেষে সব কিনা ধূলিসাৎ হয়ে গেল।...না! আগামীকাল, আগামীকালের মধ্যেই এ ভুল শোধরাতে হবে, এর একটা বিহিত করতে হবে, আর সবচেয়ে বড় কথা, এসবের মূলে এই যে উদ্ধতপ্রকৃতির দুগ্ধপোষ্য বালকটি, তাকে সরাতে হবে। অনেকটা অনিচ্ছাসত্ত্বে হলেও রাজুমিখিনের কথাও তার মনে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠল।... কিন্তু এক্ষেত্রে শিগ্‌গিরই নিজেকে সে এই বলে সান্ত্বনা দিল : 'এই লোকটাকে কি আর তাই বলে ওর পাশাপাশি রাখা যায়!' কিন্তু আসলে যাকে তার সত্যিকার ভয় সে হল স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌।...এককথায়, সামনে অনেক ঝামেলা।

* * *

"না, দোষ আমারই, আমার দোষই সকলের চেয়ে বেশি!" মাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে দুনিয়া বলল। "আমি ওর টাকার লোভে পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ভাই, তোকে দিব্যি করে বলছি, লোকটা যে এমন অপদার্থ তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি। আমি যদি আগে ওকে চিনতে পারতাম তাহলে কোনমতেই এই প্রলোভনে পড়তাম না! অপরাধ নিস নে ভাই!"

"ভগবান রেহাই দিয়েছেন! ভগবান রেহাই দিয়েছেন!" বিড়বিড় করে বলল পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না। কিন্তু কথাগুলো সে বলল অনেকটা অর্ধচেতনভাবে, যেন যা ঘটে গেল তার তাৎপর্য এখনও সঠিক অনুধাবন করতে পারছে না।

সকলেই খুশি। এমনকি পাঁচ মিনিট পরে দেখা গেল ওরা হাসাহাসি করছে। শুধু দুনিয়ার মুখ থেকে-থেকে ফেকাসে হয়ে যাচ্ছে, যা ঘটে গেল তা মনে করে সে ভুরু কোঁচকাচ্ছে। পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না কল্পনায়ই আনতে পারছিল না যে তারও খুশি হওয়া উচিত। আজ সকালেও লুজিনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়াটা তার কাছে চরম দুর্ভাগ্যজনক মনে হচ্ছিল। কিন্তু রাজুমিখিনের আনন্দ আর ধরে না। সে আনন্দ এখন পুরোপুরি প্রকাশ করতে তার সাহস হচ্ছিল না। কিন্তু তার সর্বাঙ্গ জ্বরাক্রান্ত রুগীর মতো থরথর করে কাঁপছিল। তার মনে হচ্ছিল যেন একটা বিরাট পাথরের ভার তার বুক থেকে নেমে গেল। এখন তার নিজের সমস্ত জীবন ওদের সেবায় উৎসর্গ করার অধিকার তার আছে।... কিন্তু তা হলেই বা কী! এখন কী ঘটতে পারে তাই বা কে বলতে পারে! প্রসঙ্গত, আরও বেশি ভীতচকিত হয়ে পরবর্তী চিন্তাভাবনাগুলোকে সে মন থেকে দূর করার চেষ্টা করতে লাগল। নিজের কল্পনায় সে নিজেই ভয় পেয়ে যাচ্ছিল। একমাত্র রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ই মুখ প্রায় গোমড়া করে, এমনকি কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে একঠায় বসে রইল। লুজিনকে তাড়ানোর জন্য সে-ই সবচেয়ে বেশি পীড়াপীড়ি করছিল, অথচ এখন যা ঘটে গেল তাতে তারই আগ্রহ যেন আর সকলের চেয়ে কম। দুনিয়া কিছুতেই না ভেবে পারছিল না যে ভাই এখনও তার ওপর খুব রেগে আছে। পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না ছেলের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছিল।

"স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ তোকে কী বলল তা তো বললি না," রোদিয়ার কাছে এগিয়ে এসে দুনিয়া জিগ্‌গেস করল।

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ!" পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না চেঁচিয়ে উঠল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ মাথা তুলল।

"তার ইচ্ছে, এক্ষুনি তোকে দশ হাজার রুবল উপহার দেওয়া, সেই সঙ্গে একদিন আমার উপস্থিতিতে তোর সঙ্গে দেখা করার বাসনাও প্রকাশ করেছে।"

"দেখা করা! কোনমতেই নয়!" পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না আর্তনাদ করে উঠল। "এতদূর স্পর্ধা যে ওকে টাকা দিতে চাইছে!"

তারপর রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ নিতান্ত নীরসভাবে স্‌ভিদ্রিগাইলভের সঙ্গে তার আলোচনার বিষয় জানাল। যেহেতু প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া আর কোন কথা উত্থাপনের সে প্রবল বিরোধী ছিল সেই কারণে এবং বাহুল্য বর্জনের খাতিরে মার্ফা পেত্রোভ্‌নার প্রেতাত্মার প্রসঙ্গটা সে বাদ দিল।

"তা তুই কী উত্তর দিলি ওকে?" দুনিয়া জিগ্‌গেস করল।

"প্রথমে বললাম, তোকে কিছুই জানাব না। তাতে সে জানাল যে নিজে যে কোন উপায়েই হোক তোর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবে। আশ্বাস দিয়ে বলল, তোর প্রতি ওর আবেগটা ছিল ক্ষণিকের মোহ মাত্র, এখন সেরকম কোন অনুভূতি নেই।... ওর ইচ্ছে নয় যে লুজিনের সঙ্গে তোর বিয়ে হয়।... মোটের ওপর, ওর কথাগুলো কেমন যেন অসংলগ্ন।"

"ওকে দেখে তুই নিজে কেমন বুঝলি, রোদিয়া? ওকে দেখে তোর কেমন মনে হল?"

"স্বীকার করতে বাধা নেই, আমি কিছুই ভালোমতো বুঝতে পারছি না। দশ হাজার দিতে চাইছে, অথচ নিজেই বলছে যে সে ধনী নয়। এই বলল যে কোথাও চলে যেতে চায়, আবার দশ মিনিট পরেই দেখা গেল ভুলে বসে আছে সেই কথা। হঠাৎই আবার বলে বসল যে বিয়ে করতে চায়। বলল যে ইতিমধ্যে পাত্রীও স্থির হয়ে গেছে।... বলাই বাহুল্য, ওর কোন মতলব আছে, খুব সম্ভব কুমতলব। কিন্তু আবার দেখ, ওর যদি কোন দুরভিসন্ধি থাকত তাহলে এমন বোকার মতো কাজে নামবে একথা ভাবতেও তো কেমন অদ্ভুত লাগে।... আমি অবিশ্যি তোর হয়ে ওই টাকার প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছি চিরকালের জন্যে। মোটের ওপর লোকটাকে আমার বড় অদ্ভুত মনে হয়, এমনকি... মস্তিষ্ক বিকৃতির কিছু লক্ষণও যেন ওর মধ্যে দেখা যায়। তবে আমার ভুলও হতে পারে। আসলে হয়ত ওটা ছিল এক ধরনের ছল। মার্ফা পেত্রোভ্‌নার মৃত্যু সম্ভবত ওর মনের ওপর ছাপ ফেলেছে।..."

"ভগবান ওঁর আত্মাকে শান্তি দিন!" পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না বলে উঠল। "ওঁর জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব, চিরকাল করব! ওই তিন হাজার না হলে আমাদের দশাটা এখন কী হত বল দেখি দুনিয়া! ভগবান, এ যে স্বর্গের দান! ওঃ রোদিয়া, জানিস, আজ সকালে আমাদের সম্বল ছিল মোটে তিনটে রুবল! আমি আর দুনিয়া মিলে কেবল এ কথাই চিন্তা করছিলাম ঘড়িটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোথাও বন্ধক দেওয়া যায় কিনা— যাতে ওই লোকটা নিজে থেকে কিছু অনুমান করার আগে তার কাছে হাত পাততে না হয়।

স্‌ভিদ্রিগাইলভের প্রস্তাবে দুনিয়া কেমন যেন অতিমাত্রায় বিস্মিত। সে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল।

"ভয়ঙ্কর কিছু একটা মতলব এঁটেছে লোকটা!" প্রায় শিউরে উঠে অনেকটা ফিসফিসিয়ে আপন মনে সে বলল।

এই বিভীষিকার ভাবটা রাস্‌কোল্‌নিকভের নজর এড়াল না।

"আমার মনে হয় আরও একাধিকবার ওর সঙ্গে মোলাকাত হওয়া আমার ভাগ্যে আছে," দুনিয়াকে সে বলল।

"আমরা ওর ওপর নজর রাখব! আমি ওকে ঠিক খুঁজে বার করব!" সোৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল রাজুমিখিন। "চোখের আড়াল করব না! রোদিয়া আমাকে অনুমতি দিয়ে রেখেছে। ও আমায় নিজে কিছু আগেও বলেছে: 'আমার বোনটাকে আগলে রেখো।' আপনার সম্মতি আছে তো আভ্‌তোতিয়া রমানোভ্‌না?"

দুনিয়া মুচকি হেসে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, কিন্তু তার মুখ থেকে দুশ্চিন্তার চিহ্ন দূর হল না। পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না ভয়ে-ভয়ে মেয়ের দিকে তাকাচ্ছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তিন হাজার রুবলের কথা ভেবে সে স্বস্তি পাচ্ছিল।

মিনিট পনেরো বাদে দেখা গেল ওরা সকলে মহা উৎসাহে আলোচনায় মেতে উঠেছে। এমনকি রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ কথাবার্তা না বললেও বেশ কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল। মূল বক্তা রাজুমিখিন।

"আপনারা চলে যাবেন কেন? চলে যেতে হবে কেন আপনাদের?" উচ্ছ্বসিত বক্তৃতার ফুলঝুরি ছুটিয়ে দিল রাজুমিখিন। "মফস্বল শহরে আপনারা কী করবেন বলুন তো? তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা, আপনারা সকলে এখানে একসঙ্গে আছেন, আপনাদের একজনের অন্যকে দরকার, খুবই দরকার। আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা করুন! অন্তত কিছু সময়ের জন্য দরকার তো বটেই।... আমাকে আপনাদের বন্ধু বলে, সঙ্গী বলে ধরে নিন, আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, আমরা এখানে ভেবেচিন্তে একটা চমৎকার কারবার খুলতে পারব। শুনুন, আমি আপনাদের কাছে সবটা— পুরো পরিকল্পনাটা বিশদ বুঝিয়ে বলছি। আজ সকালে... তখনও এমন কিছু ঘটেনি ...তখনই কিন্তু আমার মাথায় এটা খেলেছিল।... তা হলে খুলে বলি: আমার এক কাকা আছেন... বেশ সপ্রতিভ সম্ভ্রান্ত চেহারার বৃদ্ধ ভদ্রলোক... আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তা ওঁর হাজারখানেক রুবলের পুঁজি আছে। সে টাকায় ওঁর কোন দরকার নেই। পেনশনের টাকায় দিব্যি চলে যায়। এ নিয়ে দু-বছর হতে চলল, উনি আমার পেছনে লেগে আছেন যাতে আমি ওই টাকা ওঁর কাছ থেকে ধার নিয়ে বছরে শতকরা ছয় রুবল হারে ওঁকে সুদ দিই। ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট: আসলে উনি আমাকে সাহায্য করতে চান। কিন্তু গত বছর আমার প্রয়োজন ছিল না। এ বছর আমি ওঁর আগমনের প্রতীক্ষায়ই ছিলাম।... ঠিক করেছি টাকাটা নেব। তারপর আপনারা আপনাদের তিন হাজার থেকে আরেক হাজার দেবেন। আরম্ভ করার পক্ষে যথেষ্ট। এখানেই আমরা একসঙ্গে হচ্ছি। আমরা কী করব, এই কথা তো?"

এবারে রাজুমিখিন তার পরিকল্পনা খুলে বলতে শুরু করল। যে বিষয় নিয়ে অনেক কথা বলল তা এই যে আমাদের বই বিক্রেতা বা প্রকাশকদের প্রায় কারোই

নিজেদের পণ্যদ্রব্য সম্পর্কে বিশেষ কোন ধ্যানধারণা নেই। এই কারণে তারা সচরাচর নিকৃষ্ট ধরনের প্রকাশক। অথচ ভালো বই প্রকাশ করতে পারলে মোটের ওপর খরচ উঠে আসে, লাভও হয়— অনেক সময় ভালো লাভই হয়। দু-বছর অন্য প্রকাশকদের হয়ে কাজ করার পর এই প্রকাশনা ব্যবসায়েরই স্বপ্ন দেখছে রাজুমিখিন। তিনটে ইউরোপীয় ভাষায় তার মোটামুটি ভালো জ্ঞান আছে, যদিও দিনছয়েক আগে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে সে বলেছিল যে জার্মানে সে 'নিরেট'। সেটা বলার অবশ্য উদ্দেশ্য ছিল যাতে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ অনুবাদের অর্ধেক কাজের ভার নেয় এবং তিন রুবল আগাম নেয়। তখন সে মিথ্যে কথা বলেছিল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ও জানত যে সে মিথ্যে বলছে।

"মুখ্য উপকরণ বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে একটি, অর্থাৎ নিজস্ব পুঁজি যখন আমাদের আছেই তখন আর সুযোগ হাতছাড়া করা কেন? কী মানে হয় বলুন!" রাজুমিখিন উত্তেজিত হয়ে বলল। "এটা ঠিক যে অনেক খাটতে হবে। তা, আমরা খাটব। আপনি খাটবেন, আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না, আমি খাটব, রোদিওনও খাটবে। কোন-কোন বই থেকে এখন বেশ ভালো লাভ হয়। আমাদের ব্যবসায়ী উদ্যোগের মূল ভিত্তি এই যে ঠিক কী অনুবাদ করা দরকার তা আমরা জানব। আমরা অনুবাদ করব, বই প্রকাশ করব, পড়াশুনাও করব। ...সব একই সঙ্গে করব। এখন আমি কাজে আসতে পারি, কেননা এ কাজে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। প্রায় দু-বছর হতে চলল প্রকাশকদের দ্বারে-দ্বারে ঘুরছি! ওদের সমস্ত নাড়ীনক্ষত্র আমার জানা হয়ে গেছে। বিশ্বাস করুন, কুমোরের চাকা ভগবান ঘোরান না! তাহলে কেন, কেনই বা হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে যাব? তাছাড়া আমি নিজে জানি... এতদিন আমি গোপন করে এসেছি...দু' তিনটে এমন ধরনের বই আছে যেগুলো অনুবাদ ও প্রকাশের আইডিয়া দিলে একমাত্র তা থেকেই প্রতিটি বইয়ের জন্য একশ করে নেওয়া যেতে পারে। আবার এমন বইও আছে যার জন্য পাঁচশ রুবলেও আমি রাজি হব না। কোন প্রকাশককে প্রস্তাব দিয়ে দেখুন, সে সঙ্গে-সঙ্গে নানারকম ওজর-আপত্তি তুলবে। এতই আকাট মূর্খ তারা! আর কারবারের আসল যা ঝামেলা— প্রেস, কাগজ, বিক্রি— সে ভার আমার ওপর দিতে পারেন। আমি সব অলিগলি জানি! অল্প-অল্প করে শুরু করে বড় কারবারে যাব। অন্ততপক্ষে এটা ঠিক যে আমাদের জীবনধারণের একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর যা-ই হোক, নিজেদের টাকা ঠিক উঠে আসবে।"

দুনিয়ার চোখ চকচক করে উঠল।

"আপনি যা বলছেন, আমার খুবই মনে ধরছে, দ্‌মিত্রি প্রকোফিচ," সে বলল।

"আমি অবিশ্যি এ ব্যাপারের কিছু জানি না", পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না বলল। "হয়ত ভালোই, কিন্তু ওই তো বললাম—ভগবান জানেন। কেমন যেন নতুন, অজানা। এটা ঠিক আমাদের এখানে থাকা একান্ত দরকার—অন্তত কিছুদিনের জন্য তো বটেই।..."

সে রোদ্যিয়ার দিকে তাকাল।

"তুই কী মনে করিস, ভাই?" দুনিয়া জিগ্‌গেস করল।

"আমার মনে হয় ওর আইডিয়াটা খুবই ভালো", সে উত্তর দিল। "বলাই বাহুল্য, পাব্‌লিশিং হাউসের চিন্তা এত আগে থাকতে না করাই ভালো। তবে পাঁচ-ছয়টা বই নিঃসন্দেহে প্রকাশ করে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে। আমি নিজেই এমন একটা বইয়ের নাম করতে পারি যার নির্ঘাত কাটতি হবে। আর ব্যবসা চালানোয় ওর কতখানি দক্ষতা আছে সে প্রশ্ন যদি ওঠে তা হল বলব ও নিয়ে ভাবতে হবে না। এ বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নেই। ব্যবসা ও জানে।...যাকগে, বোঝাপড়ায় আসার আরও অনেক সময় পাবে তোমরা।"

"বাহবা!" উৎফুল্ল হয়ে বলল রাজুমিখিন। "এখন, দাঁড়ান, এখানে একটা ফ্ল্যাট আছে, এই বাড়িতে, এই একই মালিকের। ফ্ল্যাটটা বিশেষ ধরনের। সবরকমের আলাদা ব্যবস্থা আছে সেখানে, হোটেলের এই ঘরগুলোর সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই। আসবাবপত্রও পেয়ে যাচ্ছেন ঘরের সঙ্গে। ভাড়া সাধ্যের মধ্যে। ছোট-ছোট তিনটে কামরা। আপাতত এটা ভাড়া নিয়ে নিন। আপনার ঘড়িটা অমি কাল বাঁধা দিয়ে টাকা নিয়ে আসব। তখন সব ঠিক করা যাবে। সবচেয়ে বড় কথা আপনারা তিনজনে একসঙ্গে থাকতে পারছেন। রোদিয়া আপনাদের সঙ্গে থাকছে।... একী, রোদিয়া, তুমি চললে কোথায়?"

"কী হল রোদিয়া, তুই এখনই চলে যাচ্ছিস?" পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নার কথার সুরে আতঙ্ক।

"এমন একটা মুহূর্তে!" রাজুমিখিন হাঁ হাঁ করে উঠল।

দুনিয়া সন্দেহমিশ্রিত বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ভাইয়ের দিকে তাকাল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ ততক্ষণে টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে চলে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে।

"দেখেশুনে মনে হচ্ছে তোমরা যেন আমাকে কবর দিতে যাচ্ছ কিংবা চিরবিদায় জানাচ্ছ," কেমন যেন অদ্ভুতভাবে সে বলে উঠল।

সে যেন মুচকি হাসল। কিন্তু হাসি সেটাকে ঠিক বলা যায় না।

"তবে কে জানে, হয়ত বা এটাই শেষ দেখা", অপ্রত্যাশিতভাবে সে যোগ করল। সে হয়ত একথাটাই মনে-মনে ভাবছিল, কিন্তু কীভাবে যেন নিজের অজ্ঞাতসারে মুখ ফসকে বলে ফেলল।

"কী হল তোর?" আর্তনাদ করে উঠল পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না।

"তুই যাচ্ছিস কোথায়, রোদিয়া?" একটু অদ্ভুতভাবেই জিগ্‌গেস করল দুনিয়া।

"অমনি। বড় দরকার আছে আমার," যেন কী বলবে বুঝতে না পেরে ইতস্তত করে ভাসা-ভাসা জবাব দিল সে। কিন্তু তার ফেকাসে মুখের ওপর ফুটে উঠল এক ধরনের কঠিন সঙ্কল্পের চিহ্ন।

''আমি যা বলতে চাইছিলাম...এখানে আসতে-আসতে আমি যা বলব বলে ভেবেছিলাম...মামণি, তোমাকে, আর দুনিয়া, তোকে... সেটা এই যে কিছুদিনের জন্যে আমাদের আলাদা হয়ে থাকা ভালো। আমি খুব একটা ভালো বোধ করছি না, আমি স্বস্তি বোধ করছি না...আমি পরে আসব, নিজে আসব, যখন সম্ভব হবে তখন আসব। তোমাদের আমি মনে রাখব। আমি তোমাদের ভালোবাসি।...আমাকে ছেড়ে দাও' আমাকে একা থাকতে দাও। আমি অনেক আগেই এটা স্থির করে রেখেছি।...আমি চূড়ান্তভাবে ঠিক করে ফেলেছি। ...আমার ভাগ্যে যা-ই ঘটুক না কেন, আমি প্রাণ হারাই বা না হারাই— আমি একা থাকতে চাই। আমার কথা একদম ভুলে যাও। এটাই ভালো। ...আমার খোঁজখবর করতে যেও না। যখন দরকার হবে আমি নিজে আসব, নয়ত... তোমাদের ডেকে পাঠাব। হয়ত সবকিছুর পুনরুজ্জীবন ঘটবে।..,কিন্তু এখন, তোমরা যদি আমাকে ভালোবেসে থাক তাহলে আমাকে ত্যাগ কর। ...নইলে, স্পষ্ট আমি উপলব্ধি করতে পারছি, তোমাদের আমি ঘৃণা করতে থাকব।...বিদায়!''

''হা ভগবান!'' পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না আর্তনাদ করে উঠল।

মা আর বোন দুজনেই ভয়ঙ্কর ঘাবড়ে গেল। রাজুমিখিনও।

''রোদিয়া, রোদিয়া! আমাদের সঙ্গে সব বিরোধ মিটিয়ে ফেল। আয়, আমরা আবার আগের মতো হই!'' বেচারি মা আর্তচিৎকার করে বলল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ ধীরে-ধীরে দরজার দিকে ঘুরল, ধীরে-ধীরে ঘরের বাইরে পা বাড়াল। দুনিয়া ছুটে গিয়ে তাকে ধরল।

''ভাই! মা'র এ কী হাল তুই করছিস বল তো! ''সে ফিসফিসিয়ে বলল। তার দুচোখে ঝরে পড়ছে জ্বলন্ত ক্রোধ আর বিতৃষ্ণা।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ ভারী দৃষ্টি মেলে তাকাল বোনের দিকে।

''কিছু না। আমি আসব। আমি মাঝে-মাঝেই এসে দেখা করে যাব!'' অস্ফুটস্বরে বিড়বিড় করে সে বলল। দেখে মনে হচ্ছিল কী বলতে চায় সে বোধ তার পুরোপুরি নেই। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

''দয়ামায়াহীন, বদমেজাজি, স্বার্থপর!'' দুনিয়া বলল।

''দয়ামায়াহীন নয়, পা-গ-ল! উন্মাদ! দেখতে পাচ্ছেন না? এরপর আপনাকেই বরং দয়ামায়াহীন বলতে হয়!'' ...উত্তেজিত হয়ে তার হাত সজোরে চেপে ধরে একেবারে কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল রাজুমিখিন। তারপর পুলখেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নার দিকে নজর পড়তে যখন দেখতে পেল যে ভয়ে সে পাথর হয়ে গেছে, তখন 'আমি এক্ষুনি আসছি!' বলে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

করিডরের শেষে রাস্‌কোলনিকভ্‌ তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

''আমি ঠিক জানতাম যে তুমি ছুটে আসবে'', সে বলল। ''ফিরে যাও ওদের

কাছে, ওদের সঙ্গে থাক।...কালও ওদের সঙ্গে থেকো,...সবসময় থেকো। আমি...হয়ত আসব...যদি সম্ভব হয়। বিদায়!"

বিদায় নেবার সময় সে হাত পর্যন্ত বাড়াল না বন্ধুর দিকে।

"আরে, কোথায় চললে? কী শুরু করেছ? কী হয়েছে তোমার বল তো? এটা একটা কথা হল?" রাজুমিখিন একেবারে দিশেহারা হয়ে বিড়বিড় করে বলল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ আরও একবার দাঁড়িয়ে পড়ল।

"একেবারে শেষ কথা বলছি : আমায় কখনও কোনও বিষয়ে প্রশ্ন কোরো না। তোমাকে আমার জবাব দেবার মতো কিছু নেই। ...আমার কাছে এসো না। হয়ত আমিই আসব এখানে। ...আমাকে ছেড়ে দাও, তবে ওদের... *ছেড়ো না*। বুঝতে পারছ কী বলছি?"

করিডরে অন্ধকার। ওরা দাঁড়িয়ে ছিল আলোর কাছাকাছি। মিনিটখানেক ওরা একে অন্যের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল। এই ক্ষণটিকে রাজুমিখিন সারাজীবন মনে করে রেখেছিল। রাস্‌কোল্‌নিকভের জ্বলন্ত নির্নিমেষ দৃষ্টি যেন প্রতিটি মুহূর্তে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠে তার আত্মা, তার চৈতন্য এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিচ্ছিল। হঠাৎ শিউরে উঠল রাজুমিখিন। ওদের দুজনের মাঝখান দিয়ে যেন অদ্ভুত কিছু একটা চলে গেল। ... যেন কোন একটা চিন্তার ইশারা, ভয়াল, বীভৎস ধরনের কিছু একটা সহসা বোধগম্য হয়ে উঠল ওদের দুজনের কাছেই। ...রাজুমিখিনের মুখ মড়ার মতো ফেকাসে হয়ে গেল।

"এখন বুঝতে পারছ তো?" ব্যাধিগ্রস্তের মতো মুখ বিকৃত করে আচমকা বলে উঠল রাস্‌কোল্‌নিকভ্। "ফিরে যাও ওদের কাছে", এই কথা যোগ করে চট করে ঘুরে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

ওই সন্ধ্যায় পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নার ঘরে কী হয়েছিল, রাজুমিখিন কোন মুখে তাদের কাছে ফিরে এলো, ফিরে এসে ওদের কী বলে সান্ত্বনা দিল, কীভাবে দিব্যি গেলে বলেছিল যে রোদিয়াকে বিশ্রাম দেওয়া দরকার, হলফ করে বলেছিল যে রোদিয়া অবশ্যই আসবে, প্রতিদিনি দেখা করতে আসবে এবং সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে—একেবারে হারিয়ে ফেলেছে—তাই তাকে বিরক্ত করা উচিত হবে না, এছাড়া রাজুমিখিন যে কীভাবে তার ওপর নজর রাখবে, তার জন্যে ভালো ডাক্তারের, সেরা বিশেষজ্ঞদের পরমর্শসভার ব্যবস্থা করবে— সেসব কথা সবিস্তারে এখানে না হয় না-ই বললাম।...এককথায়, ওইদিন সন্ধ্যা থেকে রাজুমিখিন তাদের পুত্র ও ভ্রাতৃস্থানীয় হল।

চার

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ কিন্তু সোজা চলল খালপাড়ে সোনিয়ার আস্তানার উদ্দেশ্যে। সবুজ রং করা পুরানো, তিনতলা বাড়ি। দারোয়ানকে খুঁজে বের করার পর দরজি

কাপেরনাউমভ্ কোথায় থাকে জিগ্‌গেস করে তার কাছ থেকে ভাসা-ভাসা নির্দেশ পেল। উঠোনের এক কোনায় সঙ্কীর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন সিঁড়ির প্রবেশপথ খুঁজে পেয়ে অবশেষে সে দোতলায় উঠে গেল। উঠে এসে পড়ল প্রাঙ্গণের দিক থেকে বরাবর চলে যাওয়া টানা একটা বারান্দায়। কাপেরনাউমভের ঘরে ঢোকার পথ ঠিক কোনটা হতে পারে এই ভেবে দিশেহারা হয়ে সে যখন অন্ধকারের মধ্যে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছে, এমন সময় তার তিন পা খানেক দূরে একটা ঘরের দরজা খুলে গেল। রাসকোল্‌নিকভ্ যন্ত্রচালিতের মতো খপ্ করে চেপে ধরল দরজার পাল্লাটা।

"কে ওখানে?" উদ্বিগ্ন নারীকণ্ঠের প্রশ্ন।

"আমি...আপনার কাছে এসেছি," বলতে-বলতে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ঘরের ভেতরে সামনের ফালি জায়গাটায় ঢুকে পড়ল। সেখানে একটা ভাঙাচোরা চেয়ারের ওপর বসানো তোবড়ানো মোমবাতিদানিতে একটা মোমবাতি জ্বলছিল।

"ও আপনি! হা ভগবান!" ক্ষীণকণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ করে স্থির মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পড়ল সোনিয়া।

"আপনার ঘরটা কোন দিকে? এ দিকে?"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ওর দিকে তাকানোর চেষ্টা না করে দ্রুত ভেতরে ঢুকে পড়ল।

মিনিটখানেক বাদে সোনিয়া এসে ঢুকল মোমবাতি হাতে। মোমবাতিটা রেখে রাস্‌কোল্‌নিকভের সামনাসামনি দাঁড়াল। একেবারে দিশেহারা ভাব। সর্বাঙ্গে অবর্ণনীয় উত্তেজনার চিহ্ন। মনে হয় রাস্‌কোল্‌নিকভের অপ্রত্যাশিত আগমনে সে ভীতচকিত। হঠাৎ তার পাণ্ডুর মুখে খেলে গেল রক্তোচ্ছ্বাস। চোখে জলও দেখা দিল। ...একই সঙ্গে একটা অসুস্থ গা-ঝাঁকুনির ভাব, এক ধরনের লজ্জা, একটা মধুর ভাবাবেশ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ...রাস্‌কোল্‌নিকভ্ দ্রুত ঘুরে গিয়ে টেবিলের ধারে একটা চেয়ারের ওপর বসে পড়ল। একলহমায় পুরো ঘরটার ওপর নজর বুলিয়ে নিতে তার অসুবিধে হল না।

ঘরটা বড়সড়, তবে ছাদ খুব নিচু। কাপেরনাউমভ্‌ভরা এই একটিমাত্র ঘরই ভাড়া দিয়েছে। ওদের নিজেদের ঘরের তালাবন্ধ দরজাটা বাঁ-দিকের দেয়ালে। উলটো দিকের, ডান-দিকের দেয়ালে আরও একটা দরজা। ওটা সবসময় আষ্টেপৃষ্ঠে তালাবন্ধ থাকে। তার ওপাশে পাশের আরেকটা ফ্ল্যাট— সেটার নম্বর অন্য। সোনিয়ার ঘরটা দেখতে অনেকটা খামারবাড়ির ঘরের মতো— বেঢপ আয়তক্ষেত্র আকারের— তাইতে সেটাকে দেখায় কেমন যেন কদাকার। খালপাড়ের দিক্কার দেয়ালে তিনটে জানলা। বেশ খানিকটা তেরছাভাবে ঘরটা কেটে চলে গেছে সেই দেয়াল, যার ফলে একটা কোনা রেজায় সূক্ষ্ম হয়ে এতটা গভীরে ঢুকে পড়েছে যে স্বল্প আলোয় সে জায়গাটা ভালোমতো নিরীক্ষণও করা যায় না। আরেকটা কোনা আবার বড় বিশ্রী রকমের স্থূল। অতবড় একটা ঘরে আসবাব বলতে প্রায় কিছু নেই। ডান-দিকের

কোনায় একটা খাট, তার পাশে, দরজার কাছাকাছি একটা চেয়ার। খাটটা যে দেয়ালের গায়ে, সেখানে, অন্য আরেকটি ফ্ল্যাটের একেবারে দরজা ঘেঁষে রাখা আছে নীল চাদরে ঢাকা সাদাসিধে একটা তক্তার টেবিল। টেবিলের ধারে দুটো বেতের চেয়ার। উলটো দিকের দেয়ালে, সূক্ষ্ম কোণটার কাছাকাছি সাধারণ কাঠের তৈরি একটা ছোট দেরাজ=আলমারি—যেন শূন্যতার মধ্যে হারিয়ে গেছে। ঘরে এছাড়া আর কিছু নেই। হলদেটে, বিবর্ণ, নোংরা ওয়ালপেপার কোনায়-কোনায় কালো হয়ে আছে। ঘরটা নির্ঘাত সেঁতসেঁতে, শীতকালে প্রচুর কয়লার ধোঁয়া ঢোকে এখানে। দারিদ্র্য চোখে পড়ার মতো, এমনকি বিছানার পাশের জানলাতেও পর্দা নেই।

অতিথি যখন ভদ্রতার কোন বালাই না রেখে গভীর মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে তার ঘর দেখছিল তখন সোনিয়া চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে রইল। এমনকি শেষপর্যন্ত আতঙ্কে কাঁপতে শুরু করল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে তার ভাগ্যনিয়ন্তা বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

"আমার দেরি হয়ে গেছে।...এগারোটা বেজে গেছে, তাই না?" তখনও তার দিকে চোখ তুলে না তাকিয়ে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ জিগ্‌গেস করল।

"হ্যাঁ," বিড়বিড় করে বলল সোনিয়া। "ও, হ্যাঁ, বেজেছে।" হঠাৎ তাড়াতাড়ি এমনভাবে সে বলে উঠল যে মনে হল বুঝি এরই মধ্যে সে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের একটা উপায় খুঁজে পেয়েছে। "বাড়িওয়ালার ঘড়িতে এইমাত্র বাজল।...আমি নিজের কানে শুনেছি।... বেজেছে", সে যোগ করল।

"আমি আপনার কাছে এসেছি এই শেষবারের মতো", রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ গোমড়া মুখে বলল—যদিও আসলে সে এসেছে এই প্রথম। "আপনার সঙ্গে আমার হয়ত আর কখনও দেখা হবে না..."

"আপনি ... কোথাও চলে যাচ্ছেন?"

"জানি না...আগামীকাল দেখা যাবে..."

"তাহলে কাল কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার ওখানে আসছেন না?" সোনিয়ার গলা কেঁপে উঠল।

"জানি না। কাল সকালে দেখা যাবে।...আসল ব্যাপারটা তা নয়। আমি আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি..."

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ চোখ তুলে চিন্তাগ্রস্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। ঠিক তখনই তার খেয়াল হল সে নিজে বসে আছে, অথচ সোনিয়া তখনও দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে।

"একি, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন যে! বসুন," হঠাৎ কণ্ঠস্বর বদল করে সহানুভূতির সুরে মৃদুকণ্ঠে সে বলল।

সোনিয়া বসল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ মুহূর্তের জন্য অনেকটা সমব্যথীর মতো প্রসন্ন-দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

"কী রোগা আপনি! একবার দেখুন আপনার হাতখানা! একেবারে পাতলা, ফিনফিনে! আঙুলগুলো মরা মানুষের আঙুলের মতো।"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ওর হাতটা টেনে নিল। সোনিয়ার মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল।

"আমি বরাবরই এরকম ছিলাম", সে বলল।

"যখন বাড়িতে থাকতেন, তখনও?"

"হ্যাঁ, তখনও।"

"ও হ্যাঁ, তা তো হবেই।" খাপছাড়াভাবে সে বলল। তার মুখের ভাব এবং তার কণ্ঠস্বরও আবার হঠাৎ বদলে গেল। আরও একবার সে চারদিকে দৃষ্টিপাত করল।

"এই ঘরটা কি আপনি কাপেরনাউমভের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছেন?"

"হুঁ..."

"ওরা কি দরজার ওপাশে থাকে?"

"হ্যাঁ। ...ওদের ঘরটাও এইরকম।"

"সকলে একটা ঘরে?"

"হ্যাঁ, তাই।"

"আমি হলে আপনার ঘরে রাত কাটাতে ভয় পেতাম," গোমড়ামুখে সে মন্তব্য করল।

"বাড়িওয়ালা আর তার বাড়ির লোকজন বড় ভালো। বড় দয়ামায়া ওদের," এখন পর্যন্ত যেন ঠিক ধাতস্থ হতে না পেরে এবং কী বলবে বুঝে উঠতে না পেরে সে উত্তর দিল। "এই যে সমস্ত আসবাবপত্র দেখছেন সব...সবই ওদের। ওরা খুব ভালো মানুষ। ওদের বাচ্চারাও প্রায়ই আমার কাছে আসে।..."

"ওই যাদের জিভের আড় আছে, তাদের কথা বলছেন তো?"

"হ্যাঁ।... লোকটা তোতলা, খোঁড়াও। ওর বৌও তাই। ...ঠিক যে তোতলায় তা নয়, তবে সবকথা স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারে না। মহিলা খুব ভালো। লোকটা নিজে একসময় ভূমিদাস ছিল। সাতটি ছেলেমেয়ে। ...তাদের মধ্যে বড়টাই শুধু তোতলায়, বাকিগুলো স্রেফ অসুস্থ... ওরা কিন্তু তোতলায় না। ...কিন্তু আপনি ওদের জানলেন কী করে?" একটু অবাক হয়ে সে যোগ করল।

"আমাকে আপনার বাবা তখন সব বলেছিলেন। আপনার সম্পর্কে সবকথা বলেছেন আমাকে।... সেই যে আপনি ছয়টার সময় গেলেন, আর নয়টার সময় ফিরে এলেন, তারপর কাতেরিনা ইভানোভ্‌না যে আপনার শয্যার কাছে হাঁটু মুড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন...সব!"

সোনিয়া বিব্রত বোধ করল।

"আমার মনে হল আজ যেন ওকে দেখলাম", সোনিয়া ইতস্তত করে ফিসফিসিয়ে বলল।

"কাকে?"

"বাবাকে। আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। যেতে-যেতে একেবারে কাছে, রাস্তার এক কোনায়। তখন নয়টা-দশটা হবে। দেখলাম আমার আগে-আগে হেঁটে যাচ্ছে। ঠিক যেন বাবা। আমার তখন ইচ্ছে হচ্ছিল একবার কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার কাছে যাই।..."

"আপনি কি অমনি বেড়াচ্ছিলেন?"

"হ্যাঁ", আবারও বিব্রত হয়ে চোখ মাটিতে নামিয়ে খাপ্‌ছাড়াভাবে ফিসফিসিয়ে বলল সোনিয়া। -

"আপনি যখন বাবার ওখানে থাকতেন তখন কাতেরিনা ইভানোভ্‌না আপনাকে প্রায় মারধর করতেন, তাই না?..."

"না, না তা নয়! কী যে বলেন! তা নয়!" বলতে-বলতে কেমন যেন ভয়ে-ভয়ে সোনিয়া তাকাল ওর দিকে।

"তাহলে আপনি ওঁকে ভালোবাসেন?"

"তাঁকে? তা নয় তো কী!" নিদারুণ বেদনাহত হয়ে হঠাৎ দুহাত জড়ো করে করুণ সুরে সে টেনে টেনে বলল। "আহা, আপনি ওঁকে...আপনি যদি জানতেন! উনি একেবারে শিশুর মতো। ... শোকে-দুঃখে ওঁর মাথাটা ঠিক নেই। অথচ কী বুদ্ধিই না ওঁর ছিল! কত বড় যে ওঁর মনটা...কতই না ওঁর মায়ামমতা! আপনি জানেন না, আপনি কিছুই জানেন না...ওঃ!"

কথাগুলো বলতে-বলতে যেন দুঃখে-হতাশায় ভেঙে পড়ে, প্রবল উত্তেজনায় সে হাত কচলাতে লাগল। তার পাণ্ডুর দুই গালে আবার ফুটে উঠল লাল আভা। দু-চোখে বেদনার আভাস। বোঝাই যাচ্ছিল সে বড় বেশি বিচলিত হয়ে পড়েছে। কিছু একটা প্রকাশ করার, বলার, কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার হয়ে কিছু বলার প্রচণ্ড ইচ্ছে হচ্ছিল তার। তবে সমস্ত চোখেমুখে হঠাৎ ফুটে উঠল *অপরিসীম* সমবেদনার ভাব—যদি অবশ্য সেটাকে এই নামে অভিহিত করা যায়।

"মারধর করতেন! এ আপনি কী বলছেন! হা ভগবান, মারতেন! যদি ধরেই নি মারতেন, তাতেই বা কী! তাতে কী বলুন তো? আপনি কিছু জানেন না, কিছুই জানেন না।... উনি বড় অসুখী মানুষ, কত বড় অসুখী তা আপনাকে কী করে বলব! তাছাড়া অসুস্থ। ...উনি চান ন্যায়বিচার। ...ওঁর মনের মধ্যে কোন পাপ নেই। ওঁর স্থির বিশ্বাস সবকিছুর মধ্যে ন্যায়ের পরিচয় থাকতেই হবে, উনি তা দাবিও করেন। ....ওঁকে যত যন্ত্রণাই দিন না কেন, অন্যায় উনি কখনও করবেন না। সব লোকের মধ্যে ন্যায়বোধ থাকবে এটা যে অসম্ভব তা উনি বুঝতে চান না, তাই তাঁর বিরক্তি।...শিশুর মতো, একেবারে শিশুর মতো! ন্যায়-অন্যায় বোধ ওঁর আছে, খুব বেশি মাত্রায় আছে।"

"কিন্তু আপনার কী হবে?"

সোনিয়া প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকাল।

"ওরা সব এখন আপনার ঘাড়ে এসে পড়ল, তাই না? অবশ্য সত্যি বলতে গেলে কি, আগেও সমস্ত দায়দায়িত্ব আপনার ঘাড়েই ছিল। আপনার বাবা বেঁচে থাকতে খোয়ারি ভাঙার জন্যে আপনার কাছে টাকা চাইতে আসতেন। কিন্তু সে যাই হোক, এখন কী হবে?"

"জানি না", বিষণ্ণ কণ্ঠে সোনিয়া বলল।

"ওরা ওখানেই থাকবে?"

"জানি না। ওই ফ্ল্যাটের ভাড়া এখনও বাকি পড়ে আছে। তবে শোনা যাচ্ছে, বাড়িউলি নাকি আজ বলছিল যে ওদের নোটিশ দিতে চায়। কিন্তু কাতেরিনা ইভানোভ্না বলেছেন যে তাঁর নিজেরই আর এক মুহূর্তও ওখানে থাকার ইচ্ছে নেই।"

"তাঁর অত সাহস কোত্থেকে আসছে? আপনার ভরসায় নাকি?"

"না না, অমন কথা বলবেন না।... আমরা সকলে মিলে একটা পরিবার— একসঙ্গে মিলেমিশে থাকি," বলতে-বলতে আবার উত্তেজিত হয়ে পড়ল সোনিয়া, এমনকি রেগেও গেল— ঠিক যেন একটা ক্যানারী বা ওই-জাতীয় ছোট্ট কোন পাখি— রেগে গেলে দেখতে যেমন হয়। "কিন্তু কী হবে ওঁর? কী করতে পারেন উনি, এই অবস্থায়?" ভীষণ বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে সে জিগ্‌গেস করল। "কী কান্নাই না উনি কাঁদলেন আজ! ওঁর মাথাটা গেছে— আপনি লক্ষ করেছেন কি? একেবারে গেছে। কখনও একটা বাচ্চা মেয়ের মতো এই ভেবে ব্যস্ত হয়ে পড়েন আগামীকালের শ্রাদ্ধ-শান্তির কাজটা যেন ভালোয়-ভালোয় হয়ে যায়, যেন ভালোমতো খাবারদাবারের বন্দোবস্ত থাকে।... আবার পরমুহূর্তেই অসহায়ের মতো হাতে হাত মোচড়াতে থাকেন। কাশির সঙ্গে মুখ দিয়ে ঝলকে-ঝলকে রক্ত ওঠে। কাঁদেন, তারপর হতাশায় ভেঙে পড়ে চেয়ারে মাথা ঠুকতে থাকেন। শেষে আবার শান্ত হয়ে যান। আপনার ওপর ওঁর বড় আস্থা। বলেন, আপনি এখন ওঁর একমাত্র ভরসা। ওঁর আশা, কারও কাছ থেকে কিছু টাকাকড়ি ধার নিয়ে নিজের শহরে চলে যাবেন, আমাকেও সঙ্গে নেবেন— সেখানে মেয়েদের একটা বোর্ডিং স্কুল খুলবেন, আমাকে দেখাশোনার ভার দেবেন। শুরু হবে আমাদের এক চমৎকার নতুন জীবন। উনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খান, সান্ত্বনা দেন। কী গভীর বিশ্বাস ওঁর!— কী গভীর বিশ্বাস এই আকাশকুসুম স্বপ্নে! কিন্তু ওঁর কথার বিরোধিতা কীভাবে করব বলুন? আজ সারাদিন ধরে ঘরে ধোয়া-কাচা মাজা-ঘষা আর মেরামতের কাজ করলেন, নিজে ওই দুর্বল শরীরে কাপড় কাচার অত বড় টবটা ঘরের ভেতরে টেনে আনলেন, তারপর হাঁপাতে-হাঁপাতে ধপ করে বিছানায় গিয়ে পড়লেন। আজ সকালে ওঁর সঙ্গে দোকানে গিয়েছিলাম পোলেন্‌কা আর লিদার জন্যে জুতো কিনতে, কেননা ওদের জুতোগুলো একেবার ছিঁড়ে খুলে পড়েছে। কিন্তু আমাদের তো আর তেমন টাকাপয়সা ছিল না, বেশ টান

পড়ে গিয়েছিল। এদিকে এমন চমৎকার একজোড়া জুতো উনি পছন্দ করে ফেলেছেন।... কেন না, ওঁর রুচিবোধ দারুণ, জানেন। টাকার টান পড়েছে বলে সঙ্গে-সঙ্গে ওই দোকানেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন, একেবারে দোকানের কর্মচারীদের সামনে।... ওঃ সে কি করুণ দৃশ্য! চোখে দেখা যায় না!"

"এরপর বুঝতে অসুবিধা হয় না... কেন আপনার এই অবস্থা," তিক্ত হাসি হেসে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ বলল।

"তাহলে আপনার দুঃখ হয় না? দুঃখ হয় না বলছেন?" সোনিয়া আবার লাফিয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে। "অথচ আপনি... আমি জানি... আপনি নিজেই কিছু না জেনেশুনে আপনার শেষ কপর্দকটুকু পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আপনি যদি সব নিজের চোখে দেখতেন! হা ভগবান! তাছাড়া কতবার, কতবারই না আমি ওঁকে কাঁদিয়ে ছেড়েছি! এই তো গত সপ্তাহেই! ওঃ, হ্যাঁ আমিই! বাবার মৃত্যুর মাত্র এক সপ্তাহ আগে। আমি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি! কতবার এরকম করেছি, কতবারই না করেছি! ওঃ এখন সারাদিন ধরে সেসব মনে করে কী কষ্টই না পাচ্ছি!"

স্মৃতি তাকে যন্ত্রণায় এত অস্থির করে তোলে যে বলতে-বলতে অসহায়ভাবে সে নিজের হাত নিজেই মোচ্‌ড়াতে থাকে।

"আপনি কিনা নিষ্ঠুর?"

"হ্যাঁ আমি, আমি! সেদিন ওখানে গিয়েছিলাম," কাঁদতে-কাঁদতে সে বলল "বাবা তখন আমাকে বললেন, 'সোনিয়া, আমাকে পড়ে শোনা, আমার মাথা ব্যথা করছে, পড়ে শোনা... ওই যে ওই বইটা।" কী একটা বই যেন ছিল ওঁর কাছে— জোগাড় করেছিলেন আন্দ্রেই সেমিওনভিচের কাছ থেকে... মানে, মিস্টার লেবেজিয়াত্‌নিকভের কাছ থেকে। ভদ্রলোক ওই বাড়িতেই থাকেন— কোথা থেকে যেন জোগাড় করতেন উদ্ভট-উদ্ভট সমস্ত বই। আমি বললাম, 'আমার যাবার তাড়া আছে।' পড়ে শোনানোর তেমন ইচ্ছে আমার ছিল না। আসলে ওখানে গিয়েছিলাম অল্প সময়ের জন্যে, কাতেরিনা ইভানোভ্‌নাকে কিছু জামার কলারের নমুনা দেখাব বলে। ফিরিওয়ালি লিজাভেতা আমাকে সস্তায় কিছু কলার আর হাতার কাফ এনে দিয়েছিল। বেশ সুন্দর, নতুন, সুতোর কাজ করা। কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার খুব পছন্দ হয়েছিল। উনি ওগুলো পরে আয়নায় নিজেকে দেখতে লাগলেন। বড্ড পছন্দ হয়ে গিয়েছিল ওঁর। আমায় বললেন, 'তোর দুটি পায় পড়ি, সোনিয়া, আমায় দে না এগুলো। *দুটি পায় পড়ি'*— একথাই বললেন— এত ইচ্ছে হচ্ছিল ওঁর। কিন্তু এসব পরার দিন কি তাঁর আছে? তাঁর ফেলে আসা সুখের দিনগুলো মনে করিয়ে দিল মাত্র। আয়নায় নিজেকে দেখেন, দেখে-দেখে মুগ্ধ হন। কিন্তু জামাকাপড় বলতে তো ওঁর কিছুই নেই। আজ কত বছর হয়ে গেল ভালো কোন জামাকাপড়ই নেই! কারও কাছে কখনও কিছু চানও না উনি... সেটা ওঁর স্বভাবে নেই। ...এতই তাঁর তেজ। বরং নিজের শেষ কপর্দক অন্যকে

দিয়ে দেবেন। অথচ তখন নিজে থেকে চাইলেন। এতই পছন্দ হয়েছিল ওঁর! কিন্তু আমার দিতে মন সরছিল না। তাই বললাম, 'ও নিয়ে আপনি কী করবেন কাতেরিনা ইভানোভ্না? ' 'কী করবেন'— ঠিক এই কথাই বললাম। আর যা বলি তাই বলি, এই কথাটা বলা আমার উচিত হয়নি! উনি এমনভাবে তাকালেন আমার দিকে এবং আমি ওঁকে দিতে রাজি না হওয়ায় ওঁর মন এত খারাপ হয়ে গেল যে আমার নিজেরই খারাপ লাগছিল ওঁকে দেখে।... আমি দেখতে পাচ্ছিলাম ওঁর দুঃখটা আসলে আমার কলারের জন্যে নয়, আমি ওঁকে দিতে রাজি হইনি বলে। ওঃ এখন মনে হচ্ছে সব যদি ফিরিয়ে নেওয়া যেত, যদি পালটান যেত, আমার মুখের ওই কথাগুলো যদি ফিরিয়ে নিতে পারতাম!... ওঃ আমি... কিন্তু এসব আমি বলছিই বা কেন?... আপনার এতে কিছুই এসে যায় না!"

"ওই ফিরিওয়ালি লিজাভেতাকে আপনি জানতেন?"

"হ্যাঁ, জানতাম।... আপনিও জানতেন নাকি?" একটু অবাক হয়ে সোনিয়া পালটা প্রশ্ন করল।

"কাতেরিনা ইভানোভ্না ক্ষয়রোগে ভুগছেন, তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক। শিগগিরই মারা যাবেন," প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একটু চুপ করে থাকার পর রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বলল।

"ওঃ না, না, না!" বলতে-বলতে তা যাতে না হয় সেই জন্য মিনতির ভঙ্গিতে নিজের অজ্ঞাতসারেই তার দুই হাত চেপে ধরল সোনিয়া।

"কিন্তু মারা যাওয়াটাই তো তাঁর পক্ষে ভালো।"

"না, ভালো নয়, ভালো নয়, একদম ভালো নয়!" নিজেকে সামলাতে না পেরে ভীতকণ্ঠে সে বারবার বলতে লাগল।

"আর বাচ্চাগুলোর অবস্থা? তখন আপনার কাছে ছাড়া আর কোথায়ই বা এনে রাখবেন ওদের?"

"ওঃ তা জানি না!" প্রায় হতাশ সুরে এই বলে দু'হাতে মাথা চেপে ধরল সোনিয়া। বোঝাই যাচ্ছিল এই চিন্তাটা এর আগে আরও অনেকবার,বহুবার তার নিজেরই মাথায় এসেছে, রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তাকে আরেকবার জাগিয়ে দিল মাত্র।

"আর কাতেরিনা ইভানোভ্না থাকতে-থাকতে যদি এখন আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং আপনাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাহলে কী হবে?" রাস্‌কোল্‌নিকভ্ নাছোড়বান্দা। এতটুকু দয়ামায়া দেখাল না।

"আঃ, কী বলছেন! কী বলছেন আপনি! এমন হতেই পারে না!" ভয়ে, আতঙ্কে বেঁকে গেল সোনিয়ার মুখ।

"হতে পারে না কেমন?" কঠোর বিদ্রুপের হাসি হেসে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বলে চলল। "আপনার তো আর বীমা করা নেই। তা হলে ওদের কী দশা হবে? ওদের

সকলকে সদলবলে রাস্তায় নামতে হবে। উনি কাশতে-কাশতে ভিক্ষে চাইবেন, কোথাও কোন দেয়ালের গায়ে মাথা ঠুকবেন— যেমন আজকে হয়েছিল। ছেলেমেয়েগুলো কাঁদতে থাকবে।... তারপর রাস্তাতেই মুখ থুবড়ে পড়ে যাবেন, লোকে ওকে থানায় নিয়ে যাবে, সেখান থেকে হাসপাতাল— সেখানেই মারা যাবেন। আর ছেলেমেয়েগুলো..."

"ওঃ, না!... ভগবান তা হতে দেবেন না!" সোনিয়ার চাপা বুকের ভেতর থেকে অবশেষে ছুটে বেরিয়ে এলো। রাস্‌কোল্‌নিকভের দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে কোন কথা না বলে যেভাবে অনুনয়ের ভঙ্গিতে সে হাত জোড় করল তাতে মনে হচ্ছিল যেন সবকিছু রাস্‌কোল্‌নিকভের ওপরই নির্ভর করছে।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ উঠে দাঁড়িয়ে ঘরে পায়চারি করতে লাগল। মিনিটখানেক কেটে গেল। সোনিয়া নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় ভেঙে পড়ে মাথা নিচু করে দু-হাত ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"কিছু সঞ্চয় করতে পারেন না? দুর্দিনের জন্যে টাকা আলাদা করে সরিয়ে রাখতে পারেন না?" হঠাৎ সোনিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে সে জিগ্‌গেস করল।

"না", সোনিয়া ফিসফিসিয়ে বলল।

"অবশ্যই না! কিন্তু চেষ্টা করে দেখেছেন কি?" একটু বিদ্রূপের সুরেই যেন সে যোগ করল।

"চেষ্টা করে দেখেছি।"

"পারেননি— তাই তো? সেটাই স্বাভাবিক। জিগ্‌গেস করার কোন মানে হয় না।"

আবার সে পায়চারি শুরু করে দিল। আরও মিনিটখানেক কেটে গেল।

"রোজ তো আর রোজগার হয় না?"

সোনিয়া আগের চেয়েও বেশি অস্বস্তি বোধ করল। আবার তার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিল।

"না" অনেক কষ্টে, চেষ্টা করে সে ফিসফিসিয়ে বলল।

"পোলেন্‌কার ভাগ্যেও সম্ভবত তাই ঘটবে" হঠাৎ সে বলে উঠল।

"না, না! হতে পারে না! না!" মরিয়া হয়ে এত জোরে আর্তনাদ করে উঠল সোনিয়া যে মনে হল বুঝি কেউ হঠাৎ তাকে ছুরি মেরেছে। "ভগবান আছেন, ভগবান তা হতে দেবেন না!..."

"অন্যদের বেলায় তো হতে দেন।"

"না, না! ওকে রক্ষা করবেন, ভগবান ওকে রক্ষা করবেন!" দিশেহারা হয়ে সে আবার বলল।

"কিন্তু এও তো হতে পারে যে ভগবানই নেই," যেন অনেকটা হিংস্র উল্লাসে

উত্তরে এই কথাগুলো বলে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ হেসে উঠল, ওর দিকে তাকাল।

সোনিয়ার মুখ হঠাৎ ভয়ঙ্কর বদলে গেল। শিহরন খেলে গেল তার সারা মুখচোখে। অব্যক্ত ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে সে তাকাল তার দিকে। কিছু একটা বলতে গিয়েও মুখে আনতে পারল না। হঠাৎ দু-হাতে মুখ ঢেকে তিক্ত কান্নায় ভেঙে পড়ল।

"আপনি বলছেন কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার মাথা গেছে, এখন দেখছি আপনার নিজেরই মাথার ঠিক নেই," কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সে বলে উঠল।

মিনিটপাঁচেক কেটে গেল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ওর দিকে দৃষ্টিপাত না করে তখনও ঘরের এমুড়ো-ওমুড়ো নীরবে পায়চারি করে চলেছে। অবশেষে সোনিয়ার দিকে এগিয়ে এলো। চোখ জ্বলজ্বল করছে। দুহাতে ওর কাঁধ চেপে ধরে সরাসরি ওর চোখের জলে ভেজা মুখের দিকে তাকাল। রাস্‌কোল্‌নিকভের চোখের দৃষ্টি শুষ্ক, জ্বলন্ত, মর্মভেদী, তার ঠোঁট থরথর করে কাঁপছিল।... হঠাৎ সে দ্রুত সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, সাষ্টাঙ্গে মেঝেতে পড়ে ওর পায়ে চুমু খেল। সোনিয়া আতঙ্কিত হয়ে চট করে এমনভাবে সরে দাঁড়াল যেন সে এক উন্মাদের পাল্লায় পড়েছে। তাছাড়া তাকে সত্যি-সত্যি তখন উন্মাদের মতো দেখাচ্ছিল।

"একি! এ আপনি কী করছেন? আমার সামনে!" বিবর্ণ হয়ে গিয়ে বিড়-বিড় করে সে বলল। হঠাৎ নিদারুণ বেদনায় সঙ্কুচিত হয়ে গেল তার বুকের ভেতরটা।

রাস্‌কোল্‌নিকভ সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

"আমার এই প্রণতি তো তোমাকে নয়, মানুষের এই যে এত দুঃখ-যন্ত্রণা তাকেই," কেমন যেন অদ্ভুত খাপছাড়াভাবে কথাগুলো উচ্চারণ করে জানলার কাছে সরে গেল সে। "শোন" পরমুহূর্তেই তার কাছে ফিরে এসে যোগ করল, "এই কিছুক্ষণ আগে একজন আমাকে অপমান করতে এলে আমি বলেছিলাম সে তোমার কড়ে আঙুলেরও যুগ্যি নয়... এবং আমার বোনকে আজ তোমার পাশে বসতে দিয়ে তাকে আমি সম্মানই দেখিয়েছি।"

"আঃ, এ আপনি কী বললেন! আপনার বোনের সামনেই বললেন?" ভীতচকিত হয়ে আর্তনাদ করে উঠল সোনিয়া। "আমার পাশে বসা! সেটা কিনা সম্মানের! আমি যে একটা নষ্ট চরিত্রের মেয়ে! আমার পাপের সীমা-পরিসীমা নেই! আঃ, এ আপনি কী বললেন!"

"আমি তোমার চরিত্রদোষ বা পাপের কথা ভেবে তো তা বলিনি— বলেছিলাম তোমার অপরিসীম যন্ত্রণার কথা ভেবে। তবে তুমি যে মহাপাপী এটাও ঠিক", অনেকটা উল্লসিত হয়েই সে যোগ করল। "তোমার সবচেয়ে বড় পাপ এই যে তুমি বৃথাই নিজেকে ধ্বংস করেছ, প্রতারণা করেছ। এর চেয়ে ভয়ঙ্কর কী হতে পারে! এর চেয়ে ভয়ঙ্কর কী হতে পারে যে তুমি এই নোংরা পরিবেশের মধ্যে পড়ে আছ, যে নোংরাকে তুমি নিজেই ঘৃণা কর এবং তুমি নিজেও জান— চোখ খুললেই দেখতে

পেতে— এতে তুমি কাউকেই সাহায্য করছ না, এই করে কাউকে কোনকিছু থেকে বাঁচাতেও পারবে না! আচ্ছা, এবারে আমাকে বল দেখি...'' প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে সে বলল, ''...এই লজ্জা, এই হীনতা, তোমার যে-সব পূত-পবিত্র অনুভূতির বিপরীত, সেগুলোর পাশাপাশি কী করে স্থান পায় তোমার মধ্যে? তার চেয়ে বেশি ন্যায়সঙ্গত হত, হাজার বার বেশি ন্যায়সঙ্গত ও বুদ্ধিমানের কাজ হত সোজা জলে ঝাঁপ দিয়ে চিরকালের জন্য এর অবসান ঘটান!''

''কিন্তু ওদের তাহলে কী হবে?'' ব্যথাতুর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে সোনিয়া জিগ্‌গেস করল, কিন্তু সেইসঙ্গে এমনও মনে হল যে রাস্‌কোল্‌নিকভের প্রস্তাবে সে আদৌ বিস্মিত হয়নি। রাস্‌কোল্‌নিকভ অদ্ভুতভাবে ওর দিকে তাকাল।

ওর চোখের দৃষ্টিতেই রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ওর মনের ভাব আঁচ করতে পেরেছিল। দেখা যাচ্ছে, ওর নিজের মনের মধ্যেও এই চিন্তাটা সত্যি-সত্যি কাজ করছিল। সম্ভবত অনেক বার হতাশার মধ্যে পড়ে এই নিয়ে সে ভেবেছে, গুরুত্ব দিয়েই ভেবেছে— সব একেবারে চুকিয়ে-বুকিয়ে দিলে কেমন হয়। এত গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছে বলেই-না এখন রাস্‌কোল্‌নিকভের প্রস্তাবে সে তেমন অবাক হল না। এমনকি তার কথার মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা ছিল সেটাও লক্ষ করল না। রাস্‌কোল্‌নিকভের ভর্ৎসনা এবং সোনিয়ার লজ্জা সম্পর্কে তার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও যে সে অনুধাবন করতে পারে নি রাস্‌কোল্‌নিকভের কাছে তা প্রত্যক্ষ। কিন্তু রাস্‌কোল্‌নিকভ্ পুরোপুরি বুঝতে পারল নিজের লজ্জাজনক ও পতিত অবস্থার কথা চিন্তা করে বহুদিন যাবত কি দুঃসহ যন্ত্রণাই না সে ভোগ করছে! কিন্তু রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ভাবছিল এমন কী থাকতে পারে যা এখনও সবকিছু একেবারে চুকিয়ে-বুকিয়ে দেবার সঙ্কল্প থেকে তাকে নিবৃত্ত করতে পারে। কী হতে পারে সেটা? এই গরিব অনাথ ছোট-ছোট ছেলেমেয়েগুলো, করুণার পাত্রী, অর্ধ-উন্মাদিনী, ক্ষয়রোগগ্রস্ত এই কাতেরিনা ইভানোর্ভ্‌না, তার দেয়ালে মাথা ঠোকা— সোনিয়ার কাছে এসবের তাৎপর্য যে কী একমাত্র এখনই সে তা সম্পূর্ণ অনুধাবন করতে পারল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও তার কাছে এটাও আর একবার পরিষ্কার হয়ে গেল যে সোনিয়ার যা চরিত্র এবং যতটুকু শিক্ষা সে পেয়েছে তাতে কোনমতেই এভাবে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু রাস্‌কোল্‌নিকভের কাছে এখন প্রশ্ন: কী করে এত দীর্ঘসময় এই অবস্থায় থাকা তার পক্ষে সম্ভব হল? আর জলে ঝাঁপ দেবার মতো শক্তিই যদি তার না থাকে তাহলে এতদিনের মধ্যে পাগল হয়ে গেল না কেন? সে অবশ্য বুঝতে পারছিল যে সমাজে সোনিয়ার অবস্থাটা একটা আকস্মিক ঘটনা, যদিও দুর্ভাগ্যবশত আদৌ বিক্ষিপ্ত নয়, ব্যতিক্রমী নয়। কিন্তু এই আকস্মিকতা, তার এই সামান্য যতটুকু শিক্ষা এবং তার পূর্ববর্তী সমস্ত জীবনই তো মনে হয় এই ন্যক্কারজনক পথে তার প্রথম পদক্ষেপের সময় সঙ্গে-সঙ্গে তাকে মেরে ফেলতে পারত। কী ছিল তাহলে তার

অবলম্বন? নিশ্চয়ই ভ্রষ্টাচার নয়? স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এই কলঙ্কের সমস্তটা তাকে কেবল যান্ত্রিকভাবে স্পর্শ করতে পেরেছে। সত্যিকারের ভ্রষ্টাচার এখনও তার অন্তর এতটুকু স্পর্শ করতে পারেনি। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তা দেখতে পাচ্ছিল। সোনিয়া তার বাস্তব মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে।...

রাসকোল্‌নিকভ্ মনে-মনে ভাবল: 'সোনিয়ার সামনে এখন খোলা আছে তিনটে রাস্তা— খালের জলে ঝাঁপ দেওয়া, পাগলা গারদে স্থান পাওয়া অথবা... অথবা শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি ও মনের বৈকল্য ঘটিয়ে ভ্রষ্টাচারে ডুবে যাওয়া।' এই শেষ পন্থাটা তার কাছে সবচেয়ে বেশি বীভৎস মনে হল। কিন্তু রাস্‌কোল্‌নিকভ্ এখন ঘোর সন্দেহবাদী, তার বয়স কম, তার চিন্তা ভাবালুতায় আচ্ছন্ন, তাই ভেতরে-ভেতরে সে নিষ্ঠুরও। এই কারণে কিছুতেই বিশ্বাস না করে পারছিল না যে শেষ সমাধানটা অর্থাৎ ভ্রষ্টাচারের সম্ভাবনাই বেশি প্রবল।

'কিন্তু সত্যিই কি তাই?' তার সমস্ত অন্তঃকরণ যেন আর্তচিৎকার করে উঠল। 'এও কি সত্যি যে সৃষ্টির এই যে নিদর্শন এখনও আত্মার বিশুদ্ধতা রক্ষা করে এসেছে, সেও শেষপর্যন্ত জ্ঞাতসারে এই ঘৃণ্য, পূতিগন্ধময় গহ্বরে তলিয়ে যাবে? সেই গহ্বর কি সত্যি-সত্যি ইতিমধ্যে তাকে টানতে শুরু করেছে এবং সে যে এতদিন এই অবস্থা বরদাস্ত করতে পেরেছে তার একমাত্র কারণ কি এই যে দোষটা এখন আর তার কাছে তেমন ন্যক্কারজনক মনে হচ্ছে না? না, না, তা হতে পারে না।' কিছুক্ষণ আগে সোনিয়া যেমন আর্তনাদ করে উঠেছিল তেমনি আর্তস্বরে সে বলে উঠল। 'না, খাল থেকে এখন পর্যন্ত যে ও দূরে সরে থেকেছে তা পাপের কথা ভেবে,ওই *ওদের* কথা ভেবে।... ও যে এখনও পাগল হয়ে যায়নি... কিন্তু কে বলেছে যে এখনও পাগল হয়ে যায়নি? ওর ভাবনাচিন্তাগুলোর মধ্যে কি সুস্থ বুদ্ধির পরিচয় আছে? ও যেসব যুক্তি দিচ্ছে সুস্থ বুদ্ধিতে কি কেউ সেসব যুক্তি দিতে পারে? লোকে যখন তাকে বিপদের কথা বলছে তখন যে পূতিগন্ধময় গহ্বর তাকে অতলে টানতে শুরু করেছে সরাসরি তারই ওপর বসে দু-কান বন্ধ করে, হাত নেড়ে সবকিছুকে উড়িয়ে দিয়ে এমনভাবে নিজের সর্বনাশ কেই বা ডেকে আনে? ও কি কোন আলৌকিক শক্তির অপেক্ষায় আছে? হয়ত তাই। তাহলে এ সবই কি পাগলামির লক্ষণ নয়?'

এই চিন্তাটাই সে আঁকড়ে ধরল। অন্য যে-কোনটার চেয়ে এই পরিণতি তার বেশি মনঃপূত হল। এবারে সে আরও বেশি মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল সোনিয়াকে।

"তুমি ভগবানকে খুব ডাক, সোনিয়া, তাই না ?" রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তাকে জিগ্‌গেস করল।

সোনিয়া চুপ করে রইল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ওর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। উত্তরের প্রতীক্ষায় ছিল।

"ভগবান না থাকলে আমার চলে?" হঠাৎ ঝলকে-ওঠা চোখের দৃষ্টিতে এক লহমার জন্য রাস্‌কোল্‌নিকভের দিকে তাকিয়ে উৎসাহভরে দ্রুত ফিসফিসিয়ে কথাগুলো বলে শক্ত হয়ে নিজের হাতের মুঠোয় সে তার হাত চেপে ধরল।

"যা ভেবেছিলাম তাই!' রাস্‌কোল্‌নিকভ্ মনে-মনে ভাবল।

"এর জন্যে ভগবান তোমার কী করছেন?" আরও খুঁচিয়ে প্রশ্ন করল সে।

সোনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। মনে হল এ প্রশ্নের উত্তর সে খুঁজে পাচ্ছে না। তার শীর্ণ বুকটা উত্তেজনায় ঘনঘন ওঠানামা করতে লাগল।

"চুপ করুন! ও কথা জিগ্‌গেস করবেন না! সে যোগ্যতা আপনার নেই!..." কঠিন ও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে চিৎকার করে বলল।

'যা ভেবেছিলাম! যা ভেবেছিলাম!' নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে রাস্‌কোল্‌নিকভ মনে-মনে আওড়াল।

"সব করেন উনি!" আবার চোখ নামিয়ে দ্রুত ফিসফিসিয়ে সোনিয়া বলল।

'এই হল সমাধান! এটাই ব্যাখ্যা!' প্রবল কৌতূহল নিয়ে তাকে লক্ষ করতে-করতে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ মনে-মনে সিদ্ধান্ত করল।

বিষম ও তেরছা আকারের, পাণ্ডুরবর্ণের এই শীর্ণ ছোট মুখটি, এই নিরীহ ধরনের নীল চোখজোড়া, যেখান থেকে এমনি আগুনের ঝলক, এত প্রচণ্ড উৎসাহের উপলব্ধি ঠিকরে পড়তে পারে, এই ছোট্ট শরীরটা যা এখনও ক্রোধে, ঘৃণায় কাঁপছে... লক্ষ করে কেমন যেন পীড়াদায়ক এক ধরনের অদ্ভুত, নতুন অনুভূতিতে সে আপ্লুত হয়ে গেল। এ সবই তার কাছে উত্তরোত্তর আরও অদ্ভুত, এমনকি অসম্ভব মনে হতে লাগল। 'ভাবোন্মাদ ভাবোন্মাদ!' সে মনে-মনে বলল।

দেরাজ=আলমারির মাথার ওপরে একটা বই পড়ে ছিল। এমুড়ো-ওমুড়ো পায়চারি করতে গিয়ে প্রতিবারই সেটা নজরে পড়ছিল রাস্‌কোল্‌নিকভের। এবারে তুলে নিয়ে দেখল। রুশ অনুবাদে বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট। বইটা পুরানো, বেশ জীর্ণ, চামড়ায় বাঁধান।

"এটা কোথা থেকে?" ঘরের ওপাশ থেকে সে চেঁচিয়ে বলল। সোনিয়া দাঁড়িয়ে ছিল সেই একই জায়গায়— টেবিল থেকে কয়েক পা দূরে।

"আমাকে এনে দিয়েছে একজন," তার দিকে না তাকিয়ে সোনিয়া এমনভাবে উত্তর দিল যে মনে হল উত্তর দেওয়ার তেমন ইচ্ছে তার ছিল না।

"কে এনে দিয়েছে?"

"লিজাভেতা। আমি চেয়েছিলাম।"

'লিজাভেতা! অদ্ভুত!' সে মনে-মনে ভাবল। প্রতি মুহূর্তে সোনিয়ার ঘরের সমস্ত কিছু তার কাছে কেমন যেন অদ্ভুত আর বিস্ময়কর হয়ে উঠতে লাগল। বইটা মোমবাতির কাছে এনে সে পাতা ওলটাতে শুরু করল।

"ল্যাজারসের উপাখ্যানটা এখানে কোথায়?" হঠাৎ সে জিগ্‌গেস করল।

সোনিয়া একদৃষ্টে মাটির দিকে চেয়ে রইল, উত্তর দিল না। সে দাঁড়িয়ে ছিল টেবিলের সামান্য পাশ ঘেঁষে।

"ল্যাজারাসের পুনরুত্থানের প্রসঙ্গটা কোথায়? আমায় খুঁজে বের করে দাও, সোনিয়া।"

সোনিয়া আড়চোখে তার দিকে তাকাল।

"ওখানে নয়... চতুর্থ সুসমাচারে দেখুন..." কঠিন স্বরে ফিসফিস করে সোনিয়া বলল, কিন্তু তার দিকে এগিয়ে গেল না।

"খুঁজে বের করে আমাকে পড়ে শোনাও," এই বলে শোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে হাতে মাথা রেখে টেবিলে কনুই ভর দিয়ে সে বসে পড়ল। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল একপাশে।

"আর হপ্তা তিনেকের মধ্যে পাগলা গারদে যাবার ডাক পড়বে। আমার মনে হয়, আমি নিজেই সেখানে গিয়ে পড়ব, যদি অবশ্য তার চেয়েও খারাপ কিছু না ঘটে," আপন মনে বিড়বিড় করে সে বলল।

সোনিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে রাস্কোল্‌নিকভের অদ্ভুত বাসনার কথা শুনল। তারপর ইতস্তত করে এগিয়ে গেল টেবিলের দিকে। বইটাও শেষপর্যন্ত হাতে নিল।

"আপনি কি পড়েননি কখনও?" টেবিলের ওধার থেকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে সে জিগ্‌গেস করল। তার কণ্ঠস্বর ক্রমে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে আসছিল।

"অনেক আগে,... সেই স্কুলে থাকতে। পড়!"

"কিন্তু গির্জায় শোনেননি?"

"আমি কখনও যাইনি। তুমি কি প্রায়ই যাও?"

"ন্- না," নিচু গলায় সোনিয়া বলল।

রাসকোল্‌নিকভ্ মুচকি হাসল।

"বুঝতে পারছি।... তাহলে কাল তোমার বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেও যাচ্ছ না?"

"যাব। আমি এই সপ্তাহেও গিয়েছিলাম... একজনের শেষকৃত্য উপলক্ষে।"

"কার?"

"লিজাভেতার। ওকে কুড়ুল দিয়ে খুন করেছিল কে একজন।"

রাসকোল্‌নিকভ্ ক্রমেই বেশি খিটখিটে হয়ে পড়তে লাগল। তার মাথা ঘুরতে লাগল।

"লিজাভেতার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব ছিল বুঝি?"

"হ্যাঁ।... বড় ভালোমানুষ ছিল।... আমার কাছে আসত।... কদাচিৎ।... আসার উপায় ছিল না। আমরা দুজনে একসঙ্গে পড়তাম ... কথাবার্তা বলতাম। ও ঈশ্বরের দর্শন পাবে।"

এই কেতাবি কথাগুলো তার কাছে অদ্ভুত ঠেকল। আবারও একটা সংবাদঃ লিজাভেতার সঙ্গে কেমন যেন রহস্যজনক দেখাসাক্ষাৎ— আবার দুজনেই ভাবোন্মাদ।

'এখন দেখছি নিজেকেই ভাবোন্মাদগ্রস্ত হতে হবে! ছোঁয়াচে রোগ!' সে মনে-মনে ভাবল। তারপর হঠাৎ খেপে গিয়ে জিদ ধরে চেঁচিয়ে বলল: "পড়!"

সোনিয়া তখনও ইতস্তত করতে লাগল । তার বুক দুরদুর করছিল। তাকে পড়ে না শোনানোর মতো সাহস ওর ছিল না। যন্ত্রণাকাতর দৃষ্টিতে 'অভাগী উন্মাদগ্রস্ত মেয়েটির' দিকে তাকাল রাস্‌কোল্‌নিকভ।

"ও দিয়ে আপনার কী হবে? আপনি তো আর বিশ্বাস করেন না! তাই না?" অনেকটা হাঁপাতে-হাঁপাতে সে মৃদুস্বরে বলল।

"পড়! আমার ইচ্ছে" রাস্‌কোল্‌নিকভ্ জেদ ধরে রইল। "লিজাভেতাকে তো খুব পড়ে শোনাতে!"

সোনিয়া বই খুলে জায়গাটা খুঁজে বার করল। তার হাত কাঁপছিল, কণ্ঠস্বরে কুলোচ্ছিল না। দুবার আরম্ভ করল, কিন্তু দুবারই প্রথম শব্দের গোড়াতে আটকে গেল।

"বেথানিপল্লীর ল্যাজারাস নামক জনৈক ব্যক্তি পীড়িত হইয়াছিল..." অবশেষে অনেক চেষ্টার পর সে উচ্চারণ করল, কিন্তু হঠাৎ তৃতীয় শব্দ থেকে তার কণ্ঠস্বর ঝনঝন করে উঠল, অতিরিক্ত টান ধরা তারের মতো খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল। তার নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল, বুকের ভেতরে সে অনুভব করল একটা চাপা ভাব।

সোনিয়া যে কেন তাকে পড়ে শোনাতে ইতস্তত করছিল রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তা খানিকটা বুঝতে পারছিল। যত বেশি বুঝতে পারছিল তত বেশি রূঢ়ভাবে, আরও বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ার জন্য জেদ করতে লাগল। সোনিয়ার *নিজের* বলতে যা ছিল সেসব তখন উদ্‌ঘাটন করা, প্রকাশ করা তার পক্ষে. যে কত কঠিন রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তা বেশ বুঝতে পারছিল। সে বুঝতে পারল যে এই অনুভূতি বাস্তবিকই কোন না কোন ভাবে সোনিয়ার প্রকৃত *গোপন রহস্য* গড়ে তুলেছে। ওর সে রহস্য হয়ত অনেক কালের, হয়ত বা সেই কৈশোর থেকে, সেই তখন থেকে যখন ও থাকত পরিবারে, হতভাগ্য বাপ আর শোকে উন্মাদগ্রস্ত সৎমায়ের কাছে, বুভুক্ষ শিশুদের মাঝখানে, ভয়ঙ্কর চিৎকার -চেঁচামেচি আর গালিগালাজের পরিবেশে। কিন্তু সেইসঙ্গে রাস্‌কোল্‌নিকভ এখন এও জানে এবং ঠিকই জানে যে এই মুহূর্তে পড়তে গিয়ে যদিও কী কারণে যেন সে মুষড়ে পড়ছিল, দারুণ ভয় পাচ্ছিল, তবু সমস্ত বিষণ্ণতা, সমস্ত আশঙ্কা সত্ত্বেও সোনিয়ার নিজেরই ভীষণভাবে ইচ্ছে হচ্ছিল পড়ার— *ঠিক-ওকেই* পড়ে শোনানোর, যাতে ও শুনতে পায়, আর সেটা অবশ্যই হওয়া চাই ঠিক

এই মুহূর্তে— 'পরে সে যা-ই হোক না কেন!...' সোনিয়ার মনের কথাগুলো যেন রাস্‌কোল্‌নিকভ্ পড়তে পারল তার চোখের ভাষায়, বুঝতে পারল উত্তেজনার প্রবল উচ্ছ্বাস থেকে।... সোনিয়া শক্তি সঞ্চয় করল, যে দম আটকানো ভাবটা গলার ভেতরে চেপে বসায় স্তবকের শুরুতেই তার কণ্ঠস্বর বসে গিয়েছিল তা দমন করে সে সেন্ট জনের সুসমাচারের একাদশ অধ্যায় পড়তে শুরু করে দিল। এইভাবে পড়ে গেল উনিশ সংখ্যক স্তবক অবধি:

"এবং ভ্রাতার কারণে শোকার্ত মার্থা ও মেরীকে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক ইহুদির আগমন ঘটিল তাহাদিগের সমীপে। মার্থার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল যে যিশুর আগমন ঘটিতেছে। সে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। মেরী গৃহেই উপবিষ্ট রহিল। অতঃপর মার্থা যিশুকে কহিল: প্রভো, তুমি অত্র উপস্থিত থাকিলে মদীয় ভ্রাতা মৃত্যুমুখে পতিত হইত না। কিন্তু আমি অবগত আছি যে এই ক্ষণেও তুমি যাহা যাচঞা করিবে ঈশ্বর তাহাই তোমাকে দিবেন।..."

কণ্ঠস্বর আবার কেঁপে যাচ্ছে ও ভেঙে পড়ার উপক্রম হচ্ছে টের পেয়ে এই জায়গায় এসে তাকে লজ্জায় আবার থেমে যেতে হল।

"যিশু তাহাকে কহিলেন, তোমার ভ্রাতার পুনরুত্থান ঘটিবে। মার্থা তাঁহাকে কহিল, জানি, সমাপ্তি দিবসে, পুনরুত্থান দিবসে তাহার পুনরুত্থান ঘটিবে। যিশু তাহাকে কহিলেন, *আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন*। আমাতে যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করে তাহার মৃত্যু হইলেও জীবনপ্রাপ্তি ঘটিবে। যে কেহ জীবিত এবং আমাতে আস্থাবান তাহার কদাপি মৃত্যু নাই। ইহাতে তোমার আস্থা রহিয়াছে কি? সে তাঁহাকে কহিল..." যন্ত্রণাকাতর নিঃশ্বাস ছেড়ে বেশ জোর দিয়ে, প্রতিটি শব্দ পৃথক-পৃথকভাবে উচ্চারণ করে এমনভাবে সোনিয়া পড়ে গেল যে মনে হল নিজেই সর্বসমক্ষে কোন স্বীকারোক্তি করছে। "হে প্রভু, আমি বিশ্বাস করি যে তুমি, খ্রিস্ট, ঈশ্বরের পুত্র, ধরাধামে অবতীর্ণ!"

মুহূর্তের জন্য থেমে গিয়ে দ্রুত সে চোখ তুলে তাকাল *তার* দিকে, কিন্তু পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে আবার পড়তে শুরু করল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ টেবিলে কনুই ভর দিয়ে একপাশে দৃষ্টি সরিয়ে স্থির হয়ে বসে-বসে শুনতে লাগল, মাথা ঘোরাল না। বত্রিশ সংখ্যক স্তবক পর্যন্ত পড়ে গেল সোনিয়া।

"অতঃপর যিশু যেই স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন সেই স্থানে মেরীর আগমন হইলে তাঁহার দর্শনে সে তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া কহিল, প্রভো তুমি অত্র উপস্থিত থাকিলে আমার ভ্রাতা মৃত্যুমুখে পতিত হইত না। তাহাকে ক্রন্দনরতা অবলোকনপূর্বক এবং তাহার সহিত আগত ইহুদিদিগকেও ক্রন্দনরত অবলকোনপূর্বক স্বয়ং যিশুর অন্তরাত্মা শোকার্ত হইল, তিনি বিচলিত হইলেন। অতঃপর তিনি কহিলেন উহাকে তোমরা কোন্ স্থানে রাখিয়াছ? তাহারা কহিল, হে প্রভু, আইস অবলোকন কর। যিশু অশ্রুপাত করিলেন। অতঃপর ইহুদিগণ কহিল, সে তোমাকে কত প্রেম

করিত একবার অবলোকন কর। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কহিল: যে ব্যক্তি অন্ধকে চক্ষুষ্মান করিয়াছেন তিনি কি এমত করিতে সক্ষম ছিলেন না যাহাতে এই ব্যক্তির মৃত্যু না ঘটিত?"

রাস্‌কোল্‌নিকভ তার দিকে মুখ ফেরাল। উত্তেজনাভরে তাকিয়ে দেখল তাকে। হ্যাঁ, যা ভেবেছিল তাই! ইতিমধ্যে ঠিক যেন জ্বরের ঘোরে সত্যি-সত্যি কাঁপতে শুরু করেছে সোনিয়ার সর্বাঙ্গ। রাসকোল্‌নিকভের কাছে এটা প্রত্যাশিত ছিল। সোনিয়া অশ্রুতপূর্ব, পরম বিস্ময়কর, অলৌকিক কাহিনীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ছে, পরম ভাবাবেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তার কণ্ঠস্বরে বেজে উঠল ধাতব অনুরণন। তাতে ধ্বনিত হল, তাকে জোরাল করে তুলল উল্লাস ও আনন্দের উপলব্ধি। চোখে সে অন্ধকার দেখতে লাগল, তাই চোখের সামনে অক্ষরগুলো নাচতে লাগল। কিন্তু যা সে পড়ছিল তা ওর আগাগোড়া কণ্ঠস্থ 'যে ব্যক্তি অন্ধকে চক্ষুষ্মান করিয়াছেন তিনি কি এমত করিতে সক্ষম ছিলেন না...' এই শেষ স্তবকে এসে সে তার কণ্ঠস্বর নামিয়ে এনে উত্তেজনা ও আবেগের সঙ্গে প্রকাশ করল অবিশ্বাসী, অন্ধ সেই ইহুদিদের সন্দেহ, ভর্ৎসনা ও নিন্দা, যারা এখনই, পরমুহূর্তেই বজ্রাহতের মতো ভূলুণ্ঠিত হয়ে ডুকরে কেঁদে উঠবে, তাঁকে বিশ্বাস করবে।... 'এবং *সে— সেও,* অন্ধ ও অবিশ্বাসী সেও শুনতে পাবে সেই বার্তা, সেও বিশ্বাস করবে, হ্যাঁ হ্যাঁ... করবে! এই এখনই, এই মুহূর্তে বিশ্বাস করবে!'— কল্পনায় সে দেখতে পেল, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সেই আনন্দদায়ক মুহূর্তটির প্রত্যাশায়।

"সুতরাং যিশু পুনর্বার শোকাকুল চিত্তে সমাধিস্থলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলেন। উহা এক পর্বতকন্দর, যাহার সম্মুখভাগ ছিল এক প্রস্তরখণ্ডে আবৃত। যিশু কহিলেন: প্রস্তরখণ্ড অপসারণ কর। মৃত ব্যক্তির ভগিনী মার্থা তাঁহাকে কহিল: প্রভু, ইতোমধ্যে দুর্গন্ধ বিকিরণ করিতেছে, যেহেতু সে *চারিদিন* সমাধিস্থলে শায়িত রহিয়াছে।"

চারিদিন কথাটার ওপর সে সোৎসাহে জোর দিল।

"যিশু তাহাকে কহিলেন: আমি কি তোমাকে কহি নাই যে বিশ্বাস থাকিলে ঈশ্বরের মহিমা প্রত্যক্ষ করিবে? অতঃপর মৃতব্যক্তি যেই স্থানে শায়িত ছিল সেই কন্দরের অগ্রভাগ হইতে প্রস্তরখণ্ড অপসারিত হইল। যিশু ঊর্ধ্বাকাশের দিকে চক্ষু উত্তোলনপূর্বক কহিলেন: পিতঃ আমার আহ্বান যে তোমার কর্ণগোচর হইয়াছে তজ্জন্য তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমি ইহাও জানিতাম যে আমি সর্বদা তোমার কর্ণগোচর হইব। কিন্তু যে সকল মনুষ্য এই স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহাদিগের নিমিত্ত আমি ইহা কহিলাম, যাহাতে উহারা বিশ্বাস করিতে পারে যে তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ। এমত উক্তির পরে তিনি উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেন : ল্যাজারাস, নির্গত হও! *মৃতব্যক্তি নিষ্ক্রান্ত হইল*" — তার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ ও শিহরন খেলে গেল, দৃশ্যটা যেন সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে এমনিভাবে গলা চড়িয়ে পরম পুলকে পড়ে যেতে

লাগল: "নিষ্ক্রান্ত হইল শবাচ্ছাদন বস্ত্রখণ্ডে হস্তপদ বিজড়িত অবস্থায়। তাহার মুখমণ্ডলও বস্ত্রখণ্ডে বিজড়িত ছিল। যিশু তাহাদিগকে কহিলেন: বন্ধনমুক্ত কর, উহাকে যাইতে দাও।

"ইহাতে ইহুদিগণের মধ্যে অনেকে, যাহারা মেরীর নিকট আগমন করিয়াছিল, যিশু যাহা সংঘটন করিলেন, তাহা দৃশ্যগোচর করিয়া তাহাতে আস্থাবান হইল।"

এরপর সে আর পড়ল না, পড়তে পারল না। বই বন্ধ করে দ্রুত চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল।

"ল্যাজারাসের পুনরুত্থান সম্পর্কে এ-ই সব," দারুণ ছাড়া-ছাড়াভাবে কঠিন স্বরে ফিসফিসিয়ে এই বলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে স্থির হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। অনেকটা যেন লজ্জাবশত রাস্‌কোল্‌নিকভের দিকে চোখ তুলে সে তাকাতে সাহস করছিল না। জ্বরজ্বর কাঁপুনির ভাবটা তার তখনও চলতে লাগল। তোবড়ান বাতিদানে মোমবাতির টুকরোটা অনেকক্ষণ হল নিভু-নিভু হয়ে জ্বলছে, তাতে এই দৈন্যদশাগ্রস্ত ঘরে মৃদু আলোকিত হয়ে উঠছে অদ্ভুত পরিস্থিতিতে শাশ্বত গ্রন্থ পাঠের জন্য মিলিত এক পুরুষ আর এক নারী— একজন খুনি, অন্যজন ভ্রষ্টা। মিনিট পাঁচেক বা তারও কিছুটা বেশি সময় কেটে গেল।

"আমি কাজের কথা বলতে এসেছি," ভুরু কুঁচকে হঠাৎ জোর গলায় বলে উঠল রাস্‌কোল্‌নিকভ্। উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল সোনিয়ার দিকে। সোনিয়া কোন কথা না বলে তার দিকে চোখ তুলে তাকাল। রাস্‌কোল্‌নিকভের দৃষ্টি বিশেষভাবে কঠোর, তাতে প্রকাশ পাচ্ছিল এক ধরনের ভয়ঙ্কর দৃঢ় সঙ্কল্প।

"আমি আজ আমার আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে এসেছি," সে বলল, "আমার মা আর বোনকে ছেড়ে এসেছি। এখন আমি ওদের কাছে আর যাব না। আমি ওদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করেছি।"

"কী জন্যে?" সোনিয়া বিমূঢ় হয়ে জিগ্‌গেস করল। রাস্‌কোল্‌নিকভের মা আর বোনের সঙ্গে ওর এই আজকের সাক্ষাৎটা ওর মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল, যদিও সেটা যে কী তা ওর নিজের কাছেই তেমন স্পষ্ট ছিল না। ছাড়াছাড়ির এই সংবাদ শুনে সে ভয়ে প্রায় শিউরে উঠল।

"আমার এখন তুমি ছাড়া আর কেউ নেই," সে যোগ করল। "চল একসঙ্গে যাব।... আমি তোমার কাছে এসেছি। আমরা দুজনেই অভিশপ্ত, তাই চল, দুজনেই একসঙ্গে যাই।"

তার দুচোখে ঝকঝক করে উঠল। 'এ যে ছিটগ্রস্তের মতো।' এবারে সোনিয়া ভাবল।

" কোথায় যাব?" আতঙ্কিত হয়ে জিগ্‌গেস করার সঙ্গে-সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতসারে পিছিয়ে গেল।

"তা আমি কী করে জানব? একমাত্র যা জানি তা এই যে আমাদের দুজনের পথ এক। 'এটা আমি নিশ্চিত জানি—এর বেশি আর কিছু জানি না। আমাদের লক্ষ্য এক!"

সোনিয়া তার দিকে তাকাল, কিছু বুঝতে পারল না। সে কেবল এটাই বুঝতে পারছিল যে লোকটা ভীষণ অসুখী, বড় দুঃখী।

"ওদের সঙ্গে যদি কথা বল তাহলে ওদের কেউই কিছু বুঝতে পারবে না", সে বলে চলল, "কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি। তোমাকে আমার দরকার, তাই আমি তোমার কাছে এসেছি।"

"বুঝতে পারছি না," সোনিয়া ফিসফিসিয়ে বলল।

"পরে বুঝতে পারবে। তুমি কি এই একই কাজ করনি? তুমিও তোমার সীমারেখা ছাড়িয়ে গেছ...সীমারেখা ছাড়িয়ে যেতে পেরেছ। তুমি নিজের ওপর হাত তুলেছ, তুমি একটা জীবন নষ্ট করেছ...*নিজের* জীবন...কিন্তু ওই একই কথা হল! তুমি তোমার হৃদয় নিয়ে, বুদ্ধি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারতে, কিন্তু তার বদলে জীবন শেষ করতে চলেছ সেন্নায়ার কুখ্যাত পল্লীতে। ...কিন্তু তোমার সহ্যশক্তিতে কুলোবে না। আবার তোমাকে যদি *একা* থাকতে হয় তাহলে তুমি পাগল হয়ে যাবে—এই আমারই মতো। এখনই তুমি উন্মাদগ্রস্তের মতো। তাই আমাদের চলতে হবে একসঙ্গে, একই পথে! চল, যাই!"

"কেন? এসব আপনি কেন বলছেন?" ওর কথায় বিচলিত হয়ে বিদ্রোহের সুরে, অদ্ভুতভাবে সোনিয়া বলে উঠল।

"কেন? কেননা এভাবে থাকা উচিত নয়—ঠিক এই কারণেই! ভগবান হতে দেবেন না—এই বলে এখন বাচ্চাদের মতো কাঁদুনি গাইলে বা চিৎকার-চেঁচামেচি করলেও শেষকালে একসময় সরাসরি গুরুত্ব দিয়ে বিচার করে দেখতেই হবে! কী হবে বল যদি কাল তোমাকে হাসপাতালে যেতে হয়? আরেকজনের তো মাথাটাই গেছে, তায় আবার ক্ষয়রোগগ্রস্ত। ...শিগগিরই মারা যাবে...তখন বাচ্চাগুলোর দশা কী হবে? তোমার কি মনে হয় পোলেন্কা ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাবে? রাস্তার আনাচে-কানাচে তোমার কি কখনও চোখে পড়েনি বাচ্চা ছেলেমেয়েদের, যাদের মায়েরাই তাদের ভিক্ষে করতে পাঠাচ্ছে? এই মায়েরা কোথায় থাকে, কী ধরনের পরিবেশে থাকে তা আমার জানা আছে। ওই পরিবেশে শিশুরা আর শিশু থাকতে পারে না। সেখানে সাত বছরের শিশু দুশ্চরিত্র, চোর-বাটপার। অথচ শিশুরাই কিনা খ্রিস্টের প্রতিমূর্তি—'ঈশ্বরের রাজত্ব উহাদেরই।' উনি আমাদের আদেশ দিয়েছেন ওদের সম্মান করতে, ভালোবাসতে, ওরা মানবজাতির ভবিষ্যৎ।..."

"কী করতে হবে? কী করতে হবে তাহলে?" হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো কাঁদতে-কাঁদতে, অসহায়ভাবে নিজের হাত নিজে মোচড়াতে-মোচড়াতে সোনিয়া আওড়াল।

"কী করতে হবে? কিছু নয়—যা ভাঙাচোরা দরকার তা ভেঙে ফেলতে হবে—নিঃশেষে ভেঙে ফেলতে হবে আর নিজের ওপর তুলে নিতে হবে যন্ত্রণার বোঝা! কী? বুঝতে পারছ না? পরে বুঝবে। ...স্বাধীনতা ও ক্ষমতা, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা—ক্ষমতা! ভীরু প্রাণীগুলোর সকলের ওপর আধিপত্য, গোটা পিঁপড়ের বাসার ওপর আধিপত্য!...এই হল লক্ষ্য! মনে রেখো কথাটা! যাবার আগে তোমাকে এই শুভেচ্ছাই জানিয়ে যাচ্ছি। হয়ত তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ কথা। কাল যদি না আসি তাহলে নিজেই সব কিছু শুনতে পাবে। তখন মনে করো আজকের এই কথাগুলো। তারপর কোন একসময়, পরে, অনেক-অনেক বছর পরে জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে হয়ত উপলব্ধি করতে পারবে আমার এই কথাগুলোর তাৎপর্য। আর যদি কাল আসি তাহলে তোমাকে বলব কে খুন করেছিল লিজাভেতাকে। চললাম!"

ভয়ে শিউরে উঠল সোনিয়া।

"আপনি কি সত্যিই জানেন কে খুন করেছিল?" আতঙ্কে হিম হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল সে।

"জানি, এবং বলবও।... তোমাকে, একমাত্র তোমাকেই বলব! আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে আসব না, শুধু বলব। আমি অনেক আগে তোমাকে বেছে রেখেছি—একথা তোমাকে বলব বলে—সেই তখন থেকে যখন তোমার বাবা আমাকে তোমার কথা বলেন। লিজাভেতা তখনও বেঁচে।...তখনই ভেবে রেখেছি। চলি। থাক, হাত আর বাড়িও না। কাল দেখা হবে!"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বেরিয়ে গেল। সোনিয়া তার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল যেন ও একটা উন্মাদ। কিন্তু তার নিজেরই বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছিল—এটা সে উপলব্ধি করতে পারছিল। তার মাথা ঘুরছিল। 'হা ভগবান! লিজাভেতাকে কে খুন করেছিল কী করে জানল? ওর এই কথাগুলোর অর্থ কী? কী ভয়ঙ্কর!' কিন্তু সেই সঙ্গে *চিন্তাটা* একবারও তার মাথায় এলো না। কোনভাবেই না! ঘুণাক্ষরেও না!...'ওঃ মানুষটা নিশ্চয়ই বড় দুঃখী।...মা আর বোনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল। কেন? কী হয়েছিল? আর ওর অভিসন্ধিই বা কী? তাকে যা বলল সেটা কী? ও তার পায়ে চুমু খেল, বলল...বলল—*হ্যাঁ* স্পষ্ট এই কথাই বলল—আমাকে ছাড়া ও বাঁচবে না। ...ওঃ ভগবান!'

সারাটা রাত একটা জ্বরের ঘোর আর বিকারের মধ্যে কাটাল সোনিয়া। সময়-সময় সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ছিল, কাঁদছিল, অসহায়ভাবে নিজের হাত নিজে মোচড়াচ্ছিল, কখনও বা সংজ্ঞাহীন হয়ে জ্বরজ্বর ভাবের আকস্মিক প্রকোপে ডুবে যাচ্ছিল নিদ্রার ঘোরে। স্বপ্নে সে দেখতে পাচ্ছিল পোলেন্‌কাকে, কাতেরিনা ইভানোভ্‌না ও লিজাভেতাকে, বাইবেলের সুসমাচার পাঠ এবং...এবং ওকেও, ওর

সেই পাণ্ডুর মুখ আর জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি। .... সোনিয়ার পায়ে চুমু খাচ্ছে আর কাঁদছে।... ওঃ ভগবান!

গের্ট্রুড কার্লোভ্না রেস্‌লিখ আর সোনিয়ার ফ্ল্যাটের মাঝখানে ডানদিকের যে দরজাটা, তার ওপাশে আরও একটা ঘর ছিল— মাদাম রেস্‌লিখের ফ্ল্যাটেরই অংশ বহুদিন খালি পড়ে ছিল, ভাড়া দেবার জন্যই পড়ে ছিল। খালপাড়ের রাস্তার দিকের জানলার কাচ এবং গেটের ওপর এই মর্মে ছোট ছোট কাগজের টুকরোর ওপর সাঁটা বিজ্ঞাপন তার সাক্ষ্য বহন করছে। এই ঘরটাতে কেউ বাস করে না বলে সোনিয়ার অনেক দিনের বদ্ধমূল ধারণা। কিন্তু ইতিমধ্যে খালি ঘরের দরজার পাশে গোপনে দাঁড়িয়ে থেকে মিস্টার স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ সারাক্ষণ আড়ি পেতে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ চলে যেতে সে আরও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে একটু ভেবে নিল, পা টিপে-টিপে চলে গেল এই খালি ঘরেরই লাগোয়া তার নিজের ঘরটিতে, সেখান থেকে একটা চেয়ার তুলে এনে নিঃশব্দে সোনিয়ার ঘরের পাশের ঠিক দরজা ঘেঁষে রাখল। ওদের কথাবার্তা তার বেশ উপভোগ্য মনে হয়েছিল, খুব ভালো লেগেছিল। এত ভালো লেগেছিল যে ভবিষ্যতে অন্তত এই যেমন আগামীকাল...ঝাড়া এক ঘন্টা একঠায় দাঁড়িয়ে থাকার ঝামেলা যাতে আবার না পোয়াতে হয় সেই উদ্দেশ্যে সে একটা চেয়ারই বয়ে এনে দিব্যি জুতসই ব্যবস্থা করে নিল। এর ফলে সব রকম ভাবে পুরোদস্তুর উপভোগ করা যাবে।

পাঁচ

পরদিন সকালে কাঁটায় কাঁটায় এগারোটার সময় রাস্‌কোল্‌নিকভ্ পুলিস স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হল। ফৌজদারী তদন্ত বিভাগে পর্‌ফিরি পেত্রোভিচকে তার আগমনের সংবাদ জানাতে বলার পরও অনেকক্ষণ তার ডাক পড়ছে না দেখে সে বেশ খানিকটা অবাকই হয়ে গেল। ওর ডাক পড়তে-পড়তে আরও অন্তত দশ মিনিট কেটে গেল। অথচ তার হিসাবে, তাকে দেখে সঙ্গে-সঙ্গে ওদের লাফিয়ে ওঠার কথা। যতক্ষণ সে ওয়েটিংরুমে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল সেই সময়ের মধ্যে এদিক-ওদিক থেকে তার পাশ দিয়ে বেশ কিছু লোকজন যাতায়াত করতে লাগল। তাদের মুখ দেখে বোঝাই যাচ্ছিল, ওর সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহ তাদের নেই। পরের ঘরটা দেখতে অফিসঘরের মতো— সেখানে বেশ কিছু কেরানি বসে-বসে লিখছিল—এটা স্পষ্ট যে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ লোকটা কে এবং কী বস্তু, এ সম্পর্কে ওদের কারোই কোন ধারণা নেই। সন্দিগ্ধ ও অস্থির দৃষ্টিতে সে নিজের চারপাশে নিরীক্ষণ করতে লাগল। দেখার চেষ্টা করল তার আশেপাশে কোন সান্ত্রী আছে কিনা অথবা যাতে সে কোথাও পালিয়ে যেতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে তার ওপর গোপনে নজর রাখার জন্য কাউকে রাখা হয়েছে কিনা। কিন্তু সেরকম কিছুই

নজরে পড়ল না। সে কেবল দেখতে পাচ্ছিল খুচরো কাজকর্মে ব্যস্ত অফিস-কর্মচারীদের মুখ, এছাড়া আরও কিছু লোকজন। কিন্তু ওকে নিয়ে তাদের কারও কোনও মাথাব্যথার লক্ষণ দেখা গেল না। ইচ্ছে করলে এক্ষুনি সে যেখানে খুশি চলে যেতে পারে— কেউ বাধা দেবে না। তার মাথার মধ্যে যে চিন্তাটা ক্রমেই বেশি শক্ত শিকড় গেড়ে বসতে লাগল তা এই যে গতকাল ওই যে রহস্যজনক মানুষটি, অপচ্ছায়াটি মাটি ফুঁড়ে হঠাৎ উঠে এসেছিল সে যদি সত্যি-সত্যি সবকিছু জেনে থাকে, দেখে থাকে, তাহলে কি আর ওকে— রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে এখন এরকম শান্তভাবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করতে দিত? এবং যতক্ষণ না সে নিজে থেকে দর্শন দেওয়ার কথা বিবেচনা করছে ততক্ষণ— এগারোটা পর্যন্ত কি ওর জন্য এখানে অপেক্ষা করে বসে থাকত? সুতরাং দাঁড়াচ্ছে এই যে লোকটা হয়ত এখনও কোন রিপোর্ট করে উঠতে পারেনি, অথবা... অথবা নিজেও স্রেফ কিছুই জানে না, নিজের চোখে কিছু দেখেওনি। অবশ্য দেখবেই বা কী করে? অর্থাৎ গতকাল রাস্‌কোল্‌নিকভের যা যা ঘটেছিল সেসবই অন্যান্য বারের মতোই তার বড় বেশি উত্তেজিত অসুস্থ মস্তিষ্কপ্রসূত কল্পনার ছায়ামূর্তি মাত্র! এমনকি গতকালও তার প্রবল উত্তেজনা ও হতাশার মুহূর্তেও এই অনুমানটি তার মাথার ভেতরে শেকড় গাড়তে থাকে। এখন এসব মনে-মনে আন্দোলন করে, নতুন করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে নিতে হঠাৎ সে উপলব্ধি করল যে সে কাঁপছে। এই ঘৃণ্য পর্‌ফিরি পেত্রোভিচের ভয়ে কিনা সে কাঁপছে— একথা মনে হতেই ক্রোধে-ঘৃণায় তার বুকের ভেতরটা জ্বলে পুড়ে যেতে লাগল। তার কাছে সবচেয়ে বড় বিভীষিকা হল এই লোকটার সঙ্গে আবার দেখা করতে যাওয়া। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ ওকে দারুণ ঘৃণা করে, অপরিসীম ঘৃণা করে। এমনকি সে ভয় পাচ্ছিল এই ঘৃণার ফলে কোনভাবে সে নিজেকে প্রকাশ না করে ফেলে। তার ঘৃণা, বিদ্বেষ এতই প্রবল হয়ে উঠল যে সঙ্গে-সঙ্গে কাঁপুনি বন্ধ হয়ে গেল। সে ঠাণ্ডা মাথায়, উদ্ধত ভঙ্গি নিয়ে ওর ঘরে ঢোকার জন্য প্রস্তুত হল। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করল যতদূর সম্ভব কম কথা বলবে, চোখ-কান খোলা রাখবে। অন্ততপক্ষে এবারে যেভাবেই হোক নিজের অসুস্থ ধরনের খিটখিটে মেজাজটাকে জয় করতে হবে। ঠিক এই সময় পর্‌ফিরির কাছে তার ডাক পড়ল।

দেখা গেল ঠিক এই মুহূর্তে পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ তার ঘরে একা। ঘরটা তেমন বড় নয়, খুব একটা ছোটও নয়। ঘরে অয়েলক্লথ মোড়া একটা সোফার সামনে বড়সড় একটা লেখার টেবিল, একটা দেরাজ, এক কোনায় একটা বইয়ের আলমারি আর খানকয়েক চেয়ার। সবই সরকারি আসবাবপত্র— পালিশ করা হলুদ কাঠের। পেছনের দেয়ালের গায়ে— অথবা আরও ভালোভাবে বলতে গেলে— পার্টিশনের গায়ে, কোনায় একটা দরজা। সেটা বন্ধ। অর্থাৎ ও-পাশে নির্ঘাত আরও ঘর আছে।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে পর্‌ফিরি তার ঢোকার মুখের দরজাটা বন্ধ করে দিল। এখন ওরা দুজন ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই। অতিথিকে অভ্যর্থনার ধরনটা বেশ হাসিখুশি ও দিলখোলা মনে হল। তবে মাত্র কয়েক মিনিট পরে কতকগুলো লক্ষণ দেখে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তার মধ্যে লক্ষ করল কেমন যেন একটা বিব্রত ভাব— যেন কেউ তাকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছে অথবা একান্ত গোপনীয় কোন কাজ করতে গিয়ে সে ধরা পড়া গেছে।

"এই যে মান্যবর। আমাদের ডেরায় তাহলে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল!" দু-হাত বাড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে পর্‌ফিরি শুরু করল। "আরে বসুন বসুন মশাই। অবশ্য মান্যবর এবং... মহাশয় সম্ভাষণে যদি আপনার আপত্তি না থাকে। ... তাহলে ইয়োর tout Court চলবে তো? বাড়াবাড়ি রকমের অন্তরঙ্গতার জন্য দয়া করে মনে কিছু করবেন না।... এই যে এদিকে, সোফায় এসে বসুন।"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ এসে বসল, কিন্তু তার মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরাল না।

'আমাদের ডেরায়, বাড়াবাড়ি রকমের অন্তরঙ্গতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা, ফরাসী ভাষার শব্দ tout Court ইত্যাদি-ইত্যাদি— এ সবের মধ্যেই বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। আমার দিকে দু-হাত বাড়াল বটে, কিন্তু একটা হাতও মেলাল না, যথাসময়ে সরিয়ে নিল,' রাস্‌কোল্‌নিভের মনে সন্দেহ দানা বাঁধল। দুজনই একে অন্যকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। কিন্তু যখনই চোখাচোখি হয়ে যাচ্ছিল তখনই দুজনে চকিতে দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছিল।

"আমি আপনার কাছে নিয়ে এসেছি কাগজটা... সেই যে ঘড়ির ব্যাপারে এই যে। এভাবে লিখলে হবে তো, নাকি আবার নতুন করে লিখতে হবে?"

"কী? কাগজ? ও হ্যাঁ হ্যাঁ... চিন্তা করবেন না, ও ঠিক আছে," পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ এমনভাবে বলল যেন কোথাও যাবার তাড়া আছে তার। একথা বলার পর কাগজটা তুলে নিয়ে সে তার ওপর চোখ বুলাল। "হ্যাঁ বিলকুল ঠিক আছে। আর কিছু লাগবে না," ওইরকমই দ্রুতোচ্চারণে আগের কথার সমর্থন জানিয়ে সে কাগজটা টেবিলের ওপর রাখল। তারপর মিনিটখানেক বাদে একেবারে অন্য আরেকটা প্রসঙ্গে কথা শুরু হতে সেটা আবার তুলে নিয়ে নিজের কাছে দেরাজের ওপর রাখল।

"আমার মনে হয় গতকাল যেন বলেছিলেন... সেই যে মহিলা খুন হয়েছিল... তার সঙ্গে আমার জানাশোনা সম্পর্কে... নিয়মমাফিক কিছু প্রশ্ন করতে চান?" রাস্‌কোল্‌নিকভ আবার শুরু করতে গেল। বলার সঙ্গে সঙ্গে তার চমক ভাঙল। 'কিন্তু *মনে হয়* বলতে গেলাম কেন?' তখনই আবার বিদ্যুৎচমকের মতো ঝলক দিল আরও একটি চিন্তা: 'কিন্তু *মনে হয়* যোগ করলাম বলেই বা এত দুশ্চিন্তা করার কী আছে?'

হঠাৎ সে অনুভব করল, একমাত্র পর্‌ফিরির সংস্পর্শে এসে, মাত্র মুখের দুটো কথায়, মাত্র দু-একবার দৃষ্টি বিনিময় হতেই তার সন্দেহপ্রবণতা যে মুহূর্তের মধ্যে

বিকট আকারে বেড়ে গেছে... এটা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক: স্নায়ুতে কাঁপুনি ধরছে, উত্তেজনা বেড়ে চলেছে। 'কী বিপদ, কী বিপদ!... আবারও মুখ ফসকে কিছু একটা বলে ফেলব!'

"হ্যাঁ, হ্যাঁ! চিন্তা করবেন না! সময় আছে, এখনও অনেক সময় আছে," টেবিলের সামনে পায়চারি করতে-করতে বিড়বিড় করে পর্‌ফিরি বলল। কিন্তু পায়চারি সে করছিল একেবারেই উদ্দেশ্যহীনভাবে— কখনও যেন ছুটে যাচ্ছিল জানালার দিকে, কখনও দেরাজের দিকে, তারপর ফের টেবিলের দিকে, কখনও এড়িয়ে যাচ্ছিল রাস্‌কোল্‌নিকভের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, আবার কখনও নিজেই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সরাসরি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল তাকে। তখন রীতিমত অদ্ভুত লাগছিল তার গোলগাল, মোটাসোটা, ছোটখাটো মূর্তিটিকে— দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা ছোট্ট বল বিভিন্ন দিকে গড়িয়ে চলতে-চলতে সবগুলো দেয়াল আর আনাচে-কোনাচেতে ঠোক্কর খেয়ে ফিরে আসছে।

"সময় আছে, এখনও সময় আছে!... আপনি সিগারেট খান? আপনার নিজের কাছে আছে কি? এই যে নিন..." অতিথিকে সিগারেট দিয়ে আপ্যায়ন করতে-করতে সে বলল। "জানেন, আমি আপনাকে এখানেই অভ্যর্থনা করছি, তবে আমার ফ্ল্যাটটাও কিন্তু এখানেই— এই পার্টিশনের ওপাশে।... সরকারি। অবশ্য আমাকে এখন সাময়িকভাবে প্রাইভেট ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকতে হচ্ছে। এখানে কিছু মেরামতির কাজ চলছিল। এখন প্রায় শেষ হয়ে গেছে।... সরকারি ফ্ল্যাট...জানেন, খাসা জিনিস— কী বলেন? আপনি কী মনে করেন?"

"হ্যাঁ, খাসা" রাস্‌কোল্‌নিকভ প্রায় বিদ্রুপের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল।

"খাসা জিনিস, খাসা জিনিস..." যেন হঠাৎই একেবারে অন্য কোন একটা বিষয় নিয়ে ভাবতে-ভাবতে অন্যমনস্কভাবে আওড়াল পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ, " হ্যাঁ, খাসা জিনিস!" প্রায় চেঁচিয়ে শেষকালে এই কথা বলে হঠাৎ রাস্‌কোল্‌নিকভের দিকে সে দৃষ্টিপাত করল, তার কাছ থেকে দু-পা দূরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এখন যেরকম গুরুত্ব দিয়ে, রহস্যজনক স্থির দৃষ্টিতে অতিথির দিকে সে তাকিয়ে আছে, তার এই দৃষ্টির মধ্যে যে চিন্তাশক্তির প্রকাশ পাওয়া যাচ্ছে, সরকারি ফ্ল্যাট যে একটা খাসা জিনিস এই কথাটা অসংখ্যবার বোকার মতো আওড়ানোর মধ্যে যে মামুলি ভাব আছে সেটা তার সঙ্গে আদৌ খাপ খায় না।

কিন্তু এতে রাস্‌কোল্‌নিকভের বিদ্বেষের জ্বালা আরও তীব্র হয়ে উঠল। সে নিজেকে সামলাতে না পেরে রীতিমতো অসতর্ক হয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপ ও চ্যালেঞ্জে নেমে পড়ল।

"একটা ব্যাপার আপনি জানেন কি?" পর্‌ফিরি পেত্রোভিচের দিকে তাকিয়ে

এবং নিজের ঔদ্ধত্যে বেশ খানিকটা আনন্দ উপভোগ করতে-করতে আচমকা সে জিগ্‌গেস করল, "আমার মনে হয় সম্ভাব্য সমস্ত তদন্তকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটা বৈধ বা আইনসম্মত উপায় অথবা নিয়ম আছে। সেই নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে শুরু করতে হয় অনেক দূর থেকে, তুচ্ছ বিষয় দিয়ে। অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দিয়েও হতে পারে— তবে সেটা হতে হবে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক। উদ্দেশ্যটা হল যাকে জেরা করা হচ্ছে তাকে... বলা যেতে পারে, অনেকটা উৎসাহিত করে তোলা। ...অথবা আরও ভালোভাবে বলা যেতে পারে, তাকে অন্যমনস্ক করে দেওয়া, তার সতর্কতাকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া এবং তারপর হঠাৎ আচমকা তার মাথার ঠিক চাঁদিতে বসিয়ে দেওয়া অতি বিপজ্জনক ও সত্যিকার মারাত্মক কোন প্রশ্নের এক মোক্ষম ঘা। তাই না? সমস্ত নিয়মকানুন ও অনুশাসনের মধ্যে এই নীতিই তো আজ পর্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়ে থাকে বলে আমার মনে হয়।"

"বটে, বটে... আমি ওই যে সরকারি ফ্ল্যাটের কথা বললাম তাই থেকে আপনার এরকম ধারণা হল বুঝি... অ্যাঁ?" বলে পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ চোখ কোঁচকাল, চোখ টিপলও। এই সময় তার চোখে-মুখে কেমন একটা খুশি-খুশি ও ধূর্ত ভাব খেলে গেল। কপালের ভাঁজগুলো সমান হয়ে মিলিয়ে গেল, চোখদুটো ছোট হয়ে গেল, মুখ ঝুলে পড়ল। তারপর রাস্‌কোল্‌নিকভের চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে উত্তেজনাভরে হঠাৎ স্নায়বিক বিকারগ্রস্তের মতো সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে হাসিতে ফেটে পড়ল। বেশ খানিকক্ষণ ধরে হাসল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ নিজেও কিছুটা জোর করেই হাসতে গেল, কিন্তু পর্‌ফিরি যখন দেখতে পেল যে সেও হাসছে তখন হাসতে-হাসতে গড়িয়ে পড়ল। তার মুখ প্রায় লাল টকটকে হয়ে উঠল। তাই দেখে রাস্‌কোল্‌নিকভের বিতৃষ্ণার ভাব তার সমস্ত সতর্কতাকে ছাড়িয়ে গেল। হাসি থামিয়ে দিয়ে মুখ গোমড়া করে সে অনেকক্ষণ ধরে ঘৃণা ও বিদ্বেষের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পর্‌ফিরির দিকে। পর্‌ফিরি যেন ইচ্ছে করেই হাসি কিছুতেই বন্ধ করছিল না, দীর্ঘ সময় ধরে, যতক্ষণ হাসতে থাকল সেই সময়ের মধ্যে রাস্‌কোল্‌নিকভ মুহূর্তের জন্যও তার ওপর থেকে দৃষ্টি সরাল না। সতর্কতার অভাব অবশ্য দুই তরফ থেকেই প্রত্যক্ষ। দেখা গেল পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ তার অতিথির মুখের ওপর হাসছে, সেই হাসি অতিথির মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষের জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। অথচ তাতে সে এতটুকু বিব্রত হচ্ছে না। এই শেষ ব্যাপারটি রাস্‌কোল্‌নিকভের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে, সে বুঝতে পেরেছে যে এর আগেও পর্‌ফিরি পেত্রাভিচ বিন্দুমাত্র বিব্রত বোধ করেনি। বরং সে, রাস্‌কোল্‌নিকভ নিজেই, সম্ভবত ফাঁদে পড়েছে। এখানে স্পষ্টই এমন একটা কিছু আছে, কোন একটা উদ্দেশ্য আছে যা তার জানা নেই। হয়ত সমস্ত প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সারা হয়ে গেছে, এখন, ঠিক এই মুহূর্তেই সেটা প্রকাশ পাবে, তার মাথায় বজ্রপাতের মতো ভেঙে পড়বে।...

সে সরাসরি কাজের প্রসঙ্গে চলে এলো। জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটা হাতে তুলে নিল।

"পর্‌ফিরি পিত্রোভিচ", সে যে খুব বেশি মাত্রায় বিরক্ত তার কণ্ঠস্বরে সেটা গোপন না থাকলেও স্থির সঙ্কল্প নিয়ে সে শুরু করল, "আপনি গতকাল ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে আমি যেন আপনার এখানে আসি। জানি না , আপনার নাকি জেরা না কী করার আছে।" *জেরা* কথাটার ওপর সে বিশেষ জোর দিল। "আমি তাই এসেছি। আপনার যদি দরকার থাকে তাহলে জিজ্ঞাসাবাদ করুন, নইলে অনুমতি করুন, আমি চলে যাই। আমার সময় নেই, কাজ পড়ে আছে।... ওই যে কেরানিটি গাড়ি চাপা পড়েছিল... যার কথা... আপনি নিজেও জানেন... তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আমাকে উপস্থিত থাকতে হবে," সে যোগ করল, আবার সঙ্গে-সঙ্গে এই কথাটা যোগ করার জন্য নিজের ওপরই সে বিরক্ত হল। ফলে তৎক্ষণাৎ আরও বেড়ে গেল তার বিরক্তির মাত্রা। "এ সবে আমার ঘেন্না ধরে গেছে, শুনছেন? বহুদিন হল ঘেন্না ধরে গেছে। আমার অসুস্থতার কারণও ছিল অংশত এটাই... এককথায়..." অসুস্থতার কথাটা এখানে আরও বেশি অবান্তর হয়ে গেল উপলব্ধি করে সে প্রায় চিৎকার করে উঠল, "এককথায়, দয়া করে হয় আমাকে যা প্রশ্ন করার করুন, নয়ত আমাকে এক্ষুনি ছেড়ে দিন।... আর জেরা যদি করতে হয় তাহলে অন্য কোনভাবে না করে নিয়মমাফিক করুন! নিয়মমাফিক ছাড়া অন্য কোনভাবে আমি বরদাস্ত করব না। তাই, আপাতত, বিদায়, যেহেতু আমাদের দুজনায় মিলে করার মতো কোন কাজ নেই।"

"আরে ছি ছি! এ আপনি কী বলছেন! আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যাব কোন্ দুঃখে?" তৎক্ষণাৎ কথার সুর আর মুখের ভঙ্গি পালটে ফেলে, পলকের মধ্যে হাসি থামিয়ে হঠাৎ হাঁ হাঁ করে উঠল। "না না, চিন্তা করবেন না, দোহাই আপনার, চিন্তা করবেন না," ফের ঘরময় ছোটাছুটি করতে-করতে, আবার পরক্ষণেই হঠাৎ রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে ফের চেয়ারে বসানোর চেষ্টা করতে-করতে ব্যস্তসমস্ত হয়ে সে বলল। "সে সময় পাওয়া যাবেখন, সে সময় পাওয়া যাবেখন। এ সবই তুচ্ছ! বরং বলব আপনি যে শেষপর্যন্ত আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তার জন্য আমি খুব খুশি।... আমি আপনাকে অতিথি হিসেবে গ্রহণ করছি। আমার এই বেয়াড়া হাসিটার জন্য, রোদিওন রমানোভিচ, দোহাই আপনার, মশাই, নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন। রোদিওন রমানোভিচ? আপনার পুরো নামটা ঠিক বলছি তো?... আমার আবার একটু স্নায়ুর গোলমাল আছে। আপনার রসিকতাটা বড় বেশি ধারাল, তাইতে আমার হাসি পেয়ে গিয়েছিল। কখন-কখন, সত্যি বলতে গেলে কি, আধঘণ্টা, এমনকি তারও বেশি সময় ধরে এমন কাঁপুনি চলতে থাকে।... বড় সহজে হাসি পেয়ে যায়, জানেন? আমার শরীরের যা অবস্থা তাতে ভয় হয় পক্ষাঘাত না হয়ে যায়। আরে ও কি! বসুন না! দোহাই আপনার! না হলে কিন্তু ভাবব আপনি রাগ করেছেন।..."

রাস্‌কোল্‌নিকভ চুপ করে রইল। তখনও রাগে-উত্তেজনায় মুখ গোমড়া করে সে তাকে লক্ষ করতে লাগল, তার কথা শুনে যেতে লাগল। বসল. তবে টুপিটা হাতেই ধরে রইল।

"আমার নিজের সম্পর্কে, আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলতে যা বোঝায় তার ব্যাখ্যাস্বরূপ আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই, রোদিওন রমানোভিচ," ঘরের মধ্যে ছটফট করে ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে এবং আগের মতোই যেন অতিথির সঙ্গে চোখাচোখি এড়িয়ে পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ বলে চলল। "দেখুন, আমি বিয়ে-থা করিনি, আমি একজন অসামাজিক ও অজ্ঞাতপরিচয় লোক, তাছাড়া আমার যতদূর যা হওয়া সম্ভব হয়ে গেছে। আমি এখন স্থবিরতার পর্যায়ে চলে এসেছি, ঝড়তির দিকে। এবং ... এবং ... হ্যাঁ, আপনি লক্ষ করেছেন কি রোদিওন রমানোভিচ. আমাদের এখানে, আমাদের এই রাশিয়ায়, আরও বেশি করে আমাদের সেন্ট পিটার্সবুর্গের সামাজিক মহলগুলোতে, নিজেদের মধ্যে খুব একটা বেশি আলাপ-পরিচয় যাদের নেই, অথচ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা বলতে যা বোঝায় তা যাদের আছে এমন দুজন মানুষ— এই যেমন এখন আমরা দুজন... যখন একসঙ্গে এসে মেলে, তখন পুরো আধঘণ্টার মধ্যেও কোনমতে কথাবার্তার কোন বিষয় খুঁজে পায় না— একে অন্যের সামনে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকে, একজনের উপস্থিতি অন্যজনকে বিব্রত করে তোলে। আলাপের বিষয় সকলেরই আছে... এই ধরুন না কেন, মহিলাদের আছে... ধরুন, আদব-কায়দাদুরস্ত লোকজন, সমাজের উঁচু মহলের লোকজন— তাদেরও সবসময় আলোচনার মতো কিছু না কিছু বিষয় আছে, C'est de riguneur— এটাই প্রচলিত নিয়ম। অথচ দেখুন, আমাদের মতো মাঝারি ধরনের লোক যারা তারা সবাই যেন কেমন গোলমেলে, মুখচোরা স্বভাবের... অর্থাৎ যারা ভাবনাচিন্তা করে তাদের কথা বলছি আর কি। এর কারণ কী বলতে পারেন মশাই? সামাজিক কোন বিষয়ে কোন আগ্রহ নেই, নাকি আমরা বড় বেশি সৎ এবং একে অন্যকে ধোঁকা দেবার কোন ইচ্ছে আমাদের নেই? —জানি না। তাই কি? আপনার কী ধারণা? আরে টুপিটা তো হাত থেকে নামিয়ে রাখুন! যেন পালই-পালাই ভাব। সত্যি বলছি, বড় দৃষ্টিকটু।... আমি বরং বলব... আমার কিন্তু খুব ভালো লাগছে আপনাকে দেখে।"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ টুপিটা নামিয়ে রাখল। চুপচাপ, বেশ গুরুত্ব দিয়ে গম্ভীর মুখে শুনে যেতে লাগল পর্‌ফিরির ছাড়া-ছাড়া ফাঁকা বুলি। মনে-মনে ভাবল, 'লোকটা আসলে চায় কী? সত্যিই কি নিজের ওই বোকা-বোকা বোলচাল দিয়ে আমাকে অন্যমনস্ক করে দেবার মতলব?'

"কফি দিয়ে আপনাকে আপ্যায়ন করতে পারছি না। ...এটা সে জায়গা নয়। তবে বন্ধুস্থানীয় একজন লোকের সঙ্গে মিনিটপাঁচেক বসার আনন্দ উপভোগে কী আপত্তি থাকতে পারে?" পর্‌ফিরির মুখে অবিরাম কথার খই ফুটতে লাগল। "জানেন, এইসব

অফিসের কাজকর্ম, দায়দায়িত্ব... ভালো কথা, আমি এই যে সামনে-পেছনে সমানে পায়চারি করে চলেছি এর জন্য কিন্তু কিছু মনে করবেন না মশাই। মাফ করবেন মশাই, আমার বড় ভয়, পাছে আপনি রাগ করেন। কিন্তু কী করি বলুন? মুভমেন্ট আমার একান্ত দরকার। সর্বক্ষণ বসে থাকি। মিনিটপাঁচেক হাঁটাচলা করতে পারলে কী ভালোই যে লাগে!... অর্শের ব্যথা আছে কিনা আবার।... ব্যায়াম চর্চা করে সারাব বলে অনেকদিন ধরে ভাবছি। শুনছি রোগ সারানোর ব্যায়ামাগারগুলোতে নাকি রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের —সত্যিকার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ভারি আগ্রহ। এমনকি প্রিভি কাউন্সিলারদেরও নাকি মহা উৎসাহে স্কিপিং করতে দেখা যায়। আমাদের যুগে বিজ্ঞানের কী মহিমা ভেবে দেখুন একবার!... আর হ্যাঁ আমার এখানকার দায়দায়িত্ব, জেরা এবং যত সব আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম সম্পর্কে বলতে গেলে... এই যে মশাই, আপনি নিজেই এখনই জেরার প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেন।... তাহলে জেনে রাখুন মশাই, সত্যি করে বলছি রোদিওন রমানোভিচ, এসব জেরার সময় কখন-কখন যাকে জেরা করা হচ্ছে, তার চেয়ে যে লোক জেরা করছে তার নিজেরই মাথা বেশি গুলিয়ে যায়।... এই নিয়ে এখনই আপনি যে সরস মন্তব্যটা করলেন তা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত বটে। (প্রসঙ্গত, রাস্‌কোল্‌নিকভ এ ধরনের কোন মন্তব্যই করেনি।) হ্যাঁ সব তালগোল পাকিয়ে যায় মশাই। সত্যি, পাকিয়ে যায়! তাছাড়া সেই একই চর্বিত-চর্বণ, একঘেয়ে, ঢাকের বাদ্যির মতো! অবশ্য একটা বড়রকমের সংস্কার এখন হতে চলেছে। তাতে লাভের মধ্যে লাভ হবে এই যে আমাদের পদের নামগুলো পালটাবে।... হে- হে- হে! আর ওই আমাদের আইনের প্যাঁচঘোঁচ সম্পর্কে আপনি যে মোক্ষম রসিকতাটা করেছেন না দাদা, তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। আচ্ছা বলুন দেখি, বিচারাধীন আসামীদের মধ্যে এমন কে আছে— এমনকি সে যদি একজন ডাহা মূর্খ চাষাভুষো শ্রেণীর লোকও হয়— যার ধরুন কিনা, জানা নেই যে প্রথমে শুরু করা হবে অবান্তর প্রশ্ন তুলে সতর্কতাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে... প্রসঙ্গত কথাটা বড় মোক্ষম বলেছেন আপনি... তারপর হঠাৎ আচমকা মাথার ঠিক চাঁদিতে কুড়ুলের ভোঁতা দিকটা দিয়ে ঝপ করে বসিয়ে দেবে এক ঘা। হে- হে- হে! ঠিক কিনা মাথার চাঁদিতে... আহা কী দারুণ উপমা আপনার! হে - হে- ! তা আপনি কি সত্যি-সত্যি ভেবেছিলেন যে আমি ফ্ল্যাট দিয়ে শুরু করে আসলে চেয়েছিলাম আপনাকে... হে - হে ! বড় রসিক লোক তো আপনি! যাক গে, আর বলব না বাপু। ও হ্যাঁ, প্রসঙ্গত, কথার পিঠে কথা এসে যায়, একটা চিন্তার সূত্রে চলে আসে আরেকটা চিন্তা। জানেন, এইমাত্র কিছুক্ষণ আগে আপনিও জেরা প্রসঙ্গে আনুষ্ঠানিক বিধির উল্লেখ করলেন না... তা আমি বলি কি, কী হবে আনুষ্ঠানিকতা দিয়ে! ওসব বাহ্য নিয়মকানুন, বুঝলেন কিনা, বহু ক্ষেত্রেই একেবারে অর্থহীন। কোন-কোন সময় বন্ধুভাবে গল্পগুজব করে অনেক বেশি লাভ হয়। আনুষ্ঠানিক নিয়মকানুন সে তো হাতের পাঁচ রয়েই গেল। যদি আজ্ঞা হয় তো

বলি, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। তাছাড়া আনুষ্ঠানিক বিধি আসলে কী?— আমি আপনাকে জিগ্গেস করছি। ও দিয়ে তদন্তকারীকে প্রতি পদে বেঁধে রাখা ঠিক নয়। একজন তদন্তকারীর কাজ হল, যাকে বলে একধরনের স্বাধীন শিল্প, নিজস্ব রীতির বা ওইগোছের কিছু... হে - হে হে!..."

পর্ফিরি পেত্রোভিচ দম নেবার জন্য মিনিটখানেক থামল। সে অবিরাম অক্লান্তভাবে বর্ষণ করে চলছিল অর্থহীন ফাঁকা বুলি। কখন বা হঠাৎ-হঠাৎ ছাড়ছিল দু-একটা হেঁয়ালি আবার পরক্ষণেই খেই হারিয়ে আজেবাজে বকতে শুরু করছিল। ঘরের মধ্যে সে ইতিমধ্যে বলতে গেলে প্রায় ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। মেদবহুল দুই পায়ের গতি ক্রমে দ্রুত হয়ে উঠছে । তার দু-চোখের দৃষ্টি মাটির দিকে, ডান হাতটা পেছনে, বাঁ হাত অনবরত নাড়িয়ে নানারকম ভঙ্গি করে চলেছে। আশ্চর্য এই যে কোনবারই তার কথার সঙ্গে সেসব ভঙ্গির কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাস্কোল্নিকভ্ হঠাৎ লক্ষ করল ঘরের মধ্যে দাপিয়ে বেড়ানোর সময় বারদুয়েক কেন যেন মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কান পেতে কী যেন শোনার চেষ্টা করল।... কোন কিছুর অপেক্ষায় আছে না কী লোকটা?'

"হ্যাঁ এ ব্যাপারে আপনি ঠিক বলেছেন, আপনার কথাই ঠিক," অসাধারণ সাদাসিধে ভাব দেখিয়ে, খুশি হয়ে রাস্কোল্নিকভের দিকে চেয়ে পর্ফিরি যেভাবে আবাব তেড়েফুঁড়ে শুরু করে দিল তাতে রাস্কোল্নিকভ্ চমকে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে একটা কিছুর মোকাবিলা করার জন্য মনে-মনে তৈরি হয়ে নিল। "হ্যাঁ আপনি ঠিকই করেছেন আমাদের আইনশাস্ত্রের বিধান নিয়ে অমন ধরাল তামাশা করে, হে - হে!" হাসতে-হাসতে সে বলল। "আর জানেন, আমাদের এই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক কলাকৌশলগুলো... মানে, তাদের কতকগুলো আর কি... রীতিমতো হাস্যকর, এমনকি সম্ভবত অপ্রয়োজনীয়ও বটে, অন্তত সেসমস্ত ক্ষেত্রে যেখানে আনুষ্ঠানিকতার ফলে অত্যন্ত সঙ্কুচিত। হ্যাঁ, আবার আমি সেই আনুষ্ঠানিকতার প্রসঙ্গেই আসছি: ধরুন না কেন, আমি কোন একজনকে... একে, ওকে, তাকে— যাকেই হোক না কেন, আমার ওপরে ভার দেওয়া কোন এক মামলার অপরাধী বলে শনাক্ত করছি... আরও ভালো কথায় বলতে গেলে, সন্দেহ করছি।... আপনি তো ল' পড়ছেন রোদিওন রমানোভিচ, তাই না?"

"হ্যাঁ পড়ছিলাম।..."

"তা হলে, বলতে গেলে এই হল ভবিষ্যতের জন্যে আপনার একটা ছোটখাটো দৃষ্টান্ত।... অবশ্য ভাববেন না যে আমি আপনাকে শেখাতে যাচ্ছি— সে ধৃষ্টতা আমার নেই। ওরে ব্বাস্, অপরাধ সম্পর্কে যা সব প্রবন্ধ কাগজে ছাপাচ্ছেন! না, আমি এই এমনি ঘটনার আকারে একটা ছোটখাটো দৃষ্টান্ত আপনার সামনে সাহস করে উপস্থিত করছি মাত্র। হ্যাঁ যা বলছিলাম, ধরুন একে, ওকে, তাকে— যাকেই হোক না কেন,

আমি অপরাধী বলে ধরে নিয়েছি, কিন্তু প্রশ্ন হল এই যে তার বিরুদ্ধে আমার সাক্ষ্যপ্রমাণ যদি থাকেও তবু ঠিক সময়ের আগে তাকে আমি ঘাঁটাতে যাব কেন? একজনকে ধরুন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রেপ্তার করা আমার কর্তব্য! আবার আরেকজন হয়ত ঠিক সেই চরিত্রের নয়— তাই না? তাহলে শহরে একটু-আধটু ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা তাকে না দেবার কী আছে? হাঃ- হাঃ! না আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। তাহলে আরেকটু স্পষ্ট করে বলি: ধরুন, আমি বড় বেশি আগে লোকটাকে হাজতে পুরলাম, তাতে ফল হবে সম্ভবত এই যে যাকে নৈতিক সমর্থন বলে অনেকটা তা-ই তাকে দিয়ে বসব। হাঃ- হাঃ! আপনি হাসছেন?'' —যদিও হাসার চিন্তা রাস্‌কোল্‌নিকভের মনে একবারও উদয় হয়নি— ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসে থেকে বিস্ফারিত স্থির দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে ছিল পর্‌ফিরি পেত্রোভিচের দিকে। সেদিকে আমল না দিয়ে সে বলে চলল: তবে হ্যাঁ, এটা শুধু ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কেননা মানুষ বহু বিচিত্র ধরনের হতে পারে। তাই সব কিছুর ওপরে একমাত্র ব্যবহারিক জ্ঞানকেই স্থান দিতে হয়। এখন আপনি হয়ত প্রশ্ন তুলবেন: তাহলে সাক্ষ্যপ্রমাণ? ভালো কথা, ধরুন সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে, কিন্তু দাদা, সাক্ষ্যপ্রমাণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শাঁখের করাতের মতো, আর আমি হলেম গিয়ে একজন তদন্তকারী, দুর্বল মানুষ, হ্যাঁ, তা স্বীকার করতেই হবে আমাকে। গণিতের নিয়ম বলতে যা বোঝায় পরিষ্কার সেই নিয়মে আমি তদন্ত পরিচালনা করতে চাই, আমি চাই এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ যাতে দুয়ে-দুয়ে চার হয়! সরাসরি অকাট্য প্রমাণের মতো যাতে হয়! অথচ দেখুন, ভুল সময়ে যদি তাকে হাজতে পুরি— এমনকি যদি আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে থাকে যে এ-ই *সেই*— তাহলে তো ভবিষ্যতে তার স্বরূপ আরও প্রকট করে তোলার যে-সমস্ত উপায় থাকলেও থাকতে পারত তা থেকে আমি নিজেই নিজেকে বঞ্চিত করব। কেন? কারণ এতে করে, বলা যেতে পারে, আমি তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি তার স্থান কোথায়। বলতে পারেন, মনস্তাত্ত্বিকভাবে আমি তার স্থান নির্ধারণ করে ফেলছি, তার মনকে স্থির হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছি। সে তখন আমার হাতছাড়া হয়ে খোলসের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেবে— অবশেষে বুঝতে পারবে সে একজন কয়েদি। শোনা যায় এই তো সম্প্রতি সেভাস্তোপোলে, আল্‌মা নদীর লড়াইয়ে রুশ সেনাবাহিনীর পরাজয়ের ঠিক পর-পর বুদ্ধিমান লোকেরা নাকি দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল, এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে তারা ভেবেছিল এই বুঝি শত্রুবাহিনী সরাসরি আক্রমণে নেমে সঙ্গে-সঙ্গে সেভাস্তোপোল দখল করে ফেলবে। কিন্তু যেই দেখতে পেল শত্রুপক্ষ নিয়মিত অবরোধ করাই শ্রেয় বিবেচনা করে ট্রেঞ্চের প্রথম সারি খুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে, অমনি বুদ্ধিমান লোকদের আনন্দ দেখে কে! শোনা যায়, তারা নাকি এতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। অর্থাৎ, অন্তত মাসদুয়েক তো টানা যাবেই! মানে, বুঝতেই পারছেন, নিয়মিত পর্যায়ের অবরোধ তৈরি করে

দখল করা কতদিনের মামলা হতে পারে। আবার হাসছেন, এবারেও বিশ্বাস করছেন না? অবশ্য হ্যাঁ, আপনিও ঠিক। হ্যাঁ, আপনিও ঠিক—আমি অস্বীকার করছি না। এ সবই হল বিশেষ-বিশেষ ঘটনা। আমি আপনার সঙ্গে একমত। বর্তমান ক্ষেত্রে, বাস্তবিকই বিশেষ ধরনের! কিন্তু হে মহানুভব রোদিওন রমানোভিচ, এক্ষেত্রে একটা জিনিস লক্ষ করার মতো : দেখুন, গতানুগতিক ঘটনা, সেই ঘটনা, যাকে লক্ষ করে এবং যার ভিত্তিতে আইনশাস্ত্রের সমস্ত আনুষ্ঠানিক নিয়মকানুন গড়ে উঠেছে এবং লিপিবদ্ধও হয়েছে... তার আদৌ কোন অস্তিত্ব নেই। নেই স্রেফ এই কারণে যে কোন মামলা— হোক না তা যে-কোন মামলা, ধরুন না কেন, কোন অপরাধ... যে মুহূর্তে বাস্তবে সংঘটিত হল, অমনি পরিণত হল সম্পূর্ণ এক বিশেষ ঘটনায়। ...সময়-সময় আবার এমনই বিশেষ ঘটনায় যে আগেকার কোন ঘটনার সঙ্গে তার এতটুকু মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এই জাতীয় রীতিমতো কিছু হাসির ঘটনাও সময়-সময় ঘটে থাকে। এখন ধরুন, কোন ভদ্রলোককে আমি তার নিজের মনে থাকতে দিলাম. আমি তাকে ধরলাম না, ঘাঁটালাম না, কিন্তু সে যদি জানতে পারে অথবা অন্ততপক্ষে প্রতি ঘণ্টায়, প্রতিটি মিনিটে তার মনে এই সন্দেহ উঁকি মারতে থাকে যে আমি সব জানি, খুঁটিনাটি কিছুই আমার জানতে বাকি নেই, দিন-রাত আমি তার ওপর নজর রাখছি, সজাগ দৃষ্টি রাখছি এবং তাকে যদি আমি সন্দেহ ও আতঙ্কের মধ্যে অবিরাম সচেতন রেখে দিতে পারি, তাহলে হলফ করে বলতে পারি সে তার মাথা ঠিক রাখতে পারবে না। সত্যি বলছি, নিজে থেকে আমার কাছে আসবে এবং হয়ত এমন কাণ্ড করে বসবে যার ফলে দুয়ে-দুয়ে ঠিক মিলে যাবে, গণিতশাস্ত্রের আদল যাকে বলে তাই পাওয়া যাবে। এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে। এটা গণ্ডমূর্খ চাষাভুষোর ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে আর আমাদের গোত্রের যারা লোক...আজকালকার বুদ্ধিমান মানুষ...পরন্তু তাদের মধ্যে যাদের আবার বিশেষ দিকে বিকাশের-ঝোঁক আছে তাদের তো কোন কথাই নেই! কারণ, বুঝলেন কিনা ভাই, যে জিনিসটার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি তা হল কোন মানুষের চরিত্র ঠিক কোন দিকে বিকশিত তা বুঝতে পারা। আর হ্যাঁ, নার্ভ। নার্ভের কথাটা কি একেবারে ভুলে গেলেন নাকি! জানেন, আজকাল সেগুলো সব অসুস্থ, নড়বড়ে আর খিটখিটে। তাছাড়া তিক্ততা! ওদের সকলের মধ্যেই তিক্ততা, জ্বালাযন্ত্রণা যে কতখানি, কী বলব! আর এটা, আমি আপনাকে বলে রাখছি, এক্ষেত্রে লোকটার কাছে ঘানিটানার সমানই কষ্টকর হতে পারে। তাই সে যদি স্বচ্ছন্দে শহরে ঘুরে বেড়ায় তাতে আমার মাথাব্যথা হতে যাবে কেন? আপাতত কিছুদিন ঘুরে বেড়াক না! তাতে ক্ষতি কী? আমি তো অমনিতেই জানি যে লোকটা আমার শিকার, আমার কাছ থেকে তার পালানোর কোন উপায় নেই! যাবেই বা কোথায়, শুনি? হে-হে! বিদেশে পালিয়ে যাবে নাকি? বিদেশে পালিয়ে যেতে পারে একজন পোল। এর সে সাধ্যি নেই, বিশেষত আমি যখন নজর রেখেছি এবং ব্যবস্থাও নিয়েছি। দেশের

একেবারে ভেতরে কোথাও ডুব দেবে? কিন্তু সেখানে তো থাকে চাষাভুষো লোকজন, সত্যিকার গেঁয়ো রুশীরা। এদিকে আজকের শিক্ষিত লোকেরা বরং জেলে যাবে তাও ভালো, আমাদের চাষাভুষোদের মতো বিদেশিদের সঙ্গে কক্ষণও বসবাস করতে যাবে না। হাঃ-হাঃ! যাক গে, এসব বাজে কথা, এহ্ বাহ্য। পালিয়ে যাবে মানে? এটা একটা কথার কথা? আসল কথা কিন্তু এটা নয়। আসলে পালিয়ে যাবার কোন জায়গা নেই—একমাত্র এই কারণে নয় যে আমার কাছ থেকে সে পালাতে পারবে না। আমার কাছ থেকে পালানোর মতো *মনের অবস্থাই* তার থাকবে না। হে-হে! কী মোক্ষম কথা! কী বলেন, অ্যাঁ? প্রকৃতির নিয়মেই সে আমার কাছ থেকে পালাতে পারবে না—এমনকি পালানোর উপযুক্ত কোন জায়গা থাকলেও না। প্রদীপের সামনে পতঙ্গ দেখেছেন তো? তা এও সেই প্রদীপের চারধারে পতঙ্গের ওড়ার মতো। আমাকে ঘিরে পাক খেতে থাকবে, সমানেই পাক খেতে থাকবে। স্বাধীনতা তখন তার বিস্বাদ লাগবে, সে তখন ভাবতে বসবে, তার সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যেতে থাকবে। নিজের জালে সে নিজেই জড়িয়ে পড়বে, দুশ্চিন্তায় তিলে-তিলে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে!...শুধু কি তাই? নিজেই হয়ত আমাকে দুয়ে-দুয়ে চার গোছের গণিতশাস্ত্রসম্মত কোন প্রমাণ দিয়ে বসবে—আমি ওকে একটু বেশি মাত্রায় অবসর দিলেই হল। পাক ওকে খেতে হবে, ওকে সমানে পাক খেতে হবে আমাকে ঘিরে, আর পাক খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমেই ছোট হয়ে আসতে থাকবে বৃত্তটা। তারপর একসময়—ঝপাং! সোজা উড়ে এসে পড়বে আমার মুখবিবরে, আমি সঙ্গে-সঙ্গে ওকে কপ্ করে গিলে ফেলব! ওঃ কী পরিতৃপ্তি! হাঃ-হাঃ-হাঃ! আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ জবাব দিল না। স্থাণু হয়ে পাণ্ডুর মুখে বসে রইল। আগের মতোই উৎকণ্ঠাভরে নিরীক্ষণ করতে লাগল পর্‌ফিরির মুখ!

'শিক্ষাটা ভালোই!' আতঙ্কে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে সে মনে-মনে ভাবল। 'এখন কিন্তু আর গতকালের মতো শিকারি বিড়ালের ইঁদুর নিয়ে খেলার পর্যায়ে থাকছে না। মিছিমিছি তো আর আমাকে নিজের শক্তির পরিচয় দিচ্ছে না এবং...তার ইঙ্গিতও দিচ্ছে না। ও আরও অনেক বেশি বুদ্ধি ধরে! ...এখানে উদ্দেশ্যটা অন্য। কিন্তু কী হতে পারে? হুঁ হুঁ ভায়া, ওসব বাজে মতলব ছাড়। আমাকে ভয় দেখানো, আমার ওপরে চালাকি খাটানোর চেষ্টা! না, তোমার হাতে কোন প্রমাণ নেই, গতকালের সেই লোকটারও কোন অস্তিত্ব নেই! তুমি স্রেফ আমাকে গুলিয়ে দিতে চাও, তুমি আমাকে আগে থাকতে চটিয়ে দিয়ে ওই অবস্থায় ঝপ্ করে ফাঁদের ডালা বন্ধ করতে চাও। কিন্তু না, তা হবার নয়। তোমার ওই কৌশল বানচাল হয়ে যাবে, বানচাল হয়ে যাবে। ...কিন্তু কেন, কেন আমাকে এতদূর ইঙ্গিত দেওয়া? আমার দুর্বল নার্ভের ভরসায় কি? না ভাই, এটা খাটবে না, বানচাল হয়ে যাবে, তুমি যতই মতলব আঁট না কেন। ...আচ্ছা দেখাই যাক না হয় তোমার আসল মতলবটা কী।'

এই ভেবে সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে এক ভয়ঙ্কর ও অজ্ঞাত বিপর্যয়ের মোকাবিলা করার জন্য সে তৈরি হল। সময়-সময় তার ইচ্ছে হচ্ছিল পর্‌ফিরির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সঙ্গে-সঙ্গে তার টুটি টিপে ধরে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ এখানে ঢোকার সময়ই এই ক্রোধের কথা ভেবে ভয় পাচ্ছিল। সে অনুভব করতে পারছিল তার ঠোঁট শুকিয়ে আসছে, বুক ধড়ফড় করছে, ঠোঁটের ধারে ফেনা জমে উঠেছে। তবু সে ঠিক করল আপাতত চুপচাপ থাকবে, একটি কথাও মুখ থেকে খসাবে না। সে বুঝতে পারল তার এই অবস্থায় এটাই সবচেয়ে ভালো কৌশল, কেননা এর ফলে মুখ ফসকে কিছু বলার সম্ভাবনা তো থাকছেই না উলটে শত্রু নিজেই এই নীরবতায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবে এবং চটেমটে হয়ত ওর কাছেই বেফাঁস কোন কথা বলে বসবে। অন্তত এটাই সে আশা করছিল।

"না, আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না। আপনি শুধু ভাবছেন যে আমি আপনাকে কতকগুলো নির্দোষ মজার-মজার কথা বলে যাচ্ছি," খুশির মাত্রাটা আরও চড়িয়ে অবিরাম খুক-খুক করে পরিতৃপ্তির চাপা হাসি হাসতে-হাসতে আবারও ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে পর্‌ফিরি বলে চলল। "আপনি অবশ্য ঠিকই ধরেছেন। এমনকি স্বয়ং ভগবান আমার এমনই একটা চেহারা দিয়েছেন যে লোকের মনে হাসির চিন্তার উদ্রেক করে। যেন আমি একটা ভাঁড়। কিন্তু আমি আপনাকে যা বলব শুনে রাখুন এবং দরকার হলে আবারও বলব—হ্যাঁ গো, দাদা আমার, রোদিওন রমানোভিচ, আমাকে, এই বুড়ো লোকটাকে ক্ষমাঘেন্না করে দেবেন।...আপনি এখনও যুবক, বলতে গেলে সবে যৌবনে পদার্পণ করেছেন, তাই আর সব যুবকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আপনিও মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে সবচেয়ে বেশি দাম দিয়ে থাকেন। ক্ষুরধার বুদ্ধির মারপ্যাঁচ এবং তত্ত্বসর্বস্ব যুক্তিতর্ক আপনাকে প্রলুব্ধ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঠিক যেন অস্ট্রিয়ার পূর্বতন সামরিক পরিষদ হফ্‌ক্রিগস্রাঠ—মানে, যুদ্ধের ব্যাপার-স্যাপার আমার ক্ষুদ্র বিচারবুদ্ধিতে আমি যতটা বুঝি আর কি! অর্থাৎ, কাগজপত্রে তারা নেপোলিয়ানের বাহিনীকে গুঁড়িয়ে দিয়ে খোদ নেপোলিয়নকে বন্দিও করে ফেলেছে—ওরা ওদের অফিসঘরে বসে-বসে পরম বিজ্ঞের মতো সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ ও চুলচেরা বিচার করে কী পরিকল্পনাটাই না ফেঁদেছিল! কিন্তু কাজের বেলায় দেখা গেল ওদের ফিল্‌ড মার্শাল কার্ল মাক্‌ ফরাসী সেনাবাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে সসৈন্যে নেপোলিয়নের কাছে আত্মসমর্পণ করছেন! হাঃ-হাঃ-হাঃ! উঁহু ভায়া, রোদিওন রমানোভিচ, আমি দেখতে পাচ্ছি, ঠিক দেখতে পাচ্ছি যে আমি একজন অসামরিক লোক হয়ে বেছে-বেছে সামরিক ইতিহাস থেকে যাবতীয় নজির দিচ্ছি বলে আপনি মনে-মনে আমাকে উপহাস করছেন। কী আর করা যাবে বলুন? ওটা আমার দুর্বলতা। যুদ্ধের ব্যাপার-স্যাপার আমি পছন্দ করি, আর মিলিটারি রিপোর্টগুলো পড়তে যা ভালোবাসি...আমার কর্মক্ষেত্র নির্বাচনে যে ভুল হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সত্যি বলতে গেলে কি, আমার উচিত ছিল মিলিটারিতে যাওয়া। নেপোলিয়ন হয়ত হতাম না, কিন্তু মেজর তো হতামই। হে-হে-হে! তা সে যাই হোক, বন্ধু আমার, এখন আমি আপনাকে আপনার ওই ব্যাপারে, অর্থাৎ কিনা, *সেই বিশেষ ঘটনা* সম্পর্কে সব সত্যি কথা বিস্তারিত বলব। বাস্তবতা আর প্রকৃতি, বুঝলেন কিনা মশাই, খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। কখন-কখন নিঁখুত সাজানো পরিকল্পনা পর্যন্ত এমন ভেস্তে দেয় না যে কী বলব! আহা, বুড়ো মানুষের কথাটা একবার শুনুনই না, আমি বেশ গুরুত্ব দিয়েই বলছি রোদিওন রমানোভিচ...'' যদিও পরফিরি পেত্রোভিচের বয়স পঁয়ত্রিশ হবে কি হবে না, তবু কথাগুলো বলতে-বলতে হঠাৎ যেন সত্যি-সত্যি তার বয়স দস্তুরমতো বেড়ে গেল। এমনকি তার কণ্ঠস্বর পালটে গেল, সর্বাঙ্গ যেন কুঁকড়ে গেল। সে বলল, ''তাছাড়া আমি খোলা মনের মানুষ।... খোলা মনের কিনা বলুন? আপনার কী মনে হয়? আমার তো মনে হয়, পুরোমাত্রায়। মনে রাখবেন, এসব তথ্য আমি আপনাকে অমনি-অমনি জানাচ্ছি, এর জন্যে কোন পারিশ্রমিক দাবি করছি না। হে-হে! তা যাই হোক, বলে যাই, শুনুন : উপস্থিতবুদ্ধি জিনিসটা, আমার মতে, খাসা!—বলা যেতে পারে, মানবপ্রকৃতির অলঙ্কারবিশেষ, মানবজীবনের সান্ত্বনা। কিন্তু দেখুন, আমার তো মনে হয় সময়-সময় তা প্রহেলিকা সৃষ্টি করতে পারে। সেক্ষেত্রে, বলুন দেখি, কোন হতভাগ্য তদন্তকারীর পক্ষে কীভাবে সম্ভব রহস্যের তল খুঁজে পাওয়া?—বিশেষত তার নিজের কল্পনাই যখন তাকে বিপথে চালিত করে? এটা আকছার ঘটে থাকে, যেহেতু তদন্তকারীও একজন মানুষ! কিন্তু যত গোলমাল তো এখানেই যে অপরাধীর প্রকৃতিই হতভাগ্য তদন্তকারীর উদ্ধারে এগিয়ে আসে। নিজের উপস্থিত বুদ্ধিতে মশগুল যে যুবক, যাকে আপনি বেশ বুদ্ধি করে, দারুণ চালাকি খাটিয়ে 'যে কোন বাধা অতিক্রমের' উপযুক্ত বলে চিহ্নিত করেছেন, সে এই নিয়ে এতটুকু ভাববে না। ধরুন ডাইনে বাঁয়ে মিথ্যে বলে যাবে সে।... মানে আমাদের সেই লোকটি... *সেই বিশেষ ঘটনার* কথা বলছি। হ্যাঁ আমাদের সেই আত্মপরিচয় গোপনকারীটি। মিথ্যে সে বলবেও চমৎকার, দারুন চালাকি খাটিয়ে। সেই মুহূর্তে তার মনে হতে পারে আর কি—জিতে তো গেছিই! সে তখন তার প্রখর বুদ্ধিবৃত্তির ফল উপভোগ করতে যাবে—এমন সময় পতন ও মূর্চ্ছা! আর মূর্চ্ছা যাবি তো যা যতদূর দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো গোলমেলে জায়গা হতে পারে ঠিক সেইখানটায়। ওটা না হয় ধরে নিলাম একটা রোগ। সময়-সময় ঘরের ভেতরটাও গুমোট হয়ে থাকে বটে! তবু, যাই বলুন না কেন, চিন্তার বিষয়! মিথ্যে সে যেভাবে বলল তার কোন তুলনা হয় না। কিন্তু নিজের স্বভাবের দিকটা সে একবারও ভেবে দেখল না। এখানেই তো যত গোলমাল। আরেকবার নিজের বুদ্ধির খেলায় নিজেই মশগুল হয়ে গিয়ে যে লোক তাকে সন্দেহ করছে তাকেই বোকা বানাতে গেল, ইচ্ছে করে স্রেফ মজা করে ফেকাসে হয়ে গেল। ফেকাসে হয়েও যায় বড় *বেশি স্বাভাবিক রকম,*

দেখতে হয় বড় বেশি বাস্তব। কিন্তু তাহলে কী হবে, আবারও যুগিয়ে দিল চিন্তার খোরাক! প্রথমবার সে ধোঁকা দিয়ে পার পেলেও পেতে পারে, কিন্তু ওই লোকটাও তো সারা রাত শুয়ে-শুয়ে ভালো করে ভাবনাচিন্তার অবকাশ পাবে, যেহেতু সে নিজেও নেহাত বোকা নয়। তা প্রতি পদক্ষেপে এরকমই হতে থাকবে! সেটাই কি সব? নিজে আগে-আগে দৌড়তে শুরু করবে, অযাচিতভাবে যেখানে-সেখানে নাক গলাতে থাকবে, যে-সব বিষয় সম্পর্কে তার চুপ করে থাকা ভালো ছিল সেগুলো নিয়ে সমানে বকতে শুরু করবে, ঠারে-ঠোরে রূপকের ছলে নানা কথা বলবে। হে-হে! নিজেই এসে জিগ্‌গেস করবে : এতদিন হয়ে গেল আমাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন? হাঃ-হাঃ-হাঃ! এটা কিন্তু অতি বুদ্ধিমান মানুষের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে— এমনকি মনস্তত্ত্ববিদ ও সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রেও! মানুষের স্বভাব হল দর্পণ—হ্যাঁ, রীতিমতো স্বচ্ছ একটা দর্পণ! আয়নায় নিজেকে দেখুন, দেখে মুগ্ধ হোন। ...হ্যাঁ, যা বলছি তাই! আরে, আপনার মুখ অমন ফেকাসে হয়ে গেল কেন রোদিওন রমানোভিচ! আপনার কি গুমোট লাগছে? শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে? জানলাটা খুলে দেব কি?"

"না না, ও নিয়ে চিন্তা করবেন না", রাস্‌কোল্‌নিকভ চিৎকার করে উঠল, তারপর হঠাৎই হো-হো করে হাসতে-হাসতে বলল, "দোহাই আপনার, ও নিয়ে ভাববেন না!"

পর্‌ফিরি তার মুখোমুখি থমকে দাঁড়াল। একটু থেমে সে নিজেও ফেটে পড়ল অট্টহাসিতে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ খাপছাড়াভাবে নিজের পুরোদস্তুর বিকারগ্রস্তের হাসি আচমকা থামিয়ে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

"পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ!" তার পা ঠকঠক করে কাঁপছিল, কোনমতে সে দাঁড়িয়ে ছিল। তবু বেশ জোরে ও পরিষ্কার গলায় সে বলল, "আমি শেষকালে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বুড়ি আর তার বোন লিজাভেতার খুনের ব্যাপারে আপনি সরাসরি আমাকে সন্দেহ করছেন। আমার দিক থেকে আপনাকে জানিয়ে রাখি, এ নিয়ে যা কাণ্ডকারখানা হচ্ছে তাতে অনেকদিন হল আমার ঘেন্না ধরে গেছে। আপনি যদি দেখেন যে আমার বিরুদ্ধে আইনত মামলা দায়ের করা যায় তো করুন। গ্রেপ্তার যদি করতে হয় তো তাই করুন। কিন্তু আমার মুখের ওপর আমাকে নিয়ে উপহাস করবেন, আমাকে যন্ত্রণা দেবেন—এ আমি বরদাস্ত করব না!"

হঠাৎ তার ঠোঁট কেঁপে উঠল, ক্ষ্যাপার মতো আগুন জ্বলে উঠল দুচোখে। তার কণ্ঠস্বর এতক্ষণ সংযত ছিল, কিন্তু এবারে সে গলা চড়াল।

"বরদাস্ত করব না!" টেবিলের ওপর সজোরে ঘুষি মেরে হঠাৎ সে গর্জন করে উঠল। "আপনি শুনছেন, পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ? বরদাস্ত করব না!"

"আহা, ছি ছি! আবার কী শুরু করলেন বলুন তো!" যেন রীতিমতো ঘাবড়ে

গেছে, এমন ভাব করে চেঁচিয়ে বলল পর্ফিরি পেত্রোভিচ। "হায় হায়! এ কী হল রোদিওন রমানোভিচ! লক্ষ্মী দাদা আমার! ভাই আমার! কী হল আপনার?"

"বরদাস্ত করব না!" আরও একবার ফেটে পড়ল রাস্কোল্নিকভ্।

"আহা, আস্তে আস্তে! বাইরের লোকজন শুনতে পেলে ছুটে আসবে যে! তখন তাদের আমরা কী বলব, একবার ভেবে দেখেছেন?" রাস্কোল্নিকভের মুখের কাছে নিজের মুখ নিয়ে এসে আতঙ্কে ফিসফিস করে পর্ফিরি পেত্রোভিচ বলল।

"বরদাস্ত করব না, বরদাস্ত করব না!" যন্ত্রচালিতের মতো আওড়াল রাস্কোল্নিকভ্, তবে এবারে সে নিজেও গলা একেবারে নামিয়ে ফিসফিস করে বলল।

পর্ফিরি দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে জানলা খোলার জন্য ছুটে গেল।

"তাজা হাওয়া খেলুক! একটু জলও দরকার আপনার, ভাই। জল খাওয়া দরকার। এ যে দেখছি হিস্টিরিয়া!" বলে জল আনতে বলার জন্য সে দরজার দিকে ছুটে যাচ্ছিল, এমন সময় ঘরের কোনায় একটি জগে খানিকটা জলের সন্ধান পাওয়া গেল।

"এই যে ভাই, একটু জল মুখে দিন", জগটা নিয়ে ছুটে তার কাছে ফিরে এসে ফিসফিসিয়ে সে বলল। "হয়ত কাজে দেবে।..."

পর্ফিরি পেত্রোভিচের আতঙ্ক, বিশেষত তার সমবেদনার ভাব এতদূর স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল যে রাস্কোল্নিকভ্ চুপ করে গেল। তীব্র কৌতূহল নিয়ে সে তাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। জল অবশ্য সে স্পর্শ করল না।

"রোদিওন রমানোভিচ! লক্ষ্মীটি। এভাবে চললে তো আপনি পাগল হয়ে যাবেন, বিশ্বাস করুন! এঃ হেঃ! আঃ! জলটা খেয়ে নিন দেখি! আরে অন্তত একটু তো খান!"

শেষপর্যন্ত সে জোর করে এক গেলাস জল ওর হাতে ধরিয়ে দিল। রাস্কোল্নিকভ্ যন্ত্রচালিতের মতো জলের গেলাস ঠোঁটের কাছে ওঠাতে যাচ্ছিল, কিন্তু সংবিৎ ফিরে পেয়ে বিতৃষ্ণার সঙ্গে টেবিলে নামিয়ে রাখল।

"হ্যাঁ, একটা মূর্ছার ভাব আপনার হয়েছিল বটে! তা বন্ধু অমন করলে তো আপনার পুরোনো রোগটা আবার ফিরে আসবে," বিহ্বল ভাবটা তখনও কেটে না গেলেও বন্ধুর মতোই সমবেদনার সুরে হাঁ হাঁ করে উঠল পর্ফিরি পেত্রোভিচ। "ছি ছি, নিজের প্রতি যত্ন না নিলে হয়? এই তো রাজুমিখিন গতকাল আমার কাছে এসেছিল—আমি মানছি, হ্যাঁ, আমাকে মানতেই হবে যে আমার স্বভাবটা বিশ্রী, খোঁচা দেওয়া আমার অভ্যেস। অথচ দেখুন, এ থেকে কী সিদ্ধান্ত করে বসল!...হা ভগবান! গতকাল এসেছিল, আপনি চলে যাবার পর, আমরা একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলাম। অনর্গল কথা বলে চলল। আমি তো থ। ভাবলাম, এ কী কাণ্ড! আপনি পাঠিয়েছিলেন নাকি? একি! কী হল ভায়া? বসুন, বসুন, ভগবানের দোহাই, উঠবেন না!"

"না, আমি পাঠাইনি! তবে আমি জানতাম যে আপনার কাছে যাচ্ছে এবং কী জন্যে যাচ্ছে তাও জানতাম", তীক্ষ্ণস্বরে জবাব দিল রাস্‌কোল্‌নিকভ।

"জানতেন?"

"জানতাম। কিন্তু তাতে কী?"

"না, শুধু এই আর কি ভাই, রোদিওন রমানোভিচ, আমি যে কেবল আপনার এরকম কীর্তির খবরই রাখি তা মনে করবেন না। আমি আপনার সব খবর রাখি! দেখুন, আমি জানি যে আপনি *ঘর ভাড়া নিতে* গিয়েছিলেন, সন্ধের অন্ধকার নামার পর, রাতের দিকে। আপনি দরজার ঘণ্টি বাজিয়েছিলেন, রক্তের কথা জিগ্‌গেস করেছিলেন, তারপর কাজের লোক আর দারোয়ানদের হতবুদ্ধি করে দিয়েছিলেন। আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি আপনার তখনকার মনের অবস্থাটা...কিন্তু দেখুন, এভাবে চললে তো আপনি নিজেই নিজেকে পাগল বানিয়ে ছাড়বেন...ভগবানের দিব্যি! আপনার মাথা ঘুরে যাবে! প্রবল ঘৃণায়, ক্রোধে আপনি ভয়ঙ্করভাবে ফুঁসছেন। সেটা ন্যায়সঙ্গতও বটে—হ্যাঁ, আপনি যে আঘাত পেয়েছেন তার জন্য... প্রথমে ভাগ্যের কাছ থেকে, তারপর স্থানীয় পুলিসের কাছ থেকে। তাই তো আপনি ছটফট করে এখানে-ওখানে ছুটে বেড়াচ্ছেন, চেষ্টা করছেন যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সকলে মুখ খোলে এবং পরিণামে সঙ্গে-সঙ্গে সবকিছুর অবসান ঘটে। এসব মূর্খামি, এই সন্দেহ আপনাকে নাকাল করে ছাড়ছে। তাই নয় কি? দেখুন, ঠিক ধরেছি কিনা আপনার মনের অবস্থাটা? ...কিন্তু এভাবে আপনি শুধু নিজের নয়, আমাদের রাজুমিখিনের মাথাটাও বিগড়ে দিচ্ছেন। এই কাজের পক্ষে বড় বেশি *ভালোমানুষ* সে— আপনি তা নিজেই জানেন। আপনার যেটা সেটা হল অসুস্থতা, কিন্তু ওরটা ভালোমানুষী, তাই রোগ ওকে সহজে কাবু করে ফেলতে পারে। ...আমি ভাই, আপনাকে, এই আগে একটু শান্ত হয়ে নিন, তারপর সব বলব।...কী হল? বসুন না ভাই, ভগবানের দোহাই! দোহাই আপনার, বিশ্বাস করুন। আপনার এ কী চেহারা হয়েছে! বসুন দেখি।"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বসে পড়ল। তার কাঁপুনির ভাবটা কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু সর্বাঙ্গে সে অনুভব করতে লাগল জ্বরের উত্তাপ। পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ যখন ঘাবড়ে গিয়ে বন্ধুত্বের ভাব দেখিয়ে তার পরিচর্যার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল তখন রাস্‌কোল্‌নিকভ্ দস্তুরমতো অবাক হয়ে উৎকণ্ঠার সঙ্গে শুনতে লাগল তার কথাগুলো। কিন্তু তার একটি কথাও সে বিশ্বাস করতে পারছিল না, যদিও ভেতরে-ভেতরে বিশ্বাস করার একটা অদ্ভুত প্রবণতা অনুভব করছিল। ফ্ল্যাট সম্পর্কে পরফিরি দুম্ করে যে কথাটা বলল তাতে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ সম্পূর্ণ হতবাক হয়ে গেল। 'কী করে সম্ভব? দেখা যাচ্ছে ফ্ল্যাটের ব্যাপারটা জানে, আবার নিজে আমাকে সেকথা বলছেও!' হঠাৎ তার মনে হল।

"হ্যাঁ. প্রায় ঠিক এরকমই একটা মনস্তাত্ত্বিক ঘটনার—মানসিক বিকারের নজির আমাদের আইনের অভিজ্ঞতায় আছে," পর্‌ফিরি তাড়াতাড়ি বলে উঠল। "সে লোকটাও একটা খুনের জন্য নিজেকে দায়ী করে। কী নিখুঁতভাবেই না কাজটা করে। পুরো একটা মনগড়া ছবি তৈরি করে, তথ্য যোগ করে, পরিস্থিতির বর্ণনা দেয়। ...আমাদের সবাইকে একেবারে বিভ্রান্ত ও হতবুদ্ধি করে দেয়। কেন? নেহাতই ঘটনাচক্রে, অনিচ্ছাকৃতভাবে, অংশত সে খুনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল—কিন্তু কেবল অংশতই। যখন সে জানতে পারল যে সে খুনিদের সুযোগ করে দিয়েছে তখন একেবারে মুষড়ে পড়ল, তার বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারে লোপ পেল। সে মনে-মনে নানা দৃশ্য কল্পনা করতে লাগল, দেখতে-দেখতে পুরোপুরি বিগড়ে গেল তার মাথাটা। তার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে আসলে সে নিজেই খুনি! যা হোক, সুপ্রিম কোর্টে শেষপর্যন্ত মামলার নিষ্পত্তি ঘটল। হতভাগ্য লোকটি বেকসুর খালাস পেল, তাকে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে দিয়ে দেওয়া হল। সুপ্রিম কোর্টকে ধন্যবাদ! ইস্! কী দুঃখের কথা বলুন তো! এ আপনি কী করছেন মশাই? এভাবে এরকম হুটহাট উলটোপালটা চিন্তায় আপনার স্নায়ু যদি যখন-তখন উত্তেজিত হয়ে পড়ে, আপনি যদি রাতবিরেতে দরজায়-দরজায় ঘণ্টি বাজিয়ে বেড়ান এবং লোকজনকে ধরে-ধরে রক্তের কথা জিগ্‌গেস করতে থাকেন, তাহলে তো আপনার বায়ু চড়ে যাবে! এসব মনস্তত্ত্ব কিন্তু আমরা কাজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিখেছি! এরকম চিন্তার ফলে কোন-কোন সময় মানুষের মধ্যে জানলা থেকে বা গির্জার ঘণ্টামিনার থেকে ঝাঁপ দেওয়ার প্রবৃত্তি জাগে।... এ ধরনের উপলব্ধি মানুষকে প্রলুব্ধ করে। দরজার ঘণ্টির ক্ষেত্রেও তাই... রোগ, রোদিওন রমানোভিচ, এও একটা রোগ! আপনি আপনার রোগকে অবহেলা করছেন, বড় বেশি অবহেলা করছেন। কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারকে দেখান, আপনার ওই মোটা লোকটাকে দিয়ে কিস্যু হবে না।...আপনার যেটা রোগ তা হল বিকার! স্রেফ বিকারের ঘোরেই আপনি এসব কাণ্ডকারখানা করছেন!..."

পলকের মধ্যে রাস্‌কোল্‌নিকভের চারধারে সবকিছু ঘুরতে শুরু করে দিল।

'এটা কি সম্ভব, সত্যি-সত্যিই কি ও মিথ্যে বলছে? এখনও মিথ্যে বলছে!' বিদ্যুৎচমকের মতো খেলে গেল তার মাথায়। 'না, না, অসম্ভব, অসম্ভব!' এই চিন্তা তাকে কতদূর ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত করে তুলতে পারে আগে থাকতে তা উপলব্ধি করে এবং উত্তেজনার ফলে সে যে পাগলও হয়ে যেতে পারে তা বুঝতে পেরে চিন্তাটাকে সে জোর করে মন থেকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল।

"আমি বিকারগ্রস্ত ছিলাম না, যা করার সজ্ঞানেই করেছি।" নিজের সমস্ত বিচারশক্তি প্রাণপণে প্রয়োগ করে পর্‌ফিরির খেলা অনুধাবনের চেষ্টা করল সে। চিৎকার করে বলল, "সজ্ঞানে করেছি, সজ্ঞানে! শুনছেন?"

"হ্যাঁ, তা বুঝতে পারছি। শুনতেও পাচ্ছি। আপনি গতকালও বলেছিলেন যে

আপনি বিকারগ্রস্ত ছিলেন না। ...এমনকি বিশেষ জোর দিয়েই বলেছিলেন! আপনি যা যা বলতে পারেন সবই আমি বুঝি! আ-হা!..কিন্তু একটা কথা তো·শুনুন, প্রিয় বন্ধু আমার, রোদিওন রমানোভিচ, বিবেচনা করে দেখুন অন্তত এই পরিস্থিতিটা : দেখুন, আপনি যদি সত্যি-সত্যি, বাস্তবিকই দোষী হতেন অথবা ওই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কোনভাবে জড়িত থাকতেন, তাহলে, দয়া করে বলবেন কি, আপনার পক্ষে সম্ভব হত কি নিজেই এমন জোর দিয়ে বলা যে আপনি বিকারগ্রস্ত অবস্থায় ওসব করেননি, বরং করেছেন সম্পূর্ণ সজ্ঞানে, তার ওপরে আবার বিশেষ জোর দিয়ে বলা, অমনভাবে গোঁ ধরে বিশেষ জোর দিয়ে বলা— এটা কি সম্ভব হত? আদৌ সম্ভব হত কি? বলুন! আপনিই বলুন না! না, না, আমার মতে, একেবারে উলটোটা। আপনি যদি অনুভব করতেন যে আপনার কোন দোষ আছে তাহলে আপনি অবশ্যই জোর দিয়ে বলতেন, নির্ঘাত একথাই বলতেন যে সে সময় আপনি বিকারগ্রস্ত ছিলেন। তাই না? ঠিক বলছি কিনা?''

প্রশ্নটার মধ্যে কেমন যেন একটা ধূর্ততার আভাস ছিল। পর্‌ফিরি তার ওপর ঝুঁকে পড়ে হতভম্ব হয়ে চুপচাপ একদৃষ্টে সরাসরি তাকে নিরীক্ষণ করছে দেখে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ চট করে সরে গিয়ে সোফার ঠিক পিঠের সঙ্গে ঘেঁষে রইল।

''তারপর হ্যাঁ, ধরুন না কেন মিস্টার রাজুমিখিনের ব্যাপারটা—অর্থাৎ গতকাল নিজে থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, নাকি আপনার প্ররোচনায়? আপনার ঠিক একথাই বলা সঙ্গত ছিল যে নিজে থেকে এসেছিলেন, আপনার প্ররোচনায় যে এসেছিলেন তা গোপন করতেন! অথচ আপনি তা করছেন না! বরং আপনি জোর দিয়ে এটাই বলছেন যে আপনার প্ররোচনা ছিল।''

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ কিন্তু কখনও জোর দিয়ে একথা বলেনি। তার শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠল।

''আপনি আগাগোড়া মিথ্যে বলে যাচ্ছেন,'' ঠোঁট বাঁকিয়ে কাষ্ঠ হাসি হেসে ধীরে-ধীরে ক্ষীণকণ্ঠে সে বলল। ''আপনি আমাকে আরও একবার দেখাতে চান যে আমার সমস্ত খেলা আপনার কাছে পরিষ্কার, আপনি আগে থাকতে আমার সমস্ত উত্তর জানেন,'' যেভাবে ওজন করে কথা বলা উচিত তা যে সে আর করছে না নিজে এটা প্রায় উপলব্ধি করা সত্ত্বেও সে বলল। ''আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন...অথবা স্রেফ আমাকে নিয়ে উপহাস করছেন...''

বলতে-বলতে আগের মতোই একদৃষ্টে সে তাকিয়ে রইল পর্‌ফিরির দিকে। হঠাৎ তার দুচোখে দপ্ করে জ্বলে উঠল সীমাহীন ক্রোধের আগুন।

''আপনি আগাগোড়া মিথ্যে বলে যাচ্ছেন!'' সে চিৎকার করে উঠল। ''আপনি নিজেই বেশ ভালো করে জানেন যে অপরাধীর ফাঁকি দেবার সবচেয়ে ভালো উপায় হল যা গোপন করার দরকার নেই যতদূর সম্ভব তা গোপন না করা। আপনাকে আমি বিশ্বাস করি না!''

"ওঃ বড় ছটফটে লোক তো আপনি!" হি-হি করে হাসতে-হাসতে বলল পর্‌ফিরি।" হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে দেখছি মশায় পেরে ওঠা মুশকিল। এক ধরনের বাতিক আপনাকে পেয়ে বসেছে। আমাকে বিশ্বাস করছেন না, তাই তো? কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, বিশ্বাস আপনি ঠিকই করেন—এক=চতুর্থাংশ ইতিমধ্যেই করে ফেলেছেন। দেখবেন শেষপর্যন্ত পুরোমাত্রায় বিশ্বাস করিয়েও ছাড়ব আপনাকে, কেননা আমি আপনাকে সত্যি-সত্যি ভালোবাসি, সর্বান্তঃকরণে আপনার মঙ্গল কামনা করি।"

রাস্‌কোল্‌নিকভের ঠোঁট কেঁপে উঠল।

"হ্যাঁ, মঙ্গল কামনা করি। এটা আমার শেষ কথা", বন্ধুভাবে কনুইয়ের সামান্য ওপরে রাস্‌কোল্‌নিকভের একটা হাত চেপে ধরে সে বলে চলল। "আপনাকে বলছি আমার শেষ কথা—আপনার রোগটার ওপর নজর রাখুন। তাছাড়া আপনার সঙ্গে এখন আপনার পরিবারের লোকজনও আছে—তাদের কথা তো একবার ভেবে দেখবেন! কোথায় তাদের মনে একটু শান্তি দেবেন, তাদের আদর করবেন, তা নয়—আপনি তাদের মিছিমিছি ঘাবড়ে দিচ্ছেন..."

"তাতে আপনার কী? আপনি কী করে জানলেন? আপনার এত আগ্রহই বা কেন? তার মানে, আপনি আমার ওপর নজর রাখছেন এবং সেটাই আমাকে বুঝিয়ে দিতে চান!"

"কী যে বলেন। আরে জানতে পারলাম তো আপনার কাছ থেকেই, আপনি নিজেই তো বললেন। আপনি এটাও খেয়াল করতে পারছেন না যে উত্তেজনাবশত সব কথা আগেভাগে প্রকাশ করে দিচ্ছেন— আমার কাছে এবং অন্যদের কাছেও। দ্‌মিত্রি প্রকোফিচের কাছ থেকে, মানে মিস্টার রাজুমিখিনের কাছ থেকেও গতকাল আগ্রহ জাগানোর মতো অনেক খুঁটিনাটি বিষয় জানতে পেরেছি। না, আপনি আমার কথার মাঝখানে বাধা দিলেন, কিন্তু আমি আপনাকে না বলে পারছি না যে সন্দেহপ্রবণতার ফলে আপনার এত উপস্থিত বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও আপনি সুস্থ বুদ্ধি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলছেন। এখন ধরা যাক, আবার ফিরে আসা যাক, সেই দরজার ঘণ্টি প্রসঙ্গে। আমি, একজন তদন্তকারী হয়ে কোন রাখঢাক না করে কী দারুণ, কী মূল্যবান কতগুলো তথ্য আপনার কাছে প্রকাশ করে ফেললাম বলুন তো। এর মধ্যে কি আপনি কিছুই দেখতে পান না? আমি যদি আপনাকে এতটুকু সন্দেহ করতাম তাহলে কি একাজ করা আমার উচিত হত? বরং আমার উচিত ছিল প্রথমে আপনার সন্দেহকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া এবং এই তথ্য যে ইতিমধ্যেই আমার কাছে আছে তা ঘুণাক্ষরেও টের পেতে না দেওয়া, আপনার মনোযোগ একেবারে উলটো দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া এবং... আপনারই কথায়...কুড়ুলের ভোঁতা দিকটা দিয়ে আচমকা মাথার ঠিক চাঁদিতে বসিয়ে দেওয়া এক মোক্ষম ঘা। সেক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হত : নিহত মহিলার

ফ্ল্যাটে রাত দশটার সময় প্রায় এগারোটাই বুঝিবা হবে তখন কী করতে গিয়েছিলেন মশাই? দরজার ঘণ্টিই বা বাজাতে গেলেন কেন বলতে পারেন? রক্তের কথা জিগ্‌গেস করলেন কেন? দারোয়ানদের বিভ্রান্ত করে দিলেন কেন এবং আরও একটি প্রশ্ন : আপনার সঙ্গে থানায় ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে যাবার জন্য তাদের পীড়াপীড়িই বা কেন করলেন? আমি যদি আপনাকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতাম তাহলে আমার প্রশ্নের ধারাটা হত এইরকম। তখন আমার উচিত হত নিয়মমাফিক আপনার এজাহার নেওয়া, খানাতল্লাশি করা এবং সম্ভবত আপনাকে গ্রেপ্তারও করা। ...কিন্তু আমি যখন আপনার সঙ্গে অন্যরকম ব্যবহার করছি তখন তো বোঝাই যাচ্ছে যে আপনার ওপর আমার কোন সন্দেহ নেই! আপনার সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি লোপ পেয়েছে, আবারও বলছি, আপনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না!”

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ আঁতকে উঠল। এটা অতি সহজে পর্‌ফিরি পেত্রোভিচের নজরে পড়ে গেল।

“আপনি আগাগোড়া মিথ্যে বলে যাচ্ছেন!” সে চিৎকার করে বলল। “জানি না, আপনার উদ্দেশ্য কী, কিন্তু আপনি সমানে মিথ্যে বলে যাচ্ছেন।...এইমাত্র আপনি যে কথাগুলো বলছিলেন তার সুর একেবারে অন্য। ...আমার ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। ...আপনি মিথ্যে কথা বলছেন!”

“আমি মিথ্যে কথা বলছি?” তার সম্পর্কে মিস্টার রাস্‌কোল্‌নিকভের কী ধারণা হতে পারে আপাতদৃষ্টিতে সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন না হয়ে মুখে খুব খুশিখুশি ও হাসির ভাব বজায় রেখে, বেশ খানিকটা উত্তেজনার ভাব দেখিয়ে পর্‌ফিরি সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল। “আমি মিথ্যে কথা বলছি? ...কিন্তু দেখুন, এই কিছুক্ষণ আগে, আমি আপনার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছি! আমি নিজে একজন তদন্তকারী হয়ে আপনার আত্মরক্ষার সমস্ত উপায় বলে দিয়েছি, উপায় কী হতে পারে ধরিয়ে দিয়েছি। ...নিজেই দিয়েছি আপনার সমর্থনে সম্ভাব্য যাবতীয় মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। বলেছি, একধরনের রোগ, মানসিক বিকার... দস্তুরমতো অপদস্থও হয়েছিলেন। মনমরা ভাব, পুলিসের লোকজন...ইত্যাদি-ইত্যাদি। বলিনি? হে-হে-হে! যদিও হ্যাঁ, প্রসঙ্গত বলব, আপনার পক্ষ সমর্থনে এই যে উপায়গুলো বললাম, এর সবগুলোই অছিলা, ফাঁকিবাজি, নেহাতই অসার। শাঁখের করাতের মতো দুদিকেই কাটে। অসুস্থতা, বিকার— সে আপনি বলতেই পারেন, বলতে পারেন—দিবাস্বপ্ন, মরীচিকা, এখন কিছু মনে করতে পারছি না। বেশ, মানলাম, কিন্তু তাহলে বলুন তো মশায়, ওই বিকার বা অসুস্থতার মধ্যে আপনি অন্য কোন দিবাস্বপ্ন বা মরীচিকা না দেখে ঠিক এটাই কেন দেখলেন? আরও কিছু তো থাকতেও পারত! তাই না? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!”

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ অবজ্ঞাভরে, উদ্ধত ভঙ্গিতে তার দিকে তাকাল।

“এক কথায়...” পরফিরিকে সামান্য ধাক্কা মেরে পেছনে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াতে

-দাঁড়াতে গলা উঁচিয়ে নাছোড়বান্দার ভঙ্গিতে সে বলল, "এককথায়, আমি জানতে চাই, আপনি আমাকে আপনার সন্দেহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে স্বীকার করেন কি না? বলুন পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ, ঠিক করে বলুন। শেষ কথা বলুন। যা বলার জলদি, চটপট বলে ফেলুন!"

"ওঃ কী গেরো! আচ্ছা ফেসাদে পড়া গেল দেখছি আপনাকে নিয়ে!" এবারে আর বিন্দুমাত্র উদ্বেগের ভাব না দেখিয়ে, দারুণ খুশি হয়ে মজা করে সে বলল। "আপনার জেনে কী হবে? অতশত জেনে আপনার কী হবে বলুন তো? আপনাকে তো এখনও কেউ উত্ত্যক্ত করছে না—এতটুকু না! আপনি একেবারে ছেলেমানুষের মতো আবদার করছেন। ... সেই এক বায়না—আগুন হাতে দাও, খেলব! অমন অস্থির হচ্ছেন কেন? আপনি খাল কেটে কুমির ডেকে আনতে চাইছেন কেন? কারণটা কী, অ্যাঁ? হে-হে-হে!"

"আবারও আপনাকে বলছি," দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে খেঁকিয়ে উঠল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌, "আর সহ্য করতে পারছি না।..."

"কী সহ্য করতে পারছেন না? অনিশ্চয়তা?" তাকে বাধা দিয়ে বললে পর্‌ফিরি।

"আমাকে খোঁচাবেন না! ও পোষাবে না!...আপনাকে বলছি, পোষাবে না। পারব না, পোষাবে না! ...শুনছেন? শুনতে পাচ্ছেন?" আরও একবার টেবিলে ঘুষি মেরে সে চেঁচিয়ে উঠল।

"আরে আস্তে, আস্তে! লোকে শুনতে পাবে যে! হাসির কথা নয়, আপনাকে সত্যি-সত্যি সতর্ক করে দিচ্ছি—নিজের ওপর নজর রাখুন!" পর্‌ফিরি ফিসফিসিয়ে বলল। তবে এবারে তার চেহারায় আগেকার মেয়েলি ভালোমানুষী আর ভয়-ভয় ভাব দেখা গেল না। বরং যেন এক আঘাতে সমস্ত গোপনীয়তা ও দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাবের অবসান ঘটিয়ে এখন সে ভুরু কুঁচকে সরাসরি *হুকুম দিচ্ছে*। কিন্তু তা ছিল কেবল মুহূর্তের জন্য। প্রবল ক্রোধে উত্তেজনায় মুহূর্তের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে গেল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌। কিন্তু আশ্চর্য! প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ভেতরে-ভেতরে টগবগ করা সত্ত্বেও এবারেও আস্তে কথা বলার হুকুম সে মেনে নিল।

"আমাকে এভাবে কষ্ট দেবেন এটা আমি হতে দেব না," হুকুম না মেনে যে তার উপায় নেই যন্ত্রণা ও ঘৃণার সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে মনে-মনে তা উপলব্ধি করতে পেরে এবং এই চিন্তার ফলে আরও বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা সত্ত্বেও আগের মতোই ফিসফিসিয়ে সে বলল। "আমাকে গ্রেপ্তার করুন, তল্লাশি করুন, কিন্তু দোহাই আপনার, যা করার আইনমাফিক করুন। আমাকে নিয়ে এরকম খেলা খেলবেন না। আপনি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন..."

"আহা, ওসব নিয়মকানুন নিয়ে চিন্তা করবেন না," এবারেও দাঁত বের করে ধূর্ত হেসে—এমনকি রাস্‌কোল্‌নিকভের দুর্দশায় মুগ্ধ ও উল্লসিত হয়ে তাকে বাধা দিয়ে সে

বলল। "আমি মশাই আপনাকে আজ এখানে ডেকেছিলাম ঘরোয়াভাবে, স্রেফ বন্ধুভাবে!"

"আপনার বন্ধুত্বে আমার কোন দরকার নেই। আমার বয়েই গেছে আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে! শুনছেন তো? এবারে দেখুন—এই তুলে নিলাম টুপিটা, এবারে চললাম। দেখি, গ্রেপ্তার করার মতলব থাকলে এবারে তুমি কী বল।"

টুপি হাতে নিয়ে সে দরজার দিকে পা বাড়াল।

"কিন্তু একটা ছোটখাটো চমক দেখতে ইচ্ছে হয় না কি আপনার?" আবারও কনুইয়ের খানিকটা ওপরে তার হাত খপ করে চেপে ধরে দরজার কাছে তাকে থামিয়ে দিয়ে হি হি করে হাসতে-হাসতে বলল পর্‌ফিরি। লোকটার খুশি ও কৌতুকের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে দেখে রাস্‌কোল্‌নিকভের ধৈর্যের বাঁধ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার উপক্রম হল।

"কিসের চমক? কী ব্যাপার?" ঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ভীতচকিত দৃষ্টিতে পর্‌ফিরির দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল।

"চমক, আছে এই এখানেই, আমার দরজার ওপাশে। হে-হে-হে!" অফিসঘর আর সরকারি ফ্ল্যাটের মাঝখানের পার্টিশনের গায়ে বন্ধ দরজাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সে বলল, "আমি তালাচাবি দিয়ে আটকে রেখেছি, পাছে আবার পালিয়ে যায়।"

"কী সেটা? কোথায়? কী?..." রাস্‌কোল্‌নিকভ্ খুলে দেখার উদ্দেশ্যে দরজার দিকে পা বাড়াল। কিন্তু দরজা তালাবন্ধ।

"তালাবন্ধ। চাবি এই এখানে!"

বলে সত্যি-সত্যি পকেট থেকে চাবি বের করে তাকে দেখাল।

"সব মিথ্যে কথা তোর!" নিজেকে সামলাতে না পেরে গর্জন করে উঠল রাস্‌কোল্‌নিকভ্। "মিথ্যে কথা! হারামজাদা! ভাঁড় কোথাকার!" বলে সে ধেয়ে গেল পর্‌ফিরির দিকে। পর্‌ফিরি চট করে দরজার দিকে পিছিয়ে গেল, কিন্তু তাকে দেখে এতটুকু ভয় পেয়েছে বলে মনে হল না।

"আমি বুঝতে পারছি, সব বুঝতে পারছি!" রাস্‌কোল্‌নিকভ্ এক লাফে তার দিকে ছুটে এসে বলল। "তুই মিথ্যে কথা বলছিস, আমাকে খেপাচ্ছিস, যাতে আমি নিজেকে ধরিয়ে দিই..."

"আর কী ধরিয়ে দেবেন রোদিওন রমানোভিচ! আপনি একেবারে খেপে গেছেন মশাই। চেঁচাবেন না, আমি কিন্তু লোকজন ডেকে জড় করব!"

"মিথ্যে বকছিস! কিছুই হবে না! ডাক তোর লোকজন! তুই জানতিস আমি অসুস্থ। আমাকে উত্যক্ত করে, ক্ষিপ্ত করে তুলতে চাইছিলি তুই। যাতে আমি নিজেকে ধরিয়ে দিই—এই ছিল তোর উদ্দেশ্য! না, তথ্য বের কর! তথ্য কোথায়? আমি সব বুঝতে পেরেছি! তথ্য-টথ্য তোর কাছে নেই, যা আছে তা হল নেহাত কতকগুলো

অনুমান— এলেবেলে, জামিওতভের মনগড়া! ...তুই আমার স্বভাব জানতিস। তোর মতলব ছিল আমাকে খেপিয়ে দেওয়া, তারপর তোর যত পাদ্রি আর সাক্ষীসাবুদ নিয়ে আচমকা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া। ...তুই তাদের অপেক্ষায় আছিস তো? অ্যাঁ? কিসের অপেক্ষায় আছিস? কোথায় তারা? নিয়ে আয়!"

"ধুৎ মশায়, কিসের সাক্ষীসাবুদ! লোকের কল্পনায়ও আসে! আপনি যেমন বলছেন সেভাবে কাজ করা সম্ভব নয়—আইনত সম্ভব নয়। কাজটা কীভাবে হয় আপনার জানা নেই, বন্ধু।...তা আইনকানুন— সে তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না! নিজেই দেখতে পাবেন!..." দরজার দিকে কান খাড়া করে বিড়বিড় করে বলল পর্‌ফিরি।

সত্যি-সত্যি এইসময় অন্য ঘরের দরজার ঠিক কাছে কিসের একটা গোলমাল যেন শোনা গেল।

"ও, আসছে তাহলে!" রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ অস্ফুট চিৎকার করে উঠল। "তুই ওদের ডেকে পাঠিয়েছিস!...তুই ওদের অপেক্ষায় ছিলি! তুই আগে থাকতে ঠিক্‌ করে রেখেছিলি! তা নিয়ে আয় ওদের সকলকে এখানে— তোর যা সাক্ষীসাবুদ, শনাক্তকারী...যাকে খুশি নিয়ে আয়! আমি তৈরি! আমি তৈরি হয়ে আছি!..."

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটে গেল একটা অদ্ভুত, অপ্রত্যাশিত ও অসাধারণ ঘটনা। এ হেন পরিণতি স্বাভাবিকভাবেই রাস্‌কোল্‌নিকভ বা পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ—দুজনের কেউই স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

ছয়

পরে ওই মুহূর্তটির কথা রাস্‌কোল্‌নিকভের যতদূর মনে পড়ে সেটা এইরকম :

দরজার ওপাশ থেকে যে গোলমালটা ভেসে আসছিল তা হঠাৎ দ্রুত বেড়ে গেল, দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে গেল।

"কী ব্যাপার?" বিরক্ত হয়ে চিৎকার করে বলল পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ। "মানা করে দিয়েছি না..."

সেই মুহূর্তে কোন উত্তর পাওয়া গেল না। কিন্তু দেখা গেল দরজার ওপাশে বেশ কয়েকজন লোক। মনে হল তারা কাউকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিচ্ছে।

"কী হচ্ছে কী ওখানে?" উদ্বিগ্ন হয়ে পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ আবার বলল।

"কয়েদি নিকোলাইকে নিয়ে এসেছি," একজনের গলা শোনা গেল।

"ওকে আমার দরকার নেই। ভাগো। একটু অপেক্ষা করুক!... ও ওখানে এলো কী করতে? কোন শৃঙ্খলার বালাই নেই দেখছি!" চেঁচাতে-চেঁচাতে দরজার দিকে ছুটে গেল পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ।

"কিন্তু ও যে..." ওই একই কণ্ঠস্বর কিছু বলতে-বলতে হঠাৎই থেমে গেল।

দু'এক মুহূর্তের বেশি হবে না— চলল সত্যিকার খানিকটা ধস্তাধস্তি। তারপর হঠাৎ কে একজন কাউকে ঝটকা মেরে সরিয়ে দিল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে সটান পর্‌ফিরির অফিসঘরে ঢুকে পড়ল অত্যন্ত ফেকাসে চেহারার একটা লোক।

লোকটা দেখতে বড় অদ্ভুত। দেখে মনে হচ্ছিল সে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু কাউকেই যেন দেখতে পাচ্ছে না। তার দুটো চোখ ধকধক করে জ্বলছে সঙ্কল্পের দৃঢ়তায়, কিন্তু সেই সঙ্গে সারা মুখে ছেয়ে আছে মৃত্যুর পাণ্ডুরতা। ওকে যেন নিয়ে আসা হয়েছে বধ্যভূমিতে। দুই ঠোঁট একেবারে সাদা— থেকে-থেকে থরথর করে কাঁপছে।

বয়স খুবই কম। বেশভূষা সাধারণ। মাঝারি আকৃতির, হাড়জিরজিরে চেহারা। মাথার চুল গোল করে ছাঁটা, মুখের গড়ন পাতলা, রোগাটে। যে লোকটাকে সে আচমকা ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল সে-ই প্রথম তাকে ধরার জন্য পিছু ধাওয়া করতে গেল। ঘরের মধ্যে ছুটে এসে খপ করে তার কাঁধ চেপেও ধরল। এ লোকটা ছিল একজন আরক্ষী। কিন্তু নিকোলাই এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে এবারেও ছুটে বেরিয়ে গেল।

দরজার ওপাশে কৌতূহলীদের একটা ভিড় জমে আছে। তাদের কেউ-কেউ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে। সমস্ত ঘটনাটি প্রায় মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল।

"সরে যাও, এখন নয়। অপেক্ষা কর, পরে ডাকা হবে।... ওকে এখনই নিয়ে এলে কেন?" অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করে বলল পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ— মনে হল সে যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। কিন্তু নিকোলাই হঠাৎ নতজানু হয়ে পড়ল।

"কী চাই তোমার?" হতচকিত পর্‌ফিরি চেঁচিয়ে উঠল।

"আমি অপরাধী! আমি পাপ করেছি! আমিই খুনি!" অনেকটা হাঁপাতে-হাঁপাতে হলেও বেশ উঁচু গলায় নিকোলাই হঠাৎ বলে উঠল।

কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে এলো। উপস্থিত সকলে যেন বজ্রাহত। এমন কি আরক্ষী লোকটিও নিকোলাইয়ের দিকে এগিয়ে না গিয়ে আঁতকে কয়েক পা পিছিয়ে গেল, যন্ত্রচালিতের মতো দরজার কাছে সরে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"এসব কী ব্যাপার?" মুহূর্তের হতভম্ব ভাব কাটিয়ে উঠে পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ অস্ফুট আর্তনাদ করে বলল।

"আমি ...খুনি..." একটু চুপ করে থেকে নিকোলাই আবার বলল।

"তুমি...কী?...কাকে খুন করেছ?"

পর্‌ফিরি পেত্রোভিচকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন ভেবাচেকা খেয়ে গেছে।

নিকোলাই আবার চুপ করে রইল কিছু সময়ের জন্য।

"আলিওনা ইভানোভ্‌না আর তার বোন লিজাভেতা ইভানোভ্‌নাকে, আমি...খুন করেছি ... কুড়ুল দিয়ে। আমার তখন বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছিল..." হঠাৎ কথাটা যোগ করে আবার চুপ করে গেল সে। তখনও সে নতজানু হয়ে আছে।

পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে রইল। দেখে মনে হচ্ছিল গভীর চিন্তাগ্রস্ত। কিন্তু হঠাৎ আবার চঞ্চল হয়ে উঠল, দুহাত নাড়িয়ে অনাহূত দর্শকদের সরে যেতে বলল। তারা চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। রাস্‌কোলনিকভ এক কোনায় দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছিল নিকোলাইকে। হঠাৎ পর্‌ফিরির দৃষ্টি সেদিকে পড়ে যেতে সে তার দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎই আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তার দিকে তাকাল, সঙ্গে-সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তাকাল নিকোলাইয়ের দিকে। তারপর আবার রাস্‌কোল্‌নিকভের দিকে। সেখান থেকে আবার নিকোলাইয়ের দিকে— তার তখন দিশেহারা ভাব। শেষকালে ফের তার নজর গিয়ে পড়ল নিকোলাইয়ের ওপর।

"তোমার ওই বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাবার গাওনা আগে থেকে আমাকে শুনিয়ে কী হবে?" ক্রোধে প্রায় অন্ধ হয়ে সে ফেটে পড়ল নিকোলাইয়ের ওপর। "তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছিল কিনা ওকথা আমি এখনও তোমাকে জিগ্‌গেস করিনি।...বল : তুমি খুন করেছ?"

"আমি খুনি। ...আমি এজাহার দিতে চাই..." নিকোলাই বলল।

"বাঃ! কী দিয়ে খুন করলে?

"কুড়ুল দিয়ে। ওটা হাতের কাছে মজুত ছিল।"

"আহা, তাড়াহুড়োর কী আছে! একাই করেছিলে?"

নিকোলাই প্রশ্নটা ঠিক ধরতে পারল না।

"বলি, খুনটা কি একাই করেছিলে?"

"একা। দ্‌মিত্রির কোন দোষ নেই। ও এসবের মধ্যে ছিল না।"

"আহা, দাঁড়াও, দাঁড়াও, দ্‌মিত্রিকে নিয়ে অত ব্যস্ত না হলেও চলবে। যত্ত সব! ..তাহলে, বল, তাহলে তখন সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নেমে গিয়ে কী করছিলে অ্যাঁ? দারোয়ানরা তো তোমাদের দুজনকেই দেখেছে, তাই না?"

"আমি যে তখন দ্‌মিত্রির সঙ্গে-সঙ্গে ছুটছিলাম সেটা ওদের চোখকে ফাঁকি দেবার জন্যে," উত্তরটা নিকোলাই যে-রকম চটপট দিল তাতে মনে হচ্ছিল যেন আগে থাকতেই তৈরি করা ছিল।

"বাঃ, যা ভেবেছিলাম তাই!" পর্‌ফিরি ক্রোধে দপ করে জ্বলে উঠল। "কথাগুলো ওর নিজের নয়!" বিড়বিড় করে অনেকটা আপন মনে সে বলল। তারপর হঠাৎ আবার তার নজর পড়ল রাস্‌কোল্‌নিকভের ওপর।

দেখে মনে হচ্ছিল নিকোলাইকে নিয়ে সে এতদূর মেতে উঠেছে যে মুহূর্তের জন্য রাস্‌কোল্‌নিকভের কথা পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। এখন হঠাৎ হুঁশ ফিরে এলো, এমনকি তাকে বিব্রতও দেখাল।...

" রোদিওন রমানোভিচ, মনে কিছু করবেন না! মাফ করবেন আমাকে!" বলতে-

বলতে সে তার দিকে ছুটে গেল। "কিছু মনে করবেন না। আর নয়। ...এখানে আপনার কিছু করার নেই ...আমি নিজেই... দেখতে পাচ্ছেন, কেমন চমক! ...যদি কিছু মনে না করেন..." রাস্‌কোল্‌নিকভের হাত ধরে সে তাকে ইশারায় বাইরের দরজা দেখিয়ে দিল।

"আপনি, মনে হয়, এটা আশা করেননি, তাই না?" রাস্‌কোল্‌নিকভ্ অবশ্য তখনও স্পষ্ট কিছু বুঝতে না পেরে বলল, তবে ইতিমধ্যে তার মন-মেজাজ বেশ চাঙা হয়ে উঠেছে।

"হ্যাঁ, কিন্তু আপনিও মশাই, আশা করেননি। ইশ্! এ কী, আপনার হাত কাঁপছে যে! হে-হে!"

"কিন্তু আপনিও কাঁপছেন যে, পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ!"

"হ্যাঁ, আমিও কাঁপছি। আশা করতে পারিনি!"

ওরা দুজনে তখন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। পর্‌ফিরি অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কখন রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বেরিয়ে যায়।

"কিন্তু আপনার ওই চমক তাহলে আপনি আর দেখাবেন না?" হঠাৎ বলে উঠল রাস্‌কোল্‌নিকভ্।

"আহা কী কথাই না বললেন! এদিকে নিজেরই তো দাঁতে দাঁত লেগে ভিরমি খাবার দশা! হে-হে! ভারি মজার লোক তো আপনি! আচ্ছা, আজকের মতো আসুন।"

"আমার মনে হয় *বিদায়* বলাই ভালো।

"দেখা যাবে। সেটা ভগবানের ইচ্ছে!" ঠোঁট বাঁকিয়ে মুচকি হেসে অস্ফুট স্বরে পর্‌ফিরি বলল।

বাইরের অফিসঘর পার হয়ে যেতে-যেতে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ লক্ষ করল অনেকগুলো চোখের দৃষ্টি তার দিকে স্থির নিবদ্ধ। সামনের ঘরে ভিড়ের মধ্যে তার চোখে পড়ল ওই বাড়ির সেই দুজন দারোয়ানকে, যাদের সেই রাতে সে থানায় যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। তারা ওখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কিসের জন্য যেন অপেক্ষা করছে। কিন্তু সিঁড়িতে যেই সে পা রেখেছে অমনি পেছন থেকে শুনতে পেল পর্‌ফিরি পেত্রোভিচের কণ্ঠস্বর। ফিরে তাকাতে সে দেখতে পেল পর্‌ফিরি দৌড়ুতে-দৌড়ুতে তার নাগাল ধরেছে, রীতিমতো হাঁপাচ্ছে।

"একটা ছোট্ট কথা, রোদিওন রমানোভিচ, ওই যে দেখা যাবে বলেছিলাম না, তা অন্য সব ক্ষেত্রে ঠিকই আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আনুষ্ঠানিকভাবে দু-একটা প্রশ্ন করার আছে—তাই আমাদের আবার দেখা হবে। বুঝলেন কিনা!" বলতে-বলতে পর্‌ফিরি হাসি-হাসি মুখ করে তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। "বুঝলেন কিনা!" আরও একবার সে যোগ করল।

মনে হচ্ছিল আরও কিছু বলার ইচ্ছে তার ছিল, কিন্তু বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত আর বলা হয়ে উঠল না।

"কিছুক্ষণ আগে আপনার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করেছি তার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ...আমার মেজাজটা একটু গরম হয়ে গিয়েছিল।" ততক্ষণে রাস্‌কোল্‌নিকভের সাহস এতদূর বেড়ে গেছে যে বাহাদুরি দেখানোর ইচ্ছেটা সে কোনমতে দমন করে চেপে রাখতে পারল না।

"ও কিছু নয়, ও কিছু নয়," প্রায় খুশি হয়ে পর্‌ফিরি সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল। 'আমি নিজেও তো আর... আমার মেজাজটাও তিরিক্ষি। ...স্বীকার করতে বাধা নেই অবশ্যই বাধা নেই! তা যাই হোক, আমাদের আবার দেখা হবে। ভগবানের ইচ্ছে হলে আরও অনেক, অনেক বার!... "

"তখন আমরা একে অন্যের সঠিক পরিচয় পাব, তাই না?" রাস্‌কোলনিকভ্‌ প্রত্যুত্তরে বলল।

"হ্যাঁ, সঠিক পরিচয় পাব," চোখ কুঁচকে, গম্ভীর ভাব করে তার দিকে তাকিয়ে সায় দিয়ে পরফিরি পেত্রোভিচ বলল। " এখন তা হলে যাচ্ছেন জন্মদিনের পার্টিতে?"

"যাচ্ছি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে।"

"ও হ্যাঁ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়! শরীরের দিকে নজর রাখবেন কিন্তু, শরীরের যত্ন নেবেন।..."

"আমার তরফ থেকে উত্তরে আপনাকে যে কী শুভেচ্ছা জানাব জানি নে!" রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ ততক্ষণে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে শুরু করেছে— সেই অবস্থাতেই পর্‌ফিরির দিকে হঠাৎ আবার মুখ ফিরিয়ে সে বলল, "আপনার কাজে বিরাট সাফল্য কামনা করি। দেখছেন তো আপনার চাকরিটা কেমন মজার!"

"কেন? মজার বলছেন কেন?" পর্‌ফিরিও ফিরে যাবার জন্য উলটো দিকে পা বাড়িয়েছিল, কিন্তু রাস্‌কোল্‌নিকভের এই কথায় সে কান খাড়া করল।

"তা নয় তো কি? এই যে বেচারা নিকোলাই— আপনি আপনার নিজের মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে ওকে নিশ্চয় এত কষ্ট ও যন্ত্রণা দিয়েছেন যে শেষপর্যন্ত ও দোষ স্বীকার করতে বাধ্য হয়। আপনি নিশ্চয় দিনরাত ওর কানের কাছে মন্ত্র পড়ে ওকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন: 'তুমি খুনি, তুমি খুনি...' —কিন্তু এখন ও যেই স্বীকার করল, আপনি আবার শুরু করবেন তাকে দলাই-মলাই করতে। বলবেন, 'তুমি মিথ্যে কথা বলছ, তুমি খুনি নও! তুমি খুনি হতে পার না! তুমি তোমার নিজের কথা বলছ না— শেখান বুলি আওড়াচ্ছ!... এইসব। এরপরও আপনার চাকরিকে মজার না বলে আর কী বলা যায় বলুন?"

"হে- হে- হে! আমি যে এইমাত্র নিকোলাইকে বললাম যে সে তার 'নিজের কথা বলছে না' এটা আপনি তাহলে ঠিক খেয়াল করেছেন দেখছি!"

"বাঃ খেয়াল করব না!"

"হে - হে! চালাক, খুব চালাক আপনি! হ্যাঁ, মানতেই হবে। সবদিকে খেয়াল আছে দেখছি! মাথা বেশ ভালোই কাজ করে! সবচেয়ে মজার জায়গাটাই ধরেছেন... হে- হে! লোকে বলে লেখকদের মধ্যে এই গুণটা নাকি গোগলেরই সর্বোচ্চ মাত্রায় ছিল... তাই না?"

"হ্যাঁ, গোগলের ওটা ছিল।"

"হুম্‌, গোগলের... ঠিক কথা।... আমাদের সেই সুমধুর সাক্ষাৎ যতদিন না হচ্ছে ততদিনের মতো তা হলে বিদায়।"

"হ্যাঁ, ততদিনের মতো..."

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ সটান বাড়ি চলে গেল। সে এতদূর বিভ্রান্ত ও হতচকিত যে বাড়ি ফিরে এসে সোফায় গা ছেড়ে দিল। বসে-বসে শুধু বিশ্রাম নিতে এবং নিজের চিন্তাভাবনা অন্তত খানিকটা গুছিয়ে নিতেই তার মিনিট পনেরো সময় চলে গেল। নিকোলাইকে নিয়ে বিচার-বিবেচনার ধারেকাছে সে গেল না— এ ব্যাপারে সে হতবাক। সে উপলব্ধি করতে পারছিল যে নিকোলাইয়ের স্বীকারোক্তির মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা ব্যাখ্যাতীত, বিস্ময়কর, যার তাৎপর্য ঠিক এই মুহূর্তে সে ধরতে পারছে না। কিন্তু নিকোলাইয়ের স্বীকারোক্তি একটা বাস্তব ঘটনা। এই ঘটনার পরিণতি সঙ্গে-সঙ্গে তার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল: মিথ্যা প্রকাশ না হয়ে পারে না, আর সেক্ষেত্রে ওরা ফের ওর পেছনে লেগে যাবে। কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে অন্তত ততক্ষণ সে মুক্ত এবং তাকে অবশ্যই এই সময়ের মধ্যে নিজের জন্য কিছু একটা করা দরকার, কেননা বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু কথাটা হল, কোন্‌ পর্যায়ে? পরিস্থিতি পরিষ্কার হতে চলেছে। *স্থূলভাবে,* সাধারণ সম্পর্কসূত্রে পরফিরির সঙ্গে তার কিছুক্ষণ আগেকার নাটকীয় দৃশ্যটি মনে-মনে আগাগোড়া পর্যালোচনা করতে গিয়ে আরও একবার সে আতঙ্কে শিউরে না উঠে পারল না। অবশ্য এটা ঠিক যে পর্‌ফিরির সব উদ্দেশ্য তার এখনও জানা নেই, কী ধরনের বিচার বিবেচনা করে পর্‌ফিরি তখন কাজে নেমেছিল তাও তার পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। কিন্তু খেলার একটা অংশ তখন প্রকাশ পেয়ে গেছে এবং পর্‌ফিরির খেলায় এই চালটা যে তার পক্ষে কত ভয়ঙ্কর সেটা তার চেয়ে ভালো করে অবশ্যই আর কারও বোঝা সম্ভব নয়। আর একটু হলেই সে সম্পূর্ণ ধরা পড়ে যেতে *পারত*— এবারে তথ্যই বেরিয়ে পড়ত। সে যে দুর্বল চরিত্রের মানুষ তা পরফিরি জানতে পেরেছে, প্রথম দৃষ্টিতে তাকে সঠিকভাবে ধরতে ও পরিমাপ করতে পেরে বড় বেশি স্থিরসঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে যায়, কিন্তু তা হলেও প্রায় নির্ভুলভাবেই কাজ করেছে। কিছুক্ষণ আগেকার ওই দৃশ্যে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ যে বড় বেশি আপসের পন্থা গ্রহণ করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও *তথ্য* পর্যন্ত এখনও

গড়ায়নি। এখন পর্যন্ত সবই ছিল আপেক্ষিক মাত্র। কিন্তু যাই হোক না কেন, এখন, এই মুহূর্তে সে এসব ঠিক বুঝতে পারছে কি? ঠিকঠাক বুঝতে পারছে কি? তার ভুল হচ্ছে না তো? আজ পর্‌ফিরি ঠিক কী ফল পাবার চেষ্টা করেছিল? আজ ওর সত্যি-সত্যি কোন বিশেষ পরিকল্পনা ছিল কি? যদি থেকেই থাকে তো সেটা কী? ও কি সত্যি-সত্যি কোন কিছুর প্রতীক্ষায় ছিল? নিকোলাইয়ের আবির্ভাবের ফলে ঘটনা অপ্রত্যাশিতভাবে চূড়ান্তে না পৌঁছুলে আজ ওদের বিদায়ের দৃশ্যটাই বা ঠিক কী রকম হত?

পর্‌ফিরি তার হাতের প্রায় সবগুলো তাসই খুলে দিয়েছে। নিঃসন্দেহে ঝুঁকি নিয়েছে। কিন্তু খুলে সে দিয়েছে। তাই রাস্‌কোল্‌নিকভের মন বলছিল— পর্‌ফিরির কাছে যদি বাস্তবিকই এর চেয়ে বেশি কিছু থাকত তাহলে সেটাও সে দেখাত। ওর সেই 'চমক' — সেটা কী? নেহাত ঠাট্টা না কি? এর কোন তাৎপর্য ছিল না কি? এর অন্তরালে কি এমন কিছু লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা আছে যার সঙ্গে তথ্য অথবা সঠিক অভিযোগের অন্তত এতটুকু সাদৃশ্য আছে? গতকালের সেই লোকটা? কোথায় সে ডুব মারল? আজ কোথায় ছিল? পরফিরির কাছে যদি সত্যি-সত্যি প্রামাণিক কিছু থেকে থাকে অবশ্যই গতকালের সেই লোকটার সঙ্গে সম্পর্কিত।...

হাঁটুর ওপর কনুই ঠেকিয়ে, দু-হাতে মুখ ঢেকে, মাথা ঝুলিয়ে সে সোফায় বসে ছিল। তখনও স্নায়বিক বিকারে কাঁপছে তার সর্বাঙ্গ। অবশেষে সে উঠে দাঁড়াল। টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে একটু চিন্তা করে দরজার দিকে পা বাড়াল।

তার কেন যেন মনে হচ্ছিল যে অন্ততপক্ষে আজকের দিনটাতে সম্ভবত সে নিজেকে প্রায় নিরাপদ বলে ধরতে পারে। হঠাৎ তার বুকের ভেতরটা আনন্দে প্রায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার কাছে যাবার দারুণ ইচ্ছে হচ্ছিল তার। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সে বলাই বাহুল্য দেরি করে ফেলেছে, তবে অন্ত্যেষ্টিভোজের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার সময় সে পাবে এবং সেখানে তখন সোনিয়াকে দেখতে পাবে।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ থমকে দাঁড়িয়ে একটু ভাবল। একটা করুণ হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে

"আজ! আজ!" সে আপন মনে আওড়াল। "হ্যাঁ আজই! তাই হওয়া চাই..."

সে সবে দরজাটা খুলবে বলে হাত বাড়িয়েছে, এমন সময় সেটা নিজে থেকে খুলতে শুরু করল। তাই দেখে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ কাঁপতে-কাঁপতে এক লাফে পিছিয়ে গেল। দরজা ধীরে-ধীরে নিঃশব্দে খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক মনুষ্যমূর্তি। ...গতকালের সেই ভুঁইফোঁড় লোকটা। সেই একই পোশাক।

লোকটা চৌকাঠে দাঁড়িয়ে পড়ে নীরবে রাস্‌কোল্‌নিভের দিকে তাকাল, তারপর বলা নেই কওয়া নেই ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল। হুবহু সেই কালকের মতোই

দেখাচ্ছে তাকে, ওই একই মূর্তি, বেশভূষাও একইরকম। কিন্তু তার চোখেমুখে, চোখের দৃষ্টিতে যেন গভীর কোন পরিবর্তন ঘটে গেছে। তাকে এখন কেমন যেন বিমর্ষ দেখাচ্ছে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একমাত্র যেটা বাকি ছিল তা হল গালে করতল ঠেকিয়ে মাথাটা একপাশে হেলান— তাহলে তাকে ঠিক চাষী-বৌয়ের মতো দেখাত।

"কী চাই আপনার?" আতঙ্কে হিম হয়ে গিয়ে রাস্‌কোল্‌নিকভ জিগ্‌গেস করল।

লোকটা চুপ করে রইল, তারপর হঠাৎ অনেকখানি নিচু হয়ে— প্রায় আভূমি নত হয়ে তাকে নমস্কার জানাল। অন্তত এটা ঠিক যে ডান হাতের একটা আঙুল দিয়ে সে ভূমি স্পর্শ করল।

"এ কী ব্যাপার?" রাস্‌কোল্‌নিকভ চেঁচিয়ে উঠল।

"আমি আপনার কাছে অপরাধী," লোকটা মৃদুস্বরে বলল।

" কেন?"

"আমার কুমতলবের জন্য।"

ওরা দুজনে একে অন্যের দিকে তাকাল।

"আমার খারাপ লাগছিল। ওইসময় আপনি যখন এলেন— হয়ত নেশায় টং হয়ে ছিলেন— এসে দারোয়ানদের আপনার সঙ্গে থানায় যেতে বললেন, রক্তের কথা জিগ্‌গেস করলেন, তখন এই ভেবে আমার খারাপ লাগছিল যে ওরা মদো-মাতাল মনে করে আপনাকে একেবারে পাত্তা দিল না। এত খারাপ লাগছিল যে রাতে ঘুম হল না। আপনার ঠিকানাটা আমি মনে করে রেখেছিলাম; গতকাল এসে জিগ্‌গেসও করে গেছি..."

"কে এসেছিল?" মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাটা মনে করতে-করতে রাসকোল্‌নিকভ তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল।

"আমি। আপনার প্রতি অবিচার করেছি।"

"ও, আপনি তাহলে ওই বাড়ি থেকে আসছেন?"

"হ্যাঁ আমি ওখানেই থাকি। ওই সময় গেটের কাছে অন্যদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আপনার মনে আছে কি? আমাদের একটা ছোটখাটো ওয়ার্কশপও আছে ওখানে— বহুকালের পুরানো। আমরা মাঝারি ধরনের ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক। পশমের কারবার করে থাকি। বাড়িতেই ফরমাশ নিয়ে কাজ করি।... কিন্তু আমার সবচেয়ে বেশি খারাপ লেগেছিল..."

তৎক্ষণাৎ গত দুদিন আগের ফটকের তলাকার সেই দৃশ্যটি আগাগোড়া পরিষ্কার মনে পড়ল রাস্‌কোল্‌নিকভের। তার মনে পড়ল দারোয়ান দুজন ছাড়াও সেখানে আরও কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, কয়েজন মহিলাও ছিল তাদের মধ্যে। মনে আছে তাদের মধ্যে একজনের কণ্ঠস্বর— ওকে সরাসরি থানায় নিয়ে যাবার পক্ষে মত

প্রকাশ করেছিল। কথাটা যে বলেছিল তার মুখ সে মনে করতে পারছিল না, এমনকি এখনও ঠিক শনাক্ত করতে পারছিল না তাকে। তবে তার মনে আছে তখন লোকটার কথার উত্তরে তার দিকে ফিরে তাকিয়ে কিছু একটা সে বলেও ছিল।...

তাহলে গতকালের ওই যে সমস্ত বিভীষিকা তার সমাধান দেখা যাচ্ছে এখানে! সবচেয়ে বেশি আতঙ্ক হচ্ছিল এই ভেবে যে ও বাস্তবিকই প্রায় মারা যেতে বসেছিল, এরকম একটা *তুচ্ছ* পরিস্থিতির কারণে নিজের প্রায় সর্বনাশ করে বসেছিল। দেখা যাচ্ছে ঘরভাড়া আর রক্ত নিয়ে যা কথাবার্তা এর বেশি কিছু আর লোকটা বলতে পারছে না। অর্থাৎ পর্‌ফিরির কাছেও কিছু নেই— এই *প্রলাপ* ছাড়া আর কিছু নেই, কোন তথ্যই নেই ওর *মনস্তত্ত্ব* ছাড়া— সেটা সুনির্দিষ্ট কিছু নয়— *শাঁখের করাতের মতো,* দুদিকেই কাটে। অর্থাৎ কিনা, আর কোন তথ্য যদি প্রকাশ না পায়— প্রকাশ পাওয়া উচিতও নয়, কোনমতেই উচিত নয়— তাহলে...তাহলে ওর কী করতে পারে ওরা? ওরা যদি ওকে গ্রেপ্তারও করে, কী ভাবে চূড়ান্তভাবে ওকে অপরাধী প্রতিপন্ন করতে পারে? অর্থাৎ দাঁড়াচ্ছে এই যে পর্‌ফিরি ফ্ল্যাটের ব্যাপারটা জানল সবে এখন, এইমাত্র— এর আগে জানত না।

"আমি যে এসেছিলাম... সে খবরটা তাহলে আপনিই পর্‌ফিরিকে দিয়েছিলেন?" একটা আকস্মিক চিন্তার তাড়নায় হতচকিত হয়ে সে বলে উঠল।

" কোন্ পর্‌ফিরি?"

"তদন্তকারী।"

"হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম। দারোয়ানরা তখন গেল না। পরে আমিই গেলাম।"

"আজ?"

"আপনার মিনিটখানেক আগে গিয়েছিলাম। সব শুনলাম, সব। আপনাকে কীভাবে হেনস্তা করেছে— তাও।"

" কোথায়? কী? কখন?"

"ওই তো ওখানেই, পার্টিশানের ওপাশে— সারাক্ষণ বসে ছিলাম।"

"সেকী! তাহলে আপনিই ছিলেন সেই চমক? কীভাবে এটা হল? দয়া করে বলবেন কি?"

"দেখুন, ব্যাপারটা হল এই যে..." লোকটা বলতে শুরু করল, "দারোয়ানরা আমার কথায় যেতে রাজি হল না, কেন না— তাদের কথায়— ইতিমধ্যে বেশ দেরি হয়ে গেছে, আর ঠিক সঙ্গে-সঙ্গে না আসার জন্য পুলিস তাদের ওপর চোটপাটও করতে পারে। তা এই শুনে আমি বেশ বিরক্তই হলাম। রাতে আমার ঘুমও হল না। এরপর আমি চারপাশে খোঁজখবর নিতে থাকলাম। গতকাল খোঁজখবর নিয়ে জানার পর আজ গেলাম। প্রথম যখন এলাম তখন উনি ছিলেন না। ঘন্টাখানেক বাদে আবার এলাম। তা ওঁর ঘরে আমাকে ঢুকতে দিল না। তৃতীয়বার যখন এলাম তখন ঢুকতে

পারলাম। কী কী হয়েছিল ওঁকে জানাতে শুরু করলাম। উনি ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করে পায়চারি করেন, বুক চাপড়ে হায়-হায় করে বলেন: 'যত গুণ্ডাবদমায়েশ! আমার সঙ্গে রসিকতা ! আগে জানলে আমি ওকে নিয়ে আসার জন্য সেপাইদের একটা দল পাঠিয়ে দিতাম!' তারপর ছুটে বাইরে চলে গেলেন। কাকে যেন ডেকে এনে ঘরের এক কোনায় তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, তারপর আবার আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন, গালিগালাজও করলেন। আমাকে অনেক বকাঝকা করলেন। আমি যা-যা জানি সবই ওঁকে বললাম। এও বললাম যে গতকাল আমার কথার উত্তরে আপনি কিছু বলতে সাহস পাননি এবং আপনি আমাকে শনাক্ত করতে পারেননি। এতে তিনি আবার ছুটোছুটি শুরু করে দিলেন। ক্ষিপ্ত হয়ে বারবার বুক চাপড়ে ঘরের মধ্যেই দৌড়ঝাঁপ করতে লাগলেন। তারপর যখন ওঁকে জানান হল যে আপনি এসেছেন, তখন বললেন— পার্টিশনের ওপাশের ঘরে গিয়ে আপাতত বসে থাক, যাই শোন না কেন, এতটুকু নড়াচড়া কোরো না— এই বলে নিজেই আমাকে একটা চেয়ার এনে দিলেন, আমাকে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে ওখানে রেখে দিলেন। বললেন, 'হয়ত তোমাকেও জেরা করতে হবে।' তারপর ওরা যখন নিকোলাইকে নিয়ে এলো, আপনাকে বিদায় দেবার পর আমাকেও উনি ছেড়ে দিলেন।-বললেন, 'তোমাকে আমার আবার দরকার হবে। আরও কিছু প্রশ্ন করার আছে।...''

''তোমার সামনে নিকোলাইকে কি প্রশ্ন করেছিল?''

''আপনাকে যখন ছেড়ে দিলেন ঠিক সেই সময় আমাকেও ছেড়ে দিলেন, আর নিকোলাইকে জেরা করতে শুরু করলেন।''

লোকটা এখানেই থেমে গেল, তারপর হঠাৎ আবার আভূমি নত হয়ে মাটিতে আঙুল ঠেকিয়ে নমস্কার জানাল।

''মিছিমিছি একটা বাজে ধারণার বশে আপনার বিরুদ্ধে যে বিষোদ্‌গার আমি করেছি তার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন।''

''ঈশ্বর ক্ষমা করবেন,'' উত্তরে রাস্‌কোল্‌নিকভ এই কথা উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা মাথা নুইয়ে তাকে অভিবাদন জানাল। তবে এবারে আভূমি নত না হয়ে কটিদেশ পর্যন্ত ঝুঁকল। তারপর ধীরে-ধীরে উলটো দিকে ঘুরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। 'সবই শাঁখের করাতের মতো, শাঁখের করাতের মতোই দুদিকে কাটে,' রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ মনে-মনে এই কথাগুলো আউড়ে বেশ খোশ মেজাজে ঘর ছেড়ে বের হল। এতটা খোশ মেজাজে এর আগে তাকে আর কখনও দেখা যায়নি।

'সামনে আমাদের আরও লড়াই পড়ে আছে,' সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে তিক্ত হেসে সে মনে-মনে বলল। কিন্তু তার ওই তিক্ততা তার নিজেরই বিরুদ্ধে— নিজের 'কাপুরুষতার' কথা মনে হতে লজ্জায়, বিতৃষ্ণায় তার মন তিক্ত হয়ে গেল।

পঞ্চম পর্ব

ভোরের স্নিগ্ধ স্পর্শে মানুষ প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠে। দুনিয়া ও তার মা পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নার সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়ার পরদিন ভোরের আলো লুজিনকেও প্রকৃতস্থ করে তুলল। যে ঘটনা সবে গতকাল বাস্তবে ঘটে যাবার পরও তার কাছে অসম্ভব এবং প্রায় উদ্ভট বলে মনে হচ্ছিল আজ, এখন নিদারুণ অপ্রীতিকর ঠেকলেও ধীরে-ধীরে সেটাকেই সম্পূর্ণ সংঘটিত ও অপ্রতিরোধ্য বাস্তব ঘটনা বলে গ্রহণ না করে তার উপায় থাকল না। তার আহত অহংয়ের কালসর্প সারারাত দংশনে-দংশনে তার হৃৎপিণ্ড ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছিল। সকালে বিছানা ছেড়ে উঠে পিওতর পেত্রোভিচ সঙ্গে-সঙ্গে আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখে নিল। তার আশঙ্কা হচ্ছিল রাতের মধ্যে খিটখিটে ভাবটা হয়ত মুখমণ্ডলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। যা হোক, দেখা গেল এদিক থেকে আপাতত সব ঠিকই আছে। নিজের সাদা ধবধবে, সম্প্রতি ঈষৎ মেদপুষ্ট ও সম্ভ্রম উদ্রেককারী মুখশ্রী দেখে পিওতর পেত্রোভিচ বরং পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে মুহূর্তের জন্য নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিল যে অন্য কোথাও আর কোন পাত্রী ঠিক খুঁজে পাওয়া যাবে। ...খুব সম্ভব আরও ভালো কাউকেই পাওয়া যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই চৈতন্যোদয় হতে ঘৃণাভরে সজোরে একপাশে থুতু ফেলল। তা দেখে একই ঘরের সঙ্গী, তার যুবক বন্ধু আন্দ্রেই সেমিওনভিচ লেবেজিয়াতনিকভ কোন কথা বলল না বটে, তবে তার মুখে বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠল। হাসিটা পিওতর পেত্রোভিচের নজর এড়াল না, তৎক্ষণাৎ মনে-মনে যুবক বন্ধুটির ওপর তার শোধ নেবার জন্য তুলে রেখে দিল। সম্প্রতি সে তার ওপর শোধ নেবার জন্য আরও এমন অনেক ঘটনাই বেছে-বেছে ঠিক মনে করে রেখে দিয়েছে। তার ক্রোধ দ্বিগুণ বেড়ে গেল যখন হঠাৎ তার মনে হল গতকালের ফলাফল সম্পর্কে গতকাল লেবেজিয়াত্‌নিকভ্‌কে জানানো উচিত হয়নি। এটা ছিল গতকালের দ্বিতীয় ভুল— বিরক্তি ও উত্তেজনার বশে নিজেকে বড় বেশি প্রকাশ করে ফেলেছিল সে।... তারপর দুর্ভাগ্য এমনই যে আজ সারা সকাল ধরে একের পর এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এমনকি সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা নিয়ে সে এত দৌড়ঝাঁপ করেছে সেখানেও গতিক সুবিধার নয়। বিশেষত তার বিরক্তি উদ্রেক করেছে শীঘ্রই বিবাহ করবে বলে যে ফ্ল্যাটটা সে ভাড়া নিয়ে নিজের খরচে নতুন করে সাজাচ্ছিল, তার মালিক। লোকটা জাতে জার্মান, পেশায় কারিগর, এক উঠতি বড়লোক। তার সঙ্গে সবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল পিওতর পেত্রোভিচ। এখন কোনমতে মালিক সে-চুক্তি বাতিল করতে রাজি নয়। পিওতর পেত্রোভিচ প্রায় নতুন করে সাজান অবস্থায় সেই ফ্ল্যাট

ফিরিয়ে দিচ্ছে, তবু চুক্তিতে ক্ষতিপূরণ বাবদ যে পরিমাণ অর্থের উল্লেখ আছে তার পুরাটাই সে দাবি করছে। ফার্নিচারের দোকানেও ঠিক সেই একই হাল— যে আসবাবপত্র কেনা হলেও এখনও ফ্ল্যাটে তোলা হয়নি সেই বাবদ যে অর্থ সে জমা দিয়েছিল তা থেকে এক রুবলও ওরা ফেরত দিতে রাজি নয়। 'ফার্নিচার কিনেছি বলে কি তাহলে আমাকে বিয়ে করতে হবে!' দাঁতে-দাঁত ঘষতে-ঘষতে মনে-মনে পিওতর পেত্রোভিচ বলল। আবার তৎক্ষণাৎ আরও একবার তার মনের কোনায় উঁকি মারল একঝলক আশার আলো: 'তাহলে কি মেনে নিতে হবে সত্যি-সত্যি সব শেষ হয়ে গেল? যা গেছে তা কি আর ফিরিয়ে আনা যায় না? আরেকবার চেষ্টা করে দেখা যায় না কি?' দুনিয়ার কথা চিন্তা করে সে প্রবুদ্ধ হল, বুকের ভেতরে একটা খোঁচা অনুভব করল। এই মুহূর্তটি সহ্য করা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল। এখন, এই মুহূর্তে একমাত্র ইচ্ছাশক্তিবলে যদি রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে মেরে ফেলা সম্ভব হত তাহলে পিওতর পেত্রোভিচ এতটুকু কালবিলম্ব না করে সে-কাজ করত।

'এছাড়া আরও একটা ভুল হয়েছিল এই যে আমি ওদের একেবারে কোন টাকা দিইনি,' লেবেজিয়াত্‌নিকভের কুঠুরিতে ফেরার পথে বেজার হয়ে সে ভাবল। 'আমার মাথায় কোন্ ভূত চেপেছিল যে অমন কঞ্জুস ইহুদি বনে গেলাম? ওর মধ্যে কোনরকম হিসেবেরও বালাই ছিল না! আমি ভেবেছিলাম ওদের কিছুদিন কষ্টের মধ্যে রেখে এমন অবস্থায় এনে ফেলব যে ওরা আমায় ঈশ্বরপ্রেরিত বলে মনে করবে। কিন্তু এখন নয়ন সার্থক কর ওদের দেখে!... ছিঃ!... না, আমি যদি এই সময়ের মধ্যে যৌতুক হিসেবে, উপহারের নাম করে, ক্নোপের মনিহারী দোকান বা কোন বিলিতি দোকান থেকে রাজ্যের ফালতু জিনিস, টুকিটাকি প্রসাধনসামগ্রী ভরতি শৌখিন বাক্স, ড্রেসিং কেস, পাথর বসান গয়না, পোশাক তৈরির কাপড়— এসবের খরচ বাবদ, এই ধর না কেন, হাজার দেড়েক ওদের দিতাম তাহলে আমার অবস্থাটা আরও অনেক ভালো আর... পাকাপোক্ত হত! তখন কি আর আমাকে অত সহজে হাঁকিয়ে দিতে পারত! ওরা এমন ধাঁচের লোক যে আমাকে হাঁকিয়ে দিলে সেক্ষেত্রে টাকা আর উপহার দুইই ফেরত দেওয়া অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করত। কিন্তু ফেরত দিতে গায় লাগত, আফসোস হত! তাছাড়া বিবেকের দংশনেও কষ্ট পেত— বলত, যে-লোকটা এতদিন পর্যন্ত এত উদারতা, এতটা ভদ্রতা দেখিয়ে এসেছে তাকে হুট্ করে তাড়িয়ে দেওয়া যায় কী বলে?... হুম্! ওখানেই আমি ফসকেছি!' ভাবতে-ভাবতে আরও একবার দাঁতে দাঁত ঘষল পিওতর পেত্রোভিচ। সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে 'আহাম্মক' বলে গালি দিল— বলাই বাহুল্য, মনে-মনে।

এই সিদ্ধান্তে আসার পর, যতখানি তিক্ততা ও বিরক্তি নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ফিরে আসার পর তা যেন দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে উঠল। কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার ঘরে অন্ত্যেষ্টিভোজের যে প্রস্তুতি চলছিল তাতে তার কিঞ্চিৎ কৌতূহল

ছিল। গতকালও এই অন্ত্যেষ্টিভোজ সম্পর্কে সে দু-একটা কথা শুনেছিল। এমনকি মনে পড়ল তাকেও যেন নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কিন্তু নিজে নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থাকায় বাকি আর কোন ব্যাপারেই সে মনোযোগ দিতে পারেনি। এ বিষয়ে জানার জন্য সে তাড়াতাড়ি ছুটল মাদাম লিপ্‌পেভেক্‌জেলের কাছে। কাতেরিনা ইভানোভ্‌না তখনও গোরস্থানে, তাই তার অনুপস্থিতিতে মাদাম লিপ্‌পেভেক্‌জেলই অতিথিদের জন্য টেবিল সাজাচ্ছিল। তার কাছ থেকে জানা গেল যে অন্ত্যেষ্টিভোজটা বেশ বড়সড় করেই হবে। বাসিন্দাদের প্রায় সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে এমন লোকজনও আছে যাদের সঙ্গে মৃত ব্যক্তির কস্মিনকালে কোন জানাশোনা ছিল না। এমনকি আন্দ্রেই সেমিওনভিচ লেবেজিয়াত্‌নিকভ্‌ও আমন্ত্রিত, যদিও একসময় কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছিল। অবশেষে আছে পিওতর পেত্রোভিচ নিজে— শুধু আমন্ত্রিতই নয়, এমনকি অধীর আগ্রহে লোকে অপেক্ষা করছে তার জন্য, যেহেতু বাসিন্দাদের সকলের মধ্যে সে-ই বলতে গেলে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত অতিথি। আমালিয়া ইভানোভ্‌না লিপ্‌পেভেক্‌জেলের সঙ্গে এককালে যত অপ্রীতিকর ঘটনাই ঘটুক না কেন তাকেও আমন্ত্রণ জানান হয়েছে মহা সমাদরে। তাই সে এখন বাড়ির গিন্নির মতো ছুটে-ছুটে কাজের তদারক করে অনেকটা তৃপ্তি পাচ্ছিল। তাছাড়া তার সাজের ঘটাও কম ছিল না— পোশাক শোকের হলে কী হবে, একেবারেই নতুন, রেশমি কাপড়ের, কোথাও কোন খুঁত নেই। আর এতে সে মনে-মনে গর্বও বোধ করছিল। যে সমস্ত তথ্য ও ঘটনার সন্ধান পিওতর পেত্রোভিচ পেল তা থেকে তার মাথায় একটা চিন্তা এলো। সেই চিন্তায় অনেকটা বিভোর হয়ে সে গিয়ে ঢুকল তার নিজের আস্তানায়— অর্থাৎ আন্দ্রেই সেমিওনভিচ লেবেজিয়াত্‌নিকভের ঘরে। ঘটনা এই যে সে এও জানতে পেরেছে যে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ও আমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন। ওইদিন সারাটা সকাল আন্দ্রেই সেমিওনভিচ কেন যেন বাড়িতে বসে রইল। এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে পিওতর পেত্রোভিচের যে-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা যেমন অদ্ভুত, তেমনি কতকটা স্বাভাবিকও। তার প্রতি পিওতর পেত্রোভিচের অবজ্ঞা ও ঘৃণা ছিল প্রবল— এমনকি মাত্রাতিরিক্ত— যেদিন থেকে সে তার এখানে আস্তানা নিয়েছে প্রায় সেদিন থেকে। আবার সেই সঙ্গে পিওতর পেত্রোভিচ তাকে যেন একটু সমীহ করেও চলত। সেন্ট পিটার্সবুর্গে এসে সে যে লেবেজিয়াত্‌নিকভের কাছে উঠেছে দুটো পয়সা বাঁচানোই তার একমাত্র কারণ নয়, যদিও সেটাই ছিল প্রায় তার মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে আরও একটা উদ্দেশ্য এখানে ছিল বৈ কি। মফস্বলে থাকতেই পিওতর পেত্রোভিচ কানাঘুষোয় শুনেছিল যে এককালে তারই অভিভাবকত্বে প্রতিপালিত আন্দ্রেই সেমিওনভিচ এখন রাজধানীর প্রগতিবাদী যুবসমাজের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, এমনকি জনসাধারণের কৌতূহল উদ্রেককারী এখানকার বহু জনশ্রুত নামী-দামি

মহলেও বিশিষ্ট ভূমিকার অধিকারী। পিওতর পেত্রোভিচও অবাক। প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন সর্বজ্ঞদের এইসব মহল সম্পর্কে পিওতর পেত্রোভিচের বহুকালের ভীতি — এরা যাকে খুশি তাকে অবজ্ঞা করে, যখন-তখন যার-তার কুকীর্তি উদ্‌ঘাটন করতে পারে। ভীতি না বলে বিশেষ একধরনের আতঙ্কই তাকে বলা ভালো, যদিও সে আতঙ্কের নির্দিষ্ট কোন রূপ নেই। অবশ্য মফস্বলে থাকার দরুনও বটে, *এধরনের বস্তু* সম্পর্কে সামান্যতম ধারণাও তার নিজের পক্ষে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। আর দশজনের মতো সেও শুনেছিল যে বিশেষ করে সেন্ট পিটার্সবুর্গে প্রগতিবাদী, নিহিলিস্ট, কুকীর্তি উদ্‌ঘাটনকারী ইত্যাদি সব চক্র আছে। কিন্তু অনেকের মতো সেও ওইসমস্ত নামের অর্থ ও তাৎপর্য হাস্যকরভাবে অতিরঞ্জিত ও বিকৃত করে দেখেছে। গত কয়েক বছর হল তার কাছে সবচেয়ে বেশি ভীতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে এই *কুকীর্তি উদ্‌ঘাটন*। সে যে সবসময় অতিমাত্রায় উদ্বেগের মধ্যে আছে এটা তার মূল কারণ— বিশেষত এমন এক সময়, যখন সে তার কার্য-কলাপের ক্ষেত্র সেন্ট পিটার্সবুর্গে স্থানান্তরের স্বপ্ন দেখছে। এদিক থেকে দেখতে গেলে সে এখন একটা বাচ্চা ছেলের মতোই *আতঙ্কগ্রস্ত*। বছর কয়েক আগে মফস্বলে যখন সে তার কর্মজীবন সবে শুরু করেছে, সেই সময় জেলার বেশ হোমড়া-চোমড়া দুই ব্যক্তির ক্ষেত্রে কুকীর্তি উদ্‌ঘাটনের ঘটনা সে স্বচক্ষে দেখেছে। তাদের দুজনের সঙ্গেই তখন পর্যন্ত তার শক্ত গাঁটছড়া বাঁধা ছিল, দুজনেই ছিল ওর পৃষ্ঠপোষক। একটা ঘটনায় ওদের একজনের বড় রকমের কেলেঙ্কারি প্রকাশ হয়ে পড়ে, অন্যটিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরিণামে বেশ ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়, ঠিক এই কারণে সেন্ট পিটার্সবুর্গে আসার সঙ্গে-সঙ্গে পিওতর পেত্রোভিচ কালবিলম্ব না করে ব্যাপারটা কী তা জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ঠিক করল, দরকার হলে, অন্তত সাবধানতার খাতিরে আগে থাকতে 'আমাদের যুব প্রজন্মের' অনুগ্রহভাজন হওয়ায় চেষ্টা করবে। এক্ষেত্রে তার ভরসাস্থল ছিল আন্দ্রেই সেমিওনভিচ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, রাস্‌কোল্‌নিকভের সঙ্গে দেখা করতে যাবার আগেই সে অন্যের কাছ থেকে ধার করা কিছু বুলি রপ্ত করে নিয়েছিল।

আন্দ্রেই সেমিওনভিচ লোকটা যে নেহাতই মামুলি ও অত্যন্ত সাধারণ স্তরের সেটা বুঝে নিতে অবশ্য দেরি হয়নি পিওতর পেত্রোভিচের। কিন্তু তাতে সে এতটুকু বিচলিত হয়নি, আবার উৎসাহিতও হয়নি। এমনকি সে যদি এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারত যে প্রগতিবাদীরা সকলেই এ ধরনের হাবাগবা, তাতেও তার অস্বস্তি যেত না। আসলে এই যে সমস্ত তত্ত্ব, চিন্তা, তন্ত্র, যার সম্পর্কে আন্দ্রেই সেমিওনভিচ তার ওপর এত জ্ঞান বর্ষণ করছে, সেগুলো নিয়ে সে থোড়াই মাথা ঘামাচ্ছে। তার নিজের উদ্দেশ্যটা সম্পূর্ণ অন্য। একমাত্র যা সে জানতে চায় এবং কালবিলম্ব না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানতে চায়, তা হল : *এখানে* আসলে কী ঘটছে, কী ভাবেই বা ঘটছে; এই লোকগুলোর সত্যি-সত্যি কোন ক্ষমতা আছে কি না; তার নিজের কোন

আশঙ্কার কারণ আছে কি না; সে যদি কোনকিছুর উদ্যোগ নেবার চেষ্টা করে তাহলে ওরা তার কুকীর্তি উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করবে কিনা; যদি করে তাহলে ঠিক কিসের ভিত্তিতে করতে পারে, ঠিক কিসের জন্যই বা আজকাল করে থাকে। শুধু কি তাই?—ওরা যদি সত্যি-সত্যি প্রভাবশালী হয়ে থাকে তাহলে কোনভাবে ওদের অনুগ্রহভাজন হয়ে ওদেরই ফাঁকি দেওয়া সম্ভব কিনা। আদৌ তার কোন দরকার আছে কি? আচ্ছা, ধরা যাক, ওদের কাজে লাগিয়ে, ওদেরই মাধ্যমে নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়া—সেটা কি সম্ভব? এককথায় সামনে পড়ে আছে এরকম শত-শত প্রশ্ন।

আন্দ্রেই সেমিওনভিচ লেবেজিয়াত্‌নিকভ্ খর্বাকৃতি, ছোটখাটো মানুষ, অস্থিসার, গলার গ্রন্থিস্ফীতি রোগে ভুগছে। কোন এক সরকারি অফিসের কেরানি সে। মাথার চুল অদ্ভুত রকমের সাদা। দুই গালে কাটলেট আকারের চাপ জুলপি। এই নিয়ে তার খুব গর্ব। তাছাড়া চোখের ব্যথা তার প্রায় নিত্যসঙ্গী। তার মনটা বড় নরম, কিন্তু কথা সে বলে রীতিমতো দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে, এমনকি কখন-কখন দারুণ খোঁচা দিয়ে—তার ওই চেহারায় সেটা প্রায় সবসময় হাস্যকর ঠেকত। প্রসঙ্গত, আমালিয়া ইভানোভ্‌না তাকে দস্তুরমতো সম্মানিত ভাড়াটেদের দলে ফেলত: অর্থাৎ লোকটা মাতলামি করে না, নিয়মিত ঘরভাড়া চুকিয়ে দেয়। এতসব গুণ থাকা সত্ত্বেও আন্দ্রেই সেমিওনভিচকে বোকা বলে না মেনে উপায় নেই। প্রগতির দলে এবং আমাদের যুব প্রজন্মের সঙ্গে সে ভিড়েছে উচ্ছ্বাসবশত। সে ছিল নানা উপাদানে তৈরি অপরিণত, ক্ষীণজীবী, অর্ধশিক্ষিত, সবজান্তা অসংখ্য ইতরজনের সেই বিপুল বাহিনীরই একজন, যারা হাল ফ্যাশনের চালু কোন আইডিয়া একবার পেয়ে গেলে কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ তাকে লুফে নেয়, সঙ্গে-সঙ্গে তাকে ইতরতার পর্যায়ে নামিয়েও আনে, ফলে যে আদর্শের সেবায় তারা অনেক সময় খুবই আন্তরিক তাকেই মুহূর্তের মধ্যে প্রহসনে পরিণত করে ফেলে।

প্রসঙ্গত, লেবেজিয়াত্‌নিকভ্ অতি ভালোমানুষ হলে কী হবে সেও কিন্তু তার ঘরের সঙ্গী এবং এককালের অভিভাবক পিওতর পেত্রোভিচকে তেমন সহ্য করতে পারছিল না। ব্যাপারটা পারস্পরিক, উভয়দিক থেকেই কেমন যেন আপনা-আপনি ঘটে গেছে। লেবেজিয়াত্‌নিকভ্ যতই সরল প্রকৃতির লোক হোক না কেন, অল্প-অল্প করে নিরীক্ষণ করার পর বুঝতে শুরু করেছে যে পিওতর পেত্রোভিচ তাকে বোকা বানানোর তালে আছে, মনে-মনে তাকে তাচ্ছিল্য করে এবং 'তাকে আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয় আদৌ সে তা নয়'। সে তাকে ফুরিয়েরের পদ্ধতি ও ডারউইনের তত্ত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেছিল; কিন্তু পিওতর পেত্রোভিচ, বিশেষত সম্প্রতি, যেন বড় বেশি বিদ্রুপের ভাব নিয়ে সেসব কথা শুনত। হালে তো তাকে গালাগালই দিতে শুরু করেছিল। ঘটনা এই যে পিওতর পেত্রোভিচ তার সহজাত বুদ্ধিতে বুঝতে শুরু করেছে যে লেবেজিয়াত্‌নিকভ্ একটা অতি নগণ্য, বোকাটে লোক তো বটেই, হয়ত

বা ডাহা মিথ্যেবাদীও, হয়ত বা তেমন উল্লেখযোগ্য কোন যোগাযোগ তার আদপে কোথাও নেই—এমনকি তার নিজের মহলেও না। আসলে সে যা বলছে তা তৃতীয় কারও মুখ থেকে শোনা কথা। শুধু তা-ই নয় : সে তার নিজের *প্রচারের* কাজটাও ঠিকমতো জানে কিনা সন্দেহ, কেননা বড় বেশি গুলিয়ে ফেলছে, তাই কুকীর্তি উদ্‌ঘাটনকারী হওয়া তো তার পক্ষে রীতিমতো দূরস্থান! প্রসঙ্গত, এই ফাঁকে আমরা লক্ষ করে থাকব যে গত দেড় সপ্তাহের মধ্যে, বিশেষত গোড়ার দিকে তো বটেই পিওতর পেত্রোভিচ বেশ উৎসাহের সঙ্গেই আন্দ্রেই সেমিওনভিচের কাছ থেকে প্রশংসাসূচক নানা মন্তব্য শুনে আসছিল—এমনকি সেগুলো বড় বেশি উদ্ভট ধরনের হওয়া সত্ত্বেও গ্রহণ করে আসছিল। অর্থাৎ ধরে নেওয়া যেতে পারে, সেগুলোতে তার কোন আপত্তি ছিল না। আবার আন্দ্রেই সেমিওনভিচ যতবারই মেশ্চান্‌স্কায়া স্ট্রিটের কোথাও ভবিষ্যতে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নতুন ধরনের *'কমিউন'* গড়ে তোলার কাজে পিওতর পেত্রোভিচের সহায়তালাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে, অথবা ধরা যাক, যখন এমন মতও ব্যক্ত করেছে যে দুনিয়া যদি তাদের বিয়ের প্রথম মাস থেকেই একজন উপপতি জুটিয়ে নেবার কথা ভেবে থাকে, তাতে যেন পিওতর পেত্রোভিচ বাধা না দেন অথবা নিজের ভাবী সন্তানদের যেন তিনি গির্জায় গিয়ে দীক্ষিত না করেন ইত্যাদি ইত্যাদি...এই একই ধাঁচের নানা কথা, তখনও সে চুপচাপ শুনে গেছে। তার ওপর যে-সমস্ত গুণ আরোপ করা হত তা নিয়েও সে স্বাভাবিকভাবেই কোন আপত্তি তোলেনি এবং এই উপায়ে তাকে যে প্রশংসা করা হত তাও সে মেনে নিয়েছিল— সেসব স্তুতিবাদ এমনই সুধা বর্ষণ করত তার কানে।

বিশেষ কোন প্রয়োজনে পাঁচ শতাংশ হারের কয়েকটি সরকারি ঋণপত্র ভাঙানোর পর সেদিন সকালে পিওতর পেত্রোভিচ টেবিলের ধারে বসে ব্যাঙ্কনোটের বাণ্ডিল আর ঋণপত্রের সিরিয়াল নাম্বারগুলো গুনে দেখছিল। আন্দ্রেই সেমিওনভিচের কাছে টাকাকড়ি প্রায় কোন কালেই ছিল না। এমন ভাব করে সে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল যে ওসব বাণ্ডিল সম্পর্কে একেবারে উদাসীন—এমনকি এগুলোকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতেই দেখে। সে যাই হোক না কেন, এই পরিমাণ টাকাকে আন্দ্রেই সেমিওনভিচ যে সত্যি-সত্যি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতে পারে, এটা কিন্তু পিওতর পেত্রোভিচের কোনমতে বিশ্বাস হচ্ছিল না। এদিকে আন্দ্রেই সেমিওনভিচের মনে হচ্ছিল তার সম্পর্কে হয়ত বাস্তবিকই ওরকম ভাবার ক্ষমতা লোকটার আছে এবং সে যে কতখানি নগণ্য, তাদের দুজনের মাঝখানে ব্যবধান যে কী দুস্তর হতে পারে, ব্যাঙ্কনোট ছড়িয়ে রেখে এই যুবক বন্ধুটিকে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, তাকে সুড়সুড়ি দিয়ে খেপিয়ে তোলার সুযোগ পেয়ে হয়ত সে মজাই পাচ্ছে। এসব ভেবে আন্দ্রেই সেমিওনভিচ ভেতরে-ভেতরে তিক্ততা অনুভব করছিল।

এবারে লেবেজিয়াত্‌নিকভ্ যখন তার প্রিয় বিষয়— বিশেষ ধরনের নতুন কমিউন

প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লুজিনকে বিশদ বলতে গেল তখন তাকে অস্বাভাবিক রকম বিরক্ত ও অমনোযোগী দেখতে পেল। টাকা গোনার ফাঁকে-ফাঁকে পিওতর পেত্রোভিচ লুজিনের মুখ থেকে যে-সমস্ত সংক্ষিপ্ত হুঁ হাঁ মন্তব্য ও আপত্তি বেরিয়ে আসছিল সেগুলো যে ইচ্ছাকৃত, অভদ্র ধরনের ব্যঙ্গ, তাতে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কিন্তু লুজিনের এই মানসিক অবস্থাকে গতকাল দুনিয়ার সঙ্গে যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় তারই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলে ধরে নিল 'মানবদরদী' আন্দ্রেই সেমিওনভিচ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রসঙ্গটা তোলার জন্য সে উসখুস করছিল। এই নিয়ে প্রগতিধর্মী ও প্রচারমূলক কিছু বলারও ইচ্ছা ছিল তার। তাতে তার মাননীয় বন্ধুটি সান্ত্বনা পেতে পারে, এটা 'নিঃসন্দেহে' তাঁর ভাবী বিকাশের সহায়ক হতে পারে।

"অন্ত্যেষ্টিভোজের ওই যে আয়োজন... সেই বিধবার ঘরে হচ্ছে সেটা কী ব্যাপার বলুন তো?" সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গায় আন্দ্রেই সেমিওনভিচের চিন্তাকে বাধা দিয়ে হঠাৎ পিওতর পেত্রোভিচ জিগ্‌গেস করল।

"আহা, আপনি যেন জানেন না। গতকালই তো এই বিষয়ের ওপর আপনাকে বললাম, এসব আচার-অনুষ্ঠান, আমার ধ্যান-ধারণাও তো আপনাকে ব্যাখ্যা করলাম।...ও হ্যাঁ, উনি আপনাকেও নিমন্ত্রণ করেছেন, আমি শুনেছি। আপনি নিজেই তো গতকাল ওর সঙ্গে কথা বলেছিলেন।..."

"ওই এক মূর্খ...রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ তার কাছ থেকে টাকা পেয়ে এই হতদরিদ্র মূর্খ মহিলাটি যে অন্ত্যেষ্টিভোজের পেছনে ঢালবে এটা আমি কখনও আশা করিনি। এমনকি এই এখন পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম : ঢালাও আয়োজন! পানীয়ের ব্যবস্থাও আছে! ...বেশ কিছু লোককে ডাকা হয়েছে। বুঝিনে বাপু, এসব কী আদিখ্যেতা!" যেন এই বিষয়টিকে বিশদ করার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পিওতর পেত্রোভিচ তার সঙ্গীকে প্রশ্ন করল। "কী বললেন? আপনি বলছেন যে আমাকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল?" মাথা তুলে হঠাৎ সে যোগ করল। "কখন করা হয়েছিল শুনি? আমি তো মনে করতে পারছি না। সে যাই হোক, আমি যাচ্ছি না। আমি ওখানে গিয়ে কী করব? আমি মাত্র গতকাল ওঁর সঙ্গে কথা বলেছিলাম, কথায়-কথায় বলেছিলাম একজন সরকারি কর্মচারীর দারিদ্র্যগ্রস্ত বিধবা হিসেবে এককালীন সরকারি অনুদান বাবদ এক বছরের মাইনে পাবার সম্ভাবনা তাঁর আছে। তাহলে কি এইজন্যই আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল? হে-হে!"

"আমারও যাবার ইচ্ছে নেই", লেবেজিয়াত্‌নিকভ্‌ বলল।

"সে আর বলতে! নিজের হাতে ঠেঙিয়েছেন! বোঝাই যাচ্ছে, বিবেকে বাধছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!"

"কে ঠেঙিয়েছে? কাকে?" হঠাৎ হকচকিয়ে গেল, এমনকি লজ্জায় লাল হয়ে উঠল লেবেজিয়াত্‌নিকভ্‌।

"কে আবার? আপনি। মাসখানেক আগে হবে...কাতেরিনা ইভানোভ্‌নাকে... মারেননি আপনি? আমি কিন্তু শুনেছি, গতকালই শুনেছি। ...তাহলে এইতো আপনার নীতিবোধ! ... মেয়েদের প্রশ্ন নিয়ে যে অত বড়-বড় কথা, ওই তো তার দাম আপনার কাছে! হাঃ-হাঃ-হাঃ!"

কথাটা বলার পর পিওতর পেত্রোভিচ যেন স্বস্তি পেয়ে আবার টাকা গুনতে লেগে গেল।

"সব বাজে কথা! কুৎসা!" অন্য সময়ে কেউ ওই ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিলে ভয়ে সিঁটিয়ে যেত লেবেজিয়াতনিকভ্‌। সে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। "ব্যাপারটা আপনি যা ভাবছেন মোটেই তা নয়! সম্পূর্ণ অন্যরকম।...আপনি ভুল শুনেছেন। গালগল্প! আমি তখন স্রেফ আত্মরক্ষা করছিলাম। উনি নিজেই প্রথম ওঁর বড়-বড় নখ বাগিয়ে আমার দিকে তেড়ে এসেছিলেন।...আমার সমস্ত জুলপি খামচে উপড়ে ফেলার উপক্রম করেছিলেন। আশা করি, নিজের ব্যক্তিসত্তাকে রক্ষা করার অধিকার যে-কোন মানুষের আছে। তাছাড়া আমার ওপর জুলুমবাজি আমি কখনও বরদাস্ত করব না।...নীতিগতভাবে। কেননা ব্যাপারটা প্রায় স্বেচ্ছাচারিতার পর্যায়ে চলে যায়। আমার কী করার ছিল বলুন? স্রেফ ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা? আমি ওঁকে কেবল ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলাম।"

"হাঃ হাঃ হাঃ!" লুজিন আগের মতোই বিদ্বেষের চাপা হাসি হাসল।

"আপনি ওরকম খুঁচিয়ে কথা বলছেন তার কারণ এই যে আপনি নিজেই বিপর্যস্ত। আপনার মন-মেজাজ ভালো নেই। ...কিন্তু ওসব একদম বাজে কথা, মেয়েদের প্রশ্নের সঙ্গে এতটুকু সম্পর্ক নেই, বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই! আপনি ভুল বুঝছেন। আমার তো এমনও মনে হয় যে মেয়েরা সমস্ত ব্যাপারে এমনকি শক্তির ক্ষেত্রেও পুরুষের সমকক্ষ— যা আবার কেউ-কেউ জোর দিয়ে বলেও থাকেন। তা যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে এখানেও সমানাধিকার থাকা উচিত। অবশ্য এটা ঠিক যে আমি পরে ভেবেচিন্তে দেখেছি যে আসলে এরকম প্রশ্ন ওঠাটা সঙ্গত নয়, কেননা মারপিট হওয়াই উচিত নয় ভবিষ্যৎ সমাজে মারপিটের ঘটনা ভাবাই যায় না এবং... মারপিটের মধ্যে সমানাধিকার খুঁজতে যাওয়া অবশ্যই অদ্ভুত। আমি অতটা বোকা নই...যদিও প্রসঙ্গত, মারপিটের ঘটনা ঘটেও...অর্থাৎ কিনা পরে ওসব থাকবে না, কিন্তু আপাতত এখনও আছে।...দূর ছাই! মরুক গে! আপনার পাল্লায় পড়ে সব গুলিয়ে যাচ্ছে। আমি যে অন্ত্যেষ্টিভোজে যাচ্ছি না তা ওই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল বলে নয়। আমি যাচ্ছি না স্রেফ নীতির খাতিরে, অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন জঘন্য অনুষ্ঠানে যোগদানের ইচ্ছে আমার নেই। এটাই কারণ। প্রসঙ্গত, তাও যাওয়া যেত, কেবল হাসার জন্য...কিন্তু আফসোসের কথা যে পুরোহিত থাকছে না। থাকলে নির্ঘাত যেতাম।"

"তার মানে, একজনের আতিথেয়তা গ্রহণ করে তারই দেওয়া খাবারের ওপর থুতু ফেলা—এ তো যারা আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছে তাদের মুখের ওপর থুতু ফেলার সামিল! তাই না?"

"মোটেই থুতু ফেলা নয়, প্রতিবাদ করা। আমার উদ্দেশ্য সৎ। আমি পরোক্ষভাবে লোকের উন্নতিতে ও নীতি প্রচারে সহায়তা করতে পারি। মানুষমাত্রেরই কর্তব্য উন্নতিবিধান ও নীতিপ্রচার এবং সম্ভবত যত কড়া হয় ততই ভালো। আমি একটা আইডিয়া ছড়িয়ে দিতে পারি, বীজমন্ত্র দিতে পারি। ...এই বীজই একসময় তথ্যের মহীরুহে পরিণত হবে। আমি কীভাবে তাদের অপমান করছি বলুন তো? প্রথম-প্রথম অপমানিত বোধ করবে, পরে নিজেরাই দেখতে পাবে আমি ওদের উপকারই করেছি। এই দেখুন না কেন তেরেবেইয়েভা নামে যে মেয়েটা এখন কমিউনে আছে তার ঘটনা। যখন সে তার প্রেমিককে নিয়ে পরিবার ছেড়ে বেরিয়ে গেল তখন মা-বাবাকে চিঠি লিখে জানাল যে কুসংস্কারের মধ্যে আর থাকতে চায় না, আনুষ্ঠানিক বিবাহের মধ্যে যাচ্ছে না। সেই সময় তার বিরুদ্ধে কম অভিযোগ করেছিল লোকে? এমন কথাও উঠেছিল যে মা-বাবার ওপর অতটা রূঢ় না হলেও চলত, আরেকটু মোলায়েম করে লিখে তাদের অব্যাহতি দেওয়া যেত। আমার মতে, যত বাজে কথা! মোলায়েম করে লেখার কোন প্রয়োজন দেখি না। বরং তার উল্‌টো—উলটোটাই ঠিক। এখানেই প্রতিবাদ জানানোর দরকার। আবার ধরুন ভারেন্‌ৎসকে। সাত বছর স্বামীর ঘর করল, দুই সন্তানকে ফেলে রাতারাতি স্বামীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কচ্ছেদ করে চিঠি লিখে জানাল : 'আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে তোমার সঙ্গে থেকে আমি সুখী হতে পারব না। কমিউনের ভিত্তিতে অন্য এক সমাজব্যবস্থা আছে—এই তথ্য আমার কাছে গোপন করে তুমি যে আমাকে প্রতারণা করেছ তার জন্য আমি তোমাকে কখনও ক্ষমা করতে পারব না। আমি সম্প্রতি এক মহাপ্রাণ ব্যক্তির কাছ থেকে এসব জানতে পেরেছি, তাকেই আমি আমার মনপ্রাণ সমর্পণ করেছি। আমরা এখন একসঙ্গে কমিউন গঠন করছি। আমি যা বলার সরাসরি বললাম, কেননা তোমাকে প্রতারণা করাকে আমি অসাধুতা মনে করি। তোমার যেমন খুশি তেমনি থাকতে পার। আমাকে ফিরে পাবার আশা কোরো না। তুমি বিলম্ব করে ফেলেছ। সুখে থাক।' এ ধরনের চিঠি ঠিক এভাবেই লিখতে হয়।"

"তা আপনার এই তেরেবাইয়েভা তো সেই মেয়েটা যার সম্পর্কে আপনি একবার বলেছিলেন যে অনুষ্ঠানের বাইরে তিনবার বিয়ে করেছে?"

"না, না, মাত্র দু'বার—সত্যি-সত্যি বিচার করে দেখতে গেলে! তা হলই বা না হয় চারবার, না হয় পনেরো বারই। ওসব অর্থহীন! আমার মা-বাবা যে মারা গেছেন তার জন্য আমার যদি কখনও দুঃখ হয়ে থাকে সেটা অবশ্যই এই এখন। আমি বেশ কয়েকবার মনে-মনে এমন স্বপ্নও দেখেছি যে ওঁরা যদি এখনও জীবিত থাকতেন

প্রতিবাদ কাকে বলে আমি ওঁদের দেখিয়ে দিতাম। আমি ইচ্ছে করে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতাম...পরিবার ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া বা ওইগোছের কোন ঘটনা—আরে ছোঃ। ওসব কোথায় লাগে! আমি হাড়ে-হাড়ে টের পাইয়ে দিতাম! আমি ওদের তাক লাগিয়ে দিতাম! সত্যি বড় দুঃখের কথা যে আমার কেউ নেই!"

"তাক লাগিয়ে দিতে চান এই তো? হে-হে! তা সে আপনি যেমনভাবে খুশি করুন না কেন", পিওতর পেত্রোভিচ ওর কথার মাঝখানে বলে উঠল, "আচ্ছা এবারে বলুন দেখি, মৃত ব্যক্তির মেয়েটাকে আপনি নিশ্চয় জানেন? —ওই যে, পুঁচকে মতন দেখতে! আচ্ছা, ওর সম্পর্কে লোকে যা বলে তা কি পুরোপুরি সত্যি? অ্যাঁ?"

"ও নিয়ে অত কথার কী আছে? আমার মতে, অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস এটাই একজন নারীর সবচেয়ে স্বাভাবিক অবস্থা। হবেই বা না কেন? অর্থাৎ কিনা, Distinguons — প্রভেদ নির্ণয় করে দেখব। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় অবশ্য এটা পুরোপুরি স্বাভাবিক নয়, কারণ তা লোকের ওপর চাপিয়ে দেওয়া, কিন্তু ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হবে, যেহেতু সে সমাজব্যবস্থা হবে স্বাধীন। তাছাড়া এখনও মেয়েটির সে অধিকার আছে : সে কষ্ট ভোগ করেছে, এটা তার সম্পদ, যাকে বলে পুঁজি, তা যেমনভাবে খুশি খাটানোর পূর্ণ অধিকার তার আছে। অবশ্য এটা ঠিক যে ভবিষ্যৎ সমাজব্যবস্থায় পুঁজির কোন স্থান থাকবে না। কিন্তু ওর ভূমিকা অন্য অর্থে তাৎপর্যমণ্ডিত হবে, তার ভিত্তি হবে সুসঙ্গত ও যুক্তিপূর্ণ। ব্যক্তিগতভাবে সোনিয়া—মানে সোফিয়া সেমিওনভ্‌না সম্পর্কে আমি যেটুকু বলতে পারি তা এই যে তার কার্যকলাপকে আমি বর্তমান সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদের সুস্পষ্ট প্রকাশ হিসেবে দেখে থাকি এবং সেই জন্য তাকে গভীর শ্রদ্ধাও করি। এমনকি তাকে দেখে আমার আনন্দই হয়!"

"কিন্তু আমি যে শুনলাম আপনিই নাকি ওকে বাড়ির আশ্রয় ছাড়তে বাধ্য করেছেন!"

লেবেজিয়াত্‌নিকভ্‌ ভয়ঙ্কর খাপ্পা হয়ে উঠল।

"এই আরেকটা কুৎসা!" সে গর্জন করে বলল। "ব্যাপারটা আদৌ তা নয়, একেবারে নয়! আর যা-ই মানি এটা কিন্তু মানতে রাজি নই! কাতেরিনা ইভানোভ্‌না তখন কিছু বুঝতে না পেরে মিথ্যে করে বলেছেন! আমি সোফিয়া সেমিওনভ্‌নার ওপর মোটেই কোন জোর খাটানোর চেষ্টা করিনি। আমি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে স্রেফ তাঁর আত্মিক বিকাশ ঘটানোর জন্য তাঁকে সাহায্য করেছি, তাঁর ভেতরে প্রতিবাদ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি।... আমার একমাত্র যা দরকার ছিল তা হল তাঁর প্রতিবাদ। ...তাছাড়া সোফিয়া সেমিওনভ্‌নার পক্ষে এমনিতেই এখানে থাকা সম্ভব ছিল না।"

"কমিউনে থাকার ডাক দিয়েছিলেন নাকি?"

"আপনি এখনও আমাকে নিয়ে মজা করছেন, যদিও তাতে খুব একটা সফল হচ্ছেন না...এ মন্তব্য না করে কিন্তু আমি পারছি না। আপনি কিছুই বুঝতে পারছেন না! কমিউনে ওরকম ভূমিকার কোন সুযোগ নেই। কমিউন এই উদ্দেশ্যেই গঠিত হয় যাতে ওরকম ভূমিকা না থাকে। কমিউনে এই ভূমিকা তার বর্তমান চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটাবে। এখানে যা মূর্খামি ওখানে তা বিচক্ষণতার পরিচায়ক হবে। যা এখানে বর্তমান পরিস্থিতিতে অস্বাভাবিক ওখানে তা হবে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সবই নির্ভর করছে মানুষ কোন্ পরিস্থিতিতে, কোন পরিবেশে আছে তার ওপর। পরিবেশই সব, ব্যক্তিমানুষ কিছু নয়। সোফিয়া সেমিওনভ্‌নার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এখনও বেশ ভালো—তার প্রমাণ এই যে তিনি কখনও আমাকে তাঁর নিগ্রহকারী বা শত্রু বলে গণ্য করেননি। হ্যাঁ, জেনে রাখুন! আমি এখন তাঁকে কমিউনে টানার চেষ্টা করছি। তবে সম্পূর্ণ অন্য ভিত্তিতে, একেবারে অন্য ভিত্তিতে! এর মধ্যে আপনি হাসির কী দেখলেন? আমরা আমাদের নিজেদের কমিউন গড়ে তুলতে চাই, তবে আগের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক ও প্রশস্ত ভিত্তির ওপর। আমরা আমাদের বিশ্বাস নিয়ে আরও অনেক দূর এগিয়েছি। আমাদের অস্বীকৃতির মাত্রা আরও বেশি! দব্রোলিউবভ যদি সমাধি থেকে উঠে আসতেন তাহলে আমি তাঁর সঙ্গে বিতর্কে নামতাম। আর বেলিন্‌স্কির কথা যদি বলেন, তাকে তুলোধুনো করে ছেড়ে দিতাম! কিন্তু আপাতত আমি সোফিয়া সেমিওনভ্‌নার আত্মিক বিকাশের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এক অপূর্ব প্রকৃতি, অপূর্ব!"

"বটে, ওই অপূর্ব প্রকৃতিকেই বুঝি কাজে লাগাচ্ছেন, অ্যাঁ? হে-হে!"

"না না! আরে তা কেন হবে। বরং তার উলটো!"

"হ্যাঁ উলটো—বললেই হল! হাঃ হাঃ হাঃ! কী কথাই না বললেন!"

"কিন্তু বিশ্বাস করুন! কোন কারণে আমি আপনার কাছ থেকে গোপন করতে যাব, দয়া করে বলবেন কি? বরং উলটো—আমার নিজেরই অদ্ভুত মনে হয় : আমার সঙ্গে আচরণে কেমন যেন বাড়াবাড়ি রকমের লাজুক, এমনকি নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্য যেন ভীষণভাবে সচেষ্ট!

"আর আপনি, বলাই বাহুল্য, তার বিকাশ ঘটিয়ে যাচ্ছেন... হে-হে! উঠে পড়ে তার কাছে প্রমাণ করতে লেগেছেন যে ওসব লজ্জা-টজ্জা বাজে ব্যাপার?..."

"আদৌ না! আদৌ তা নয়! ওঃ কী স্থূলভাবে, কী মূর্খের মতন—মাফ করবেন আমাকে—'বিকাশ' কথাটিকে আপনি গ্রহণ করছেন! কিছুই বোঝেন না দেখছি! হা ভগবান, এখনও আপনি... সেভাবে প্রস্তুত নন! আমরা নারীস্বাধীনতার সন্ধানে আছি, কিন্তু আপনার মাথায় ঘুরছে সেই এক জিনিস। মেয়েদের লজ্জা আর সতীত্বের প্রশ্ন যদি সম্পূর্ণ ছেড়েও দিই... যেহেতু ওগুলো অমনিতেই অপ্রয়োজনীয়, এমনকি কুসংস্কারও বটে... তবু আমার সঙ্গে আচরণে উনি যে সতীত্ব রক্ষা করে চলেন, তাতে

আমার আপত্তি নেই, এতটুকু আপত্তি নেই, যেহেতু সেটা তাঁর সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছে, তাঁর অধিকার। বলাই বাহুল্য, উনি নিজে যদি আমাকে বলতেন : 'তোমাকে পেতে চাই' তাহলে আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান জ্ঞান করতাম, কেননা মেয়েটিকে আমার ভারি পছন্দ। কিন্তু এখন, অন্তত এই মুহূর্তে, অবশ্যই আমার চেয়ে বেশি ভদ্রতা ও সৌজন্য তাঁকে আর কেউ কখনও দেখায়নি, তাঁর গুণের এত মর্যাদাও কেউ দেয়নি।...আমি অপেক্ষা করে আছি, আশায়-আশায় আছি—এইমাত্র!''

''আপনি বরং ওকে কিছু উপহার-টুপহার দিলে পারতেন। আমি বাজি ধরে বলতে পারি আপনি একথাটা একদম ভেবে দেখেননি।''

''কিস্যু বোঝেন না আপনি—আমি তো বলেইছি আপনাকে! ওর অবস্থাটা অবশ্যই যেমন দেখছেন তাই—কিন্তু সেটা অন্য প্রশ্ন। একেবারে অন্য! আপনি ওঁকে শুধু তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে যাচ্ছেন। ভুল তথ্যের ভিত্তিতে আপনি তাঁকে তাচ্ছিল্য করার যোগ্য বলে গণ্য করছেন। আপনি মানবিক দৃষ্টিতে একজন মানুষকে দেখতে চাইছেন না। আপনি এখনও জানেন না তাঁর প্রকৃতি ঠিক কী ধরনের! আমার বড় দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে আজকাল কেন যেন উনি বইপড়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছেন, আমার কাছে বই-পুঁথি নিতে আসেন। আগে নিতেন। আমার আরও আক্ষেপ এই যে —ওঁর প্রতিবাদ করার এত যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সঙ্কল্প, যার প্রমাণ উনি একবার দিয়েওছেন, তা সত্ত্বেও স্বাতন্ত্র্যবোধ...যাকে বলে স্বাধীন চেতনা...তা এখনও যেন ওঁর বেশ কম। যে কোন কুসংস্কার আর...মূর্খামি সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলতে হলে অস্বীকৃতির যে ক্ষমতা দরকার তাতে ঘাটতি ওঁর আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন-কোন প্রশ্ন তিনি চমৎকার বোঝেন। যেমন ধরুন, হাতে চুমু খাওয়ার প্রশ্নটি তিনি অতি চমৎকার বুঝেছেন। অর্থাৎ কিনা একজন পুরুষ যদি একজন মহিলার হাতে চুমু খায় তাতে মহিলাকে অসমান বিবেচনা করে তাকে অপমান করা হয়। এই প্রশ্নের ওপর একটা বিতর্ক আমাদের হয়েছিল — সেকথা আমি তক্ষুনি ওঁকে জানিয়ে দিই। ফ্রান্সের শ্রমিক সমিতির কথা যখন আমি ওঁকে বলি তাও উনি মনোযোগ দিয়ে শোনেন। এখন আমি ভবিষ্যৎ সমাজে স্বাধীনভাবে যে কোন ঘরে প্রবেশ করা যায় কিনা এই প্রশ্ন ব্যাখা করছি ওঁকে।''

''সেটা আবার কী বস্তু?''

''সম্প্রতি আমাদের বিতর্কের বিষয় ছিল একটি : কমিউনের কোন সদস্যের নারী পুরুষ নির্বিশেষে যে কোন সদস্যের ঘরে যখন-তখন প্রবেশ করার অধিকার আছে কিনা...তা শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল সে অধিকার আছে।...''

''কিন্তু কোন পুরুষ বা মহিলা যদি ঠিক সেই মুহূর্তে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে ব্যস্ত থাকেন তখন কী হবে? হে-হে!''

আন্দ্রেই সেমিওনভিচ একথায় রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল।

"আপনার সেই ঘুরেফিরে এক কথা! কোথাকার যত জঘন্য 'প্রয়োজন' না কি তাই নিয়ে মাথাব্যথা!" ঘৃণাভরে সে চেঁচিয়ে উঠল। "ছিঃ! আমার নিজের ওপর কী রাগই যে হচ্ছে! আক্ষেপও হচ্ছে এই ভেবে যে ব্যবস্থাটা বুঝিয়ে বলতে গিয়ে আমি তখন এসব জঘন্য প্রয়োজনের উল্লেখ আগেভাগে করে ফেলেছি! চুলোয় যাক! আপনাদের মতো যারা আছে তাদের সকলের কাছে এটা একটা বড় প্রতিবন্ধক আর সবচেয়ে খারাপ এই যে ব্যাপারটা আসলে কী, জানার আগেই তা নিয়ে আপনারা সবসময় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন! যেন আপনারাই ঠিক! যেন এতে আপনাদের গর্ব! ছিঃ! আমি এর আগেও কয়েকবার এই মত পোষণ করে এসেছি যে এই প্রশ্নটি একজন নতুন শিক্ষার্থীর সামনে আগাগোড়া তুলে ধরা যেতে পারে একেবারে শেষ দিকে—একমাত্র তখনই, যখন এই ব্যবস্থায় তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, যখন মানুষটি পরিণত হয়ে উঠেছে, তার লক্ষ্য ঠিক করে ফেলেছে। আচ্ছা হ্যাঁ, দয়া করে বলবেন কি, আঁস্তাকুড়ও যদি ধরি, তার মধ্যেই বা লজ্জার ও তাচ্ছিল্য করার মতো কী আপনি খুঁজে পান? আমি নিজেই প্রথম সেই আঁস্তাকুড় সাফ করার জন্য এগিয়ে আসব। এখানে এমনকি আত্মত্যাগ করার মতোও কিছু নেই! স্রেফ একটা কাজ, মহৎ কাজ, সমাজের পক্ষে উপকারী, আর দশটা কাজের সমান। এমনকি, কোন রাফাএল বা পুশকিনের কার্যকলাপের দৃষ্টান্ত যদি ধরেন তার চাইতে অনেক ওপরে, যেহেতু অনেক বেশি উপকারী।"

"এবং মহত্তর, অনেক বেশি মহৎ। হাঃ হাঃ হাঃ!"

"মহত্তর? তার মানে? মানুষের কার্যকলাপের সংজ্ঞা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ওরকম কোন শব্দের আমি তাৎপর্য বুঝতে পারি না। 'মহত্তর' 'উদারতর'—এসবই রাবিশ, মূর্খামি। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সেকেলে শব্দ। এগুলোতে আমার আপত্তি আছে! মানুষের পক্ষে যা *উপকারী* সেটাই মহৎ। আমি বুঝি একটাই শব্দ—*উপকারী*। হাসুন হাসুন, যত খুশি হাসুন, কিন্তু ব্যাপারটা তাই!"

পিওতর পেত্রোভিচ জোর হাসছিল। ইতিমধ্যে তার গোনার কাজ শেষ হয়ে গেছে। টাকার বাণ্ডিলও সে উঠিয়ে রাখছিল। তবে হ্যাঁ, একটা অংশ কেন যেন তখনও টেবিলে পড়ে ছিল। বিষয়টা যত তুচ্ছই হোক না কেন 'আঁস্তাকুড়ের' এই প্রশ্নটাই কিন্তু ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার পিওতর পেত্রোভিচ আর তার যুবক বন্ধুটির মধ্যে মতভেদ ও মনোমালিন্যের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। এর মধ্যে মূর্খতাটা পুরোপুরি এখানেই যে আন্দ্রেই সেমিওনভিচ সত্যি-সত্যি রেগে যাচ্ছিল। অন্যদিকে লুজিন কিন্তু এই সুযোগে মনের ভার হালকা করছিল এবং ঠিক এই মুহূর্তে লেবেজিয়াত্‌নিকভ্‌কে খেপিয়ে তুলতে তার বিশেষ করে ইচ্ছে হচ্ছিল।

"আসলে গতকালের ব্যর্থতার জন্য আপনি অমন খেপে আছেন এবং আমার পেছনে লাগছেন," অবশেষে লেবেজিয়াত্‌নিকভের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, যদিও

সাধারণভাবে বলতে গেলে, লেবেজিয়াত্‌নিকভ্‌ যত 'স্বাধীনচেতা'ই হোক, যত 'প্রতিবাদের' কথাই সে বলুক না কেন, পিওতর পেত্রোভিচের মুখের ওপর কিছু বলতে তার কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকত এবং মোটের ওপর এখনও আগেকার সেই অভ্যাসবশত তার সামনে এক ধরনের শ্রদ্ধার ভাব বজায় রেখেই সে চলত।

"আচ্ছা, আপনি বরং বলুন দেখি একটা কথা," বাধা দিয়ে বিরক্তি ও দম্ভমিশ্রিত সুরে পিওতর পেত্রোভিচ বলল, "যে যুবতীটির উল্লেখ আপনি করলেন তাকে কি এক্ষুনি, মিনিটখানেকের জন্য এখানে, এই ঘরে আপনি ডেকে আনতে পারেন? ...অথবা আরও ভালোভাবে বলতে গেলে আপনার সঙ্গে সত্যি-সত্যিই কি তার অতটা মাখামাখি আছে? আমার মনে হয় ওরা সবাই ইতিমধ্যে গোরস্থান থেকে ফিরে এসেছে। ...আমি শুনতে পাচ্ছি লোকজনের চলাচলের শব্দ। ...মানে, ওই বিশেষ চরিত্রটিকে আমি একবারটি দেখতে চাই।"

"আপনার আবার কী দরকার?" লেবেজিয়াত্‌নিকভ্‌ বিস্ময় প্রকাশ করল।

"ওই অমনি, একটা দরকার আছে। আজকালের মধ্যে আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি, তাই আমি তাকে জানাতে চাই... সে যাই হোক, তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তার সময় দয়া করে এখানেই থাকবেন আপনি। তাতে বরং ভালোই হবে। নইলে, ভগবান জানেন, আপনি আবার কী না কী ভেবে বসবেন।"

"আমি মোটেই কিছু ভাবব না।...আমি কেবল এই কারণেই জিগ্‌গেস করেছিলাম যে আপনার যদি কোন কাজ থাকে তাহলে ওকে ডেকে আনতে অনেক বেশি সুবিধে হয়। এখুনি যাচ্ছি। আপনি নিজেও নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন যে আপনার ব্যাঘাত ঘটাব না।"

সত্যি-সত্যি মিনিটপাঁচেক বাদে লেবেজিয়াত্‌নিকভ্‌ ফিরে এলো সোনিয়াকে নিয়ে। সোনিয়া দারুণ অবাক হয়ে, তার স্বাভাবিক সলজ্জ ভঙ্গিতে ঘরে প্রবেশ করল। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সে সবসময়ই লজ্জা পায়, নতুন মুখ আর নতুন আলাপে তার বড় ভয়। ভয় আগেও ছিল, সেই ছোটবেলা থেকে—এখন তো কথাই নেই। ...পিওতর পেত্রোভিচ তার সঙ্গে 'সস্নেহ ও ভদ্র' ব্যবহার করল, তবে তার আচরণের মধ্যে কেমন যেন একটা খুশি-খুশি অন্তরঙ্গতার ভাব দেখা দিল। প্রসঙ্গত, পিওতর পেত্রোভিচের মতে, এরকম একটি কচি বয়সের এবং এক অর্থে *আকর্ষণীয়* এক সৃষ্টির সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তার মতো একজন শ্রদ্ধাভাজন ও ভারিক্কি লোকের পক্ষে সেটা ছিল মানানসই। পিওতর পেত্রোভিচ ওকে 'আশ্বস্ত' করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল, টেবিলের ধারে নিজের মুখোমুখি বসাল। সোনিয়া বসল। বসে নজর বুলাল চারপাশে — দেখল লেবেজিয়াত্‌নিকভ্‌কে। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা কিছু টাকার ওপরও নজর পড়ল। তারপর হঠাৎ আবার তাকাল পিওতর পেত্রোভিচের দিকে। এবারে সে আর চোখ ফেরাল না। তার দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল পিওতর পেত্রোভিচের

মুখের ওপর, লেবেজিয়াত্নিকভ্ দরজার দিকে পা বাড়াল। পিওতর পেত্রোভিচ উঠে দাঁড়িয়ে ইশারায় সোনিয়াকে বসে থাকতে বলল এবং দরজার কাছে লেবেজিয়াত্নিকভের গতিরোধ করল।

"সেই রাস্কোল্নিকভ্টা কি ওখানে?" লেবেজিয়াত্নিকভ্কে ফিসফিসিয়ে সে জিগ্গেস করল।

"রাস্কোল্নিকভ্? হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কী হয়েছে? হ্যাঁ, ওখানে।...এইমাত্র ঢুকল আমি দেখেছি। ...কী ব্যাপার?"

"বেশ, আমি তাহলে বিশেষ করে আপনাকে অনুরোধ করব এখানে আমাদের সঙ্গে থাকতে। আমাকে এই... মেয়েটির সঙ্গে একা ছেড়ে যাবেন না। আমার কাজটা নেহাত তুচ্ছ, কিন্তু লোকে তার কী অর্থ করতে পারে ভগবান জানেন। আমি চাই না যে রাস্কোল্নিকভ্ *ওখানে* বলে বেড়ায়...আপনি বুঝতে পারছেন আমি কী বলছি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পারছি!" লেবেজিয়াত্নিকভ্ হঠাৎ অনুমান করতে পারল। "হ্যাঁ, আপনার অধিকার আছে। ...এটা অবশ্য ঠিক, ব্যক্তিগতভাবে আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আপনার আশঙ্কাটা একটু বাড়াবাড়ি ধরনের হয়ে যাচ্ছে, তবে... সে যাই হোক, আপনার অধিকার আছে। আপনি যখন বলছেন তখন আমি থাকব। আমি এখানে এই জানলার ধারে দাঁড়িয়ে থাকব। আপনার ব্যাঘাত ঘটাব না। ...আমার মতে, আপনার অধিকার আছে।..."

পিওতর পেত্রোভিচ ফিরে এসে সোফায় সোনিয়ার মুখোমুখি বসল। মনোযোগ দিয়ে, তাকে তাকিয়ে দেখল, তারপর হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর, এমনকি বেশ খানিকটা কঠোর ভাব ধারণ করল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল যেন বলতে চায় : 'তুমি কিন্তু তাই বলে কিছু ভেবে বসো না গো দিদি।' সোনিয়া একেবারে বিভ্রান্ত।

"প্রথমত, সোফিয়া সেমিওনভ্না, আপনি দয়া করে আপনার পরম শ্রদ্ধেয়া মাতৃদেবীর কাছ থেকে আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেবেন।...ঠিক বললাম কিনা? কাতেরিনা ইভানোভ্না আপনার মা'র মতন তাই না?" পিওতর পেত্রোভিচ বেশ গম্ভীরভাবে কথাগুলো শুরু করলেও তার সুরে স্নেহের এতটুকু অভাব ছিল না। তার অভিপ্রায় দস্তুরমতো বন্ধুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছিল।

"ঠিক বলেছেন, উনি আমার মা'র মতন," তড়বড় করে ভয়ে-ভয়ে উত্তর দিল সোনিয়া।

"বেশ, তাহলে দয়া করে আমার হয়ে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে বলবেন যে আমি অনিবার্য কারণবশত উপস্থিত থাকতে পারলাম না। আপনার মাতৃদেবীর সুমধুর আহ্বান সত্ত্বেও আপনাদের প্যানকেকের ভোজে... অর্থাৎ অন্ত্যেষ্টিভোজে আমার উপস্থিত থাকা সম্ভব হচ্ছে না।"

"বেশ, এখুনি বলব", বলেই সোনিয়া তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল।

"*এখনও* শেষ হয়নি", মেয়েটার ভদ্রতাজ্ঞানের অভাব এবং বড় বেশি সারল্যের পরিচয় পেয়ে মৃদু হেসে পিওতর পেত্রোভিচ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল। "সোফিয়া সেমিওনভ্না, আপনি যদি মনে করে থাকেন যে শুধু আমার সঙ্গেই সম্পর্কিত তুচ্ছ একটা কারণে ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে, আপনার মতো একজন মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলব, ডেকে পাঠাব, তাহলে বলব আপনি আমাকে সামান্যই জানেন। আমার উদ্দেশ্য অন্য।"

সোনিয়া ধপ করে বসে পড়ল। ধূসর ও রামধনু রঙের যে ব্যাঙ্কনোটগুলো টেবিল থেকে তখনও সরান হয়নি সেদিকে আবার তার একপলক দৃষ্টি পড়ে গেল। পরক্ষণেই সেখান থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পিওতর পেত্রোভিচের দিকে চোখ তুলে তাকাল। হঠাৎ তার মনে হল পরের টাকাকড়ির ওপর নজর দেওয়া বিশ্রী রকমের অভদ্রতা হয়ে যাচ্ছে—বিশেষত *তার* পক্ষে। পিওতর পেত্রোভিচের বাঁ হাতে ধরে রাখা সোনার ফ্রেমের লর্নেট চশমা এবং ওই হাতের মধ্যমাতে হলুদ রঙের পাথর বসান দারুণ সুন্দর, বিশাল আঙটিটার ওপর দৃষ্টি রাখতে যাচ্ছিল কিন্তু কী করবে বুঝে উঠতে না পেরে হঠাৎ সেখান থেকেও চোখ সরিয়ে নিল। পরিণামে আবারও দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সরাসরি পিওতর পেত্রোভিচের চোখের ওপর। আগের চেয়ে গম্ভীর ভাব করে আরও খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর পিওতর পেত্রোভিচ বলতে শুরু করল :

"গতকাল ঘটনাক্রমে পাশ দিয়ে যাবার সময় দুর্ভাগা কাতেরিনা ইভানোভ্নার সঙ্গে দু-একটা বাক্যবিনিময় আমার হয়েছিল। দুটো কথা বলেই আমার বুঝতে বাকি রইল না যে তিনি এমন একটা অবস্থার মধ্যে রয়েছেন যাকে এককথায় বলা চলে অস্বাভাবিক।..."

"হ্যাঁ...অস্বাভাবিক", তাড়াতাড়ি সায় দিয়ে বলল সোনিয়া।

"অথবা আরও সহজ ও বোধগম্য ভাষায় বলতে গেলে—তিনি সুস্থ অবস্থায় নেই।"

"হ্যাঁ, আরও সহজ ও বোধ...হ্যাঁ, তা-ই বলতে পারেন।"

"ঠিক তাই। অতএব মানবিক উপলব্ধি এবং...এবং বলতে গেলে, সমবেদনার বশবর্তী হয়ে, তাঁর অনিবার্য দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির কথা চিন্তা করে আমি, আমার দিক থেকে কোন না কোন ভাবে তাঁর সামান্য উপকারে আসতে চাই। আমার মনে হয় দারিদ্র্যপীড়িত এই গোটা পরিবারটা এখন একমাত্র আপনার ওপরই নির্ভরশীল।"

"কিছু যদি মনে না করেন আপনাকে একটা কথা জিগ্গেস করি..." বলতে-বলতে সোনিয়া হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, "...আপনি গতকাল ওঁর পেনশন পাবার সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন যে সেটা কী? কেননা গতকালই উনি বলছিলেন আপনি নাকি ওঁর পেনশন বের করার দায়িত্ব নিয়েছেন? এটা কি সত্যি?"

"আদৌ ব্যাপারটা তা নয়, বরং এক অর্থে হাস্যকর। আমি শুধু এই ইঙ্গিত দিয়েছিলাম যে কোন সরকারি কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় মারা গেলে, যদি প্রভাবশালী কেউ পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তাহলে তার বিধবা স্ত্রীর সাময়িকভাবে সরকারি সাহায্য পাবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আপনার পরলোকগত জন্মদাতা পুরো মেয়াদ পর্যন্ত চাকরি তো করেনইনি, এমনকি শেষদিকে চাকরিই করতেন না। এককথায়, আশা যদি কিছু থাকতও সেটা হত অতি ক্ষীণ, কেননা এ ক্ষেত্রে বস্তুত ভাতা পাবার কোন অধিকার তার নেই। বরং বিপরীত। ...অথচ উনি কিনা এর মধ্যে পেনশনের কথা ভেবে বসে আছেন। হাঃ হাঃ হাঃ! ভদ্রমহিলা তো বেশ চটপটে দেখছি!"

"হ্যাঁ, পেনশনের কথা ভাবছেন। ...তার কারণ উনি ভালোমানুষ, সহজে লোককে বিশ্বাস করেন। এই ভালোমানুষির জন্য যে যা বলে তাতেই বিশ্বাস করেন এবং...এবং...এবং...ওঁর চিন্তার ধারাটাই অমনি...হ্যাঁ...আমাকে মাফ করবেন এসব বলছি বলে," এই বলে সোনিয়া আবার উঠে স্থানত্যাগের উদ্যোগ করল।

"দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমার সব কথা এখনও শুনলেনই তো না।"

"হ্যাঁ, তা শুনিনি," বিড়বিড় করে বলল সোনিয়া।

"তাহলে বসুন দেখি দয়া করে।"

সোনিয়া ভীষণরকম ভেবাচেকা খেয়ে আবার বসে পড়ল—এই নিয়ে তৃতীয়বার।

"তাঁর এবং সেই সঙ্গে হতভাগ্য কচি-কাঁচাগুলোর এমন দুর্দশা দেখে আমার ইচ্ছে হয়েছে— সেকথা আমি আগেই বলেছি—আমার সাধ্যমতো কোন উপকারে লাগা। অর্থাৎ যাকে বলে, আমার সাধ্যমতো কিছু করা— তার বেশি কিছু নয়। হয়ত, এই ধরুন না কেন, তাঁর সাহায্যের জন্যে চাঁদা করে কিছু তোলা যায় অথবা যাকে বলে লটারি...বা ওইধরনের কিছুরও আয়োজন করা যায়— ঘনিষ্ঠ লোকেরা কিংবা নিদেনপক্ষে মোটের ওপর যারা সাহায্য করতে ইচ্ছুক এধরনের বাইরের লোকজনও এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় তা-ই করে থাকে। ঠিক এই কথাটাই জানানো আমার অভিপ্রায়। এটা সম্ভব।"

"বেশ, ভালো।...ঈশ্বর আপনাকে এর জন্যে..." পিওতর পেত্রোভিচের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে সোনিয়া আমতা-আমতা করে বলল।

"সম্ভব, তবে...এ বিষয়ে পরে কথা হবে...অর্থাৎ শুরু করা যেতে পারে আজই। সন্ধেবেলায় দেখা হবে, তখন কথাবার্তা বলে ঠিক করা যাবে এবং যাকে বলে, প্রাথমিক সূচনা, তাই করা যাবে। সাতটা নাগাদ আমার এখানে একবার আসুন। আশা করি আন্দ্রেই সেমিওনভিচও আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন...তবে হ্যাঁ,...এখানে একটা কথা আছে, যা আগে থাকতে ভালো করে মনে করিয়ে দিতে হয়। ঠিক এই কারণেই

আপনাকে এখানে আসতে বলে কষ্ট দিলাম, সোফিয়া সেমিওনভ্না। আমার নিজের অভিমত এই যে কাতেরিনা ইভানোভ্নার নিজের হাতে টাকা দেওয়া ঠিক হবে না, সেটা বিপজ্জনকও বটে। তার প্রমাণ—আজকের এই অন্ত্যেষ্টিভোজ। ঘরে আগামীকালের উপেযোগী সামান্য খুদকুঁড়ো পর্যন্ত নেই. পায়ের জুতো বা প্রয়োজনীয় একটি জিনিসও নেই, অথচ দেখুন, আজ কিনে বসে আছেন জামাইকান রম, এমনকি, আমার তো মনে হল মাদেইরা এবং...এবং...এবং ...কফিও আছে। আমি পাশ দিয়ে যেতে-যেতে দেখেছি। আগামীকালই আবার সব আপনার মাথার ওপর ভেঙে পড়বে, একটুকরো রুটির চিন্তা পর্যন্ত আপনাকেই করতে হবে। কোন অর্থ হয়? সেই কারণে, আমার নিজের দৃষ্টিতে, চাঁদা তোলার ব্যাপারটাও এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে ওই দুর্ভাগা বিধবাটি, বলা যেতে পারে, ঘুণাক্ষরেও কিছু টের না পান। জানবেন, ধরুন শুধু আপনি। যা বলছি ঠিক কিনা?"

"আমি জানি নে। উনি শুধু আজই এমন করছেন...জীবনে একবার...তাঁর বড় ইচ্ছে ছিল স্মরণ করা, স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানান।...কিন্তু আসলে উনি খুব বুদ্ধিমতী। সে যাক গে, আপনার যেমন অভিরুচি। ...আমি খুব, খুব, খু-উ-ব...ওরা সকলেও...আর ভগবান আপনাকে...ওই অনাথ শিশুগুলোও..."

সোনিয়া ছাড়াছাড়াভাবে বলল। কথাগুলো সে শেষ করতে পারল না। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

"বটে, বেশ, তাহলে মনে রাখবেন। আচ্ছা, এখন আপনার আত্মীয়স্বজনের স্বার্থে, প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী সামান্য যেটুকু অর্থ ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে ব্যয় করা সম্ভব, তা গ্রহণ করে আমাকে বাধিত করুন। আমার ইচ্ছে, একান্তভাবে ইচ্ছে, এই প্রসঙ্গে আমার নাম যেন প্রকাশ না পায়। এই যে...আমার, বলতে গেলে নিজস্ব কতকগুলো সমস্যা থাকায় এর চেয়ে বেশি আর দেওয়া সম্ভব হল না। ..." এই বলে দশ রুবলের একটা নোট সযত্নে ভাঁজ খুলে সোনিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিল পিওতর পেত্রোভিচ। সোনিয়া নোটটা নিল, তার চোখেমুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল, এক লাফে জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় নেবার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি মাথা নুইয়ে নমস্কার জানিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলল। পিওতর পেত্রোভিচ ভদ্রতা করে তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। সোনিয়া যখন ছাড়া পেল তখন সে রীতিমতো উত্তেজিত ও বিপর্যস্ত। কাতেরিনা ইভানোভ্নার কাছে ফিরে এলো অত্যন্ত বিব্রত অবস্থায়।

এই দৃশ্য যতক্ষণ চলছিল সেই সময়ের মধ্যে আন্দ্রেই সেমিওনভিচ কখনও জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল, কখনও বা ঘরে পায়চারি করছিল—ওদের কথাবার্তার মাঝখানে ব্যাঘাত ঘটানোর কোন ইচ্ছে তার ছিল না। সোনিয়া চলে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে সে পিওতর পেত্রোভিচের দিকে এগিয়ে গিয়ে আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিল।

"আমি সব শুনেছি, সব *দেখেছি,*" শেষ কথাটার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে সে বলল। এটা একটা মহৎ কাজ, অর্থাৎ আমি বলতে চাই, মানবিক কাজ! আপনি ওর কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ ইচ্ছে করে এড়িয়ে গেলেন, আমি দেখেছি! যদিও স্বীকার করছি যে নীতিগতভাবে ব্যক্তিগত চ্যারিটির প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নেই, কেননা এতে মন্দের মূলোচ্ছেদ তো হয়ই না বরং তার আরও বেশি পুষ্টি সাধিত হয়। তা সত্ত্বেও স্বীকার না করে পারছি না যে আপনার আচরণে আমি পুলকিত। হ্যাঁ, যা বলছি...আমার ভালো লেগেছে।"

"ওসব রাবিশ!" কতকটা উত্তেজিত হয়ে অদ্ভুতভাবে লেবেজিয়াত্‌নিকভ্‌কে নিরীক্ষণ করতে-করতে বিড়বিড় করে বলল পিওতর পেত্রোভিচ।

"না, রাবিশ নয়। আপনার মতো মানুষ, গতকালের ঘটনায় অপমানিত ও আহত হওয়া সত্ত্বেও একই সঙ্গে যে অন্যদের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবার ক্ষমতা রাখে—এরকম একজন মানুষ...যদিও কাজের মধ্য দিয়ে একটা সামাজিক ভুল করছেন, তবু...শ্রদ্ধার যোগ্য! আপনার কাছ থেকে আমি আশাই করতে পারিনি পিওতর পেত্রোভিচ, বিশেষত আপনার যা ধ্যানধারণা সেদিক থেকে বিবেচনা করে। ওঃ, আপনার ওই সব ধ্যানধারণা আপনার কী প্রতিবন্ধকতাই না সৃষ্টি করছে! ধরুন না কেন, গতকালের ওই ব্যর্থতা—তাতে কি মুষড়েই না আপনি পড়েছেন!" পিওতর পেত্রোভিচের প্রতি আবার সদয়ভাব তীব্রভাবে উপলব্ধি করে ভালোমানুষ আন্দ্রেই সেমিওনভিচ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল। "আচ্ছা, অশেষ শ্রদ্ধাভাজন, মহামতি পিওতর পেত্রোভিচ, বলতে পারেন কি এই বিবাহের জন্য, এই *বিধিবদ্ধ* বিবাহের জন্য আপনি অমন উঠেপড়ে লেগেছিলেন কেন? বিবাহের এই *বিধিবদ্ধতা* কি আপনার একান্তই দরকার? আপনি চাইলে আমাকে প্রহার করতে পারেন, কিন্তু আমি না বলে পারছি না যে আপনার এই ব্যর্থতায় আমি খুশি, দারুণ খুশি! আপনি যে মানবজাতির কাছে এখনও একেবারে ফুরিয়ে যাননি তা ভেবে আমি খুশি। ...বুঝলেন, আমি আমার মনের কথা বললাম!"

যেহেতু আপনার ওই আনুষ্ঠানিকতার বাইরে বিবাহ করে অসতী স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করা এবং অন্যের ছেলেপুলে প্রতিপালন করা আমার ইচ্ছে নয়, ঠিক এই জন্যেই বিধিবদ্ধ বিবাহ আমার দরকার," উত্তরে নেহাত কিছু বলতে হয় বলেই লুজিন কথাগুলো বলল। তাকে দেখে কেমন যেন অন্যমনস্ক ও বিশেষভাবে চিন্তাগ্রস্ত মনে হচ্ছিল।

"ছেলেপুলে? আপনি ছেলেপুলের কথা বলছেন?" শৃঙ্গাবাদন কানে গেলে যুদ্ধের ঘোড়ার যেমন অবস্থা হয় তেমনি সচকিত হয়ে উঠল আন্দ্রেই সেমিওনভিচ। "ছেলেপুলে একটা সামাজিক প্রশ্ন এবং প্রধান গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বটে— আমি মানছি। কিন্তু ছেলেপুলে সংক্রান্ত প্রশ্নটি সমাধিত হয়ে থাকে অন্যভাবে। কোন-কোন মানুষ পরিবার সংক্রান্ত যে কোন ইঙ্গিতের মতো ছেলেপুলের প্রশ্নটাও পুরোপুরি বাতিল

করে দেয়। ছেলেপুলে নিয়ে কথা পরে হবে, এখন ওই অসতীর প্রসঙ্গই ধরা যাক। আপনার কাছে স্বীকার করছি যে এই বিষয়টার ওপর আমার দুর্বলতা আছে। সেনাবাহিনীর ব্যারাকে আর পুশকিনের কাব্যে প্রচলিত এই কদর্য কথাটা ভবিষ্যৎ শব্দভাণ্ডারে অকল্পনীয়। তাছাড়া এই সতী-অসতী ব্যাপারটা কী বলুন তো? ওঃ কি বিভ্রান্তিকর! কিসের অসতী? কেন অসতী? যত সব রাবিশ! বরং হবে উল্টোটা—আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া যে বিবাহ তাতে এ সবের বালাই থাকবেই না! অসতী বলতে যা বোঝেন তা যে-কোন বিধিবদ্ধ বিবাহের স্বাভাবিক পরিণামমাত্র, বলা যেতে পারে তার সংশোধন, প্রতিবাদ। তাই এই অর্থে এতটুকু অপমানজনক নয় কথাটা। একটা উদ্ভট দৃষ্টান্তই না হয় ধরুন...ধরুন, আমি যদি কখনও বিধিবদ্ধ বিবাহ করি তাহলে লোকে যাকে উঠতে-বসতে শাপশাপান্ত করছে, আপনাদের এরকম একজন অসতীকে বরণ করে আমি বরং খুশিই হব। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বলব : 'বন্ধু আমার, এর আগে তোমায় শুধু ভালোই বেসেছি, কিন্তু এখন তোমাকে শ্রদ্ধা করব, কেননা তুমি প্রতিবাদ করতে পেরেছ!' আপনি হাসছেন? তার কারণ কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার সাধ্য আপনার নেই! মরুক গে! বিধিবদ্ধ বিবাহের মধ্যে থেকে যখন প্রতারিত হতে হয় তার যে কী জ্বালা সে কি আর আমি বুঝি না? কিন্তু সে তো হল একটা বাজে ঘটনার এক বাজে পরিণতি, যেখানে দুজনেরই সম্মানহানি ঘটছে। কিন্তু কেউ যদি প্রকাশ্যেই ব্যাভিচার করে থাকে, যে সুযোগ আনুষ্ঠানিকতার বাইরে বিবাহ করলে থেকে যাচ্ছে, তখন ব্যাভিচারের কোন অস্তিত্বই থাকে না, তা অর্থহীন হয়ে পড়ে, এমনকি ওই শব্দটাও লোপ পেয়ে যায়। বরং আপনি যে আপনার স্ত্রীর সুখের ব্যাঘাত ঘটাতে অক্ষম এবং আপনি এতই উন্নত যে তাঁর নতুন পতিলাভের জন্য তাঁর ওপর প্রতিহিংসা গ্রহণে যে আপনি অপারগ—এই বিবেচনা করে উনি প্রমাণ দেবার চেষ্টা করবেন আপনাকে কতই না শ্রদ্ধা করেন! মরুক গে। আমি অনেক সময় ভাবি, আমাকে যদি কেউ বিয়ে দিত ...ধুত্তোর! ...মানে, যদি আমি বিয়ে করতাম...তা সে আনুষ্ঠানিকতার বাইরে হোক, বিধিবদ্ধই হোক বা যাইহোক না কেন... যদি দেখতাম অনেকদিন হয়ে গেল আমার স্ত্রী কোন প্রেমিক জোটাতে পারছে না তাহলে আমার তো মনে হয় আমি নিজে তার জন্য একজনকে জোগাড় করে এনে দিতাম। বলতাম, 'ওগো বন্ধু, আমি তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু এই ভালোবাসারও ওপরে আমি যা চাই তা হল তোমার শ্রদ্ধা। ...এই হল কথা!' ঠিক কিনা? ঠিক বলছি কিনা?"

পিওতর পেত্রোভিচ শুনতে-শুনতে হি হি করে হাসছিল, তবে তার হাসির মধ্যে বিশেষ উৎসাহের ভাব ছিল না। এমনকি মনে হচ্ছিল তেমন কানও দিচ্ছিল না ওর কথায়। বাস্তবিকই সে অন্য কিসের একটা মতলব আঁটছিল মনে-মনে। এমনকি লেবেজিয়াত্‌নিকভেরও সেটা নজর এড়াল না। পিওতর পেত্রোভিচ নিজের ভাবনা

ভাবতে-ভাবতে এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে সে হাতে হাত ঘষতে লাগল। আন্দ্রেই সেমিওনভিচ অবশ্য পরে এর তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিল।

দুই

ঠিক কী কারণে কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার বিশৃঙ্খল মাথার ভেতরে অন্ত্যেষ্টিভোজের উদ্ভট খেয়াল চেপেছিল, তা নির্ধারণ করা কঠিন। মার্মেলাদভের প্রকৃত শেষকৃত্য অনুষ্ঠান বাবদ যে বিশ রুবলেরও বেশি রাস্‌কোল্‌নিকভের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল বস্তুত তার প্রায় অর্ধেকটাই সে এই ভোজের পেছনে লাগিয়েছিল। হয়ত কাতেরিনা ইভানোভ্‌না ভেবেছিল পরলোকগত ব্যক্তির স্মৃতির প্রতি 'যথোচিত' শ্রদ্ধা জানান তার কর্তব্য। এর ফলে বাড়ির বাসিন্দারা সকলে, বিশেষত আমালিয়া ইভানোভ্‌না জানতে পারবে যে 'উনি তাদের চেয়ে কোনও অংশে খারাপ তো ছিলেনই না, হয়ত বা অনেক ভালোই ছিলেন' এবং তাঁর সম্পর্কে 'নাক সিটকানোর' কোনও অধিকার কারও নেই। হয়ত বা এখানে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল *দরিদ্রের সেই বিশেষ অহঙ্কার,* যার ফলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি মানুষের পক্ষে বাধ্যতামূলক কোন-কোন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বহু দরিদ্র মানুষ নাভিশ্বাস তুলতে-তুলতে তাদের শেষ শক্তি, সঞ্চয়ের শেষ কপর্দকটুকু পর্যন্ত উজাড় করে দেয়। তারা স্রেফ দেখাতে চায় যে তারা 'অন্যদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়'। তারা চায় সেই অন্যেরা যেন কোনভাবে তাদের 'নিন্দা' করতে না পারে। এও হতে পারে যে বিশেষ করে এই উপলক্ষে, বিশেষত এই মুহূর্তে যখন মনে হচ্ছিল এই দুনিয়ায় সে যেন সর্বজনপরিত্যক্ত, খুব সম্ভব কাতেরিনা ইভানোভ্‌না বাড়ির এইসব 'নগণ্য ও কুৎসিত বাসিন্দাদের' দেখাতে চেয়েছিল 'কীভাবে জীবন-যাপন করতে হয়, লোকজনকে আপ্যায়ন করতে হয় সেটা তার জানা আছে,' যে শিক্ষাদীক্ষা সে পেয়েছিল তা আদৌ এ ধরনের জীবনধারণের জন্য নয়, সে মানুষ হয়েছিল 'এক সম্ভ্রান্ত সামরিক অফিসার পরিবারে...বলতে গেলে অভিজাত পরিবেশে,' নিজের হাতে মেঝে পরিষ্কার করা এবং রাত জেগে ছেলেমেয়েদের ছেঁড়া জামাকাপড় কাচার মানসিক প্রস্তুতি তার মোটেই ছিল না। অহঙ্কার ও দম্ভের এই প্রবল উচ্ছ্বাস অনেক সময় চরম দারিদ্র্যপীড়িত ও অবদমিত লোকজনের মধ্যে দেখা যায় এবং সময়-সময় তা যন্ত্রণাদায়ক, অসংযত বাসনার আকার ধারণ করে। কাতেরিনা ইভানোভ্‌না আবার তার ওপর এমন মানুষ ছিল না যাকে দাবিয়ে রাখা যায়। পরিস্থিতি তাকে ধ্বংস করলেও করতে পারত, কিন্তু তার মনোবলকে *অবদমন* করা অর্থাৎ ভয় দেখিয়ে, জোর খাটিয়ে তাকে দাবিয়ে রাখা— সেটা ছিল অসম্ভব। তাছাড়া সোনিয়া যে বলেছিল যে তার মাথার ঠিক নেই, কথাটা একেবারে অমূলক নয়। অবশ্য নিশ্চিতভাবে ও চূড়ান্তভাবে এটা ঠিক বলা না গেলেও বাস্তবিকই সম্প্রতি, গত

বছরটা পুরোই তার হতভাগ্য মাথাটার ওপর দিয়ে এত ধকল গেছে যে অন্তত অংশত ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে যায় না। চিকিৎসকরা বলে থাকেন, ক্ষয়কাশের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলেও লোকের মানসিক বিকার ঘটতে পারে।

অন্ত্যেষ্টিভোজে মদের বোতল সংখ্যায় অগণিত ছিল না, বহু বিচিত্র ধরনেরও ছিল না, *মাদেইরা* নামে দামি মদিরাও ছিল না। সবটাই বাড়িয়ে বলা। তবে মদ ছিল। ভোদকা, রম, পোর্টওয়াইন...সবই নিকৃষ্ট স্তরের... ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। খাবারের মধ্যে মিষ্টি ভাত ও কিসমিস মেশান প্রসাদী খাবার ছাড়া ছিল আরও তিন-চারটে পদ। প্রসঙ্গত প্যানকেকও ছিল। সবই আমালিয়া ইভানোভ্‌নার রান্নাঘর থেকে। তাছাড়া ভোজের পর চা ও পাঞ্চের প্রয়োজন আছে বিবেচনা করে দুটো সামোভারও একসঙ্গে তৈরি রাখা হয়েছিল। কেনাকাটার তদারকিতে ছিল স্বয়ং কাতেরিনা ইভানোভ্‌না। তাকে সাহায্য করছিল এই বাড়িরই এক বাসিন্দা— ছোটখাটো, দুখী-দুখী চেহারার এক বিদেশি, জাতে পোল। লোকটা কোন কারণে কে জানে, মাদাম লিপ্‌পেভেখজেলের কাছেই থাকত। কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার ফুটফরমাস খাটার জন্য সঙ্গে-সঙ্গে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এসেছিল। গতকাল সারাটা দিন এবং আজও সারা সকাল মাথার ঘাম পায়ে ফেলে গলদঘর্ম হয়ে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছে। তার এই অবস্থা যাতে লোকের নজরে পড়ে সেজন্য সম্ভবত চেষ্টার ত্রুটি তার ছিল না। প্রতিটি ছোটখাটো ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য সে ঘন ঘন কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার কাছে ছুটে যাচ্ছিল, এমনকি তাকে খুঁজতে গাস্তিনি দ্‌ভোর-এর বাজারপট্টিতেও ছুটছিল, কাতেরিনা ইভানোভ্‌নাকে অনবরত 'সহোদরা' বলে সম্বোধন করছিল। গোড়ার দিকে কাতেরিনা ইভানোভ্‌না যদিও বলছিল যে এই 'পরোপকারী মহানুভব' ভদ্রলোকটি না থাকলে তার অবস্থা শোচনীয় হত, কিন্তু শেষকালে লোকটার জ্বালায় যেন তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হল। কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে প্রথম সাক্ষাতেই যে কোন মানুষকে যতদূর পারা যায় গাঢ় উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত করার জন্য উঠেপড়ে লেগে যায়, তাকে এত প্রশংসা করতে থাকে যে সে বেচারি লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। লোকটার কৃতিত্ব হিসাবে ভেবে-ভেবে এমন সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করে যা কস্মিনকালে ঘটেনি। সেগুলিকে সে নিজে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে, সর্বান্তঃকরণে বাস্তব বলে বিশ্বাসও করত। তারপর হঠাৎ একসময়, যেন মুহূর্তের মধ্যে সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ত তার প্রতি। যে লোকটাকে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও আক্ষরিক অর্থে পুজো করেছিল, তারই সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হত, তাকে চরম অপদস্থ করে, পারলে ঘর থেকে ঠেলে বের করে দিত। স্বভাবত সে শান্তিপ্রিয়, আমুদে, ফুর্তিবাজ। কিন্তু সে নিজে জীবনে দুর্ভাগ্য ও ব্যর্থতার গ্লানি অবিরাম ভোগ করছিল বলে কোনও মানুষই যেন সুখে-শান্তিতে ছাড়া অন্য কোনভাবে জীবনযাপনের *স্পর্ধা* না করে তার এই বাসনা ও দাবি এত উদগ্র হয়ে ওঠে যে জীবনের সামান্যতম ছন্দপতন, এতটুকু ব্যর্থতা সঙ্গে-সঙ্গে তাকে প্রায় ক্ষিপ্ত

করে তুলত। উজ্জ্বলতম আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনাকে প্রশ্রয় দেবার পর মুহূর্তের মধ্যে সে তার ভাগ্যকে অভিশাপ দিতে শুরু করত। হাতের কাছে যা কিছু পেত তা-ই ভাঙচুর করত, ছুঁড়ে ফেলে দিত, দেয়ালে মাথা কুটতে থাকত। আমালিয়া ইভানোভ্‌নাও হঠাৎ কেন যেন কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার কাছে অসাধারণ গুরুত্ব অর্জন করল, তার .অপরিসীম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করল। এর একমাত্র কারণ হয়ত এই যে অন্ত্যেষ্টিভোজ নামে বস্তুটি ভেবে বের করা গেছে এবং আমালিয়া ইভানোভ্‌না সমস্ত মনপ্রাণ এ কাজে নিয়োগ করেছে— টেবিল সাজানোর কাজে হাত দিয়েছে, কোথা থেকে টেবিলক্লথ, বাসনপত্র ইত্যাদি জোগাড় করে আনছে, খাবার-দাবার নিজের হেঁসেলে রান্না করার দায়িত্ব নিয়েছে। কাতেরিনা ইভানোভ্‌না সমস্ত দায়-দায়িত্ব একা তার ওপর ছেড়ে দিয়ে তাকে ঘরে রেখে নিজে গোরস্থানে চলে যায়। প্রস্তুতি বাস্তবিকই ভারি চমৎকার হয়েছিল : টেবিল দিব্যি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সাজান। বাসনপত্র, ছুরিকাঁটা, ছোটবড় নানা আকারের পানপাত্র, পেয়ালা ইত্যাদি—সবই অবশ্য বিভিন্ন আকৃতির ও বিভিন্ন মাপের, একটার সঙ্গে আরেকটা ঠিক মেলে না, যেহেতু এ বাড়ির বিভিন্ন ভাড়াটেদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা। তবু সব যথাসময়, যথাস্থানে রাখা ছিল। আমালিয়া ইভানোভ্‌নার অঙ্গে শোভা পাচ্ছিল কালো পোশাক, তার মাথার টুপিতে শোকের চিহ্নস্বরূপ নতুন কালো ফিতে। গোরস্থান থেকে লোকজন ফিরে আসতে দেখে সে তার কাজ খুব ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছে উপলব্ধি করে বেশ খানিকটা আত্মপ্রসাদ নিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানাল। আত্মপ্রসাদ লাভের কারণ যদিও সঙ্গত, তবু তার এই ভাবটা কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার কেন যেন পছন্দ হল না। তার মনে হল 'যে কেউ সত্যি-সত্যি ভাবতে পারে যে আমালিয়া ইভানোভ্‌না না থাকলে টেবিল সাজানই হত না!' নতুন ফিতে লাগান টুপিটাও তার পছন্দ হল না : 'বলা যায় না, এই বোকা জার্মান মহিলাটির দেমাক হয়ত এই কারণে যে উনি বাড়িউলি এবং দয়াপরবশ হয়ে তার গরিব ভাড়াটেদের সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন? দয়াপরবশ হয়ে! বটে! আরে, কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার বাবা ছিলেন একজন কর্নেল, প্রায় গভর্নর পর্যায়ের লোক, তাদের বাড়িতে একসঙ্গে চল্লিশ জন অতিথির জন্য টেবিল পাতা হত, সেখানে কোথাকার কে আমালিয়া ইভানোভ্‌না...নাকি ল্যুদ্‌ভিগোভ্‌না...লিপ্‌পেভেখ্‌জেল না কে— হেঁসেলেই তো ঢোকার অনুমতি পেত না!...' সে যাই হোক, কাতেরিনা ইভানোভ্‌না ঠিক করল আপাতত সে তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করবে না, যদিও মনে-মনে সঙ্কল্প করল যে আমালিয়া ইভানোভ্‌নাকে আজই, অবশ্যই বসিয়ে দিতে হবে, তাকে তার সঠিক স্থান স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, নইলে ভগবান জানেন, নিজেকে সে কী ভাবছে! তবে এই মুহূর্তে তার প্রতি স্রেফ নিস্পৃহ ভাব দেখাল। আরও একটি অপ্রীতিকর ঘটনাও কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার বিশেষ বিরক্তির কারণ হয়েছিল। গোরস্থানে শবানুগমনের

জন্য এ বাড়ির যাদের ডাকা হয়েছিল তাদের মধ্যে ওই বেঁটেখাটো পোল ভদ্রলোকটি ছাড়া প্রায় কেউ সেখানে যায়নি। সে তবু এত ব্যস্ততার মাঝখানেও সময় করে একবার সেখানে ছুটে গিয়েছিল। অথচ অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে, অর্থাৎ ভোজের বেলায় তাদের মধ্যে যারা অতি নগণ্য, হতদরিদ্র সবাই ঝেঁটিয়ে এসেছে। তাদের মধ্যে অনেকে আবার ঠিক প্রকৃতিস্থও নয়— মোটকথা, আজেবাজে লোকজনের একটা দঙ্গল। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে যারা একটু বয়স্ক, ভারিক্কি গোছের তারা সকলে যেন ইচ্ছে করে, নিজেদের মধ্যে যুক্তি করে ফাঁকি দিয়েছে। যেমন, পিওতর পেত্রোভিচ লুজিন— বাসিন্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভারিক্কি যাকে বলা যেতে পারে, তিনি এলেন না। অথচ গতকাল সন্ধ্যাবেলাতেই কাতেরিনা ইভানোভ্না একফাঁকে দুনিয়াসুদ্ধ সকলকে বলে এসেছে... অর্থাৎ, আমালিয়া ইভানোভ্না, পোলেন্কা, সোনিয়া এবং পোল ভদ্রলোকটি—কাউকে বলতে বাকি রাখেনি যে পিওতর পেত্রোভিচ একজন অতি সজ্জন, সম্ভ্রান্ত বিত্তশালী ব্যক্তি, বহু জায়গায় বহু যোগাযোগ তাঁর আছে। উনি ওর প্রথম স্বামীর এককালের বন্ধু, তার বাপের বাড়িতেও ওঁর যাতায়াত ছিল। ভদ্রলোক কথা দিয়েছেন যে ওকে একটা মোটামুটি ভদ্রগোছের পেনশন পাইয়ে দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে কাতেরিনা ইভানোভ্না যদি কখনও সেরকম কারও যোগাযোগ নিয়ে, সে ব্যক্তির বিত্ত নিয়ে বড়াই করত, তা করত ব্যক্তিগত লাভের কথা চিন্তা না করে, বিশেষ কোন অভিসন্ধি ছাড়াই, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে ...বলা যেতে পারে, অন্তরের অন্তস্তল থেকে। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হত প্রশংসার পাত্রের মূল্য আরও চড়িয়ে দেওয়া, কাউকে প্রশংসা করে তৃপ্তি লাভ করা। লুজিন তো এলোই না, সম্ভবত 'তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে' সেই 'নোংরা হারামজাদা লেবেজিয়াত্নিকভ্টাও' এলো না। 'আর যে যাই ভাবুক না কেন, এই লোকটা নিজেকে ভাবে কী? ওকে তো নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল স্রেফ দয়া করে, তাও করা হয়েছিল পিওতর পেত্রোভিচের সঙ্গে একই ঘরে থাকে এবং তার পরিচিত বলে। না করলে ঠিক ভালো দেখায় না, তাই।' একজন আদব-কায়দা-দোরস্ত ভদ্রমহিলা আর তার 'অরক্ষণীয়া কন্যার' আসার কথা ছিল—তারাও অনুপস্থিত। ওরা মাত্র সপ্তাহদুয়েক হল ইভানোভ্নার কাছ থেকে ঘর ভাড়া নিয়ে আছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই মার্মেলাদভদের ঘর থেকে চিৎকার-চেঁচামেচি আসছে বলে বারকয়েক অভিযোগ করেছে—বিশেষত সেইসব সময় যখন অধুনা মৃত মার্মেলাদভ মাতাল হয়ে বাড়িতে ফিরত। কাতেরিনা ইভানোভ্নার অবশ্য সে খবরটা জানা হয়ে গিয়েছিল ওই আমালিয়া ইভানোভ্নার কাছ থেকেই। এই নিয়ে কাতেরিনা ইভানোভ্নার সঙ্গে আমালিয়া ইভানোভ্নার তুমুল ঝগড়া হয়। আমালিয়া ইভানোভ্না ওদের পরিবারসুদ্ধ সকলকে ঘর থেকে উৎখাত করার হুমকি দেয়। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে মহিলা একথাও বলেছিল যে ওরা 'যাদের পায়ের নখের যুগ্যি নয়, সেইসব সম্ভ্রান্ত

ভাড়াটেদের' নাকাল করে ছাড়ছে। যাকে তার 'পায়ের নখের যুগ্যি নয়' বলে মনে করা হচ্ছে, পরন্তু যে মহিলা তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে দেমাক দেখিয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় তাকে কাতেরিনা ইভানোভ্না নিমন্ত্রণ করেছিল ইচ্ছে করেই—বিশেষত মহিলাকে জানিয়ে দেবার জন্য যে এখানকার লোকজনের 'চিন্তাভাবনা, তাদের মন অনেক বেশি উদার, তারা মনের মধ্যে রাগ পুষে না রেখে লোকজনকে নিমন্ত্রণও করে থাকে।' তার উদ্দেশ্য ছিল ওদের বুঝিয়ে দেওয়া যে কাতেরিনা ইভানোভ্না নিজেও অন্য পরিবেশে বসবাসে অভ্যস্ত। ঠিক করে রেখেছিল টেবিলে খানাপিনার সময় ব্যাপারটা অবশ্যই সকলকে বুঝিয়ে বলবে, পরলোকগত পিতৃদেবের গভর্নর হতে-হতে না হওয়ারও উল্লেখ করবে এবং সেই সঙ্গে পরোক্ষে এও শুনিয়ে দেবে যে দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবার কোন যুক্তি নেই—ওটা ডাহা মূর্খামি। স্থূলকায় লেফটেনান্ট কর্নেল...আসলে অবশ্য অবসরগ্রস্ত লেফটেনান্ট...তিনিও এলেন না। তবে জানা গেছে গতকাল সকাল থেকে তিনি 'উত্থানশক্তিরহিত'। এককথায়, একমাত্র যারা এসেছিল তাদের মধ্যে ছিল সেই বেঁটেখাটো পোল ভদ্রলোকটি, ছিল অতি নগণ্য চেহারার এক নিরীহ চুপচাপ ছোট কেরানি— লোকটার গায়ের ফ্রককোটটা তেল চিটচিটে, মুখময় ছোট-ছোট ফুসকড়ি, বোটকা গন্ধ আসছিল তার গা থেকে। আরও একজন—পাতলা ছোটখাটো গড়নের এক বৃদ্ধ— এ লোকটা কালা, প্রায় অন্ধও তাকে বলা চলে। একসময় কোন একটা পোস্ট অফিসে না কোথায় কাজ করত। কেউ বলতে পারে না কে, কবে থেকে এবং কী কারণে আমালিয়া ইভানোভ্নার বাড়িতে তার থাকার খরচ যুগিয়ে আসছে। একজন অবসরপ্রাপ্ত মাতাল লেফটেন্যান্টও এসেছিল। লোকটা আসলে অবশ্য সেনাবাহিনীর রসদ সরবরাহ দপ্তরের এক পাতি কেরানি। অসভ্যের মতো অট্টহাসি হাসছিল। গায়ে ওয়েস্টকোটের বালাই নেই—'ধারণা করা যায়!' একজন তো কাতেরিনার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার পর্যন্ত না জানিয়ে সোজা টেবিলের ধারে গিয়ে বসে পড়ল। আরেক ব্যক্তি বাইরের উপযুক্ত পোশাকের অভাবে ড্রেসিংগাউন পরেই বসে পড়তে গিয়েছিল, কিন্তু ব্যাপারটা শালীনতার সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখে আমালিয়া ইভানোভ্না ও পোল ভদ্রলোকটির তৎপরতায় শেষপর্যন্ত তাকে বহিষ্কার করা হয়। প্রসঙ্গত, এই পোল ভদ্রলোকটি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন আরও দুজন পোলজাতের লোককে। তারা কস্মিনকালে আমালিয়া ইভানোভ্নার ভাড়াটে ছিল না, এ বাড়ির ত্রিসীমানায় এর আগে তাদের কেউ কখনও দেখেনি। সব মিলিয়ে নিদারুণ বিরক্তিতে ভরে গেল কাতেরিনা ইভানোভ্নার মনটা। মনে-মনে সে ভাবল : 'এতসব আয়োজন তাহলে কাদের জন্য?' এমনকি স্থান-সঙ্কুলানের জন্য বাড়ির ছেলেমেয়েগুলোকে পর্যন্ত টেবিলের ধারে বসান হয়নি। এমনিতেই অবশ্য ঘরের সবখানি জায়গা জুড়ে ফেলেছিল টেবিলটা। তাই ছেলেমেয়েদের জন্য পেছনের কোণে একটা ট্রাঙ্কের ওপর

চাদর বিছিয়ে খাবার জায়গা করা হয়েছিল, ছোট দুটিকে বসান হয়েছিল বেঞ্চির ওপর। পোলেন্‌কা ওদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বলে ওদের চোখে-চোখে রাখা, খাওয়ান, এবং 'বড় ঘরের ছেলেমেয়েদের মতো' নাক মোছার ভার তার ওপর দেওয়া হয়েছিল। এককথায় কাতেরিনা ইভানোভ্‌নাকে এখন ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক, দ্বিগুণ আত্মমর্যাদা বজায় রেখে এবং তেমন দরকার হলে উদ্ধত ভঙ্গিতেই তাদের অভ্যর্থনা জানাতে হবে। এদের মধ্যে কারও-কারও ওপর সে বিশেষভাবে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দয়াদাক্ষিণ্য দেখানোর ভঙ্গিতে আসন গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানাল। যারা যারা আসতে পারেনি তাদের সকলের অনুপস্থিতির জন্য কেন যেন আমালিয়া ইভানোভ্‌নাকে দোষী সাব্যস্ত করে সে হঠাৎ তার প্রতি এত অবহেলা দেখাতে শুরু করল যে আমালিয়া ইভানোভ্‌নারও তা লক্ষ করতে বিলম্ব হল না। তাতে সে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হল। শুরুটা যেখানে এরকম তার পরিণতি যে ভালো হবে এমন আশা করা যায় না। অবশেষে সকলে আসন গ্রহণ করল।

ওরা যখন গোরস্থান থেকে ফিরে এলো প্রায় সেই মুহূর্তেই র‍্যাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ প্রবেশ করল। কাতেরিনা ইভানোভ্‌না তাকে দেখে পরম পুলকিত, যেহেতু প্রথমত, অতিথিদের সকলের মধ্যে সে-ই একমাত্র 'শিক্ষিত ব্যক্তি'—'ওদের সকলের জানা আছে দু-বছরের মধ্যে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের আসন অলঙ্কৃত করার জন্য সে তৈরি হচ্ছে।' দ্বিতীয়ত, সে যে তার আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও শেষকৃত্যের সময় উপস্থিত থাকতে পারেনি তার জন্য সঙ্গে-সঙ্গে কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার কাছে সবিনয় ক্ষমা চেয়ে নিল। কাতেরিনা ইভানোভ্‌না ছুটে এসে তাকে নিজের বাঁ পাশে বসার জায়গা করে দিল। ডান পাশে বসে ছিল আমালিয়া ইভানোভ্‌না। যদিও খাবারদাবার যাতে ঠিকমতো পরিবেশিত হয় এবং সকলের ভাগে কিছু না কিছু জোটে সেজন্য তাকে অবিরাম ব্যস্ত ও সজাগ থাকতে হচ্ছিল। কাশির দমকে সে কষ্ট পাচ্ছিল— প্রতি মুহূর্তে তার কথা বন্ধ হয়ে আসছিল, দম আটকে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল বিশেষত গত দুদিনে যেন কাশিটা আরও গেড়ে বসেছে, তবু তারই ফাঁকে-ফাঁকে সে রাস্‌কোল্‌নিকভের সঙ্গে অবিরাম নিচু গলায় কথা বলে যেতে লাগল। তার মনের মধ্যে জমে থাকা সমস্ত ক্ষোভ এবং অন্ত্যেষ্টিভোজের ব্যর্থতার জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবেই তার যাবতীয় বিতৃষ্ণা রাস্‌কোল্‌নিকভের সামনে উজাড় করে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অবশ্য বিতৃষ্ণার জায়গায় মাঝে-মাঝে দেখা দিচ্ছিল অত্যন্ত অসংযত ধরনের উচ্ছল হাসি—উপস্থিত অতিথিদের লক্ষ্য করে, তবে মুখ্যত তার লক্ষ্যস্থল ছিল তাদের বাড়িউলি।

"যত নষ্টের গোড়া ওই টুনটুনিটা। কার কথা বলছি বুঝতে পারছেন তো?—হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ওর কথাই বলছি!" কাতেরিনা ইভানোভ্‌না মাথার ইশারায় বাড়িউলিকে দেখিয়ে বলল। "দেখুন দেখুন, চোখ ঠিকরে পড়ছে, বুঝতে পারছে ওকে নিয়েই

আমরা কথা বলছি। কী বলছি বুঝতে পারছে না... তাই চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে আছে। মা গো! একটা পেঁচী! হা-হা-হা! খুক-খুক-খুক! ওর ওই টুপি দিয়ে ও কী দেখাতে চায় বলুন তো? হি-হি-হি! লক্ষ করে দেখেছেন কি ও সবাইকে দেখাতে চায় যে এখানে এসে আমার পৃষ্ঠপোষকতা করছে এবং উপস্থিত থেকে আমাকে ধন্য করে দিচ্ছে। আমি একজন ভদ্রঘরের মেয়ে হিসেবে ওকে অনুরোধ করেছিলাম একটু ভালো দেখে লোকজনদের, বিশেষত পরলোকগত মানুষটির সঙ্গে যাদের জানাশোনা ছিল তাদের নিমন্ত্রণ করতে। অথচ দেখুন, কাদের ডেকে এনেছে— রাজ্যের যত ভাঁড় আর লোচ্চা লোকজন! চেয়ে দেখুন ওই নোংরা লোকটার দিকে—যেন দুটো কাঠি-পায়ের ওপর একদলা শিকনি! আর ওই যে ওই পোলগুলো... হা-হা- হা! খুক - খুক- খুক! কেউ কখনও কস্মিনকালে ওদের এখানে দেখেনি, আমিও কখনও দেখিনি। কী বলে ওরা এলো?— আমি আপনাকে জিগ্গেস করছি। কেমন গম্ভীর মুখে সার বেঁধে বসে আছে!" বলতে-বলতে ওদের একজনের দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল: "এই যে, ও মশাই, শুনছেন? প্যানকেক নিয়েছেন তো? আরও একটু নিন না! বীয়ার খান, বীয়ার! ভোদ্কা চলবে?" তারপর রাস্কোল্নিকভের দিকে ফিরে বলল, "দেখুন দেখুন, বলার সঙ্গে-সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে উঠে পড়ল। মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কারের কী ঘটা! দেখুন একবার। আহা, বেচারি! বড় ক্ষুধার্ত! যাক গে, খাক। অন্তত হৈ-হট্টগোল তো করছে না... তবে আসলে আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে... আমাদের বাড়িউলির রুপোর চামচগুলো নিয়ে!" এবারে বাড়িউলিকে উদ্দেশ্য করে হঠাৎ প্রায় গলা উঁচিয়েই সে বলে উঠল, "আমালিয়া ইভানোভ্না! আপনার চামচগুলো চুরি হয়ে গেলে কিন্তু আমি দায়ী নই— আপনাকে আগে থাকতে সাবধান করে দিচ্ছি! হা-হা- হা!" ফের রাসকোল্নিকভের দিকে ফিরে, এবারেও মাথার ইশারায় বাড়িউলিকে দেখিয়ে দিয়ে নিজের কৌতুকে নিজেই মজা পেয়ে খিলখিল করে হাসতে-হাসতে সে বলল, "বুঝতে পারেনি, এবারেও বুঝতে পারেনি! দেখুন কেমন বোকার মতো হাঁ করে বসে আছে! পেঁচী, ঠিক যেন পেঁচী! ওর ওই টুপির নতুন ফিতে-টিতে নিয়ে একটা জবুথবু পেঁচী। হা- হা- হা!"

এরপরই হাসি অসহ্য কাশির দমকের আকার ধারণ করল— মিনিটপাঁচেক ধরে চলল। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে উঠল, রুমাল দিয়ে মুখ চাপতে গিয়ে খানিকটা রক্ত লেগে গেল সেখানে। রক্তলাগা রুমালটা নীরবে দেখাল রাসকোল্নিকভ্কে। একটু বিশ্রাম নিতে না নিতে তক্ষুনি আবার মহা উৎসাহে রাস্কোল্নিকভের কানের কাছে ফিসফিসানি শুরু করে দিল, তার গালে ফুটে উঠল লাল ছোপ।

"দেখুন কাণ্ডটা! সবচেয়ে ভদ্রধরনের কাজ বলতে যা বোঝায় তারই ভার ওকে দিয়েছিলাম— বলেছিলাম, ওই ভদ্রমহিলা আর তাঁর মেয়েকে নিমন্ত্রণ করে আসতে। ...কার কথা বলছি বুঝতে পারছেন তো? এরজন্য দরকার অত্যন্ত ভদ্র ও মার্জিত

ব্যবহার, এখানে কাজ হাসিল করতে রীতিমতো দক্ষতা ও কৌশলের দরকার। কিন্তু কাজটা উনি কী ভাবে করলেন? বাইরে থেকে এ শহরে আসা ওই মূর্খ মহিলাটি ওই বেয়াদপ জীবটি, কোথাকার কোন্ এক গেঁয়ো ভূত...কোথাকার কোন্ এক মেজরের স্ত্রী, পেনশন পাবার জন্য চেষ্টাচরিত্র করতে এখানে এসে পোশাকের আঁচল দিয়ে সরকারি অফিসগুলো ঝেঁটিয়ে বেড়াচ্ছে, এই পঞ্চাশ বছর বয়সেও চোখে সুর্মা লাগাচ্ছে, মুখে রং চং আর পাউডারের প্রলেপ লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে... কেন, তা কারও জানতেও বাকি নেই... এরকম একটা নিকৃষ্ট ধরনের জীব কিনা এখানে উপস্থিত থাকার কোন গরজ তো দেখালই না, এমনকি আসতে না পারার জন্য ক্ষমা চেয়ে একটা খবর পর্যন্ত পাঠাল না। অথচ এসব ক্ষেত্রে সামান্যতম ভদ্রতা তো এটাই দাবি করে! বুঝতে পারছি না পিওতর পেত্রোভিচও বা কেন এলেন না। কিন্তু সোনিয়া কোথায়? গেল কোথায়? ও হ্যাঁ, এই তো এসে গেছে! কী রে সোনিয়া, কোথায় ছিলি? আশ্চর্য, তুই তোর বাপের কাজের সময়ও ঠিকমতো উপস্থিত হতে পারিস নে! ওকে আপনার পাশে বসতে দিন, রোদিওন রমানোভিচ। এই যে তোর জায়গা সোনিয়া।... তোর খুশিমতন খাবার বেছে নে। ওই মাছের জেলিটাই বরং নে— ওটা ভালো। প্যানকেক আসছে এখুনি আরেক দফা। বাচ্চাদের দেওয়া হয়েছে তো? পোলেন্কা। তোদের ওখানে সব আছে তো? খুক-খুক-খুক। বেশ, ভালো কথা। লক্ষ্মীটি হয়ে থাক লিদা, সোনা আমার! আর কোলিয়া, পা ছোঁড়াছুঁড়ি বন্ধ কর বলছি! ভদ্রঘরের বাচ্চারা যেমনভাবে বসে থাকে তেমনি বসে থাক। কী বলছিলি তুই সোনিয়া?"

সোনিয়া তৎক্ষণাৎ তড়বড় করে পিওতর পেত্রোভিচের ক্ষমপ্রার্থনার কথা তাকে জানাতে গেল। সে চেষ্টা করল জোরে বলার, যাতে, সবাই শুনতে পায়। ভক্তিপ্রকাশের জন্য যত বাছাবাছা লাগসই শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়ে, ইচ্ছে করে বেশ খানিকটা বানিয়ে, রং ফলিয়ে পিওতর পেত্রোভিচের মুখের কথা বলে চালিয়ে দিল। সে যোগ করল, পিওতর পেত্রোভিচ বিশেষ করে জানিয়ে দিতে বলেছেন যে তিনি সময় পেলেই কালবিলম্ব না করে আসবেন, তার সঙ্গে একান্তে *কাজের* কথা বলবেন, ভবিষ্যতে কী করা যায়, কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় ইত্যাদি-ইত্যাদি বিষয়ের একটা সমাধানে আসবেন।

সোনিয়া জানত যে এসব কথা শুনলে কাতেরিনা ইভনোভ্না শান্তি ও স্বস্তি পাবে, এতে সে তুষ্ট হবে, আর সবচেয়ে বড় কথা, তার অহঙ্কার পরিতৃপ্ত হবে। রাস্কোল্নিকভ্‌কে চটপট নমস্কার জানিয়ে সে তার পাশে গিয়ে বসল, কৌতূহলী দৃষ্টিতে একপলক তাকাল তার দিকে। প্রসঙ্গত বাদবাকি সময়টা সর্বক্ষণ তার দিকে দৃষ্টিপাত করা এবং তার সঙ্গে কথা বলা দুটোই কেমন যেন এড়িয়ে যেতে লাগল। তাকে কতকটা উদ্‌ভ্রান্তই দেখাচ্ছিল, যদিও কাতেরিনা ইভানোভ্নার মুখের দিকে সে

তাকাচ্ছিল তার মন পাবার উদ্দেশ্যে। তার এবং কাতেরিনা ইভানোভ্নার— কারও পরনেই শোকের কালো পোশাক ছিল না, যেহেতু ওরকম পোশাকই তাদের কাছে নেই। সোনিয়া পরেছে বাদামি রঙের একটা পোশাক— একটু গাঢ়র দিকে। কাতেরিনা ইভানোভ্নার গায়ে তার একমাত্র পোশাক— সেটা ছিটকাপড়ের, গাঢ় রঙের ডোরাকাটা। পিওতর পেত্রোভিচ-সংক্রান্ত সংবাদটা বেশ ভালোভাবে গৃহীত হল। সোনিয়ার মুখ থেকে গম্ভীরভাবে কথাগুলো শোনার পর একইরকম গাম্ভীর্য নিয়ে পিওতর পেত্রোভিচ কেমন আছে তাও জানতে চাইল কাতেরিনা ইভানোভ্না। তারপর সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় সকলকে শুনিয়ে-শুনিয়েই রাস্কোল্নিকভের কানের কাছে *ফিসফিসিয়ে* বলল যে তার পরিবারবর্গের প্রতি পিওতর পেত্রোভিচের এত অনুরাগ এবং তার বাবার সঙ্গে পিওতর পেত্রাভিচের পুরনো সৌহার্দ্য সত্ত্বেও তার মতো একজন শ্রদ্ধাভাজন ও রাশভারী মানুষকে এরকম একটা দঙ্গলের মধ্যে বাস্তবিকই বেমানান লাগত।

"রোদিওন রমানোভিচ, আপনি যে এরকম একটা পরিবেশের মধ্যেও আমার আতিথ্যগ্রহণে এতটুকু কুণ্ঠিত হননি ঠিক এই কারণেই আমি আপনার কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ," প্রায় সকলকে শুনিয়ে-শুনিয়েই সে যোগ করল। "অবশ্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে আমার পরলোকগত হতভাগ্য স্বামীর সঙ্গে আপনার যে বিশেষ সৌহার্দ্যের সম্পর্ক ছিল একমাত্র তারই প্রেরণাবশত আপনি আপনার কথা রেখেছেন।"

তারপর সে গম্ভীর ভাব করে সদর্পে আরও একবার তার অতিথিদের ওপর ভালো করে চোখ বুলাল। হঠাৎই কেন যেন বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ নিয়ে টেবিলের এ প্রান্ত থেকে কানে কালা বুড়ো মানুষটিকে জোর গলায় জিগ্গেস করল তার আরও রোস্ট চাই কিনা এবং পোর্টওয়াইন তার পাত্রে ঢালা হয়েছে কিনা। বুড়ো উত্তর দিল না! তাকে কী জিগ্গেস করছে তা বুঝতে তার অনেকক্ষণ সময় লেগে গেল, যদিও তার আশেপাশের লোকজন মজা করার জন্য তাকে এদিক-ওদিক থেকে ঠেলছিল। লোকটা শুধু হাঁ করে চারদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল। তাতে সকলের আরও বেশি হাস্যোদ্রেক করল।

"কোথাকার আকাট এসে জুটেছে! দেখুন দেখুন! ওকে এখানে ডাকা হয়েছে কী কারণে? পিওতর পেত্রোভিচের কথা যদি বলেন, তার ওপর সবসময়ই আমার আস্থা ছিল," রাসকোল্নিকভ্কে বলে চলল কাতেরিনা ইভনোভ্না, "তিনি অবশ্যই এরকম নন..." এরপর আমালিয়া ইভানোভ্নার দিকে ভীষণ কটমট করে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে কেটে-কেটে যে কথাগুলো সে বলল তাতে মহিলা ভয়ে সিটিয়ে গেল। 'আপনাদের ওসব রং চং মাখা চটকদার চিজগুলোর মতো নন। আমার বাবা তো রান্নাঘরে রাঁধুনি হিসেবেও ওদের গ্রহণ করতেন না। হ্যাঁ, আমার পরলোকগত স্বামী

যদি সম্মান দেখিয়ে তাদের আদর-আপ্যায়ন করেও থাকেন সেটা নেহাত তাঁর মনটা বড় বেশি উদার ছিল বলেই।"

"হ্যাঁ পান করতে ভালাবাসতেন, বেশ ভালোবাসতেন, সত্যি-সত্যি ভালোবাসতেন!" বারো গেলাস ভোদ্‌কা পেটে পড়ার পর তা জানান দিতে সেনাবাহিনীর রসদ সরবরাহ দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত কেরানিটি হঠাৎ চিৎকার করে উঠল।

"আমার পরলোকগত স্বামীর বাস্তবিকই এই দুর্বলতা ছিল এটা সবাই জানেও," কাতেরিনা ইভানোভ্‌না হঠাৎ যেন লোকটার কথা লুফে নিয়ে বললেন, "কিন্তু উনি ছিলেন ভালোমানুষ, উদারচেতা। পরিবারের সকলকে ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু ওঁর একটামাত্র খারাপ দিক ছিল এই যে নিজের ভালোমানুষির জন্য রাজ্যের আজেবাজে লোককে বড় বেশি বিশ্বাস করে বসতেন। ভগবান জানেন, কাদের সঙ্গেই না উনি মদ খেয়েছেন। যাদের সঙ্গে খেয়েছেন তারা ওঁর জুতোর সুখতলার যোগ্য নয়! ভেবে দেখুন, রোদিওন রমানোভিচ, ওঁর পকেটে মোরগছাঁচের জিঞ্জার ব্রেডও পেয়েছি আমি। বদ্ধ মাতাল, তবু বাচ্চাদের কথা ভোলেননি।"

"মো-র-গ? মাফ করবেন, মো-র-গ বললেন তাই না?" রসদ দপ্তরের সেই ভদ্রলোকটি চেঁচিয়ে উঠল।

কাতেরিনা ইভানোভ্‌না তার কথার জবাব দেওয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করল না। সে যেন কী নিয়ে ভাবছিল। শেষকালে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"এই যে আপনি... আর সকলের মতো আপনিও হয়ত ভাবছেন যে আমি সবসময় ওর সঙ্গে বড় রূঢ় আচরণ করতাম," রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে উদ্দেশ্য করে সে বলে চলল। "ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়! উনি আমাকে শ্রদ্ধা করতেন, খুব শ্রদ্ধা করতেন, অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন! মনটা খুব বড় ছিল! সময়-সময় তাঁর জন্য এত কষ্ট হত যে কী বলব! কখন-কখন এমন হত যে হয়ত ঘরের এক কোনায় চুপটি করে বসে-বসে তাকিয়ে দেখছেন আমাকে। তখন এত মায়া হত! ইচ্ছে হত ওঁর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করি কিন্তু পরক্ষণেই মনে-মনে ভাবতাম: 'একটু যদি আদর করতে যাই তো হয়ে গেল— আবার গিয়ে মদ গিলবে।' একমাত্র কঠিন ব্যবহার করতাম বলেই না ওঁকে অন্তত খানিকটা সামলে-সুমলে-রাখতে পেরেছিলাম।"

"হ্যাঁ, চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনি— তাও খেতে হয়েছে। অমন ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে," রসদ দপ্তরের প্রাক্তন কেরানিটি গাঁক-গাঁক করে আবার বলে উঠে সঙ্গে-সঙ্গে আরও এক গেলাস ভোদকা গলায় ঢেলে দিল।

"শুধু চুলের মুঠি ধরে কেন, কোন-কোন মূর্খকে ঝাঁটাপেটাও করতে হয়— তাতে উপকার পাওয়া যায়। না, আমি অবশ্য পরলোকগত মানুষটি সম্পর্কে একথা বলছি না!" রসদ বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কেরানিটিকে মুখের ওপর শুনিয়ে দিল কাতেরিনা ইভানোভ্‌না।

তার গালের লাল চাকা-চাকা দাগগুলো আরও বেশি ফুটে বের হতে লাগল, বুক ক্রমেই বেশি ঘনঘন ওঠাপড়া করতে লাগল। আর মিনিটখানেক— তারপরই সে একটা দৃশ্য ঘটিয়ে ছাড়বে— তার জন্য এখনই প্রস্তুত। অনেকে হি হি করে হাসছিল। অনেকে, মনে হয়, ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছিল। লোকগুলো রসদের লোকটাকে কনুই দিয়ে গুঁতোতে-গুঁতোতে কানে-কানে ফিসফিসিয়ে মন্ত্রণা দিতে শুরু করে দিয়েছে। দেখাই যাচ্ছে ওদের দুজনের মধ্যে একটা গোলমাল বাধিয়ে দেওয়ার মতলব।

"জ্-জানতে প্-পারি কি ম্যাডাম আপনি আসলে কী বলতে চান?" রসদ দপ্তরের লোকটি শুরু করল। "ম্- মানে আপনি কার... সম্মানজনক নাম নিয়ে... অমন... এইমাত্র... সে যাক গে! বাদ দিন ওসব রাবিশ! আপনি একজন বিধবা! হতভাগী বিধবা! ক্ষমা করে দিচ্ছি... আর নয়!" বলেই আরও এক গেলাস ভোদকা গলায় ঢেলে দিল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বেজার হয়ে চুপচাপ বসে-বসে শুনছিল। খাবার সে খেল নেহাতই ভদ্রতার খাতিরে। কাতেরিনা ইভানোভ্‌না প্রতি মুহূর্তে তার পাতে যা যা তুলে দিচ্ছিল তা-ই দাঁত দিয়ে একটু-আধটু খুঁটল। ...তাও কাতেরিনা ইভানোভ্‌না পাছে রাগ করে এই ভেবে। তার চোখজোড়া সোনিয়ার ওপর গাঁথা। কিন্তু সোনিয়া ক্রমেই আরও বেশি করে উদ্বিগ্ন ও অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। সেও ভেতরে-ভেতরে উপলব্ধি করছিল যে অনুষ্ঠানটা ভালোয়-ভালোয় শেষ হবে না। কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার বিরক্তি সমানে বেড়ে চলেছে লক্ষ করে সোনিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল। প্রসঙ্গত, মফস্বল থেকে আগত ওই দুই মহিলা যে কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার আমন্ত্রণকে এভাবে উপেক্ষা করল তার মূল কারণ যে সে, সোনিয়া নিজে, তা ওর অজানা ছিল না। আমালিয়া ইভানোভ্‌নার নিজের মুখ থেকে সে শুনেছে যে নিমন্ত্রণ পেয়ে বয়স্কা মহিলাটি দস্তুরমতো অপমানিত বোধ করে। এমনকি প্রশ্ন করে': 'ওই *মেয়েটার* পাশাপাশি আমার মেয়েকে বসতে দিই কী করে?' সোনিয়া মনে-মনে আঁচ করতে পারছিল যে কাতেরিনা ইভানোভ্‌না কোন না কোন ভাবে সেটা জেনে গেছে এবং তার অপমান, সোনিয়ার অপমান, কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার কাছে ব্যক্তিগতভাবে তার নিজের, তার সন্তানদের, তার বাবার অপমানের চেয়েও বেশি অর্থবহ। এককথায়, অপমানটা ছিল মর্মন্তুদ এবং সোনিয়া জানত যে 'যতক্ষণ না ওই দুই চটকদারের কাছে প্রমাণ করতে পারছে যে তারা দুজনেই...' ইত্যাদি-ইত্যাদি... ততক্ষণ কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার মনে কোন শান্তি নেই। পরিস্থিতি আরও ঘোরাল করে তোলার উদ্দেশ্যে কে যেন জেনেশুনেই টেবিলের ও প্রান্ত থেকে হৃৎপিণ্ডের আকারে কাটা এবং তীর বেঁধান দুটো রুটির টুকরো সমেত একটা প্লেট সোনিয়ার কাছে পাচার করে দিল। কাতেরিনা ইভানোভ্‌না তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। সঙ্গে-

সঙ্গে জোর গলায় টেবিলের এ প্রান্ত থেকে মন্তব্য করল যে কাজটা যে-ই করুক না কেন সে একটা 'মাতাল গর্দভ'। এদিকে আমালিয়া ইভানোভ্‌নাও খারাপ একটা কিছু ঘটতে চলেছে আঁচ করতে পেরেছিল। কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার ঔদ্ধত্যে নিদারুণ মর্মাহত হয়ে উপস্থিত সকলের ভারাক্রান্ত মনোযোগ অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত করে তাদের হালকা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে, সেই সঙ্গে সকলের সামনে নিজের গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্যেও বটে, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ শুরু করে দিল তার কোন এক পরিচিত ব্যক্তি কোথাকার কোন্ 'ডাক্তারখানার কার্ল' সম্পর্কে এক কাহিনী। লোকটা রাতেরবেলায় এক ভাড়া গাড়িতে চড়ে যাচ্ছিল। 'তা গাড়িওয়াল তো তাকে মাইরেই ফেইলতে চায়। কার্ল তাকে খু-উ-ব কইরে বইলল ওকে যেন না মারে। কাঁদল, হাতও জোড় কইরল, ভয়ও পেইয়ে গেলো। আর ওই ভয়ে ওর কলিজাই এফোঁড়-ওফোঁড় হইয়ে গেলো।' কাতেরিনা ইভানোভ্‌না মুচকি হাসল বটে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এ মন্তব্যও করতে ছাড়ল না যে আমালিয়া ইভানোভ্‌নার পক্ষে রুশ ভাষায় চুটকি ছাড়ার চেষ্টা না করাই ভালো। আমালিয়া ইভানোভ্‌না তাতে আরও রেগে গেল। প্রবল আপত্তি তুলে বলল যে বার্লিনে তার 'ফাদার সিলেন বহুত বহুত বোড়ো মানুষ, সোব সোময় পকেটে হাথ ঢোকাইতেন।' কাতেরিনা ইভানোভ্‌না তার এই কথায় এত আমোদ পেল যে নিজেকে আর সামলাতে না পেরে ভীষণ জোরে হো হো করে হেসে উঠল। ফলে আমালিয়া ইভানোভ্‌নার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ার উপক্রম হল, কোনমতে নিজেকে সামলে নিল সে।

"পেঁচীটার কথা শুনুন!" খুশিতে প্রায় ডগমগ হয়ে উঠে আবার ফিসফিস করে রাসকোল্‌নিকভ্‌কে বলল। "বলতে চেয়েছিল পকেটে হাত দিয়ে ঘুরে বেড়াত, দাঁড়াল — লোকের পকেট হাতড়াত।... খুক খুক!.. আচ্ছা, আপনি লক্ষ করেছেন কি রোদিওন রমানোভিচ, সেন্ট পিটার্সবুর্গের এইসব বিদেশি, অর্থাৎ প্রধানত জার্মান, ... কোথা থেকে কী ভাবে যেন আমাদের এখানে এসে পড়ে, সব কয়টা আমাদের চেয়ে বোকা। এর কিন্তু কোন ব্যতিক্রম দেখি না। আপনাকে মানতেই হবে, কেননা ভেবে দেখুন না, ডাক্তারখানার কার্ল লোকটার 'কলিজা ভয়ে এ ফোঁড় ও ফোঁড় হইয়ে গেলো' এবং সে এমনই একটা কচি খোকা যে গাড়োয়ানকে বেঁধে ফেলার কোন চেষ্টা না করে 'কাঁদল, হাথ জোড় কইরল'— এ ধরনের গপ্পো কার পক্ষে বলা সম্ভব হতে পারে? হাঁদা কোথাকার! অথচ ভাবল খুব মর্মস্পর্শী! মনের মধ্যে একবার সন্দেহও ঢুকল না যে কথাগুলো বোকার মতো হয়ে যাচ্ছে! আমার তো মনে হয় ওই যে সরবরাহ দপ্তরের মাতাল কেরানিটা— ওটাও অনেক বেশি বুদ্ধিমান। অন্তুতপক্ষে এটা বোঝা যায় যে লোকটা বেহেড মাতাল, মদের নেশায় ওর বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে। অথচ দেখুন এই এরা— সবাই কেমন গুরুগম্ভীর, সিরিয়স।... ওঃ কেমন বসে-বসে চোখ ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছে! রেগে গেছে! খুব রেগে গেছে! হাঃ- হাঃ- হাঃ!... খুক-খুক-খুক!...."

উচ্ছ্বসিত হয়ে কাতেরিনা ইভানোভ্না তৎক্ষণাৎ নানা বিষয়ের বিশদ আলোচনার মেতে উঠল। হঠাৎ কথায়-কথায় বলে ফেলল তার জন্য যে পেনশন আদায়ের চেষ্টা-চরিত্র চলছে সেটা সফল হলে ওই টাকা দিয়ে সে তার নিজের শহরে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের জন্য একটা বোর্ডিং স্কুল অবশ্যই খুলবে। তখন পর্যন্ত কাতেরিনা ইভানোভ্নার নিজের মুখ থেকে এ সম্পর্কে রাস্‌কোলনিকভ্ কিছু শোনেনি। কাতেরিনা ইভানোভ্না তৎক্ষণাৎ তার পরিকল্পনার মনোমুগ্ধকর বিশদ বর্ণনায় মেতে উঠল। হঠাৎ দেখা গেল যেন কোন মায়ামন্ত্রবলে তার হাতে এসে পড়েছে একটা 'প্রশংসাপত্র' যেটার কথা রাস্‌কোল্‌নিকভ শুঁড়িখানায় মহিলার পরলোকগত স্বামীর মুখে শুনেছিল। তখন কথায়-কথায় তাকে এও জানিয়েছিল যে তার সহধর্মিণী কাতেরিনা ইভানোভ্না ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক বিদায় সংবর্ধনার আসরে 'গভর্নর এবং আরও সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে' শাল নৃত্য পরিবেশন করেছে। কাতেরিনা ইভানোভ্নার নিজেরই যে এখন বোর্ডিং স্কুল খোলার অধিকার আছে, দেখা যাচ্ছে এই প্রশংসপত্রটি তার প্রমাণ হতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় যে উদ্দেশ্যটা সে এতক্ষণ ভেতরে ভেতরে পুরে রেখেছিল তাহল ওই দুই 'রং চং মাখা চটকদার' যদি অন্ত্যেষ্টি ভোজের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসে তাহলে ওদের দুজনকেই একেবারে বসিয়ে দেবে এবং ওদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ করে দেবে যে কাতেরিনা ইভানোভ্না দস্তুরমতো সম্ভ্রান্ত ঘরের...'এমনকি বলা যেতে পারে....এক অভিজাত পরিবারের মেয়ে। সে একজন কর্নেলের মেয়ে। সম্প্রতি যে হঠকারি মহিলাদের এত দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে তাদের যে কারও চেয়ে সম্ভবত ভালো। ' প্রশংসাপত্রটি তৎক্ষণাৎ মাতাল অতিথিদের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। কাতেরিনা ইভানোভনা কোন বাধা দিল না, যেহেতু তাতে বাস্তবিকই —en toutes lettres—অর্থাৎ কিনা 'অক্ষরে অক্ষরে' লেখা ছিল যে সে লেফটেনান্ট কর্নেল পর্যায়ে উন্নীত জনৈক কোর্ট কাউন্সিলের কন্যা। আর উনি যেহেতু সম্মান পদকেও ভূষিত হয়েছিলেন সেহেতু তাঁর কন্যাকে আসলে প্রায় কর্নেলের কন্যাই বলা চলে। আবেগে উচ্ছ্বসিত কাতেরিনা ইভানোভ্না কালবিলম্ব না করে তার নিজের ছোট্ট শহরটিতে তার ভাবী শান্তিময় ও সুখের জীবনযাত্রার বিশদ বিস্তারিত বিবরণ দিতে শুরু করল। তার বোর্ডিং স্কুলে পড়ানোর জন্য কোন কোন হাই স্কুল টীচারদের সে আমন্ত্রণ জানাবে তাও বলল। মান্‌খো নামে পরম শ্রদ্ধেয় এক ফরাসী বৃদ্ধেরও উল্লেখ করল। ভদ্রলোক কাতেরিনা ইভানোভ্নাকে ইনস্টিটিউটে ফরাসী শিখিয়েছিলেন। উনি এখনও ওই শহরেই জীবনের শেষ দিনগুলো কাটাচ্ছেন। কাতেরিনা ইভানোভ্নার ধারণা উপযুক্ত দক্ষিণা পেলে তিনি অবশ্যই তার স্কুলে পড়াতে আসবেন। অবশেষে সোনিয়ার প্রসঙ্গও উঠল। 'কাতেরিনা ইভানোভ্নার সঙ্গে সেও যাবে। সব ব্যাপারে সাহায্য করবে' তাকে। এমন সময় টেবিলের এক প্রান্ত থেকে কে যেন নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে

বিদঘুটে আওয়াজ বার করল। কাতেরিনা ইভানোভ্‌না যদিও তখুনি ভাব দেখানোর চেষ্টা করল যে টেবিলের এক প্রান্তে উদ্রিক্ত ওই হাসিকে তাচ্ছিল্যভরে কোনও আমল দিচ্ছে না, তবু তক্ষুনি ইচ্ছে করে গলা চড়াল : তার সহকারিণী হওয়ার উপযোগী সমস্ত রকম গুণপনা যে নিঃসন্দেহে সোফিয়া সেমিওনভ্‌নার আছে এবং 'বিনয় সহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ, আভিজাত্য ও শিক্ষা'—কোনটারই যে তার অভাব নেই, সোৎসাহে এই কথা বলতে-বলতে সে সোনিয়ার গাল টিপে আদর করল, আবেগভরে তাকে দুবার চুমু খেল। সোনিয়া লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, কাতেরিনা ইভানোভ্‌না হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গে মনে-মনে মন্তব্য করল যে সে একটা 'আস্ত বোকা, বড় দুর্বল চরিত্রের মানুষ, বড় বেশি বিচলিত হয়ে পড়েছে। আর নয়, এখানেই ক্ষান্ত দেওয়া উচিত। তাছাড়া খাবারদাবারও ইতিমধ্যে শেষ হয়ে এসেছে। অতএব চা আনার কথা বলতে হয়।' ঠিক এই মুহূর্তে, এতক্ষণের এত কথাবার্তার মধ্যে সে যে এতটুকু অংশ পর্যন্ত নিতে পারেনি, এমনকি তাকে যে একেবারেই আমল দেওয়া হচ্ছে না এই ভেবে নিজেকে চরম অপমানিত মনে করে আমালিয়া ইভানোভ্‌না হঠাৎ একটা শেষ চেষ্টা করে দেখার ঝুঁকি নিয়ে বসল। গোপন অভিসন্ধি নিয়ে সাহস করে কাতেরিনা ইভানোভ্‌নাকে সে অত্যন্ত কাজের ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ একটি মন্তব্য করল: জানাল যে ভাবী বোর্ডিং স্কুলে মেয়েদের জামাকাপড় যাতে 'ডি ভিয়েশে' অর্থাৎ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং 'জামাকাপড় বালো দেখাশোনার জন্যে একজন বালো মহিলা—'ডি ডামে'— জরুর চাই। দ্বিতীয়ত 'দেখতে হোবে, ওল্প বয়সের মেইয়েরা যেন রাতে নোবেল-টোবেল না পড়ে।' কাতেরিনা ইভানোভ্‌না ইতিমধ্যে সত্যি-সত্যি বড় ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, অন্ত্যেষ্টিভোজের অনুষ্ঠানে তার এতক্ষণে রীতিমতো বিরক্তিও ধরে গেছে। তাই সঙ্গে-সঙ্গে আমালিয়া ইভানোভ্‌নাকে সে এই বলে 'বসিয়ে দিল' যে সে 'আজেবাজে বকছে', এ ব্যাপারের কিছুই সে বোঝে না, কেননা 'ডি ভিয়েশ' অভিজাত মেয়েদের বোর্ডিং স্কুলের পরিচালিকার মাথা ঘামানোর বিষয় নয়— ও নিয়ে মাথা ঘামাবে ওখানকার মেট্রন। আর নভেল পড়ার প্রসঙ্গে বলতে হয় যে বিষয়টি একেবারে অশোভন, তাই তার অনুরোধ এ নিয়ে সে যেন আর কোন কথা না বসে। আমালিয়া ইভানোভ্‌না একথায় জ্বলে উঠল। রেগে গিয়ে বলল যে সে শুধু 'বালোর জন্যেই' বলেছিল, 'খু-উ-ব, খু-উ-ব বালোর জন্যে' বলোছিল এবং এও শুনিয়ে দিল যে কাতেরিনা ইভানোভ্‌না 'বহুত সোময় হোয়ে গেলো, ফ্লাটের জন্যে 'ওকে' পোইসাও দিচ্ছেন না।' কাতেরিনা ইভানোভ্‌না সঙ্গে-সঙ্গে তাকে এই বলে 'বসিয়ে দিল' যে তার 'বালোর জন্যে'-টন্যে ও সব স্রেফ মিছে কথা, কেননা এই গতকালও, মৃত ব্যক্তির দেহ তখনও টেবিলের ওপর শায়িত, সেই সময় সে ফ্ল্যাটভাড়ার তাগিদ দিয়ে কাতেরিনা ইভানোভ্‌নাকে কম জ্বালাতন করেনি। তাতে

আমালিয়া ইভানোভ্‌নার অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত মন্তব্য হল: 'ওই মহিলাদের আসতে বুলেছিলাম, কিন্তু উনারা এলেন না, কেননা খানদানি ঘরের জেনানা উনারা, নীচু ঘরে আইসবে কি!' কাতেরিনা ইভানোভ্‌না তাকে তৎক্ষণাৎ 'বুঝিয়ে দিল' যেহেতু সে নিজে একটা নোংরা মেয়েমানুষ তাই যথার্থ আভিজাত্য কাকে বলে তা বোঝার ক্ষমতা তার নেই। আমালিয়া ইভানোভ্‌না এ অপমান সহ্য করতে না পেরে তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করল যে বার্লিনে তার 'ফাদার সিলেন বহুত-বহুত বোড়ো মানুষ, সোব সোময় পকেটে হাত ঢোকাইতেন, বেড়াইতে-বেড়াইতে মুখ দিয়ে আওয়াজ কইরতেন: উফ্ উফ্!'' ফাদারের একটা বাস্তব চিত্র তুলে ধরার উদ্দেশ্যে আমালিয়া ইভানোভ্‌না এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত ঢুকিয়ে গাল ফুলিয়ে মুখ দিয়ে 'উফ্ উফ্' গোছের অদ্ভুত আওয়াজ বের করতে লাগল। একটা কিছু বেধে যাবার সম্ভাবনায় উপস্থিত সকলে ইচ্ছে করে আমালিয়া ইভানোভ্‌নাকে জোর উৎসাহ দিয়ে আসছিল— এবারে তারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। কিন্তু কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল, আর কালবিলম্ব না করে সকলকে শুনিয়ে সে এক মোক্ষম ঘা মারল— বলে বসল যে আমালিয়া ইভানোভ্‌নার হয়ত কস্মিনকালে ফাদার বলে কেউ ছিল না, আমালিয়া ইভানোভ্‌না আসলে ছোট জাতের কোন মাতাল ভিনদেশি— সেন্ট পিটার্সবুর্গে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। আগে হয়ত কোথাও রাঁধুনি-টাঁধুনি ছিল— বলা যায় না, হয়ত তার চেয়েও নিচু স্তরের কিছু। আমালিয়া ইভানোভ্‌না লজ্জায় লাল হয়ে গেল। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে বলল যে হয়ত কাতেরিনা ইভানোভ্‌নারই কুনো ফাদার ছিল না কিন্তু ওর নিজের 'ফাদার ছিল, বার্লিনে ছিল। ইয়া লম্বা ফ্রক কোট পইরত আর সব সোময় উফ্ উফ্ উফ্ কইরত!' কাতেরিনা ইভানোভ্‌না তাচ্ছিল্যভরে বলল যে সে কোন্ ঘর থেকে এসেছে তা সকলের জানা আছে এবং এই প্রশংসপত্রটিতেই ছাপার অক্ষরে লেখা আছে যে তার বাবা একজন কর্নেল ছিলেন। কিন্তু আমালিয়া ইভানোভ্‌নার বাপ— যদি বাপ বলে তার আদৌ কেউ থাকত... সম্ভবত সেন্ট পিটার্সবুর্গের কোন ভবঘুরে ভিনদেশি, কোন গয়লা-টয়লা হবে। তবে এটাই খুব সম্ভব যে বাপ-টাপ কেউ ছিল না কেননা যে পিতৃনামে মানুষের পরিচয় তার ক্ষেত্রে সেটাই আজ পর্যন্ত কারও জানা নেই। ইভানোভ্‌না না ল্যুদ্‌ভিগোভ্‌না— কেউ জানে না। একথায় আমালিয়া ইভানোভ্‌না প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে টেবিলে ঘুষি মেরে এই বলে তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচাতে লাগল যে সে ল্যুদ্‌ভিগোভ্‌না মোটে নয়... আমাল ইভান— তার 'ফাদার ছিলেন ইয়োহান— ইভান, তিনি ছিলেন একজন মেজিস্টের।' সঙ্গে-সঙ্গে সে এও জানিয়ে দিল যে কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার ফাদার 'কখুনও মেজিস্টের ছিল না।' কাতেরিনা ইভানোভ্‌না চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তার মুখ ফেকাসে হয়ে গিয়েছিল, বুক ঘনঘন ওঠা-পড়া করছিল। তবু আপাতশান্ত ভাব বজায় রেখে সে তাকে জানিয়ে

দিল যে 'ফের যদি নিজের ওই ওঁচা ফাদারটাকে পূজনীয় পিতৃদেবের সঙ্গে একাসনে বসানোর সাহস দেখায় তাহলে সে তার মাথায় টুপি ছিনিয়ে নিয়ে পায়ে মাড়াবে।' তাই শুনে আমালিয়া ইভানোভ্না ঘরময় দাপাদাপি করতে-করতে প্রাণপণ চিৎকার করে বলল যে সে বাড়িউলি এবং কাতেরিনা ইভানোভ্নাকে 'এখুনি ঘর ছেইড়ে চোলে যেতে হোবে।' তারপর কেন যেন টেবিলের দিকে ধেয়ে গিয়ে সেখান থেকে তার রুপোর চামচগুলো সংগ্রহ করতে লাগল। হুলস্থূল বেধে গেল। বাচ্চাগুলো কাঁদতে শুরু করে দিল। সোনিয়া তাড়াতাড়ি করে কাতেরিনা ইভানোভ্নাকে ধরে সামলাতে গেল। কিন্তু এমন সময় আমালিয়া ইভানোভ্না হঠাৎ চিৎকার করে বেশ্যার খাতায় নাম লেখানো ধরনের কিছু একটা মন্তব্য করলে কাতেরিনা ইভানোভ্না আর থাকতে না পেরে এক ধাক্কায় সোনিয়াকে সরিয়ে দিয়ে আমালিয়া ইভানোভ্নার মাথার টুপি সম্পর্কে তার হুমকি অবিলম্বে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে তার দিকে ধেয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলে গেল। দোরগোড়ায় আবির্ভাব ঘটল পিওতর পেত্রোভিচ লুজিনের। ওখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সে তীব্র সন্ধানী দৃষ্টি ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখতে লাগল সমবেত লোকজনের দঙ্গলটাকে। কাতেরিনা ইভানোভ্না সোৎসাহে তার দিকে ছুটে গেল।

তিন

"পিওতর পেত্রোভিচ।" চেঁচিয়ে উঠল কাতেরিনা ইভানোভনা। " অন্তত আপনি আমাকে উদ্ধার করুন! এই আনাড়িটাকে বুঝিয়ে দিন যে বড় ঘরের এক দুস্থ ভদ্রমহিলা সঙ্গে এরকম ব্যবহার করার দুর্মতি যেন ওর না হয়! এর জন্য আদালতের আশ্রয় নিতে পারি।... আমি খোদ গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে দেখা করব।... ওকে জবাবদিহি করতে হবে।... আমার পিতৃদেবের আতিথেয়তার কথা স্মরণ করে এই অনাথ শিশুগুলোর পাশে এসে দাঁড়ান।"

"কিছু মনে করবেন না ঠাকরুন, কিছু মনে করবেন না!... মাফ করবেন, একটু দাঁড়ান," পিওতর পেত্রোভিচ হাতের ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিতে-দিতে বলল, "কিছু মনে করবেন না... আপনি নিজেই জানেন যে আপনার পিতৃদেবকে জানার সৌভাগ্য আমার হয়নি!" (কে একজন জোরে হেসে উঠল) "তাছাড়া আমালিয়া ইভানোভ্নার সঙ্গে আপনার এই যে অবিরাম ঝগড়াঝাঁটি তাতে অংশগ্রহণের কোনও অভিপ্রায়ও আমার নেই।... আমি এসেছি আমার নিজের একটা প্রয়োজনে।... আপনার সৎ মেয়ে সোফিয়া... ইভানোভ্নার সঙ্গে আমি অবিলম্বে কিছু কথা বলতে চাই.... নামটা ঠিক বললাম তো? দয়া করে আমাকে যেতে দিন..." বলতে-বলতে কাত হয়ে কাতেরিনা ইভানোভ্নার পাশ কাটিয়ে সে এগিয়ে গেল উলটো দিকের কোনায় যেখানে সোনিয়া বসে ছিল।

কাতেরিনা ইভানোভ্না যেমনকার তেমন স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বজ্রাহতের মতো। সে বুঝে উঠতে পারছিল না কী করে পিওতর পেত্রোভিচ তার পিতৃদেবের আতিথেয়তার কথাটা সরাসরি অস্বীকার করে বসল। ওই আতিথেয়তার ব্যাপারটা তার স্বকপোলকল্পিত হলেও সে নিজে কিন্তু ইতিমধ্যে সেটাকে প্রশ্নাতীত সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল। নেহাত যেন একটা কাজে এসেছে, পিওতর পেত্রোভিচের কথার মধ্যে এরকম একটা নীরব ভাব, এমনকি কতকটা যেন তাচ্ছিল্যপূর্ণ হুমকির আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। তাতেও বিস্মিত হল কাতেরিনা ইভানোভ্না। তাছাড়া ভদ্রলোকের আবির্ভাবে সমস্ত গোলমাল কেমন যেন আস্তে-আস্তে থিতিয়ে গেল। এই 'গম্ভীর প্রকৃতির কাজের মানুষটি' যে এখানকার এই পুরো দঙ্গলটির মধ্যে রীতিমতো বেমানান, এছাড়াও, এই ঘটনাটি ছাড়াও কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের তাগিদে সম্ভবত কোন অস্বাভাবিক কারণে যে সে এই দঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না। ফলে এখনই যে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, কোন একটা ঘটনা ঘটবে তাও স্পষ্ট। রাসকোল্‌নিকভ্ সোনিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে সরে দাঁড়িয়ে পথ করে দিল। পিওতর পেত্রোভিচ তাকে দেখেও দেখল না। মিনিটখানেক পরে দোরগোড়ায় লেবেজিয়াত্‌নিকভের আবির্ভাব ঘটল। ঘরে সে প্রবেশ করল না। যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তারও চোখে-মুখে বিশেষ একধরনের কৌতূহল, এমনকি কিছুটা বিস্ময়ও। মন দিয়ে শুনতে লাগল, কিন্তু মনে হল অনেকক্ষণ ধরে যেন কী একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করেও কিছুতে বুঝতে পারছিল না।

"মাফ করবেন, আমি হয়ত আপনাদের বিঘ্ন সৃষ্টি করছি, কিন্তু যে কাজে আমি এসেছি সেটা বেশ গুরুতর," বিশেষভাবে কাউকে উদ্দেশ্য না করে কতকটা সাধারণভাবে উপস্থিত সকলকেই যেন লক্ষ্য করে পিওতর পেত্রোভিচ বলল, "এমনকি আপনারা সকলে যে এখানে উপস্থিত আছেন তাতে আমি আনন্দিতই। আমালিয়া ইভানোভ্না, আপনার প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ এই যে সোনিয়া ইভানোভ্নার সঙ্গে এর পরে আমার যে-সমস্ত কথাবার্তা হবে, এখানকার মালিকান হিসেবে আপনি সেদিকে মনোযোগ দেবেন।" সোনিয়া আগেই ভয় পেয়ে গিয়েছিল, এবারে তাকে রীতিমতো চমকে দিয়ে সরাসরি তাকে লক্ষ করে পিওতর পেত্রোভিচ বলতে লাগল: "আমার বন্ধু আন্দ্রেই সেমিওনভিচ লেবেজিয়াত্‌নিকভের ঘরে যে আপনি এসেছিলেন তার ঠিক পর-পরই আমার টেবিল থেকে একশ রুবলের একটা ব্যাঙ্কনোট উধাও হয়ে যায়। আপনি যদি যে কোন উপায়ে জেনে থাকেন এবং আমাদের দেখিয়ে দিতে পারেন ওটা এখন কোথায় আছে, তাহলে বিশ্বাস করুন, আপনাকে কথা দিচ্ছি, সকলকে সাক্ষী মেনেই বলছি, ব্যাপারটা ওখানেই মিটে যাবে। তা যদি না হয়, তাহলে অত্যন্ত গুরুতর ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে বাধ্য হব। তখন... তখন কিন্তু নিজেকেই দুষবেন!"

ঘরের মধ্যে নেমে এলো থমথমে নিস্তব্ধতা। এমনকি ছেলেমেয়েগুলো যে কাঁদছিল তারাও চুপ করে গেল। সোনিয়া মড়ার মতো পাণ্ডুর মুখে দাঁড়িয়ে লুজিনের দিকে তাকাচ্ছিল, কিছু উত্তর দিতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল সে যেন তখনও ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারছে না। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল।

"তাহলে? এখন কী হবে?" স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে লুজিন জিগ্‌গেস করল।

"আমি জানি না।... আমি কিছুই জানি না..." ক্ষীণকণ্ঠে সোনিয়া অবশেষে বলল।

"না? জানেন না?" লুজিন আবার জিগ্‌গেস করল। তারপর আরও কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। "একটু ভেবে দেখুন দিদিমণি," কঠিন স্বরে হলেও যেন তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পথে আনার চেষ্টায় লুজিন বলতে শুরু করল,"ভালো করে ভেবেচিন্তে দেখুন। ভেবে দেখার জন্য আমি আপনাকে আরও কিছুটা সময় দিতে রাজি আছি। আপনার বোঝা উচিত, আমি যদি নিশ্চিত না হতাম তাহলে, বলাই বাহুল্য, আমি এরকম একজন অভিজ্ঞ লোক হয়ে সরাসরি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার ঝুঁকি নিতাম না; কেননা খোলাখুলি ও সর্বসমক্ষে এ ধরনের অভিযোগ আনার পর আমি যদি মিথ্যেবাদী, এমনকি এতটুকু ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হই তাহলে এক অর্থে আমাকে নিজেকেই তার জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে। আমি সেটা জানি। আজ সকালে আমি আমার নিজের প্রয়োজনে মোট তিন হাজার রুবল মূল্যের পাঁচ শতাংশ হারের কতকগুলি সরকারি ঋণপত্র ভাঙিয়েছিলাম। সে হিসাব আমার পকেটবুকে টোকা আছে। বাড়ি ফিরে এসে আমি টাকাগুলো গুনি— আন্দ্রেই সেমিওনভিচ তার সাক্ষী আছেন— দু-হাজার তিনশ রুবল গুনে পকেটবুকে তুলে রাখি। পকেটবুকটা রেখেছিলাম আমার ফ্রককোটের পাশপকেটে। বাকি প্রায় পাঁচশ রুবলের ব্যাঙ্কনোট টেবিলের ওপর ছিল। ... সেগুলোর মধ্যে তিনটে ছিল একশো রুবলের। সেই মুহূর্তে আপনি আমার কাছে এলেন, অবশ্য আমারই ডাকে। এরপর যতক্ষণ আমার ঘরে ছিলেন সারাটা সময় আপনাকে অত্যন্ত বিচলিত দেখাচ্ছিল। আপনি এত বেশি অস্থির হয়ে পড়েছিলেন যে কথাবার্তার মাঝখানেই তিন-তিনবার উঠে পড়েছিলেন, কেন যেন ঘর ছেড়ে চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, যদিও আমাদের কথাবার্তা তখনও শেষ হয়নি। আন্দ্রেই সেমিওনভিচ এসবেরই সাক্ষ্য দিতে পারেন। সম্ভবত, দিদিমণি, আপনি নিজেও এটা স্বীকার না করে এবং ঘোষণা না করে পারবেন না যে আপনাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম আন্দ্রেই সেমিওনভিচের মাধ্যমে। আপনার আত্মীয়া কাতেরিনা ইভানোভ্‌না আমাকে অন্ত্যেষ্টিভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, কিন্তু তাতে আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি। আপনাকে ডেকে পাঠানোর পেছনে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাঁর অসহায় অবস্থা ও দুর্দশার পরিপ্রেক্ষিতে কী ভাবে তাঁর উপকার করা যায়, তাঁর সাহায্যকল্পে চাঁদা তোলা ধরনের অথবা লটারি গোছের কিছুর

আয়োজন করা যায় কিনা— এই নিয়ে আলোচনা করা। আপনি আমাকে ধন্যবাদ জানালেন, এমনকি অশ্রুপাতও করলেন। সব যেমন-যেমন ঘটেছিল আমি আপনাকে বলে যাচ্ছি প্রথমত আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে, দ্বিতীয়ত আপনাকে এটাই দেখাতে যে সামান্যতম খুঁটিনাটি পর্যন্ত আমার মন থেকে মুছে যায়নি। যা হোক, এরপর টেবিল থেকে একটা দশ রুবলের ব্যাঙ্কনোট তুলে নিয়ে আমি আমার নিজের তরফ থেকে আপনার আত্মীয়ার স্বার্থে এবং আমার প্রাথমিক চাঁদা হিসেবে আপনাকে দিলাম। আন্দ্রেই সেমিওনভিচ এ সবই দেখেছেন। তারপর আমি আপনাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। তখনও কিন্তু আপনি ওইরকমই বিব্রত। আপনি চলে যাবার পর আমি আর আন্দ্রেই সেমিওনভিচ নিভৃতে বসে মিনিটদশেক কথাবার্তা বলে সময় কাটালাম। আন্দ্রেই সেমিওনভিচ বেরিয়ে যেতে আমি আবার টেবিলের ওপর পড়ে থাকা টাকাগুলোর দিকে নজর দিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল আমার আগেকার অভিপ্রায়মতো ওগুলো গুনে আলাদা জায়গায় রেখে দেওয়া। গুনতে গিয়ে দেখে অবাক হয়ে গেলাম যে নোটের তাড়াটার মধ্যে একটা একশ রুবলের নোট নেই। দয়া করে একবার বিবেচনা করে দেখুন, আন্দ্রেই সেমিওনভিচকে আমি কোনমতে সন্দেহ করতে পারি না। এমনকি ওকথা মনে আনতেও লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়। গুনতে যে আমার ভুল হবে সেটাও সম্ভব নয়, যেহেতু আপনার ঘরে ঢোকার মিনিট খানেক আগে আমার গোনা শেষ হয়ে গিয়েছিল— তখন দেখেছি হিসাবে ঠিক আছে। আপনাকে মানতেই হবে যে আপনার বিব্রত ভাব, চলে যাবার জন্য আপনার অমন তাড়া এবং আপনি যে কিছুক্ষণের জন্য টেবিলে হাত রেখেছিলেন... এ সব মনে হতে, অবশেষে আপনার সামাজিক অবস্থা, তার আনুষঙ্গিক অভ্যাস ইত্যাদি বিবেচনা করার পর, বলা যেতে পারে, আতঙ্কিত হয়ে, এমনকি নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই সন্দেহটা আপনার ওপর পড়তে *বাধ্য* হয়।... ব্যাপারটা নিষ্ঠুর, সন্দেহ নেই, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত বটে। সেই সঙ্গে এও যোগ করছি, আবারও বলছি যে সমস্ত রকম *চাক্ষুষ* ঘটনার ভিত্তিতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস সত্ত্বেও আমি এটা ঠিক বুঝতে পারছি যে আমার এই অভিযোগ আনার মধ্যে বেশ খানিকটা ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন, ব্যাপারটা আমি অমনি-অমনি ছেড়ে দিচ্ছি না। আমি যে রুখে দাঁড়িয়েছি তার কারণটা আপনাকে বলছি: একমাত্র কারণ, দিদিমণি, একমাত্র কারণ আপনার ঘোরতর অকৃতজ্ঞতা। কী রকম? আমি আপনাকে ডেকেছিলাম আপনার চরম দুর্দশাগ্রস্ত আত্মীয়ার স্বার্থে, আমি আমার সাধ্যমতো দশ রুবল সাহায্যও আপনাকে দিয়েছি, অথচ তার প্রতিদানে কালবিলম্ব না করে, সঙ্গে-সঙ্গে কিনা আপনার এই ব্যবহার। না না এটা ভালো নয়। এর জন্য অবশ্যই উপযুক্ত শিক্ষা হওয়া দরকার আপনার। বিবেচনা করে দেখুন। শুধু তাই নয়, আপনার একজন খাঁটি বন্ধু হিসেবে আপনাকে এখনও অনুরোধ করছি— আপনার চৈতন্য হোক। আমার চেয়ে ভালো

বন্ধু কিন্তু এই মুহূর্তে আপনি পাবেন না। আমার কথা যদি না শোনেন তাহলে আমি নির্মম হব! কী বলেন আপনি?''

''আমি আপনার কাছ থেকে কিছু নিইনি,'' ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে ফিসফিস করে বলল সোনিয়া। ''আপনি আমাকে দশ রুবল দিয়েছিলেন, এই নিন।'' সোনিয়া পকেট থেকে রুমাল বের করল, গিঁট খুলে দশ রুবলের নোটখানা বাড়িয়ে দিলে লুজিনের দিকে।

''বাকি একশ রুবলের কথা স্বীকার করছেন না তাহলে?'' টাকাটা না নিয়ে কঠোর ভর্ৎসনার সুরে সে বলল।

সোনিয়া চারপাশে নজর বুলাল। সকলে তাকিয়ে আছে তার দিকে— বিদ্রুপ, ঘৃণা ও বিদ্বেষে ভরা ভয়ঙ্কর, কঠিন সব মুখ। সে তাকাল রাস্‌কোল্‌নিকভের দিকে।... দু'হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি জড় করে দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল ঘেঁষে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে তাকে।

''হা ভগবান!'' সোনিয়ার মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো।

''আমালিয়া ইভানোভ্‌না, পুলিসকে জানান দরকার। তাই আপনার প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ, আপাতত দারোয়ানকে ডেকে পাঠান,'' শান্তকণ্ঠে, এমনকি বেশ গদ্গদ স্বরেই লুজিন বলল।

''গট ডের বার্মহের্‌ৎসিগে! আমি ঠিক জাইনতাম যে চৌরি কোরেসে''। দুহাত ছুঁড়ে ভঙ্গি করে বলল আমালিয়া ইভানোভ্‌না।

''আপনি জানতেন তাহলে?'' তার কথাটা লুফে নিল লুজিন। ''তার মানে এর আগেও অন্তত এমন কিছু-কিছু নমুনা পেয়েছিলেন যার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে? পরম শ্রদ্ধেয়া আমালিয়া ইভানোভ্‌না, আপনার কাছে আমার অনুরোধ আপনার এই কথাগুলো মনে রাখবেন... প্রসঙ্গত, আপনি বলেছেনও সাক্ষীদের সামনেই।

চারদিক থেকে সকলে হঠাৎ একসঙ্গে হৈচৈ করে উঠল, নড়েচড়ে উঠল।

''কী- ই- ই!'' সংবিৎ ফিরে পেয়ে, যেন বাঁধন ছিঁড়ে হঠাৎ চিৎকার করতে-করতে কাতেরিনা ইভানোভ্‌না তেড়ে গেল লুজিনের দিকে। ''কী! আপনি ওকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করছেন? সোনিয়াকে? ওঃ কী হারামজাদা, কী বদমাশ!'' বলতে-বলতে ছুটে গিয়ে হাড় জিরজিরে দু হাতে সাঁড়াশির মতো জড়িয়ে ধরল সোনিয়াকে।

''সোনিয়া! কী বলে তুই ওর কাছ থেকে দশ রুবল নিলি! ওঃ কী বোকা! দে দেখি এদিকে! এক্ষুনি দে ওই দশ রুবল— এই যে!

সোনিয়ার হাত থেকে নোটখানা ছিনিয়ে নিয়ে কাতেরিনা ইভানোভ্‌না হাতের মুঠোয় দুমড়ে-মুচড়ে ডেলা পাকাল, তারপর সজোরে ছুঁড়ে দিল সোজা লুজিনের মুখের ওপর। পাকান ডেলাটা লুজিনের চোখে লেগে ঠিকরে মেঝেতে পড়ে গেল।

আমালিয়া ইভানোভ্‌না ওটা তোলার জন্য ছুটে গেল। পিওতর পেত্রোভিচ মেজাজ ঠিক রাখতে পারল না।

" চেপে ধরে রাখুন আপনারা এই মাথা খারাপ মহিলাকে!" চিৎকার করে উঠল সে।

ঠিক এই মুহূর্তে দরজার সামনে লেবেজিয়াত্‌নিকভের পাশে দেখা গেল আরও কয়েকটা মুখ— তাদের মধ্যে মফস্বল থেকে আসা ওই দুই মহিলাও ছিল।

"কী! মাথা খারাপ? আমার কিনা মাথা খারাপ? বুদ্ধু কোথাকার!" হাউমাউ করে উঠল কাতেরিনা ইভানোভ্‌না। "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুদ্ধু! ভারি আমার কোর্ট-কাছারি দেখাচ্ছে! জুয়াচোর, ইতর! সোনিয়া, আমাদের সোনিয়া কিনা ওর টাকায় হাত দেবে! সোনিয়া কিনা চোর! তেমন হলে বরং উলটে তোকেই দেবে, বুদ্ধু!" বলতে-বলতে কাতেরিনা ইভানোভ্‌না হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো হেসে উঠল। "দেখে রাখুন আপনারা বুদ্ধুটাকে!" আঙুল দিয়ে লুজিনকে দেখিয়ে ঘরের এমুড়ো-ওমুড়ো ছুটতে-ছুটতে উপস্থিত সকলকে বলল। "কী? তুইও সেই দলে?" বাড়িউলির দিকে চোখ পড়ে যেতে সে বলল। "তুইও সেই দলে হারামজাদী জার্মান সসেজ কারবারি, বলছিস যে ও 'চৌরি করেসে ! আহা, প্রাশিয়া থেকে আমদানি করা মুরগির ঠ্যাং— তার ওপরে কেমন বাহারে ঘাগরা পরেছে দেখ! ইতর কোথাকার! ওঃ কী লোক সব! কী সব লোক! ওরে নচ্ছার, তোর কাছ থেকে আসার পর সেই যে রোদিওন রমানোভিচের পাশে এসে বসল তারপর আর ঘর ছেড়েই বের হয়নি ও!... তল্লাশি করে দেখুন। ও যখন ঘর ছেড়ে কোথাও বের হয়নি তখন টাকা তো ওর কাছেই থেকে যাবার কথা! খুঁজে দ্যাখ, খুঁজে দ্যাখ! তবে, বাছা আমার, দয়া করে মনে রাখবি, যদি না পাস, তোকে কিন্তু কৈফিয়ত দিতে হবে! আমি সম্রাটের কাছে যাব, আমাদের মহামান্য সম্রাটের কাছে, দয়ার অবতার জারের কাছে যাব, গিয়ে সটান তাঁর পায়ের কাছে আছড়ে পড়ব— আজই, এই এক্ষুনি! বলব, আমি অনাথা। ওরা আমায় ঠিক যেতে দেবে। ভাবছিস, দেবে না? ভুল করছিস, আমি ঠিক পৌছে যাব। যা-বই! মেয়েটা অমন নিরীহ বলে তুই পেয়ে বসেছিস, না? এটাই তোর ভরসা ছিল, তাই তো? কিন্তু আমাকে তুই চিনিস নে— আমি অন্য ধাতুতে গড়া! তোর দফারফা করে ছাড়ব। খোঁজ না! খোঁজ, খোঁজ! যা খুঁজে দ্যাখ!" বলতে-বলতে কাতেরিনা ইভানোভ্‌না উন্মত্ত হয়ে লুজিনকে ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল সোনিয়ার কাছে।

"আমি প্রস্তুত। দরকার হলে কৈফিয়ত দিতে রাজি আছি... কিন্তু শান্ত হোন ঠাকরুন, শান্ত হোন! আমি দিব্যি দেখতে পাচ্ছি যে আপনি মোটে নিরীহ প্রকৃতির নন! কিন্তু এ কাজটা... এ কাজটা... কী ভাবে করা সম্ভব?" লুজিন বিড়বিড় করে বলল। এটা করা উচিত পুলিসের উপস্থিতিতে... অবশ্য, যদিও এখানে এখন সাক্ষীর এতটুকু কমতি নেই। ... বেশ, আমি প্রস্তুত। কিন্তু মোটের ওপর একজন পুরুষ

মানুষের পক্ষে কঠিন হয়ে যাচ্ছে... লিঙ্গভেদের কারণে।... যদি আমালিয়া ইভানোভ্‌নার সাহায্য নেওয়া যেত... অবশ্য যদিও ব্যাপারটা এভাবে করা ঠিক নয়।... তা হলে কী করা যায় বলুন?"

"যাকে খুশি! যে খুশি তল্লাশ করে দেখতে পারে!" কাতেরিনা ইভানোভ্‌না চেঁচিয়ে উঠল। "সোনিয়া, পকেট উলটে দেখা ওদের! এই যে এই যে! ওরে জানোয়ার, দ্যাখ দ্যাখ— খালি। এখানে রুমাল ছিল, এ পকেট খালি— দেখছিস তো! এবারে অন্য পকেট— এই যে! দেখছিস! দেখছিস তো! " বলতে-বলতে কাতেরিনা ইভানোভ্‌না একে-একে সোনিয়ার দুটো পকেট শুধু উলটেই না, টেনে মুচড়ে দেখাল। কিন্তু ডান পাশের দ্বিতীয় পকেট থেকে হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে এলো একটুকরো কাগজ, শূন্যে গোঁত্তা খেয়ে লুজিনের পায়ের কাছে এসে পড়ল। এটা সকলেরই চোখে পড়েছিল। অনেকে চেঁচামেচি শুরু করে দিল। পিওতর পেত্রোভিচ নিচু হয়ে দুই আঙুলে মেঝে থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে সকলের চোখের সামনে ভাঁজ খুলল। সেই একশ রুবলের ব্যাঙ্কনোট— আট ভাঁজ করা। পিওতর পেত্রোভিচ্ হাতটা চারদিকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সকলকে নোটটা দেখাল।

"চোর! ভাগ্ আমার ফ্লেট থেকে! পুলিস! পুলিস!" গর্জন করে উঠল আমালিয়া ইভানোভ্‌না। "ওদের সাইবেরিয়ায় ঘানি ঠেলতে পাঠাতে হয়! ভাগ!"

চারদিক থেকে বর্ষিত হতে লাগল বিস্ময়োক্তি। রাস্‌কোল্‌নিকভ নীরব। সোনিয়ার মুখের ওপর থেকে সে তার দৃষ্টি সরাচ্ছিল না। কেবল কদাচিৎ লুজিনের দিকে দ্রুত দৃষ্টিপাত করে পরমুহূর্তে চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল। সোনিয়া সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। তার যেন স্মৃতি লোপ পেয়েছে। দেখে মনে হচ্ছিল সে এতটুকু অবাক পর্যন্ত হয়নি। হঠাৎ তার সারা মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল। দু-হাতে মুখ ঢেকে সে ডুকরে কেঁদে উঠল।

"না, আমি না । আমি নিইনি'। আমি জানি না!" বুক ফাটা আর্তনাদ করতে-করতে কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার দুই বাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাতেরিনা ইভানোভ্‌না তাকে এমনভাবে শক্ত করে বুকে চেপে ধরল যে মনে হল দুনিয়াসুদ্ধু সকলের বিরুদ্ধে বুক দিয়ে সে ওকে আগলাতে চায়।

"সোনিয়া! সোনিয়া! আমি বিশ্বাস করি না! দ্যাখ, আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না!" প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণ যতই থাক না কেন, তবু তার মাথাটা কোলে নিয়ে শিশুর মতো করে দোলাতে-দোলাতে চিৎকার করে বলল কাতেরিনা ইভানোভ্‌না। অসংখ্যবার চুমু খেতে লাগল তাকে, বারবার তার দুহাত ধরে হাতের ওপর অনেকক্ষণ ঠোঁট চেপে ধরে রেখে চুমু খেল। "তুই নিয়েছিস. এ হতেই পারে না। কী মূর্খ সব লোকজন। হা ভগবান! তোমরা সব মূর্খ , বোকাহাঁদার দল!" উপস্থিত সকলকে লক্ষ করে সে চিৎকার করে বলল। "তোমরা কী করে জানবে ও কী মেয়ে? তোমরা জান না ওর

মনটা কত বড় ! ও নেবে, ও! আরে, ও গায়ের শেষ জামাটা অবধি খুলে বেচে দেবে, খালি পায়ে হাঁটবে, তোমাদের প্রয়োজন হলে শেষ কপর্দকটুকু দিয়ে দেবে— এমনই মেয়ে ও! ও যে খাতায় নাম লিখিয়েছে তার কারণ আমার ছেলেমেয়েরা না খেয়ে ছিল, আমাদেরই জন্যে ও নিজেকে বেচে দিয়েছে!... ওঃ আমার স্বামী! আমার পরলোকগত স্বামী! ও কি দেখতে পাচ্ছে? ওগো দেখতে পাচ্ছ তুমি? তোমার আত্মার শান্তির জন্যে যে আয়োজন আমি করেছিলাম এই হল তার পরিণতি! হা ভগবান! আপনারা সকলে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন যে বড়! ওর হয়ে কেউ দাঁড়াচ্ছেন না! রোদিওন রমানোভিচ! আপনিই বা কেন ওর হয়ে কিছু বলছেন না? আপনিও কি তাহলে বিশ্বাস করেন? আপনারা ওর কড়ে আঙুলের যোগ্য নন। কেউ নয়, একজনও নয়! ভগবান! তুমিই তাহলে ওকে রক্ষা কর!"

ক্ষয়রোগগ্রস্ত, অভাগী, অনাথা কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার বিলাপ উপস্থিত সকলের মনে গভীর দাগ কাটল বলে মনে হল। ক্ষয়রোগে শীর্ণ-বিশীর্ণ, যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট সেই মুখে, রক্তজমাট শুকনো ঠোঁটে ভাঙা-ভাঙা গলার চিৎকারের মধ্যে, শিশুর মতো ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্নার মধ্যে মানসম্মান রক্ষার জন্য সকলের কাছে মরিয়া হয়ে তার শিশুসুলভ সরল ও বিশ্বাসপ্রবণ কাতর অনুনয়-বিনয়ের মধ্যে এত দুঃখকষ্ট জালা-যন্ত্রণার এমন করুণ প্রকাশ ছিল যে মনে হচ্ছিল সকলেই হতভাগীর জন্য দুঃখ পাচ্ছে। অন্তত পিওতর পেত্রোভিচ কালবিলম্ব না করে *দুঃখ প্রকাশ* করল।

"*ঠাকরুন, ঠাকরুন!*" গম্ভীর কণ্ঠে সে বলে উঠল। " এই ঘটনা আপনাকে স্পর্শ করছে না! আপনার বিরুদ্ধে দুরভিসন্ধি বা যোগসাজসের অভিযোগ কেউ আনতে পারবে না— বিশেষত আপনিই যখন পকেট উলটে ওটা আবিষ্কার করেছেন— সুতরাং দেখাই যাচ্ছে আগে থাকতে আপনার কোন ধারণা ছিল না। আমি ক্ষমা করে দিতে রাজি আছি, খুবই রাজি আছি। যাকে বলে দারিদ্র্য, তারই তাড়নায় সোফিয়া সেমিওনভ্‌না যদি একাজ করে থাকেন তাহলে আমার এতটুকু আপত্তি নেই ওঁকে ক্ষমা করে দিতে। কিন্তু দিদিমণি, আপনি স্বীকার করতে চাইছেন না কেন বলুন তো? কলঙ্কের ভয়ে? এটাই কি আপনার প্রথম চেষ্টা? আপনি হয়ত মাথা ঠিক রাখতে পারেননি— তাই না? বুঝি, বুঝি, সব বুঝি!... কিন্তু এসব বদ খেয়াল কেন বলতে পারেন। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী!" উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে এবার সে বলতে শুরু করল, "ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাবৃন্দ! ব্যক্তিগতভাবে যে অপমান আমাকে সহ্য করতে হয়েছে তা সত্ত্বেও অনুকম্পার বশবর্তী হয়ে, বলতে গেলে সমবেদনায় ব্যথিত হয়ে, এমনকি এই এখনও আমি মোটামুটিভাবে ওঁকে ক্ষমা করে দিতে প্রস্তুত আছি। হ্যাঁ দিদিমণি, আপনার এই লজ্জা আপনার ভবিষ্যতের শিক্ষা হয়ে থাকবে— এটাই আমি আশা করি," সোনিয়ার দিকে ফিরে সে বলল, "আমি ব্যাপারটা আর টানছি না, এখানেই এর পরিসমাপ্তি ঘটাচ্ছি। অনেক হয়েছে!"

পিওতর পেত্রোভিচ আড়চোখে তাকাল রাস্‌কোল্‌নিকভের দিকে। দুজনের চোখাচোখি হল। রাস্‌কোলনিকভ্ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পারলে তাকে ভস্ম করে ফেলে। কাতেরিনা ইভানোভ্‌না এখন যেন চারপাশের কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না— পাগলের মতো সোনিয়াকে বার-বার জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছিল। বাচ্চারাও চারদিক থেকে তাদের খুদে-খুদে হাত বাড়িয়ে সোনিয়াকে আঁকড়ে ধরে ছিল। সবার ছোট পোলেন্‌কা কী ঘটছে কিছুই বুঝতে না পেরে হাপুস নয়নে এমনভাবে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল যে মনে হচ্ছিল এখনই তার বুক ফেটে যাবে। কাঁদতে-কাঁদতে ফুলে ওঠা তার সুন্দর ছোট মুখখানা সে সোনিয়ার কাঁধের আড়ালে লুকোচ্ছিল।

"কী জঘন্য!" এমন সময় দরজার ধার থেকে বেজে উঠল জোর গলার আওয়াজ। পিওতর পেত্রাভিচ চট করে ফিরে তাকাল।

"কী জঘন্য!" পিওতর পেত্রোভিচের চোখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে আবার আওড়াল লেবেজিয়াত্‌নিকভ্।

পিওতর পেত্রোভিচ যেন চমকে উঠল। উপস্থিত সকলে এটা লক্ষ করেছিল, পরে এই নিয়ে তারা বলাবলিও করেছিল। লেবেজিয়াত্‌নিকভ্ ঘরের ভেতরে পা বাড়ল।

"আপনি কিনা আমাকে সাক্ষী মানছিলেন! আপনার এতদূর স্পর্ধা!" পিওতর পেত্রোভিচের দিকে এগিয়ে আসতে-আসতে সে বলল।

"এর অর্থ কী, আন্দ্রেই সেমিওনভিচ? আপনি কিসের কথা বলছেন?" মিনমিন করে লুজিন বলল।

"অর্থ এই যে আপনি একজন...কুৎসারটনাকারী! এই হল আমার কথার অর্থ!" ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন ছোট-ছোট দুই চোখের তীব্র চাহনি হেনে উত্তেজিতভাবে সে বলল। ভীষণ খেপে গেছে সে। রাস্‌কোল্‌নিকভের দৃষ্টি তার ওপর এসে বিঁধে রইল— যেন তার প্রতিটি কথা লুফে নিয়ে নিক্তিতে ওজন করতে ব্যস্ত সে। আবার নেমে এলো নিস্তব্ধতা। পিওতর পেত্রোভিচের অবস্থা প্রায় দিশেহারা হওয়ার মতো—বিশেষত প্রথম মুহূর্তে।

"আপনি যদি আমাকে বলেন..." তোতলাতে শুরু করল সে। "আপনার হয়েছে কী? আপনার মাথা ঠিক আছে তো?"

"আমার মাথা ঠিকই আছে মশাই, কিন্তু আপনি ...আপনি একটা ইতর লোক! ওঃ কী নীচ আপনি! আমি সব শুনেছি, ইচ্ছে করে শুধু অপেক্ষা করছিলাম, বোঝার চেষ্টা করছিলাম পুরো ব্যাপারটা, কেননা স্বীকার করতে বাধা নেই, এখনও আমি যুক্তি দিয়ে সবটা বুঝে উঠতে পারছি না।... কেন আপনি এসব করতে গেলেন? আমি বুঝতে পারছি না।"

"কী করেছি আমি? আপনি কী বলতে চান? আপনার যত আজেবাজে হেঁয়ালি বন্ধ করবেন কিনা? নাকি আপনি নেশা করেছেন?"

"আপনি একটা ইতর লোক। নেশা-টেশা হয়ত আপনিই করেন, আমার ওসব নেই! আমি ভোদকা একেবারে ছুঁই না, কারণ ওটা আমার নীতিবিরুদ্ধ। আপনারা ভেবে দেখুন একবার : এই যে এ লোকটা নিজে, নিজের হাতে একশ রুবলের নোট সোফিয়া সেমিওনভ্‌নাকে দিয়েছিল। আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমি সাক্ষী, আমি হলফ করে বলতে পারি। ও করেছে, ওর কীর্তি এটা!" সকলের দিকে একে-এক চোখ বুলিয়ে লেবেজিয়াত্‌নিকভ্‌ আওড়াল।

"আপনার মাথাটা কি একেবারে গেছে, নাকি আপনি একটা কচি খোকা?" গর্জন করে উঠল লুজিন। "উনি এখানে নিজে এইমাত্র সকলের সামনে—নিজের মুখে, এই এখুনি স্বীকার করলেন যে আমার কাছ থেকে দশ রুবল ছাড়া আর কিছু পাননি। তাই যদি হয় তবে এরপর কখন কীভাবে আরও কিছু আমি ওকে দিলাম? কীভাবে সেটা সম্ভব হল?"

"আমি দেখেছি, আমি সব দেখেছি।" লেবেজিয়াত্‌নিকভ্‌ গলা চড়িয়ে জোর দিয়ে বলল। "যদিও কোনও শপথ নেওয়া বা হলফনামা পড়া আমার নীতিবিরুদ্ধ, তবু আমি এই মুহূর্তে আদালতে শপথ নিয়ে বলতে পারি—তা সে যেমনভাবে শপথ নিতে বলেন না কেন—কারণ, আমি দেখেছি! কী ভাবে ওঁর অজ্ঞাতে চুপিচুপি ওঁকে টাকা গুঁজে দিলেন তা আমি দেখেছি! তবে দেখা যাচ্ছে আমি একটা হাঁদা। আমি তো ভেবেছিলাম আপনি দাতব্য করে গুঁজে দিলেন। দরজার কাছে আপনি যখন ওঁকে বিদায় জানাতে গেলেন সেই সময় উনি ঘুরে দাঁড়ালেন, আপনি এক হাতে ওঁর সঙ্গে করমর্দন করলেন, অন্য হাতে, বাঁহাতে আপনি চুপিচুপি ওর পকেটে নোটটা গুঁজে দিলেন। আমি দেখেছি।"

লুজিনের মুখ ফেকাসে হয়ে গেল।

"এসব কী আজেবাজে বকছেন!" উদ্ধতস্বরে সে বলল। "তাছাড়া জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আপনি নোটটা ঠিকমতো দেখতে পেলেনই বা কী করে? ও আপনার চোখের ভুল...আপনার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, তাই কী দেখতে কী দেখেছেন। আপনি প্রলাপ বকছেন।"

"না, চোখের ভুল নয়! যদিও আমি খানিকটা দূরে দাঁড়িয়েছিলাম, তবু আমি দেখেছি, সব দেখেছি এবং যদিও জানলার ওখান থেকে নোটটা ঠিকমত দেখতে পাওয়া বাস্তবিকই কঠিন—কথাটা আপনি ঠিক বলছেন—তবু ওটা যে একশ রুবলেরই নোট, একটা বিশেষ ঘটনার কারণে আমি সে বিষয়ে নিশ্চিত। কারণটা এই যে আপনি যখন সোফিয়া সেমিওনভ্‌নাকে দশ রুবলের নোটখানা দিচ্ছিলেন তখন আমি নিজের চোখে দেখেছি যে আপনি তখনই একশ রুবলের একটা নোটও টেবিল থেকে তুলে নেন। এটা আমার চোখে পড়েছে, কেননা সেই সময় আমি কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং যেহেতু সেই মুহূর্তে এর ফলে একটা চিন্তাও আমার মাথায় এসেছিল।

তাই নোটটা যে আপনি হাতে ধরে রেখেছিলেন তা আমি ভুলে যাইনি। আমি লক্ষ করেছি আপনি ওটা ভাঁজ করে সর্বক্ষণ হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে রেখেছিলেন। পরে ওটার কথা আমি ফের ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু উঠে দাঁড়ানোর সময় আপনি ডান হাত থেকে বাঁ হাতের মুঠোর রাখলেন। রাখতে গিয়ে আপনার হাত থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। তখন আমার আবার মনে পড়ে গেল, যেহেতু আবার আমার মাথায় এলো সেই চিন্তাটা। চিন্তাটা আসলে এই যে আপনি আমার অজ্ঞাতসারে ওঁর উপকার করতে চান। ফলে বুঝতেই পারছেন আমার নজর কতটা তীক্ষ্ণ ছিল। তাই আমি দেখতে পেলাম কী ভাবে আপনি কায়দা করে ওটা ওঁর পকেটে গুঁজে দিলেন। আমি দেখেছি, দেখেছি, শপথ নিয়ে আদালতে বলব!"

হাঁপাতে-হাঁপাতে লেবেজিয়াত্‌নিকভের দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। চারধার থেকে উঠতে লাগল নানা রকমের গুঞ্জন—অধিকাংশই বিস্ময়সূচক। তবে কারও-কারও সুরে ভীতিপ্রদর্শনের লক্ষণও প্রকাশ পাচ্ছিল। সকলে পিওতর পেত্রোভিচের চারধারে ভিড় করে দাঁড়াল। কাতেরিনা ইভানোভ্‌না ছুটে গেল লেবেজিয়াত্‌নিকভের দিকে।

"আন্দ্রেই সেমিওনভিচ! আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম! ওকে বাঁচান! একমাত্র আপনিই আছেন ওর পক্ষে! অভাগী অনাথা মেয়ে। ভগবান আপনাকে পাঠিয়েছেন! আন্দ্রেই সেমিওনভিচ, ভাই আমার, বন্ধু আমার!" বলতে-বলতে কী যে করতে চলছে সে সম্পর্কে প্রায় কোন বোধ তার না থাকায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো নতজানু হয়ে আন্দ্রেই সেমিওনভিচের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল কাতেরিনা ইভানোভ্‌না।

"গাঁজাখুরি কথা!" ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে গর্জে উঠল লুজিন। "গাঁজাখুরির আর জায়গা পান না মশাই! 'ভুলে গিয়েছিলাম, মনে পড়ে গেল, মনে ছিল, ভুলে গেলাম'—একি একটা কথা হল! তার মানে, বলতে চান, আমি ইচ্ছে করে ওঁর পকেটে গুঁজে দিয়েছি? কী কারণে? কী উদ্দেশ্যে? সাধারণভাবে কী এমন সম্পর্ক থাকতে পারে আমার এবং এই ...এর মধ্যে?"

"কী কারণে? সেটাই তো আমার বোধগম্য হচ্ছে না। কিন্তু আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে যা-যা আমি বলছি সব সত্যি, সত্যি ঘটনা! আপনি একটা অতি নীচ ও অসৎ লোক! আমার স্মৃতিশক্তি এতটা লোপ পায়নি। আমার স্পষ্ট মনে আছে এই প্রসঙ্গে সেই সময় সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল...ঠিক সেই সময়টিতে যখন আমি আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আপনার করমর্দন করলাম। কী এমন কারণ থাকতে পারে যার জন্য আপনি অমন গোপনে ওঁর পকেটে টাকা গুঁজে দিলেন? একমাত্র কারণ কি এই যে আপনি আমার কাছ থেকে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন, যেহেতু জানতেন যে এক্ষেত্রে আমি ভিন্ন মত পোষণ করি এবং ব্যক্তিগত দাতব্যে কোন আমূল প্রতিকার হতে পারে না বলে আমি তার বিরুদ্ধে? তাই মনে-মনে সিদ্ধান্ত

করলাম যে আমার উপস্থিতিতে এত বিপুল পরিমাণ অর্থসাহায্য দিতে আপনি বাস্তবিকই লজ্জা পাচ্ছেন। তাছাড়া এমনও মনে হয়েছিল যে আপনি হয়ত ওঁকে চমকে দিতে চান—পকেটে হঠাৎ একেবারে একশ রুবল আবিষ্কার করে উনি অবাক হয়ে যান—এটাই আপনার মনোগত ইচ্ছা! কেননা আমি জানি কোন-কোন পরোপকারী ব্যক্তি তাদের দান নিয়ে ওরকম রগড়াতে খুব ভালোবাসে। পরে আমার এও মনে হল যে আপনি হয়ত ওঁকে পরীক্ষা করতে চান—অর্থাৎ দেখতে চান ওটা আবিষ্কার করার পর উনি কৃতজ্ঞতা জানাতে আসেন কিনা। তারপর ভাবলাম হয়ত কৃতজ্ঞতা এড়িয়ে যেতে চান। ...মানে ওই যে কথায় বলে না, ডান হাত না কী যেন, যেন জানতে না পারে...বা ওই গোছের কিছু। এককথায়, ওরকম কোন মনোভাববশত হলেও হতে পারে। ...তা কতরকমের চিন্তাই না তখন আমার মনে এসেছিল। এগুলো পরে ভালো করে ভেবে দেখব বলে তুলে রেখে দিলাম। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, আমার মনে হয়েছিল আমি যে আপনার গোপন রহস্য জানি সেটা আপনাকে বলা ঠিক ভদ্রতাসম্মত হবে না। তবে সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে কিন্তু আরও একটা প্রশ্ন জেগেছিল : আচ্ছা, বলা তো যায় না, সোফিয়া সেমিওনভ্‌নার নজরে পড়ার আগেই যদি টাকাটা হারিয়ে যায়? ঠিক এই কারণেই আমি ঠিক করলাম এখানে এসে ওঁকে ডেকে জানিয়ে দেব যে ওঁর পকেটে একশ রুবল দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, এখানে আসার পথে আমি শ্রীমতী কবিলিয়াত্‌নিকভদের ঘরে একবার ঘুরে এসেছিলাম—'প্রত্যক্ষবাদী পদ্ধতির সাধারণ সিদ্ধান্ত' বইটি দিয়ে বিশেষত পিডেরিটের প্রবন্ধ এবং প্রসঙ্গত ভাগ্‌নেরের লেখাটাও তাদের পড়ে দেখতে বললাম। তারপর এখানে এসে দেখি এই কাণ্ড! এখন বলুন দেখি এসব চিন্তা-ভাবনা বিচার-বিবেচনা আমার পক্ষে করা কি সম্ভব হত যদি আমি সত্যি-সত্যি স্বচক্ষে ওঁর পকেটে আপনাকে একশ রুবল গুঁজে দিতে না দেখতাম?"

আন্দ্রেই সেমিওনভিচ যখন এরকম যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত টেনে তার রুদ্ধশ্বাসসংবলিত দীর্ঘভাষণের পরিসমাপ্তি ঘটাল তখন তাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। এমনকি তার মুখ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছিল। দুর্ভাগ্যবশত, রুশ ভাষায় ভালোমত প্রকাশের ক্ষমতা তার ছিল না— অবশ্য আর কোন ভাষাও তার জানা ছিল না। ফলে তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক ধাক্কায় তার শরীরের সমস্ত রস নিংড়ে বেরিয়ে গেছে। এমনকি ওকালতিতে এত বড় একটা কীর্তির পর হঠাৎ যেন সে রোগা হয়ে গেছে। সে যাই হোক, তার ভাষণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার মতো হল। এত গভীর আবেগ আর দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সে কথাগুলো বলেছিল যে দেখা গেল সকলে তার কথা বিশ্বাস করছে। পিওতর পেত্রোভিচ বুঝতে পারল যে গতিক সুবিধার নয়।

"আপনার মাথায় কখন কী সব বোকা-বোকা ভাবনাচিন্তা এসেছিল তাতে আমার কী?" চেঁচিয়ে উঠল সে। "এটা কোন প্রমাণ নয়, মশাই। ওসব আপনি ঘুমের ঘোরে,

স্বপ্নের মধ্যে দেখে থাকবেন—এছাড়া আর কী বলব! আমি আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি মশাই, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন! মিথ্যে কথা তো বলছেনই, আমার নামে কুৎসাও করছেন হয়ত কোন কারণে আমার ওপর আপনার রাগ থাকার দরুন। বিশেষত রাগটা এই কারণে হতে পারে যে আপনার স্বাধীন চিন্তা আর নিরীশ্বরবাদী ওইসব সামাজিক ধ্যানধারণার আমি পক্ষপাতী নই! এই হল আসল কথা!"

কিন্তু এভাবে মোচড় দিয়ে পিওতর পেত্রোভিচ কোন সুবিধা করতে পারল না। বরং চারধার থেকে মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল।

"কোথাকার জিনিস কোথায় গড়িয়ে যাচ্ছে দেখ!" লেবেজিয়াত্‌নিকভ্‌ চেঁচিয়ে উঠল। "মিথ্যেবাদী! ডাক তোর পুলিস, আমি শপথ নিয়ে বলব। শুধু একটা কথাই বুঝতে পারছি না—কী বলে ও এমন একটা নোংরা কাজে নামার ঝুঁকি নিল। ওঃ কী জঘন্য প্রবৃত্তির, কী বদমাশ লোক!"

"আমি বলতে পারি কেন উনি এই ঝুঁকি নিয়েছিলেন। দরকার হলে আমিও শপথ নিয়ে বলব।" দৃঢ়স্বরে অবশেষে কথাগুলো উচ্চারণ করে সামনে এগিয়ে এলো রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌।

তাকে দৃঢ় ও শান্ত দেখাচ্ছিল। তাকে একবার দেখে, তার দিকে একবার দৃষ্টিপাতমাত্রই সকলে স্পষ্ট বুঝতে পারল যে আসল ব্যাপারটা তার জানা আছে এবং ঘটনার জট খুলতে আর দেরি নেই।

"এখন পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার," সরাসরি লেবেজিয়াত্‌নিকভ্‌কে লক্ষ্য করে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ বলতে লাগল। "ঘটনার একেবারে গোড়াতে আমার অবশ্য সন্দেহ হয়েছিল যে এর মধ্যে কোনও বাজে ধরনের নোংরা কৌশল আছে। আমি সন্দেহ করতে শুরু করি একমাত্র আমারই জ্ঞাত বিশেষ কতকগুলো ঘটনা থেকে— এখন আমি তা আপনাদের সকলের সামনে ভেঙে বলব— সেখানেই সবকিছুর মূল। আপনি, আন্দ্রেই সেমিওনভিচ আপনার মহামূল্যবান সাক্ষ্য দিয়ে শেষপর্যন্ত সবকিছু আমার কাছে স্পষ্ট করে তুলেছেন। আমার অনুরোধ, আপনারা শুনুন, আপনারা সকলেই শুনুন," এবারে লুজিনকে দেখিয়ে বলল, "এই ভদ্রমহোদয়টি সম্প্রতি কোন এক যুবতীর সঙ্গে তাঁর নিজের বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে আসেন। যুবতীটি আর কেউই নয়— আমার আপন বোন আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না রাস্‌কোল্‌নিকভা। কিন্তু সেন্ট পিটার্সবুর্গে আসার পর, গত পরশুদিন আমাদের প্রথম সাক্ষাতের সময় উনি আমার সঙ্গে ঝগড়া করেন এবং আমি ওঁকে আমার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিই— এ ঘটনার দু-জন সাক্ষীও আছে। এই লোকটি অত্যন্ত কুটিল।... পরশুদিন, আমি তখনও জানতামই না আন্দ্রেই সেমিওনভিচ, যে উনি এখানে আপনার ঘরে এসে উঠেছেন... দেখা যাচ্ছে যেদিন আমাদের ঝগড়া হয়েছিল ঠিক সেইদিনই.. অর্থাৎ গত পরশুদিন, যখন আমি পরলোকগত

মার্মেলাদভের পরিচিত ব্যক্তি হিসেবে তাঁর সহধর্মিণী কাতেরিনা ইভানোভ্‌নাকে শেষকৃত্যের খরচ বাবদ কিছু টাকা দিই, তখন উনি তা দেখেছিলেন। উনি তৎক্ষণাৎ একটা চিরকুট লিখে আমার মাকে জানালেন যে আমি আমার সমস্ত টাকা যে দিয়ে দিয়েছি সেটা কাতেরিনা ইভানোভ্‌নাকে নয়, দিয়েছি সোফিয়া সেমিওনভ্‌নাকে। প্রসঙ্গত খুব খারাপ ভাষায় সোফিয়া সেমিওনভ্‌নার... চরিত্রের উল্লেখ করেন, অর্থাৎ সোফিয়া সেমিওনভ্‌নার সঙ্গে আমার সম্পর্কের প্রকৃতি সম্পর্কেও খারাপ ইঙ্গিত দেন। এসবের উদ্দেশ্য, আপনারা বুঝতেই পারছেন, আমার মা আর বোনের সঙ্গে আমার মনোমালিন্য ঘটান, তাদের মনের মধ্যে এই ধারণা সঞ্চার করা যে ওঁরা যেখানে ওঁদের শেষ কপর্দকটুকু দিয়ে আমায় সাহায্য করছেন আমি সেখানে তা দুহাতে উড়িয়ে আমার অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করছি। গতকাল সন্ধ্যাবেলা মা ও বোনের সামনে এব তাঁর উপস্থিতিতে আমি সত্য ঘটনা খুলে বলি, প্রমাণ করে দিই যে টাকাটা মোটেই সোফিয়া সেমিওনভ্‌নাকে দিইনি, দিয়েছিলাম কাতেরিনা ইভানোভ্‌নাকে— শেষকৃত্যের জন্য। পরশুদিনও আমি সোফিয়া সেমিওনভ্‌নাকে চিনতামই না, এমনকি তাকে চোখেও দেখিনি। সেই সঙ্গে আমি যোগ করি যে যার সম্পর্কে তাঁর এত খারাপ ধারণা, উনি, পিওতর পেত্রোভিচ লুজিন তাঁর নিজের সমস্ত গুণপনা সত্ত্বেও সেই সোফিয়া সেমিওনভ্‌নার কড়ে আঙুলেরও যোগ্য নন। তিনি যখন প্রশ্ন করেন সোফিয়া সেমিওনভ্‌াকে আমি আমার বোনের পাশে বসতে দিতাম কিনা তার উত্তরে আমি বলি যে সে আমি ওইদিনই বসিয়েছি। ওঁর মিথ্যে অপবাদের ভিত্তিতে আমার মা আর বোন আমার সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ বাধাতে চান না দেখে উনি ভয়ঙ্কর খেপে যান, উদ্ধত ভঙ্গিতে একের পর এক এমন সব কথা বলতে থাকেন যার জন্য কোনমতেই তাঁকে ক্ষমা করা যায় না। এর ফলে চূড়ান্ত সম্পর্কচ্ছেদ ঘটল। ওঁকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন ওঁরা। এসব ঘটেছিল গতকাল সন্ধ্যাবেলায়। এখন একটা বিষয়ে আপনাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিঃ ভেবে দেখুন উনি যদি এখন প্রমাণ করতে সফল হতেন যে সোফিয়া সেমিওনভ্‌না— চোর, তাহলে প্রথমত আমার মা আর বোনের কাছে প্রমাণ করে দিতে পারতেন যে তাঁর সন্দেহ প্রায় ঠিকই ছিল, আমার বোন আর সোফিয়াকে একই আসনে আমি স্থান দিয়েছি বলে তিনি যে রাগ করেছিলেন তারও সঙ্গত কারণ ছিল। সুতরাং দাঁড়াচ্ছে এই যে আমার ওপর আক্রমণ করে তিনি আসলে আমার বোনের অর্থাৎ তাঁর ভাবী বধূর স্বার্থ রক্ষা করেছেন, তাঁর মানমর্যাদা বাঁচিয়েছেন। এককথায়, এই ঘটনার সাহায্য নিয়ে উনি আমার পরিবারের লোকজনের সঙ্গে আমার আরও একবার ঝগড়া বাধানোর চেষ্টা করতে পারতেন। বলাই বাহুল্য এবারে উনি আবার ওঁদের অনুগ্রহ লাভ করবেন বলে আশাও করেছিলেন। একথা না হয় না-ই বললাম যে ব্যক্তিগতভাবে আমার ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করাও ওঁর উদ্দেশ্য ছিল, যেহেতু সোফিয়া সোমিওনভ্‌নার সুখ ও

সম্মান যে আমার কাছে খুবই মূল্যবান এমন অনুমান করার ভিত্তি তার আছে। এই হল ওঁর পুরো হিসাব! ব্যাপারটা আমি এইভাবে বুঝেছি। এই হল আসল কারণ— এ ছাড়া আর কোন কারণ থাকতে পারে না!"

এইভাবে, অথবা অনেকটা এইভাবেই রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তার বক্তব্য শেষ করল। উপস্থিত জনমণ্ডলীর ঘন ঘন চিৎকারে তার বক্তব্যে ছেদ পড়ছিল, যদিও বেশ মনোযোগ দিয়েই তারা ওর কথা শুনছিল। কিন্তু ছেদ যতই পড়ুক না কেন, তার কথাগুলো ছিল তীক্ষ্ণ, শান্ত-সংযত, যথাযথ, স্পষ্ট ও দৃঢ়। তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, কণ্ঠের সুরে দৃঢ় প্রত্যয়ের আভাস, তার কঠিন মুখ সকলের মনে গভীর ছাপ ফেলে।

"ঠিক, ঠিক, তাই বটে!" উল্লসিত হয়ে সমর্থন জানাল, লেবেজিয়াত্‌নিকভ্। হ্যাঁ, তা-ই হবে, কেননা সোফিয়া সেমিওনভ্‌না যেই মুহূর্তে আমাদের ঘরে ঢুকলেন ঠিক তখনই উনি আমাকে জিগ্‌গেস করেছিলেন আপনি এখানে আছেন কিনা, কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার অতিথিদের মধ্যে আপনাকে আমি দেখেছি কিনা। উনি আমাকে জানলার পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিচু গলায় জিগ্‌গেস করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে এখানে আপনার উপস্থিতি তাঁর একান্ত প্রয়োজন ছিল! ঠিক কথা! তাই বটে!"

লুজিন চুপ করে রইল, তাচ্ছিল্যভরে মৃদু হাসল। অবশ্য তাকে বড় বেশি ফেকাসে দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, কী করে এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়া তার জন্য মতলব ভাঁজছে। হয়ত সব কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যেতে পারলেই সে খুশি হত। কিন্তু এই মুহূর্তে তা প্রায় অসম্ভব। এর অর্থ হত তার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ উঠেছে সেগুলো ন্যায়সঙ্গত বলে সরাসরি স্বীকার করা এবং সে যে সোফিয়া সেমিওনভ্‌নার নামে সত্যি-সত্যি কুৎসা রটিয়েছে তা মেনে নেওয়া। পরন্তু মদ পেটে পড়ায় লোকজন অমনিতেই বড় বেশি উত্তেজিত হয়ে আছে। রসদ দপ্তরের সেই লোকটা, যদিও পুরো ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি, চেঁচাচ্ছিল সকলের চেয়ে বেশি, এমন সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব দিচ্ছিল সেগুলো লুজিনের পক্ষে দস্তুরমতো অপ্রীতিকর। কিন্তু এমন লোকজনও ছিল যারা নেশাগ্রস্ত নয়— আশপাশের সবগুলো ঘর থেকে তারা এসে ভিড় জমিয়েছে। পোল জাতের যে তিন মূর্তি সেখানে উপস্থিত ছিল তারা সকলেই ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে লক্ষ্য করে অবিরাম 'বদমাশ! বদমাশ!' বলে চেঁচাতে লাগল, সেইসঙ্গে পোল ভাষায় আরও কী সব ধমক-ধামকও দিতে লাগল বিড়বিড় করে। সোনিয়া উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিল, কিন্তু সেও সব কিছু বুঝতে পারছিল বলে মনে হয় না। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সবে অচেতন অবস্থা থেকে জেগে উঠেছে। তবে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ই যে তার একমাত্র উদ্ধারকর্তা এটা উপলব্ধি করে সে মুহূর্তের জন্যও তার মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরাচ্ছিল না। কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার নিঃশ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল, ঘড়ঘড় আওয়াজ করে সে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাকে, মনে হচ্ছিল সব শক্তি তার ফুরিয়ে গেছে।

সবচেয়ে বোকা-বোকা লাগছিল আমালিয়া ইভানোভ্‌নাকে। এমনভাবে হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল যেন তার চিন্তাশক্তিই লোপ পেয়েছে। শুধু যা দেখতে পাচ্ছিল তা এই যে পিওতর পেত্রোভিচের জারিজুরি ফাঁস হয়ে গেছে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ আরও কিছু বলার সুযোগ চেয়ে আবেদন করতে গিয়েছিল, কিন্তু তাকে ওরা আর কথা শেষ করতে দিল না— সকলে হৈ হৈ করে লুজিনকে ঘিরে ধরে গালিগালাজ ও ধমক-ধামক দিতে শুরু করল। কিন্তু পিওতর পেত্রোভিচ ঘাবড়ানোর পাত্র নয়। সোনিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভেস্তে গেছে দেখে সে চূড়ান্ত বেহায়াপনার আশ্রয় নিল।

"দাঁড়ান দেখি মশাই, দাঁড়ান! দয়া করে ভিড় জমাবেন না। আমায় যেতে দিন!" ভিড় ঠেলে এগোতে-এগোতে সে বলল। "দয়া করে চোখ রাঙাবেন না আমাকে। বিশ্বাস করুন ওতে কিছু হবে না, কোন সুবিধা হবে না। ভয়ে মাথা নিচু করে থাকব সে বান্দা আমি নই। বরং মশাই আপনারা যে জোর করে একটা ফৌজদারি অপরাধের ঘটনা চাপা দিয়ে দিলেন এর জন্য আপনাদের জবাবদিহি করতে হবে। চোরের মুখোশ খুলে গেছে বললেও কম বলা হবে। আমি এই মামলা চালাব। আদালতে যাঁরা বসেন তাঁরা এরকম অন্ধ নন এবং... এবং মাতালও নন। স্বাধীন চিন্তার প্রচারক দুজন কট্টর নাস্তিক ও প্ররোচক যখন বোকার মতো নিজমুখেই স্বীকার করছে যে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই তারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে তখন আদালত তাদের কথা বিশ্বাস করবে না এটাই স্বাভাবিক।... হয়েছে, যেতে দিন দেখি!"

"এই মুহূর্তে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বেরিয়ে যান আমার ঘর থেকে! আপনার ছায়ামাত্র যেন আমার ঘরের ত্রিসীমানায় না দেখি! দোহাই আপনার, চলে যান! আমাদের দুজনের মধ্যে যেটুকু সম্পর্ক ছিল তা চুকেবুকে গেছে! আমি শুধু ভাবি, ওঁকে পথে আনার জন্যে কী প্রাণান্তকর চেষ্টাই না আমি করেছিলাম... পুরো দুটি সপ্তাহ!..."

"আমি নিজেই তো আপনাকে বলেছিলাম, আন্দ্রেই সেমিওনভিচ, যে আমি চলে যাচ্ছি। বলেছিলাম কিনা? কিন্তু আপনিই তো থেকে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। এখন শুধু একটা কথাই যোগ করার আছে—আপনি একটা আহাম্মক! আপনার দুর্বল মন আর ক্ষীণ দৃষ্টির আরোগ্য কামনা করি! এবারে ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়বৃন্দ, আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি!"

সে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু সেনাবাহিনীর রসদ সরবরাহ দপ্তরের সেই অবসরপ্রাপ্ত কেরানিটি অত সহজে সামান্য কয়েকটা গালাগালের ওপর দিয়ে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। টেবিল থেকে একখানা গেলাস তুলে নিয়ে ধাঁ করে ছুঁড়ে মারল পিওতর পেত্রোভিচের দিকে। সেটা সোজা উড়ে এসে পড়ল আমালিয়া ইভানোভ্‌নার ওপর। সে হাউমাউ করে উঠল, এদিকে রসদ দপ্তরের সেই লোকটিও

সজোরে ছুঁড়তে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ধপাস করে মুখ থুবড়ে টেবিলের ওপর পড়ে গেল। পিওতর পেত্রোভিচ তার ঘরে চলে গেল। আধ ঘন্টার মধ্যে বাড়ির ধারেকাছে তাকে দেখা গেল না। সোনিয়া অমনিতেই লাজুক স্বভাবের, আগেও জানত যে দুনিয়ায় যে কারও চেয়ে তার সর্বনাশ করা সহজ এবং শাস্তির প্রায় কোন ভয় না করে যে কেউ তাকে অপমানও করতে পারে। কিন্তু তা হলেও ঠিক এই একমুহূর্ত আগেও তার ধারণা ছিল যে কোনও মানুষের সঙ্গে নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করলে, সতর্ক হয়ে চললে বিপদ এড়ানো গেলেও যেতে পারে। মোহভঙ্গ হতে সে বড় কঠিন আঘাত পেল। অবশ্যই সহিষ্ণুতা দিয়ে প্রায় মুখ বুজে সব সহ্য করার ক্ষমতা তার ছিল। এমনকি এটাও সে সহ্য করতে পারত। কিন্তু প্রথমদিকে বড় বেশি অসহনীয় লাগছিল তার যে জয় হয়েছে এবং সে যে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়েছে তা সত্ত্বেও— প্রথম ভয় ও প্রথম স্তম্ভিত ভাবটা কেটে যাবার পর যখন সে সব কিছু স্পষ্ট বুঝতে পারল, উপলব্ধি করতে পারল তখন একটা অসহায় ভাব ও অপমানের অসহ্য জ্বালায় তার বুকের ভেতরটা যেন জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যেতে লাগল। হিস্টিরিয়াগ্রস্তের লক্ষণ দেখা দিল তার মধ্যে। অবশেষে সহ্যের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে সে একছুটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে তার নিজের ডেরায় পালিয়ে গেল। সেটা ঘটল লুজিনের প্রস্থানের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে। ছুঁড়ে দেওয়া গেলাসটা গায়ে এসে পড়তে উপস্থিত সকলে যখন জোরে হেসে উঠল তখন অন্যের দোষে নিজের এই শাস্তি আমালিয়া ইভানোভ্‌নাও আর সহ্য করতে পারল না। কাতেরিনা ইভানোভ্‌নাকে সব কিছুর জন্য দায়ী বিবেচনা করে তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করতে-করতে সে তার দিকে ধেয়ে গেল।

"ভাগো আমার ফ্লেট থেকে! এই মুহূর্তে! এক্ষুনি!" এই বলে কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার যা যা জিনিস তার হাতের কাছে পড়ল তুলে-তুলে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। কাতেরিনা ইভানোভ্‌না এর আগেই অবসন্ন হয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়েছিল। অমনিতেই সে তখন মৃতপ্রায়, প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য, পাণ্ডুর। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছিল। আমালিয়া ইভানোভ্‌নার কাণ্ডকারখানা দেখে ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে সে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু যুদ্ধটা বড় বেশি অসমান। আমালিয়া ইভানোভ্‌না তাকে অবলীলাক্রমে একটা পালকের মতো ঠেলে সরিয়ে দিল।

" কী! ওই নচ্ছার লোকটা পরকালের কোন পরোয়া না করে যা নয় তাই অপবাদ দিয়ে গেল— সেটা কম হল বুঝি? এখন এই হতচ্ছাড়াটাও হামলা করছে আমারই ওপর! এ কী কাণ্ড! স্বামীর অন্ত্যেষ্টির দিনে আমাকে ফ্ল্যাট থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, আমারই আতিথ্য গ্রহণের পর অনাথ বাচ্চাকাচ্চা সমেত আমাকে রাস্তায় বের করে দিচ্ছে! কোথায় যাব আমি?" হাঁপাতে -হাঁপাতে তারস্বরে বিলাপ করতে লাগল অভাগী। "হা ভগবান!" তার দু-চোখে আগুনের ঝলক। "হে প্রভু, আমাদের মতো অনাথদেরই যদি তুমি রক্ষা করতে না পার তাহলে আর কাকে রক্ষা করবে? কিন্তু না, আমিও

দেখব। পৃথিবীতে ন্যায়বিচার বলে বস্তু আছে, সত্য আছে, আছে! আমি তা-ই খুঁজে বের করব! দাড়াও, এখনই করব। তোমরা ভেবেছ কী? অবিশ্বাসী, নচ্ছারের দল! পোলেন্‌কা, তুই বাচ্চাদের নিয়ে থাক, আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি। আমার জন্য অপেক্ষা করিস তোরা, রাস্তায় হলেও করিস। দেখি, পৃথিবীতে সত্য আছে কিনা!"

এই বলে মাথায় জড়িয়ে নিল সেই সবুজ শালটা— পরলোকগত মার্মেলাদভ্ তার বিবরণে যার উল্লেখ করেছিল। মাতাল পড়শীরা তখনও এলেমেলোভাবে ঘরের মধ্যে ভিড় করে ছিল। ঠেলতে-ঠেলতে তাদের ভেতর দিয়ে জায়গা করে নিয়ে সাশ্রুনয়নে বিলাপ করতে-করতে সে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গেল। তার লক্ষ্য অনির্দিষ্ট আর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে যেখান থেকে হোক যেভাবেই হোক সে ন্যায়বিচার খুঁজে বের করবে। পোলেন্‌কা বাচ্চাদের নিয়ে ঘরের এক কোনায় ট্রাঙ্কের ওপর ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে থাকল। ছোট দুই ভাই-বোনকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে-কাঁপতে অপেক্ষা করতে লাগল কখন মা ফিরে আসে। আমালিয়া ইভানোভ্‌না চিৎকার-চেঁচামেচি আর বিলাপ করতে-করতে ঘরের মধ্যে দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগল। হাতের কাছে যা-যা পড়ল সব পাক মেরে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। চূড়ান্ত অসংযত হয়ে পড়েছিল সে। জনতা যে যার মতো উলটোপালটা গলাবাজি করে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ যা ঘটেছিল তাই নিয়ে যে যেমন জানে আলোচনা করছিল, কেউ বা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ও গালিগালাজ করছিল। কেউ আবার এরই মধ্যে গানও জুড়ে দিয়েছিল।...

'আচ্ছা, এবারে আমাকেও যেতে হয়!' রাস্‌কোল্‌নিকভ্ মনে-মনে ভাবল। 'তাহলে সোফিয়া সেমিওনভ্‌না, দেখা যাক আপনি এখন কী বলেন।'

সোনিয়ার বাড়ির রাস্তা ধরল রাস্‌কোল্‌নিকভ্।

চার

মনের মধ্যে নিজেরই জ্বালাযন্ত্রণা ও বিভীষিকার এত দুঃসহ বোঝা বহন করা সত্ত্বেও লুজিনের বিরুদ্ধে সোনিয়ার হয়ে ওকালতিতে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ যথেষ্ট সাহস ও কর্মতৎপরতার পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু সেদিন সকালে অতটা কষ্ট ভোগ করার পর সোনিয়ার পক্ষ অবলম্বনের জন্য তার তাগিদ যে কতদূর ব্যক্তিগত ও আন্তরিক ছিল সে প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও, নিজের মনের ওপর যে-সমস্ত প্রভাব তার নিজের কাছেই অসহ্য ঠেকছিল তা থেকে রেহাই পেয়ে তার যেন বেশ ভালোই লাগছিল তখন। তাছাড়া তার সামনে ছিল বিশেষ কতকগুলো মুহূর্ত। সোনিয়ার সঙ্গে আসন্ন সাক্ষাৎকারের কথা ভেবে মনে-মনে ভীষণ দুশ্চিন্তাও হচ্ছিল। সোনিয়াকে ওর *জানাতেই হবে* কে খুন করেছিল লিজাভেতাকে। তার মন বলছিল এর ফলে তাকে নিদারুণ কষ্টভোগ করতে হবে। সেই ভয়টাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টাও সে করছিল। তাই কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সে যে মনে-মনে

বলেছিল 'তাহলে সোফিয়া সেমিওনভ্না, দেখা যাক আপনি কী বলেন!'— তা সম্ভবত এই কারণে যে লুজিনের বিরুদ্ধে সবে জয়লাভের ফলে বাহ্যত এক ধরনের উৎসাহ ও যুদ্ধং দেহি মনোভাব তখনও তার মধ্যে কাজ করছিল। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। সে যখন কাপেরনাউমভ্‌দের ফ্ল্যাটের কাছে এসে পৌঁছল তখন একটা নিদারুণ আতঙ্ক ও অবসাদ হঠাৎ তাকে গ্রাস করল। কী করবে বুঝতে না পেরে সে দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মনে প্রশ্ন জাগল: 'লিজাভেতাকে কে খুন করেছে সেটা কি বলা একান্তই দরকার?' বেয়াড়া প্রশ্ন, যেহেতু ওই একই সময় হঠাৎ তার মনে হল, না=বলা তো ঠিক হবেই না, এমনকি এই মুহূর্তটিকে অন্তত কিছু সময়ের জন্য *ঠেকিয়ে* রাখাও অসম্ভব। সে তখনও জানত না কেন অসম্ভব। এটা সে কেবল *অনুভব করল*। প্রয়োজনের সামনে নিজের অসহায়তা সম্পর্কে এই পীড়াদায়ক সচেতনতা তাকে প্রায় পিষে ফেলতে লাগল। আর চিন্তাভাবনা নয়, আর কোন কষ্টভোগ করা নয়— এই সঙ্কল্প নিয়ে সে দ্রুত খুলে ফেলল ভেজান দরজাটা। চৌকাট থেকেই তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সোনিয়ার ওপর। টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে বসে ছিল সোনিয়া। কিন্তু রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে দেখামাত্র চটপট উঠে দাঁড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল— যেন তারই প্রতীক্ষায় ছিল।

"আপনি না থাকলে আমার যে কী দশা হত!" ঘরের মাঝখানে এসে তার মুখোমুখি হয়ে সোনিয়া তাড়াতাড়ি বলে উঠল। বোঝা যাচ্ছিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একথাই তাকে বলার জন্য সে ছটফট করছিল। এরই অপেক্ষায় সে ছিল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। যে চেয়ারটা ছেড়ে সোনিয়া সবে উঠে দাঁড়িয়েছিল সেটাতে বসে পড়ল। সোনিয়া ঠিক গতকালের মতোই দাঁড়িয়ে ছিল ওর সামনে দু'পা তফাতে।

"তা হলে সোনিয়া?" বলতে-বলতে হঠাৎ সে উপলব্ধি করল যে তার গলা কাঁপছে। "পুরো ব্যাপারটার ভিত্তি তাহলে দেখা যাচ্ছে 'সামাজিক পরিবেশ এবং তার আনুষঙ্গিক অভ্যাস।' এখন আপনি এটা বুঝতে পেরেছেন তো?"

যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল সোনিয়ার চোখে-মুখে।

"দোহাই আপনার, গতকালের মতো কথা আমার সঙ্গে আর বলবেন না!" রাস্‌কোল্‌নিকভের কথার মাঝখানে সে বলে উঠল। "আপনার দুটি পায় পড়ি, শুরু করার চেষ্টা পর্যন্ত করবেন না। অমনিতেই ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে আছি আমি। ..." সঙ্গে-সঙ্গে সে তাড়াতাড়ি মুচকি হাসলও, কেননা, তার ভয় হল তিরস্কারটা রাস্‌কোল্‌নিভের মনঃপূত নাও হতে পারে।

"আমি তো বোকার মতো ওখান থেকে চলে এলাম। ওখানে কী হচ্ছে এখন? এখনই যাব ভাবছিলাম। আবার ভাবলাম কী জানি,... আপনি যদি আসেন!"

আমালিয়া ইভানোভ্না যে ফ্ল্যাট থেকে ওদের তাড়িয়ে দিচ্ছে এবং কাতেরিনা ইভানোভ্না যে 'সত্যের সন্ধানে' কোথায় কে জানে ছুটে বেরিয়ে গেছে এসব বৃত্তান্ত সে তাকে দিল।

"ওঃ ভগবান!" সোনিয়া আর্তনাদ করে উঠল। শিগ্‌গির চলুন তা হলে..." এই বলে সে আংরাখাটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হল।

"সেই একই ব্যাপার!" বিরক্তি ঝরে পড়ল রাস্‌কোল্‌নিকভের কণ্ঠস্বরে। "একমাত্র ওরাই আপনার ধ্যানজ্ঞান! আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটান না।"

"কিন্তু... কাতেরিনা ইভানোভ্নার কী হবে?"

"কাতেরিনা ইভানোভ্না আপনাকে ফাঁকি দিয়ে যাবেন কোথায়? ও নিয়ে ভাববেন না। ঘর ছেড়ে যখন বেরিয়েছেন তখন নির্ঘাত আপনার কাছেই আসবেন", রাগতস্বরে সে যোগ করল। "আপনাকে দেখতে না পেলে দোষ কিন্তু আপনারই ঘাড়ে পড়বে।..."

সোনিয়া কোন সিদ্ধান্তে আসতে না পেরে অস্বস্তির সঙ্গে চেয়ারের কিনারায় বসল। রাস্‌কোল্‌নিকভ চুপচাপ মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। মনে-মনে কী যেন ভাবছিল।

"ধরে নেওয়া যেতে পারে লুজিন ঠিক এই মুহূর্তে ওটা করতে চায়নি," সোনিয়ার দিকে না তাকিয়ে সে শুরু করল, "তবে ও যদি চাইত অথবা ব্যাপারটা যদি ওর হিসাবের মধ্যে থাকত তাহলে আপনাকে নির্ঘাত জেলে পাঠিয়ে ছাড়ত— অবশ্য ঘটনাচক্রে আমি আর লেবেজিয়াত্‌নিকভ্ উপস্থিত না থাকলে। তাই না?"

"হ্যাঁ," ক্ষীণকণ্ঠে সে বলল। "হ্যাঁ।" অন্যমনস্কভাবে, উদ্বিগ্নস্বরে সে আওড়াল।

"আমি কিন্তু সত্যি-সত্যি ওখানে উপস্থিত নাও থাকতে পারতাম! আর লেবেজিয়াত্‌নিকভ্?— সে তো নেহাতই দৈবাৎ এসে পড়েছিল।"

সোনিয়া চুপ করে রইল।

"কিন্তু জেলে যদি যেতে হত তাহলে? মনে আছে, গতকাল কী বলেছিলাম?"

এবারেও সে উত্তর দিল না। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল উত্তরের জন্য।

"আমি তো ভেবেছিলাম আপনি আবার চিৎকার করে উঠবেন: 'আ, বন্ধ করুন! থামুন দেখি!' বলতে-বলতে রাস্‌কোল্‌নিকভ হেসে উঠল— কিন্তু অনেকটা যেন জোর করেই। "কী? এবারেও চুপ?" মিনিটখানেক পরে সে জিগ্‌গেস করল। "আরে কিছু একটা নিয়ে কথাবার্তা বলতে হয় তো! এই ধরুন না কেন, লেবেজিয়াত্‌নিকভের ভাষাতেই বলি: একটি 'প্রশ্ন'— তার সমাধান আপনি এখন কী ভাবে করতেন, জানতে আমার বিশেষ আগ্রহ।" এই পর্যন্ত বলেই সে গুলিয়ে ফেলল। পরক্ষণেই বলল, "না সত্যি কিন্তু, ঠাট্টা নয়। ভেবে দেখুন সোনিয়া, আপনি

লুজিনের সমস্ত মতলব আগে থাকতে জানতেন, আপনি জানতেন, অর্থাৎ নিশ্চিত জানতেন যে তার পরিণামে কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার এবং ছেলেমেয়েগুলোরও একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে— ফাউ হিসেবে আপনারও— *ফাউ হিসেবে* বলছি এই কারণে যেহেতু আপনি নিজেকে গণনার মধ্যেই আনছেন না। পোলেন্‌কারও তাই... কেননা তাকেও ওই পথেই যেতে হবে। এবারে বলুন তো, পৃথিবীতে কাকে বাঁচতে দেওয়া হবে— ওকে না ওদের, অর্থাৎ লুজিনকে বাঁচিয়ে রেখে তাকে তার দুষ্কর্ম চালিয়ে যেতে দেওয়া হবে নাকি কাতেরিনা ইভানোভ্‌নাকে মরতে দেওয়া হবে— এই সমস্ত কিছু মীমাংসার ভার যদি এখন হঠাৎ আপনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হত? আপনি কী ভাবে সমাধান করতেন? ওদের মধ্যে কার মরা উচিত? আমি আপনাকে জিগ্‌গেস করছি।"

সোনিয়া অস্বস্তিভরে তার দিকে তাকাল। বেশ ঘুরিয়ে করা অস্থির ধরনের এই প্রশ্নটির মধ্যে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে বলে সে আঁচ করল।

"আমার মন কেন যেন বলছিল যে আপনি এরকম একটা কিছু জিগ্‌গেস করবেন," অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে সোনিয়া বলল।

"বেশ তা না হয় হল, কিন্তু সমাধান কী।"

"যা অসম্ভব তা জিগ্‌গেস করছেন কেন?" বিতৃষ্ণা ফুটে উঠল তার কণ্ঠে।

"তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে লুজিন বেঁচে থেকে তার দুষ্কর্ম চালিয়ে যাক! এটাও সমাধান করার সাহস আপনার হল না?"

"কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় আমি জানব কী করে বলুন?... তাছাড়া যে প্রশ্ন তোলা উচিত নয় তা আপনি তুলছেন কেন? এরকম ফাঁকা প্রশ্নের কোন মানে হয়? আমার সিদ্ধান্তের ওপর কি কিছু নির্ভর করছে? তা কী করে সম্ভব? কার বাঁচা উচিত, কার না উচিত সে বিচারের ভার কে আমাকে দিয়েছে?"

"এর মধ্যে যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় নিয়ে আসেন তাহলে অবশ্য কিছু করার নেই," গম্ভীর মুখে গজগজ করে বলল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌।

"তার চেয়ে বরং সোজাসুজি বলুন না, আপনার কী চাই!" সোনিয়া আহত স্বরে চিৎকার করে বলল। "আপনি আবার কিছুর একটা ইঙ্গিত দিচ্ছেন।... আপনি নিশ্চয়ই শুধু-শুধু আমাকে যাতনা দেবার উদ্দেশ্যে আসেননি!"

সোনিয়া আর সহ্য করতে না পেরে তিক্ত কান্নায় ভেঙে পড়ল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ মনমরা হয়ে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। মিনিটপাঁচেক কেটে গেল এইভাবে।

"তুমি ঠিকই বলেছ সোনিয়া," অবশেষে মৃদুস্বরে সে বলল। হঠাৎ যেন তার পরিবর্তন ঘটে গেল। তার কথা বলার ভঙ্গিতে যে চেষ্টাকৃত প্রগল্‌ভতা ও অক্ষমের আস্ফালন প্রকাশ পাচ্ছিল, তা মিলিয়ে গেল। এমনকি কণ্ঠস্বরও হঠাৎ ক্ষীণ হয়ে এলো। এবারে সে বলল, "আমি নিজে গতকাল তোমাকে বলেছিলাম যে আমি ক্ষমা

চাইতে আসব না, অথচ দেখ, শুরু করলাম প্রায় ওই ক্ষমা চেয়েই।... লুজিন এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পর্কে আমি যা বললাম সে আমার নিজের খাতিরে।... আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছিলাম, সোনিয়া।..."

সে হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু তার সেই ম্লান হাসির মধ্যে কেমন যেন একটা অসহায়তা ও অসম্পূর্ণতার ভাব ফুটে উঠল। সে মাথা নিচু করে দু-হাতে মুখ ঢাকল।

তারপরই হঠাৎ সোনিয়ার প্রতি তিক্ত ঘৃণার এক অদ্ভুত, আকস্মিক উপলব্ধিতে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল রাস্‌কোল্‌নিকভের মন। এই উপলব্ধিতে নিজেই যেন কেমন অবাক হয়ে গেল। সশঙ্কিত হয়ে হঠাৎ সে মাথা তুলে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল সোনিয়ার দিকে। কিন্তু সে তার চোখের সামনে দেখতে পেল সোনিয়ার উদ্বিগ্ন, ব্যাকুল দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছিল ভালোবাসা। রাস্‌কোল্‌নিকভের ঘৃণা অপচ্ছায়ার মতো নিমেষে মিলিয়ে গেল। সে তাহলে ভুল বুঝেছিল। এক অনুভূতিকে অন্য অনুভূতি বলে ধরে নিয়েছিল। এর একমাত্র অর্থ যে *সেই* পরম ক্ষণটি এসেছে।

আবার সে দুহাতে মুখ ঢেকে মাথা নিচু করল। হঠাৎ তার মুখ পাণ্ডুর হয়ে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সোনিয়ার দিকে তাকাল, কিছু না বলে যন্ত্রচালিতের মতো উঠে গিয়ে তার বিছানায় বসল।

তার উপলব্ধিতে এই মুহূর্তটির সঙ্গে দারুণ মিল ছিল আরও একটি মুহূর্তের— সেই যখন ফাঁস থেকে কুড়ুলটা বের করে নিয়ে বুড়ির পেছনে সে দাঁড়িয়েছিল এবং মনে মনে বুঝতে পারছিল যে এখন আর 'এক মুহূর্তও নষ্ট করা যায় না'।

"কী হল আপনার?" ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে সোনিয়া জিগ্‌গেস করল।

রাসকোল্‌নিকভ্ একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারল না। ঠিক এইভাবে *জানাতে* হবে তা সে আদৌ ভাবেনি, কখনও ভাবেনি। এখন যে তার কী হয়েছে সে নিজেও বুঝতে পারছিল না। সোনিয়া ধীরে-ধীরে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বিছানায় তার পাশে বসল। উৎসুক হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার দিকে। তার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তার মড়ার মতো সাদা মুখটা সোনিয়ার দিকে ফেরাল। কী যেন বলার প্রাণপণ চেষ্টা করতে গিয়ে অসহায়ভাবে বেঁকে গেল তার ঠোঁট। আতঙ্কে হিম হয়ে গেল সোনিয়ার বুকের ভেতরটা।

"কী হল আপনার?" তার কাছ থেকে সামান্য সরে গিয়ে আবার জিগ্‌গেস করল সোনিয়া।

"কিছু না, সোনিয়া। ভয় পেয়ো না।... ও কিছু নয়! সত্যি বলতে গেলে কি ভাবলে দেখা যাবে কিছুই নয়," প্রলাপ বকার মতো বিড়বিড় করে যেভাবে সে কথাগুলো বলল তাতে মনে হল যেন তার বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়েছে। "তোমাকেই বা

আবার কষ্ট দিতে এলাম কেন?" হঠাৎ সে যোগ করল সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে। "সত্যিই তো! কেন? আমি নিজেকে বারবার এই প্রশ্ন করছি, সোনিয়া..."

সে হয়ত মিনিট পনেরো আগেও এই প্রশ্নটা নিজেকে করেছে, কিন্তু এখন সেকথা যখন বলে ফেলল তখন তার আর এতটুকু শক্তিও অবশিষ্ট নেই, সে নিজেই নিজেকে প্রায় বুঝতে পারছে না, সর্বাঙ্গে উপলব্ধি করছে অবিরাম শিহরন।

"ইস্, কী কষ্ট পাচ্ছেন আপনি!" তার দিকে তাকিয়ে সমবেদনার সুরে সোনিয়া বলল।

"ও কিছু না!... যা বলছি শোন, সোনিয়া..." কয়েক মুহূর্তের জন্য হঠাৎ কেন যেন ম্লান, নিষ্প্রাণ হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। মৃদু হেসে সে বলল, "কাল আমি তোমায় কী বলতে চেয়েছিলাম মনে আছে?"

সোনিয়া অস্বস্তির সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগল।

"চলে যাবার সময় আমি বলেছিলাম, হয়ত তোমার কাছ থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিচ্ছি, কিন্তু যদি আসি, তবে আমি তোমাকে বলব... কে খুন করেছিল লিজাভেতাকে।"

সোনিয়ার আপাদমস্তক হঠাৎ শিউরে উঠল।

"তা এই আমি এলাম তোমাকে বলতে।"

"তাহলে গতকাল আপনি সত্যি-সত্যিই..." অতি কষ্টে ফিসফিসিয়ে সে বলল। "কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?" হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে সে তাড়াতাড়ি জিগ্‌গেস করল।

সোনিয়া ভারী নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। তার মুখ ক্রমে আরও ফেকাসে হয়ে উঠতে লাগল।

"আমি জানি।"

সোনিয়া মিনিটখানেক চুপ করে রইল।

"*তাকে* খুঁজে পাওয়া গেছে নাকি?" ভয়ে-ভয়ে সে জিগ্‌গেস করল।

"না, তা নয়।"

"তাহলে আপনি *ওটা* জানেন কী করে?" আবারও অস্ফুট স্বরে সে জিগ্‌গেস করল— এবারেও প্রায় মিনিটখানেক চুপ করে থাকার পর।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ স্থির, অবিচল দৃষ্টিতে তার দিকে ফিরে তাকাল।

"আন্দাজ কর," বলার সঙ্গে-সঙ্গে তার মুখে ফুটে উঠল আগেকার সেই দুর্বল বাঁকা হাসি।

সোনিয়ার সর্বাঙ্গে বিকারগ্রস্তের মতো খিঁচুনি ধরল।

"ওঃ আপনি... আমাকে... কেন আমাকে... অমন ভয় দেখাচ্ছেন বলুন তো?" শিশুর মতো সরল হাসি হেসে সোনিয়া বলল।

"মানে, জানি যখন... তখন তার সঙ্গে আমার রীতিমতো দোস্তি আছে।" রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে দেখে মনে হচ্ছিল সোনিয়ার মুখের ওপর থেকে সে দৃষ্টি সরাতে পারছিল না। তাকে একদৃষ্টে দেখতে-দেখতে সে বলে চলল, "ওই ওকে... লিজাভেতাকে... খুন করার ইচ্ছে তার ছিল না।... অনিচ্ছাকৃতভাবে ...ওকে খুন করেছে। ...ও খুন করতে চেয়েছিল বুড়িকে... বুড়ি একা ছিল... সেই ভেবেই সে এসেছিল...এমন সময় এসে ঢুকল লিজাভেতা।... সঙ্গে-সঙ্গে ও... তাকে খুন করল।"

আরও কয়েকটি ভয়ঙ্কর মুহূর্ত কেটে গেল। দুজনেই তখনও একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে।

"কী, আন্দাজ করতে পারছ না, কে?" কোন উঁচু মিনার থেকে ঝাঁপ দিয়ে নিচে পড়ার মতো উপলব্ধি নিয়ে দুম্‌ করে সে মুখ ফস্‌কে বলে বসল।

"ন্‌- না," অর্ধস্ফুট স্বরে ফিসফিসিয়ে সোনিয়া বলল।

"ভালো করে চেয়ে দেখ দেখি।"

একথা বলামাত্র আবার সেই আগেকার, চেনা উপলব্ধিতে হঠাৎ আতঙ্কে বরফের মতো হিম হয়ে গেল তার বুকের ভেতরটা। সোনিয়ার দিকে তাকাতে হঠাৎ যেন লিজাভেতার মুখের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল তার মুখে। রাস্‌কোল্‌নিকভের স্পষ্ট মনে ছিল লিজাভেতার তখনকার মুখের সেই ভাব, যখন কুড়ুল হাতে সে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। লিজাভেতা তখন একটা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে পিছিয়ে যাচ্ছিল দেয়ালের দিকে, তার মুখে ফুটে উঠেছিল শিশুসুলভ আতঙ্ক। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন একটা শিশু— হঠাৎ কোন অস্বস্তির সঙ্গে স্থির দৃষ্টিতে তার ভীতি উদ্রেককারীর দিকে তাকাতে-তাকাতে কচি হাতখানা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে পিছু হটছে। এই বুঝি কেঁদে ফেলবে। সোনিয়ার অবস্থাও এখন প্রায় তাই। তেমনি অসহায়ভাবে, তেমনি ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রাসকোল্‌নিকভের দিকে। তারপর হঠাৎ বাঁ হাতখানা সামনে বাড়িয়ে রাস্‌কোল্‌নিকভের বুকে আলতো করে একটুখানি আঙুল ঠেকাল, ধীরে-ধীরে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে একটু-একটু করে পিছিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু রাস্‌কোল্‌নিকভের মুখের ওপর তার দৃষ্টি ক্রমেই আরও স্থির হয়ে আসতে লাগল। সোনিয়ার আতঙ্ক অকস্মাৎ তার মধ্যেও সঞ্চারিত হল। ঠিক সেইরকমই আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল তারও চোখেমুখে, ঠিক সেইভাবে সেও তাকাতে লাগল তার দিকে, এমনকি তারও মুখে অনেকটা সেই *শিশুর* হাসি।

"ধরতে পেরেছ তো?" অবশেষে ফিসফিসিয়ে বলল রাস্‌কোল্‌নিকভ।

"হা ভগবান!" তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো বুকভাঙা আর্তনাদ। অসহায়ভাবে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে সে বালিশে মুখ গুঁজল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে ধড়মড় করে উঠে পড়ল। দ্রুত তার কাছে সরে এসে সরু-সরু আঙুলে- সাঁড়াশির

মতো সজোরে চেপে ধরল তার দু-হাত। আবার স্থির দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। মনে হল দৃষ্টি যেন গেঁথে গেছে তার মুখের ওপর। অন্তত সামান্য এতটুকু আশাও শেষপর্যন্ত সে করতে পারে কিনা সোনিয়া তার এই দৃষ্টি দিয়ে মরিয়া হয়ে শেষবারের মতো তা খুঁজে বের করার ও ধরার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আশা ছিল না। সন্দেহের এতটুকু অবকাশ নেই। সত্যিই *তাই*! এমনকি পরে, পরবর্তীকালে এই মুহূর্তটি মনে করে সে অবাক হয়ে যেত, তার অদ্ভুত মনে হত— কেন সে তখন ঠিক *সঙ্গে-সঙ্গে* দেখতে পেয়েছিল যে সন্দেহের এতটুকু অবকাশ নেই? অথচ এ ধরনের কোন উপলব্ধি আগে থাকতেই তার হয়েছিল এমন কথাও তো সে বলতে পারে না! কিন্তু এখন রাস্‌কোল্‌নিকভ্ যে-ই তাকে একথা বলল অমনি তার মনে হল সত্যি-সত্যি সে যেন আগে থাকতে *তা* উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

"হয়েছে, সোনিয়া, অনেক হয়েছে। আমায় আর কষ্ট দিও না!" ব্যথিত কণ্ঠে সে অনুনয় করল।

এভাবে নয়, ঠিক এভাবে ওর কাছে প্রকাশ করার কথা সে আদৌ ভাবেনি। কিন্তু শেষপর্যন্ত দাঁড়াল *তাই*।

কী করতে যাচ্ছে তা বুঝতে না পেরে সোনিয়া লাফিয়ে উঠল। হতাশ ভঙ্গিতে হাতে হাত মোচড়াতে-মোচড়াতে ঘরের মাঝামাঝি চলে গেল। কিন্তু দ্রুত ফিরে এসে আবার বসল তার পাশে, প্রায় তার কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে। হঠাৎ চমকে এমনভাবে আর্তনাদ করে উঠল যেন বুকে তীর বিঁধেছে। তারপর কেন, সে নিজেও জানে না, নতজানু হয়ে লুটিয়ে পড়ল তার সামনে।

"এ আপনি কী করলেন! আপনি নিজের এ কী সর্বনাশ করলেন!" হতাশ হয়ে এই কথা বলতে-বলতে সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, ছুটে গিয়ে তার কাঁধে মাথা রেখে তাকে জড়িয়ে ধরল, শক্ত করে দুহাতে তাকে চেপে ধরল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ চমকে পিছিয়ে গেল, ম্লান হাসি হেসে তাকাল তার দিকে।

"ভারি অদ্ভুত তো তুমি, সোনিয়া!—যখন আমি তোমাকে *ওটার* কথা বললাম তখন কিনা জড়িয়ে ধরে আদর করছ, চুমু খাচ্ছ! তুমি কী করছ নিজেই জান না।"

"না, তোমার চেয়ে অসুখী আর কেউ এখন সারা দুনিয়ায় নেই।" ওর মন্তব্যে কান না দিয়ে পাগলের মতো সে বলে উঠল। পরক্ষণেই হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো।

অনেক দিনের অপরিচিত এক অনুভূতির প্রবল উচ্ছ্বাসে রাস্‌কোল্‌নিকভের সমস্ত সত্তা আলোড়িত ও আপ্লুত হয়ে উঠল। তাতে সে বাধা দিল না। চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে তার চোখের পাতার কাছে টলটল করতে লাগল।

"তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না তো সোনিয়া?" অনেকটা প্রত্যাশা নিয়েই সে তাকাল সোনিয়ার দিকে!

"না, না, কখনও না!" সোনিয়া বলে উঠল। "তুমি যেখানেই যাও আমি তোমাকে অনুসরণ করব। হা ভগবান!...ওঃ কী সুখী আমি!... কেন, কেন আমি তোমাকে আগে জানতাম না! কেন তুমি আগে এলে না? হা ভগবান!"

"এই তো এলাম।"

"সে তো এই এখন! ওঃ এখন কী করব! ... একসঙ্গে, একসঙ্গে!" যেন একটা ঘোরের মধ্যে সে আওড়াল। আরও একবার জড়িয়ে ধরল তাকে। "আমি তোমার সঙ্গে সাইবেরিয়ার নির্বাসনদণ্ড ভোগ করতে যাব।"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ যেন একটা আকস্মিক আঘাতের ধাক্কা অনুভব করল। তার ঠোঁটে ফুটে উঠল আগেকার সেই ঘৃণাব্যঞ্জক এবং প্রায় উদ্ধত ধরনের হাসি।

"সাইবেরিয়াতে নির্বাসনদণ্ড ভোগ করার ইচ্ছে হয়ত আমার এখনও নেই, সোনিয়া," সে বলল।

সোনিয়া দ্রুত তাকাল তার দিকে।

এই অসুখী মানুষটির প্রতি তার গভীর আবেগ ও তীব্র সমবেদনার প্রথম উচ্ছ্বাস কেটে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে লোকট যে খুন করেছে এই ভয়ঙ্কর চিন্তা আবার তাকে গ্রাস করল। রাস্‌কোল্‌নিকভের পালটে যাওয়া কথার ভঙ্গির মধ্যে সোনিয়া যেন হঠাৎ শুনতে পেল একজন খুনির কণ্ঠস্বর। সে অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। কেন, কীভাবে, কী কারণে ঘটনাটা ঘটেছিল তার বিন্দুবিসর্গ তখন পর্যন্ত ওর জানা ছিল না। এখন সবগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে তার মাথার মধ্যে এসে ভিড় করল। এবারেও ওর বিশ্বাস হল না : 'ও খুনি। না, না! এও কি সম্ভব?'

"তা কী করে হয়? আমি কোথায় আছি তাহলে?" এখন পর্যন্ত সে যেন ধাতস্থ হতে পারছে না। রীতিমতো বিভ্রান্ত হয়ে সে জিগ্‌গেস করল, "আপনি...*আপনার মতো* একজন মানুষ কীভাবে এমন কাজ করার কথা ভাবতে পারে?...তা কী করে হয়?"

"চুরি করতে গিয়েছিলাম—এ তো সোজা কথা। থাম দেখি, সোনিয়া!" কেমন যেন ক্লান্ত স্বরে সে বলল। তবে আক্ষেপের ভাবও চাপা থাকল না তার উত্তরের মধ্যে।

সোনিয়া স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল।

"তোমার তখন অনটন চলছিল! তুমি চেয়েছিলে... তোমার মাকে সাহায্য করতে— তাই না?"

"না সোনিয়া, না", মুখ ঘুরিয়ে মাথা নিচু করে বিড়বিড় করে সে বলল। অতটা বুভুক্ষু আমি ছিলাম না...মাকে সাহায্য আমি সত্যি-সত্যিই করতে চেয়েছিলাম, তবে...হ্যাঁ এটাও একেবারে ঠিক নয়...আমাকে যন্ত্রণা দিও না, সোনিয়া!"

সোনিয়া হতাশভাবে হাত নাড়াল।

"তাহলে এসব সত্যি! বাস্তবিকই সত্যি! হা ভগবান! এ কী রকম সত্যি! কে বিশ্বাস করবে?...আপনি নিজে আপনার শেষ কর্পদকটুকু অন্যকে দিয়ে দিচ্ছেন, আবার আপনিই চুরি-ডাকাতির উদ্দেশ্যে খুন করেছেন—তা কী করে হয়! অ্যাঁ?..." হঠাৎ সে আর্তনাদ করে উঠল। "সেই টাকা...তাহলে সেই টাকা, যা আপনি কাতেরিনা ইভানোভ্‌নাকে দিয়েছিলেন...তা কি...হা ভগবান! সেই টাকাও কি..."

"না সোনিয়া," তাকে বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌, "নিশ্চিন্ত থাকতে পার, ও টাকা সে টাকা নয়! ও টাকা মা আমাকে পাঠিয়েছিলেন একজন ব্যবসায়ীর মারফত। ও টাকা যখন আমি পেয়েছিলাম তখন আমি অসুস্থ ছিলাম— যেদিন পেয়েছিলাম সেদিনই দিয়েছি। ...রাজুমিখিন দেখেছে...টাকাটা আসলে আমার হয়ে ও-ই নিয়েছিল। ও টাকা আমার...আমার নিজের টাকা...সত্যি-সত্যি আমার টাকা।"

সোনিয়া হতভম্ব হয়ে শুনতে লাগল। সমস্ত শক্তি দিয়ে সে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছিল।

"আর *সে* টাকা—আমি অবশ্য জানিই না ওখানে টাকা ছিল কিনা..." মৃদুস্বরে, খানিকটা চিন্তিতভাবেই যেন সে যোগ করল, "আমি তখন গলা থেকে ঝোলানো দামি চামড়ার একটা ছোট্ট থলি খুলে নিয়েছিলাম...থলিটা ছিল বেশ ভরতি, ঠাসা...কিন্তু ওর ভেতরে কী আছে আমি দেখিনি। দেখার ঠিক সময় পাইনি আর কি। ...জিনিসপত্র— কোথাকার কী সব জামার হাতার দামি বোতাম, গলার চেইন— সে সব, সেই সঙ্গে ওই থলেটাও আমি ভজ্‌নেসেন্‌স্কি এভিনিউতে এক বাড়ির পেছনের উঠোনে পরদিন সকালেই গর্ত খুঁড়ে পুঁতে পাথর চাপা দিয়ে রেখে এসেছি। সব এখনও ওখানে যেমনকার তেমনি পড়ে আছে।..."

সোনিয়া মনপ্রাণ দিয়ে ওর কথাগুলো শুনছিল।

"কিন্তু ওখান থেকে আপনি যখন কিছুই নিলেন না তখন আপনি কেন বললেন যে চুরি করতে গিয়েছিলেন?" খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো ব্যস্ত হয়ে সোনিয়া জিগ্‌গেস করল।

"জানি না...আমি তখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি—ও টাকা আমি নেব কিনা", অর্ধস্ফুটস্বরে, আবারও কেমন যেন চিন্তিতভাবে সে বলল। তারপর হঠাৎই সংবিৎ ফিরে পেতে মুখে একঝলক ক্ষণিকের হাসি ফুটিয়ে সে বলে উঠল, 'ইস্‌, বোকার মতো কী যা তা বকছি আমি, অ্যাঁ!"

'পাগল নাকি?'— সোনিয়ার মাথার মধ্যে এরমক একটা চিন্তা আরেকটু হলেই এসে গিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সে চিন্তা ছেড়ে দিয়ে ভাবল : না, এখানে অন্য কোনও ব্যাপার আছে, যার মাথামুণ্ডু কিছুই সে বুঝতে পারছে না, ওর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়!

''জান সোনিয়া'', হঠাৎ কিসের যেন প্রেরণায় সে বলে উঠল, ''আমি তোমাকে একটা কথা বলব—আমি না খেতে পেয়ে মরতে বসেছি, একমাত্র এই কারণেই যদি ওকে খুন করতাম... প্রতিটি কথার ওপর জোর দিয়ে রহস্যজনক ভঙ্গিতে অথচ সোনিয়ার দিকে অকপট দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলে চলল, ''তাহলে কিন্তু আমি তখন ...*সুখীই* হতাম! এটা জেনে রেখ!''

''তাছাড়া, তাছাড়া আমি যদি...'' মুহূর্তের মধ্যে কেমন যেন হতাশ হয়ে আর্তস্বরে সে বলে উঠল, ''আমি যদি এখন স্বীকার করেও থাকি যে আমি খারাপ কাজ করে ফেলেছি তাতে তোমার কী? আমার ওপরে তোমার যদি জিতও হয় সেটা তো নিছক অর্থহীন! ওতে তোমার কী এসে যায়? ওঃ সোনিয়া, আমি যে এখন তোমার কাছে এসেছি তা কি এই কারণে?''

সোনিয়া আবার কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলতে গিয়েও বলল না।

''গতকাল আমি তোমাকে আমার সঙ্গে আসার ডাক দিয়েছিলাম তার কারণ এই যে তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই!''

''কোথায় যেতে বল তোমার সঙ্গে?'' সোনিয়ার ভীরু জিজ্ঞাসা।

''চিন্তার কোন কারণ নেই, চুরি করতে নয়, খুন করতেও নয়—এসবের জন্যে ডাকছি না'', তিক্ত হাসি হেসে সে বলল। ''আমরা দুই আলাদা ধরনের মানুষ। ...তুমি জান কি সোনিয়া, আমি কিন্তু মাত্র এই এখনই, এই মুহূর্তেই বুঝতে পেরেছি গতকাল তোমাকে *কোথায়* যাবার ডাক দিয়েছিলাম। গতকাল আমি তোমাকে যখন যাবার ডাক দিয়েছিলাম, তখন কিন্তু নিজেও জানতাম না— কোথায়। আমি একটা কারণেই ডেকেছিলাম, একটা কারণেই এসেছিলাম—আমাকে ছেড়ে যেও না সোনিয়া। ছেড়ে যাবে না তো?''

সোনিয়া ওর হাত চেপে ধরল।

''কেন? কেন আমি ওকে বলতে গেলাম! কেন আমি প্রকাশ করতে গেলাম ওর কাছে?'' অপরিসীম ব্যথাতুর দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই রাস্‌কোল্‌নিকভ বলে উঠল। ''এই যে তুমি আমার কাছ থেকে ব্যাখ্যা চাইছ, সোনিয়া, বসে-বসে অপেক্ষা করছ—আমি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কী বলব আমি তোমাকে? কিছুই তো বুঝবে না তুমি, শুধু-শুধু যন্ত্রণায় দগ্ধাতে থাকবে...আমার কথা ভেবে! দেখ কাণ্ড, তুমি কাঁদছ, আবার আমাকে জড়িয়ে ধরছ—কিন্তু কেন আমাকে জড়িয়ে ধরছ বলতো? আমি নিজে এ ভার বহন করতে পারছি না...'তুমিও কষ্ট কর, তাতে আমার বোঝা হালকা হবে'— এই ভেবে অন্যের ঘাড়ে বোঝা চাপাতে এসেছি বলে? এরকম একটা ইতরকে তুমি ভালোবাসতে পার?''

''কিন্তু তুমি নিজেও কি কষ্ট পাচ্ছ না?'' সোনিয়া কাতরস্বরে বলল।

মুহূর্তের মধ্যে আবার সেই একই অনুভূতির প্রবল উচ্ছ্বাসে আলোড়িত ও আপ্লুত হয়ে উঠল রাস্‌কোল্‌নিকভের সমস্ত সত্তা।

"আমি দুরাত্মা সোনিয়া—এটা খেয়াল রাখবে কিন্তু। এতে অনেক কিছুর ব্যাখ্যা মিলতে পারে। আমি দুরাত্মা বলেই এসেছি। এমন লোকও আছে যে হয়ত আসত না। কিন্তু আমি ভীতু আর...ইতরও! বেশ, না হয় তা-ই হলাম! আসল ব্যাপারটা তা নয়। ...আমার এখন কথা বলা দরকার, কিন্তু কী ভাবে শুরু করতে হয় তা আমার জানা নেই।..."

বলতে-বলতে কথা থামিয়ে সে ভাবনায় ডুবে গেল।

"ধ্যুৎ, আমরা দুজনে আলাদা-আলাদা ধরনের মানুষ!" আবার সে চেঁচিয়ে উঠল। "আমাদের জুড়ি বাঁধা সম্ভব নয়। তাহলে, তাহলে আমি কেন এলাম? এর জন্যে আমি নিজেকে কক্ষণও ক্ষমা করতে পারব না!"

"ন্- না, এসে ভালোই করেছ!" সোনিয়া বলে উঠল। "আমি জানতে পেরেছি এতে বরং ভালো হয়েছে! খুবই ভালো হয়েছে!"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বেদনাহত দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

"আরে তাই তো! হয়ত ঠিকই বলেছ!" বেশ যেন ভেবেচিন্তে মনস্থির করে সে বলল। "হ্যাঁ, ঘটেছিল এইভাবে! কী ভাবে, বলি তাহলে। আমি নেপোলিয়ন হতে চেয়েছিলাম, তাই খুন করি।...এখন পরিষ্কার তো?"

"ন্-না," সরল মনে ভয়ে-ভয়ে মিনমিন করে বলল সোনিয়া। "তা হোক, তুমি বল, বলে যাও! আমি ঠিক বুঝে নেব, *মনে-মনে* ঠিক বুঝতে পারব!" সোনিয়া মিনতি করল।

"বুঝতে পারবে বলছ? বেশ, দেখা যাক!"

সে চুপচাপ বিষয়টাকে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করল।

"ব্যাপারটা এইরকম : একবার আমি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম : আচ্ছা, ধর নেপোলিয়ান যদি আমার অবস্থায় পড়ত, যদি তাঁর কর্মজীবন শুরু করার জন্য তুলোঁ বা মিশর না থাকত, যদি মঁ ব্লাঁ পার হওয়ারও প্রশ্ন না আসত, এসব সুন্দর-সুন্দর বিশাল-বিশাল স্মরণীয় বস্তুর জায়গায় যদি স্রেফ থাকত দেখতে হাস্যকর কোন এক বৃদ্ধা— কোথাকার কোন এক কলমপেষা কেরানির স্ত্রী, যাকে অমনিতেই খুন করা উচিত...তার ট্রাঙ্কের ভেতরকার টাকাপয়সাগুলো হাতানোর উদ্দেশ্যে..., বুঝতেই পারছ, নিজের কর্মজীবনে উন্নতির খাতিরে...তাহলে অনন্যোপায় হয়ে তিনি কি এই কাজে প্রবৃত্ত হতেন? কাজটা যে আদৌ কোন কীর্তির পর্যায়ে পড়ে না, স্মরণীয় নয় এবং ...এবং গর্হিত—এই ভেবে কি তিনি সঙ্কুচিত হয়ে পিছিয়ে যেতেন? তাহলে আমি তোমাকে বলি, এই 'প্রশ্ন' বড় বেশি দীর্ঘকাল ধরে আমাকে যন্ত্রণায় কুরে-কুরে খেয়েছে, এত বেশিদিন আমায় যন্ত্রণা দিয়েছে যে পরে আমার ভীষণ লজ্জা হতে থাকে যখন আমি উপলব্ধি করলাম...হঠাৎই কেমন করে যেন উপলব্ধি করলাম... নেপোলিয়ন এক্ষেত্রে সঙ্কুচিত তো হতেনই না, এমনকি কাজটা যে স্মরণীয় কীর্তির

পর্যায়ে পড়ে না এ চিন্তাও তাঁর মাথায় আসত না, এমনকি...এতে সঙ্কোচের কী আছে তাও তিনি একদম বুঝতে পারতেন না। তাঁর সামনে যদি আর কোন পথ খোলা না থাকত তাহলে তিনি এতটুকু ইতস্তত না করে, বৃদ্ধাকে টুঁ শব্দটি করার অবকাশমাত্র না দিয়ে টুঁটি টিপে মেরে ফেলতেন!... তা আমিও ...আর ইতস্তত না করে ...মহাজ্ঞানী মহাজনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে...ওকে টুঁটি টিপে মেরে ফেললাম।...যা-যা ঘটেছিল ঠিক তাই তোমাকে বললাম! তোমার কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ, সোনিয়া, এখানে সবচেয়ে বেশি হাস্যকর এই যে সত্যি-সত্যি এভাবেই ঘটেছিল ব্যাপারটা।..."

সোনিয়ার কাছে কিন্তু মোটেই হাস্যকর মনে হচ্ছিল না।

"আপনি ...ওসব দৃষ্টান্ত-টৃষ্টান্ত ছেড়ে দিয়ে...বরং সরাসরি বলুন," আরও সলজ্জভাবে, প্রায় অস্ফুটস্বরে সোনিয়া অনুনয় করল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ তার দিকে মুখ ফেরাল, বিষণ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে তার হাতদুটো ধরল।

"এবারেও তুমি ঠিক বলেছ, সোনিয়া। এসবই অবশ্য অর্থহীন, প্রায় বাজে বকা বলা যেতে পারে! বুঝলে কিনা, তুমি তো জানই যে আমার মা'র প্রায় কিছুই নেই। বোন শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছে দৈবক্রমে। লোকের বাড়িতে গভর্নেসের কাজ করে জীবিকা উপার্জন ছিল তার নিয়তি। ওদের সমস্ত আশাভরসা ছিলাম একমাত্র আমি। আমি পড়াশুনা করছিলাম, কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে নিজের খরচ চালাতে না পেরে সাময়িকভাবে পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হই। এইভাবে যদি টেনেটুনে চলতও তাহলে দশ-বারো বছর পরে...অবশ্য সব যদি ভালোয়-ভালোয় চলত...আমি একজন শিক্ষক বা সরকারি আমলা হয়ে হাজার রুবল রোজগারের আশা করতে পারতাম।..." (প্রসঙ্গত, কথাগুলো সে আওড়াচ্ছিল শেখান বুলির মতো) "কিন্তু ইতিমধ্যে আমার মা সংসারের ঝামেলায়, শোকে-দুঃখে শুকিয়ে যেতেন, আমি তাঁকে সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষাই খুঁজে পেতাম না। আমার বোনের অবস্থা, ততোধিক খারাপ হতে পারত!...তাছাড়া মা'র কথা ভুলে থেকে, বোনের অপমান মাথা পেতে নিয়ে, সারা জীবন সব কিছুর পাশ কাটিয়ে যেতে, সব কিছুর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে চলতে কাঁহাতক ভালো লাগে বল দেখি? কিসের জন্য এসব? উদ্দেশ্য কি এটাই যাতে ওদের কবরে পাঠিয়ে দিয়ে আমি অর্জন করতে পারি আরও নতুন কাউকে— স্ত্রী-সন্তানাদি — এই সমস্ত, তারপর তাদেরও কপর্দকশূন্য অবস্থায়, অনাহারে রেখে দিই? তা, এই ভেবে...ঠিক এই কথা ভেবেই আমি ঠিক করলাম বুড়ির টাকাকড়ি হাতিয়ে আমার প্রথম কয়েক বছরের খরচ চালাব—তাতে মা'র কষ্ট লাঘব হবে, ইউনিভার্সিটিতে আমার পড়াশুনা চলবে, ইউনিভার্সিটির পর কর্মজীবনের শুরুতেও কাজে লাগবে—এবং এ সবই আমি করে উঠতে পারব ব্যাপক ও বিস্তৃত উপায়ে,

আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে, এমনভাবে যাতে সম্পূর্ণ নতুন কর্মজীবন গড়ে তুলতে পারি, এক নতুন ও স্বাধীন পথ ধরতে পারি। ...এই তো...হ্যাঁ...এই তো সব। ...তা, বলাই বাহুল্য, বুড়িকে খুন করাটা খারাপ কাজ হয়েছে।...যাক গে, আর নয়, অনেক হয়েছে!"

কোনমতে কষ্টেসৃষ্টে ক্লান্তভাবে বিবরণ শেষ করে সে মাথা হেঁট করল।

"আঃ, তা নয়, তা নয়," ব্যাকুলভাবে বলে উঠল সোনিয়া। "তা কী করে হয়?...না, ঠিক নয়, ঠিক নয়!"

"নিজেই দেখতে পাচ্ছ ঠিক নয়!...আমি কিন্তু অকপটে বলেছি, সত্যি কথা বলেছি!"

"এ আবার কী রকম সত্যি! হা ভগবান!"

"আমি যাকে মেরেছি সে একটা উকুন ছাড়া কিছু নয় সোনিয়া। একটা অপ্রয়োজনীয়, ঘৃণ্য, অনিষ্টকারী উকুন!"

"মানুষ কী করে উকুন হয়!"

"তা ঠিক, আমিও অবশ্য জানি যে উকুন নয়," অদ্ভুতভাবে ওর দিকে তাকিয়ে সে উত্তর দিল। "প্রসঙ্গত, আমি মিথ্যে কথা বলছি, সোনিয়া," সে যোগ করল, "অনেক কাল হলই বলে আসছি।...তুমি ঠিকই ধরেছ, আদৌ তা নয়। আসল কারণ অন্য, একেবারেই অন্য!...আমি অনেকদিন হল কারও সঙ্গে কথা বলিনি, সোনিয়া। ...আমার এখন ভীষণ মাথা ব্যথা করছে।"

জ্বরভারগ্রস্তের মতো আগুন জ্বলে উঠল তার দুই চোখে। সে প্রায় প্রলাপ বকা শুরু করে দিয়েছিল। তার ঠোঁটে খেলে গেল অস্থির হাসি। মনের উত্তেজিত অবস্থার আড়াল ভেদ করে ইতিমধ্যে প্রকাশ পাচ্ছিল নিদারুণ অসহায়তা। সোনিয়া বুঝতে পারল ওর কষ্ট। তার নিজেরও মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ এমন অদ্ভুতভাবে কথাগুলো বলল! মনে হল কিছু অংশ যেন পরিষ্কার, তবু...'কী করে! সে কী করে হয়। হা ভগবান!' ভাবতে-ভাবতে হাল ছেড়ে দিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়াল সোনিয়া।...

"না, সোনিয়া, তা নয়!" যেন চিন্তার স্রোত আচমকা অন্যদিকে ঘুরে যাওয়ায় দারুণ অবাক হয়ে গেছে সে, আবার উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। হঠাৎ মাথা তুলে সে আবার বলতে শুরু করল : "তা নয়! বরং ... ভেবে দেখ না কেন— হ্যাঁ সেটাই ঠিক হবে... ভেবে দেখ, আমি একটা দাম্ভিক, পরশ্রীকাতর, মন্দ স্বভাবের হীন ও প্রতিহিংসাপরায়ণ লোক। তাছাড়া...সম্ভবত পাগলামির প্রবণতাও আমার মধ্যে আছে, আচ্ছা, সবগুলো না হয় একসঙ্গেই হল! পাগলামির কথা তো লোকে আগেও বলেছে...আমি লক্ষ করেছি। আমি এইমাত্র তোমাকে বলেছি যে ইউনিভার্সিটির খরচ আমি চালাতে পারছিলাম না। কিন্তু জান কি, হয়ত চালাতে পারলেও পারতাম?

ইউনিভার্সিটির খরচ বাবদ যতটা দরকার মা হয়ত পাঠাতেন। আর জুতো, জামা, খাবারদাবারের জন্য যা খরচ তা হয়ত আমি নিজেই উপার্জন করতে পারতাম। ঠিকই তাই! টুইশানি পাওয়া যাচ্ছিল—একেকটা পাঠের জন্য তিরিশ কোপেক করে। রাজুমিখিনও তো কাজ করেই চালাচ্ছে! কিন্তু আমি *তিতিবিরক্ত*—ওতে আমার পোষাবে না। হ্যাঁ, *তিতিবিরক্ত*—ঠিক এই কথাটাই এখানে খাটে! আমি তখন মাকড়সার মতো এক কোনায় কুনো হয়ে পড়ে রইলাম। তুমি তো আমার খোঁড়লেও গিয়েছ— দেখেছ আমার অবস্থাটা।...জান কি সোনিয়া, ঘরের ছাদ যদি নিচু হয়, ঘর যদি চাপা হয় তাতে মানুষের মন-মেজাজও দমে যায়! ওঃ কি ঘেন্নাই না আমি করতাম ওই খোঁড়লটাকে। কিন্তু দেখ! তবু ওখান থেকে বেরোবার ইচ্ছে হত না। ইচ্ছে করেই বেরোতাম না। দিনের পর দিন বেরোইনি। কাজ করার ইচ্ছে হত না আমার, এমনকি খাবারও নয়। কেবল শুয়ে থাকতাম। নাস্তাসিয়া খাবার আনলে খেতাম, না আনলে না খেয়েই কাটিয়ে দিতাম সে দিনটা। আক্রোশের জ্বালায়, ইচ্ছে করেই কিছু জিগ্‌গেসও করতাম না। রাতে আলো নেই। অন্ধকারের মধ্যেই শুয়ে থাকি, কিন্তু মোমবাতির জন্য যে পয়সা রোজগার করব সে ইচ্ছাও নেই। পড়াশুনা করা উচিত ছিল, অথচ বইপুথি আমি বেচে দিয়েছি। আমার টেবিলের ওপর, নোট লেখা কাগজ আর খাতাপত্রের ওপর তখন আঙুল সমান পুরু ধুলো জমে আছে। আমার বরং ভালো লাগত শুয়ে-শুয়ে ভাবতে। আমি শুধুই ভাবতাম।... আমার স্বপ্নগুলোও হত এমন সব অদ্ভুত-অদ্ভুত, বিচিত্র ধরনের, কী আর বলব! কিন্তু মাত্র তখনই আমি কল্পনায় দেখতেও শুরু করলাম যে...নাঃ ঠিক তা নয়। আমি আবার ভুলভাল বলছি! দেখ, আমি তখন নিজেকে বারবার প্রশ্ন করতাম: আচ্ছা আমি এত বোকা কেন? অন্যেরা যদি বোকাই হয় এবং আমি যদি নিশ্চিত জানি যে তারা বোকা, তা হলে আমি নিজে তাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান হতে চাই না— এটাই বা কেমন? তারপর আমি জানতে পারলাম, সোনিয়া, সকলে কবে বুদ্ধিমান হবে তার অপেক্ষায় বসে থাকলে বড় দীর্ঘকাল চলে যাবে।... পরে আমি এও জানতে পারলাম যে তা কখনও হবার নয়। লোকের পরিবর্তন হবে না, তাদের বদলাতেও কেউ পারবে না এবং একাজে শক্তিক্ষয় করার কোন অর্থ হয় না! হ্যাঁ, ঘটনা তাই। এটা তাদের নিয়ম।... এটাই নিয়ম, সোনিয়া! এটাই ঘটনা!... আমি এখন জানি, সোনিয়া, যে মানুষ মনের দিক থেকে এবং বুদ্ধিবৃত্তিতে শক্ত ও সমর্থ সেই সকলের ওপর প্রভুত্ব করতে পারে! যে বেশি সাহস দেখাতে পারবে ওদের কাছে সে-ই সঠিক। লোকের মুখের ওপর যে বেশি করে থুতু ফেলতে পারবে সে-ই তাদের আইনপ্রণেতা আর যে সবার চেয়ে বেশি সাহস ধরে সে-ই সবার চেয়ে ঠিক! এ পর্যন্ত তা-ই চলে আসছে এবং চিরকাল তা চলবেও! একমাত্র অন্ধদেরই সেটা চোখে পড়ে না!"

কথাগুলো বলার সময় সোনিয়ার দিকে সে তাকাচ্ছিল বটে, কিন্তু ও বুঝতে পারবে কি পারবে না সেই নিয়ে তার তখন আর কোন মাথাব্যথা ছিল না। জ্বরগ্রস্ত বিকারের ভাবটা এতক্ষণে তাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কেমন যেন একটা বিষণ্ণ উন্মাদনা তাকে পেয়ে বসেছে। বাস্তবিকই তো আজ কতকাল হয়ে গেল কারও সঙ্গে কথা বলতে পারেনি! সোনিয়া বুঝতে পারল এই অন্ধ মতটাই তার বিশ্বাস ও বিধান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সোৎসাহে সে বলে চলল, "আমি বুঝতে পেরেছি, সোনিয়া, ক্ষমতা একমাত্র তারই হাতে আসে, ঝুঁকে পড়ে তা তুলে নেবার মতো সাহস যার আছে। এখানে দরকার একটা জিনিস, মাত্র একটাই জিনিস: তোমাকে সাহস দেখাতে হবে! সেই সময়, আমার জীবনে সেই প্রথম, একটা চিন্তা মাথায় এসেছিল— সে এমন এক চিন্তা যা আমার আগে কখনও কারও মাথায় আসেনি। কারোই মাথায় আসেনি! আমার কাছে হঠাৎ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল একটা প্রশ্ন: আচ্ছা, এ সমস্ত হাস্যকর অসঙ্গতির পাশ দিয়ে যাবার সময় *স্রেফ লেজে ধরে তুলে* সবসুদ্ধ চুলোয় ঝেড়ে ফেলার মতো সাহস আজ পর্যন্ত একজনও দেখাতে পারেনি এবং দেখাচ্ছেও না— এটা কেমন কথা! আমি... আমি চেয়েছিলাম সে *সাহস দেখাতে*। তাই খুন করলাম... আমি শুধু সাহসই দেখাতে চেয়েছিলাম সোনিয়া! এই হল মূল কারণ!"

"আঃ চুপ করুন, চুপ করুন!" হতাশ ভঙ্গিতে হাত নেড়ে সোনিয়া আর্তনাদ করে উঠল। "আপনি ভগবানের কাছ থেকে সরে গেছেন তাই ভগবান আপনাকে আঘাত করেছেন, শয়তানের হাতে তুলে দিয়েছেন আপনাকে!"

"আচ্ছা, সোনিয়া, আমি যখন অন্ধকারের মধ্যে শুয়ে-শুয়ে এসব চিন্তা করছিলাম তখন শয়তান আমার ওপর ভর করেছিল, তাই বলতে চাও কি? অ্যাঁ?"

"চুপ করুন। আপনি হাসছেন! ঈশ্বরের অবমাননা করছেন। আপনি কিছু বোঝেন না, কিছুই বোঝেন না! হা ভগবান। এ যে বুঝবে না, কিছুই বুঝতে চায় না দেখছি।"

"চুপ কর সোনিয়া! আমি মোটেই হাসছি না। আমি নিজেই জানি যে শয়তান আমার ওপর ভর করেছিল। চুপ কর সোনিয়া, চুপ কর।" আবার সে আওড়াল বিষাদ ও মিনতির সুরে। "আমি সব জানি। সেই সময় অন্ধকারের মধ্যে শুয়ে-শুয়ে এ সবই আমি ভালো করে ভেবেচিন্তে দেখেছি, মনে-মনে আউড়েছি। এ সমস্ত নিয়ে আমি মনে-মনে কত না তর্ক করেছি—চুলচেরা বিচার করেছি। সব জানি, সব জানা আছে আমার। বাজে বকে-বকে তখন আমার বিরক্তি ধরে গেছে, ভীষণ বিরক্তি ধরে গেছে। আমার তখন বড় ইচ্ছে হত ওসব ভুলে গিয়ে নতুন করে সব কিছু শুরু করি, সোনিয়া, ছেড়ে দিই বাজে বকা! তুমি কি সত্যি-সত্যি মনে কর যে আমি এতটুকু ভাবনা-চিন্তা না করে বোকার মতো সামনে ধেয়ে গিয়েছিলাম? না, আমি এগিয়ে

গিয়েছিলাম বুদ্ধিমানের মতো, তাইতেই যা আমার সর্বনাশ হল! তুমি কি সত্যি-সত্যি মনে কর যে আমি যখন নিজেই নিজেকে নানা ভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করেছি ক্ষমতালাভের অধিকার আমার আছে কিনা, তখন অন্তত এটাও আমার জানা ছিল না? তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে সে অধিকার আমার নেই? অথবা ধর যদি প্রশ্ন করি: মানুষ উকুন কিনা— তার মানে মানুষ *আমার কাছে* উকুন নয়। উকুন সে এমন একজনের কাছে হতে পারে যার মাথায় এ প্রশ্নটা আদৌ আসে না, সে সরাসরি কোন প্রশ্ন ছাড়াই এগিয়ে যায়।... নেপোলিয়ন হলে এগোতেন কিনা এই প্রশ্ন নিয়ে যদি আমি এতদিন মনে-মনে কষ্ট পেয়ে থাকি, তার মানে, এটা আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে আমি নেপোলিয়ন নই।...এত সব বাজে বকার এই বিপুল যন্ত্রণা আমাকে সহ্য করতে হয়েছে, সোনিয়া। এ ভূত আমি আমার কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছিলাম। সোনিয়া, আমি চেয়েছিলাম কূটতর্ক ছেড়ে দিয়ে নিজের জন্যে, আমার একার স্বার্থেই খুন করব! এ ব্যাপারে নিজের কাছেও মিথ্যে বলার ইচ্ছে আমার ছিল না! মা'কে সাহায্য করার জন্যে আমি খুন করেছি তা বললে বাজে কথা বলা হবে। যদি বলি টাকাকড়ি ও ক্ষমতা লাভের পর মানবজাতির উপকার করব বলে আমি খুন করেছি— সেটাও বাজে কথা। অমনি খুন করেছি, নিজের জন্যে, আমার একার স্বার্থে। আর তারপর আমি কারও উপকারে লাগলাম কিনা, নাকি সারাটা জীবন মাকড়সার মতো বসে-বসে একের পর এক সকলকে জালে ধরে জ্যান্ত তাদের রক্ত শোষণ করতে লাগলাম— সেই মুহূর্তে এসব প্রশ্ন আমার কাছে সম্পূর্ণ অবান্তর হতে বাধ্য!... সবচেয়ে বড় কথা, সোনিয়া, আমি যখন খুন করি তখন টাকার দরকার আমরা ছিল না— টাকার দরকার আমার ততটা ছিল না যতটা ছিল অন্য কিছুর।... এখন আমি সে সবই জানি!... আমাকে বোঝার চেষ্টা কর— হয়ত ওই পথে গিয়ে আমি আর কখনও আর একটা খুন করে বসব না। আমার জানা দরকার ছিল অন্য আরেকটা কিছু, আমাকে তাড়না করে বেড়াচ্ছিল অন্য আরেকটা কিছু। আমার তখন জানা দরকার ছিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানা দরকার ছিল আমি আর সকলের মতো উকুন, না আমি মানুষ ? আমি সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারি কিনা— সে সামর্থ্য আমার আছে কিনা— ঝুঁকে পড়ে তুলে নেবার মতো সাহস আমার হবে কি? আমি কি ভীরু প্রাণী, নাকি আমার *অধিকার* আছে?..."

"খুন করার? খুন করার অধিকার আছে আপনার?" সোনিয়া হাত নাড়িয়ে বলল।

"ওঃ সোনিয়া!" বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল রাস্‌কোল্‌নিকভ। ওর কথায় আপত্তি করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষকালে অবজ্ঞাভরে ক্ষান্ত হয়ে বলল, "আমাকে বাধা দিও না, সোনিয়া! আমি তোমার কাছে কেবল যে জিনিসটা প্রমাণ

করতে চাইছিলাম তা এই যে ওই সময় আসলে শয়তান আমার ওপর ভর করেছিল, পরে সে আমায় স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল যে ওখানে যাবার অধিকার আমার ছিল না, যেহেতু আমিও আর সবারই মতো একটা সামান্য উকুন মাত্র। ব্যাটা আমাকে নিয়ে মনের খুশে মজা করেছে। আমি তাই এখন তোমার কাছে এসেছি! অতিথিকে বরণ কর! আমি যদি উকুন না হতাম তবে থোড়াই তোমার কাছে আসতাম! শোন, ওই সময় যখন আমি বুড়ির কাছে গিয়েছিলাম তখন কিন্তু কেবল *যাচাই* করে দেখার জন্যই গিয়েছিলাম!... জেনে রেখো!"

"তবু খুন করলেন! খুন করলেন!"

"কিন্তু এ কেমন খুন বল তো! এভাবে কি কেউ খুন করে? আমি তখন যেভাবে খুন করতে গিয়েছিলাম সেভাবে কি কেউ যায়! কী ভাবে গিয়েছিলাম সে বৃত্তান্ত আমি তোমাকে অন্য কোন সময় দেবখন!... আমি কি বুড়িকে খুন করেছি? বুড়িকে নয়, আমি খুন করেছি নিজেকে! আমি মিছিমিছি নিজেকে এক ধাক্কায় খতম করে দিলাম, চিরকালের জন্যে খতম করে দিলাম!... আর এই বুড়িকে? ওকে তো আমি খুন করিনি— ওকে খুন করেছে শয়তান।...হয়েছে, অনেক হয়েছে সোনিয়া, আর নয়! আমাকে রেহাই দাও!" হঠাৎ কাঁপতে-কাঁপতে ব্যাকুল কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল সে, "আমাকে রেহাই দাও!" বলতে-বলতে দুই হাঁটুর ওপর কনুইদুটো ঠেকিয়ে সাঁড়াশির মতো শক্ত করে দু-হাতে মাথা চেপে ধরল।

'ইস্ কী কষ্ট !" সোনিয়ার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ।

"তাহলে এখন আমার কী করা উচিত বল!" হঠাৎ মাথা তুলে তার দিকে তাকিয়ে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ জিগ্‌গেস করল। হতাশায় বীভৎসরকম বিকৃত হয়ে উঠেছিল তার মুখ।

"কী করা উচিত?" সোনিয়া চট করে জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তার ছলছল দুচোখ হঠাৎ ঝলক দিয়ে উঠল। "উঠে দাঁড়াও!" বলেই রাস্‌কোল্‌নিকভের কাঁধ চেপে ধরল সে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ প্রায় হকচকিয়ে গিয়ে তার দিকে তাকাল। সোনিয়া বলল, "এখনই, এই মুহূর্তে রাস্তার চৌমাথায় গিয়ে দাঁড়াও। মাথা নোয়াও, যে মাটিকে তুমি অপবিত্র করেছ প্রথমে তাকে চুমু খাও, তারপর চারদিকে ঘুরে-ঘুরে দুনিয়াসুদ্ধ সবাইকে মাথা নুইয়ে প্রণাম জানাও, সবাইকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বল: 'আমি খুন করেছি।' তবেই ভগবান আবার তোমাকে জীবন ফিরিয়ে দেবেন। যাবে? যাবে তো?" রাস্‌কোল্‌নিকভের হাতদুটো নিজের দু হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে আগুনের মতো জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে সে জিগ্‌গেস করল। সোনিয়ার তখন মূর্ছা যাবার অবস্থা— তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ অবাক হয়ে গেল, এমনকি হতভম্ব হয়ে গেল তার আকস্মিক উচ্ছ্বাসে।

"তুমি কি সাইবেরিয়ায় যেতে বল নাকি আমাকে? বলতে চাও আমি নিজেই নিজেকে ধরিয়ে দিই?" বিষাদ ঝরে পড়ল রাস্‌কোল্‌নিকভের কণ্ঠে।

"যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, তারই মধ্য দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে— এটাই দরকার।"

"না, আমি যাব না, সোনিয়া।"

"তাহলে, তাহলে জীবনধারণ করবে কী করে বল তো? কী নিয়ে বেঁচে থাকবে বলতে পার?" সোনিয়া বলে উঠল। "এখন কি তা সম্ভব? তোমার মা'র সঙ্গে তুমি কথা বলবে কী করে?... ইস্, ওদের এখন কী অবস্থা হবে?... কিন্তু এ আমি কী বলছি? তুমি তো অমনিতেই তোমার মা আর বোনকে ছেড়ে চলে এসেছ! ছেড়েছ! ইতিমধ্যেই ছেড়ে দিয়েছ যে! ওঃ ভগবান!" আর্তকণ্ঠে সে বলল। "ওর নিজেরই তো এসব জানা আছে! কিন্তু মানুষ ছাড়া জীবনধারণ করা— এটা কী করে সম্ভব? কী করে? কী হবে তোমার এখন?"

"ছেলেমানুষি কোরো না, সোনিয়া," মৃদুস্বরে সে বলল। "তাদের কাছে আমার কিসের অপরাধ? কেন আমি যাব? কী আমি বলব তাদের? এসবই মনের বিকারমাত্র।... ওরা নিজেরাই লক্ষ মানুষ খতম করছে, আবার সেটাকে গৌরব বলে জাহিরও করছে। ওরা পাজি আর বদমাশের দল, সোনিয়া!... যাব না। গিয়ে আমি বলব কী?— বলব যে খুন করেছি, কিন্তু টাকাকড়ি নেবার মতো বুকের পাটা ছিল না, তাই পাথর চাপা দিয়ে লুকিয়ে রেখেছি?" তিক্ত হাসি হেসে সে যোগ করল। "তা একথা শুনে ওরা নিজেরাই তো আমাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করে দেবে। বলবে— বোকা কোথাকার, নিতে পারেনি। ভীতু, আর বোকা! ওরা বুঝবে না, কিছুই বুঝতে পারবে না, সোনিয়া। তাছাড়া বোঝার যোগ্যতাও ওদের নেই। কেন আমি যাব? যাব না। ছেলেমানুষি করবে না, সোনিয়া! ..."

"নিজেকে এত কষ্ট দিয়ে তুমি মারা পড়বে! মারা পড়বে যে শেষকালে!" মরিয়া হয়ে দুহাত তার দিকে বাড়িয়ে অনুনয়ের সুরে সোনিয়া বলল।

"বলা যায় না, *এখনও* হয়ত ওটা নিজের নামে কুৎসা ছাড়া আর কিছু নয়," বিষণ্ন সুরে, অনেকটা যেন অন্যমনস্কভাবে সে মন্তব্য করল। হয়ত আমি উকুন নই, *এখনও* আমাকে মানুষ বলা যেতে পারে— একটু তাড়াতাড়ি নিজের নিন্দা করে ফেলেছি।.... আমি *এখনও* লড়াই করার ক্ষমতা রাখি।"

তার ঠোঁটে ফুটে উঠল উদ্ধত হাসি।

"কিন্তু তাই বলে এত কষ্ট ভোগ করা! তোমাকে যে সারাজীবন ভোগ করতে হবে এ কষ্ট! সারাটা জীবন!..."

"অভ্যেস হয়ে যাবে..." মুখ গোমড়া করে চিন্তিতভাবে সে বলল। "শোন," মিনিটখানেক বাদেই সে শুরু করল, "অনেক কান্নাকাটি হয়েছে। এবারে কাজের কথায়

আসা যাক। আমি তোমাকে বলতে এসেছি যে ওরা আমার পেছনে লেগেছে। আমাকে ধরার চেষ্টা চলছে...''

''ইস্!'' সোনিয়া আঁতকে উঠল।

''কী, অমন আঁতকে উঠলে কেন! নিজে চাইছ আমি সাইবেরিয়া যাই, অথচ একথা শুনে ভয় পেয়ে গেলে? তবে হ্যাঁ একটা কথা— আমি ওদের কাছে ধরা দিচ্ছি না। আমি এখনও ওদের সঙ্গে লড়ব, ওরা আমার কিছুই করতে পারবে না। সত্যিকার কোন প্রমাণ ওদের কাছে নেই। গতকাল আমি বড় বিপদে পড়েছিলাম—ভেবেছিলাম এই বুঝি গেলাম। কিন্তু আজ সামলে নেওয়া গেছে। ওদের সব প্রমাণ শাঁখের করাতের মতো, অর্থাৎ ওদের অভিযোগগুলোকেই আমি নিজের কাজে লাগাতে পারি। বুঝলে তো? আর তা করবও কেননা এখন আমি জানি কী ভাবে তা করতে হয়।... তবে জেলে ওরা আমাকে সম্ভবত পুরবে। একটা ঘটনা না ঘটলে হয়ত আজই পুরত। আমার তো মনে হয় নির্ঘাত পুরত, এমনকি হয়ত *এখনও*, আজই পুরতে পারে।... কিন্তু ও কিছুই নয়, সোনিয়া। কিছুদিন রেখে দেবে, তারপর ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে... কেননা ওদের কাছে সত্যিকার সাক্ষ্যপ্রমাণ একটাও নেই, থাকবেও না— আমি তোমাকে বলে রাখছি। ওদের কাছে যা আছে তা দিয়ে আর যাই হোক, কাউকে জেলে পাঠান যায় না। যাক, অনেক হয়েছে।... আমি শুধু চেয়েছিলাম তুমি জান।... মা আর বোনের ক্ষেত্রেও চেষ্টা করে দেখব— ওদের ভালোমত বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলব। দেখতে হবে ওরা যেন ভয় না পায়।... বোনের অবশ্য এখন, মনে হয় কোন অভাব নেই... তার মানে, মা'রও নেই।... ব্যাস্, এই তো। হ্যাঁ, সাবধান কিন্তু। আমি যখন জেলে যাব তখন আমাকে দেখতে আসবে তো?''

''আসব! আসব! নিশ্চয়ই আসব!''

ওরা দুজনে পাশাপাশি বসে রইল। বিষণ্ণ, মনমরা— যেন নির্জন সৈকতে ঝড়ে নিক্ষিপ্ত দুটি প্রাণী। সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে রাস্‌কোল্‌নিকভ উপলব্ধি করতে পারছিল তার জন্য ওর কী গভীর দরদ। অদ্ভুত এই যে সোনিয়া যে তাকে এত ভালোবাসে এই কথা ভেবে হঠাৎ তার মন ভারী হয়ে গেল, বুকের ভেতরটা বেদনায় টনটন করে উঠল। বাস্তবিকই এটা ছিল এক অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর অনুভূতি! সোনিয়ার কাছে আসার সময় সে মনে-মনে উপলব্ধি করছিল যে সোনিয়াই তার একমাত্র আশাভরসা, তার শেষ ভরসাস্থল। সে ভেবেছিল মনের ভার অন্তত খানিকটা হালকা করতে পারবে। কিন্তু এখন সোনিয়ার সমস্ত মনপ্রাণ যখন তারই অভিমুখী তখন হঠাৎ সে উপলব্ধি করল, তার মনে হল সে যেন আগের চেয়ে আরও বেশি অসুখী, বড় বেশি অসুখী হয়ে পড়েছে।

সে বলল, ''না সোনিয়া, আমি যখন জেলে যাব, তখন আমাকে দেখতে এসো না— বরং সেটাই ভালো।''

সোনিয়া উত্তর না দিয়ে নীরবে কাঁদতে লাগল। কয়েক মিনিট কেটে গেল।

"তোমার গলায় কি ক্রুশ ঝোলান আছে।" হঠাৎই মনে পড়তে আচম্বিতে সোনিয়া জিগ্‌গেস করল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ প্রথমে প্রশ্নটা বুঝতে পারল না।

"নেই? তাই তো? এই নাও এটা—সাইপ্রেস কাঠের তৈরি। আমার আরেকটা আছে—তামার। লিজাভেতার দেওয়া। লিজাভেতার সঙ্গে ক্রুশ বদলাবদলি করেছিলাম। ও আমাকে ওরটা দিয়েছিল, আমি ওকে আমারটা দিয়েছিলাম। এখন আমি লিজাভেতারটা গলায় ঝুলাব, তোমাকে এইটে দেব। নাও...এটা আমার! এটা যে আমার!" অনুনয়ের সুরে সে বলল। "আমরা তো একই সঙ্গে দুঃখকষ্ট ভোগ করতে যাচ্ছি, একই সঙ্গে ক্রুশও বহন করব!"

"দাও!" রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ বলল। ওর মনে দুঃখ দিতে চাইছিল না সে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ক্রুশের জন্য বাড়ান হাতখানা ঝটকা মেরে সরিয়ে নিল।

"এখন না সোনিয়া। বরং পরে," ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সে যোগ করল।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভালো, সেই ভালো," রাস্‌কোল্‌নিকভের কথার খেই ধরে সোনিয়া আন্তরিকভাবেই বলল। "যখন কষ্ট ভোগ করতে যাবে তখন পরবে। আমার কাছে আসবে, আমি নিজে হাতে পরিয়ে দেব। আমরা প্রার্থনা করব, প্রার্থনা করেই বেরিয়ে পড়ব।"

ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন দরজায় তিনবার টোকা মারল।

"সোফিয়া সেমিওনভনা, আসতে পারি কি?" কে যেন ভদ্রভাবে জিগ্‌গেস করল। কণ্ঠস্বরটা তো খুবই চেনা-চেনা মনে হল।

সোনিয়া ভয় পেয়ে দরজার দিকে ছুটে গেল। ঘরের ভেতরে উঁকি মারল লেবেজিয়াত্‌নিকভের সোনালি চুলভর্তি মাথাটা।

পাঁচ

লেবেজিয়াত্‌নিকভের চোখেমুখে উদ্বেগের আভাস।

"আমি আপনার কাছে এসেছি, সোফিয়া সেমিওনভ্‌না। মাফ করবেন। ...আমি ঠিকই ভেবেছিলাম যে আপনাকে এখানে পাব," রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে লক্ষ করে হঠাৎ সে বলে উঠল। "না, মানে আমি সেরকম কিছুই ভাবিনি...আসলে আমি যা ভেবেছিলাম... এদিকে আমাদের ওখানে কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার মাথা বিগড়ে গেছে", রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ সোনিয়ার দিকে ফিরে সে ছুঁড়ে দিল।

সোনিয়া আর্তনাদ করে উঠল।

"মানে, বলতে চাই, অন্তত তাই মনে হচ্ছে। যাই হোক...মুশকিল হল। কী করা যায় আমরা কেউ বুঝে উঠতে পারছি না! উনি যখন ফিরে এলেন তখন দেখে মনে

হল... কোন জায়গা থেকে কেউ তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে। হয়ত বা কারও হাতে মারও খেয়েছেন। ...উনি ছুটে গিয়েছিলেন মার্মেলাদভের ওপরওয়ালার কাছে। বাড়িতে তাঁকে পাননি। তিনি খানা খাচ্ছিলেন আরেকজন জেনারেলের বাড়িতে। ... ভেবে দেখুন যেখানে ওঁরা খানা খাচ্ছিলেন উনি ছুটলেন সেখানে... সেই আরেক জেনারেলের বাড়িতে। আরও ভেবে দেখুন উনি জেদ ধরলেন সেমিওন জাখারভিচের ওপরওয়ালাকে ডেকে পাঠাতেই হবে—এমনকি, মনে হয়, খানার টেবিল থেকে হলে তা-ই সই। বুঝতেই পারছেন ফল কী হল। বলাই বাহুল্য ওঁকে ওখান থেকে খেদিয়ে দেওয়া হয়। উনি অবশ্য বলছেন যে উনি নিজে ওই ভদ্রলোককে যা নয় তাই বলে গালিগালাজ করেন এবং তাঁকে লক্ষ করে কিছু একটা ছুঁড়েও মারেন। একেবারে অবিশ্বাস্য নয়।...ওঁকে ওরা কেন গ্রেপ্তার করল না সেটাই বুঝতে পারছি না। এখন উনি সকলকে সে বৃত্তান্ত ফলাও করে বলে বেড়াচ্ছেন—এমনকি আমালিয়া ইভানোভ্‌নাকে। তবে বক্তব্য বোঝা ভার। চিৎকার-চেঁচামেচি আর দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছেন।...ও হ্যাঁ, উনি চিৎকার করে সকলকে বলছেন যে এখন সকলে ওঁকে ছেড়ে চলে গেছে, তাই অনন্যোপায় হয়ে উনি ছেলেপুলেদের হাত ধরে কলের বাজনা নিয়ে পথে নামবেন, ওরা বাজনার তালে-তালে গাইবে নাচবে, তিনি নিজেও তাই করবেন—এইভাবে ভিক্ষে করে বেড়াবেন এবং রোজ জেনারেলের বাড়ির জানলার পাশ দিয়ে যাবেন।...উনি বলছেন, 'নিজের চোখে দেখুন, সরকারি কর্মচারীর ভদ্রঘরের সন্তানরা কেমন রাস্তায়-রাস্তায় ভিখ্ মেগে বেড়াচ্ছে!' বাচ্চাগুলোকে ধরে-ধরে পেটাচ্ছেন। ওরা সব কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। লিদাকে 'ছোট্ট আমার গাঁ' গান শেখাচ্ছেন, ছেলেটাকে নাচ শেখাচ্ছেন, পোলেন্‌কাকেও। উনি ওদের সমস্ত জামাকাপড় ছিঁড়ে তাই দিয়ে ওদের জন্য টুপি না কি বানাচ্ছেন—অভিনেতাদের মতো ওরা পারবে বলে। নিজে নাকি গামলা নিয়ে বের হবেন, বাজনার বদলে ওটাই পেটাবেন। ...কারও কোন কথাই শুনছেন না। ...বলুন দেখি কী কাণ্ড! এ যে একেবারে অসম্ভব ব্যাপার!"

লেবেজিয়াত্‌নিকভ্ হয়ত আরও চালিয়ে যেত, কিন্তু সোনিয়া এতক্ষণ ধরে নিঃশ্বাস বন্ধ করে তার কথাগুলো শোনার পর হঠাৎ আঙরাখা আর টুপিটা তুলে নিয়ে ছুটতে-ছুটতেই পায়ে জুতো গলাতে-গলাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তাকে অনুসরণ করল, তার পিছন-পিছন লেবেজিয়াত্‌নিকভ্।

"নির্ঘাত মাথার গণ্ডগোল!" রাস্‌কোল্‌নিকভের সঙ্গে রাস্তায় বেরোতে-বেরোতে সে তাকে বলল। "সোফিয়া সেমিওনভ্‌না পাছে ভয় পেয়ে যান সেই ভেবে আমি বলেছিলাম 'মনে হচ্ছে'। কিন্তু সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। শুনেছি ক্ষয়রোগে নাকি মগজের ভেতরে গুটি বেরিয়ে মস্তিষ্ককে বিকল করে দেয়। দুর্ভাগ্যবশত চিকিৎসাশাস্ত্র আমার জানা নেই। আমি অবশ্য ওঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু উনি কানেই তুললেন না।"

"আপনি ওঁকে গুটির কথা বোঝাতে গিয়েছিলেন নাকি?"

"না, ঠিক তা নয়। তাছাড়া বললেও তিনি কিছুই বুঝতেন না। তবে আমি বলি কি মানুষকে যদি যুক্তি দিয়ে বোঝান যায় যে আসলে কান্নাকাটি করার কোন কারণ নেই, তাহলে সে কান্না থামাবে। এটা পরিষ্কার। আপনার কী মত? থামাবে না?"

"তাহলে তো জীবনধারণ করা বড় বেশি সহজ হয়ে যেত," রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ জবাব দিল।

"মাফ করবেন, ঠিক মানতে পারলাম না। এটা ঠিক যে কাতেরিনা ইভানোভ্‌নাকে বোঝা বেশ কঠিন। কিন্তু আপনি কি জানেন যে একমাত্র যুক্তি দিয়ে বোঝানোর মাধ্যমে পাগলের আরোগ্য যে সম্ভব প্যারিসে ইতিমধ্যে তার ওপর গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা- নিরীক্ষা হয়ে গেছে? ওখানকার একজন প্রোফেসর...সম্প্রতি উনি মারা গেছেন...একজন উল্লেখযোগ্য পণ্ডিত মনে করেন যে ওই উপায়ে রোগ সারান সম্ভব। তাঁর মূল আইডিয়া হল পাগলদের শরীরে বিশেষ কোন অভ্যন্তরীণ বিকার নেই, পাগলামি হল যুক্তির ভুল, বিচারের ভুল, যাকে বলে বস্তুর প্রতি ভ্রমাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি—তাই। উনি ধীরে-ধীরে রোগীর মত খণ্ডন করতেন এবং ...ভেবে দেখুন... লোকে বলে, উনি নাকি অসাধারণ ফল পেয়েছিলেন। তবে যেহেতু একই সঙ্গে তিনি জলচিকিৎসারও প্রয়োগ করতেন সেই হেতু, বলাই বাহুল্য ওই চিকিৎসার ফলাফল সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে।...অন্তত আমার তো তাই মনে হয়।..."

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ ওর কথায় কান দেওয়া অনেকক্ষণ হলই বন্ধ করে দিয়েছিল। বাড়ির কাছাকাছি হতে মাথা ঝুঁকিয়ে লেবেজিয়াত্‌নিকভকে নমস্কার জানিয়ে ফটকের দিকে মোড় নিল। লেবেজিয়াত্‌নিকভের চৈতন্যোদয় হতে ফিরে তাকাল। তাড়াতাড়ি সামনের দিকে পা চালাল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ তার খুপরিতে ঢুকে মাঝখানে এসে দাঁড়াল। কেন এখানে ফিরে এলো? চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সে দেখল বিবর্ণ হলদেটে ছিন্নভিন্ন সেই ওয়ালপেপার, সেই ধুলো, তার সেই সোফা। ...আঙিনা থেকে ভেসে আসছে কিসের যেন একটানা, কর্কশ ঠকঠক আওয়াজ। কোথাও কেউ কিছু একটা ঠুকছে—সম্ভবত পেরেক। জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে পায়ের আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগের ভাব করে অনেকক্ষণ ধরে আঙিনাটা দেখতে লাগল। কিন্তু আঙিনা ফাঁকা, ঠকাঠক আওয়াজ যে বা যারাই করুক তাদের কাউকেই চোখে দেখা যাচ্ছে না। বাড়ির বাঁ পাশের অংশটাতে এখানে-ওখানে দু-একটা জানলা খোলা দেখতে পেল, জানলার তাকগুলোতে টবে জিরজিরে জেরানিয়াম ফুল। জানলার ওপাশে জামাকাপড় মেলা আছে।... এসবই ওর জানা, মুখস্থ। সে ফিরে সোফায় গিয়ে বসল।

এরকম ভয়ঙ্কর একাকী সে নিজেকে আর কখনও অনুভব করেনি—কখনও না!

হ্যাঁ, সে আরও একবার অনুভব করল হয়ত সত্যি-সত্যি সোনিয়াকে সে ঘৃণা করে—বিশেষত ঠিক এখনই, যখন সোনিয়ার দুর্ভাগ্যের বোঝাকে সে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কী দরকার ছিল ওর কাছে গিয়ে ওর চোখের জল প্রার্থনা করার? ওর জীবনকে বিষময় করে তোলার কী এমন দরকার ছিল তার? এ কী নীচতা!

"আমি একাই থাকব!" হঠাৎ দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে সে বলে উঠল। "না জেলখানায় ওকে আসতে হবে না দেখা করতে!"

মিনিটপাঁচেক পরে সে মাথা তুলে অদ্ভুতভাবে হাসল। তার মাথায় এসেছে একটা উদ্ভট চিন্তা। 'বলা যায় না, সাইবেরিয়ায় দণ্ডভোগ করা হয়ত সত্যি-সত্যি এর চেয়ে ভালো,' হঠাৎ তার মনে হল।

মাথার ভেতরে ভাসা-ভাসা চিন্তার ভিড় নিয়ে কতক্ষণ যে সে ঘরে বসেছিল তা তার মনে নেই। এমন সময় দরজা খুলে গেল, দুনিয়া ঘরে ঢুকল। প্রথমে সে চৌকাটের ওপর পা রেখে থমকে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে তাকে দেখল— কিছুক্ষণ আগে সোনিয়াকে দেখে তার নিজের যেমন অবস্থা হয়েছিল। তারপর এগিয়ে এসে তার মুখোমুখি চেয়ারে বসল—গতকালও এই জায়গাতেই সে বসেছিল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ কোন কথা না বলে কেমন যেন ফ্যালফ্যাল করে তাকাল তার দিকে।

"রাগ করিস নে ভাই, আমি মাত্র এক মিনিটের জন্যে এসেছি," দুনিয়া বলল। তার মুখে গভীর চিন্তার ছাপ থাকলেও কঠোরতার কোন চিহ্ন ছিল না। চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ ও শান্ত। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ দেখেই বুঝতে পারল যে সেও এসেছে ভালোবাসার টানে।

"আমি এখন সব জানি রে ভাই, *সব* জানি। দ্‌মিত্রি প্রকোফিচ আমায় সব ব্যাখ্যা করে বলেছেন, পুরো বৃত্তান্ত দিয়েছেন। বোকার মতো একটা বিশ্রী সন্দেহের বশে ওরা তোকে তাড়না করছে, কষ্ট দিচ্ছে। ...দ্‌মিত্রি প্রকোফিচ বলেছেন, বিপদের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। তুই মিছিমিছি ভয় পেয়ে যাচ্ছিস। আমি তা মনে করি না। তুই যে খুবই ঘাবড়ে গেছিস, এই বিতৃষ্ণার ভাব তোর মনে যে স্থায়ী ছাপ ফেলে রেখে যেতে পারে এ আমি *বেশ বুঝি*। এটা আমার ভয়ের কারণ। তুই যে আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দিয়েছিস তার জন্য আমি তোকে দোষ দিচ্ছি না, সে স্পর্ধাও আমার নেই। তোকে আমি আগে যে কটু কথা বলেছি তার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। আমি নিজেই নিজেকে দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছি যে এরকম বড় দুঃখ যদি আমার জীবনে আসত তাহলে আমি হয়ত সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে কোথাও চলে যেতাম। *এ বিষয়ে* মা'কে আমি কিছু বলতে যাচ্ছি না, তবে তোর কথা অনবরত বলবই এবং তোর নাম করে বলব যে তুই শিগ্‌গিরই ফিরে আসছিস। ওর কথা ভেবে নিজেকে কষ্ট দিস না—*আমি* ওকে সান্ত্বনা দেব। তুইও ওকে আর কষ্ট দিস না। অন্তত

একবারের জন্যে হলেও আয়। মনে রাখিস, হাজার হোক মা! এখন আমার আসা শুধু এই কথাই বলতে যে...'' জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে দুনিয়া বলল, ''যদি কোন কারণে কখনও আমাকে তোর দরকার হয় অথবা...আমার সমস্ত জীবনটা বা আরও কিছু তোর দরকার হয়...তাহলে একবার অন্তত ডাকিস, আমি আসব। চলি!'' বলেই ঝট করে ঘুরে সে দরজার দিকে পা বাড়াল।

''দুনিয়া!'' রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তাকে থামিয়ে দিল। উঠে দাঁড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, ''আমাদের এই রাজুমিখিন— তোর দ্‌মিত্রি প্রকোফিচ— লোকটা বড় ভালো রে।''

দুনিয়া সামান্য লাল হয়ে উঠল।

''মানে?'' একটু চুপ করে থেকে শেষকালে সে জিগ্‌গেস করল।

''ও করিৎকর্মা, পরিশ্রমী, সৎ। গভীর ভালোবাসার ক্ষমতা ওর আছে।... বিদায়, দুনিয়া।''

দুনিয়া আরক্ত হয়ে উঠল, তারপর হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে বলল, ''কিন্তু এ কী ব্যাপার? আমাদের কি সত্যি-সত্যি চিরকালের জন্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে যে তুই আমাকে ...এরকম শেষ ইচ্ছে জানাচ্ছিস?''

''সে যা-ই হোক...বিদায়...''

রাস্‌কোল্‌নিকভ ওর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে জানলার দিকে সরে গেল। দুনিয়া একটু দাঁড়িয়ে থেকে অস্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে দেখল, তারপর ভারাক্রান্ত মনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

না, বোনের প্রতি তার যে কোন অনুভূতি ছিল না এমন নয়। একটা সময়ে, একেবারে শেষমুহূর্তে তার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল দুনিয়াকে আদর করে জড়িয়ে ধরে তার কাছ থেকে *বিদায় নেয়*, এমনকি ঘটনাটা তাকে *বলেও ফেলে*; কিন্তু শেষকালে বিদায় নেবার জন্য ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার পর্যন্ত সাহস তার হল না।

'আমি ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছি তাই মনে হতে হয়ত পরে, শিউরে উঠবে। হয়ত বলবে আমি ওর চুমু চুরি করেছি।'

'কিন্তু *এটা* ও সহ্য করতে পারবে কি পারবে না?' কয়েক মিনিট বাদে সে মনে - মনে যোগ করল। না সহ্য করতে পারবে না। ওর মতো মানুষের সাধ্য নয়। ওরা কখনই পারে না...' সোনিয়ার কথাও সে ভাবল।

জানলা দিয়ে খোলা হাওয়া আসছে। বাইরে দিনের আলো ম্লান হয়ে আসছে। হঠাৎ কী মনে করে সে টুপিটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

অবশ্যই নিজের অসুস্থ অবস্থার কথা চিন্তা করতে সে পারছিল না। ওই নিয়ে চিন্তা করতে তার মন চাইছিলও না। কিন্তু সবসময় মনের মধ্যে এই উদ্বেগ, এই বিভীষিকা—এ সবের ফল ফলতে বাধ্য। এখনও যে সে সত্যি-সত্যি 'জ্বর আর

বিকারের ঘোরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েনি তার একমাত্র কারণ হয়ত এই যে মনের ভেতরের এই নিরন্তর উদ্বেগ এখনও ওকে খাড়া করে এবং ওর চেতনাকে সজাগ করে রাখতে সাহায্য করছিল। তবে সেটা কেমন যেন চেষ্টাকৃত, সাময়িক।

সে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কিছুকাল যাবৎ বিশেষ এক ধরনের কেমন একটা ব্যাকুলতা যেন তাকে পেয়ে বসছে। সেই অনুভূতির মধ্যে তীব্র জ্বালাধরা সেরকম কিছু ছিল না। কিন্তু অবিরাম, নিরন্তর এমন একটা কিছু সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ছিল যার ফলে সে মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করতে পারছিল মৃত্যুর হিমশীতল ছোঁয়া লাগা, সীমাহীন নিরানন্দময় বছরগুলোর নিষ্ফলতা, উপলব্ধি করতে পারছিল 'দুগজ জমিতে' অনন্তের পূর্বাভাস। আসন্ন সন্ধ্যায় এই উপলব্ধি স্বাভাবিকভাবেই যন্ত্রণায় আরও বেশি অস্থির করে তুলল তাকে।

"কোথাকার কোন সূর্যাস্ত!—তারই প্রভাবে একটা মানুষ ডাহা মূর্খের মতো যখন সত্যি-সত্যি শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়ে তখন সে যে বোকার মতো কাজকর্ম করে বসবে এতে আর বিচিত্র কি! সোনিয়ার কাছে কেন, দুনিয়ার কাছে গেলেও বলার কিছু নেই!" বিতৃষ্ণার সঙ্গে সে বিড়বিড় করে বলল।

কে যেন তার নাম ধরে ডাকল। ফিরে তাকিয়ে দেখল তার দিকে ছুটতে-ছুটতে আসছে লেবেজিতা্নিকভ্।

"ভেবে দেখুন, আমি আপনার খোঁজে আপনার কাছে গিয়েছিলাম। ভেবে দেখুন, উনি ওঁর নিজের মর্জিমতন বাচ্চাগুলোকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেছেন। আমি আর সোফিয়া সেমিওনভ্না মিলে অনেক কষ্টে ওদের খুঁজে বের করেছি। উনি ঠনঠন করে বাসন বাজাচ্ছেন, বাচ্চাগুলোকে জোর করে গান গাওয়াচ্ছেন, নাচাচ্ছেন। ওরা কাঁদছে। উনি ওদের নিয়ে রাস্তার মোড়ে আর দোকানপাটের কাছে থামছেন। একদঙ্গল বোকা লোক ওদের পেছন-পেছন ছুটছে। চলুন।"

"আর সোনিয়া?" লেবেজিয়াত্নিকভের পেছন-পেছন দ্রুত পা ফেলতে-ফেলতে উদ্বিগ্ন হয়ে রাস্কোল্নিকভ্ জিগ্গেস করল।

"একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। মানে, সোফিয়া সেমিওনভ্না নন, কাতেরিনা ইভানোভ্না। তবে হ্যাঁ সোফিয়া সেমিওনভ্নারও ওই একই দশা। কিন্তু কাতেরিনা ইভানোভ্না একেবারেই ক্ষিপ্ত হয়ে গেছেন। আপনাকে বলছি, মাথাটা পুরোপুরি বিগড়ে গেছে। পুলিসে ওদের ধরে নিয়ে যাবে। ধারণা করতে পারেন, তার পরিণাম কী হতে পারে...ওরা এখন ওই খালের ধারে ব্রিজটার কাছে আছে, সোফিয়া সেমিওনভ্নার বাড়ি থেকে খুব বেশি দূরে নয়।"

খালের ধারে, ব্রিজের অদূরে, সোনিয়া যে বাড়িতে থাকত তার দুটো বাড়ি আগে দেখা গেল ছোটখাটো জনতার একটা ভিড়। বিশেষ করে এসে জুটেছে রাস্তার যত ছেলেমেয়ে। ব্রিজের কাছ থেকেই শোনা যাচ্ছিল কাতেরিনা ইভানোভ্নার

ভাঙা-ভাঙা কর্কশ গলার আওয়াজ। বাস্তবিকই একটা অদ্ভুত দৃশ্য—বিশেষত রাস্তার জনতাকে আকর্ষণ করার মতো। কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার গায়ে তার সেই পুরানো পোশাক আর সেই সবুজ শালখানা, মাথায় তোবড়ান স্ট্র হ্যাট, একটা দিকে দলামোচড়া পাকিয়ে বিশ্রীভাবে হেলে পড়েছে। সত্যি-সত্যি সে ক্ষেপে গেছে। ক্লান্ত হয়ে ঘন-ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। ক্ষয়রোগে ক্লিষ্ট তার মুখে এত বেশি যন্ত্রণার ছাপ এর আগে আর কখনও দেখা যায়নি। তাছাড়া এটা ঠিক যে যক্ষ্মা রোগী ঘরে থাকলে তাকে যেমন দেখায়, রাস্তায় আর সূর্যের আলোর সংস্পর্শে সবসময় তার চেয়ে অনেক বেশি অসুস্থ ও কুৎসিত দেখায়। কিন্তু তার উত্তেজনার এতটুকু কমতি দেখা যাচ্ছিল না। প্রতি মুহূর্তে প্রকোপ বেড়েই চলছে। বাচ্চাগুলোর দিকে তেড়ে যাচ্ছে, তাদের ওপর চিৎকার চেঁচামেচি করছে। ওই রাস্তার ওপরই সকলের চোখের সামনে ধরেবেঁধে ওদের নাচ-গান শেখাচ্ছে, ওদের বোঝাতে শুরু করে দিয়েছে কী জন্যে এর দরকার। আবার ওরা তা বুঝতে পারছে না দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওদের ধরে পেটাচ্ছে। ...তারপর সে কাজ অর্ধসমাপ্ত রেখে তেড়ে যাচ্ছে দর্শকদের দিকে এবং একটু ভালো জামাকাপড় পরা কেউ দাঁড়িয়ে পড়ে কৌতূহলী হয়ে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করছে দেখতে পেলে কথা নেই—সঙ্গে-সঙ্গে তার বাখান শুরু করে দিচ্ছে : দেখুন-দেখুন, 'সম্ভ্রান্ত, এমনকি বলতে গেলে অভিজাত পরিবারের' এই ছেলেমেয়েগুলোর কী হাল করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে! ভিড়ের মধ্য থেকে হাসি বা বিদ্রুপসূচক কোন মন্তব্য তার কানে এলে যাদের এতদূর স্পর্ধা সঙ্গে-সঙ্গে তাদের তুলোধুনো করে ছাড়ছে, তাদের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ বর্ষণ করছে। কেউ-কেউ সত্যি-সত্যি হাসছে, কেউ বা মাথা নাড়ছে। মোটকথা, ভয়ে জড়সড় বাচ্চাদের সঙ্গে ক্ষ্যাপাটে মহিলাটিকে দেখার জন্য লোকজনের কৌতূহলের অভাব নেই। লেবেজিয়াত্‌নিকভ্‌ যে বাসনের কথা বলেছিল তা অবশ্য ছিল না—অন্তত রাস্‌কোল্‌নিকভের চোখে পড়ল না। তবে পোলেন্‌কাকে দিয়ে গান গাওয়ানোর সময় অথবা লিদা বা কোলিয়াকে দিয়ে নাচানোর সময় বাসন বাজানোর বদলে কাতেরিনা ইভানোভ্‌নাকে হাড্ডিসার দুহাতে ঠকাঠক তালি বাজিয়ে তাল ঠুকতে দেখা যাচ্ছিল। এমনকি সে নিজেও সেই সঙ্গে গলা মেলানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু প্রতিবারই দ্বিতীয় স্বরগ্রামে এসে ভয়ঙ্কর কাশির দমকে গলা ভেঙে যাচ্ছিল। ফলে আবার হতাশ হয়ে ভেঙে পড়ছিল। কাশির জন্য শাপশাপান্ত করছিল, এমনকি কেঁদেও ফেলছিল। সবচেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল কোলিয়া ও লিদার আতঙ্কগ্রস্ত কান্নাকাটিতে। বাস্তবিকই রাস্তার গায়ক-গায়িকাদের মতো পোশাকে বাচ্চাগুলোকেও সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। ছেলেটার মাথায় কোথা থেকে একটুকরো লাল-সাদা কাপড়ের পাগড়ি জড়িয়ে তাকে তুর্কী সাজানো হয়েছে। লিদার তেমন পোশাক জোটেনি। তার মাথায় মিহি পশমি সুতোর বোনা লাল টুপি—টুপি

না বলে খোল বলাই ভালো। ওটা পরলোকগত সেমিওন জাখারভিচের সম্পত্তি। টুপিতে উটপাখির সাদা পালকের যে টুকরোটা গুঁজে দেওয়া হয়েছে সেটা আবার কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার পিতামহীর সম্পত্তি—পরিবারের পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত দুর্লভ সামগ্রী হিসেবে এতকাল ট্রাঙ্কে যত্ন করে রাখা ছিল। পোলেন্‌কার গায়ে তার সেই সাধারণ জামাটা। সে ভেবাচেকা খেয়ে ভয়ে-ভয়ে মার দিকে তাকাচ্ছিল, তার কাছাকাছি ঘুরঘুর করছিল, চোখের জল লুকানোর চেষ্টা করছিল। অনুমান করতে পারছিল যে তার মা'র মাথার ঠিক নেই, অস্বস্তির সঙ্গে চারধারে চোখ বুলাচ্ছিল। রাস্তা আর এই ভিড় তাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছে। সোনিয়া অবিরাম কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার পায়ে-পায়ে ঘুরঘুর করছিল, কাঁদতে-কাঁদতে বারবার তাকে বাড়ি ফেরার জন্য অনুনয়-বিনয় করছিল। কিন্তু কাতেরিনা ইভানোভ্‌না নির্মম।

"থাম সোনিয়া, থামলি তুই!" কাশির দমকে হাঁপাতে-হাঁপাতে দ্রুত একনিঃশ্বাসে সে চিৎকার করে বলল। "তুই যে কী বলছিস তা নিজেই জানিস নে—একেবারে কচি বাচ্চার মতন! আমি তো তোকে বলেই দিয়েছি যে ওই মাতাল জার্মান মাগীটার বাড়িতে আর ফিরছি না। একজন বড়ঘরের মানুষ, যিনি সারাটা জীবন বিশ্বস্তভাবে, সততার সঙ্গে সরকারের সেবা করলেন এবং বলতে গেলে কাজের জায়গাতেই মারা গেলেন, তাঁর ছেলেপুলেরা কীভাবে পথে-পথে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে সে দৃশ্য সকলে দেখুক, স্বচক্ষে দেখুক পিটার্সবুর্গের সব মানুষ। (প্রসঙ্গত, কাজের জায়গাতে মারা গেলেন এরকম একটা কিংবদন্তী কাতেরিনা ইভানোভ্‌না ইতিমধ্যে তৈরি করে ফেলেছিল এবং সে নিজে অন্ধভাবে তা বিশ্বাস করতেও শুরু করেছিল।) দেখুক, দেখুক ওই হতভাগা ওঁচা জেনারেলটা। তাছাড়া তুই একটা আচ্ছা বোকা মেয়ে সোনিয়া : এখন আর কী আছে বলতে পারিস? আমরা তোকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আর নয়। আরে, রোদিওন রমানোভিচ যে!" রাস্‌কোল্‌নিকভকে দেখতে পেয়ে হাঁকডাক করে তার কাছে ছুটে এসে সে বলল, "এই বোকা মেয়েটাকে দয়া করে আপনিই বুঝিয়ে বলুন না যে এর চেয়ে ভালো পন্থা আর হতে পারে না! এমনকি রাস্তায় কলের গান বাজিয়েও লোকে রোজগার করে, কিন্তু আমাদের দেখলেই অন্যদের চেয়ে আলাদা করে চেনা যায়, লোকের বুঝতে বাকি থাকে না যে আমরা গরিব হলেও বড় ঘরের মানুষ— সর্বস্বান্ত হয়ে অনাথ অবস্থায় এখন রাস্তায় নেমেছি। ওই ওঁচা জেনারেলটা ওর চাকরি খোয়াবে, দেখবেন। আমরা রোজ ওর জানলার ধার দিয়ে যাব, আর মহামান্য সম্রাট বাহাদুরকে যদি গাড়ি করে যেতে দেখি তাহলে আমি নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে বাচ্চাকাচ্চাগুলোকে সামনে বাড়িয়ে দিয়ে ওদের দেখিয়ে তাঁকে বলব : 'আপনি ওদের মা-বাবা! রক্ষা করুন ওদের!' উনি অনাথদের পিতা, উনি দয়ার সাগর, ঠিক রক্ষা করবেন, দেখবেন! আর এই হতভাগা জেনারেলটাকে... লিদা, সোজা হয়ে দাঁড়া! **tenez-vous droite!** আর কোলিয়া, তোকে ফের নাচতে

হবে এখন। কী হল, ঘ্যানঘ্যান করছিস যে? ফের শুরু হল নাকি-কান্না! কিসের ভয় করছিস, কিসের? হাঁদা কোথাকার! হায় হায়! ওদের নিয়ে আমি এখন কী করি রোদিওন রমানোভিচ? ওঃ আপনি যদি জানতেন ওরা কী গণ্ডমূর্খ! এরকম ছেলেপুলেকে দিয়ে কীই বা কাজ হবে!..."

বলতে-বলতে ক্রন্দনরত ছেলেমেয়েদের দেখিয়ে সে নিজেই প্রায় কেঁদে ফেলল, যদিও তাতে তার অবিরাম কথাস্রোতে এতটুকু বাধা পড়ল না। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ তাকে বুঝিয়ে ফেরানোর চেষ্টা করল, তার আত্মসম্মানবোধের ওপর কাজ করবে ভেবে এমন কথাও বলল যে কলের গান বাজিয়ে যারা ঘুরে-ঘুরে রোজগার করে তাদের মতো রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো তাঁর শোভা পায় না, যেহেতু উনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের বোর্ডিং স্কুলের পরিচালিকা হওয়ার পরিকল্পনা করছেন।

"বোর্ডিং স্কুল, হাঃ হাঃ হাঃ! ও দূর থেকেই ভালো!" হাসির চোটে পরমূহূর্তেই কাশতে-কাশতে কাতেরিনা ইভানোভ্‌না বলল। "না, রোদিওন রমানোভিচ, সে স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে। সবাই আমাদের ছেড়ে চলে গেছে!...আর ওই ওঁচা জেনারেলটা...জানেন, রোদিওন রমানোভিচ, আমি ওকে দোয়াত ছুঁড়ে মেরেছি। ওর বাইরের ঘরে ভিজিটারদের খাতার পাশে রাখা ছিল। আমি নাম সই করে ছুঁড়ে পালিয়ে এসেছি। কী পাজি, কী পাজি! নিকুচি করেছি! এখন থেকে আমি নিজেই এগুলোর মুখের গ্রাস জোগাব। কারও কাছে মাথা নোয়াতে যাব না! ওকে অনেক কষ্ট দিয়েছি আমরা!" সোনিয়াকে দেখিয়ে সে বলল। "পোলেন্‌কা, কত পেয়েছিস দেখা তো। সে কি! মাত্র দু কোপেক! কি জঘন্য লোকজন! জিভ বের করে শুধু আমাদের পিছু-পিছু ছোটে, কিছুই দেয় না দেখছি! আরে, এই আকাটটা আবার হাসে কেন?" ভিড়ের মধ্যে একজনকে দেখিয়ে সে বলল। "এর একমাত্র কারণ এই কোলিয়াটা বড্ড বোকা, ওকে নিয়ে ভারি ঝামেলা! কী চাই তোর পোলেন্‌কা? আমার সঙ্গে ফরাসীতে কথা বল। Parlez moi francais। কী জ্বালা! আমি তোকে শিখিয়েছিলাম না! কয়েকটা কথা তো জানিস তুই! ...তা নইলে তোরা যে মোটে রাস্তার ওসব হেঁজিপেঁজি কলের গান বাজিয়ে দলের নোস, তোরা যে বড়ঘরের ভালো শিক্ষাদীক্ষা পাওয়া ছেলেমেয়ে এটা লোকে বুঝবে কী করে? আমরা তো আর রাস্তায় সঙের নাচগান করতে নামিনি, আমরা উঁচুদরের গান শোনাতে এসেছি।...ও হ্যাঁ! কী গান গাওয়া যায়? না, আপনারা সর্বক্ষণ বাধা সৃষ্টি করে যাচ্ছেন, এদিকে আমরা... দেখতেই পাচ্ছেন রোদিওন রমানোভিচ, এখানে থেমে চিন্তা করছি কী গান বাছা যায়—এমন গান বাছতে হবে যাতে কোলিয়াও তার সঙ্গে নাচতে পারে... কেননা, ভেবে দেখুন, আমাদের সবই হল প্রস্তুতি ছাড়া। আমাদের নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিয়ে ভালোমতো রিহার্স্যাল দিতে হবে, তারপর আমরা যাব নেভ্‌স্কি এভিনিউতে—ওখানে সমাজের উঁচুস্তরের লোকজন অনেক বেশি, আমরা সঙ্গে-সঙ্গে

নজরে পড়ে যাব। লিদা জানে 'ছোট্ট আমার গাঁ'...সারাক্ষণ কেবল 'ছোট্ট আমার গাঁ', আর 'ছোট্ট আমার গাঁ'। ও গান তো সবাই গায়। আমাদের গাইতে হবে আরও উঁচুদরের কিছু। ...আচ্ছা, তুই কি ভেবে বের করলি কিছু পোলেন্‌কা? অন্তত মা'কে একটু সাহায্য করবি তো! আমার স্মৃতিশক্তি তো লোপ পেয়ে গেছে, একেবারেই গেছে! নইলে আমি ঠিক মনে করতাম। তাই বলে তো আর 'অসি ভর দিয়ে খাড়া ঘোড়সওয়ার' গাওয়া যায় না। ও হ্যাঁ, গাওয়া যাক 'Cinq sous'—'পাঁচ পয়সা'—ফরাসী ভাষায়! আমি তোদের শিখিয়েছিলাম যে! শিখিয়েছিলাম না? সবচেয়ে বড় কথা, ফরাসী ভাষায় গান হলে লোকে তৎক্ষণাৎ জানতে পারবে যে তোরা অভিজাত বংশের ছেলেমেয়ে, ফলে অনেক বেশি করুণ হবে দৃশ্যটা।...এমনকি 'Malborough s'en Va-t-en guerre'-ও চলতে পারে। ভালোই হবে, ওটা একেবারে বাচ্চাদের গান, সব অভিজাত পরিবারেই বাচ্চাদের ঘুম পাড়ান হয় এই গান গেয়ে :

Malborough s'en Va-t-en guerre,
Ne sait quand reviendra...

শুরু করতে না করতে মত পালটে বলল : "না, না তার চেয়ে বরং 'Cinq sous' ই ভালো! তাহলে, কোলিয়া, কোমরের দুদিকে দুহাত ঠেকা—চটপট! আর তুই লিদা, তুইও উলটো দিকে ঘোর, পোলেন্‌কা আর আমি গলা মেলাব আর হাতে তালি বাজাব!

Cinq sous, cinq sous,
Pour monter notre menage...

খক -খক- খক।" কাশতে-কাশতে গড়িয়ে পড়ার মত অবস্থা হল তার। "ওরে পোলেন্‌কা, গায়ের জামাটা ঠিক করে নে, কাঁধ থেকে নেমে গেছে," কাশতে-কাশতেই দম নিতে-নিতে সে বলল। "এখন তোমাদের বিশেষ করে ভালো আর ভদ্র ব্যবহার করতে হবে—যাতে সকলে দেখতে পায় যে তোমরা বড় ঘরের ছেলেমেয়ে। আমি তখনই বলেছিলাম ভেতরের ছোট জামাটা আরও লম্বা করে কাটা উচিত, দু-পিসের করতে বলেছিলাম। তা তুই, সোনিয়া, তখন বারবার পরামর্শ দিলি : 'খাটো হওয়া দরকার, আরও খাটো হওয়া দরকার'—এখন দ্যাখ কী দাঁড়িয়েছে—বাচ্চাটাকে কী যাচ্ছেতাই দেখাচ্ছে বল তো।... দেখ কাণ্ড, আবার সবাই মিলে কান্নাকাটি জুড়ে দিল! যতসব বোকাহাঁদার দল! নে, কোলিয়া, শুরু করে দে! জলদি কর, জলদি! ওঃ, আর তো পারা যায় না তোকে নিয়ে!...

Cinq sous, cinq sous...

ওঃ আবার সেপাই! কী দরকার বাপু তোমার?"

বাস্তবিকই ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছিল এক পুলিস কনস্টেবল। কিন্তু সেই সঙ্গে এগিয়ে আসছিল আরও একজন—অফিসারের পোশাকের ওপর ওভারকোট গায়ে

রাশভারী চেহারার এক আমলা, বছর পঞ্চাশেক বয়স হবে। গলায় তার পদক ঝুলছে। সেটা দেখে কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার ভালো লাগল, কনস্টেবলটির মনেও তা সম্ভ্রমের উদ্রেক করল। ভদ্রলোক এগিয়ে এসে তিন রুবলের একটা সবুজ ব্যাঙ্কনোট নীরবে কাতেরিনা ইভানোভনার হাতে তুলে দিলেন। কাতেরিনা ইভানোভ্‌না নোটখানা নিয়ে ভদ্রভাবে—এমনকি ঘটা করে মাথা ঝুঁকিয়ে তাকে নমস্কার জানাল।

"ধন্যবাদ মাননীয় ভদ্রমহোদয়", সাড়ম্বরে শুরু করল কাতেরিনা ইভানোভনা, "যে কারণের বশবর্তী হয়ে আমরা ...টাকাটা ধর, পোলেন্‌কা। দেখছিস তো, এখনও মহৎ আর উদার মনের মানুষ আছেন, যাঁরা ভদ্রঘরের দুঃস্থ মহিলাকে বিপদের সময় সাহায্য করে থাকেন। দেখছেন মাননীয় ভদ্রমহোদয়, এরা সব বড়ঘরের অনাথ শিশু, এমনকি বলতে গেলে অভিজাত যোগাযোগও এদের পরিবারের সঙ্গে আছে। ... অথচ ওই হতভাগা ওঁচা জেনারেলটা কিনা বসে-বসে হাঁসের মাংস খাচ্ছিল... আমি ওর শান্তির ব্যাঘাত ঘটিয়েছি বলে পা ঠুকে দাবড়ানি দিল আমাকে! ...বললাম, 'হে মহামান্য, অনাথ শিশুগুলোকে রক্ষা করুন! পরলোকগত সেমিওন জাখারভিচকে আপনি খুব ভালোমতন জানতেন। যেহেতু কোথাকার এক অতি নীচ লোক তাঁর মৃত্যুর দিনেই তাঁর আপন কন্যার নামে কলঙ্ক রটিয়ে দিয়েছে...' ওঃ আবার সেই সেপাই! রক্ষা করুন!" আমলাটির উদ্দেশ্যে সে চেঁচিয়ে বলল। "এই সেপাইটা যে আমার দিকে আসছে, কী চায় ও? এরকম একজনের কাছে তাড়া খেয়ে মেশ্চান্‌স্কায়া থেকে আমরা এখানে পালিয়ে এসেছি।...কিন্তু তোমার আবার কী চাই হে বুদ্ধির ঢেঁকি!"

"কারণ এই যে রাস্তায় নিষেধ আছে। দয়া করে গণ্ডগোল পাকাবেন না।"

"গণ্ডগোল তো আপনিই পাকাচ্ছেন দেখছি! ধরে নাও রাস্তায় যারা কলের গান বাজিয়ে উপার্জন করে বেড়ায় আমিও ওইরকম একজন। তোমার কী হে?"

"ওই যে কলের গানের কথা বললেন, তার জন্য অনুমতি চাই। কিন্তু ও সবের বালাই আপনার নেই! এভাবে আপনি রাস্তায় ভিড় জমাচ্ছেন। আপনার ঠিকানাটা বলবেন কি?"

"কিসের অনুমতি!" বিলাপের সুরে কাতেরিনা ইভানোভ্‌না বলে উঠল। আমি আজ স্বামীকে কবর দিয়ে এলাম। কিসের অনুমতি আবার!"

"শান্ত হোন ঠাকরুন, শান্ত হোন," আমলাটি বলল। "চলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দেব।... এখানে ভিড়ের মধ্যে ভালো দেখাচ্ছে না।... আপনি সুস্থ নন..."

"মাননীয় ভদ্রমহোদয়, মাননীয় ভদ্রমহোদয়, আপনি কিছুই জানেন না!" চিৎকার করে বলল কাতেরিনা ইভানোভ্‌না। "আমার নেভ্‌স্কিতে যাব। সোনিয়া, সোনিয়া! সোনিয়া আবার কোথায় গেল সেও কাঁদছে! বাঃ, তোদের সকলের হল কী!... কোলিয়া, লিদা, চললি কোথায় তোরা?" হঠাৎ ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল। "ওঃ কী

বোকা ছেলেমেয়েগুলো! কোলিয়া, লিদা, চলল কোথায় ওরা!...”

ঘটনা এই যে রাস্তার ভিড় এবং উন্মত্ত মায়ের ক্ষ্যাপামিতে অমনিতেই ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিল কোলিয়া ও লিদা। তার ওপরে শেষকালে সেপাইয়ের আবির্ভাব ঘটতে যখন ওরা দেখতে পেল সেপাই তাদের ধরে কোথাও নিয়ে যাবার তালে আছে, তখন হঠাৎ যেন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করেই দুজনে হাত ধরাধরি করে ছুটে পালাতে শুরু করে দিল। বেচারি কাতেরিনা ইভানোভ্‌না কাঁদতে-কাঁদতে, বিলাপ করতে-করতে তাদের ধরার জন্য পিছু ধাওয়া করল। যেভাবে ফোঁপাতে-ফোঁপাতে, হাঁপতে-হাঁপাতে সে ছুটছিল দৃশ্যটা ছিল বড়ই বিসদৃশ ও করুণ। তার পেছন-পেছন সোনিয়া ও পেলোন্‌কাও ছুটল।

“ফিরিয়ে নিয়ে আয়, ওদের ফিরিয়ে নিয়ে আয়, সোনিয়া! ওঃ কী বোকা, কী অকৃতজ্ঞ ছেলেমেয়ে! পোলেন্‌কা, ধর ওদের... তোদের জন্যেই না আমি...”

ছুটন্ত অবস্থায় সে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল।

“হায় হায়! হাড়গোড় ভেঙে গেল বোধ হয়! রক্ত ঝরছে!” তার ওপর ঝুঁকে পড়ে আর্তনাদ করে উঠল সোনিয়া।

সকলে ছুটে এলো, সবাই গোল হয়ে ওর চারপাশে ভিড় জমাল। প্রথম যারা ছুটে এসেছিল তাদের মধ্যে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ও লেবেজিয়াত্‌নিকভও ছিল। আমলাটিও দেরি করল না, তাকে অনুসরণ করল সেপাই। ব্যাপারটা যে ঝামেলার দিকে গড়াতে চলেছে টের পেয়ে ‘ধুত্তোর’ বলে গজগজ করে হতাশভাবে সে হাতঝাড়া দিল।

“হট সব! হট!” বলতে-বলতে চারপাশে ভিড় করে থাকা লোকজনকে তাড়াতে লাগল সে।

“মারা যাচ্ছে!” কে একজন চিৎকার করে উঠল।

“মাথা খারাপ হয়ে গেছে!” আরেকজন বলল।

“হা ভগবান, রক্ষে কর!” একজন মহিলা ক্রুশ-প্রণাম ঠুকতে-ঠুকতে বলল। “ছেলেটা আর মেয়েটাকে ধরতে পেরেছে তো? ওই তো নিয়ে আসছে, বড়টি ধরেছে তাহলে।...দেখ কাণ্ড, একেবারে অপোগণ্ড!”

কিন্তু কাতেরিনা ইভানোভ্‌নাকে ভালো করে দেখার পর সকলে বুঝতে পারল সোনিয়া যেমন ভেবেছিল আঘাত ততটা গুরুতর নয়— পাথরে লেগে হাড়গোড় মোটেই ভাঙেনি। সদর রাস্তা যে রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল সেটা আসলে তার বুকের ভেতর থেকে গলা দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসার ফলে।

“এ আমি জানি, আমার দেখা আছে,” আমলাটি বিড়বিড় করে রাস্‌কোল্‌নিকভ ও লেবেজিয়াত্‌নিকভ্‌কে বলল। “এ হল ক্ষয়রোগ, গলগল করে রক্ত বের হয়, তাতে দম আটকে আসে। আমারই এক আত্মীয়ার হয়েছিল, বেশিদিন আগের কথা নয়, আমি তার সাক্ষী। গ্লাসদেড়েক বেরিয়ে এলো এক ধাক্কায়... হঠাৎ।... সে যাই হোক,

আমাদের এখন কী করা উচিত? মারা যাবে যে!"

"শিগ্‌গির, শিগগির! এদিকে, আমার কাছে নিয়ে চলুন।" সোনিয়া অনুনয়-বিনয় করে বলল। আমি এই এখানে থাকি! এই যে, এখান থেকে একটা বাড়ি পরেই।... জলদি-জলদি! দিশেহারা হয়ে ছটফট করতে-করতে যাকে সামনে পেল তাকেই ধরে বলল, "ডাক্তার ডেকে আনুন!... হায় হায়!"

আমলাটির চেষ্টায় কাজটা ভালোয়-ভালোয় উতরে গেল। এমনকি কনস্টেবলটিও কাতেরিনা ইভানোভ্‌নাকে বয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করল। তাকে ধরাধরি করে যখন সোনিয়ার ঘরে তুলে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল তখন সে অর্ধমৃত। রক্ত পড়া তখনও বন্ধ হয়নি, কিন্তু এরই মধ্যে একটু-একটু করে যেন তার সংজ্ঞা ফিরে আসছিল। ঘরের মধ্যে সোনিয়া ছাড়া রাস্‌কোল্‌নিকভ্, লেবেজিয়াত্‌নিকভ্, আমলা ভদ্রলোকটি এবং কনস্টেবল সকলে একসঙ্গে এসে ঢুকল। ভিড়ের মধ্য থেকে বেশ কিছু লোক একেবারে বাড়ির দরজা পর্যন্ত চলে এসেছিল দেখে কনস্টেবলটি আগেই তাদের তাড়িয়ে দেয়। কোলিয়া আর লিদা থরথর করে কাঁপছিল আর হাপুস নয়নে কাঁদছিল। পোলেন্‌কা এই অবস্থায় ওদের হাত ধরে নিয়ে এসেছে। কাপেরনাউমভ্‌দের ঘরের লোকজনও এসে জড় হল। কাপেরনাউমভ্ নিজে খোঁড়া, কানা, দেখতে অদ্ভুত। মুখে তার খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, মাথার চুল খাড়াখাড়া, গালের দু পাশে মোটা জুলপি। তার বৌটিকে দেখে মনে হয় সেই যে কোনকালে ভয় পেয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল তার ছাপ স্থায়ী হয়ে বসে গেছে মুখের ওপর। তাদের বেশ কয়েকটি আন্ডাবাচ্চা— সবসময় বিস্ময়ে আড়ষ্ট তাদের চোখমুখ। মুখ হাঁ করেই আছে। এই জনতার মাঝখানে আচমকা আবির্ভাব ঘটল স্‌ভিদ্রিগাইলভের। লোকটা কোথা থেকে এলো বোঝা গেল না। ভিড়ের মধ্যে এর আগে তাকে দেখেছে বলে মনে করতে পারল না রাস্‌কোল্‌নিকভ্। অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

ডাক্তার আর পাদ্রি ডাকার কথা হচ্ছিল। আমলাটি যদিও রাস্‌কোল্‌নিকভের কানে-কানে বললেন যে ডাক্তার ডাকার এখন আর কোন অর্থ হয় না, তবু একজন ডাক্তার ডেকে আনার পরামর্শ দিলেন। কাপেরনাউমভ্ নিজে ছুটল ডাক্তার ডেকে আনতে।

ইতিমধ্যে কাতেরিনা ইভানোভ্‌না তার স্বাভাবিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফিরে পেয়েছে। রক্ত পড়া আপাতত বন্ধ হয়েছে। যন্ত্রণাকাতর দু-চোখের স্থির, মর্মভেদী দৃষ্টি মেলে সে তাকাল সোনিয়ার দিকে। সোনিয়া বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কাঁপতে-কাঁপতে রুমাল দিয়ে কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার কপালের বিন্দু-বিন্দু ঘাম মুছছিল। অবশেষে কাতেরিনা ইভানোভ্‌না তাকে বিছানায় সামান্য তুলে বসানোর অনুরোধ করল। ওকে দুদিক থেকে ধরে বিছানায় বসিয়ে দেওয়া হল।

"ছেলেমেয়েগুলো কোথায়?" ক্ষীণকণ্ঠে সে জিগ্‌গেস করল। "তুই ওদের নিয়ে

এসেছিস তো পোলেন্‌কা? ওঃ কী বোকা ওরা!... তোরা সব ওরকম পালিয়ে গিয়েছিলি কেন...ওঃ!"

তার শুকনো ঠোঁটে তখনও রক্ত লেগে রয়েছে। সে চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখতে লাগল।

"তাহলে এই তোর থাকার জায়গা, সোনিয়া! একবারও তো আমি তোর এখানে আসিনি... শেষকালে আসতে হল।..." ব্যথাতুর দৃষ্টিতে সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে সে বলল: "আমরা তোকে শুষে খেয়েছি সোনিয়া।... পোলেন্‌কা, লিদা, কোলিয়া, এদিকে আয় তোরা।।... এই যে ওরা, সোনিয়া, ওরা সবাই এখানে... ওদের নে... তুলে দিলাম... তোর হাতে।... আমার হয়ে এসেছে!... খেলা শেষ! হা!... আমাকে নামিয়ে দাও, অন্তত শান্তিতে মরতে দাও।..."

তাকে আবার বালিশে মাথা দিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল।

"কী? পাদ্রিমশাই?... কোনও দরকার নেই।... বাড়তি টাকা তোমাদের কোথায়? আমি কোন পাপ করিনি! ঈশ্বর অমনিতেই আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।... নিজেই জানেন অমি কত কষ্ট পেয়েছি!... আর ক্ষমা যদি না করেন তাতেও আপত্তি নেই।"

অস্থিরতা আর ভুল বকা উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। থেকে-থেকে সে শিউরে উঠছিল, চারধারে চোখ বুলাচ্ছিল। মুহূর্তের জন্য চিনতে পাচ্ছিল সবাইকেই, আবার পরমুহূর্তে সংজ্ঞা লোপ পেয়ে ভুল বকতে শুরু করছিল। ঘড়ঘড় আওয়াজ করে অতি কষ্টে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল— গলার ভেতরে কোথায় যেন কী একটা ডেলা পাকিয়ে আছে।

"আমি ওঁকে বললাম, 'হে মহামান্য!' প্রতিটি কথার মাঝখানে দম নিতে-নিতে শেষকালে চিৎকার করে সে বলে উঠল, "ও, আমালিয়া লিউদ্‌ভিগোভ্‌না যে। লিদা, কোলিয়া, হাত কোমরে ঠেকা তোরা, জলদি, জলদি! তা তা থৈ থৈ! তা তা থৈ থৈ! পায়ে তাল ঠোক!... ওরে ভাব ফুটিয়ে তোল।

Du hast Diamanten und perlen...

এরপর কী? ও হ্যাঁ-

Du hast die schönsten Augen,

Mädchen, was willst du mehr?

বা, এ আবার কেমন ধারা। 'তোমার আছে মনোহরণ আঁখি' তাই কিনা, 'হে কন্যে, তোমার আবার ভাবনা কী?'— Willst du mehr — আহা, কী ভাব! মুখ্যু কোথাকার!...ও হ্যাঁ, এই যে আরও:

দাগেস্তানের দুই পাহাড়ের মাঝে, উপত্যকায়, মধ্যদিনের তাপে...

আহা, কী ভালোই না লাগত... দারুণ ভালো লাগত রে এই গীতিকাটা, পোলেন্‌কা... জানিস, তোর বাবা... তখনও আমাদের বিয়ে হয়নি... এই গানটা গাইত। ওঃ কী সব

দিন গেছে!... ঠিক এই গানটা... এই গানটা যদি গাওয়া যায়! কিন্তু কী যেন, তারপর কী যেন... যা, ভুলেই গেছি দেখছি... কে আছ, একবার মনে করিয়ে দাও না!" বলতে-বলতে সে দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল, জোর করে বসার চেষ্টা করল। তার চেহারায় ক্রমেই বেশি করে ফুটে উঠতে লাগল কেমন যেন একটা আতঙ্কের ভাব। কথার ফাঁকে-ফাঁকে ঘন-ঘন নিঃশ্বাস নিতে-নিতে, ভয়ঙ্কর, কর্কশ, ভাঙা-ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে সে গাইতে শুরু করল:

দাগেস্তানের দুই পাহাড়ের মাঝে...মধ্যদিনের... তাপে!...

বুলেট বিঁধে বুকে!...

"হে মহামান্য!" হঠাৎ বুকফাটা আর্তনাদ করে চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়ে সে বলে উঠল, "এই অনাথগুলোকে রক্ষা করুন! আমার পরলোকগত স্বামীর আতিথেয়তার কথা স্মরণ করে!... যে আতিথেয়তাকে বলা যেতে পারে রীতিমতো খানদানি!... হ্যা!" কাশির দমকে শিউরে উঠে হঠাৎ চেতনা ফিরে পেয়ে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগল সকলকে। সঙ্গে-সঙ্গে চিনতে পারল সোনিয়াকে। "সোনিয়া! সোনিয়া!" ওকে সামনে দেখতে পেয়ে যেন অবাক হয়ে সস্নেহে, দরদভরে সে বলল, "সোনিয়া, মা আমার, তুইও এখানে!"

ওকে আবার তুলে বসানো হল।

"অনেক হয়েছে!... আর নয়!... ওরে, অভাগা আমার তোরা, চলি!... এই হাড়ে আর কত টানা যায়! দম ফু-রি-য়ে গেছে!" বলতে-বলতে ক্ষোভে হতাশায় ভেঙে পড়ে কাঁদতে-কাঁদতে লুটিয়ে পড়ল বালিশের ওপর।

আবার তার সংজ্ঞা লোপ পেল, কিন্তু শেষবারের এই আচ্ছন্ন ভাবটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। নিরক্ত হলদেটে বিশুষ্ক মুখটা বালিশ থেকে সামান্য উঠিয়েই সঙ্গে-সঙ্গে চিত হয়ে পড়ে গেল, মুখ হাঁ হয়ে গেল, পা দুটো কাঁপতে-কাঁপতে টানটান হয়ে গেল। কাতেরিনা ইভানোভনা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। শেষ নিঃশ্বাস ফেলল।

সোনিয়া মৃতদেহের ওপর লুটিয়ে পড়ল, দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে তার বিশীর্ণ বুকে মাথা ঠেকিয়ে স্থির হয়ে পড়ে রইল। পোলেন্‌কা তার মা'র পায়ের কাছে পড়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে মা'র পায়ে চুমু খেল। কোলিয়া আর লিদা তখনও বুঝতে পারছিল না কী ঘটেছে, কিন্তু সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে মনে-মনে উপলব্ধি করতে পেরে ওরা এ ওর কাঁধে হাত দিয়ে একে অন্যের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ একসময় দুজনেই একসঙ্গে মুখ খুলে কাঁদতে শুরু করে দিল। দুজনেই তখনও তাদের সেই পোশাকে : একজনের মাথায় পাগড়ি, অন্যজনের মাথায় উটপাখির পালকগোঁজা টুপি।

সেই 'প্রশংসাপত্রটা' যে ঠিক সেই সময় বিছানায়, কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার কাছে কী ভাবে এলো কে জানে? বালিশের ধারে পড়ে ছিল। রাস্‌কোলনিকভের নজর এড়ায়নি।

রাস্‌কোল্‌নিকভ জানলার কাছে সরে গেল। লেবেজিয়াত্‌নিকভ্‌ ছুটে এলো তার কাছে।

"মারা গেছে!" লেবেজিয়াত্‌নিকভ বলল।

"রোদিওন রমানোভিচ, আপনার সঙ্গে দুটো ছোটখাটো দরকারি কথা ছিল," স্‌ভিদ্রিগাইলভ এগিয়ে এসে বলল। লেবেজিয়াত্‌নিকভ্‌ তৎক্ষণাৎ জায়গা ছেড়ে দিয়ে ভদ্রভাবে সরে গেল। বিস্মিত রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে স্‌ভিদ্রিগাইলভ আরও খানিকটা দূরে, ঘরের একটা কোনায় টেনে নিয়ে গেল।

"এইসমস্ত ঝামেলা, মানে অন্ত্যেষ্টি ইত্যাদির যাবতীয় দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। জানেন তো সবই টাকার ব্যাপার। আর আমি তো আপনাকে বলেইছি যে বাড়তি টাকা আমার আছে। এই দুটো কচি বাচ্চা আর এই পোলেন্‌কাকে আমি ভালো দেখে কোন অনাথ আশ্রমে রাখার ব্যবস্থা করব। ওদের প্রত্যেকের জন্য দেড় হাজার রুবল করে পুঁজি রেখে দিচ্ছি, ওরা সাবালকত্ব অর্জন করার পর পাবে। সোফিয়া সেমিওনভ্‌নাকে ওদের নিয়ে একেবারে কোন চিন্তা করতে হবে না। তাছাড়া ওকেও পাঁক থেকে টেনে তুলব— কেননা আসলে ভালো মেয়ে— তাই না? ও হ্যাঁ, আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নাকে জানিয়ে দেবেন ওঁর দশ হাজারের আমি তাহলে এভাবেই সদ্ব্যবহার করছি।"

"আপনার এই এত দাতব্যের আসল উদ্দেশ্য কী জানতে পারি কি?" রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ জিগ্‌গেস করল।

"দেখ কাণ্ড! সবেতেই আপনার অবিশ্বাস দেখছি!" স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ হাসতে-হাসতে বলল। "আমি তো বলেইছি যে ও টাকা আমার বাড়তি। নিছক মানবিক অনুভূতি থেকে যে কেউ কিছু করতে পারে এটাও স্বীকার করবেন না নাকি?" মৃত কাতেরিনা ইভানোভ্‌না কোনায় যেখানে পড়ে ছিল আঙুল দিয়ে সেদিকে দেখিয়ে সে বলল, "হাজার হোক উনি তো আর সুদখোর বুড়ির মতো 'উকুন' ছিলেন না। ভেবে দেখুন, তাহলে কি 'লুজিনকে বাঁচিয়ে রেখে তার দুষ্কর্ম চালিয়ে যেতে দেওয়া হবে, নাকি এঁকে মরতে দেওয়া হবে?' আমি যদি সাহায্য করতে এগিয়ে না আসি তাহলে পোলেন্‌কারও তাই গতি হবে... তাকেও ওইপথেই যেতে হবে..."

রাস্‌কোল্‌নিকভের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে ধূর্ত লোকের মতো মজা করে কেমন যেন *চোখ টেপার* ভঙ্গি করে কথাগুলো সে বলল। সোনিয়াকে বলা তার নিজের কথাগুলো লোকটার মুখে অবিকল শুনতে পেলে রাস্‌কোল্‌নিকভের মুখ শুকিয়ে গেল। সর্বাঙ্গ শিরশির করে উঠল। দ্রুত পিছিয়ে গিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল স্‌ভিদ্রিগাইলভের দিকে।

"আ-আপনি কী করে... জানলেন?" রুদ্ধশ্বাসে ফিসফিসিয়ে সে জিগ্‌গেস করল।

"দেখুন, আমি এই এখানে, দেয়ালের ওপাশে মাদাম রেস্‌লিখের ফ্ল্যাটে এসে

উঠেছি। এ ধারে কাপেরনাউমভ, আর ও ধারে মাদাম রেস্‌লিখ— আমার বহুকালের জানাশোনা, খুবই অনুরক্ত আমার। প্রতিবেশী।''

''আপনি?''

''হ্যাঁ।'' সর্বাঙ্গ দুলিয়ে হাসতে-হাসতে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ বলল। ''মাই ডিয়ার রোদিওন রমানোভিচ, বিশ্বাস করুন, বুকে হাত দিয়ে বলছি, আপনার সম্পর্কে আমার দারুণ আগ্রহ। আমি বলিনি আপনাকে যে আমাদের মধ্যে বনিবনা হবেই— আগেই বলেছি আপনাকে। এখন দেখুন, হল তো। আপনি দেখবেন আমি কি সহজ-সরল মানুষ। দেখবেন, আমার সঙ্গে মানিয়ে চলা খুবই সম্ভব।...''

ষষ্ঠ পর্ব

রাসকোল্‌নিকভের জীবনে এক বিচিত্র পর্যায়ের সূত্রপাত ঘটল। একরাশ কুয়াশা হঠাৎ যেন ভিড় করে এসে দুর্বিষহ নির্জনতার কারাপ্রাচীর তুলে দিল তার সামনে। সেখান থেকে তার আর মুক্তি নেই। পরে অনেক কাল পরে, জীবনের এই পর্বের কথা মনে হলে সে অনুমান করতে পারত যে তখন তার চেতনা সময়-সময় যেন ঝাপসা হয়ে যেত, কিছুকাল অন্তর-অন্তর এমন ঘটতে থাকার ফলেই শেষপর্যন্ত ঘনিয়ে আসে চরম বিপর্যয়: পরে সে নিশ্চিত বুঝতে পেরেছিল যে তখন অনেক ব্যাপারে— যেমন কোন-কোন ঘটনার সময় ও স্থিতিকাল নিয়ে— তার মনে ভুল ধারণা ছিল। অন্তত পরে মনে হতে এবং মনে পড়া ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে অন্যদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই নিজের সম্পর্কে অনেক কিছু সে জানতে পারে। যেমন, একটা ঘটনাকে সে আরেকটার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলছিল, আরেকটাকে আবার এমন এক ঘটনার পরিণতি বলে তার মনে হচ্ছিল, যার অস্তিত্ব তার নিজের কল্পনার বাইরে আর কোথাও ছিল না। কখন-কখন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলত অসুস্থ ধরনের এক পীড়াদায়ক উদ্বেগ। সেই উদ্বেগ আবার সময়-সময় বিভীষিকার আকারও ধারণ করত। কিন্তু সে এও মনে করতে পারছিল যে কখন-কখন কোন মুমূর্ষু মানুষের অসুস্থ উদাসীন অবস্থার মতো এক-একটি মুহূর্ত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন তাকেও পেয়ে বসত পরিপূর্ণ অনীহা— আগেকার সেই বিভীষিকার অনেকটা যেন বিপরীত। তবে মোটের ওপর, সম্প্রতি সে নিজেই যেন তার নিজের অবস্থার সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা সযত্নে পরিহার করে চলছিল। তার অবস্থা বিশেষভাবে অসহনীয় করে তুলেছে কিছু-কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সেগুলো বিশ্লেষণের জরুরি তাগিদ সে ভেতরে-ভেতরে অনুভব করছিল। কিন্তু এমন কিছু ঝামেলা আছে যা এড়াতে পারলে, যা থেকে অব্যাহতি পেতে পারলে সে খুবই খুশি হত। অথচ তার এখন যা অবস্থা তাতে সেগুলোকে অবহেলা করার অর্থ নিশ্চিত সর্বনাশ ডেকে আনা।

বিশেষ করে তার দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌। এমনকি স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ এখন যেন তার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। সোনিয়ার ঘরে, কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার মৃত্যুর সময় স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ যখন সুস্পষ্ট ভাষায় অতি ভয়ঙ্কর সেই কথাগুলো উচ্চারণ করে সেই মুহূর্ত থেকে রাসকোল্‌নিকভের ভাবনাচিন্তার স্বাভাবিক প্রবাহ কেমন যেন ব্যাহত হয়ে যায়। এই নতুন ঘটনাটি তাকে অত্যন্ত বিচলিত করে তুললেও তার ব্যাখ্যা খোঁজার তেমন কোন তাগিদ রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ অনুভব করল

না। কখন-কখন ঠিক কী ভাবে তা সঠিক স্মরণ করতে পারত না— হঠাৎ-হঠাৎ শহরের কোন সুদূর প্রত্যন্ত এলাকায় সস্তার কোন হোটেলে গিয়ে পড়লে সেখানে একা-একা টেবিলের ধারে বসে গভীর চিন্তায় ডুবে যেত সে। তখন আচমকা তার মনে পড়ে যেত স্‌ভিদ্রিগাইলভের কথা। লোকটার সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় একটা বোঝাপড়ায় আসা এবং সম্ভবত কোন চূড়ান্ত মীমাংসা করে ফেলা যে একান্ত দরকার এটা তার কাছে হঠাৎ বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠায় সে উদ্বেগ বোধ করতে থাকে। একবার তো হাঁটতে-হাঁটতে শহরের সীমানা ছাড়িয়ে এক জায়গায় উপস্থিত হওয়ার পর তার এমন ধারণাও হয়েছিল যে এখানে স্‌ভিদ্রিগাইলভের জন্য তার অপেক্ষা করার কথা— এখানেই তারা দেখা করবে বলে স্থির করেছিল। আরেকবার ভোরের আগে-আগে ঘুম ভেঙে যেতে দেখে সে একটা ঝোপের ভেতরে মাটিতে শুয়ে আছে। কিন্তু বুঝতে পারল না কী করে সেখানে এলো। যা হোক, কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার মৃত্যুর পর এই দু-তিন দিনের মধ্যে স্‌ভিদ্রিগাইলভের সঙ্গে তার বারদুয়েক দেখাও হয়ে গেছে— প্রায় সব বারই সোনিয়ার ঘরে। লোকটা যখন-তখন সেখানে এসে উপস্থিত হত যেন অনেকটা উদ্দেশ্যহীনভাবে এবং প্রায় প্রতিবারই মিনিটখানেকের জন্য। ওদের মধ্যে সবসময় সংক্ষিপ্ত বাক্য বিনিময় হত, কিন্তু আসল বিষয় নিয়ে কোন কথা একবারও হয়নি— দেখে মনে হত আপাতত সে-সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকাটা স্বাভাবিক বলে তারা নিজেদের মধ্যে স্থির করে নিয়েছে। কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার মৃতদেহ তখনও কফিনে শায়িত। স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ অন্ত্যেষ্টির যাবতীয় ব্যবস্থায় ব্যস্ত, সোনিয়াও তাই। রাস্‌কোল্‌নিকভের সঙ্গে শেষ যখন দেখা হয় সেই সময় স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ তাকে বলেছিল যে কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার ছেলেমেয়েদের একটা হিল্লে সে করে ফেলেছে, ভালোভাবেই করেছে। তার নিজের কিছু যোগাযোগের সূত্রে এমন কিছু ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের সাহায্যে তিনটি অনাথ শিশুকেই অবিলম্বে ভদ্রগোছের জায়গায় রাখা সম্ভব হচ্ছে। ওদের জন্য যে টাকাপয়সা আলাদা করে রেখে দেওয়া হয়েছিল তাতেও ওদের অনেকটা সাহায্য হয়, যেহেতু নিঃসম্বল অনাথদের চেয়ে যেসব অনাথের অন্তত কিছু পুঁজি আছে তাদের ব্যবস্থা করা অনেক বেশি সহজ। সোনিয়ার প্রসঙ্গেও সে কী যেন বলেছিল। নিজেই একদিন সময় করে রাসকোল্‌নিকভের কাছে আসবে বলে কথা দিয়েছিল। কথায়-কথায় বলেছিল 'শলাপরামর্শ করার ইচ্ছে আছে, এমন কতকগুলো বিষয় আছে যা নিয়ে আলোচনা করা একান্ত দরকার।...' কথাগুলো হয়েছিল সিঁড়ির সামনের চাতালে। স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ একদৃষ্টে রাস্‌কোল্‌নিকভের চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল। একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ গলা খাটো করে সে জিগ্‌গেস করল: "কিন্তু আপনার কী হয়েছে বলুন তো রোদিওন রমানোভিচ? কেমন যেন আনমনা ভাব! ঠিক বলছি কিনা? কথাবার্তা শুনছেন, এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাতও করছেন, অথচ

ভাবটা এমন যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না! বলি চাঙ্গা হয়ে উঠুন। আসুন না, কথাবার্তা বলা যাক। তবে দুর্ভাগ্যের কথা, বড্ড বেশি ঝামেলায় জড়িয়ে আছি— যেমন নিজের তেমনি অন্য লোকজনের... ওঃ রোদিওন রমানোভিচ...” হঠাৎ সে যোগ করল, “প্রত্যেক মানুষের যেটা দরকার, একান্ত দরকার তা হল মুক্ত বায়ু, খোলা হাওয়া, একটু খোলা হাওয়া।... এটাই সবচাইতে বেশি দরকার কিন্তু!”

বলতে-বলতে হঠাৎ সে সরে দাঁড়াল— একজন যাজক আর গির্জার এক কর্মচারীকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে দেখে তাদের যাবার জন্য পথ করে দিল। পরলোকগত আত্মার শান্তির জন্য ঈশ্বরের নামগান করতে যাচ্ছিলেন তাঁরা। স্‌ভিদ্রিগাইলভের নির্দেশে দিনে দুবার নিয়ম করে নাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা হয়েছিল। স্‌ভিদ্রিগাইলভ তার নিজের পথ ধরল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ একটু দাঁড়িয়ে মুহূর্তের জন্য কী যেন ভাবল, তারপর যাজকের পিছু-পিছু সোনিয়ার ঘরের দিকে পা বাড়াল।

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ দেখতে পেল ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। শান্ত, সংযত ও বিষণ্ণ পরিবেশ। মৃত্যু সম্পর্কে এবং মৃত্যুর উপস্থিতি সম্পর্কে তার আশৈশব যে ধারণা ও উপলব্ধি তা তার মনকে সবসময় ভারাক্রান্ত করত, এক বিভীষিকাময় দুর্জ্ঞেয় রহস্যে আচ্ছন্ন করে ফেলত। তাছাড়া অনেকদিন হল কারও আত্মার শান্তির জন্য নামসংকীর্তনও সে শোনেনি। এখানে আবার এমন আরও একটা কিছু ছিল যা বড় বেশি বিভীষিকাময় এবং অস্বস্তিকর। বাচ্চাগুলোর দিকে তাকাল সে। সকলে নতজানু হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে কফিনের ধারে। পোলেন্‌কা কাঁদছে। ওদের পেছনে নিঃশব্দে কেমন যেন সলজ্জভাবে কাঁদতে-কাঁদতে প্রার্থনা করছে সোনিয়া। রাস্‌কোল্‌নিকভের হঠাৎ মনে হল ‘আচ্ছা, এই কয়দিন ও তো একবারও আমার দিকে চোখ তুলে তাকায়নি, একটা কথাও আমাকে বলেনি!’ প্রখর সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে ঘরটা। কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে ধুনোর ধোঁয়া। যাজক আত্মার শান্তির জন্য স্তোত্র পাঠ করছেন। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ অনুষ্ঠানের পুরো সময়টা একঠায় দাঁড়িয়ে রইল। সকলকে আশীর্বাদ করে বিদায় নেবার সময় যাজক কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। অনুষ্ঠানপর্ব সাঙ্গ হলে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ এগিয়ে গেল সোনিয়ার দিকে। সোনিয়া হঠাৎ ওর দুটো হাত চেপে ধরে মাথা নুইয়ে ওর কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ল। ক্ষণিকের এই ভঙ্গিটি রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে বিস্মিত ও বিভ্রান্ত করল। কী অদ্ভুত। এতটুকু বিরাগ নেই, এতটুক বিতৃষ্ণা নেই তার প্রতি, এমনকি হাত পর্যন্ত এতটুকু কাঁপছে না!—এ কী করে সম্ভব? এ যে চরম আত্ম অবমাননা! ওর নিজের তো অন্তত তাই মনে হচ্ছে। সোনিয়া কোন কথা বলল না। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ ওর হাতে চাপ দিল, বিদায় নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ভীষণ খারাপ লাগছিল তার। এইমুহূর্তে যদি কোথাও

চলে গিয়ে একেবারে একা-একা থাকা যেত—এমনকি যদি সারাজীবনের জন্যও থাকতে হত—তাহলে সে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করত। কিন্তু ঘটনা এই যে আজকাল যদিও সে প্রায় সর্বক্ষণ একা-একাই থাকে, তবু সে যে একা সেটা কিছুতেই সে উপলব্ধি করতে পারছিল না। একেক সময় হাঁটতে-হাঁটতে সে শহর ছাড়িয়ে চলে যায় বড় সড়কের ওপরে। এমনকি একবার তো ছোটখাটো একটা বনের ভেতরেই ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু জায়গা যত বেশি নির্জন ততই যেন বেশি করে মনে হয় ধারেকাছে এমন কেউ আছে যার উপস্থিতি তার কাছে অস্বস্তিকর। সে উপস্থিতি ভীতিকর ততটা নয়, যতটা অপ্রীতিকর। এতই অপ্রীতিকর যে সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শহরে ফিরে আসত, ভিড়ের মধ্যে মিশে যেত, কোন সস্তার হোটেলে বা শুঁড়িখানায় গিয়ে ঢুকত, হাটে-বাজারে, দোকানপাটের এলাকায় ঘুরে বেড়াত। তখন সেখানেই সে যেন খানিকটা স্বস্তি পেত, এমনকি নিজেকে অনেক বেশি একাকী মনে করতে পারত। একটা খাবারের দোকানে সন্ধ্যাব আগে-আগে গান হচ্ছিল। পুরো এক ঘণ্টা সেখানে বসে সে গান শুনল। মনে আছে, বেশ ভালোই লাগছিল। কিন্তু শেষের দিকে আবার কেমন যেন একটা অস্বস্তির ভাব হঠাৎ তাকে পেয়ে বসল। হঠাৎই সে যেন অনুভব করতে লাগল বিবেকের দংশন। 'দিব্যি বসে-বসে গান শুনছি। কিন্তু এটা কি আমার মানায়?' সে ভাবল। অবশ্য সঙ্গে-সঙ্গে এও অনুভব করল যে এটাই তার অস্বস্তির একমাত্র কারণ নয়। আরও এমন একটা কিছু আছে যার এই মুহূর্তে সমাধান কাম্য। কিন্তু ভাবনার যেমন কোন নির্দিষ্ট আকার সে দিতে পারছিল না, তেমনি ভাষাতেও খুঁজে পাচ্ছিল না তার প্রকাশ। সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। 'নাঃ, এর চেয়ে লড়াই অনেক ভালো। বরং হোক তা আবার পর্‌ফিরির সঙ্গে...নয়ত স্‌ভিদ্রিগাইলভের সঙ্গে! ...যত তাড়াতাড়ি হয় আসুক আবার সামনে লড়াইয়ের ডাক অথবা কারও দিক থেকে কোন আক্রমণ! ... হোক, তাই হোক!' সে মনে-মনে ভাবল। দুনিয়া আর মা'র সম্পর্কে চিন্তা হঠাৎ কেন যেন তার মনে নিদারুণ আতঙ্ক সঞ্চার করল। খাবারের দোকান থেকে বেরিয়ে সে প্রায় ছুটতে শুরু করল। ...ঠিক সেই রাতেই, সকালের আগে ঘুম ভেঙে যেতে সে দেখল যে শুয়ে আছে ক্রেস্তোভ্‌স্কি দ্বীপ এলাকার একটা ঝোপের মধ্যে। তার সর্বাঙ্গ জ্বরের তাড়নায় থরথর করে কাঁপছে। সে বাড়ির দিকে রওনা দিল। বাড়ি যখন ফিরল তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। কয়েক ঘণ্টা ঘুমানোর পর জ্বরজ্বর ভাবটা কেটে গেল। কিন্তু ঘুম ভাঙল বেশ বেলায়—দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে— বেলা দুটোয়।

তার মনে পড়ে গেল আজই কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে বলে ধার্য হয়েছিল। তাকে যে সেখানে থাকতে হল না এই ভেবে তার আনন্দ হল। নাস্তাসিয়া ওর জন্য খাবার নিয়ে এসেছিল। খাবার আর চা সে খেল পরম তৃপ্তির

সঙ্গে। খেল বলতে গেলে গোগ্রাসে। তার মাথা এখন অনেকটা পরিষ্কার, মনও গত তিন দিনের তুলনায় অনেক শান্ত। এমনকি এর আগে যে বিভীষিকার জোয়ার তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তা ভেবে সে ক্ষণিকের জন্য অবাকও হল। এমন সময় ঘরের দরজা খুলে গেল। ভেতরে এসে ঢুকল রাজুমিখিন।

"বাঃ দিব্যি খাওয়া হচ্ছে! তার মানে, অসুস্থ নয়!" বলতে-বলতে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে টেবিলে রাস্কোল্নিকভের মুখোমুখি সে বসে পড়ল। তাকে বিচলিত দেখাচ্ছিল। সে-ভাবটা লুকানোর কোন চেষ্টাও তার দেখা গেল না। কোন ব্যস্ততা প্রকাশ না করলেও, গলা তেমন না চড়ালেও তার কথার মধ্যে বিরক্তির ভাব কিন্তু বেশ স্পষ্ট। দেখে মনে হতে পারে কোন বিশেষ, এমনকি নিগূঢ় কোন অভিসন্ধি তার আছে। বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে সে বলতে শুরু করল, "ওহে, চুলোয় যাও তোমরা! নিকুচি করেছি তোমাদের সকলের! তবে আমি এখন যা দেখতে পাচ্ছি তা থেকে একটা জিনিস আমার কাছে স্পষ্ট—মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা আমার সাধ্যের বাইরে! দোহাই তোমার, তাই বলে ভেবে বোসো না যে আমি তোমাকে জেরা করতে এসেছি। আমার বয়ে গেছে! নিজেরই ইচ্ছে নয়। এখন যদি নিজে থেকে প্রকাশ কর তোমাদের যত গোপন রহস্য, তবু হয়ত আমি শুনতে যাব না — থুতু ফেলে চলে যাব। আমি এসেছি ব্যক্তিগতভাবে এবং শেষবারের মতো শুধু জানতে প্রথমত, লোকে যে বলে তুমি পাগল তা সত্যি কিনা। দেখ, তোমার সম্পর্কে লোকসমাজে...ওই কোন-কোন মহলে আর কি...একটা ধারণা প্রচলিত আছে: তুমি নাকি পাগল, অথবা পাগলামির একটা প্রবণতা তোমার মধ্যে পুরোমাত্রায় আছে। স্বীকার করতে বাধা নেই যে আমি নিজেও এই বিশ্বাসের জোর সমর্থক হয়ে পড়েছিলাম, প্রথমত তোমার মূর্খামির পরিচয় পেয়ে এবং অংশত তোমার এমন বেশ কিছু নোংরা আচরণ থেকে, যার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। দ্বিতীয়ত মা এবং বোনের সঙ্গে এই কয়েকদিন আগে তুমি যে দুর্ব্যবহার করেছ তা দেখে। তুমি যা করেছ পাগল না হলে একমাত্র পাষণ্ড আর ইতরের পক্ষেই তা করা সম্ভব। ফলে দাঁড়াচ্ছে এই যে তুমি উন্মাদ।..."

"ওদের সঙ্গে কবে তোমার শেষ দেখা হয়েছিল?"

"এইমাত্র। তুমি তারপর থেকে আর দেখা করতে যাওনি তো? কোথায় তুমি ঘুরে বেড়াও দয়া করে বলবে কি? আমি এর মধ্যে তিনবার তোমার এখানে এসে ফিরে গেছি। গতকাল থেকে তোমার মা গুরুতর অসুস্থ। তোমার এখানে আসার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। তোমার বোন আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোন কথাই উনি কানে তুলতে চাইলেন না। বললেন 'ও যদি অসুস্থ হয়ে থাকে, যদি ওর মাথার গোলমালই হয়ে থাকে তাহলে মা না দেখলে কেই বা দেখবে ওকে?' আমরা সবাই মিলে এখানে এলাম, কেননা তাই বলে তো ওঁকে

একা ছেড়ে দিতে পারি না আমরা। তোমার ঘরের দরজা পর্যন্ত সারাটা রাস্তা ওঁকে সান্ত্বনা দিতে-দিতে এসেছি আমরা। এসে দেখি তুমি বেপাত্তা। এই এখানটায় উনি বসে ছিলেন। মিনিট দশেক বসলেন। আমরা দুজনে ওঁর ওপর ঝুঁকে পড়ে দাঁড়িয়ে রইলাম চুপচাপ। শেষকালে উঠে দাঁড়িয়ে উনি বললেন, 'বাইরে যখন বেরিয়েছে তখন বলতে হবে সুস্থ আছে, কিন্তু মাকে ভুলে গেছে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভিখিরির মতো স্নেহমমতা ভিক্ষে করা মার পক্ষে শোভা পায় না, লজ্জাজনক।' বাড়ি ফিরে গিয়ে শয্যা নিলেন। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। বলছেন 'দেখা যাচ্ছে *নিজের লোকের* জন্য ওর সময় আছে।' *নিজের লোক* বলতে আসলে বোঝাতে চাইছেন সোফিয়া সেমিওনভ্‌নাকে— তোমার ভাবী বধূ না প্রেমিকা— কে তা জানি নে বাপু। আমিও আর দেরি না করে চলে গেলাম সোফিয়া সেমিওনভ্‌নার কাছে, কেননা ভাই, ভাবলাম সবটা খোলসা হয়ে যাওয়া ভালো। এসে দেখি কফিন, তাকে ঘিরে ছেলেমেয়েরা কান্নাকাটি করছে। সোফিয়া সেমিওনভ্‌না শোকের পোশাক ওদের গায়ে মেপে দেখছেন। তুমি সেখানে নেই। এই দৃশ্য দেখে ক্ষমা চেয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নাকে ঘটনাটা জানলাম। তার মানে, যত বাজে কথা। ওখানে তোমার *নিজের* বলে কেউ নেই। অর্থাৎ, তুমি যে পাগল এই সম্ভাবনাটাই বেশি করে প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু এই তো দেখছি তুমি দিব্যি বসে-বসে গবগব করে সেদ্ধ মাংস খাচ্ছ— দেখে মনে হচ্ছে তিন দিন ধরে পেটে কিছু পড়েনি। ধরলাম না হয় পাগলেও তো খায়, তুমি আমার সঙ্গে এ পর্যন্ত একটি কথাও না বললে কী হবে, তুমি কিন্তু... পাগল নও বাপু! আমি হলফ করে বলতে পারি, আর যা-ই হও, পাগল নও। তা জাহান্নমে যাও তোমরা সবাই! এখানে কোন গোপন রহস্য আছে, গোপন একটা কিছু আছে। কিন্তু তোমাদের এই রহস্য ভেদ করার জন্য মাথা ঘামানোর সাধ আমার নেই। আমার এখানে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য তোমাকে চুটিয়ে গালাগাল করা", উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে সে বলল, "গালাগাল দিয়ে মনের ভার হালকা করা। আমি জানি এখন আমার কী করা উচিত।"

"কী তুমি করতে চাও এখন?"

"আমি কী করতে চাই না চাই তোমার তাতে কী?"

"দেখো, বেশি পরিমাণে মদ গিলে বোসো না আবার!"

"তুমি...তুমি কী করে জানলে?"

"হুঃ, এ আবার একটা কথা হল।"

রাজুমিখিন মিনিটখানেক গুম হয়ে রইল।

"বিচারবুদ্ধি বরাবরই তোমার বেশ ধারাল ছিল, উম্মাদ তুমি কস্মিনকালেও ছিলে না, আদৌ ছিলে না," হঠাৎ সে উত্তেজিত হয়ে বলল। "ঠিক ধরেছ। আমি আকণ্ঠ মদ গিলব। চলি!" রাজুমিখিন ঘর ছেড়ে বের হওয়ার জন্য পা বাড়াল।

"আমি তোমার কথা বোনকে বলেছিলাম, রাজুমিখিন—খুব সম্ভব এই গত পরশুই হবে।"

"আমার কথা। অ্যাঁ...পরশুদিন আবার তোমার সঙ্গে ওঁর কোথায় দেখা হল?" বলতে-বলতে হঠাৎ থেমে গেল রাজুমিখিন। এমনকি তার মুখ সামান্য ফেকাসে হয়ে গেল। দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল উত্তেজনায় তার বুক দুরদুর করছে।

"ও এখানে এসেছিল, একা। এখানে বসেছিল। আমার সঙ্গে কথা বলে গেছে।"

"তাই!"

"হ্যাঁ, তাই।"

"তুমি কী বললে?...আমি জানতে চাই, আমার সম্পর্কে কী কথা হল?"

"আমি ওকে বললাম তুমি খুব ভালো লোক, সৎ আর উদ্যোগী। তুমি যে ওকে ভালোবাস সে কথা আমি আর ওকে বলিনি, কেননা ও নিজেও তা জানে।"

"নিজে জানে?"

"তা আর বলতে। আমি যেখানেই যাই না কেন, আমার ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন, তুমি ওদের সঙ্গে থাকবে, ওদের দেখাশোনা করবে। বলতে পার আমি ওদের তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। আমি একথা বলছি, কেননা আমি বেশ ভালোভাবেই জানি তুমি ওকে কত ভালোবাস। আমি নিশ্চিত জানি যে তোমার মনটা খাঁটি। এও জানি যে ও তোমাকে ভালোবাসতে পারে, এমনকি ইতিমধ্যেই হয়ত তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছে। এখন নিজে মনস্থির করে যা ভালো বোঝ কর— ভেবে দেখ, আকণ্ঠ মদ গেলা তোমার পক্ষে ঠিক হবে কিনা।"

"রোদিয়া... দেখ...কিন্তু...ওঃ, সে যাক গে। কিন্তু তুমি কোথায় যাবার মতলব করছ? দেখ, ব্যাপারটা যদি গোপনীয় হয় তাহলে তাই থাক। তবে আমি...আমি রহস্য ঠিকই ভেদ করব।...আমার দৃঢ় বিশ্বাস কারণটা একদম বাজে, বিদঘুটে অর্থহীন কিছু এবং সবটাই তোমার একার উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত। যাহোক, তুমি একটা দারুণ ভালো লোক। দারুণ ভালো।"

"আমি আসলে আরও একটা কথা যোগ করতে যাচ্ছিলাম, তুমি তাতে বাধা দিলে। এই খানিকক্ষণ আগে গোপনীয়তা ও রহস্য জানতে যাবে না বলে তুমি যে স্থির করেছিলে সেটা বেশ ভালো বলতে হবে। কিছুকালের জন্য ছেড়ে দাও ওসব চেষ্টা। কোন চিন্তা কোরো না এই নিয়ে। যথা সময়ে, অর্থাৎ যখন দরকার হবে, সব জানতে পারবে। গতকাল আমাকে একজন বলল মানুষের দরকার মুক্ত বায়ু, খোলা হাওয়া, একটু খোলা হাওয়া। আমি এখন সেই লোকটার কাছে যেতে চাই, গিয়ে জানতে চাই তার এই কথার কী তাৎপর্য।"

উত্তেজিত রাজুমিখিন অন্যমনস্কভাবে কী যেন ভাবতে লাগল।

'কোন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছে। না হয়ে যায় না। কোন একটা চূড়ান্ত

সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। নির্ঘাত তাই! এছাড়া আর কিছু হতে পারে না! এবং...এবং দুনিয়াও জানে...' হঠাৎ মনে-মনে সে বলল।

"তাহলে তোমার বোন তোমার কাছে আসেন বলছ", সাবধানে ভেঙে-ভেঙে শব্দ উচ্চারণ করে সে বলল, "আর তুমি সেই লোকটার সঙ্গে কথা বলতে চাও যে বলে মুক্ত বায়ু চাই, আরও বেশি করে খোলা হাওয়া চাই...তার মানে, বলতে হয় এই চিঠিটা... সেটারও ওই একই উৎস," অনেকটা যেন আপন মনেই সে তার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করল।

" কোন্ চিঠি?"

"আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না আজ একটা চিঠি পেয়েছেন। তাইতে উনি খুব চিন্তিত। খুবই। এমনকি বড় বেশি মাত্রায়। আমি প্রসঙ্গত তোমার কথা বলতে শুরু করলে উনি আমাকে চুপ করতে বললেন। তারপর...তারপর বললেন, হয়ত আমাদের মধ্যেও খুব শিগ্‌গির ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। তারপর কিসের জন্যে যেন উনি আমাকে বারবার উচ্ছ্বসিত হয়ে ধন্যবাদ জানাতে লাগলেন। শেষকালে ভেতরের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সেখানেই বসে থাকলেন।

"ও চিঠি পেয়েছে বলছ?" অন্যমনস্কভাবে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ জিগ্‌গেস করল।

"হ্যাঁ, একটা চিঠি পেয়েছে। তুমি কি জানতে না? হুম্!"

দুজনেই চুপ।

"চলি রোদিয়া। আমি, ভাই...এমন একটা সময় ছিল...যা হোক, চলি। দেখ একটা সময় ছিল যখন...আচ্ছা চলি। আমারও হাতে আর সময় নেই। মদ আমি খাব না। এখন আর দরকার নেই। তবে তুমি মিথ্যে কথা বলছ।"

সে ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে পড়ল। কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা ভেজিয়ে চলে যেতে না যেতে হঠাৎ আবার দরজা খুলে ঘরের একপাশে কোথায় যেন দৃষ্টিপাত করে বলল:

"ভালো কথা। সেই খুনের ঘটনাটা মনে আছে তো? সেই যে পরিফিরি আর সেই বুড়ি? তা শুনে রাখ, খুনির সন্ধান পাওয়া গেছে, সে নিজে মুখে স্বীকার করেছে, সাক্ষ্যপ্রমাণ সব দিয়েছে। ভাবতে পার, কে? সেই দুই রঙের মিস্তিরির একজন। তোমার মনে আছে বোধহয়, আমি ওদের পক্ষ নিয়ে এখানে জোর ওকালতি করেছিলাম? ধারণা করতে পার মারপিটের পুরো দৃশ্যটা, যখন ওই ওরা— দারোয়ান আর দুই প্রত্যক্ষদর্শী সিঁড়ি দিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় সিঁড়িতে বন্ধুর সঙ্গে হাসাহাসি— সবটা ওর সাজান, ফাঁকিবাজি। ওরকম একটা পুঁচকে কুকুরের বাচ্চার পেটে-পেটে কত প্যাঁচ আর কী উপস্থিত বুদ্ধি দেখ! বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু দেখ, নিজে সব বলেছে, নিজের মুখে স্বীকার করেছে! কী/ভুলই না আমি করেছিলাম! তবে যাই বল, আমার মতে উপস্থিত বুদ্ধি আর চাতুরির যে পরিচয় দিয়েছে— তাতে ওকে

প্রতিভাবান বলে মানতেই হবে। আইনের চোখকে ফাঁকি দেবার ব্যাপারে ও রীতিমতো প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে— তার মানে, এতে অবাক হওয়ার বিশেষ কারণ থাকছে না। এ ধরনের লোক কি আর থাকতে পারে না? আর ও যে মনোবল টিকিয়ে রাখতে না পেরে শেষপর্যন্ত কবুল করে ফেলল তাইতে আরও বেশি বিশ্বাস হচ্ছে। এর ফলে ব্যাপারটা আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।... কী ভুলই না আমি তখন করেছিলাম। ওদের হয়ে তখন আমি কীই না বলেছি!"

"আচ্ছা, এত সব তুমি জানলে কোত্থেকে আর কেনই বা এতে তোমার এত আগ্রহ বলতে পার?" রাস্‌কোল্‌নিকভের প্রশ্নের মধ্যে উত্তেজনার ভাব চাপা থাকল না।

"এ আবার একটা কথা হল। আমার কেন আগ্রহ? কী প্রশ্ন। যাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি পর্‌ফিরি তাদের একজন। অবশ্য হ্যাঁ, বলতে গেলে প্রায় সবটা ওর কাছ থেকেই জানা।"

"পর্‌ফিরির কাছ থেকে?"

"তা নয়ত কী?"

"তা কী বলল?... কী বলল সে?" ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করল রাসকোল্‌নিকভ্‌।

"ও খুব স্পষ্ট ভাষায় আমাকে বুঝিয়ে দিল, ওর নিজস্ব ধরনে, মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝাল।"

"ব্যাখ্যা করল? নিজে ব্যাখ্যা করে বোঝাল তোমাকে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিজেই। চলি! পরে সময় পেলে আরও কিছু বলা যাবে। কিন্তু এখন একটা কাজ আছে। একসময়... এমন একটা সময় ছিল যখন আমি ভেবেছিলাম... যাক গে, ওসব পরে হবে। ...এখন আমি মদ খেতে যাব কোন্‌ দুঃখে? তুমি আমাকে মদ ছাড়াই মাতাল করে দিয়েছ হে। আমি কিন্তু এখন বদ্ধ মাতাল, রোদিয়া। মদ না খেয়ে মাতাল। যাক, চলি! খুব শিগগিরই আসব একবার।"

রাজুমিখিন বেরিয়ে পড়ল।

'কোন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছে নির্ঘাত। না হয়ে যায় না!' ধীরে-ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করল রাজুমিখিন। 'বোনটাকেও জড়িয়েছে। আর আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার যা স্বভাব তাতে এটা সম্ভব, খুবই সম্ভব। ওদের মধ্যে দেখা হয়েছিল তা হলে!... হ্যাঁ, তাইতো, সেও তো আমায় এরকম একটা ইঙ্গিত দিয়েছিল! আভ্‌দোতিয়ার অনেক কথা... টুকরো-টাকরা কথা...আর নানা ইঙ্গিত থেকে দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা ঠিকই তাই। তাছাড়া আর কী ভাবেই বা ব্যাখ্যা করা যায় এসব তালগোলের? হুম্‌। এদিকে আমি তো প্রায় ভেবে বসেছিলাম... ধুত্তোর! এ আবার কি উদ্ভট ভাবনা ভাবতে বসেছিলাম! হ্যাঁ, আমার মাথাটা গুলিয়ে গিয়েছিল, আমি ওর কাছে অপরাধী। সেই যে তখন করিডরে বাতির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, তখনই আমার মাথাটা গুলিয়ে দেয়। ছি! আমার দিক থেকে এ কি কুৎসিত, নোংরা, জঘন্য চিন্তা।

সাবাস বলতে হয় রঙের মিস্তিরি নিকোলাইকে— শেষ অবধি কবুল করেছে!... এর ফলে আর সবের মতো আগেকার সমস্ত কিছুরও পরিষ্কার ব্যাখ্যা মিলছে! ওর তখনকার সেই অসুস্থতা, ওর, সব 'অদ্ভুত-অদ্ভুত' আচার-আচরণ, এমনকি আগেও, আগে যখন সে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করত তখনও সর্বক্ষণ যেরকম বিষণ্ণ হয়ে, মুখ গোমড়া করে চলাফেরা করত... কিন্তু ওই চিঠিটার অর্থ তাহলে এখন কী হতে পারে? ওটাও সম্ভবত একেবারে ফেলনা নয়। চিঠিটা কার লেখা? আমার সন্দেহ... হুম্! না, এসব আমাকে খোঁজখবর নিয়ে জানতে হবে।'

দুনিয়ার কথা মনে পড়ে যেতে এবং তার সম্পর্কে যাবতীয় চিন্তা মনের মধ্যে আন্দোলন করতে গিয়ে রাজুমিখিনের বুকটা কেমন যেন দমে গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে জায়গা ছেড়ে ছুট মারল।

রাজুমিখিন চলে যাওয়ামাত্র রাস্কোল্নিকভ্ উঠে দাঁড়িয়ে জানলার দিকে ঘুরে গেল, ছটফট করতে গিয়ে একবার এক কোনায় আরেকবার আরেক কোনায় যেভাবে বাধা পেল তাতে মনে হল তার খোঁড়লটা যে কত সঙ্কীর্ণ তা যেনে সে ভুলে বসে আছে।... আবার সোফায় গিয়ে বসল। এখন যেন তার ধড়ে আবার প্রাণ ফিরে এলো। সামনে আবার লড়াই— তার মানে উদ্ধারের পথ পাওয়া গেছে!

হ্যাঁ, তাহলে উদ্ধারের পথ পাওয়া গেছে! তা নইলে এতদিন সব কিছু চাপা আর শ্বাসরোধী হয়ে তাকে পিষে মেরে ফেলছিল, সে যেন ছিল একটা ঘোরের মধ্যে। পরফিরির ঘরে নিকোলাইকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছিল ঠিক তারপর থেকেই উদ্ধারের কোন পথ দেখতে না পেয়ে বদ্ধ অবস্থার মধ্যে তার যেন দম আটকে আসছিল। নিকোলাইয়ের ঘটনার পর ওইদিনই সোনিয়ার ঘরের সেই ঘটনা। আগে ঠিক যেমন ভেবে রেখেছিল সেভাবে ব্যবস্থা করতে এবং পরিসমাপ্তি ঘটাতে আদৌ সে পারেনি... ফলে সে দুর্বল হয়ে পড়ে, তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে, এক নিমেষে। কিন্তু তখন সোনিয়ার সঙ্গে সে তো একমত হয়েছিল, মনে-প্রাণে মেনে নিয়েছিল যে তার একার পক্ষে মনের ওপর এতবড় একটা বোঝা নিয়ে জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। আর স্ভিদ্রিগাইলভ্? স্ভিদ্রিগাইলভ্ একটা প্রহেলিকা।...এটা ঠিক যে স্ভিদ্রিগাইলভ্ তাকে ভাবিয়ে তুলেছে, কিন্তু সেখানে কারণটা অন্য ধরনের। হয়ত স্ভিদ্রিগাইলভের সঙ্গেও তার লড়াই সামনে পড়ে আছে, হয়ত সেটাও উদ্ধারের একটা উপায়। কিন্তু পর্‌ফিরি... পর্‌ফিরির সঙ্গে ব্যাপারটা একেবারে আলাদা।

তা পর্‌ফিরি নিজেও ব্যাখ্যা করে রাজুমিখিনকে বলেছে, *মনস্তাত্ত্বিক* ব্যাখ্যা দিয়েছে তাকে। আবার ওর সেই বস্তাপচা মনস্তত্ত্ব টেনে আনতে শুরু করেছে এর মধ্যে। কিন্তু পর্‌ফিরি? নিকোলাইয়ের আবির্ভাবের আগে ওইসময় ওদের দুজনের মধ্যে সামনাসামনি যা ঘটে গেছে তারপর... যার *একটা* বৈ আর কোন সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর... সেই দৃশ্যের পর অন্তত একমুহূর্তের জন্য হলেও পর্‌ফিরি কী ভাবে

বিশ্বাস করতে পারে যে নিকোলাই অপরাধী! গত কয়েকদিন ধরে পর্‌ফিরির সঙ্গে ওই ঘটনার সমস্ত দৃশ্য খণ্ড খণ্ড আকারে বেশ কয়েকবার তার স্মৃতিতে হানা দিচ্ছিল। সামগ্রিকভাবে ওই ঘটনার স্মৃতিচারণ তার পক্ষে অসহনীয়। ওইসময় তাদের দুজনের মধ্যে এমন সব কথা হয়েছিল, এমন সমস্ত ভাবভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছিল, এমন ধরনের দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল, কোন-কোন কথা এমন ভঙ্গিতে বলা হয়েছিল এবং সব কিছু সামগ্রিকভাবে এমন এক গ্রামে গিয়ে পৌঁছেছিল যে তারপর কোন নিকোলাইয়ের সাধ্য নেই... যে নিকোলাইয়ের মনের কথা তার মুখের কথা পড়তে না পড়তে পর্‌ফিরি ধরে ফেলে ... তার সাধ্য নেই যে পর্‌ফিরির বিশ্বাসের ভিত্তি এতটুকু টলাতে পারে!

বোঝ কাণ্ড! রাজুমিখিন পর্যন্ত সন্দেহ করতে শুরু করেছে। করিডরে, বাতির কাছের সেই দৃশ্যটিও তাহলে নজর এড়ায়নি।... তখন সে পর্‌ফিরির কাছে ছুটে গিয়েছিল।... কিন্তু তাকে এভাবে বোকা বানিয়ে পর্‌ফিরির কী লাভ? রাজুমিখিনের দৃষ্টি নিকোলাইয়ের দিকে সরানোর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে তার? না, ও নির্ঘাত মনে-মনে কিছু একটা ফন্দি এঁটেছিল। কোন একটা উদ্দেশ্য ওর আছে। কিন্তু কী সেটা? অবশ্য এটা ঠিক যে সেই সকালের পর থেকে অনেকটা সময় চলে গেছে— বড় বেশি দীর্ঘ সময়ই অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু পর্‌ফিরির কাছ থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। লক্ষণটা অবশ্য আরও খারাপ বলতে হবে।... রাসকোল্‌নিকভ্ টুপি তুলে নিয়ে চিন্তিতভাবে দরজার দিকে পা বাড়াল। এতদিনের মধ্যে আজই প্রথম সে অন্তত মনেপ্রাণে সুস্থ বোধ করছিল। মনে-মনে ভাবল: 'না, স্‌ভিদ্রিগাইলভের সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার। যে কোন উপায়েই হোক, সেটা যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই ভালো। এই লোকটাও মনে হয় অপেক্ষা করে আছে কখন আমি নিজে থেকে ওর কাছে যাই।' ঠিক সেই মুহূর্তে তার ভাঙা বুক ভেদ করে হঠাৎ এত প্রচণ্ড ঘৃণা উঠে এলো যে তখন হয়ত স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ বা পর্‌ফিরি এদের দুজনের যে কাউকে হাতের কাছে পেলে খুন করতে সে দ্বিধা করত না। অন্তত সে উপলব্ধি করতে পারল যে এখন যদি নাও হয়, পরে কোন একসময় এ কাজটা করার মতো সামর্থ্য তার আছে। 'দেখা যাবে, দেখা যাবে,' সে মনে-মনে আওড়াল।

কিন্তু সামনের দরজাটা খুলতে না খুলতে খোদ পর্‌ফিরির সঙ্গেই তার মুখোমুখি ধাক্কা লাগার উপক্রম হল। রাস্‌কোল্‌নিকভের কাছে আসছিল সে। রাসকোল্‌নিকভ্ মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত। কিন্তু সে ওই মুহূর্তের জন্যই। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে পর্‌ফিরিকে দেখে খুব একটা অবাক সে হয়নি, ভয়ও তেমন পায়নি। শুধু চমকে উঠল, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে, চটপট সামলে উঠে প্রস্তুতি নিল। 'হয়ত ঘটনার জট চূড়ান্তভাবে খুলতে শুরু করে দিয়েছি! কিন্তু ও যে এরকম বেড়ালের মতো পা টিপে-টিপে নিঃশব্দ এগিয়ে এলো এবং আমি কিছুই শুনতে পেলাম না এটা কী ব্যাপার? তাহলে কি আড়ি পেতে ছিল?'

"অতিথির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না তো রোদিওন রমানোভিচ," হাসতে-হাসতে গলা ছেড়ে পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ বলল। "অনেকদিন হল আসব-আসব ভাবছিলাম। পাশ দিয়ে যেতে-যেতে ভাবলাম মিনিটপাঁচেকের জন্য একবার দেখা করে যাই না কেন। কোথাও বেরোচ্ছিলেন বুঝি? বেশিক্ষণ ধরে রাখব না। কেবল এই একটা সিগারেট—আপনি যদি অনুমতি করেন।"

"বসুন পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ, বসুন," রাস্‌কোল্‌নিকভ বাইরে এমন খুশি খুশি ও বন্ধুত্বের ভাব দেখিয়ে তার অতিথিকে বসার জন্য চেয়ার এগিয়ে দিল যে নিজেকে নিজে দেখার কোন সুযোগ যদি তার থাকত তাহলে সত্যি বলতে গেলে কি সে রীতিমতো অবাকই হয়ে যেত। শেষমাত্রা পূর্ণ হতে চলেছে! অনেক সময় এমন হয় যে কোন ঠগীর হাতে পড়ে মানুষ হয়ত আধঘণ্টা ধরে যম যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে, কিন্তু ঠগী যখন শেষপর্যন্ত তার গলায় ছুরি ঠেকায় তখন সঙ্গে-সঙ্গে কোথায় চলে যায় তার সেই ভয়! রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ সোজা পরফিরির মুখোমুখি বসল, নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। পর্‌ফিরি চোখ কুঁচকে সিগারেট ধরাল।

'বল, কী বলার আছে বল,' রাসকোল্‌নিকভের বুক ভেদ করে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছিল। 'কী হল? কিছু বলছ না যে!'

দুই

"ওঃ এই সিগারেট হয়েছে এক জ্বালা!" সিগারেট ধরানোর পর দম ছেড়ে পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ অবশেষে বলল। "ক্ষতিকর, রীতিমতো ক্ষতিকর, অথচ ছাড়তে পারছি না! কাশি হয়, গলা খুশখুশ করে, দম বন্ধ হয়ে আসে। জানেন, আমি আসলে ভীতু। এই সেদিন গিয়েছিলাম একজন বড় স্পেশালিস্টকে দেখাতে। একেকজন রোগীকে দেখার পেছনে উনি মিনিমাম আধঘণ্টা করে সময় দেন। আমাকে দেখে তো উনি হেসেই অস্থির। টোকা দিলেন, কান পেতে শুনলেন। বললেন, 'তামাক কিন্তু আপনার মোটে চলবে না। আপনার ফুসফুসের অবস্থা খারাপ।' কিন্তু ছাড়ি কী করে? কী দিয়ে বদল করব? মদ আমি খাই না— সেখানেই তো বিপদ! হাঃ হাঃ হাঃ, মদ খাই না বলেই বিপদ! আসলে সবটা আপেক্ষিক রোদিওন রমানোভিচ, সবই আপেক্ষিক, বুঝলেন!"

'মতলবটা কী? সেই ওর পুরানো বাঁধা গৎ শুরু করে দিল নাকি?' মনে-মনে দারুণ বিরক্ত হল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌। তার স্মৃতিতে সঙ্গে-সঙ্গে জেগে উঠল তাদের শেষ সাক্ষাতের পুরো দৃশ্যটা, আবার তার বুকের মধ্যে খেলে গেল তখনকার সেই উপলব্ধির প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস।

"আমি কিন্তু গত পরশু দিনই সন্ধেবেলায় আপনার কাছে এসেছিলাম। আপনি জানেন না তো?" ঘরের চারপাশে দৃষ্টি বুলাতে-বুলাতে পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ বলল।

"আপনার এই ঘরেই ঢুকেছিলাম। আজকের মতো সেদিনও পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। যেতে-যেতে ভাবলাম, যাই একবার আপনাকে অন্তত দর্শন দিয়ে আসি। দেখি দরজা হাঁ করে খোলা। চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম, একটু অপেক্ষা করলাম। কিন্তু আপনার চাকরানীকে কিছু না জানিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। দরজা তালাবন্ধ করেন না নাকি?"

রাস্‌কোল্‌নিকভের মুখ উত্তরোত্তর বেশি কালো হয়ে উঠল। পর্‌ফিরি তার মনোভাব ঠিক আন্দাজ করতে পারল।

"আপনার কাছে একটা কৈফিয়ত দিতে চাই বন্ধু, রোদিওন রমানোভিচ। এইজন্যেই আসা। আপনার কাছে কৈফিয়ত দেওয়া আমার কর্তব্য, কৈফিয়ত দিতে আমি বাধ্য," মুচকি হেসে সে বলল। 'এমনকি বলতে-বলতে রাস্‌কোল্‌নিকভের হাঁটুতে মৃদু চাপড়ও মারল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে তার মুখে গম্ভীর ভাব ও উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠল। এমনকি সেখানে অনেকটা বিষণ্ণতার আভাস দেখতে পেয়ে রাসকোল্‌নিকভ্ অবাক হয়ে গেল। তার এই চেহারা এর আগে সে কখনও দেখেনি। এমন চেহারা যে তার কখনও হতে পারে তা রাস্‌কোল্‌নিকভ্ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। পর্‌ফিরি বলে চলল, "শেষবার আমাদের যখন দেখা হয় তখন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল আমাদের মধ্যে, রোদিওন রমানোভিচ। সম্ভবত আমাদের প্রথম সাক্ষাতের সময়ও ঘটেছিল একটা অদ্ভুত দৃশ্য। কিন্তু তখন... তা এখন অবশ্য এসে ঠেকেছে একটাতেই। তা যা বলছিলাম, যা ঘটেছে তার জন্য আমি হয়ত আপনার কাছে বড় রকমের অপরাধী। এটা আমি উপলব্ধি করতে পারছি। আমরা কী ভাবে বিদায় নিয়েছিলাম মনে আছে তো! আপনার নার্ভের অবস্থা তখন সঙ্গিন, হাঁটু কাঁপছে আমারও তথৈবচ। বুঝতেই পারছেন আমাদের মধ্যে তখন যা ঘটেছিল সেটা আদৌ শিষ্টাচারসম্মত নয়, ভদ্রজনোচিত আচরণ তাকে বলা যায় না। কিন্তু আমরা হাজার হোক ভদ্রলোক। অর্থাৎ কিনা, যে যাই বলুক, আমরা সর্বোপরি ভদ্রলোক। এটা বোঝা দরকার। মনে আছে তো কোন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল?... রীতিমতো অশোভন।"

'কী মতলব ওর? কী ভাবছে আমাকে?' মাথা তুলে কটমট করে পর্‌ফিরির দিকে তাকিয়ে বিস্মিত রাস্‌কোল্‌নিকভ্ নিজেকে প্রশ্ন করল।

"আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে এখন আমাদের ব্যবহার বরং খোলাখুলি হওয়াই ভালো," আগের মারপ্যাঁচ আর কৌশল ছেড়ে দিয়ে, তার এককালের শিকারকে আর দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ করবে না বলে স্থির করেই যেন মাথাটা সামান্য পেছনে হেলিয়ে এবং চোখ নামিয়ে পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ বলল। "না, এরকম সন্দেহপ্রবণতা এবং এরকম ঘটনা আর বেশিদিন চলতে দেওয়া যায় না। গতবার আমাদের ওই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করেছিল নিকোলাই। তা না হলে আমাদের মধ্যে যে কী ঘটে যেত, ঘটনা যে কোথায় গিয়ে গড়াত আমি জানি না। ওই যে হতভাগা পাজি লোকটা... ওটাও আবার তখন আমার ওখানে পার্টিশনের ওপাশে বসে ছিল— ধারণা করতে পারেন।

আপনি অবশ্য ইতিমধ্যে তা জানেনও। তাছাড়া আমি নিজেও জানি যে সে পরে আপনার কাছে এসেছিল। কিন্তু আপনি যা ভেবেছিলেন ঘটনা আসলে তা নয়। আমি কাউকে ডেকে পাঠাইনি এবং কোনও ব্যবস্থাও তখন নিইনি। জিগ্‌গেস করবেন, কেন ব্যবস্থা নিইনি। কী বলব বলুন? আমি নিজেই তখন কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। দারোয়ান দুজনকে ডেকে পাঠানোর ব্যবস্থা করাই তো আমার পক্ষে তেমন সহজ ছিল না। পাশ দিয়ে যাবার সময় ওই দারোয়ানদের আপনি অবশ্যই লক্ষ করে থাকবেন। চিন্তাটা হঠাৎ তখন বিদ্যুৎ চমকের মতো আমার মাথায় দ্রুত খেলে যায়। আমার ততক্ষণে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল— বুঝলেন রোদিওন রমানোভিচ? ভাবলাম, একটা জিনিস না হয় এখনকার মতো ফসকে যেতেই দিলাম, কিন্তু আরেকটাকে তো লেজে ধরে এখনই খেলাতে পারি— অন্তত যেটা আমার দরকার যেটাকে ফসকানোর ইচ্ছে আমার আদৌ নেই। রোদিওন রমানোভিচ, রগচটা স্বভাবের লোক আপনি— এমনকি বলব, বাড়াবাড়ি রকমের, যদিও আপনার আর সমস্ত অন্তর্নিহিত গুণ এবং আপনার মনের পরিচয় আমি অংশত উদ্ধার করতে পেরেছি এই ভেবে মনে-মনে আত্মপ্রসাদ বোধ করি। অবশ্য এটা ঠিক যে তখনও আমি বিচার করে দেখেছি যে একজন মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে সমস্ত খুঁটিনাটি হুড়হুড় করে আপনাকে বলে দেবে এমন ঘটনা সবসময় ঘটে না। ঘটলেও বিশেষ করে ঘটে কোন মানুষের ধৈর্যের বাঁধ সম্পূর্ণ ভেঙে দিলে... তবে সেটাও মোটের ওপর কদাচিৎ। এটা আমিও বিচার করে বুঝতে পেরেছিলাম। ভাবলাম, না, আমার যা দরকার তা হল সামান্য একটা বিষয়! হোক না তা অতি সামান্য, মাত্র একটাই... কিন্তু এমন হওয়া চাই যে তাকে ধরা-ছোঁওয়া যায়। ...তা শুধু ওই মনস্তত্ত্ব-সম্মতই নয়, তাকে বস্তু বলা যেতে পারে। কারণ, আমি ভেবেছিলাম, কোন মানুষ যদি অপরাধী হয় তাহলে তার কাছ থেকে অন্তত সুনির্দিষ্ট ও সত্যিকার কিছু একটা অবশ্যই আশা করা যেতে পারে। এমনকি রীতিমতো অপ্রত্যাশিত ফলের উপর ভরসা করাটাও দোষের কিছু নয়। আমি তখন আপনার স্বভাবের ওপর ভরসা করেছিলাম, রোদিওন রমানোভিচ, সর্বোপরি আপনার স্বভাবের ওপর! তখন খুবই ভরসা করেছিলাম আপনার ওপর।"

"কিন্তু আপনি... আপনি এসব কী কথা বলছেন এখন?" নিজের প্রশ্নটার তাৎপর্য নিজেও ভালোমতো অনুধাবন করতে না পেরে অবশেষে বিড়বিড় করে বলল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌। 'কিসের কথা বলছে?' ভেবাচেকা খেয়ে সে মনে-মনে বলল। 'আমাকে কি সত্যি-সত্যি নিরপরাধ বলে ভাবছে?'

"কী বলছি? আমি এসেছি, বলতে গেলে, আপনার কাছে একটা কৈফিয়ত দিতে এবং এটাকে আমি আমার পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করি। আমার তখন বলতে পারেন মতিচ্ছন্নই হয়েছিল। সেই মতিচ্ছন্নের পুরো বিবরণ, ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আপনাকে আমি দিতে চাই। আমি আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি রোদিওন

রমানোভিচ। আমি পাষণ্ড নই, আপনার মতো একজন হতাশা-জর্জরিত অথচ অহঙ্কারী আত্মসচেতন, প্রভুত্বকারী এবং অসহিষ্ণু... হ্যাঁ, বিশেষ করে অসহিষ্ণু মানুষের পক্ষে এই ভার বহন করা যে কী দুঃসহ আমিও কিন্তু তা বুঝি! সে যাই হোক না কেন, আমি আপনাকে অতি সদাশয় মানুষ হিসেবে গণ্য করি, এমনকি এও মনে করি যে আপনার মধ্যে অনেক মহত্ত্বের লক্ষণ আছে, যদিও আপনার সমস্ত মত ও বিশ্বাসের সঙ্গে আমি একমত নই। আগে থাকতে সরাসরি, অকপটে সে কথা জানিয়ে দেওয়া আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি, যেহেতু সবচেয়ে বড় কথা এই যে আপনাকে প্রতারণা করা আমার অভিপ্রায় নয়। আপনাকে ভালো করে জানার পর আপনার প্রতি আমার অনুরাগ জন্মেছে। আমার এসব কথায় হয়ত আপনার হাসি পাচ্ছে, তাই না? সে আপনার যা অভিরুচি! জানি যে প্রথম দৃষ্টিতে আমাকে আপনার অপছন্দ। পছন্দ করার কোন কারণও অবশ্য নেই। সে যা খুশি আপনি ভাবতে পারেন, কিন্তু আমার সম্পর্কে আপনি মনে-মনে যে ধারণা গড়ে তুলেছেন, আমার দিক থেকে সর্বতোভাবে তা অপসারণ করার জন্য আমি বদ্ধপরিকর। আমি দেখাতে চাই যে আমিও মানুষ এবং আমারও মন ও বিবেক বলে পদার্থ আছে। আমি আন্তরিকভাবেই আপনাকে বলছি।''

পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ গাম্ভীর্য বজায় রেখে একটু থামল। নতুন করে এক ধরনের আতঙ্কের শিহরন রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ অনুভব করল তার সর্বাঙ্গে। পর্‌ফিরি যে তাকে নিরপরাধ বলে মনে করছে এই চিন্তা হঠাৎ তাকে আতঙ্কিত করে তুলল।

''ওইসময় হঠাৎ কী ভাবে ব্যাপারটা শুরু হল তার আনুপূর্বিক বিবরণ দিতে যাওয়ার তেমন প্রয়োজন দেখি না,'' পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ শুরু করল, ''এমনকি আমার তো মনে হয় সেটা অবান্তর হবে। তাছাড়া সব সেভাবে গুছিয়ে বলতে পারব কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া কি আর সম্ভব? শুরুতে চারদিকে গুজব ছড়াল। কী ধরনের গুজব, কার বা কাদের মস্তিষ্কপ্রসূত, কখন... এবং আসলে কোন্‌ সূত্রে আপনিও এর মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন— এসবও আমার মতে অবান্তর। ব্যক্তিগতভাবে আমার দিক থেকে কিন্তু শুরু হয়েছিল দৈবাৎ, সম্পূর্ণ আকস্মিক ঘটনাচক্রে। ব্যাপারটা অতিমাত্রায় যেমন ঘটা সম্ভব ছিল তেমনি আবার নাও ঘটতে পারত। কী রকম? হুম, আমার মনে হয় সেও বলার মতো কিছু নয়। গুজব আর দৈব ঘটনা— এসব আমার মনের মধ্যে মিলে তখন একটা নির্দিষ্ট চিন্তার আকার নেয়। অকপটে স্বীকার করছি, কেননা স্বীকার যদি করতেই হয় তাহলে সবটাই স্বীকার করা ভালো— আমারই সন্দেহটা তখন প্রথম আপনার ওপর পড়েছিল। ধরা যাক, বন্ধকী জিনিসগুলোর ওপর বুড়ির ওইসব লেখা ইত্যাদি-ইত্যাদি— সেও নেহাত বাজে ব্যাপার। ওরকম জিনিস তো হাজার গণ্ডা থাকতে পারে। ওই সময় থানার অফিসের সেই দৃশ্যটির বিশদ বিবরণ জানার সুযোগও আমার ঘটেছিল। সেও

ঘটনাচক্রে। কথায়-কথায় নয়, কোন এক বিশ্বস্ত বিবরণদাতার মুখ থেকে। লোকটা তার নিজের অজ্ঞাতসারে দৃশ্যটি আশ্চর্যরকম পরিষ্কার তুলে ধরেছিল। বন্ধু রোদিওন রমানোভিচ, এসবই কিন্তু এসে ঠেকছে একটাতে, সেই একটাতেই। অতএব দেখতেই পাচ্ছেন, একটা নির্দিষ্ট দিকে না ঘুরে আমার কোন উপায় ছিল না! একশোটা খরগোশে যেমন কখনও একটা ঘোড়া হয় না তেমনি একশোটা সন্দেহও কোন প্রমাণ নয়— একটা ইংরেজি প্রবচনে অন্তত তাই বলে। এটা হল সাধারণ বিচারবুদ্ধি। কিন্তু মানুষের আবেগ-উচ্ছ্বাস! আবেগ-উচ্ছ্বাসকে বাগে আনার চেষ্টা করেই দেখুন না। আর ঠিক এই কারণেই না তদন্তকারীও একজন মানুষ। আমার তখন মনে পড়ে গেল জার্নালে লেখা আপনার সেই ছোট্ট প্রবন্ধটা— আপনার মনে আছে তো আমাদের প্রথম সাক্ষাতের সময় সেই নিয়ে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা! আমি তখন অনেক ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছি, কিন্তু সে কেবল আপনাকে খুঁচিয়ে আরও কিছু বের করার উদ্দেশ্যে। আবারও বলছি, আপনি বড্ড অসহিষ্ণু আর গুরুতর অসুস্থ, রোদিওন রমানোভিচ। আপনি যে সাহসী, বদমেজাজি, গম্ভীর প্রকৃতির এবং... এবং আপনি যে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, অনেক কিছুই উপলব্ধি করতে পেরেছেন— এসবই আমার বহুকাল হল জানা আছে। এসব উপলব্ধি আমার পরিচিত এবং আপনার ওই ছোট্ট লেখাটাও পড়ার সময় আমার কাছে পরিচিত বলে মনে হয়েছিল। ওর পরিকল্পনা করতে গিয়ে আপনাকে রাতের পর রাত প্রবল উত্তেজনার মধ্যে জেগে কাটাতে হয়েছে, আপনার মন কতই না উথালপাথাল করেছে, কতবারই না আপনার উৎসাহে ভাটা পড়েছে— বলুন। একজন যুবকের অহঙ্কারদৃপ্ত অবদমিত এই উৎসাহ কিন্তু বিপজ্জনক। আমি তখন ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছিলাম বটে, কিন্তু এখন আপনাকে বলতে পারি যে মোটের ওপর বলতে গেলে, মানে একজন রসিক ব্যক্তি হিসেবে, কলম নিয়ে অল্পবয়সের এই প্রথম অত্যুৎসাহী পরীক্ষা আমার ভীষণ ভালো লাগে। ধোঁয়া আর কুয়াশা। কুয়াশার মাঝখানে কোথায় ঝঙ্কার দিচ্ছে একটি তন্ত্রী! আপনার লেখাটা হাস্যকর, উদ্ভট, কিন্তু তার মধ্যে ঝলক দিচ্ছে একটা আন্তরিকতা, একটা অহঙ্কার — যৌবনের সেই অহঙ্কার, যাকে কোনভাবে নোয়ানো যায় না। আছে দুর্জয় সাহস। আপনার লেখাটার মধ্যে ফুটে উঠছে একটা বিষণ্ণ সুর, কিন্তু সেটা ভালোই। আপনার লেখাটা পড়লাম। পড়ে সরিয়ে রাখলাম... ওইসময় আমার কিন্তু মনে হয়েছিল : 'নাঃ এই লোকটার কপালে অনেক দুঃখ আছে!' এখন বলুন আমাকে, বলুন দেখি, এরকম একটা মুখপাতের পর আমার পক্ষে পরবর্তী ঘটনায় জড়িয়ে না পড়ে কি কোন উপায় ছিল? হা ভগবান! আমি কি অন্যায় কিছু বলছি? আমি কি এখন জোর দিয়ে কিছু বলছি? আমি তখন লক্ষ করেছিলাম মাত্র। আমি ভাবলাম, এতে কী আছে? কিছুই না, সেরকম কিছু না, বলা যেতে পারে একেবারেই কিছু না। তাছাড়া আমার মতো একজন তদন্তকারীর পক্ষে এভাবে জড়িয়ে পড়া

শোভা পায় না, এতটুকু শোভা পায় না। এই তো আমার হাতে আছে নিকোলাই, সেই সঙ্গে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ— যে যাই হোক বলুক না কেন, সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে কথা। ওর মনস্তত্ত্বটাও আসছে। সেদিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার। কারণ এই যে এখানে প্রশ্নটা জীবন-মরণের। এসব কথা আমি আপনাকে এখন ব্যাখ্যা করছি কেন? করছি আপনার অবগতির জন্য যাতে আমার তখনকার ওই দুর্ব্যবহারের জন্য আপনার বিচারবুদ্ধি, আপনার মন আমাকে দোষী সাব্যস্ত না করে। আমার ওই ব্যবহারের মধ্যে কোন বিদ্বেষের ভাব ছিল না— আপনাকে অকপটে বলছি। হে-হে! আপনি ভাবছেন কী? সেই সময় আমি কি আর আপনার ঘরে তল্লাশি চালাইনি? চালিয়েছি, চালিয়েছি! হে- হে! চালিয়েছি, যখন আপনি এখানে অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় পড়ে ছিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে নয়, নিজে উপস্থিত থেকেও নয়, কিন্তু কাজ যা করার করেছি— এমনকি প্রথম যে সূত্র পাওয়া যায় তাই ধরে আপনার ফ্ল্যাটে চিরুনি তল্লাশিও চালান হয়েছিল। কিন্তু umsonst! বৃথা! আমার মনে হয়েছিল এবারে এই লোকটি আমার কাছে আসবে, নিজে থেকে আসবে এবং খুব শিগ্‌গিরই আসবে। দোষী যখন তখন অবশ্যই আসবে। অন্য কেউ হলে আসত না, কিন্তু এ লোক আসবে। মনে আছে মিস্টার রাজুমিখিন কী ভাবে আপনাকে সব ভেতরের কথা ফাঁস করে দিতে শুরু করলেন? আপনাকে বিচলিত করার জন্য বকবক করে আপনাকে বলে দেন, কেননা মিস্টার রাজুমিখিন এমন মানুষ যিনি তাঁর বিরাগ চেপে রাখতে পারেন না। মিস্টার জামিওতভের সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে আপনার প্রচণ্ড ক্রোধ ও খোলাখুলি সাহস। কোন মানুষ হোটেলে বসে হঠাৎ করে ফস করে বলে উঠতে পারে: 'আমি খুন করেছি!' বড় বেশি সাহস, বড় দুঃসাহস! মনে-মনে ভাবলাম, 'যদি সত্যি-সত্যি দোষী হয়ে থাকে, তাহলে মানতে হবে যে একজন দুর্ধর্ষ লড়িয়ে!' এরকমই আমি ভেবেছিলাম তখন। অপেক্ষা করতে থাকি! সমস্ত শক্তি দিয়ে আপনার অপেক্ষা করতে থাকি! কিন্তু জামিওতভ্‌কে তখন আপনি দমিয়ে দিয়েছিলেন এবং... হ্যাঁ, ঘটনাটা এই যে এ সব আজেবাজে মনস্তত্ত্ব আসলে শাঁখের করাতের মতো— দুদিকেই কাটে! তাই কী আর করা! আপনার অপেক্ষা করি। দেখি, ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন— আপনি আসছেন! আমার বুকের ভেতরটা যা ঢিপঢিপ করতে লাগল। ওঃ! কিন্তু তখন আপনার আসার কী দরকার ছিল? আর আপনার হাসি, আপনার তখনকার সেই হাসি, যখন আপনি ঘরে ঢুকলেন, মনে আছে আপনার? আমি কিন্তু আপনাকে ঠিক ধরতে পেরেছি, আমার কাছে সব ছিল জলের মতো পরিষ্কার। আমি যদি অমন বিশেষভাবে আপনার জন্য অপেক্ষা করে না থাকতাম তাহলে আপনার হাসির মধ্যে কিছুই আমার নজরে পড়ত না। মেজাজে না থাকলে কি আর এটা হত! আর মিস্টার রাজুমিখিন তো তখন... ও হ্যাঁ, সেই পাথর, মনে আছে তো সেই পাথরের কথা, যার তলার জিনিসগুলো লুকানো ছিল? হ্যাঁ, ঠিক

যেন দেখতে পাচ্ছি ওটাকে কোথাকার কোন এক আনাজক্ষেতে...আনাজক্ষেতে... তেমনই তো বলেছিলেন জামিওতভ্‌কে, তারপর দ্বিতীয়বার আমার কাছে? আবার আমরা যখন আপনার লেখার বিশ্লেষণ শুরু করে দিলাম এবং যখন আপনি তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে লাগলেন তখন কিন্তু আপনার প্রতিটি কথা ছিল দ্ব্যর্থবোধক, যেন বাইরে এক, ভেতরে আরেক। তাহলেই দেখুন, রোদিওন রমানোভিচ, এইভাবে চলতে-চলতে আমি কানাগলিতে এসে ঠেকলাম। শেষের দেয়ালে দড়াম করে মাথা ঠুকে যেতে আমার সংবিৎ ফিরে এলো। মনে-মনে বললাম, 'না, এ আমি কী করছি! ইচ্ছে করলে এ সবেরই তো একেবারে শেষ খুঁটিনাটি পর্যন্ত সম্পূর্ণ উল্‌টো ব্যাখ্যাও দেওয়া যেতে পারে—এমনকি সেটা হয়ত আরও স্বাভাবিক শোনাবে। যন্ত্রণার একশেষ দেখছি! ভাবলাম, না, 'বরং ছোটখাটো কোন ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারলে ভালো!' তা যখন ওই দরজায় ঘণ্টি বাজানোর কথা শুনলাম তখন উত্তেজনায় আমার দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল, এমনকি সর্বাঙ্গে শিহরন খেলে গেল। ভাবলাম, 'বাঃ এই তো সেই ঘটনা! এটাই তো চাই।' আমি আর তখন তেমন ভাবনাচিন্তা করলাম না— করার কোন ইচ্ছেও আসলে ছিল না। সেই যে লোকটা যখন আপনার মুখের ওপর আপনাকে খুনি বলল, তারপর কী করে একশো গজ তার পাশাপাশি হেঁটে গেলেন এবং সেই একশ গজ হাঁটার মধ্যে একটা কথাও তাকে বলার সাহস আপনার হল না—এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখার জন্য আমি সেই মুহূর্তে আমার নিজের পকেট থেকে হাজার রুবল দিতেও ইতস্তত করতাম না।...হ্যাঁ, শিরদাঁড়ায় সেই শিরশিরে উপলব্ধিটা? আর অসুখের সময়, যখন আপনি প্রায় ঘোরের মধ্যে ছিলেন, সেই সময় দরজার ওই ঘণ্টি? তাই বলছিলাম কি রোদিওন রমানোভিচ, এরপর আমি যদি আপনাকে নিয়ে তখন অমন তামাসা করে থাকি তাতে আর কি আশ্চর্য হওয়ার কোন কারণ আছে? তাছাড়া আপনিই বা ঠিক সেই মুহূর্তেই এলেন কেন? মনে হচ্ছিল কেউ বুঝি আপনাকে পেছন থেকে ঠেলছে—তাই না? মাইরি বলছি! নিকোলাই তখন এসে যদি আমাদের দুজনকে আলাদা করে না দিত তাহলে ...নিকোলাইয়ের সেই তখনকার কথা আপনার মনে আছে তো? ভালোমতো মনে রেখেছেন তো? সে ছিল একটা সত্যিকার বজ্রপাত! মেঘ থেকে বজ্রনির্ঘোষ, বিদ্যুৎচমক! কিন্তু আমি তার মুখোমুখি হলাম কী করে? বিদ্যুৎচমকে আমি কিন্তু এতটুকু বিশ্বাস করিনি— সে তো আপনি নিজেই দেখেছেন। করবই বা কেন? শুধু তাই নয়, তারপর, আপনি চলে যাবার পরও যখন ও কোন-কোন প্রশ্নের এত বেশি গোছাল উত্তর দিতে লাগত যে আমি নিজেও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, তখনও কিন্তু বিন্দুমাত্র বিশ্বাস আমার হয়নি। মানে, বুঝতেই পারছেন, আমি আমার নিজের গোঁ ধরে রইলাম। ভাবলাম, মর্গ্যান ফ্রি— বোঝ কাণ্ড! নিকোলাই এখানে আসে কী করে!"

"আমাকে যে রাজুমিখিন এই কিছুক্ষণ আগেও বলল যে আপনি এখনও নিকোলাইকে অপরাধী মনে করেন এবং আপনি নিজে রাজুমিখিনকে এই মর্মে আশ্বাসও দিয়েছেন..." বলতে-বলতে তার নিঃশ্বাসে আর কুলাল না। কথা তাই সে শেষ করতে পারল না। লোকটা তার হাড়হদ্দ জেনে ফেলার পর এখন নিজেই নিজের কথা ফিরিয়ে নিচ্ছে দেখে সে এত বেশি বিচলিত হয়ে পড়ল যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে ভয় হচ্ছিল তার। বিশ্বাস সে করতে পারল না। কথাগুলো এখনও দ্ব্যর্থব্যঞ্জক। তবু সে ব্যাকুল হয়ে তারই ভেতর থেকে আরও যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট কিছু একটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে লাগল।

"মিস্টার রাজুমিখিনের কথা বলছেন তো!" এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর রাস্‌কোল্‌নিকভ্ যে মুখ খুলেছে তাতেই যেন উল্লাসে ফেটে পড়ল পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ। "হাঃ হাঃ হাঃ! আসলে মিস্টার রাজুমিখিনকে অমনিতেই সরিয়ে দেওয়া দরকার ছিল— অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। মিস্টার রাজুমিখিনের এর মধ্যে থাকার কোন প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া উনি বাইরের লোক। উনি একেবারে মুখ ফেকাসে করে ছুটতে-ছুটতে আমার কাছে এসেছিলেন...বাদ দিন তো ওঁর কথা। ওঁকে আবার এর মধ্যে টেনে আনা কেন? কিন্তু নিকোলাইয়ের ব্যাপারে যদি বলেন, আপনার কি জানতে আগ্রহ হয় কী চরিত্রের লোক সে?—অর্থাৎ কিনা, আমি তাকে দেখে যেমন বুঝেছি? প্রথম কথা, এখনও নেহাত নাবালক। ভীতু ওকে ঠিক বলা যায় না। অনেকটা যেন ভাবুক, শিল্পী গোছের। হ্যাঁ, যা বলছি তাই। ওকে এইভাবে বর্ণনা করছি বলে হাসবেন না কিন্তু। লোকটা নির্দোষ। সব ব্যাপারে বড় বেশি স্পর্শকাতর। অনুভূতিপ্রবণ, কল্পনাপ্রবণ। গান গাইতে পারে, নাচতে পারে, আবার শোনা যায় গল্পও নাকি এমন বলতে পারে যে নানা জায়গা থেকে লোকে ছুটে আসে তার গল্প শুনতে। স্কুলেও যায়, কথায়-কথায় হাসতে-হাসতে গড়িয়ে পড়ে, মাতাল হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে—কারণ এই নয় যে সে লম্পট। মদ খায় সে অবরে-সবরে, যখন লোক ওকে খাওয়ায়। একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো! সেই সময় ও চুরি করেছিল, কিন্তু সেটা যে চুরি তা নিজেও জানে না। যুক্তিটা হল : 'মাটি থেকে যদি কিছু তুলে নিই তাকে কি চুরি বলা যায়?' আপনি কি জানেন ও সরকারি গির্জার বিরোধী রাস্‌কোল্‌নিক সম্প্রদায়ের লোক...অবশ্য ঠিক রাস্‌কোল্‌নিক হয়ত নয়...তবে ওইরকম কোন ধর্মসম্প্রদায়ের বটে। ওদের বংশে 'যাযাবর' ধর্মসম্প্রদায় নামে গোষ্ঠীর লোকজনও ছিল। ও নিজে এই কিছুদিন আগে টানা দুবছর এক গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে গ্রামে কাটিয়ে এসেছে। এসবই আমি নিকোলাইয়ের মুখে এবং জারাইস্‌কে ওর যারা লোকজন আছে তাদের কাছ থেকে জেনেছি। শুধুই কি তাই! পালিয়ে কোন নির্জন মাঠেময়দানে চলে যাবার ইচ্ছেও ছিল ওর! রাত জেগে সাধনভজন, সত্যের সন্ধানে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ পাঠ এবং তাতে ডুবে থাকায় তার দারুণ উৎসাহ ছিল। কিন্তু সেন্ট

পিটার্সবুর্গ ওর জীবনে গভীর ছাপ ফেলে—বিশেষত মহিলামহল, আর সুরাও বটে। খুবই আবেগপ্রবণ কিনা! তাই কোথায় রইলেন তার গুরুদেব, কোথায় গেল তার ধর্মবোধ!—সব ভুলে গেল। আমি জানতে পেরেছি যে এখানে একজন শিল্পীরও নেকনজরে পড়ে যায়। তার কাছে যাতায়াতও করতে লাগল—আর তার পরই তো এই ঘটনা! ফলে ঘাবড়ে গেল— গলায় দড়ি দিতে গেল! পালানোরও চেষ্টা করল! আমাদের দেশের আইনকানুন সম্পর্কে সাধারণ লোকের যে ধ্যানধারণা তাতে আর কীই বা আশা করা যেতে পারে! 'বিচার' কথাটা শোনামাত্র কোন-কোন মানুষের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। দোষ কার? দেখা যাক, নতুন আদালত-ব্যবস্থা কী বলে। আশা করি ভগবানের ইচ্ছায় একটা কিছু হবে! হ্যাঁ, ভালো কথা, জেল হাজতে আসার পর কিন্তু ওর মনে পড়েছে সেই পরম পূজ্যপাদ গুরুদেবকে। বাইবেলেরও আবার আবির্ভাব ঘটেছে ওর জীবনে। আপনি জানেন কি, রোদিওন রমানোভিচ, ওদের মধ্যে কোন-কোন মানুষের কাছে 'কষ্ট ভোগ' করার অর্থ কী? এই নয় যে কারও জন্য ভোগ করা— স্রেফ 'কষ্টভোগ করা দরকার', তাই। অর্থাৎ কিনা কষ্ট মাথা পেতে নিতে হয় এবং তা যদি শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে আসে তাহলে তো আরও ভালো। আমার আমলে পুরো একটা বছর হাজতে ছিল অতি নিরীহ স্বভাবের এক কয়েদী। রোজ রাতে বাইবেল পড়ত। একবার পড়তে-পড়তে এমনই ডুবে গেল, বুঝলেন কিনা, বলা নেই কওয়া নেই কোথা থেকে এক থান ইট বের করে নিয়ে জেল সুপারের দিকে ছুঁড়ে মারল—যদিও সে লোকটা কখনও ওর কোন ক্ষতি করেনি। তবে ছোঁড়ার ধরনটাও লক্ষ করতে হবে—ইচ্ছে করে এমনভাবে ছুঁড়ল যে হাত-দেড়েক পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, জেল সুপারের কোন ক্ষতি হল না! কিন্তু কোন কয়েদী অস্ত্র হাতে ওপরওয়ালাকে আক্রমণ করলে তার পরিণতি কী হতে পারে সে তো সবারই জানা আছে। অর্থাৎ, 'দুঃখ বরণ করে নিল'। তাই আমারও এখন সন্দেহ হচ্ছে নিকোলাই হয়ত 'দুঃখ বরণ করে নিতে' বা ওই গোছের কিছু একটা করতে চাইছে। আসলে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এমনকি আমার এই অনুমানের পক্ষে তথ্যও আছে। কিন্তু ও নিজেও জানে না যে আমি তা জানি। কী হল? ওই জাতের লোকজনের মধ্যে এমন অদ্ভুত জীবের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে একথা মানতে পারছেন না বুঝি? খুব পাওয়া যেতে পারে! এখন আবার গুরুদেবের প্রভাব শুরু হয়ে গেছে— বিশেষত গলায় দড়ি দেওয়ার ঘটনার পর মনে পড়েছে তাঁকে। সে যাই হোক, নিজে আমাকে সব বলবে, আসবে আমার কাছে। আপনি মনে করছেন সহ্য করতে পারবে? দাঁড়ান না, যা যা বলেছে সব ওকে অস্বীকার করতে হবে! আমি অপেক্ষা করে আছি, যে কোন মুহূর্তে এসে ওর এজাহার তুলে নিতে পারে। এই নিকোলাইটার ওপর আমার মায়া পড়ে গেছে, আমি খুব যত্ন নিয়ে ওকে পরীক্ষা করে দেখছি। ভাবতে পারেন? হে-হে! কোন-কোন বিষয়ে ওর উত্তরগুলো ছিল বেশ

গোছাল— বোঝাই যাচ্ছিল প্রয়োজনীয় তথ্য কোন সূত্রে সে পেয়ে গিয়েছিল, ভালোভাবে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু অন্য কতকগুলো ক্ষেত্রে দেখা গেল একেবারে অথৈ জলে হাবুডুবু খাচ্ছে, কিস্যু জানে না, একেবারে অজ্ঞ, এমনকি সে যে অজ্ঞ সেই জ্ঞানটুকু পর্যন্ত তার নেই। না ভাই রোদিওন রমানোভিচ, নিকোলাই এর মধ্যে নেই! আসলে এটা সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির অতীত, গভীর দুঃখজনক একটা মামলা। আধুনিক কালের, আমাদের সময়কার উপযোগী ঘটনা। এ সময়টা এমনই যখন মানুষের মন অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে, লোকে রক্তপাতকে 'সঞ্জীবনী শক্তি' বলে উল্লেখ করছে, আরামকে মানুষের জীবনের মূলমন্ত্র বলে প্রচার করছে। এখানে আছে কেতাবি স্বপ্ন, তত্ত্বের জ্বালায় উত্ত্যক্ত মন। এক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপে দৃঢ় সঙ্কল্পের পরিচয় আছে বটে, কিন্তু সে সঙ্কল্প এক বিশেষ ধরনের: সঙ্কল্প করল বটে, কিন্তু তার পরই অতর্কিতে, পাহাড়ের চূড়ো বা কোন উঁচু মিনার থেকে যেন পা ফসকে নিচে পড়ে গেল। লোকটা অপরাধ করতে এগিয়েছে তাও ঠিক নিজের পায়ে নয়। ঘরে ঢোকার পর ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেল। আর খুন করল তো জোড়া খুন করল— তত্ত্বের খাতিরে। খুন করল অথচ টাকাকড়ি নিতে পারল না। যাও বা হাতাতে পারল তাও নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখে দিল পাথর চাপা দিয়ে। লোকে যখন বাইরে থেকে দরজা ধাক্কাধাক্কি করে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে, বারবার ঘণ্টি বাজাচ্ছে, সেই সময় ভেতরে দরজার আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে থাকার যে যন্ত্রণা সেটাও যেন যথেষ্ট নয়। আরও কী করল। না, পরে একসময় ঘর খালি পেয়ে প্রায় বিকারের ঘোরে সেই ঘণ্টির আওয়াজটা মনে করে দেখার জন্য এবং শিরদাঁড়া বয়ে সেই শিরশিরে উপলব্ধিটা নতুন করে লাভ করার উদ্দেশ্যে আবার সেখানে উপস্থিত হল।... আচ্ছা, না হয় ধরা গেল লোকটা অসুস্থ, কিন্তু আরও একটা ব্যাপার দেখুন— খুন করার পরও নিজেকে একজন সৎ লোক বলে মনে করছে, লোকজনকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে, পাণ্ডুর মুখে দেবদূতের মতো চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে।... না, না নিকোলাই এখানে আসে কী করে বন্ধু, রোদিওন রমানোভিচ? নিকোলাইয়ের কোন প্রশ্নই আসে না।"

পর্‌ফিরির এর আগের এত কথা তার পূর্বমত প্রত্যাহার করার মতোই শোনাচ্ছিল। কিন্তু এত কিছুর পর তার এই শেষ কথাগুলো ছিল বড় বেশি অপ্রত্যাশিত। রাস্‌কোলনিকভ্‌কে যেন এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। তার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল।

"তাহলে... তাহলে... কে খুন করল?" আর ধৈর্য ধারণ করতে না পেরে রুদ্ধশ্বাসে সে জিগ্‌গেস করল। প্রশ্নের আকস্মিকতায় পর্‌ফিরি পেত্রোভিচও এত চমকে উঠেছিল যে চেয়ারের পিঠে ধাক্কা খেল।

"কে খুন করল মানে?" প্রতিধ্বনি করে সে বলল। নিজের কানকে যেন সে

বিশ্বাস করতে পারছিল না। "খুন তো করেছেন *আপনি*, রোদিওন রমানোভিচ! আপনিই খুন করেছেন— হ্যাঁ, তাই..." সম্পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সুরে প্রায় ফিসফিসিয়ে সে যোগ করল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ সোফা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে একটি কথাও না বলে আবার বসে পড়ল। তার সারা মুখে হঠাৎ মৃদু কুঞ্চনরেখা ফুটে উঠল।

"আপনার ঠোঁট তো সেই তখনকার মতো আবার কাঁপছে," বেশ খানিকটা সহানুভূতির সুরেই যেন বিড়বিড় করে বলল পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ। "রোদিওন রমানোভিচ, আমার মনে হয় আপনি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারেননি," একটু চুপ করে থেকে সে যোগ করল, "তাই আপনি এত অবাক হয়ে গেছেন। আমার আসার উদ্দেশ্যই হল আপনাকে সব কিছু খোলসা করে বলা, বিষয়টা আপনার সামনে খোলাখুলি তুলে ধরা।"

"আর যেই খুন করুক, আমি করিনি।" কোন বাচ্চা ছেলে অপরাধ করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলে যেমন হয় তেমনি কাচুমাচু হয়ে ফিসফিসিয়ে বলল রাস্‌কোল্‌নিকভ্।

"না, আপনিই করেছেন, রোদিওন রমানোভিচ। আপনিই, আর কেউ নয়," কঠিন ও দৃঢ়স্বরে ফিসফিসিয়ে বলল পর্‌ফিরি।

দুজনেই চুপ। অদ্ভুত, দীর্ঘস্থায়ী নীরবতা— অন্তত মিনিট দশেক এইভাবে কাটল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে আঙুল দিয়ে চুপচাপ মাথার চুলে বিলি কেটে যেতে লাগল। পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ নিশ্চল হয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ রাস্‌কোল্‌নিকভ্ চোখ তুলে অবজ্ঞাভরে তাকাল পর্‌ফিরির দিকে।

"আপনি আবার সেই পুরানো চাল চালছেন পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ! আপনার সেই এক কায়দা। আচ্ছা সত্যি বলুন তো, আপনার কি বিরক্তি ধরে না এতে?"

"তা আর বলতে! তবে কায়দা দিয়ে এখন আমার কী হবে? হ্যাঁ, যদি এখানে কোন সাক্ষী থাকত তাহলে অন্য কথা। কিন্তু আছি তো আমরা দুজন— একান্তে, ফিসফিসিয়ে নিজেদের মধ্যেই কথা বলছি। আপনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন খরগোশের মতো তাড়া করে আপনাকে ধরার বাসনা নিয়ে আমি আপনার কাছে আসিনি। স্বীকার করুন আর নাই করুন— এই মুহূর্তে আমার কাছে গৌণ। আপনি স্বীকার না করলেও আমি কিন্তু মনে-মনে ঠিকই জানি।"

"তাই যদি হয় তাহলে এলেন কেন?" রাস্‌কোল্‌নিকভের কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ঝরে পড়ল। "আমি আপনাকে সেই আগের প্রশ্নই করছি: দোষী বলে যদি গণ্য করেন তাহলে হাজতে পুরছেন না কেন?"

"হ্যাঁ, এটা একটা প্রশ্ন বটে। একে একে উত্তর দিচ্ছি। প্রথমত, স্রেফ আপনাকে গ্রেপ্তার করে আমার কোন লাভ নেই।"

"লাভ নেই কেমন! আপনার যদি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে থাকে তাহলে আপনি বাধ্য..."

"দৃঢ় বিশ্বাস হলেই বা কী? আপাতত এ সবই আমার কল্পনা। তাছাড়া আপনার *মনের শান্তির জন্য* আমি কী বলে আপনাকে লকআপে রেখে দেব? আপনি যখন জিগ্‌গেস করছেন তখন আপনি নিজেও তা জানেন। ধরুন না কেন, গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা সেই লোকটাকে যদি আমি আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে হাজির করি এবং আপনি যদি তাকে বলেন: 'তুমি কি মাতাল না আর কিছু? আমাকে তোমার সঙ্গে কে দেখেছে বলতে পার? আমি তোমাকে স্রেফ একজন মাতাল বলে ধরেছিলাম, তুমি মাতালই ছিলে বাপু', তখন আমি আপনাকে কী বলব বলতে পারেন? — বিশেষত আপনার বিবরণ যেখানে ওরটার চাইতে অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য, যেখানে ওর সাক্ষ্যের মধ্যে আছে শুধুই মনস্তত্ত্ব, যা ওর মতো লোকের মুখে একেবারে শোভা পায় না? তাছাড়া আপনার লক্ষ্যটিও হবে অব্যর্থ, যেহেতু হতভাগাটা পাঁড় মাতাল, এমনকি সেই হিসেবে বড় বেশি পরিচিতও। সে যাই হোক না কেন, আমি নিজেও আপনার কাছে ইতিমধ্যে কয়েকবার খোলাখুলি স্বীকারও করেছি যে মনস্তত্ত্ব জিনিসটা শাঁখের করাতের মতো দুদিকেই কাটে, তবে দ্বিতীয় ধারটার ধার ও ভার বেশি এবং সেটা অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য— এছাড়া আপনার বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত বলার কিছু নেইও। এত কিছু সত্ত্বেও যদিও আমি আপনাকে হাজতে পুরব, এমনকি যদিও প্রচলিত নিয়মের অনেকটা বিরোধিতা করেই আমি নিজে এসেছি আপনাকে আগেভাগে সমস্ত জানিয়ে দিতে, তবু সরাসরি বলছি— এটাও অবশ্য প্রচলিত নিয়মের বিরোধিতা করে— যে আমার পক্ষে ব্যাপারটা সুবিধাজনক হবে না। আর দ্বিতীয়ত আপনার কাছে এসেছি এই কারণে..."

"হ্যাঁ বলুন, দ্বিতীয়ত কী?" জিগ্‌গেস করতে গিয়ে তখনও রাস্‌কোল্‌নিকভের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হচ্ছিল।

"এই কারণে যে, এইমাত্র আপনাকে বলেওছি, আপনার কাছে কৈফিয়ত দেওয়া আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি। আমি চাই না যে আপনি আমাকে পাষণ্ড মনে করেন, বিশেষত আমি যখন আন্তরিকভাবে আপনার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন— সে আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন। এরই ফলস্বরূপ, তৃতীয়ত, আমি আপনার কাছে এসেছি খোলাখুলি ও সরাসরি একটা প্রস্তাব নিয়ে: আপনি মুখ ফুটে নিজের অপরাধ স্বীকার করুন। এতে আপনার অনেক সুবিধে হবে, আমারও অনেক সুবিধে হবে— কেননা এর ফলে কাঁধ থেকে একটা বড় বোঝা নেমে যাবে। কী, আমার দিক থেকে আমি অকপট কিনা?"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ মিনিটখানেক ভেবে দেখল।

"শুনুন, পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ, আপনি নিজে বলেছিলেন যে ব্যাপারটা শুধুই মনস্তত্ত্বের, কিন্তু এখন তো দেখছি আপনি গণিতশাস্ত্রের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে এখন আপনি নিজেই ভুল করছেন?"

''না, রোদিওন রমানোভিচ, ভুল করছি না। একটা ছোটখাটো নজির আমার কাছে আছে। আমিই তখন খুঁজে পেয়েছিলাম আর কি! ঈশ্বরপ্রেরিত বলা যেতে পারে!''

''কী নজির?''

''সে আমি বলছি না রোদিওন রমানোভিচ! তা সে যাই হোক না কেন, এখন কিন্তু আর *ঠেকিয়ে* রাখার কোন অধিকার আমার নেই। হাজতে পুরতে হবে। তাই বলি কি, বিবেচনা করে দেখুন: আমার কিন্তু *এখন* কিছুতেই কিছু এসে যায় না। ফলে যা বলছি তা একমাত্র আপনারই মুখ চেয়ে। ঈশ্বরের দোহাই, এতে আপনার ভালো হবে রোদিওন রমানোভিচ!''

রাস্‌কোল্‌নিকভের মুখে বিদ্বেষের হাসি ফুটে উঠল।

''ব্যাপারটা শুধু হাস্যকর নয়, এমনকি ধৃষ্টতাই বলব। এমনকি আমি যদি দোষীও হই— যদিও আমি তা আদৌ স্বীকার করছি না— বলুন তো কেন আমি আপনার কাছে হাজির হয়ে দোষ স্বীকার করব, যখন আপনি নিজেই বলছেন যে আমাকে আমার *মনের শান্তির* জন্য ওখানে ঢুকতে হবে?''

''আহা রোদিওন রমানোভিচ, একেবারে আক্ষরিক অর্থে নেবেন না। হয়ত *মনের শান্তি* একেবারেই হবে না! এটা নেহাতই তত্ত্বকথা, তাও আবার আমার। আপনার কাছে কীই বা যোগ্যতা আছে আমার? এমনও হতে পারে যে আমি এখনও আপনার কাছ থেকে কিছু জিনিস গোপন করে রাখছি। স্রেফ এসে হাতের সবগুলো তাস আপনার সামনে ফেলে দিলাম এ তো আর হতে পারে না! হে - হে! আরও একটা কথা: কী সুবিধে হবে এতে তাই তো? আপনি কি জানেন এর ফলে আপনার দণ্ড কতটা লাঘব হতে পারে? এখন না হলে আর কখন আপনি এগিয়ে আসবেন? কোন্ মুহূর্তে? একবার ভেবে দেখুন! যখন অপরাধের বোঝা অন্য একজন ইতিমধ্যে মাথা পেতে নিয়েছে এবং পুরো মামলাটাই গুলিয়ে দিয়েছে? আমি কিন্তু একেবারে ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, 'ওখানে' এমনভাবে সাজিয়ে রাখব এবং এমন ব্যবস্থা করব যে আপনার আসাটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত মনে হবে। মনস্তত্ত্বের ব্যাপার-স্যাপার সব একদম বাতিল করে দেব, আপনার ওপর এই যে এত সন্দেহ তাও সম্পূর্ণ মুছে দিচ্ছি। আপনার অপরাধ এক ধরনের সাময়িক মনোবিকারের পরিণতির মতো দেখাবে — আসলে বলতে গেলে ঘটনাও তাই। আমি সত্যবাদী, রোদিওন রমানোভিচ আমি আমার কথা রাখব।''

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ মুখ ভার করে চুপচাপ মাথা নিচু করে রইল। অনেকক্ষণ ভাবল, অবশেষে আবার হাসল, কিন্তু সে হাসি ম্রিয়মাণ, তার মধ্যে বিষাদের ভাব গোপন থাকল না।

''উঁহু, দরকার নেই!'' এবারে যেন পর্‌ফিরির কাছ থেকে কিছুই গোপন করতে না পেরে সে বলে উঠল। ''কোনও লাভ নেই। আপনার ওই দণ্ড লাঘবে আমার কোন কাজ নেই!''

''দেখ কাণ্ড! এই ভয়টাই আমি করছিলাম!'' অনেকটা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও

উত্তেজনার বশে পর্‌ফিরির মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। "আমাদের ওই দণ্ড লাঘবে আপনার কাজ নেই— এ কথা যে বলবেন ঠিক এই ভয়টাই আমি করছিলাম।"

গম্ভীর ও করুণ দৃষ্টিতে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তাকাল তার দিকে।

"আরে জীবনকে অমন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলে হয়!" পরফিরি বলল। "সামনে আরও কত পড়ে আছে। দণ্ড লাঘব হয় তা আপনি চান না! এ আপনি কী বলছেন! বড় অসহিষ্ণু মানুষ তো আপনি!"

"কী পড়ে আছে অত সামনে?"

"কী আবার? জীবন! আপনি কোথাকার কোন্ পয়গম্বর এলেন? কতটুকুই বা আপনি জানেন? সন্ধান করিবে, সন্ধান মিলিবে। ঈশ্বর হয়ত আপনাকে এইভাবেই আশা করেছিলেন। তাছাড়া শৃঙ্খল তো আর সারাজীবনের জন্য হতে পারে না..."

"দণ্ড লাঘব হবে..." হাসতে-হাসতে বলল রাস্‌কোল্‌নিকভ।

"কী হল, মধ্যবিত্তসুলভ লোকলজ্জার ভয় নাকি? ভয় হয়ত পেয়েছেন, পাওয়াটা স্বাভাবিক।— হয়ত নিজের অজান্তেই পেয়েছেন— কেননা আপনার বয়স কম! সে যাই হোক, সশরীরে হাজির হয়ে অপরাধ স্বীকার করতে ভয় বা লজ্জা পাবেন সে পাত্র কিন্তু আপনি নন।"

"ধুৎ, বয়েই গেছে আমার!" কথা বলার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি রাস্‌কোল্‌নিকভের ছিল না, তাই অবজ্ঞা ও বিতৃষ্ণা মেশান সুরে ফিসফিস করে সে বলল। সে আবার জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ঘর ছেড়ে বাইরে কোথাও বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছে। কিন্তু কী ভেবে আবার হতাশ হয়ে বসে পড়ল।

"ঠিক বলেছেন— বয়েই গেছে! আপনি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন, তাই ভাবছেন আমি আনাড়ির মতো আপনাকে খোশামোদ করছি। কত বছরই বা কাটিয়েছেন এই পৃথিবীতে? কতই বা জানেন? একটা তত্ত্ব ভেবে বের করেছেন বটে! সব বানচাল হয়ে গেল এবং পরিণতি খুব একটা মৌলিক হল না দেখে লজ্জা পাচ্ছেন, তাই না? সত্যি বলতে গেলে কি যা দাঁড়াল তা একেবারে নীচ ধরনের, কিন্তু হাজার হোক আপনি তো আর তাই বলে একেবার উচ্ছন্নে যাওয়া নীচ প্রবৃত্তির লোক নন! সেরকম নীচ আপনাকে মোটে বলা যায় না। অন্তত এটা ঠিক যে আত্মপ্রবঞ্চনা আপনাকে বেশিদিন করতে হয়নি, এক ধাক্কায় কানাগলিতে গিয়ে ঢুকে পড়েছেন। আমি আপনাকে কী মনে করি, জানেন? আমি মনে করি আপনি এমন একজন মানুষ যার পেটের নাড়িভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিলেও দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তার নিষ্ঠুর উৎপীড়নকারীদের দিকে তাকিয়ে হাসবে— কেবল ভগবানে বিশ্বাস বা অন্য কোন বিশ্বাস খুঁজে পেলেই হল! তাই বলছিলাম কি, খুঁজে বের করুন আপনার বিশ্বাস, তাহলে আপনি বেঁচে যাবেন। আপনার প্রথমত দরকার, অনেক আগেই দরকার ছিল আবহাওয়া বদল করা। কষ্ট ভোগ করা— সে তো ভালোই।

যান, ভোগ করুন। নিকোলাই যে কষ্ট ভোগ করতে চায় সেটা হয়ত ঠিকই করে। আমি জানি যে এটা বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু আপনি কূটতর্ক তুলবেন না। কোনরকম চিন্তাভাবনা না করে সোজা জীবনের হাতে নিজেকে সঁপে দিন—চিন্তা করবেন না। জীবনের তরঙ্গ আপনাকে সোজা কূলে পৌঁছে দেবে, আপনাকে দুপায়ে খাড়া করে দেবে। সে কোন্ কূল? তা আমি জানব কী করে? আমার শুধু এই বিশ্বাস আছে যে আপনাকে আরও বহুকাল বাঁচতে হবে। জানি, আপনি আমার কথাগুলোকে এখন মুখস্থ করা বুলি বলে মনে করছেন। কিন্তু পরে হয়ত মনে পড়বে, পরে কোন একসময় হয়ত কাজে লাগবে আপনার। এইজন্যই তো বলছি। ভালো বলতে হবে যে আপনি কেবল একটা বুড়িকে খুন করেছেন। কিন্তু আপনি যদি অন্য কোন তত্ত্ব উদ্ভাবন করতেন তাহলে হয়ত আরও লক্ষগুণ, কোটিগুণ কোন বীভৎস কাজ করে বসতেন! আমার তো মনে হয় এর জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে হয়। ভগবান কোন কাজের জন্য আপনাকে রক্ষা করে আসছেন না তাই বা আপনি জানলেন কী করে? মন শক্ত করুন, ভয়টা কমান! আপনার সামনে যে বিরাট কাজ পড়ে আছে তা দেখে কি আপনি ভয়ে পিছিয়ে যাবেন? না, এক্ষেত্রে পিছিয়ে যাবার অর্থ হবে কাপুরুষতা। এমন কাজ যখন করেই ফেলেছেন তখন মন শক্ত করুন। ন্যায়বিচার তাই বলে। সুতরাং ন্যায়ের দাবি মেনে চলুন। জানি যে আপনি বিশ্বাস করছেন না, কিন্তু ভগবানের দিব্যি, জীবন আপনাকে ঠিক কূলে পৌঁছে দেবে। এর পর নিজেই আপনি ভালোবাসার পরম সুখ উপভোগ করবেন। আপনার এখন যেটা একান্ত দরকার তা হল মুক্ত বায়ু, খোলা হাওয়া, একটু খোলা হাওয়া!"

রাস্‌কোল্‌নিকভ দস্তুরমতো চমকে উঠল।

"আচ্ছা আপনি কে বলুন তো?" চিৎকার করে বলল সে। " আপনি কোথাকার কোন্ গুরুঠাকুর এসেছেন? ধ্যানগম্ভীর মহিমার কোন্ উচ্চাসন থেকে আপনি এ সমস্ত জ্ঞানগর্ভ দৈববাণী শোনাচ্ছেন আমাকে?"

"আমি কে? আমি একজন ফুরিয়ে যাওয়া মানুষ— এর বেশি আর কি? এমন একজন মানুষ যে সম্ভবত উপলব্ধি করতে পারে, কারও সমব্যথী হতে পারে, সম্ভবত দু-একটা জিনিস সম্পর্কে একটু-আধটু জানেও। তবে হ্যাঁ এটা ঠিক যে একেবারে ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু আপনি—আপনার ব্যাপারটা আলাদা। ঈশ্বর আপনার জন্য জীবনের ক্ষেত্র তৈরি করে রেখেছেন। অবশ্য হ্যাঁ, বলা যায় না, হয়ত আপনার জীবনও একরাশ ধোঁয়ার মতো কোথায় মিলিয়ে যাবে— শেষপর্যন্ত কিছুই দাঁড়াবে না! আপনি যদি ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত মানুষে পরিণত হন তাতেই বা কী? আপনি একজন হৃদয়বান লোক, আপনার মতো লোকের প্রাণ তো আর আরামের জন্য কাঁদবে না! হয়ত বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য কেউ আপনাকে দেখতে পাবে না— কিন্তু তাতে

আপনার কী এসে যায়? সময় বলে কথা নয়, আসল কথা আপনাকে নিয়ে। আপনি সূর্য হোন— তাহলেই সকলে আপনাকে দেখতে পাবে। সূর্যের কাজ সর্বোপরি সূর্য হওয়া। আপনি আবারও হাসছেন? আমি এক ধরনের শিলার — এই ভেবে হাসছেন? আমি বাজি ধরে বলতে পারি ভাবছেন যে আমি এখন আপনাকে তোষামোদ করছি! বেশ তো, হয়ত সত্যি-সত্যিই করছি, হাঃ-হাঃ-হাঃ! আপনার... রোদিওন রমানোভিচ... আপনার সম্ভবত উচিত হবে না আমার কথায় বিশ্বাস করা, এমনকি সম্ভবত কখনই উচিত হবে না সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা— আমি মানছি, আমার ধরনটাই এরকম। তবে একটা কথা যোগ করছিঃ আমি কতটা নীচ আর কতটা সৎ সেটা, আমার বিশ্বাস, আপনি নিজেই বিচার করতে পারেন!"

"আপনি কখন আমাকে গ্রেপ্তার করবেন বলে ভাবছেন?"

"তা আরও দিনদুয়েক ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ানর সময় আপনাকে দিতে পারি। ভেবে দেখুন বন্ধু, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন। এতে আপনার অনেক সুবিধে হবে, ভগবানের দিব্যি, অনেক সুবিধে হবে।"

"কিন্তু ধরুন যদি পালিয়ে যাই?" অদ্ভুত হাসি হেসে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ জিগ্‌গেস করল।

"না, পালিয়ে যাবেন না। পালিয়ে যেতে পারে চাষাভুষো মানুষ, শখের প্রতিষ্ঠান বিরোধী ধর্মসম্প্রদায়ের লোক, যারা ধার করা চিন্তাভাবনার বশংবদ কেননা ওরা সব গোগলের নাটকের বিশ্বাসপ্রবণ সেই হাঁদা লোকটার মতোঃ আঙুলের ডগা নেড়ে একটু ইশারা করলেই হল, আপনি যা চান তাতেই বিশ্বাস করবে সারাজীবনের মতো। আপনি তো আপনার নিজের তত্ত্বেও আর বিশ্বাস করেন না। তাই, পালাবেন কী কারণে? কী করবেন পালিয়ে-পালিয়ে বেড়িয়ে? পালিয়ে-পালিয়ে বেড়ান বিশ্রী, কঠিন, অথচ, আপনার যা সব চাইতে বেশি দরকার তা হল জীবন, জীবনে স্থিত হওয়া এবং তার উপযুক্ত আলো-বাতাস— পলাতকের জীবনে কি আর আপনার সেই আলো-বাতাস পাবেন? পালিয়ে গেলে আবার নিজে থেকে ফিরে আসবেন। *আমাদের ছাড়া আপনার চলবে না*। কিন্তু আপনাকে যদি জেলখানায় তালাবন্ধ করে রাখতে পারি— এই ধরুন না কেন, এক মাস, হয়ত বা দু-মাস অথবা তিন মাস, তখন মনে রাখবেন আমার কথাগুলো— হঠাৎ আপনি নিজে এগিয়ে আসবেন। সম্ভবত আপনার নিজের কাছেও সেটা আকস্মিক মনে হবে। ঘণ্টাখানেক আগেও আপনি নিজেই জানতে পারবেন না যে দোষ স্বীকার করতে আসছেন। এমনকি আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে আপনি 'দুঃখবরণের জন্য মনস্থির করে ফেলবেন'। আমার মুখের কথায় এখন তো আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু আপনি নিজেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। কারণ এই যে, দুঃখ এক পরম শক্তি, রোদিওন রমানোভিচ। আমার নাদুসনুদুস শরীরটার দিকে অমনভাবে তাকাবেন না, তার কোন দরকার নেই। তবে

আমি জানি... না, না, হাসবেন না... আমি জানি যে দুঃখ ভোগের মধ্যে একটা আইডিয়া আছে। নিকোলাই ঠিকই বলেছে। না, পালিয়ে আপনি যাবেন না, রোদিওন রমানোভিচ।"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে টুপি হাতে তুলে নিল। পর্‌ফিরি পেত্রোভিচও উঠে পড়ল।

"বেড়াতে যাচ্ছেন বুঝি? সন্ধেটা ভালো যাবে মনে হচ্ছে, তবে বজ্রবিদ্যুৎসমেত ঝড়বৃষ্টি না হলেই হয়। অবশ্য হলে মন্দ হয় না— তাজা বাতাস পাওয়া যাবে।..."

পর্‌ফিরিও তার টুপি হাতে তুলে নিল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ নিজের জেদ বজায় রেখে গম্ভীর মুখে বলল, "আপনার কাছে আমার অনুরোধ পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ, আপনি কিন্তু ভুলেও মনে করবেন না যে আমি আজ আপনার কাছে কবুল করেছি। আপনি আজব ধরনের মানুষ, আমি আপনার কথা শুনে গেছি একমাত্র কৌতূহলের খাতিরে। আমি কিন্তু আপনার কাছে কিচ্ছু কবুল করিনি... এটা যেন মনে থাকে আপনার।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা জানি। মনে থাকবে বৈ কি! ইস্ দেখ কাণ্ড ! লোকটা যে কাঁপছে ঠকঠক করে! চিন্তা করবেন না বন্ধু, আপনার যা ইচ্ছে তা-ই হবে। একটু বেড়িয়ে আসুন। তবে খুব বেশি বেড়ান ঠিক হবে না। হ্যাঁ, কী হয় বলা যায় না— তাই আপনার কাছে আমার একটা ছোটখাটো অনুরোধ আছে," গলা খাটো করে সে যোগ করল, "অনুরোধটা অবশ্য একটু বেয়াড়া ধরনের, তবে গুরুত্বপূর্ণ: যদি ...মানে, বলতে চাই, যদি এমন হয়... প্রসঙ্গত, এই নয় যে আমি বিশ্বাস করি এবং আমার ধারণা যে আপনার পক্ষে তা আদৌ সম্ভবও নয়... তবু, কথার কথা বলছি আর কি... যদি এমন হয় যে এই সময়ের মধ্যে, আগামী চল্লিশ-পঞ্চাশ ঘণ্টার মধ্যে অন্য কোনভাবে, অলৌকিক কোন উপায়ে, নিজেই নিজের গায়ে হাত তুলে মামলাটার নিষ্পত্তি করবেন বলে আপনি মনস্থ করেছেন, তা হলে সেই মর্মে সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট বক্তব্য লিখে একটা চিরকুট আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আমার অনুমান অবশ্য অর্থহীন, হাস্যকর। এর জন্য আশা করি আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। বলছিলাম কি, দুটো ছত্র, মাত্র দুটো ছত্র। হ্যাঁ, পাথরের কথাটাও উল্লেখ করবেন কিন্তু। তাহলে আরও বাধিত হব। আচ্ছা, আসি, আবার দেখা হবে।... আপনার শুভ বুদ্ধির উদয় হোক, শুভ হোক আপনার সূচনা।"

পর্‌ফিরি বেরিয়ে গেল কেমন যেন ঝুঁকে পড়ে। মনে হল রাস্‌কোল্‌নিকভের সঙ্গে চোখাচোখি ইচ্ছে করে এড়িয়ে গেল। রাস্‌কোল্‌নিকভ জানলার দিকে এগিয়ে গেল, অপরিসীম বিরক্তির সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগল কখন, তার হিসাব মতো পর্‌ফিরি রাস্তায় বেরিয়ে আরও বেশ খানিকটা দূরে সরে যাবে। এরপর সে নিজেও দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

তিন

স্‌ভিদ্রিগাইলভের কাছে যাবার তাড়া ছিল তার। এই লোকটার কাছে ওর কী প্রত্যাশা থাকতে পারে তা ওর নিজেরও জানা ছিল না। কিন্তু এই মানুষটির মধ্যে যেন ওর ওপর প্রভুত্বকারী কোন ক্ষমতা নিহিত ছিল। একবার যখন সে তা উপলব্ধি করতে পারল তখন থেকে তার মনে আর কোন শান্তি রইল না। তাছাড়া এটাই উপযুক্ত সময়।

পথে যেতে-যেতে তাকে বিশেষ করে পীড়া দিচ্ছিল একটি প্রশ্ন: স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ কি পর্‌ফিরির কাছে গিয়েছিল? যতদূর সে বিচার করতে পারছিল তাতে হলফ করে বলতে পারে— না, যায়নি! বেশ কয়েকবার ভালো করে সে ভেবে দেখল, মনে করে দেখল পর্‌ফিরির সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতিটি খুঁটিনাটি। সিদ্ধান্ত করল: না, যায়নি! অবশ্যই যায়নি!

কিন্তু এখনও যদি না গিয়ে থাকে তাহলে যাবে কি যাবে না পর্‌ফিরির কাছে? এই মুহূর্তে, আপাতত রাস্‌কোল্‌নিকভের মনে হচ্ছিল যে যাবে না। কেন? তা সে বুঝিয়ে বলতে পারবে না, কিন্তু যদি পারতও তো এখন ও নিয়ে সে বিশেষ মাথা ঘামাত না। এসবই ওর কাছে যন্ত্রণাদায়ক। তবু এই নিয়ে ভাবার অবকাশও ওর ছিল না। যে কারও পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হলেও অদ্ভুত ঘটনা এই যে তার এখনকার ভাগ্য এবং আসন্ন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার ভাবনাচিন্তার গতিপ্রকৃতি কেমন যেন দুর্বল, অন্যমনস্ক ধরনের। তাকে যা পীড়া দিচ্ছিল তা অন্য কিছু, আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, অসাধারণ কিছু একটা— যা অন্য কাউকে নিয়ে নয়, একমাত্র তাকে নিয়েই ...কিন্তু অন্য কিছু...আর সেটাই মুখ্য। তার ওপর সে ভেতরে-ভেতরে উপলব্ধি করতে পারছিল সীমাহীন মানসিক অবসাদ, ক্লান্তি, যদিও আজ সকালে তার বিচারবুদ্ধিগত বেশ কিছু কালের মধ্যে যে-কোনদিনের তুলনায় অনেক ভালো কাজ করছিল।

কিন্তু এই যে এত কাণ্ড ঘটে গেল তারপর অতি নগণ্য এই সব নতুন বাধাবিপত্তি জয় করার চেষ্টা করতে যাবার কোন মূল্য আছে কি? তেমনি মূল্য আছে কি ফন্দি খাটিয়ে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌কে পর্‌ফিরির কাছে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টার এবং কোথাকার কোন্ এক স্‌ভিদ্রিগাইলাভ না কে... তার পেছনে অযথা সময় নষ্ট করার?

ওঃ কী বিরক্তিকরই না তার লাগছে এসব!

অথচ, এতসব সত্ত্বেও স্‌ভিদ্রিগাইলভের কাছে যাবার জন্য তার মন ছটফট করছিল। লোকটার কাছে সে কি আশা করছিল তার নিজের পক্ষে নতুন কিছু, কোন নির্দেশ বা উদ্ধারের কোন উপায়? ডুবন্ত মানুষ তো খড়কুটো আঁকড়ে ধরেও বাঁচতে চায়। ওদের দুজনের যে মিলন ঘটাচ্ছে সেটা কী? সে কি অদৃষ্ট, না কি কোন সহজাত প্রবৃত্তি? হয়ত বা নেহাতই ক্লান্তি বা হতাশা তার কারণ। হয়ত বা যাকে দরকার ছিল সে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ নয়, অন্য কেউ। স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌কে ঠিক সেই সময়

সামনে পাওয়া গিয়েছিল। সোনিয়া? কিন্তু সোনিয়ার কাছে এখন ও যাবেই বা কেন? আবার ওর কাছ থেকে চোখের জল ভিক্ষা করতে? হ্যাঁ, সোনিয়া ওর কাছে বিভীষিকা। সোনিয়া তার কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে অপ্রতিরোধ্য চরম দণ্ড ও অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্তের প্রতিমূর্তি। এখানে বেছে নেবার মতো পথ দুটোর একটা— হয় সোনিয়ার নয়ত স্‌ভিদ্রিগাইলভের। বিশেষত ঠিক এই মুহূর্তে সোনিয়াকে দেখার মতো মনের অবস্থা তার নেই। না, তার চেয়ে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌কে চেষ্টা করে দেখলে হয় না— জানতে পারলে হত না ওর পথটা কী? মনে-মনে সে স্বীকার না করে পারছিল না যে বাস্তবিকই বহুদিন হল স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌কে তার কী কারণে যেন দরকার ছিল।

তবু, ওদের দুজনের মধ্যে কী এমন সাধারণ ধর্ম থাকতে পারে? এমনকি ওদের যে দুষ্কর্ম তাও তো একরকম হতে পারে না। পরন্তু এই লোকটা রীতিমতো অপ্রীতিকর, স্পষ্টত অত্যন্ত নোংরা ধরনের, নিঃসন্দেহে ধূর্ত ও শঠ, হয়ত বা অত্যন্ত বদ। ওর সম্পর্কে এই লোকটার মাথার মধ্যে সবসময় নানারকম ফন্দিফিকির আর মতলব ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এই কয়েকদিন ধরে রাস্‌কোল্‌নিকভের মনের মধ্যে সর্বক্ষণ উঁকিঝুঁকি মারছে আরও একটা চিন্তা। তাতে সে ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়ছে। যদিও চিন্তাটা মাথা থেকে দূর করার জন্য তার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না— এতই দুঃসহ ছিল সেই চিন্তার বোঝা! কখন-কখন তার মনে হচ্ছিল স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ সব সময় তার আশেপাশে ঘুরঘুর করছে, এমনকি এখনও করছে। স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ ওর গোপন রহস্য জেনে ফেলেছে। দুনিয়ার বিরুদ্ধে স্‌ভিদ্রিগাইলভের দুরভিসন্ধি ছিল। আচ্ছা, এখনও যদি থেকে থাকে? হ্যাঁ, সম্ভবত বলাই যেতে পারে যে *আছে*। তাই এখন ওর গোপন রহস্য জানার পর এবং এই ভাবে ওর ওপর ক্ষমতা লাভ করে সেই অস্ত্র যদি সে দুনিয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার চেষ্টা করে তাহলে?

এই চিন্তা সময়-সময় তাকে পীড়িত করে— এমনকি স্বপ্নের মধ্যেও পীড়িত করে। কিন্তু এখন, স্‌ভিদ্রিগাইলভের কাছে যাবার পথে এই প্রথম তা বড় বেশি প্রকট হয়ে তার চেতনাকে প্রবলভাবে নাড়া দিল। শুধু এই চিন্তাতেই চাপা রাগে তার সমস্ত মন বিষিয়ে উঠল। প্রথমত, তাই যদি হয়, সেক্ষেত্রে সব কিছু বদলে যাবে — এমনকি তার নিজের অবস্থাই পালটে যাবে, তৎক্ষণাৎ দুনিয়ার কাছে তার নিজের সমস্ত গোপন রহস্য প্রকাশ করতে হবে। দুনিয়া যাতে কোন অসতর্ক পদক্ষেপ না করে তার জন্য ওর মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে তা করতে গেলে নিজেকে ধবিয়ে দেওয়া ছাড়া বোধহয় অন্য কোন উপায় নেই। চিঠির ব্যাপারটা? আজ সকালে দুনিয়া একটা চিঠি পেয়েছে! সেন্ট পিটার্সবুর্গে কার কাছ থেকে ও চিঠি পেতে পারে? লুজিনের কাছ থেকে? অবশ্য এটা ঠিক সেখানে বাজুমিখিন নজর রাখছে। কিন্তু

রাজুমিখিন কিছু জানে না। রাজুমিখিনের কাছেও কি তাহলে সব কথা খুলে বলা উচিত? একথা ভেবে বিতৃষ্ণায় ভরে গেল রাস্কোল্নিকভের মন।

'সে যাই হোক, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্ভিদ্রিগাইলভের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার,' শেষকালে সে মনে-মনে সিদ্ধান্ত করল। 'ভালো বলতে হবে যে এখানে খুঁটিনাটি ততটা নয়, যতটা দরকার মূল বিষয়টি। কিন্তু...কিন্তু একমাত্র সে ক্ষমতা যদি তার থাকে, যদি স্ভিদ্রিগাইলভ্ দুনিয়ার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত এঁটে থাকে তবেই...

এই সময়ের মধ্যে, এই এক মাসের মধ্যে রাস্কোল্নিকভ্ এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে একটিমাত্র সমাধান ছাড়া এ ধরনের প্রশ্নের আর কোন সমাধান তার পক্ষে খুঁজে বের করা সম্ভব হল না। 'সেক্ষেত্রে আমি ওকে খুন করব,' ভাবতে-ভাবতে হতাশ হয়ে পড়ল সে। ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল তার শরীরে। মনটা ভার হয়ে গেল। রাস্তার মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে চারধারে তাকিয়ে দেখতে লাগল— কোন্ পথে সে যাচ্ছে, কোথায় এসে পড়ল? এইমাত্র সেন্নায়া স্কোয়ার সে ছাড়িয়ে এসেছে, এখন সেখান থেকে তিরিশ-চল্লিশ পা দূরে বড় রাস্তার ওপর এসে পড়েছে। বাঁ দিকের বাড়ির দোতলার সবটা জুড়ে সস্তার হোটেল। সবগুলো জানলা হাঁ করে খোলা। জানলা দিয়ে লোকজন চলাফেরা করার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে— তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সেখানে তিল ধারণের জায়গা নেই। বড় হলঘরটা থেকে ভেসে আসছে গানের আওয়াজ। ক্ল্যারিওনেট আর বেহালা বাজছে, দুমদাম বাজছে তুর্কী ঢোলের বোল। মেয়েদের তীক্ষ্ণ গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কেন যে এই রাস্তাটায় মোড় নিল বুঝতে না পেরে সে ফিরে যাবার উদ্যোগ করছিল, এমন সময় হোটেলের একপ্রান্তে এক জানলায় সে দেখতে পেল স্ভিদ্রিগাইলভ্কে— চায়ের টেবিলের ধারে। জানলার একেবারে ধার ঘেঁষে বসে আছে পাইপ দাঁতে চেপে। দেখে সে ভীষণ অবাক হয়ে গেল। এমনকি আঁতকে উঠল। স্ভিদ্রিগাইলভ্ তাকে লক্ষ করছিল, চুপচাপ নিরীক্ষণ করছিল। যেটা রাসকোল্নিকভ্কে সেই মুহূর্তে অবাক করল তা এই যে স্ভিদ্রিগাইলভ্ যেন চোখে পড়ার আগেই চুপিচুপি, সরে পড়ার তাল করছে। রাস্কোল্নিকভ্ সঙ্গে- সঙ্গে এমন ভাব করল যেন তাকে দেখতে পায়নি— অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল, তবে আড়চোখে তার ওপর নজর রাখতে লাগল। উদ্বেগে বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল তার। যা ভেবেছিল তাই— দেখা যাচ্ছে, রাস্কোল্নিকভের চোখে পড়ে যাওয়া স্ভিদ্রিগাইলভের অভিপ্রেত নয়। পাইপটা ঠোঁট থেকে সরিয়ে নিয়েছে, গা ঢাকা দেওয়ার মতলব করছে। কিন্তু চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ানোর পর সম্ভবত হঠাৎ তার নজরে পড়েছে যে রাস্কোল্নিকভ্ তাকে দেখতে পেয়েছে এবং লক্ষ করছে। তাদের দুজনের মাঝখানে যা ঘটে গেল তা অনেকটা রাস্কোল্নিকভের ঘরে তাদের প্রথম সাক্ষাতের সেই দৃশ্যের মতো, যখন রাস্কোল্নিকভ্ মটকা মেরে ছিল। স্ভিদ্রিগাইলভের মুখে ফুটে উঠল কুটিল হাসি

— প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হয়ে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল সে হাসি। ওরা দুজনেই বুঝতে পারছিল যে দুজনে-দুজনকে দেখছে, একে অন্যের ওপর নজর রাখছে। অবশেষে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ জোরে হেসে উঠল।

"বেশ, বেশ! যদি চান তো চলেই আসুন না কেন। আমি এখানে!" জানলা থেকে চেঁচিয়ে সে বলল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌কে সে দেখতে পেল পেছনের খুব ছোট একটা কেবিনে। কেবিনের একটা জানলা বড় হলঘরের লাগোয়া। হলঘরে ছোট-ছোট কুড়িটা টেবিল, সেখানে ব্যবসায়ী, সরকারি আমলা আর নানা শ্রেণীর অসংখ্য লোকজন উদ্দাম সমবেত গানের হৈ-হল্লার মধ্যে চা পান করছে। কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে বিলিয়ার্ড বলের টুকটাক আওয়াজ। স্‌ভিদ্রিগাইলভের টেবিলে পড়ে আছে শ্যাম্পেনের একটা খোলা বোতল আর অর্ধেক গেলাসে ভরা মদ। এছাড়া সেখানে ছিল কলের গানের বাজন্যাদার একটি ছেলে আর বেশ স্বাস্থ্যবতী একটি মেয়ে— গায়িকা, বছর আঠারো বয়স, লাল টকটকে দুটি গাল মেয়েটির। কোনরকমে গুঁজে পরেছে ডোরাকাটা একটা ঘাগরা, মাথায় অস্ট্রিয়ান ট্রিয়ল টুপি— বিচিত্রবর্ণের ফিতে লাগান। পাশের ঘরের গানবাজনার পরোয়া না করে সে কলের গানের বাজনার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বিশ্রী ফ্যাঁসফেঁসে খাদের গলায় চাকরবাকর মহলে চলতি একটা গান গাইছিল।

"হয়েছে, আর নয়!" রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটিকে থামিয়ে দিল স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌। ভক্তি-গদগদ হয়ে প্রত্যাশাভরে সে দাঁড়িয়ে রইল। ছড়া-পাঁচালীর সুরে চাকরবাকর মহলের চটকদার গান যখন সে গাইছিল তখনও তার মুখে ছিল এই একই গম্ভীর ও ভক্তি-গদগদ ভাব।

"এই ফিলিপ, আরও একটা গেলাস!" স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ হাঁক দিল।

"আমি মদ খাব না," রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ বলল।

"সে আপনার যা অভিরুচি, আমি আপনার জন্যে বলিনি। নাও, কাতিয়া! আজ আর কিছু চাই না, কেটে পড়!" স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ পুরো এক গেলাস মদ তাকে ঢেলে দিয়ে এক রুবলের একটা নোট বের করে টেবিলের ওপর রাখল। কাতিয়া চোঁ-চোঁ করে পুরোটা শ্যাম্পেন খেয়ে ফেলল— অবশ্য মেয়েদের পক্ষে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব— অর্থাৎ একচুমুকে হলেও অন্তত বিশ বার ঢোক গিলে। তারপর নোটটা তুলে নিয়ে স্‌ভিদ্রিগাইলভের হাতে চুমু গেল। স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ বেশ গুরুত্ব দিয়েই সেই উদ্দেশ্যে হাতখানা সামনে বাড়িয়ে দিয়েছিল। মেয়েটি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে তার পেছন-পেছন বাজিয়ে ছেলেটাও গুটিগুটি বেরিয়ে গেল। ওদের দুজনকেই রাস্তা থেকে ডেকে আনা হয়েছিল। স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ সেন্ট পিটার্সবুর্গে আছে এক সপ্তাহও হয়নি, কিন্তু এরই মধ্যে চারধারে মুরুব্বি হিসাবে বেশ শক্ত ভিত করে ফেলেছে। হোটেলের

ভৃত্য ফিলিপও তার 'পরিচিত,' তার খিদমত করতে পারলে বর্তে যায়। বড় হলঘরের দিককার দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করা যায়। এই কেবিনে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌কে দেখে মনে হচ্ছিল সে তার নিজের বাড়িতেই আছে, কোন-কোন সময় হয়ত সারাদিন সে এখানেই কাটায়। হোটেলটা নোংরা, মাঝারি স্তরেরও বলা যায় না— একেবারে রদ্দিমার্কা।

"আমি আপনার কাছে যাচ্ছিলাম, আপনার খোঁজেই যাচ্ছিলাম," রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ শুরু করল, "কিন্তু সেন্নায়া স্কোয়ার ছাড়ার পর হঠাৎ কেন এই রাস্তায় মোড় নিলাম জানি না। আমি এদিকে কখনও মোড় নিই না, এই রাস্তায় আসিও না। সেন্নায়া থেকে আমি ডান দিকে ঘুরি। তাছাড়া আপনার বাড়ি যাবার পথ তো এটা নয়। মোড় নিতেই দেখি আপনি! অদ্ভুত যোগাযোগ।"

"সরাসরি বললেই তো পারেন যে অলৌকিক!"

"কেননা এটা হয়ত নিছক আকস্মিক যোগাযোগ।"

"আপনারা সব কী অদ্ভুত ধরনের লোক বলুন তো!" হো হো করে হেসে উঠল স্‌ভিদ্রিগাইলভ। "ভেতরে-ভেতরে দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করলে কী হবে বাইরে কিছুতেই স্বীকার করবেন না! আপনি নিজেই তো বলছেন 'হয়ত' নিছক আকস্মিক যোগাযোগ। নিজের ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে ভয় পেয়ে যায় এখানে এমন কত লোক যে আছে আপনি ধারণা করতে পারবেন না, রোদিওন রমানোভিচ! আমি আপনার কথা বলছি না। আপনার নিজস্ব মতামত আছে এবং আছে বলে আপনি যে ভয়ে জড়সড় তাও নয়। এই কারণেই না আপনার সম্পর্কে আমার এত কৌতূহল।"

"এর বেশি কিছু নয়?"

"আরে এটাই তো যথেষ্ট।"

স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌কে দেখে বোঝাই যাচ্ছিল যে ফুর্তিতে আছে— অবশ্য সামান্য মাত্রায়। মাত্র আধ গেলাস মদ তার পেটে পড়েছে।

"আমার মনে হয়, আপনি যাকে নিজস্ব মতামত বলছেন আমি যে তা পোষণের ক্ষমতা রাখি তা জানার আগেই আপনি আমার কাছে এসেছিলেন, তাই না?" রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ মন্তব্য করল।

"কিন্তু তখন সে তো অন্য ব্যাপার ছিল। প্রত্যেকেরই নিজস্ব পন্থা আছে। তবে অলৌকিক ঘটনা প্রসঙ্গে আপনাকে বলি, আমার মনে হয় গত দু-তিন দিন আপনি ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন। আমি নিজে আপনাকে এই হোটেলের কথা বলেছি এবং আপনি যে সোজা এখানে চলে এসেছেন তার মধ্যে অলৌকিক কোন ব্যাপার নেই। এখানে আসার পথ আমি আপনাকে ভালোমতো বুঝিয়ে দিয়েছি, ঠিক কোন্‌ জায়গায় সে কথা বলেছি, এমনকি কোন্‌ সময় আমাকে এখানে পেতে পারেন তাও বলেছি। মনে নেই আপনার?"

"ভুলে গেছি," অবাক হয়ে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ উত্তর দিল।

"আপনার কথা আমি বিশ্বাস করছি। আপনাকে দু-বার বলেছি। তাইতেই আপনি যন্ত্রচালিতের মতো এদিকে মোড় নিয়েছিলেন। এলেন কিন্তু ঠিক ঠিকানা ধরে— যদিও আপনার নিজের অজান্তে। আমি যখন আপনাকে বলছিলাম তখনও কিন্তু আমার ভরসা ছিল না যে আপনি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন। আপনি নিজেকে বড় বেশি প্রকাশ করে ফেলছেন রোদিওন রমানোভিচ। আরও একটা জিনিস: আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সেন্ট পিটার্সবুর্গে এমন বেশ কিছু লোক আছে যারা পথ চলতে-চলতে আপন মনে কথা বলে। এটা আধ-পাগলাদের শহর। আমাদের দেশে যদি বিজ্ঞান বলে কিছু থাকত তাহলে চিকিৎসাবিজ্ঞানী, আইনবিদ আর দার্শনিকরা তাঁদের নিজের-নিজের শাখায় সেন্ট পিটার্সবুর্গকে নিয়ে অতি মূল্যবান গবেষণা করতে পারতেন। সেন্ট পিটার্সবুর্গের মতো এমন জায়গা খুব কম আছে যেখানে মানুষের মনের ওপর বিষণ্ণতার এত বেশি তীব্র ও আশ্চর্য প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। একমাত্র আবহাওয়ার প্রভাবের কথাই একবার ভেবে দেখুন না! অথচ এ শহর সারা রাশিয়ার প্রশাসনিক কেন্দ্র, এর প্রকৃতি সব কিছুতে প্রতিফলিত হতে বাধ্য। কিন্তু এখন ব্যাপারটা তা নয়, ব্যাপারটা এই যে আমি ইতিমধ্যে বারকয়েক পাশ থেকে আপনাকে লক্ষ করে দেখেছি। আপনি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় মাথা উঁচু করেই বের হন, কিন্তু বিশ পা মতো এগোনর পর মাথা নিচু করেন, হাতদুটো জোড়া করে পিছন দিকে রাখেন। আপনি তাকিয়ে থাকেন বটে কিন্তু দেখে মনে হয় কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না— না সামনে, না পাশে। শেষকালে ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় করে আপন মনে কী সব আওড়াতে থাকেন, অনেক সময় আবার একটা হাত পেছন দিক থেকে ছাড়িয়ে এনে হাত নেড়ে আবৃত্তি করেন, শেষকালে রাস্তার মাঝখানে বেশ খানিকক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থাকেন। এটা খুব একটা ভালো লক্ষণ নয়। আমি না হয়ে অন্য কেউ যদি এই অবস্থায় আপনাকে দেখতে পায় তো আপনার পক্ষে সেটা সুবিধের হবে না। আমার অবশ্য আসলে তাতে কিছু এসে যায় না, আমি আপনার চিকিৎসা করতে যাচ্ছি না। তবে আপনি নিশ্চয়ই আমার কথাটা বুঝতে পারছেন।"

"আপনি কি জানেন আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখা হয়েছে?" অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকে খুঁটিয়ে দেখতে-দেখতে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ জিগ্‌গেস করল।

"না, ওরকম কিছু জানি না তো!" অনেকটা যেন আশ্চর্যই হয়ে গেল স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌।

"যাক গে, আমার কথা ছেড়ে দিন," ভুরু কুঁচকে বিড়বিড় করে বলল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌।

"বেশ, আপনার কথা ছেড়ে দিচ্ছি।"

'তার চেয়ে বলুন দেখি, আপনি যদি এখানে মদ্যপান করতেই আসেন এবং

নিজেই দুবার আমাকে এখানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তাহলে তখন রাস্তা থেকে জানলার ওপর আমার দৃষ্টি পড়তে আপনি গা ঢাকা দিয়ে সটকে পড়ার মতলব করছিলেন কেন? এটা কিন্তু আমার স্পষ্ট নজরে পড়েছে।"

"হে-হে! তাহলে আমি যখন আপনার ঘরের চৌকাটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম তখন আপনি চোখ বুজে মটকা মেরে পড়ে ছিলেন কেন? আপনি তো তখন আদৌ ঘুমোচ্ছিলেন না! এটা আমার স্পষ্ট নজরে পড়েছে।"

"আমার... আমার কোন কারণ থাকতে পারত... সে আপনি নিজেই জানেন।"

"আমারও হয়ত কোন কারণ থাকতে পারত, যদিও আপনি তা কখনও জানতে পারবেন না।"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ ডান হাতের কনুই টেবিলে ঠেকাল। ডান হাতের আঙুলে থুতনি ঠেকিয়ে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল স্‌ভিদ্রিগাইলভের দিকে। মিনিটখানেক ধরে তার মুখটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল। স্‌ভিদ্রিগাইলভের মুখ অবশ্য এর আগেও সবসময় তাকে বিস্মিত করেছে। কেমন যেন অদ্ভুত মুখ— অনেকটা মুখোশের মতো— সাদা, গোলাপি। ঠোঁটদুটো লাল টকটকে, গোলাপি; ফেকাসে রঙের দাড়ি, মাথার চুল এখনও বেশ ঘন, তারও রং ফেকাসে। চোখের রং যেন বড় বেশি নীল, দৃষ্টি বড় বেশি থমথমে, স্থির। বয়সের তুলনায় অতিমাত্রায় তারুণ্যদীপ্ত এই সুন্দর মুখটিতে এমন একটা কিছু ছিল যা ভীষণ অপ্রীতিকর। স্‌ভিদ্রিগাইলভের বেশভূষা কায়দাদুরস্ত, গ্রীষ্মকালের উপযোগী, হালকা। বিশেষ করে দেখার মতো তার ভেতরের জামাটা। হাতের একটা আঙুলে বিশাল আংটি, তাতে দামি পাথর বসান।

"তাহলে আমাকে এখন কি সত্যি-সত্যি আপনাকে নিয়েও পড়তে হবে?" ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়তে শিহরিত হয়ে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ দুম করে সরাসরি বলে বসল। যদিও কারও ক্ষতি করতে চাইলে আপনিই হয়ত সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক লোক, কিন্তু তাই বলে আমি আর নতি স্বীকার করতে রাজি নই। আমি এখন আপনাকে দেখাব যে আপনি সম্ভবত যেমন ভাবছেন আমি আসলে আমার নিজের প্রাণের তেমন মায়া করি না। জেনে রাখুন তাহলে, আমি আপনার কাছে এসেছি সরাসরি এই কথাই জানিয়ে দিতে যে আমার বোনের ব্যাপারে আপনি যদি এখনও আপনার আগেকার অভিসন্ধি মনে-মনে পোষণ করে থাকেন এবং সম্প্রতি যা প্রকাশও পেয়েছে, উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যদি তার অংশমাত্রও কাজে লাগানোর মতলব করেন তাহলে আপনি আমাকে জেলহাজতে পাঠানোর আগেই আমি আপনাকে খুন করব। আমার যা কথা তাই কাজ। আপনি জানেন যে কথা রাখার ক্ষমতা আমার আছে। দ্বিতীয়ত, আমাকে যদি আপনার জানানোর কিছু থাকে... কেননা ইদানীং সর্বক্ষণ আমার মনে হচ্ছিল আপনি যেন আমাকে কিছু বলতে চান... তাহলে যা জানানোর চটপট জানিয়ে দিন, কারণ সময়ের দাম আছে এবং সম্ভবত খুব শিগগিরই আর সময় পাওয়া যাবে না।"

"আহা, অত তাড়াহুড়োর কী আছে?" কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকে নিরীক্ষণ করতে-করতে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ জিজ্ঞেস করল।

"প্রত্যেকেরই নিজস্ব পন্থা আছে," মুখ গোমড়া করে অসহিষ্ণুভাবে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ বলে উঠল।

"আপনি নিজে এইমাত্র অকপট হওয়ার জন্য হাঁকডাক করছিলেন, অথচ প্রথম প্রশ্নেরই উত্তর দিতে অস্বীকার করছেন," স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ সাহাস্যে মন্তব্য করল। "আপনার কেবল মনে হচ্ছে আমার কোথায় কোন্‌ উদ্দেশ্য আছে। তাই আপনি আমাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। তা আপনার মনের যা অবস্থা তাতে এটা খুবই স্বাভাবিক— সে আমি বেশ বুঝি। কিন্তু আপনার সঙ্গে বনিবনা করার যত ইচ্ছেই আমার থাকুক না কেন, তবু ঠিক উলটো কথা বলে আপনাকে বুঝ দেওয়ার কষ্ট আমি স্বীকার করতে রাজি নই। সত্যি বলছি, ওরকম খেলার কানাকড়ি দাম নেই। তাছাড়া আপনার সঙ্গে তেমন বিশেষ কথা বলার অভিপ্রায়ও আমার ছিল না।"

"তাহলে আপনার কী প্রয়োজন ছিল আমার কাছে? আপনি আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করছিলেন, তাই না?"

"সে তো নিছক কৌতূহলের বস্তু হিসেবে, পর্যবেক্ষণের জন্য। আপনার পরিস্থিতির অসাধারণত্বের কথা মনে করে আপনাকে আমার ভালো লেগেছিল— এই হল ঘটনা! তাছাড়া আপনি হলেন এমন একজনের ভাই যার প্রতি আমার বিশেষ দুর্বলতা ছিল। এবং শেষ কথা হল সেই একজনের মুখে আমি এককালে প্রায়ই আপনার সম্পর্কে এত বেশি কথা শুনেছি যে বলার নয়। তা থেকে আমার ধারণা হয়েছিল যে তাঁর ওপর আপনার প্রভাব বিরাট। এটাই কি যথেষ্ট নয়? হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভালো কথা, আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে আপনার প্রশ্ন আমার কাছে অত্যন্ত জটিল, আমার পক্ষে আপনাকে এর উত্তর দেওয়া কঠিন। বেশ তো? এই ধরুন না কেন আপনি এখন যে আমার কাছে এসেছেন তা তেমন কোন কাজ নিয়ে নয়— স্রেফ নতুন কিছু পাবার আশায়— তাই না? কী বলেন? তাই তো? তাই না?" ধূর্ত হাসি হেসে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ একরোখার মতো বলল, "এরপর তাহলে নিশ্চয়ই ধারণা করতে পারেন যে এখানে আসার সময় ট্রেনের কামরাতে বসে-বসেই আমিও কেমন আপনার ওপর ভরসা করেছিলাম, ভেবেছিলাম যে আপনিও আমাকে *নতুন* কিছু বলবেন এবং আপনার কাছ থেকে আমি কিছু পেতেও পারি। তাহলে দেখুন আমরা কত সম্পদশালী!"

"কী পাবার আছে আবার?"

"কী বলব আপনাকে? সে কি আর আমি জানি? দেখছেন কি বিতিকিচ্ছিরি একটা সস্তার হোটেলে আমি সব সময় বসে থাকি। তবু এটা আমি উপভোগ করি... মানে উপভোগ করা বললে একেবারে ঠিক হবে না, ওই আর কি... কোথাও তো বসে

সময় কাটাতে হবে। এই দেখুন না কেন বেচারি কাতিয়া... দেখেছেন তো ওকে? ... ধরুন, আমি যদি অন্তত পেটুক বা ইংলিশ ক্লাবের ভোজনবিলাসীও হতাম, তা নয়ত, দেখুন না... এখানে খাওয়া বলতে তো এই!" এককোনায় একটা ছোট্ট টেবিলের ওপর একটা টিনের রেকাবিতে বীভৎস চেহারার কিছু মাংস আর আলুর উচ্ছিষ্ট আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সে বলল। "হ্যাঁ ভালো কথা, আপনি খেয়েছেন তো? আমি সামান্য কিছু দাঁতে কেটেছি। আর খাবার ইচ্ছে নেই। মদ আমি বলতে গেলে খাই না। শ্যাম্পেন ছাড়া আর কিছু চলে না। তা ওই শ্যাম্পেনও এক গেলাসে সারাটা সন্ধে চলে যায়। তাতেও আবার মাথা ব্যথা করে। এখন এই যে অর্ডার দিয়েছিলাম তা নেহাত একটু চাঙ্গা হওয়ার জন্যে, কেননা আমি একটা কোথাও যাবার আয়োজন করছি, আগে আমি যে স্কুল-পালানো ছেলের মতো গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করছিলাম তার কারণ এই যে আমি ভেবেছিলাম আপনি আমার ব্যাঘাত ঘটাবেন। তবে মনে হচ্ছে..." ঘড়ি বের করে সে বলল,... "ঘণ্টাখানেক আপনার সঙ্গে কাটাতে পারি। এখন সাড়ে চারটে। বিশ্বাস করুন, জমিদার, নয়ত একজন আদর্শ পিতা, ঘোড়সওয়ার বাহিনীর অফিসার, ফটোগ্রাফার, সাংবাদিক— অন্তত কিছু একটা যদি হতে পারতাম!... তা নয় তো কিছুই না...কোন যোগ্যতাই আমার নেই! সময়-সময় বড় বেজার লাগে। আমি কিন্তু সত্যিই ভেবেছিলাম যে আপনি আমায় নতুন কিছু বলবেন।"

"আপনি তাহলে কে? কী কারণে আপনার এখানে আসা?"

"আমি কে? আপনি জানেন, আমি একজন বাবুশ্রেণীর লোক। দুবছর ঘোড়সওয়ার বাহিনীতে কাজ করেছি। তারপর এই এখানে, সেন্ট পিটার্সবুর্গে বিস্তর চরে বেড়িয়েছি, পরে মার্ফা পেত্রোভ্‌নাকে বিয়ে করে গ্রামে বসবাস করতাম। এই হল আমার জীবনকাহিনী!"

"আপনি বোধহয় জুয়াড়ি, তাই না?"

"না, জুয়াড়ি কিসের? জুয়াড়ি নয়— জুয়াচোর।"

"আপনি জুয়াচোর?"

"হ্যাঁ, জুয়াচোর তো ছিলামই।"

"তাহলে উত্তম-মধ্যমও কপালে জুটেছে?"

"তা জুটেছে বৈকি! কিন্তু তাতে কী?"

"তার মানে ডুয়েল লড়ারও সম্ভাবনা ছিল আপনার... তা মন্দ নয়, মোটের ওপর মনটা তাজা থাকে।"

"আপনার বিরোধিতা করছি না, তাছাড়া দার্শনিকতা করার এলেম আমার নেই। আপনার কাছে স্বীকার করতে বাধা নেই, আমি এখানে যে এত তাড়াহুড়ো করে এসেছি তার বড় কারণ মেয়েমানুষ।"

"স্ত্রীকে সমাধিস্থ করার সঙ্গে-সঙ্গে?"

"হ্যাঁ, তাই," বিজয়ীর প্রাণখোলা হাসি হাসল স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌। "কিন্তু তাতে কী আছে? মেয়েমানুষদের সম্পর্কে যে আমি এমন কথা বলছি তার মধ্যে আপনি খারাপ কিছু দেখছেন নাকি?"

"অর্থাৎ, লাম্পট্যের মধ্যে আমি খারাপ কিছু দেখছি কিনা?"

"লাম্পট্য! বোঝ কাণ্ড! সে যাই হোক, একে-একে আপনার উত্তর দিচ্ছি— প্রথমেই বলি সাধারণভাবে মেয়েমানুষ সম্পর্কে। জানেন, আমি বাচালতা করার মেজাজে আছি। সংযম করতে যাব কেন বলুন তো? মেয়েমানুষ পেলে ছেড়ে দেব কেন, যখন আমি তাদের মর্ম বুঝি? এও অন্তত একটা বৃত্তি তো বটে!"

"তাহলে লাম্পট্যই এখানে আপনার একমাত্র ভরসা?"

"হলই বা তাই, তাতে কী? লাম্পট্য আপনাদের মাথায়। তবে আমার অন্তত সরাসরি প্রশ্নই পছন্দ। এই লাম্পট্যের মধ্যে অন্তত এমন কিছু আছে যা স্থায়ী, যা কল্পনার আওতায় পড়ে না। এমনকি তার ভিত্তি মানুষের প্রকৃতি, মানুষের রক্তের ভেতরে জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো সর্বক্ষণ তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। তা চিরকাল মানুষকে দগ্ধ করে এবং আরও অনেক-অনেক কাল ধিকি-ধিকি জ্বলতে থাকে ভেতরে-ভেতরে, বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে চট করে নিভে যায় না। তাহলে এটা যে ধরনের বৃত্তি তা মানবেন তো?"

"এতে উল্লসিত হওয়ার কী আছে? এটা এক ধরনের ব্যাধি, বিপজ্জনক।"

"বোঝ কাণ্ড! মানছি এটা একটা ব্যাধি। যা কিছু সীমা ছাড়িয়ে চলে যায় তাকে যদি ব্যাধি বলি তাহলে এটাও একটা ব্যাধি। এখানে অবশ্যই সীমা ছাড়িয়ে যেতে হচ্ছে— তবে হ্যাঁ, প্রথমত একজনের ক্ষেত্রে একরকম আরেকজনের ক্ষেত্রে আরেক রকম। দ্বিতীয়ত, বলাই বাহুল্য মানুষকে সব কাজে একটা মাত্রা মেনে চলতে হয়, হিসাব করে চলতে হয়, তা সে মানুষ যত নীচই হোক না কেন— এ ছাড়া আর উপায় কী? তা যদি না হত তাহলে সম্ভবত গুলি করে আত্মহত্যা করতে হত। আমি মানছি যে শিষ্ট লোকজন একঘেয়েমির মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য। কিন্তু তবু..."

"আপনি কি ইচ্ছে করলে আত্মহত্যা করতে পারতেন?"

"আহা ও কথা কেন?" বিরক্তির সঙ্গে এড়িয়ে গেল স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌। "আপনার কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ— দয়া করে ও কথা বলবেন না," এর আগে কথার মধ্যে এত যে হামবড়া ভাব ফুটে উঠেছিল তার ধারেকাছে না গিয়ে সে তাড়াতাড়ি যোগ করল। এমনকি ওর মুখের ভঙ্গিও যেন কেমন পালটে গেল। "দুর্বলতাটা আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে," সে বলল, "কিন্তু কী করি বলুন? মরণকে ভয় পাই। লোকে যখন তার কথা বলে তখন ভালো লাগে না। আপনি কি জানেন যে আমি অনেকটা মিস্টিক?"

"ওঃ! আপনার স্ত্রীর ভূত! এখনও আসা-যাওয়া করছে নাকি?"

"ওঃ! ওকথা আর বলবেন না! সেন্ট পিটার্সবুর্গে এখনও দেখা দেয়নি। মরুক গে!" কেমন যেন বিরক্তির ভাব করে চেঁচিয়ে বলল। "না আসুন বরং আমরা... যা হোক... হুম্! এঃ খুব একটা সময়ও হাতে নেই দেখছি। আপনাকে বেশিক্ষণ সঙ্গ দিতে পারছি না। আফসোসের কথা। একটা কথা জানানোর ছিল আপনাকে।"

"কিসের কথা? মেয়েমানুষের কথা নাকি?"

"হ্যাঁ, তাই বটে। এই একেবারে আকস্মিক একটা ঘটনা আর কি... না, ঠিক তাও নয়।"

"কিন্তু এই যে অবস্থা, এর মধ্যে এই যে এত নোংরামি— এসব কি আপনার ওপর এতটুকু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না? কোথায় থামতে হয় তা বোঝার ক্ষমতাও কি আপনি হারিয়ে ফেলেছেন?"

"আপনার কি তা আছে বলে দাবি করছেন? হাঃ-হাঃ-হাঃ! আপনি এখন আমাকে অবাক করে দিলেন যে রোদিওন রমানোভিচ! —যদিও আমি আগে থাকতেই জানতাম যে এই রকম কিছু একটা ঘটবে। আপনি কিনা লাম্পট্য আর নন্দনতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন আমাকে! আপনি শিলার, আপনি একজন আদর্শবাদী! ব্যাপারটা অবশ্য এরকমই হওয়া উচিত, বরং অন্যরকম হলেই আশ্চর্যের হত। তবু কিন্তু বাস্তবে দেখতে গেলে কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয়।... ইস্ হাতে সময় কম বলে আফসোস হচ্ছে, কারণ আপনি নিজেই কৌতূহলজনক বিষয়বস্তু! হ্যাঁ ভালো কথা, আপনি কি শিলার পছন্দ করেন? আমার কিন্তু ভারি পছন্দ।"

"আঃ ভারি নিজের ঢাক পেটান তো আপনি!" বেশ খানিকটা বিরক্ত হয়ে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বলল।

"না, মাইরি বলছি, একদম না!" হো-হো করে হাসতে-হাসতে বলল স্‌ভিদ্রিগাইলভ্। "সে যা হোক তর্ক করতে যাচ্ছি না, না হয় পেটালামই। নিজের ঢাক নিজে পেটাতে বাধাটা কোথায়, যদি তার ফলে কারও কোন ক্ষতি না হয়? আমি সাত বছর মার্ফা পেত্রোভ্‌নার কাছে গ্রামে থেকেছি, তাই এখন আপনার মতো একজন বুদ্ধিমান মানুষকে পেয়ে—বুদ্ধিমান এবং সেই সঙ্গে অতিমাত্রায় কৌতূহলজনক একজনকে পেয়ে বড় আনন্দ পাচ্ছি একটু বাচালতা করে। তাছাড়া এই যে এই আধ গেলাস মদ খেয়েছি তাতে মাথাটা সামান্য ঝিমঝিমও করছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, একটা বিষয় আছে যা আমার মেজাজটাকে বেশ তুঙ্গে উঠিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সে সম্পর্কে আমি...চুপ করে থাকাই সমীচীন বোধ করছি। আরে, আপনি চললেন কোথায়?" হঠাৎ ভীত কণ্ঠে জিগ্‌গেস করল স্‌ভিদ্রিগাইলভ্।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ উঠে পড়ার উদ্যোগ করছিল। তার মন ভার হয়ে গিয়েছিল। দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এখানে এসে পড়েছে বলে তার কেমন যেন বেয়াড়া লাগছিল।

স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌কে দেখে তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে ওর মতো অসার, এত বাজে ও খল প্রকৃতির মানুষ দুনিয়ায় দুটো নেই।

"আহা! একটু বসুন, থেকে যান আরেকটু!" স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ মিনতির সুরে বলল। "নিজের জন্যে অন্তত একটু চা আনিয়ে নিন। একটু বসুন না। থাক, আমি আর বাজে বকব না, মানে নিজের সম্পর্কে আর কিছু বলছি না। আমি আপনাকে এই অমনি কিছু বলব। মানে, আপনি যদি চান, একজন মহিলা—আপনার রীতিতে বলতে গেলে...কীভাবে আমাকে 'উদ্ধার করে' সেই কাহিনীই না হয় আপনাকে শোনাই? এতে এমন কি আপনার প্রথম প্রশ্নেরও উত্তর আপনি পেয়ে যাবেন, কারণ সেই বিশেষ ব্যক্তিটি আপনারই ভগিনী। বলব তাহলে? এতে অবশ্য সময়টাও কাটান যাবে।"

"বলুন, তবে আশা করি আপনি..."

"না, না, চিন্তা করবেন না! তাছাড়া আমার মতো একজন অতি নোংরা ও নচ্ছার লোকের মনেও আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না একমাত্র গভীর শ্রদ্ধারই উদ্রেক করতে পারেন।"

চার

"আপনি সম্ভবত জানেন—হ্যাঁ, প্রসঙ্গত আমি নিজে আপনাকে বলেওছি," স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ শুরু করল, "আমাকে একবার এখানে বিপুল পরিমাণ ঋণের দায়ে হাজতবাস করতে হয়েছিল। ঋণ শোধ করার মতো এতটুকু উপায় বা সঙ্গতি আমার ছিল না। সেই সময় মার্ফা পেত্রোভ্‌না কীভাবে টাকা শোধ করে আমাকে খালাস করে নিয়ে আসেন তার বিশদ বিবরণের মধ্যে আমি যাচ্ছি না। ভালোবাসার নেশায় অনেক সময় মেয়েদের মাথা যে কীরকম ঘুরে যেতে পারে তা আপনি জানেন কি? উনি ছিলেন সচ্চরিত্রের মহিলা। বোকা তাঁকে মোটে বলা যায় না, যদিও শিক্ষাদীক্ষার বালাই তাঁর একেবারে ছিল না। ধারণা করতে পারেন, এই সৎ প্রকৃতির মহিলাই অসংখ্যবার তুলকালাম কাণ্ড ও খিটিমিটি বাধার পর ঈর্ষার বসে শেষকালে এত নিচে নেমে গেলেন যে আমার সঙ্গে একটা চুক্তি করে বসলেন—আমাদের বিবাহিত জীবনের আগাগোড়া সেখান থেকে একচুল সরলেন না। ঘটনা এই যে উনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন, তাছাড়া সবসময় লবঙ্গ বা ওইজাতীয় কিছু একটা মুখে পুরে থাকতেন। আমার মনটা ছিল এত কদর্য, অথচ একদিক থেকে আমি এতই সৎ ছিলাম যে স্পষ্টাস্পষ্টি তাঁকে একথা জানতে দ্বিধা বোধ করলাম না যে তাঁর প্রতি অবিচল নিষ্ঠা থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার এই স্বীকারোক্তির ফলে উনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তবে মনে হয় আমার স্থূল ধরনের খোলাখুলি মনোভাব ওঁর একরকম ভালোই লেগেছিল। উনি হয়ত মনে-মনে ভাবলেন, 'আগে থাকতে যখন

জানিয়ে দিচ্ছে তার মানে আমাকে প্রতারণা করার কোন ইচ্ছে ওর নিজেরই নেই।' তা একজন ঈর্ষাপরায়ণ মহিলার পক্ষে এটা মুখ্য ব্যাপার। অনেকবার অনেক অশ্রুবিসর্জনের পর আমাদের মধ্যে এক ধরনের মৌখিক চুক্তি হল : আমি কখনও মার্ফা পেত্রোভ্‌নাকে পরিত্যাগ করব না এবং বরাবর ওঁর স্বামী থাকব। দ্বিতীয়ত, ওঁর অনুমতি ছাড়া কোথাও যেতে পারব না। তৃতীয়ত, বাঁধা কোনও রক্ষিতা আমি রাখতে পারব না। চতুর্থত, এর বিনিময়ে মার্ফা পেত্রোভ্‌নার অনুমতিক্রমে কখন-সখন গোলাবাড়ির কাজের ছুঁড়িগুলোর ওপর নজর দেবার অধিকার আমার থাকছে, তবে সে ক্ষেত্রে ঘটনাটা গোপনে তাঁর শ্রুতিগোচর হতে হবে। পঞ্চমত, ঈশ্বর না করুন আমি যেন কখনও আমাদের নিজেদের সমাজের কোন মহিলার প্রেমে না পড়ি। ষষ্ঠত, ঈশ্বর না করুন, আমি যদি নিতান্তই সে ধরনের কোন গভীর ও প্রবল আবেগের শিকার হয়ে পড়ি তাহলে মার্ফা পেত্রোভ্‌নার কাছে তা প্রকাশ করতে হবে। এই শেষের বিষয়টা সম্পর্কে অবশ্য মার্ফা পেত্রোভ্‌নার কোনকালে কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। উনি ছিলেন বুদ্ধিমতী মহিলা, সেই কারণে দুশ্চরিত্র লম্পট ছাড়া আর কিছু বলে আমাকে ভাবতে পারতেন না। তাই ধরেই নিয়েছিলেন যে সত্যি-সত্যি কারও প্রেমে পড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু মুশকিলটা এই যে বুদ্ধিমতী মহিলা আর ঈর্ষাকাতর মহিলা দুই ভিন্ন বস্তু। তাছাড়া কিছু লোকের নিরপেক্ষ বিচার করতে হলে আমাদের আশেপাশে সচরাচর যে-সমস্ত মানুষ ও বস্তু চোখে পড়ে তাদের প্রতি গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কিছু-কিছু বদ্ধমূল ধারণা আগে থাকতে আমাদের বর্জন করা উচিত। অন্য যে কারও বিচারবুদ্ধির তুলনায় আপনার বিচারবুদ্ধির ওপর বেশি আস্থা রাখার যথেষ্ট কারণ আমার আছে। আপনি হয়ত ইতিমধ্যে মার্ফা পেত্রোভ্‌না সম্পর্কে হাস্যকর ও অর্থহীন অনেক কথা শুনে থাকবেন। বাস্তবিকই ওঁর কিছু-কিছু অভ্যাস বড় বেশি মাত্রায় হাস্যকর ছিল। কিন্তু আমি সরাসরি আপনাকে বলছি, আমি যে তাঁর অসংখ্য দুর্গতির কারণ হয়েছিলাম সে কথা ভাবলে আমার দুঃখ হয়। যাকগে অনেক হয়েছে। একজন প্রবল অনুরাগী স্বামীর কাছ থেকে একজন প্রবল অনুরাগিণী স্ত্রীর সমাধিশিলায় খোদাই করে রাখার উপযোগী বাণী বটে—ভালো Oraison funèbre। আমাদের মধ্যে ঝগড়া হলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমি চুপ করে থাকতাম। মেজাজ খারাপ করতাম না। এই ভদ্রব্যবহারের উদ্দেশ্য প্রায় কোনসময়ই বিফলে যেত না। উনি এতে প্রভাবিত হতেন, এমনকি খুশিও হতেন। আমাকে নিয়ে তিনি গর্ব করেছেন এমন ঘটনাও ঘটেছে। সে যাই হোক আপনার ভগিনীটিকে উনি বরদাস্ত করতে পারলেন না। এরকম এক পরমা সুন্দরীকে বাড়িতে গভর্নেস হিসেবে বহাল রাখার ঝুঁকি যে উনি নিলেন সেটা কীভাবে সম্ভব হল? আমার ব্যাখ্যা এই যে মার্ফা পেত্রোভ্‌না বড় আবেগপ্রবণ ও অনুভূতিশীল মহিলা, উনি নিজে স্রেফ আপনার ভগিনীর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন—আক্ষরিক অর্থে প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। আর

আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না! আমি প্রথম দৃষ্টিতেই বেশ ভালো করে বুঝতে পেরেছিলাম যে গতিক ভালো নয়, তারপর—কী হল ভাবতে পারেন?—আমি ঠিক করলাম চোখ তুলে তাকাবই না ওঁর দিকে। কিন্তু আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না নিজেই প্রথম উদ্যোগটা নিলেন—বিশ্বাস হচ্ছে না? আপনি এও বিশ্বাস করবেন কি যে মার্ফা পেত্রোভ্‌না এতদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন যে আমি আপনার ভগিনীর প্রসঙ্গে সবসময় চুপ করে থাকতাম বলে এবং মার্ফা পেত্রোভ্‌নার মুখে তাঁর অবিরাম এত মুগ্ধ প্রশংসা শোনা সত্ত্বেও আমাকে তাঁর প্রতি উদাসীন থাকতে দেখে উনি প্রথম-প্রথম আমার ওপর বেশ রাগারাগি করতেন? আমি নিজেই বুঝতে পারছি না ওঁর কী উদ্দেশ্য ছিল! অবশ্য বলাই বাহুল্য, মার্ফা পেত্রোভ্‌না ওঁকে আমার সম্পর্কে যাবতীয় খুঁটিনাটি কিছু বলতে বাকি রাখেননি। মার্ফা পেত্রোভ্‌নার একটা খারাপ দিক ছিল—যাকে-তাকে আমাদের সমস্ত হাঁড়ির খবর না দিয়ে থাকতে পারতেন না এবং সকলের কাছে সবসময় আমার নামে নালিশ করে বেড়াতেন। এরকম একজন নতুন, চমৎকার বান্ধবী পেয়ে উনি যে সে সুযোগ হাতছাড়া করবেন না তাতে আর বিচিত্র কি! অনুমান করতে পারি ওদের কথাবার্তার বিষয়বস্তু আমি ছাড়া আর কিছু ছিল না এবং আমার নামে আরোপিত যত কেচ্ছা আর রহস্যজনক গালগল্প ইতিমধ্যে নিঃসন্দেহে আপনার ভগিনীর জানা হয়ে গিয়েছিল।...আমি বাজি ধরে বলতে পারি তার কিছু-কিছু আপনার কানেও এসেছে।"

"তা এসেছে। লুজিন এই মর্মেও আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন যে আপনি নাকি একটা বাচ্চার মৃত্যুর জন্য দায়ী। কথাটা কি সত্যি?"

"আপনার কাছে আমার অনুরোধ—দয়া করে ওসব নোংরা গালগল্প বাদ দিন," বিরক্তি ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল স্‌ভিদ্রিগাইলভ। "ওসব অর্থহীন বাজে জিনিস সম্পর্কে আপনি যদি নিতান্তই জানতে চান সে আমি অন্য একসময় আপনাকে বিশেষভাবে বলব, কিন্তু এখন..."

"আপনার গ্রামের এক ভৃত্য সম্পর্কেও কানাঘুষোয় শুনেছি যে সেখানেও নাকি আপনি কিসের জন্য দায়ী।"

"আপনার কাছে আমার অনুরোধ—থামুন! অনেক হয়েছে!" স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ তার অসহিষ্ণুতা চাপতে না পেরে আবার বাধা দিয়ে বলল।

"এ কি সেই ভৃত্য যে মৃত্যুর পর আপনার পাইপের তামাক ভরে দিতে এসেছিল?... সে গল্প আপনি নিজেই আমার কাছে করেছেন!" রাস্‌কোল্‌নিকভ্ উত্তরোত্তর বেশি মাত্রায় বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগল।

স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ মনোযোগ দিয়ে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে দেখে নিল। রাস্‌কোল্‌নিকভের মনে হল তার দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্য বিদ্যুৎচমকের মতো ঝলকে উঠল ক্রূর হাসি। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে সংযম হারাল না, যতদূর সম্ভব ভদ্রভাবে বলল :

"হ্যাঁ সে-ই বটে। আমি দেখছি এসবে আপনারও অপরিসীম আগ্রহ। অবকাশ পেলে প্রথম সুযোগেই এই সমস্ত বিষয়ে আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করা আমি আমার কর্তব্য বলে জ্ঞান করব। মরুক গে! আমি দেখতে পাচ্ছি কারও-কারও কাছে সত্যি-সত্যি উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে গণ্য হতে পারি। মার্ফা পেত্রোভ্না আপনার ভগিনীর কাছে আমার সম্পর্কে এত সব রহস্যজনক ও কৌতূহলজনক গল্প বলার পর তাঁর প্রতি আমি কী পরিমাণ কৃতজ্ঞ থাকতে পারি একবার ভেবে দেখুন! আপনার ভগিনীর মনে কী ছাপ ফেলেছিল তার বিচার আমি করতে যাচ্ছি না। তবে যাই হোক, এতে আমার লাভ হয়েছিল। আমার প্রতি আভ্দোতিয়া রমানোভ্নার মন স্বাভাবিকভাবে বিষিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এবং আমার চেহারার মধ্যে সব সময় একটা বিষণ্ণ ও ন্যক্কারজনক ভাব লেগে থাকলেও শেষকালে আমার প্রতি তাঁর করুণা হতে লাগল—এ করুণা একজন উচ্ছন্নে যাওয়া মানুষের প্রতি করুণা। আর, কোন যুবতীর মনে যদি *করুণার* উদ্রেক হয় তাহলে বলাই বাহুল্য সেটা তার পক্ষে সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক। এর সঙ্গে-সঙ্গে আসতে বাধ্য আপনাকে 'উদ্ধার' করার ইচ্ছে, আপনার শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার, আপনার পুনরুজ্জীবন ঘটানোর, আরও মহৎ কোন উদ্দেশ্যে আপনাকে সামিল করা এবং নতুন জীবন ও নতুন কোন কার্যকলাপে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার ইচ্ছে—মানে, বুঝতেই পারছেন, এই অবস্থায় যে ধরনের মনোভাব হয়ে থাকে। আমি তৎক্ষণাৎ আঁচ করতে পারলাম পাখি নিজেই জালে এসে উড়ে পড়বে। আমিও সেই ভাবে তৈরি হয়ে রইলাম। আপনি যেন ভুরু কোঁচকাচ্ছেন, রোদিওন রমানোভিচ? ও কিছু নয়, ঘটনাটা জানেনই তো, শেষপর্যন্ত কিছুই দাঁড়াল না। ...ধুত্তোর, কত মদ আমি গিলছি! ...জানেন আমার সবসময় আক্ষেপ হয় এই ভেবে যে দুর্ভাগ্যবশত আপনার ভগিনী খ্রিস্টজন্মের দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে কোন জায়গার কোন শাসনকর্তা বা বংশপরম্পরার রাজত্বকারী কোন প্রিন্স অথবা এশিয়া মাইনরের মতো কোন অঞ্চলে নিযুক্ত কোন রাজদূতের কন্যা হয়ে জন্মানোর সুযোগ পাননি। তাহলে যাঁরা শহিদত্ব বরণ করেছেন উনি নিঃসন্দেহে তাঁদের একজন হতে পারতেন এবং আগুনে তাতান সাঁড়াশি বুকে ছেঁকা দিয়ে তাঁকে পীড়ন করলে তিনি অবশ্যই হাসিমুখে তা সহ্য করতেন। উনি হয়ত নিজে ইচ্ছে করে সেই পথ বেছে নিতেন। আর সময়টা চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দী হলে হয়ত সন্ন্যাসিনী হয়ে মিশরের মরুভূমিতে চলে গিয়ে সেখানে গাছের শেকড়বাকড় খেয়ে অলৌকিক শক্তির ধ্যান করে ভাবোম্মাদ অবস্থায় তিরিশ বছর কাটিয়ে দিতেন। এর জন্যই ওঁর সমস্ত আকুলতা। কারও হয়ে যে কোনও ধরনের দুঃখ বরণ করার জন্য উনি উন্মুখ। সে দুঃখ যদি তাঁকে বরণ করতে দেওয়া না হয় তাহলে উনি সম্ভবত জানলা থেকে লাফিয়ে পড়বেন। রাজুমিখিন নামে একজনের সম্পর্কে কিছু-কিছু আমার কানে এসেছে। শুনেছি লোকটা বেশ বিচক্ষণ—ওঁর নামও অবশ্য সেই অর্থ বহন করে।

কোন ধর্মীয় সেমিনারিতে পড়াশোনা করা লোক হবে নিশ্চয়। তা উনিই না হয় আপনার ভগিনীর দেখাশোনার ভার নিন। এক কথায়, আমার মনে হয় আমি ওঁকে বুঝতে পেরেছি— এতে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি। কিন্তু সেই সময়— অর্থাৎ আলাপের শুরুতে, আপনি নিজেও জানেন লোকে সব সময় কেমন যেন বেশি করে চপলমতি আর বোকা-বোকা হয়ে যায়— তখন দেখার মধ্যে ভুল থেকে যায়, যা দেখার তা দেখতে পাওয়া যায় না। ধুত্তোর! জানি না, কেন উনি দেখতে এত ভালো! আমার দোষ নেই! এক কথায় আমার মধ্যে কামনার ভয়ঙ্কর দুর্বার তাড়না শুরু হয়ে গেল। আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না অসাধারণ শুদ্ধ চরিত্রের— এরকমটি দেখা যায় না, শোনা যায় না। খেয়াল রাখবেন, আমি আপনাকে আপনার ভগিনী সম্পর্কে একটা তথ্য হিসেবে এটা জানাচ্ছি। বুদ্ধির এত বিচার সত্ত্বেও ওঁর শুদ্ধতা এত বেশি বাড়াবাড়ি ধরনের যে তাকে সম্ভবত ব্যাধির পর্যায়ে ফেলা যায়। এতে কিন্তু ওঁর ক্ষতি হওয়ারই সম্ভাবনা। তা আমাদের ওখানে তখন একটা মেয়ে ছিল— পারাশা তার নাম। কালো চোখ। ওকে তখন সবে অন্য গ্রাম থেকে আনা হয়েছে। গোলাবাড়িতে কাজ করত। আগে আমি কখনও দেখিনি মেয়েটাকে। দেখতে-শুনতে বেশ ভালো, তবে অসম্ভব বোকা। কেঁদেকেটে সারা বাড়ি মাথায় করে এমন হাউমাউ শুরু করে দিল যে সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড! একবার খাওয়া-দাওয়ার পর আভ্‌দোতিয়া ইভানোভ্‌না তাঁর নিজের ইচ্ছায় খুঁজে-খুঁজে আমাকে একা বাগানের একটা তরুবীথিতে বের করলেন। চোখে ঝিলিক হেনে আমার দিকে তাকিয়ে আমার কাছে *দাবি* করলেন আমি যেন বেচারি পারাশাকে শান্তিতে থাকতে দিই। এটা বলতে গেলে আমাদের দুজনের প্রথম একান্তে কথাবার্তা। স্বাভাবিকভাবেই ওঁর ইচ্ছা পূরণ করা আমি সম্মানের কাজ বলে মনে করলাম এবং চেষ্টা করে ভান করলাম যেন আমি বিস্মিত ও বিমূঢ়। তা এক কথায়, অভিনয়টা মন্দ উতরোল না। শুরু হয়ে গেল সংযোগ, গোপনে কথাবার্তা, নীতিশিক্ষা, ধর্মোপদেশ, আবেদন-নিবেদন, অনুনয়-বিনয়, এমনকি অশ্রুবিসর্জন— 'বিশ্বাস করুন, এমনকি অশ্রুবিসর্জন— একেকটা মেয়ের মধ্যে প্রচারের আবেগটা কোন্ পর্যায়ে চলে যেতে পারে বুঝুন! আমি, বলা বাহুল্য সব দোষ আমার অদৃষ্টের ঘাড়ে চাপালাম, ভাব দেখালাম যে আলোর দিশা পাবার জন্য আমার প্রাণ আকুলি-বিকুলি করছে। অবশেষে নারীর মন জয় করার এক অব্যর্থ অস্ত্র প্রয়োগ করলাম— সে অস্ত্র এমনই যে তা কখনও কাউকে প্রতারণা করে না, কোনরকম ব্যতিক্রম ছাড়াই যে-কোন নারীর ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য— চরম ও অমোঘ। এই অস্ত্র সুপরিচিত— স্তুতিবাদ। পৃথিবীতে স্পষ্টবাদিতার চেয়ে কঠিন কিছু নেই, স্তুতিবাদের চেয়ে সহজ কিছু নেই। স্পষ্টবাদিতার মধ্যে যদি একশ ভাগের এক ভাগও মিথ্যার রেশ থাকে তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে তা বেসুরো হয়ে বাজে, ফলে ঝামেলার একশেষ কিন্তু স্তুতিবাদে যদি একেবারে শেষ স্বরগ্রামটি পর্যন্ত আগাগোড়া সবই মেকি

হয় তবু তা মধুর, কানে সুধা বর্ষণ করে। লোকে তা শুনে তৃপ্তি পায়। এই তৃপ্তি স্থূল প্রকৃতির হলেও এক ধরনের তৃপ্তি বটে। স্তুতি যত স্থূলই হোক না কেন তার মধ্যে অবশ্যই অন্তত অর্ধেক সত্যি বলে মনে হবে। সমাজের সর্বস্তরের, সর্বশ্রেণীর মানুষের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। স্তুতিবাক্য দিয়ে চিরকুমারী সন্ন্যাসিনীর মন পর্যন্ত জয় করা যায়। সাধারণ লোকের তো কোন কথাই নেই। আমি একবার স্বামী, সন্তান আর পরিবারের প্রতি অনুরক্ত এক সতীসাধ্বী রমণীকে কী ভাবে ফুঁসলেছিলাম তা মনে করলেও হাসি পায়। কী মজা, আর কাজটা কতই না সহজসাধ্য! অথচ মহিলা সত্যি-সত্যি সতীসাধ্বী ছিলেন — অন্তত তাঁর নিজস্ব ধারায়। আমার কৌশল বলতে যা ছিল তা হল তাঁর সতীত্বে মুগ্ধ হয়ে গদ্গদ চিত্তে প্রতি মুহূর্তে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জানান— স্রেফ এই। আমি নির্লজ্জভাবে তাঁর স্তুতি করতে থাকি এবং যেই মুহূর্তে তাঁর করস্পর্শ পাই, এমনকি আমার ওপর তাঁর দৃষ্টি উপলব্ধি করি অমনি এই বলে নিজেকে ভর্ৎসনা করি যে দোষটা আমারই— আমি তাঁকে জোর করে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি, উনিই বরং বাধা দিয়েছিলেন— এতই বাধা দিয়েছিলেন যে আমি যদি এমন দুশ্চরিত্র না হতাম তাহলে হয়ত কখনই কিছু পেতাম না। আমি এও বলি যে উনি নিষ্পাপ বলে আমার দুষ্ট অভিসন্ধি আগে থাকতে বোঝা তাঁর সাধ্য ছিল না এবং নিজের অজ্ঞাতসারে, স্রেফ না জেনেশুনে উনি নতি স্বীকার করেছেন ইত্যাদি-ইত্যাদি। এক কথায়, আমি সবই পেয়ে গেলাম আবার আমার সেই মহিলাটিরও পুরোদস্তুর এই দৃঢ় বিশ্বাস রয়ে গেল যে উনি নিষ্পাপ, সতী-সাধ্বী রমণী, সমস্তরকম দায়দায়িত্ব ঠিক-ঠিক পালন করছেন, আর তাঁর অধঃপতন যে ঘটেছে সেটা নিছক দৈবাৎ। শেষকালে আমি যখন তাঁকে জানালাম যে আমার আন্তরিক বিশ্বাস এই যে আমার মতো উনিও ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগে আগ্রহী ছিলেন তখন আমার ওপর উনি কী ভীষণ যে রেগে গেলেন! বেচারি মার্ফা পেত্রোভ্‌নাও স্তুতির কাছে অনায়াসে নতি স্বীকার করতেন, আমি যদি চাইতাম তাহলে ওঁর জীবদ্দশাতেই ওঁর সমস্ত তালুক আমি আমার নিজের নামে লিখিয়ে নিতে পারতাম।... কিন্তু আমি দেখছি খুব বেশি মদ্যপান করছি আর বকেও চলেছি।... আশা করি আপনি রাগ করবেন না যদি আমি এখন উল্লেখ করি যে আপনার ভগিনী আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার ওপরও আমি সেই একই প্রভাব সৃষ্টি করতে লাগলাম। তবে হ্যাঁ, এক্ষেত্রে আমি নিজে বোকামি আর অধৈর্যের পরিচয় দেওয়ায় গোটা ব্যাপারটা ভেস্তে যায়। এমনকি আগেও বেশ কয়েকবার— একবার তো বিশেষ করে— আমার চোখের ভাষা আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নার ভীষণ খারাপ লাগে— আপনি বিশ্বাস করেন? এক কথায়, আমার চোখের মধ্যে এমন একটা আগুনের শিখা ছিল যা ক্রমে অসতর্কভাবে, উত্তরোত্তর প্রবল হয়ে দীপ্তি পেতে থাকে, যার ফলে উনি ভয় পেয়ে যান, শেষপর্যন্ত বিগড়ে যান। বিশদ বলে আর কী হবে, আমাদের মন কষাকষি হয়ে গেল। এখানে আমি

অরেকটা ভুল করে বসলাম। ওঁর ওইসমস্ত নৈতিক প্রচার আর আবেদন-নিবেদন নিয়ে যতরকম স্থূলভাবে সম্ভব মজা করতে মেতে উঠলাম। আবার রঙ্গমঞ্চে পারাশার আবির্ভাব... অবশ্য একমাত্র পারাশাই নয়... মোট কথা ব্যভিচারের চরম। ওঃ আপনি যদি জীবনে অন্তত একটিবারও দেখার সুযোগ পেতেন মাঝে-মাঝে সময়বিশেষে আপনার ভগিনীর চোখ কেমন জ্বলতে পারে! আমি যে ইতিমধ্যে পুরো এক গেলাস শ্যাম্পেন খেয়ে ফেলেছি এবং আমার একটু নেশা ধরেছে ও কিছু নয়। ...আমি আপনাকে সত্যি কথা বলছি। আপনি বিশ্বাস করুন ওঁর ওই দৃষ্টি আমাকে স্বপ্নেও হানা দিতে শুরু করল। অবশেষে ওঁর জামাকাপড়ের খসখস শব্দ পর্যন্ত আমার অসহ্য মনে হতে লাগল। সত্যি কথা বলতে গেলে কি আমার মনে হতে লাগল এই বুঝি ফিটের ব্যামো আমাকে ধরল। অমন একটা ক্ষিপ্ত অবস্থায় পৌঁছুতে পারি তা কখনও ধারণাই করতে পারিনি। এক কথায়, একটা আপসে আসা অবশ্য দরকার। অথচ তখন আর সেটা সম্ভব ছিল না। ধারণা করতে পারেন তখন আমি কী করলাম? ওঃ মানুষের উন্মত্ততা তাকে মূর্খামির কোন্ পর্যায়ে না নিয়ে যেতে পারে। রাগের মাথায় কক্ষণও কোনও কাজের উদ্যোগ নেবেন না রোদিওন রমানোভিচ। আমি মনে-মনে হিসাব করে দেখলাম আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না তো আসলে ভিখিরি... ওঃ মাফ করবেন আমি ঠিক তা বলতে চাইনি... তবে হ্যাঁ, অর্থটা যদি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একই প্রকাশ পায় তাহলে কোন্ শব্দ আমরা ব্যবহার করছি তাতে কী এসে যায়? এক কথায় উনি নিজে খেটে রোজগার করেন এবং ওঁর মা'র আর আপনারও প্রতিপালন ওঁকে করতে হয়... যা বাবা! আপনি আবার চোখমুখ কোঁচকাচ্ছেন!... তা, আমি ঠিক করলাম আমার সমস্ত টাকা ওঁকে দেবার প্রস্তাব করব। তখনই আমি তিরিশ হাজার পর্যন্ত ওঠাতে পারতাম। তবে শর্ত থাকবে এই যে ওঁকে আমার সঙ্গে পালিয়ে আসতে হবে— এমনকি ইচ্ছে হলে এখানে সেন্ট পিটার্সবুর্গেও আসতে পারেন। বলাই বাহুল্য আমি সঙ্গে-সঙ্গে অনন্ত প্রেম, স্বর্গসুখ ইত্যাদি আরও অনেক কিছুর প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি ছিলাম। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না আমি তখন এমন হাবুডুবু খাচ্ছিলাম যে উনি যদি আমাকে একবার মুখ ফুটে বলতেন : মার্ফা পেত্রোভ্‌নাকে কেটে ফেল কিংবা বিষ দিয়ে মেরে ফেল, তারপর আমায় বিয়ে কর— আমি তৎক্ষণাৎ তাই করতাম! কিন্তু সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। কী হল সে তো আপনার জানাই আছে। মার্ফা পেত্রোভ্‌না তখন কোথা থেকে ওই হতভাগা কলমপেশা লুজিনটাকে ধরে এনে ওঁর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ প্রায় পাকা করে ফেলেছেন জানার পর আমি কী পরিমাণ খেপে যেতে পারি তা আশা করি আপনি ধারণা করতে পারেন। আমি যা প্রস্তাব দিতে যাচ্ছিলাম এই সম্বন্ধও আসলে তাই দাঁড়াচ্ছিল। তাই না? কী বলেন? আমি ঠিক বলছি কিনা? ইন্টারেস্টিং ইয়ং ম্যান... আমি দেখতে পাচ্ছি... আপনি বেশ মনোযোগ দিয়ে আমার কথাগুলো শুনছেন।..."

স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ অধৈর্য হয়ে টেবিলের ওপর ঘুষি মারল। তার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ স্পষ্ট দেখতে পেল অলক্ষিতে এক্কেক চুমুকে এক গেলাস অথবা দেড় গেলাস শ্যাম্পেন পান করায় স্‌ভিদ্রিগাইলভের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ ওর এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করবে বলে স্থির করল। স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ লোকটা তার কাছে খুবই সন্দেহজনক।

"এরপর আমার কিন্তু আর এতটুকু সন্দেহ রইল না যে আমার বোনের কথা মনে রেখেই আপনি এখানে এসেছেন," কোন রাখঢাক না করে সরাসরি সে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌কে বলল তাকে আরও বেশি খেপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

"না, অনেক হয়েছে!" স্‌ভিদ্রিগাইলভের হঠাৎ যেন টনক নড়ল। আমি তো আপনাকে বলেইছি যে... তাছাড়া আপনার ভগিনী আমাকে দু-চক্ষে দেখতে পারেন না।"

"পারে না যে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। এই মুহূর্তে সেটা আলোচনার বিষয়ও নয়।"

"আপনি নিশ্চিত যে পারেন না?" স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ চোখ কুঁচকে বিদ্রুপের হাসি হাসল। "আপনি ঠিক বলেছেন, উনি আমাকে ভালোবাসেন না। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে কী ঘটতে পারে নিশ্চিত হয়ে কখনও বলা যা না। এখানে সবসময় ছোট্ট একটা ফাঁক থেকে যায় যা তারা দুজন ছাড়া দুনিয়ার কেউ কখনও জানে না। আপনি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না আমাকে বিষনজরে দেখতেন?"

"আপনার গল্প বলার সময় আপনার কিছু-কিছু কথা আর ইঙ্গিত থেকে আমি লক্ষ করেছি যে এখনও দুনিয়া সম্পর্কে নিজস্ব কতকগুলো মতামত এবং দ্রুত হাসিল করার জন্য কতকগুলো অভিসন্ধি আপনি মনে-মনে পোষণ করেন, বলাই বাহুল্য, সেগুলো নীচ ধরনের।"

"সে কী! আমার মুখ থেকে ওরকম কথা বা ইঙ্গিত আবার কোথায় বের হল?" ওর অভিসন্ধি সম্পর্কে যে বিশেষণ এইমাত্র প্রয়োগ করা হল সেদিকে এতটুকু আমল না দিয়ে মুখে অত্যন্ত সরল ভাব দেখিয়ে হঠাৎ ভীতকণ্ঠে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ বলে উঠল।

"হ্যাঁ, তা এখনও বেরিয়ে আসছে। কিন্তু বলুন তো, আপনার অত ঘাবড়ানোর কী আছে? এই এখন হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলেন কিসে?"

"আমি ভয় পাচ্ছি? আমি ঘাবড়ে যাচ্ছি? আপনাকে ভয় পাচ্ছি? বরং আপনারই আমাকে ভয় পাবার কথা Cher ami! কী সব যা তা বকছেন!... যা হোক আমার নেশা ধরেছে, এটা আমি বুঝতে পারছি। এবারেও আরেকটু হলে বলে ফেলেছিলাম। চুলোয় যাক মদ! এই বেয়ারা, জল!"

স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ বোতলটা চট করে তুলে নিল, কোন ভদ্রতার বালাই না রেখে

পাক মেরে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ফিলিপ জল নিয়ে এলো।

সবই আজগুবি," তোয়ালে ভিজিয়ে চেপে-চেপে মাথায় লাগাতে-লাগাতে সে বলল। " আমি কিন্তু একটা কথায় আপনাকে বসিয়ে দিতে পারি, আপনার সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটাতে পারি। আপনি কি জানেন যে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি?"

"আপনি আগেই একবার একথা আমায় বলেছেন।"

"বলেছিলাম নাকি? ভুলে গেছি। কিন্তু তখন জোর দিয়ে আমার পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না, কেননা তখন পর্যন্ত পাত্রী আমি চোখে দেখিনি। আমি শুধু মনে-মনে মতলব করেছিলাম। এখন কিন্তু আমার পছন্দের পাত্রী আছে। কাজও আমি হাঁসিল করে ফেলেছি। ভীষণ জরুরি কতকগুলো কাজ যদি পড়ে না যেত তাহলে আমি অবশ্যই এই মুহূর্তে আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতাম, কারণ আমি আপনার পরামর্শ চাই। এই দেখ! হাতে আর মাত্র দশ মিনিট আছে। দেখুন, চেয়ে দেখুন ঘড়ির দিকে! সে যাই হোক, আমি আপনাকে বলব, যেহেতু বিষয়টা বেশ আকর্ষণীয়... মানে আমার বিয়েটা... তার নিজস্ব ধরনে আর কি। আরে চললেন কোথায়? আবারও চলে যাচ্ছেন নাকি?"

"না, এবারে আমি আর যাচ্ছি না।"

"একেবারেই যাচ্ছেন না? বেশ, দেখা যাবে! আমি আপনাকে ওখানে নিয়ে যাব, সত্যি বলছি, আমার পছন্দের পাত্রীটিকে দেখাব, তবে এখন না। এখন আপনার সময়ও শিগগির ফুরিয়ে আসছে। আপনি ডাইনে যাবেন, আমি যাব বাঁয়ে। আপনি ওই রেস্‌লিখ মহিলাকে জানেন তো? সেই রেস্‌লিখ, যার ওখানে আমি এসে উঠেছি ... কী হল? শুনছেন? না, কী ভাবছেন আপনি? মানে সেই তার কথা হচ্ছে যার একটি মেয়ে নাকি, শোনা যায় শীতকালে জলে ডুবে মরতে গিয়েছিল। ...কী হল, আপনি শুনছেন তো? শুনছেন? তা ওই মহিলাই আমার জন্যে এতসব কারসাজি করেছে। বললে, তুমি দেখছি বড় মনমরা হয়ে থাক, কিছুদিনের জন্যে অন্তত এতটু আমোদ-প্রমোদ কর। আমি লোকটা অমনিতেই বিমর্ষ, গোমড়ামুখো। আপনার কি মনে হয় ফুর্তিবাজ? না, গোমড়া স্বভাবের। ...চুপচাপ এককোনায় বসে থাকি, কারও কোন ক্ষতি করি না। কখন-কখন তিনদিন ধরে আমার মুখ দিয়ে কেউ কোন কথা বার করতে পারে না। তা এই রেস্‌লিখটা হল গিয়ে মহা ধড়িবাজ! তাহলে আর বলছি কী আপনাকে? ওর মাথার মধ্যে কী আছে আমি আপনাকে বলছি। একসময় আমার বিরক্তি ধরে যাবে, আমি বৌকে ফেলে পালিয়ে যাব। তখন বৌটি তার খপ্পরে পড়বে। সেও সুযোগ বুঝে তাকে বাজারে খাটাবে— আমাদের শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে আর কি— হয়ত বা আরও উঁচু শ্রেণীর মধ্যে। সে আমায় বললে এখানে এক মেয়ের বাপ আছে। ...লোকটা অথর্ব গোছের, অবসরপ্রাপ্ত এক কেরানি। আজ তিন বছর হল হুইল চেয়ারেই বসা, পা নাড়াতে পারে না। বললে, মেয়ের মাও আছে—

বেশ বিচক্ষণ মহিলা এই মাতৃরত্নটি। গুণধর পুত্রটি মফস্বলে কোথাও চাকরি করে, সাহায্য করে না। এক মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, কখনও দেখতেও আসে না। ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে বাচ্চা দুই ভাইপো— যেন ওদের নিজেদেরই কমতি আছে! তা শেষ সন্তানটিকে— ছোট মেয়েটিকে হাইস্কুলের পড়া শেষ করতে না দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। এই মাসখানেকের মধ্যে ষোলয় পড়বে। অর্থাৎ কিনা এক মাসের মধ্যে বিয়ের যুগ্যি হবে। মানে, ওটি আমার জন্য। আমরা গেলাম। ব্যাপারটা রীতিমতো হাস্যকর। আমি নিজের পরিচয় দিলাম: জমিদার, বিপত্নীক, সদ্বংশজাত, এই-এই যোগাযোগ আছে, ভালো পুঁজি আছে। আমার বয়স পঞ্চাশ। কিন্তু মেয়ে এখনও ষোলয় পড়েনি... তাতে কী? কে তা দেখতে যাচ্ছে? বেশ প্রলোভন জাগানোর মতো, তাই না? প্রলোভন জাগানোর মতো বটে, হাঃ হাঃ! তখন যদি দেখতেন মেয়ের মা আর বাপের সঙ্গে আমার কথা বলার ধরন! স্রেফ দর্শনী দিয়ে দেখতে হয় সেই সময় আমাকে। মেয়েটি সামনে এসে হাঁটু ভেঙে সৌজন্য দেখাল। ভাবতে পারেন, তখনও তার গায়ে যে জামা সেটা বেশ খাটো। মুকুল তখনও ফোটেনি। লজ্জায় লাল হয়ে উঠছে, ভোরের আলোর মতো রাঙিয়ে উঠছে। ওরা নিশ্চয়ই ওকে আমার আসার উদ্দেশ্য বলেছে। মেয়েদের মুখশ্রী সম্পর্কে আপনার কী ধ্যানধারণা আমি জানি না, কিন্তু আমার মনে হয় এইসব ষোড়শী, এখনও শিশুর মতো সরল ওদের চোখ— এই সলজ্জ ভঙ্গি, অপ্রতিভ এই অশ্রুকণা ...আমার তো মনে হয় এসব যে-কোন সৌন্দর্যকে হার মানায়। তার ওপর সে নিজেই একটা পটে আঁকা ছবি! হালকা রঙের খাটো চুল, ফাঁপিয়ে তোলা, ভেড়ার লোমের মতো কোঁকড়ান উড়ু-উড়ু চুল, ফোলা-ফোলা ছোট্ট দুটি ঠোঁট, লাল টুকটুকে। পা-দুটোর আকারের কোন তুলনা হয় না!... তা আলাপ-পরিচয় তো হল। আমি জানালাম যে বাড়ির কতকগুলো কাজ পড়ে থাকায় আমার তাড়া আছে। পরের দিনই, গত পরশু দিন আশীর্বাদপর্ব চুকে গেল। এরপর থেকে ওদের বাড়িতে এলেই আমি ওকে কোলে বসাই, কিছুতেই ছাড়ি না।... ভোরের আলোর মতো রাঙিয়ে ওঠে, আমি ক্ষণে ক্ষণে ওকে চুমু খাই। এদিকে মাতৃদেবীটি বলাই বাহুল্য মেয়েকে বারবার আশ্বাস দিয়ে বলে যাচ্ছে এটি তোর স্বামী, এরকমই করতে হয়। এককথায় স্বর্গসুখ! আর এই যে এখনকার এই হবু বর-বর অবস্থাটা হয়ত সত্যি-সত্যি স্বামী হওয়ার পর যে অবস্থা তার চেয়ে অনেক ভালো। এখানে পরিস্থিতি হল যাকে বলে La nature et la vérité! প্রকৃতি ও সত্য। হা- হা! আমি ওর সঙ্গে বারদুয়েক কথা বলে দেখেছি। বোকা মোটে বলা যায় না। মাঝে-মাঝে আমার দিকে এমন চোরা চাউনি হানে যে তাতে আমার ভেতরটা যেন জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যায়। আর জানেন, ওর মুখখানা অনেকটা রাফাএলের ম্যাডোনার মতো। সিস্টিনের ম্যাডোনার মুখ তো অলৌকিক, ভাবোন্মাদগ্রস্ত বিষাদের প্রতিমা। ...আপনার চোখে পড়েছে কি? তা এও অনেকটা

তাই। আমাদের আশীর্বাদপর্ব চুকে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে পরের দিনই আমি নিয়ে এলাম দেড় হাজার রুবলের সামগ্রী: একসেট হীরের গয়না, আরেক সেট মুক্তোর, মেয়েদের রুপোর একটা ড্রেসিং কেস— বেশ বড় আকারের, তার মধ্যে নানা টুকিটাকি— দেখে ওর সেই ম্যাডোনার মতো মিষ্টি মুখখানাও খুশিতে ঝলমল করে উঠল। গতকাল আমি ওকে কোলে বসিয়েছিলাম, তা হয়ত বা বড় বেশি অশালীনভাবেই। তাতে ওর মুখ-চোখ রাঙা হয়ে উঠল, চোখে জল দেখা গেল। ওর সর্বাঙ্গ জ্বলছিল, কিন্তু বাইরে সেটা গোপন করার চেষ্টা করছিল। আর সবাই কিছুক্ষণের জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ঘরে তখন শুধুই আমরা দুজনে। হঠাৎ আমার ঘাড়ের ওপর মাথা রাখল— এই প্রথম, নিজের ইচ্ছেয়। ছোট-ছোট দুই হাতে জড়িয়ে ধরল আমাকে, আমাকে চুমু খেতে-খেতে শপথ করে বলল যে সে আমার কথার বাধ্য হবে, সুগৃহিণী ও সতীসাধ্বী স্ত্রী হবে। বলল যে আমায় সুখী করবে, তার সমস্ত জীবন, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমার জন্য নিবেদন করবে, সব কিছু, সমস্ত কিছু উৎসর্গ করবে আমাকে, তার বদলে আমার কাছ থেকে তার একমাত্র প্রত্যাশা *আমার ভক্তি*। ওর কথা, 'এর বেশি আমি আর কিছু চাই না, কিছুই না, কোন উপহারও না!' আপনি নিজেই আশা করি স্বীকার করবেন যে যার মাথায় একরাশ ফাঁপান উড়ু উড়ু চুল, পরনে মসলিনের পোশাক, দেবশিশুর মতো নিষ্পাপ সেই ষোড়শী যখন নিভৃত কক্ষে কুমারীর ব্রীড়াবশত মুখ রাঙা করে, আবেগে উচ্ছ্বাসে চোখের জল ফেলতে-ফেলেতে এ ধরনের কথা বলে তখন তা রীতিমতো প্রলোভনজনক। ...এটা আপনাকে মানতেই হবে কিন্তু। ঠিক বলছি কিনা? এর একটা আলাদা দাম আছে। তাই না?... শুনুন... শুনছেন তো?... আপনাকে নিয়ে যাব আমার সেই ভাবী বধূকে দেখাতে... তবে এখন না— অন্য আরেক দিন।..."

"এক কথায় বলতে গেলে বয়স, এবং বিকাশের এত বেয়াড়া রকমের ফারাক থাকা সত্ত্বেও কিনা আপনার মধ্যে কামনা জাগতে পারল। আপনি সত্যি-সত্যি বিয়ে করতে যাচ্ছেন নাকি?'

"কেন নয়? আলবত। যে কোন মানুষকে নিজের কথা নিজেই ভাবতে হয়। যে মানুষ নিজেকে যত বেশি ফাঁকি দিতে পারে তার জীবন তত বেশি সুখের হয়। হাঃ হাঃ। বলি, আপনি চরিত্রের সততা নিয়ে এমন উঠেপড়ে লাগলেন কেন? আমায় রেহাই দিন, আমি বাপু একজন পাপী মানুষ। হাঃ হাঃ হাঃ। "

"তবু আপনিই আবার কাতেরিনা ইভনোভ্‌নার বাচ্চাগুলোর হিল্লে করেছেন।... অবশ্য, এর পেছনে আপনার নিজস্ব কোন যুক্তি ছিল... এখন আমি সব বুঝতে পারছি।"

"বাচ্চাদের আমি মোটের ওপর ভালোবাসি," হো হো করে হাসতে-হাসতে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ বলল। এমনকি এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত কৌতূহলজনক এমন একটা ঘটনার

উল্লেখ আপনাকে করতে পারি যার জের এখন পর্যন্ত চলছে। আমি এখানে আসার প্রথম দিনেই এখানকার অস্থানে-কুস্থানে নরককুণ্ডের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি— সাত বছর পরে আবার সেই পাঁকে। আপনি সম্ভবত লক্ষ করে থাকবেন যে আমার দলবলের সঙ্গে, আগেকার বন্ধুবান্ধব ও চেনা-পরিচিতদের সঙ্গে মেলামেশার জন্য কোন তাড়া বা তাগিদ আমার নেই। যতদূর পারা যায় তাদের ছাড়াই চলা আমার উদ্দেশ্য। জানেন মার্ফা পেত্রোভ্‌নার সঙ্গে যখন আমি গ্রামে থাকতাম তখন এই সমস্ত গোপন ছোট-বড় ক্লেদাক্ত জায়গার স্মৃতি আমাকে পীড়িত করত, পাগল করে তুলত। যে মানুষ জানে, তার পক্ষে ওইসব নোংরা জায়গায় অনেক কিছু খুঁজে বের করা সম্ভব। কী বলে বোঝাব ছাই আপনাকে! লোকে মাতলামিতে ডুবে আছে, শিক্ষিত যুবকেরা নিষ্ক্রিয়তার ফলে আকাশ কুসুম কল্পনায় আর দিবাস্বপ্নের মধ্যে ডুবে থেকে, শক্তি ক্ষয় করছে, নানা তত্ত্বের আলোচনায় নিজেদের বিকৃতি ঘটাচ্ছে। এদিকে কোথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে হাজির হয়েছে সুদখোর ইহুদীরা—টাকাকড়ি সব কোথায় সরিয়ে ফেলছে। বাদবাকিরা সকলে ব্যভিচারে মত্ত। এই শহরে আসার প্রথম কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমি এখানকার এই পরিচিত ঘ্রাণ পাই। আমি গিয়ে পড়লাম এক তথাকথিত নাচের আসরে এক বীভৎস নরককুণ্ডের মধ্যে! আমার আবার এসব অস্থান-কুস্থান একটু নোংরা গোছের হলেই ভালো লাগে। বুঝতে পারছেন ... কাঁকাঁ নাচ ...যেমনটি দেখা যায় না, যেমনটি আমার সময়েও ছিল না। হ্যাঁ, এই না হলে উন্নতি! এমন সময় দেখি বছর তেরো বয়সের একটা বাচ্চা মেয়ে, দিব্যি সাজগোজ করা। একজন পাকা নাচিয়ের সঙ্গে নাচছে। আরেকজন ওর সামনে, মুখোমুখি। দেয়ালের ধার ঘেঁষে একটা চেয়ারে বসে আছে মেয়েটার মা। আপনি ধারণা করতে পারেন সে কী রকম কাঁকাঁ নাচ! মেয়েটা বিব্রত হয়ে পড়ছে, লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছে। শেষকালে লজ্জায়, অপমানে কেঁদে ফেলল। নাচিয়ে লোকটি তাকে খপ্ করে চেপে ধরে বনবন করে ঘোরাতে লাগল মেয়েটির মায়ের সামনে। চারপাশে হো হো হাসির ধুম। এই সব মুহূর্তে আমাদের জনসাধারণকে দেখতে আমার বেশ লাগে — তা হোক না সে কাঁকাঁ নাচের আসরের! হাসাহাসি, চিৎকার-চেঁচামেচি : 'ঠিক হয়েছে! উচিত শাস্তি! বাচ্চাদের কেউ আনে এখানে!' আমার আর কী আছে! ওরা যে এই ভাবে নিজেদের মনকে প্রবোধ দিচ্ছে সেটা যুক্তিসঙ্গত কিনা তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আমি সঙ্গে-সঙ্গে ঠিক করে নিলাম আমার জায়গাটা এখানে কোথায়। বাচ্চাটার মার পাশে গিয়ে বসলাম, এই বলে তার সঙ্গে আলাপ শুরু করে দিলাম যে আমিও এ শহরে একজন নবাগত, বললাম যে এই লোকগুলো সব এমনই গোমুখ্যু যে মানুষের খাঁটি গুণ এদের চোখে পড়ে না, মানুষের যথাযোগ্য মর্যাদাও এরা দিতে পারে না। প্রকারান্তরে জানিয়ে দিলাম যে আমার অগাধ টাকাকড়ি আছে। আমার গাড়িতে করে ওদের বাড়ি পৌঁছে দেবার আমন্ত্রণ

জানালাম। বাড়ি পৌঁছে দিলাম, আলাপ-পরিচয় হল। সবে এখানে এসেছে, কোন ভাড়াটের কাছ থেকে খুপরি ভাড়া নিয়ে থাকে। আমাকে ওরা জানাল যে আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে মা আর মেয়ে দুজনেই কৃতার্থ। জানতে পারলাম ওরা কপর্দকশূন্য, এখানে এসেছে কোন এক দপ্তরে কিসের একটা আর্জি নিয়ে তদারক করতে। আমি ওদের. কিছু কাজে এবং টাকাকড়ি দিয়ে সাহায্য করার প্রস্তাব দিলাম। জানতে পারলাম যে তারা ভুলক্রমে ওই আসরে গিয়ে পড়েছিল, ভেবেছিল ওখানে সত্যি-সত্যি নাচ শেখান হয়। আমি কিশোরীটির নাচ ও ফরাসী ভাষা শেখার ব্যাপারে আমার নিজের দিক থেকে সহযোগিতার প্রস্তাব দিলাম। সম্মানজনক বিবেচনা করে ওরা সোল্লাসে লুফে নিল সেই প্রস্তাব। এই পর্যন্ত আলাপ-পরিচয়।... যদি চান, চলুন আমার সঙ্গে। তবে আজকে নয়।"

"ছাড়ুন দেখি, ছাড়ুন আপনার যতসব জঘন্য ইতর চুটকি। আপনি একটা লম্পট, নীচ আর কামুক লোক।"

"আহা শিলার, আমাদের শিলার এসেছেন, আদর্শবাদী শিলার। Ou´ va-t-elle La vetru se nicher?— সদ্‌গুণ কোথায় না বাসা বাঁধে? জানেন, আমি কিন্তু ইচ্ছে করে এ ধরনের সব কাহিনী আপনাকে বলব— একমাত্র আপনার ওই চেঁচানি শুনব বলে। উপভোগ করার মতো!"

"তা আর বলতে! এই মুহূর্তে আমি কি আর নিজের কাছে নিজেই হাস্যকর নই?" বিড়বিড় করে ক্রুদ্ধস্বরে বলল রাস্‌কোল্‌নিকভ।

স্‌ভিদ্রিগাইলভ দরাজ গলায় হো হো করে হেসে উঠল। অবশেষে ফিলিপকে ডেকে বিল চুকিয়ে দিয়ে ওঠার উদ্যোগ করল।

"হুঁ, দেখতে পাচ্ছি নেশাটা বেশ ধরেছে। assez causé— অনেক বাচালতা করা হয়েছে!" সে বলল। "বেশ আনন্দ পাওয়া গেল কিন্তু!"

"তা আর বলতে! আপনি উপভোগ করবেন না তো কে করবে! বলতে-বলতে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ও উঠে দাঁড়াল। "এই ধরনের আরও কোন বদ মতলব মাথায় নিয়ে আপনার মতো একজন ঘাগু লম্পট এরকম সব অভিযানের গল্প করে সুখ পাবে না তো কে পাবে?... বিশেষত এই পরিস্থিতিতে, আমার মতো একজন মানুষের কাছে সে গল্প করে সুখ পাবেন বটেই।... উৎসাহটা চাগিযে ওঠে বৈ কি!"

"তাই যদি হয় ..." খানিকটা অবাক হয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে দেখতে-দেখতে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ উত্তর দিল, "সেক্ষেত্রে বলতে হয় আপনি একজন বেশ ভালোরকমের সিনিক। অন্তত তার উপকরণ আপনার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আছে বলতে হবে। আপনার অনেক উপলব্ধি করার ক্ষমতা আছে, অনেক... হ্যাঁ, অনেক কিছু করার ক্ষমতাও আপনার আছে। তা যাক গে, অনেক হয়েছে। সত্যি-সত্যি আমার বড় আফসোস রয়ে গেল যে আপনার সঙ্গে আমার খুবই কম কথাবার্তা হল। তবে

আপনাকে আমার কাছ থেকে যেতে হচ্ছে না।... একটু অপেক্ষা করুন না, তাহলেই দেখতে পাবেন।..."

স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল, রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তাকে অনুসরণ করল। স্‌ভিদ্রিগাইলভের অবশ্য খুব একটা নেশা হয়নি। মুহূর্তের জন্য তার মস্তিষ্কে ধাক্কা মেরেছিল। তবে ঘোর প্রতি মুহূর্তে একটু-একটু করে কেটে যাচ্ছিল। কী একটা ব্যাপারে, অত্যন্ত জরুরি কোন একটা বিষয় নিয়ে সে খুব চিন্তিত, ভুরু কোঁচকাচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল কিসের একটা প্রতীক্ষায় আছে— তাই বিচলিত, উত্তেজিত। শেষের দিকে কিছুটা সময় রাস্‌কোল্‌নিকভের সঙ্গে ব্যবহার হঠাৎ যেন কেমন পালটে গিয়েছিল— প্রতি মুহূর্তে উত্তরোত্তর বেশি মাত্রায় অমার্জিত ও বিদ্রুপাত্মক হয়ে উঠছিল তার কথাবার্তা। এসবই রাস্‌কোল্‌নিকভের নজরে পড়েছিল, সেও তাই উদ্বেগ বোধ করছিল। স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ এখন ওর কাছে খুবই সন্দেহজনক ব্যক্তি। তাই রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ঠিক করল তাকে অনুসরণ করবে।

"আপনার পথ ডান দিকে, আমারটা— বাঁদিকে, অথবা তার উল্টোটাও হতে পারে। মোটকথা, adieu mon plaisir, আসি— যতদিন না আমাদের আনন্দের সাক্ষাৎকার হয়!" এই বলে সে ডাইনে সেন্নায়া স্কোয়ারের দিকে মোড় নিল।

পাঁচ

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তাকে অনুসরণ করল।

"এর মানে কী" স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ পিছন ফিরে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল। "আমার তো মনে হয় আমি বলেছিলাম..."

"এর মানে কী!" যে আমি এখন আর আপনাকে ছাড়ছি না।"

"কী- ই -ই?"

দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়ল। দুজনেই তাকাল এ ওর দিকে, যেন তাকিয়ে-তাকিয়ে একজন আরেকজনকে মেপে দেখতে লাগল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বেশ গলা চড়িয়ে বলল, "আধমাতাল অবস্থায় আপনি যে-সমস্ত কাহিনী আমাকে শোনালেন তা থেকে আমি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছি যে আপনি আমার বোন সম্পর্কে আপনার বদ মতলবগুলো তো ছাড়েনইনি, বরং ওই নিয়ে আগের চেয়েও অনেক বেশি মেতে উঠেছেন। আমি জানি যে আজ সকালে আমার বোন একটা চিঠি পেয়েছে। আপনি সবসময় উসখুশ করছিলেন।... আপনি হয়ত রাস্তায় কোথাও কোন বউ পেয়ে গেছেন কিন্তু তাতে কিছু বোঝায় না। আমি ব্যক্তিগতভাবে আশ্বস্ত হতে চাই..." ঠিক কী সে চায় আর কী ব্যাপারেই বা এখন ব্যক্তিগতভাবে আশ্বস্ত হতে চায় তা কি ছাই রাস্‌কোল্‌নিকভ্ নিজেও সঠিক জানত।

"এই ব্যাপার। আপনি কি চান যে আমি পুলিস ডাকি?"

"ডাক না!"

ওরা দুজনে আরও মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইল মুখোমুখি। অবশেষে স্‌ভিদ্রিগাইলভের মুখের চেহারা পালটে গেল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ যে হুমকিতে ঘাবড়ে যায় নি সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর হঠাৎ সে মুখে খুব খুশি-খুশি আর অন্তরঙ্গ ভাব ফুটিয়ে তুলল।

"কী লোক রে বাবা! আমি ইচ্ছে করেই আপনার ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলা থেকে ক্ষান্ত ছিলাম, যদিও এটা ঠিক যে কৌতূহল আমাকে অস্থির করে তুলছে। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! আপাতত স্থগিত রাখতে চেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম অন্য একসময় দেখা যাবে, কিন্তু দেখছি মরা মানুষকেও উত্ত্যক্ত করার ক্ষমতা আপনার আছে।... বেশ চলুন, তবে আগে থাকতে বলে রাখছি— আমি এখন মাত্র মিনিট খানেকের জন্যে বাড়ি যাব, কিছু টাকাপয়সা নিতে হবে, তারপর ঘরের দরজায় তালাচাবি দিয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করে সারা সন্ধ্যা এখানকার এই দ্বীপগুলোতে ঘুরে বেড়াব। তাই বলছিলাম, আমার পিছু নিয়ে আপনার কী লাভ?"

"আমি আপাতত ওই ফ্ল্যাটেই যাব, তবে আপনার কাছে না, সোফিয়া সেমিওনভ্‌নার কাছে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যেতে পারিনি বলে ক্ষমা চাইতে।"

"সে আপনার মর্জি। তবে সোফিয়া সেমিওনভ্‌না ঘরে নেই। উনি ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গেছেন এক ভদ্রমহিলার কাছে— ভালো ঘরের বর্ষীয়সী মহিলা, আমার পূর্বপরিচিতা, বহুকালের জানাশোনা, অনাথ আশ্রমের তত্ত্বাবধান করেন। কাতেরিনা ইভানোভ্‌নার তিনটি ছানাপোনার সবগুলোর বাবদ আমি ভদ্রমহিলাকে টাকা দিয়েছি, তাতে উনি মুগ্ধ। তাছাড়া ওদের প্রতিষ্ঠানের জন্যও কিছু দান করেছি। অবশেষে সোফিয়া সেমিওনভ্‌নার প্রতি এতটুকু অসম্মান না দেখিয়ে কোন কিছু গোপন না করে তাঁর কাহিনী ভদ্রমহিলাকে বলেছি। প্রতিক্রিয়া যা হল তা অবর্ণনীয়। ঠিক এই কারণে আমার সেই ভদ্রমহিলা শহরের বাইরে থেকে এসে আপাতত যে হোটেলে উঠেছেন, সোফিয়া সেমিওনভ্‌নাকে নির্দেশমতো আজই সোজা সেখানে দেখা করতে যেতে হয়েছে।

"দরকার নেই, তবু একবার যাব।"

"সে আপনার ইচ্ছে। তবে আমি তো আর আপনার সঙ্গী নই, আমার কী? এই তো বাড়ি এসে গেছি। আচ্ছা বলুন দেখি... আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি এই কারণেই কি আমাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন না যে আমি এতটা ভদ্র যে এখন পর্যন্ত আপনাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলিনি... বুঝতেই পারছেন কিসের প্রশ্ন? এটা আপনার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, তাই! এর পরও ভদ্র হতে বলেন!"

"দরজায় আড়ি পাতেন!"

"ও, এই কথা! স্‌ভিদ্রিগাইলভ হেসে উঠল। "হ্যাঁ, এত সবের পর কোন মন্তব্য ছাড়া এই প্রসঙ্গটা যদি বাদ দিয়ে যেতেন তাহলে আমি অবশ্য অবাকই হতাম। হাঃ-হাঃ! ওখানে... তখন... আপনি যেসব ফন্দি-ফিকির আঁটছিলেন এবং আপনি নিজে সোফিয়া সেমিওনভ্‌নাকে যেসব কথা বলছিলেন তা থেকে তেমন কিছু না হোক, যৎসামান্য আমি বুঝতে পেরেছি বটে, কিন্তু তাতে কী? এমনও তো হতে পারে যে আমি একেবারে পিছিয়ে পড়া লোক, কিছুই বোঝার ক্ষমতা আমার নেই! ঈশ্বরের দোহাই, একটু ব্যাখ্যা করে বলুন বন্ধু! নতুন কোন তত্ত্বজ্ঞান দিয়ে আলোকিত করুন।"

"কিছুই শোনা আপনার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যতসব বুজরুকি!"

"না, না আমি ও বিষয়ে বলছি না, ওই নিয়ে কিছু বলছি না— যদিও দু-একটা জিনিস আমি শুনেছি। না, আমি বলতে চাই যে আপনি সব সময় হা-হুতোশ করেন! আপনার ভেতরের শিলার আপনাকে প্রতিনিয়ত বিব্রত করে। এখন তাই বলবেন দরজায় আড়ি পাতাও বারণ! তাই যদি হয়, যান পুলিস কর্তৃপক্ষে গিয়ে জানান, বলুন এই-এই ঘটেছিল আমার... একটা বিশেষ ধরনের ঘটনা... তত্ত্বে একটা ছোটখাটো ভুল হয়ে গেছে। আপনার যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে থাকে যে আড়ি পাতা অন্যায়, কিন্তু কোন বৃদ্ধাকে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে মাথার খুলি ফাটিয়ে তৃপ্তি পাওয়া যায় তাহলে বলি কি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমেরিকার কোথাও চলে যান। পালান ইয়ং ম্যান! হয়ত এখনও সময় আছে। আমি আপনাকে খোলাখুলি বলছি। টাকাপয়সা নেই বুঝি? পথখরচা না হয় আমি আপনাকে দেব।"

"আমি আদৌ সে কথা ভাবছি না," রাসকোল্‌নিকভ্‌ বিতৃষ্ণার সঙ্গে তাকে বাধা দিয়ে বলল।

"বুঝতে পারছি। তা কষ্ট করে কাজ নেই।... ইচ্ছে না হলে বেশি কথা বলার দরকার নেই। বুঝতে পারছি আপনার মনের মধ্যে এখন কী ধরনের প্রশ্ন আলোড়ন তুলছে— নৈতিক— তাই? একজন সৎ নাগরিক ও মানুষের মনে যে প্রশ্ন উঠতে পারে ওসব আপনি একপাশে সরিয়ে রাখুন না। কী দরকার আপনার এখন? হে-হে! কারণ এই যে আপনি এখনও একজন নাগরিক এবং মানুষও? কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে নাক গলানোর দরকার ছিল না, অন্যের ব্যাপারে মাথা ঘামানোর কোন দরকার ছিল না। বেশ তো, গুলি করে আত্মহত্যা করুন না? না কি সে ইচ্ছে নেই?"

"আমার মনে হয় আপনি ইচ্ছে করে আমাকে খেপিয়ে তুলতে চান, আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য যাতে আমি এখন আপনার কাছ থেকে সরে যাই।..."

"কী আজব লোক! এই যে এসে গেছি আমরা। সিঁড়িতে উঠতে আজ্ঞা হোক। এই যে সোফিয়া সেমিওনভ্‌নার ঘরে ঢোকার দরজা। দেখছেন তো, কেউ নেই! বিশ্বাস হচ্ছে না? কাপেরনাউমভের কাছ থেকে চাবি চেয়ে নিন। সোফিয়া

সেমিওনভ্‌না ওদের কাছে চাবি রেখে যান। এই যে সশরীরে হাজির মাদাম দ্য কাপেরনাউমভ্‌ আঁ? কী?... উনি আবার কানে একটু খাটো।... বেরিয়ে গেছেন? কোথায়? হল তো, শুনলেন তো এখন? নেই। ...হয়ত ফিরতে-ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে। আচ্ছা, এবারে আসুন আমার ঘরে। আপনি আসতে চাইছিলেন না? এই যে এই হল আমার ঘর। মাদাম রেস্‌লিখ বাড়ি নেই। মহিলা সর্বক্ষণ কিছু না একটা কিছু নিয়ে আছেন। কিন্তু খুব ভালো মহিলা। আমি আপনাকে আশ্বাস দিয়ে বলছি... যদি আপনি আরেকটু বিচক্ষণ হতেন উনি হয়ত আপনার কাজে লাগতে পারতেন। এই যে, দয়া করে দেখুন: টেবিলের দেরাজ থেকে আমি এই পাঁচ শতাংশের ঋণপত্রটা নিচ্ছি।... আরও কত আমার আছে দেখছেন তো!... এটা অবশ্য আজই ভাঙিয়ে টাকা তুলব। কী, দেখলেন তো? আর নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে নেই। দেরাজ চাবি দিয়ে বন্ধ করা হল, দরজায় তালাচাবি পড়ল। আমরা আবার সিঁড়িতে এসে পড়লাম। কী হল? যদি চান আমরা একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া নিতে পারি। আমি কিন্তু দ্বীপে যাচ্ছি। কি, গাড়ি চেপে ঘোরাঘুরি করার ইচ্ছে আছে নাকি? এই যে আমি এই গাড়িটা নিয়ে ইয়েলাগিন দ্বীপে যাচ্ছি। কী হল? যাবেন না? হাল ছেড়ে দিলেন নাকি? কিছু না, আসুন একটু ঘুরে বেড়ান যাক। বৃষ্টি আসছে মনে হচ্ছে। ও কিছু না, মাথার ওপরের ছাউনিটা নামিয়ে নিলেই হবে।...”

স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ ততক্ষণে গাড়িতে উঠে পড়েছে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ মনে-মনে বিবেচনা করে দেখল যে তার সন্দেহ, অন্তত ঠিক এই মুহূর্তে , ভিত্তিহীন। উত্তরে একটি কথাও না বলে সে ঘুরে গিয়ে ফের সেন্নায়া স্কোয়ারের পথ ধরল। যেতে-যেতে সে যদি অন্তত একবারও পিছু ফিরে তাকাত তাহলে দেখতে পেত যে গাড়ি শ'খানেক পা যেতে না যেতে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ গাড়োয়ানকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ফুটপাতে নেমে পড়েছে। কিন্তু এখন আর তার দেখার কোন উপায় নেই, কেননা ইতিমধ্যে মোড় নিয়ে কোনায় ঢুকে পড়েছে। স্‌ভিদ্রিগাইলভের সংস্পর্শ ছাড়ার কারণ তার প্রতি একটা গভীর বিতৃষ্ণা। ‘এই লালসা-পরায়ণ ব্যভিচারী ইতর লোকটার কাছ থেকে, এই অশিষ্ট দুর্বৃত্তটার কাছ থেকে আমি মুহূর্তের জন্যও কিছু আশা করতে গিয়েছিলাম কী বলে?’ আপনা-আপনি কথাগুলো বেরিয়ে এলো ওর মুখ দিয়ে। অবশ্য এটা ঠিক যে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ বড় বেশি তাড়াতাড়ি অবিবেচকের মতা এই রায়দান করে। স্‌ভিদ্রিগাইলভের সমস্ত কিছুর মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা তাকে রহস্যজনক না হলেও অন্তত বেশ খানিকটা মৌলিক করে তোলে। এই সমগ্র পরিস্থিতির মধ্যে বোনের কথা ভেবে রাস্‌কোল্‌নিকভ কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার নিজের এই স্থির সিদ্ধান্তই বহাল রাখল যে স্‌ভিদ্রিগাইলভ তাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। কিন্তু এসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা, মনের মধ্যে বারম্বার এই নিয়ে আন্দোলন করা বড় বেশি ভারী বোঝার মতো দুঃসহ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।

একলা থাকলে সচরাচর রাস্‌কোল্‌নিকভের যা হয়— বিশ পা মতো যেতে না যেতে সে গভীর চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। ব্রিজের ওপরে ওঠার পর সে রেলিং এর ধারে দাঁড়িয়ে জল দেখতে লাগল। ঠিক এই সময় তার ঘাড়ের কাছে এসে দাঁড়াল দুনিয়া। ব্রিজে ঢোকার মুখেই দুনিয়ার সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সে তাকে ভালোমতো লক্ষ্যই করল না। পাশ কাটিয়ে চলে. গেল। দুনিয়া তাকে কখনও রাস্তায় এই অবস্থায় দেখেনি, তাই ভয় পেয়ে গেল। দুনিয়া দাঁড়িয়ে পড়ল, বুঝতে পারছিল না তাকে ডাকবে কিনা। হঠাৎ সে লক্ষ করল স্কোয়ারের দিক থেকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌।

লোকটা কেমন যেন রহস্যজনকভাবে, সন্তর্পণে এগিয়ে আসছিল। ব্রিজের ওপর না উঠে সে দাঁড়িয়ে রইল একধারের ফুটপাতে, তার আপ্রাণ চেষ্টা রাস্‌কোল্‌নিকভ যাতে তাকে দেখতে না পায়। দুনিয়াকে সে অবশ্য অনেক আগেই দেখতে পেয়েছিল, তাকে ইশারা করতে শুরু করেছিল। দুনিয়ার মনে হল ইশারায় সে তাকে অনুনয় করছে যেন ভাইকে না ডাকে, তাকে ব্যাঘাত না করে যেমনকার তেমন ছেড়ে দিয়ে সে যেন স্‌ভিদ্রিগাইলভের কাছে আসে।

দুনিয়া তাই করল। চুপিসারে ভাইয়ের পাশ কাটিয়ে স্‌ভিদ্রিগাইলভের দিকে এগিয়ে গেল!

"শিগ্‌গির চলুন," ফিসফিসিয়ে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ তাকে বলল। "আমি চাই না যে রোদিওন রমানোভিচ আমাদের সাক্ষাতের কথা জানতে পারেন। আপনাকে আগে থাকতে জানিয়ে রাখি। আমি ওঁর সঙ্গে এই কাছের একটা সস্তার হোটেলে বসে ছিলাম। উনি নিজে আমাকে ওখানে খুঁজে বের করেন, অনেক কষ্টে ওঁর কবল থেকে উদ্ধার পেয়েছি। আমি যে আপনার কাছে চিঠি লিখেছিলাম সেটা যেন কী ভাবে উনি জানতে পেরেছেন এবং কিছু একটা সন্দেহ উনি করছেন। আশা করি আপনি ফাঁস করে দেননি? তা যদি না হয় তবে কে?"

"এই যে আমরা ইতিমধ্যে মোড় নিয়ে কোনায় চলে এসেছি," দুনিয়া ওর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, "এখন আর ভাই আমাদের দেখতে পাবে না। আপনাকে স্পষ্ট জানিয়ে রাখি, আমি এর বেশি দূরে আপনার সঙ্গে যাচ্ছি না। আপনার যা বলার আছে এখানেই আমাকে বলুন। এমন কিছু থাকতে পারে না যা রাস্তায় বলা যায় না।"

"প্রথমত, রাস্তায় একদম বলা যায় না । দ্বিতীয়ত, সোফিয়া সেমিওনভ্‌নার বক্তব্যও আপনার শোনা উচিত। তৃতীয়ত, আমি আপনাকে কিছু তথ্যপ্রমাণ দেখাতে চাই। ... আর হ্যাঁ, শেষ কথা হল আপনি যদি আমার সঙ্গে আমার ঘরে আসতে রাজি না হন তাহলে এরপর আর কোন ব্যাখ্যা আমি দিতে যাচ্ছি না, সঙ্গে-সঙ্গে চলে যাব, তবে সে ক্ষেত্রে আপনার কাছে আমার অনুরোধ— ভুলে যাবেন না যে আপনার

প্রাণাধিক প্রিয় ভাইটির দারুণ কৌতূহলজনক সমস্ত গোপন রহস্য সম্পূর্ণ আমার হাতের মুঠোয়।"

দুনিয়া দাঁড়িয়ে পড়ল, ইতস্তত করতে লাগল। তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করল স্‌ভিদ্রিগাইলভের দিকে।

"কিসের ভয় আপনার?" শান্ত কণ্ঠে সে বলল। "এ তো আর পাড়াগাঁ নয়, শহর। তাছাড়া পাড়াগাঁয়েও আমি আপনার যত ক্ষতি করেছি তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি আপনি আমার করেছেন। কিন্তু এখানে..."

"সোফিয়া সেমিওনভ্‌নাকে বলা আছে?"

"না, আমি তাঁকে একটি কথাও বলিনি, এমনকি উনি এখন বাড়ি আছেন কিনা সে বিষয়েও আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই। তবে সম্ভবত বাড়িতেই। উনি আজ ওঁর আত্মীয়াকে গোর দিয়ে এলেন— ওঁর পক্ষে কোথাও কারও সঙ্গে দেখা করতে যাবার দিন নয় এটা। আপাতত এ বিষয়ে আমি কারও সঙ্গে কথা বলতে চাই না— এমনকি আপনাকে যে জানিয়েছি তার জন্য আফসোসই হচ্ছে। এক্ষেত্রে সামান্য বেচাল হয়ে গেলেই আর দেখতে হবে না— যথাস্থানে রিপোর্ট চলে যাবে। আমি এই এখানে, এই বাড়িতে থাকি। এই চলে এসেছি। এ হল আমাদের বাড়ির দারোয়ান। দারোয়ান আমাকে খুব ভালো করে চেনে। দেখলেন তো সেলাম ঠুকছে। ও দেখেছে আমি একজন ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকছি। লোকটা অবশ্য এর মধ্যে আপনার মুখ দেখে নিয়েছে— এটা আপনার কাজে দেবে, যদি আপনি নিতান্তই আমাকে এত ভয় পান ও সন্দেহের চোখে দেখেন। মাফ করবেন, আমার কথাগুলো বড় বেশি স্থূল হয়ে যাচ্ছে। আমি ভাড়াটেদের কাছ থেকে ঘর ভাড়া নিয়ে আছি। সোফিয়া সেমিওনভ্‌না থাকেন আমার ঘরের দেয়ালের ওপাশে লাগোয়া ঘরে, সেও ভাড়াটেদের কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া। গোটা তলাটাই এভাবে ভাড়া নিয়ে নানা ধরনের লোকজন বাস করছে। আপনার এত ভয় করার কী আছে? আপনি কি কচি খুকি। না কি আমি এমনই ভয়ঙ্কর লোক?"

স্‌ভিদ্রিগাইলভের মুখে অনুকম্পার বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। কিন্তু হাসার মতো মনের অবস্থা তখন তার ছিল না। তার বুক ঢিপঢিপ করছিল, বুকের ভেতরে নিঃশ্বাস আটকে আসছিল। উত্তেজনা সমানে বেড়ে চলছিল— সেটা চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সে ইচ্ছে করে জোরে-জোরে কথা বলতে লাগল। কিন্তু ওর এই বিশেষ উত্তেজনার ভাবটা দুনিয়ার নজরে পড়ল না— সে যে কচি খুকির মতো ভয় পাচ্ছে এবং স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ যে তার কাছে ভয়ঙ্কর লোক এই মন্তব্যে সে বড় বেশি অস্বস্তি বোধ করছিল।

"যদিও আমি জানি যে আপনি এমন একজন মানুষ... যার কোন মান-সম্মান বোধ নেই, তবু আমি আপনাকে ভয় পাই না। আগে আগে চলুন," আপাতশান্ত ভাব

বজায় রেখে সে বলল— যদিও মুখ তার বড় বেশি পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছিল।

সোনিয়ার ফ্ল্যাটের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল স্‌ভিদ্রিগাইলভ্।

"যদি বলেন তো একবার দেখে নিই উনি বাড়ি আছেন কিনা। নেই। কপাল খারাপ। তবে আমি জানি, খুব শিগ্‌গিরই চলে আসার সম্ভাবনা। যদি বেরিয়ে থাকেন তাহলে গেছেন এক ভদ্রমহিলার কাছে ওই অনাথ শিশুগুলোর ব্যাপারে। ওরা মাতৃহারা। আমিও জড়িয়ে পড়েছি এর মধ্যে, ওদের জন্য ব্যবস্থা করেছি। সোফিয়া সেমিওনভ্না যদি মিনিট দশেকের মধ্যে না ফেরেন তাহলে আমি তাঁকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো— যদি বলেন তো আজই। এই যে আমার আস্তানা। দরজার ওধারে থাকেন আমার বাড়িউলি মিসেস রেস্‌লিখ। এবারে এদিকে তাকান- আমি আপনাকে আমার মুখ্য তথ্যপ্রমাণ দেখাব। আমার শোবার ঘর থেকে এই যে দরজাটা দেখতে পাচ্ছেন এটার ওপাশে আছে দুটো ঘর, একদম খালি, ভাড়া দেওয়া হয়ে থাকে। এই যে... বেশ ভালো করে, মন দিয়ে দেখুন।..."

স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ ভাড়া নিয়েছিল আসবাবপত্র দিয়ে সাজান বেশ প্রশস্ত দুটো ঘর। দুনিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চারধার দেখছিল, কিন্তু গৃহসজ্জা বা ঘরের অবস্থান— কোনটার মধ্যেই অসাধারণ কিছু তার নজরে পড়ল না, যদিও লক্ষ করার মতো দু-একটা ছোটখাটো জিনিস যে একেবারে ছিল না এমন নয়— যেমন, স্‌ভিদ্রিগাইলভের ফ্ল্যাটটা কী ভাবে যেন পড়ে গিয়েছিল প্রায় নির্জন দুটো ফ্ল্যাটের মাঝখানে। ঘরে ঢোকার পথটা সরাসরি করিডর দিয়ে না হয়ে বাড়িউলির দুটো ঘরের ভেতর দিয়ে— সে ঘরদুটোও প্রায় ফাঁকা। শোবার ঘর থেকে বন্ধ দরজাটা চাবি দিয়ে খুলে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ ভাড়া দেবার জন্য রাখা খালি ফ্ল্যাটটা দুনিয়াকে দেখাল। দুনিয়া চৌকাটের গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল— বুঝতে পারছিল না এসব তাকে দেখান হচ্ছে কেন কিন্তু স্‌ভিদ্রিগাইলভ ব্যাখ্যা দিতে তৎপর হয়ে উঠল।

"এবারে দেখুন এদিকে— এই দ্বিতীয় বড় ঘরটার দিকে তাকিয়ে দেখুন। লক্ষ করুন ওই দরজাটা— তালাচাবি দেওয়া। দরজার কাছে রাখা আছে একটা চেয়ার— দুটো ঘরের জন্য মাত্র এই একটিই চেয়ার। এটা আমি এনেছি নিজের ঘর থেকে। জুত করে শোনার জন্য। ঠিক ওপাশে আছে সোফিয়া সেমিওনভ্নার টেবিল। ওখানে বসে-বসে উনি কথা বলছিলেন রোদিওন রমানোভিচের সঙ্গে। আর আমি এখানে চেয়ারে বসে আড়ি পেতে শুনেছি— পর-পর দুটো সন্ধে, দু-বারই দুঘণ্টা করে— অতএব বুঝতেই পারছেন দু-একটা জিনিস আমার পক্ষে জানা একেবারে অসম্ভব নয়। কী বলেন?"

"আপনি আড়ি পেতেছিলেন?"

"হ্যাঁ, আড়ি পেতেছিলাম। এবারে চলুন আমার ঘরে। এখানে বসার কোন জায়গা নেই।"

আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌নাকে সে ফের তার প্রথম ঘরে নিয়ে এসে তাকে বসার জন্য চেয়ার এগিয়ে দিল। এই ঘরটা সে তার বসার ঘর হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। নিজে বসল টেবিলের আরেক প্রান্তে— অন্তত হাতখানেক তফাতে। তার চোখে নিঃসন্দেহে ফুটে উঠেছে সেই জ্বলন্ত আগুনের শিখা যা এক সময় দুনিয়াকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। সে শিউরে উঠে আরও একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল। দুনিয়ার এই ভঙ্গিটা ছিল অনিচ্ছাকৃত— দেখা যাচ্ছিল, সন্দেহটা সে প্রকাশ করতে চায় না। কিন্তু স্‌ভিদ্রিগাইলভের ফ্ল্যাটের আশেপাশের এরকম নির্জন পরিবেশে শেষ পর্যন্ত সে অবাক হয়ে গেল। তার জিগ্‌গেস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল স্‌ভিদ্রিগাইলভের বাড়িউলি অন্তত ঘরে আছে কিনা, কিন্তু জিগ্‌গেস করতে গিয়েও পারল না- তার অহঙ্কারে বাধল। তাছাড়া নিজের জন্য আতঙ্কের চেয়েও বড়, অপরিসীম আরেকটি বেদনা তার মনকে উতলা করে তুলেছিল। অসহনীয় সে যন্ত্রণা।

"এই যে আপনার চিঠি," টেবিলের ওপর রেখে দুনিয়া বলল। "আপনি যা লিখেছেন তা কি সত্যি-সত্যি সম্ভব? আমার ভাই অপরাধ করেছে এমন আভাস আপনি দিয়েছেন। আপনার আভাস-ইঙ্গিতের মধ্যে এটা এত বেশি স্পষ্ট যে এখন তা ফিরিয়ে নেওয়ার মতো স্পর্ধা আপনার নেই। তাহলে জেনে রাখুন, ওই আজেবাজে গপ্পো আপনার আগেই আমি শুনেছি এবং তার একবর্ণও আমি বিশ্বাস করি না। কদর্য, হাস্যকর এই সন্দেহ। কোথা থেকে কী ভাবে এর উদ্ভাবন সে ইতিহাস আমার জানা আছে। আপনার কাছে কোনরকম প্রমাণ থাকতে পারে না। আপনি কথা দিয়েছিলেন প্রমাণ দেখাবেন —কোথায়? দেখান! তবে আগে থাকতে জেনে রাখুন, আমি বিশ্বাস করি না! বিশ্বাস করি না!..."

দ্রুত, একনিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল দুনিয়া। মুহূর্তের জন্য তার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল।

"আপনি যদি বিশ্বাস না করতেন তাহলে আমার এখানে একা আসার ঝুঁকি কি আপনি নিতে পারতেন? আপনি এলেন কেন? স্রেফ কৌতূহল চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে?"

"আর যন্ত্রণা দেবেন না আমাকে। বলুন, যা বলার আছে বলুন!"

"আপনি যে সাহসী মেয়ে তা মানতেই হবে। সত্যি বলছি, আমার ধারণা ছিল আপনি মিস্টার রাজুমিখিনকে এখানে আপনার সঙ্গে আসার জন্য অনুরোধ করবেন। কিন্তু আপনার সঙ্গে তো নয়ই, ত্রিসীমানায় তাঁকে দেখতে পেলাম না— আমি বেশ ভালো করে দেখে নিয়েছি। এটা সাহসের কাজ। তার মানে, আপনি রোদিওন রমানোভিচকে বাঁচাতে চান। মোট কথা আপনার সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা স্বর্গীয় ভাব দেখতে পাচ্ছি!... আপনার ভাইয়ের কথা যদি বলেন... কীই বা বলব আপনাকে! নিজেই তো এখন দেখলেন। কেমন দেখলেন?"

"একমাত্র এটাই কি আপনার ভিত্তি?"

"না, এটা নয়, আমার ভিত্তি তাঁর নিজের মুখের কথা। এই এখানে পর-পর দুটি সন্ধ্যা উনি সোফিয়া সেমিওনভ্‌নার কাছে এসেছিলেন। আমি আপনাকে দেখিয়েছি ওঁরা কোথায় বসেছিলেন। রোদিওন রমানোভিচ ওঁর সামনে তাঁর নিজের সমস্ত অপরাধ স্বীকার করেন। উনি খুনি। কেরানির বিধবা স্ত্রী সুদখোর বুড়ি, যার কাছে উনি নিজেও জিনিস বন্ধক রেখেছিলেন, তাকে উনি খুন করেন। খুন করেন খুচরো জিনিসপত্রের কারবারি, লিজাভেতা নামে বুড়ির বোনটাকেও। বুড়ির খুনের সময় দৈবাৎ সে ঘরে ঢুকে পড়েছিল। দুজনকেই খুন করেন কুড়ুলের ঘা মেরে। কুড়ুলটা সঙ্গে করেই এনেছিলেন। ওদের খুন করেন ডাকাতি করার মতলবে, ডাকাতি করেনও। টাকাকড়ি আর সামান্য কিছু জিনিস হাতিয়েছিলেন।... উনি নিজের মুখে সব কবুল করেছেন সোফিয়া সেমিওনভ্‌নার কাছে। একমাত্র সোফিয়া সেমিওনভ্‌নাই জানেন এই গোপন রহস্য। তবে খুনে তাঁর কোন অংশ নেই— না কথায়, না কাজে। বরং উলটো: সব শুনে শিউরে উঠেছিলেন— এই এখন আপনার যেমন অবস্থা। ঘাবড়াবেন না, উনি ওঁকে ধরিয়ে দেবেন না।"

"এ হতেই পারে না!" দুনিয়া ফেকাসে মুখে বলল। তার ঠোঁট মড়ার মতো সাদা হয়ে গিয়েছিল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বিড়বিড় করে সে বলল, "হতেই পারে না। হওয়ার বিন্দুমাত্র কারণ আমি দেখি না। কোন যুক্তি থাকতে পারে না এর পেছনে।... মিছে কথা! ডাহা মিথ্যে!"

"যুক্তি একটাই— ডাকাতি। উনি টাকাকড়ি সরিয়েছেন, জিনিসপত্রও সরিয়েছেন। অবশ্য এটা ঠিক যে ওঁর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, না টাকাকড়ি, না জিনিস কোনটাই উনি কাজে লাগাননি— কোথায় নিয়ে গিয়ে কোন্ একটা পাথর চাপা দিয়ে লুকিয়ে রেখেছেন— সেখানেই এখনও পড়ে আছে। তবে তার কারণ এই যে কাজে লাগানোর সাহস ওঁর হয়নি।"

"কিন্তু ও চুরি করতে পারে, ডাকাতি করতে পারে এটা কি সম্ভব? ও কি মনেও আনতে পারে?" চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে সে বলল, "আপনি তো ওকে জানেন, দেখেছেন ওকে। ও কি চোর হতে পারে?"

দুনিয়ার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌কে সে অনুনয়-বিনয় করছে। কোথায় চলে গেছে তার মনের সমস্ত আতঙ্ক।

"এক্ষেত্রে ওর সঙ্গে এটা, এর সঙ্গে ওটা যুক্ত হয়ে হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ সম্ভাবনা গড়ে উঠতে পারে, আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না। চোর চুরি করে, কিন্তু নিজের সম্পর্কে সে জানে— জানে যে সে একটা দুর্বৃত্ত। কিন্তু আমি ভদ্রঘরের একজন লোকের কথা শুনেছি যে ডাকঘর লুট করেছিল। কে বলতে পারে, হয়ত সত্যি-সত্যি উনি ভেবেছিলেন যে সম্মানজনক কোন কাজ করছেন। বলাই বাহুল্য, আমি নিজেও

হয়ত বিশ্বাস করতাম না যদি বাইরের কেউ আমাকে জানাত। কিন্তু আমি আমার নিজের কানকে বিশ্বাস না করে পারছি না। উনি সোফিয়া সেমিওনভ্‌নাকে সমস্ত কারণও খুলে বলেছেন। সোফিয়া সেমিওনভ্‌না প্রথমে নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারেননি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিশ্বাস করতে হয়েছে তাঁর চোখকে, নিজের চোখকে। হাজার হোক রোদিওন রমানোভিচ যে নিজের মুখে তাঁকে বলেছেন!"

"কী কারণে হতে পারে তাহলে?"

"সে এক দীর্ঘ কাহিনী, আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না। এখানে... কী ভাবে বলব আপনাকে? এর পেছনে এক ধরনের তত্ত্ব, ঠিক এমন একটা ব্যাপার যা থেকে ধরুন, আমার অন্তত মনে হয়েছে যে কোন-কোন দুষ্কর্ম মেনে নেওয়া যেতে পারে যদি তার উদ্দেশ্য সৎ হয়। একটি মাত্র দুষ্কর্ম এবং একশটি সৎ কাজ! এটা তো ঠিক যে যাবতীয় সৎ গুণের আধার এবং অসাধারণ উচ্চাভিলাষী একজন যুবক যখন জানতে পারে যে তার কাছে, এই ধরুন, যদি মাত্র হাজারতিনেক রুবলও থাকত তাহলে তার সমস্ত কর্মজীবন, তার ভবিষ্যৎ, জীবনের লক্ষ্য একেবারেই অন্য রকম হতে পারত, অথচ ওই তিন হাজারেরই তার অভাব, তখন তার মনে তিক্ততার সঞ্চার হতেই পারে। এর সঙ্গে যোগ করুন অনাহার, দমচাপা ঘুপচি ঘর, শতচ্ছিন্ন জামাকাপড়, নিজের আহামরি সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তার টনটনে জ্ঞান— এ সবের ফলে তিক্ততা, তদুপরি মা-বোনের দুর্দশা। সর্বোপরি দম্ভ। অহঙ্কার ও দম্ভ— অবশ্য ভগবান জানেন, অনেক ভালো-ভালো প্রবণতা তার থাকলেও থাকতে পারে— আমি ওঁকে দোষ দিচ্ছি না, দোহাই আপনার, তা মনে করবেন না! তা ছাড়া এটা আমার কাজও নয়। এখানেও ছিল নিজস্ব একটা ছোটখাটো তত্ত্ব। তত্ত্বটা এমন কিছু নয়— ওই তত্ত্ব অনুসারে মানুষকে, বুঝলেন কিনা, ভাগ করা যায় নিছক বস্তু আর অসাধারণ— এই দুই ভাগে। অসাধারণ মানুষ হলেন তাঁরা, সমাজের উঁচু জায়গায় থাকার দরুন আইন যাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। শুধু তাই না তাঁরা উলটে নিজেরাই বাদবাকি সকলের জন্য... যাদের বস্তু আখ্যা দেওয়া হচ্ছে, অর্থাৎ যারা সমাজের আবর্জনাস্তূপ... তাদের জন্য আইন প্রণয়ন করে থাকেন। তত্ত্বটা মন্দ নয়— une theorie comme une autre– অন্য আরও পাঁচটা তত্ত্বের মতোই। নেপোলিয়নের প্রতি তাঁর দারুণ আকর্ষণ, অর্থাৎ সত্যি বলতে গেলে কি তাঁকে যেটা আকর্ষণ করে তা হল এই যে মহা প্রতিভাধর অনেক ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন দুষ্কর্মের দিকে দৃকপাত তো করেনই না, এমনকি বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে তাকে উপেক্ষাভরে ডিঙিয়ে চলে যান। উনি, আমার মনে হয়, মনে-মনে নিজেকে মহাপ্রতিভার অধিকারী বলে ভেবেছিলেন অর্থাৎ কিনা অন্তত কিছুকাল এই দৃঢ়বিশ্বাস তাঁর ছিল। উনি এই ভেবে অনেক কষ্ট পেয়েছেন এবং এখনও পাচ্ছেন যে তত্ত্ব তিনি খাড়া করতে পেরেছেন ঠিকই, কিন্তু ইতস্তত না করে সীমারেখা লঙ্ঘনের সামর্থ্য তাঁর হল না। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে উনি মহাপ্রতিভাধর

নন। এটা একজন আত্মমর্যাদা-সচেতন যুবকের পক্ষে দস্তুরমতো অপমানজনক— বিশেষত আমাদের এই যুগে।...''

''কিন্তু বিবেকের দংশন? তাহলে আপনি অস্বীকার করছেন যে ওর মধ্যে কোন নীতিবোধের বালাই থাকতে পারে? ও কি সত্যি সত্যি সেই প্রকৃতির?''

''আহা, আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না, আজকাল সব ঘোলাটে হয়ে গেছে, অবশ্য তাই বলে কোনকালে ব্যাপারটার মধ্যে বিশেষ শৃঙ্খলা ছিল এমন কথাও বলা যায় না। রুশীরা মোটের ওপর দরাজ মনের মানুষ, আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না। ওদের মন ওদের দেশের মাটির মতোই দরাজ এবং অতিমাত্রায় বিশৃঙ্খল, কল্পনাপ্রবণ। কিন্তু বিশেষ প্রতিভার অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও দরাজ হতে গেলে বিপদ আছে। আপনার মনে আছে কি কতবার সন্ধ্যাবেলায় খাবার পর বাগানের টেরাসে বসে অনেকটা এই ধরনের বিষয় নিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে কত কথাই না হত! আপনি আমাকে ঠিক এই দরাজ মনের জন্যই তখন নিন্দা করেছিলেন। বলা যায় না, আপনি যখন ওই কথাগুলো বলছিলেন ঠিক সেই সময় উনি হয়ত এখানে শুয়ে-শুয়ে ওঁর নিজের মতলব আঁটছিলেন! আমাদের দেশে শিক্ষিত সমাজে পবিত্র ঐতিহ্য বলতে বিশেষ কিছু নেই, আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না: হয়ত এক-আধজনকে দেখতে পাবেন কিছু পুথি পড়ে... অথবা প্রাচীন ঘটনাপঞ্জীর ভিত্তিতে নিজের জন্য যা হোক একটা খাড়া করেছে। কিন্তু তাদের বেশির ভাগই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত লোকজন। কিন্তু জেনে রাখবেন, একদিক থেকে দেখতে গেলে তাঁদেরও এক ধরনের গবেট ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ওঁদের সেই সব তত্ত্ব কোনও পার্থিব মানুষের অনুসরণ করার ঠিক উপযুক্ত নয়। সে যাই হোক আমার মতামত আপনার মোটের ওপর জানা আছে। চূড়ান্তভাবে কাউকে দোষ আমি দিই না। আমি নিজে একজন নিষ্কর্মা— তা আমি আমার সেই নীতিই আঁকড়ে ধরে আছি। এ নিয়ে তো আমাদের মধ্যে একাধিকবার কথাবার্তাও হয়েছে। এমনকি আমার মতামতের প্রতি আপনার আগ্রহ জাগিয়ে তোলার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল।... আপনাকে বড় ফেকাসে দেখাচ্ছে যে আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না।''

''আমি ওর সেই তত্ত্ব জানি। কোন-কোন মানুষের পক্ষে সবই শোভা পায় এই মর্মে লেখা ওর একটা প্রবন্ধ পত্রিকায় বেরিয়েছে— সেটা আমি পড়েছি।... রাজুমিখিন এনে দিয়েছিলেন আমাকে।...''

''মিস্টার রাজুমিখিন? আপনার ভাইয়ের লেখা প্রবন্ধ? পত্রিকায়? এরকম প্রবন্ধ আছে বুঝি? জানতাম না তো! নির্ঘাত খুবই আগ্রহ জাগানোর মতো! কী হল, আপনি চললেন কোথায় আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না?''

''আমি সোফিয়া সেমিওনভ্‌নার সঙ্গে দেখা করতে চাই,'' ক্ষীণকণ্ঠে দুনিয়া বলল। ''কী করে যাওয়া যায় ওঁর ঘরে? উনি হয়ত এতক্ষণে ফিরে এসেছেন। এক্ষুনি তার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া চাই। আমি চাই উনি...''

দুনিয়া তার কথাগুলো শেষ করতে পারল না। আক্ষরিক অর্থে তার নিঃশ্বাসে কুলাল না।

"সোফিয়া সেমিওনভ্‌নার ফিরতে-ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে। আমার তাই মনে হয়। তাঁর ফেরার কথা ছিল খুবই শিগ্‌গির, তা যখন ফেরেননি তখন বেশ দেরি হবে।..."

"তার মানে এতক্ষণ ধাপ্পা দেওয়া হচ্ছিল! দেখতে পাচ্ছি... এতক্ষণ মিথ্যে বলছিলি... তোর সব কথা মিথ্যে!... আমি তোকে বিশ্বাস করি না! বিশ্বাস করি না! এতটুকু বিশ্বাস করি না!" মাথা একেবারে ঠিক রাখতে না পেরে সত্যি-সত্যি ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল দুনিয়া।

স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ ত্যর দিকে চেয়ার এগিয়ে দিতে সে প্রায় সংজ্ঞা হারিয়ে ধপ করে বসে পড়ল।

"আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না, কী হল আপনার? জ্ঞান হারাবেন না! এই যে জল! এক ঢোক খেয়ে নিন।..."

স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ ওর চোখেমুখে জল ছিটাল। দুনিয়া চমকে উঠল, তার জ্ঞান ফিরে এলো।

"আঘাতটা বড় বেশি জোরাল হয়ে গেছে!" স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ ভুরু কুঁচকে বিড়বিড় করে বলল। "আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না, শান্ত হোন! আপনি জেনে রাখুন উনি এখানে নির্বান্ধব নন। আমরা ওঁকে বাঁচাব, উদ্ধার করব। আপনি যদি চান, আমি ওঁকে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আমার টাকাপয়সা আছে, তিন দিনের মধ্যে আমি টিকিট জোগাড় করে ফেলব। আর খুনের কথা যদি বলেন, উনি ভবিষ্যতে অনেক ভালো-ভালো কাজ করবেন, ফলে ওসব মুছে যাব। শান্ত হোন! বিরাট মানুষ উনি এখনও হতে পারেন। কী হল আপনার? কেমন বোধ করছেন?"

"পাজি কোথাকার! আবার ঠাট্টামস্করা হচ্ছে! ছেড়ে দিন আমাকে..."

"কোথায় যাবেন আপনি? যাবেন কোথায়?"

"রোদিয়ার কাছে। কোথায় ও? আপনি জানেন? এই দরজাটা বন্ধ কেন? আমরা এখানে ঢুকেছিলাম এই দরজা দিয়ে, এখন দেখছি এটা চাবি দিয়ে বন্ধ করা? কোন ফাঁকে আপনি বন্ধ করলেন চাবি দিয়ে?"

"আহা, আমরা এখানে যে বিষয়ে কথা বলছি তা নিয়ে বাড়ি মাথায় করা কি কোন কাজের কথা হত? আমি মোটে মস্করা করছি না। আসলে এই ভাষায় কথা বলতে-বলতে আমার বিরক্তি ধরে গেছে। এই অবস্থায় আপনি যাবেন কোথায় শুনি? নাকি আপনি ওঁকে ধরিয়ে দিতে চান? আপনি ওঁর কাছে গেলে উনি একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে যাবেন, ফলে নিজেই নিজেকে ধরিয়ে দেবেন। আপনি জেনে রাখুন ওঁর পেছনে

পুলিসের চর আছে, ওরা ইতিমধ্যে গন্ধ পেয়ে গেছে। আপনার যাওয়া মানে খামোকা ওঁকে ওদের হাতে তুলে দেওয়া। একটু ধৈর্য ধরুন। আমি ওঁকে দেখেছি, এই কিছু আগেও ওঁর সঙ্গে কথা বলেছি। ওঁকে বাঁচান যেতে পারে। অপেক্ষা করুন, বসুন, একসঙ্গে বসে একটু ভেবেচিন্তে দেখা যাক। এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে একান্তে কথাবার্তা বলব এবং ভালো করে ভাবনাচিন্তা করব বলেই আমি আপনাকে ডেকেছি। করছেন কী, বলুন না!"

"আপনি ওকে কী ভাবে বাঁচাতে পারেন? ওকে বাঁচান কি সম্ভব?"

দুনিয়া বসল। স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ ওর পাশে বসল।

"এ সবই নির্ভর করছে আপনার ওপর। আপনার ওপর, একমাত্র আপনার ওপরই নির্ভর করছে।" স্‌ভিদ্রিগাইলভের চোখ চকচক করে উঠল। প্রায় ফিসফিসিয়ে আমতা-আমতা করে সে কথাগুলো বলল। এমনকি বলার সময় উত্তেজনাবশত দু-একটা কথা তার মুখ দিয়ে ঠিকমতো বের হচ্ছিল না।

দুনিয়া ভয় পেয়ে বেশ খানিকটা পিছিয়ে গেল। স্‌ভিদ্রিগাইলভেরও সর্বাঙ্গ কাঁপছিল।

"আপনি... আপনার মুখের একটা কথা— তাহলেই উনি বেঁচে যাবেন! আমি... আমি ওঁকে বাঁচাব। আমার টাকাকড়ি আছে, বন্ধুবান্ধব আছে। আমি সঙ্গে-সঙ্গে ওঁকে বাইরে পাঠিয়ে দেব। পাসপোর্ট একটা জোগাড় করব— একটা কেন, দুটো জোগাড় করব— একটা ওঁর জন্যে, আরেকটা আমার নিজের জন্যে। আমার বন্ধুবান্ধব আছে, করিৎকর্মা লোকজন আছে।... যদি চান তো বলেন। আমি আপনার পাসপোর্টেরও ব্যবস্থা করে দেব... আপনার মা'রও।... রাজুমিখিনকে দিয়ে আপনার কী দরকার? ওরকম ভালো তো আমিও আপনাকে বাসি।... এ ভালোবাসার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আপনার পোশাকের আঁচলটা আমায় দিন, চুমু খাই। দিন, দিন! আপনার পোশাকের ওই খসখস আওয়াজ শুনে আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না। আমাকে শুধু একবার মুখ ফুটে বলুন— এটা কর, আমি সঙ্গে-সঙ্গে করব। আমি সব কিছু করতে রাজি। আমি অসম্ভবও করব। আপনার যা বিশ্বাস, আমিও তাই বিশ্বাস করব। আমি সব কিছু করব, সব। দোহাই আপনার, আমার দিকে অমনভাবে তাকাবেন না। আপনি কি জানেন যে আপনি আমাকে মেরে ফেলছেন..."

সে প্রায় প্রলাপ বকতে শুরু করে দিয়েছিল। আচমকা কী যেন একটা ঘটে গেল এর মধ্যে। মনে হল হঠাৎ কোন একটা চিন্তা বজ্রাঘাতের মতো ওর শিরে আঘাত করেছে। দুনিয়া সচকিত হয়ে লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে ছুটে গেল।

"খুলুন! দরজা খুলুন!" দুহাতে দরজা ধরে ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে বাইরের কেউ শুনতে পারে এই আশায় ফাঁক দিয়ে চিৎকার করে ডাকাডাকি শুরু করে দিল সে। "কে আছেন খুলুন! কেউ কি নেই তাহলে?"

স্‌ভিদ্রিগাইলভের সংবিৎ ফিরে এলো। সে উঠে দাঁড়াল। তার ঠোঁট তখনও কাঁপছে। ধীরে-ধীরে সেখানে খেলে গেল বিদ্রুপের কুটিল হাসি।

"ওখানে কেউ নেই। কেউ নেই বাড়িতে," শান্ত কণ্ঠে থেমে-থেমে সে বলল, "বাড়িউলি বাইরে গেছে। চেঁচিয়ে অযথা শক্তিক্ষয় করছেন। মিছিমিছি নিজেকে উতলা করে তুলছেন মাত্র।"

"চাবি কোথায়? এক্ষুনি দরজা খোল! খোল বলছি! পাজি, বদমাশ কোথাকার!"

"চাবি আমি হারিয়ে ফেলেছি, খুঁজে পাচ্ছি না।"

"বটে! এ যে দস্তুরমতো বলপ্রয়োগ!" দুনিয়া চিৎকার করে উঠল। তার মুখ মড়ার মতো ফেকাসে হয়ে গেল। দ্রুত ছুটে গেল ঘরের এক কোনায়, হাতের সামনে ছোট একটা টেবিল দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি তার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। আর চেঁচামেচি না করে সে তার পীড়নকারীর দিকে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, তার প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ করতে লাগল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ও জায়গা ছেড়ে নড়ল না। ঘরের অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে রইল দুনিয়ার মুখোমুখি। এমনকি সে নিজেকে সামলে নিল। অন্তত বাইরে থেকে তা-ই মনে হচ্ছিল। কিন্তু তার মুখ আগেকার মতোই পাণ্ডুর। তার ঠোঁটে তখনও লেগে রয়েছে বিদ্রুপের হাসি।

"আপনি এই মাত্র 'বলপ্রয়োগের' কথা বললেন, আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না। যদি বলপ্রয়োগই হয় তাহলে আপনি নিজেই বিবেচনা করে দেখতে পারেন যে আমি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি কিনা। সোফিয়া সেমিওনভ্‌না বাড়ি নেই। কপেরনাউমভ্‌রা অনেক দূরে, সেখানে পৌঁছুতে গেলে তালাচাবি দেওয়া পাঁচটা ঘর পেরোতে হয়। আর শেষ কথা হল আমি আপনার দ্বিগুণ শক্তি ধরি। তাছাড়া, আমার ভয় করার কিছু নেই, কেননা আপনার পক্ষে পরেও অভিযোগ করা সম্ভব নয়— আপনি তো আর সত্যি-সত্যি আপনার ভাইকে ধরিয়ে দিতে চাইবেন না? আর আপনার কথা কেই বা বিশ্বাস করবে? বলুন দেখি, কোন যুবতী কেনই বা একা-একা একজন একা পুরুষ মানুষের ফ্ল্যাটে দেখা করতে যাবে? তাই বলছিলাম কি, যদি ভাইকেও সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেন, তবু প্রমাণ আপনি কিছুই করতে পারবেন না। বলপ্রয়োগের ঘটনা প্রমাণ করা খুব কঠিন, আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না।"

"ইতর!"

"সে আপনার যেমন অভিরুচি। তবে খেয়াল রাখবেন, আমি নিছক একটা অনুমান হিসেবেই বলেছিলাম। ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি যে আপনি একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন: বলপ্রয়োগ একটা জঘন্য কাজ। আমি শুধু যা বলতে যাচ্ছিলাম তা এই যে আমি আপনাকে যে রকম প্রস্তাব দিচ্ছি সেইভাবে... এমনকি সেইভাবেও যদি আপনি স্বেচ্ছায় আপনার ভাইকে বাঁচাতে চান, নিজের বিবেকের কাছে আপনার জবাবদিহি করার একদম কিছু থাকছে না তাতে। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে

আপনি স্রেফ পরিস্থিতির কাছে নতিস্বীকার করেছেন... আচ্ছা না হয় শেষ পর্যন্ত ধরা গেল শক্তির কাছেই... যদি অবশ্য ও কথাটা ছাড়া নিতান্তই না চলে। একবার ভেবে দেখুন, আপনার ভাইয়ের ভাগ্য, আপনার মায়ের ভাগ্য আপনারই হাতে। আমি আপনার দাসানুদাস হয়ে থাকব... সারা জীবন... আমি এই এখানে অপেক্ষা করে থাকব।..."

দুনিয়ার কাছ থেকে হাততিনেক দূরে সোফার ওপর বসে পড়ল স্‌ভিদ্রিগাইলভ। লোকটার অবিচলিত দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে আর এতটুকু সন্দেহ রইল না দুনিয়ার মনে। পরন্তু তাকে সে জানতও।...

হঠাৎ সে পকেট থেকে রিভলভার বের করে রিভলভারের ঘোড়ায় আঙুল ঠেকিয়ে সেই অবস্থায় হাতটা সামনের ছোট্ট টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল। স্‌ভিদ্রিগাইলভ জায়গা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল।

"বটে! এই ব্যাপার!" অবাক হয়ে গেল সে। ক্রূর হাসি হেসে বলল, "এতে অবশ্য ঘটনার ধারা সম্পূর্ণ পালটে যাচ্ছে! আপনি নিজেই আমার কাজ অনেক সহজ করে দিচ্ছেন, আভদোতিয়া রমানোভ্‌না! তা এই রিভল্‌ভারটি আপনি পেলেন কোত্থেকে? মিস্টার রাজুমিখিনের কাণ্ড নয় তো? বাঃ! এ যে দেখছি আমারই রিভল্‌ভার। পুরনো পরিচিত! অথচ দেখ দেখি, তখন কত না খোঁজাখুঁজি করেছি!... আমাদের গ্রামের সেই গুলি ছোঁড়ার বিদ্যা... যা আপনাকে শেখানোর সৌভাগ্য আমার হয়েছিল... বৃথা যায়নি দেখছি।"

"তোর রিভল্‌ভার নয়, এটা মার্ফা পেত্রোভ্‌নার, যাকে তুই খুন করেছিস, হারামজাদা! ওঁর বাড়িতে তোর নিজের বলতে কিছু ছিল না। তুই কী ধরনের কাজ করতে পারিস এই নিয়ে আমার মনে যখন সন্দেহ হতে থাকে তখন আমি এটা নিয়েছিলাম। আর এক পাও এগিয়েছিস কি, আমি হলফ করে বলছি, তোকে খুন করব!"

দুনিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। রিভল্‌ভার হাতে সে তৈরি হয়ে ছিল।

"কিন্তু ভাইয়ের অবস্থাটা কী হবে সে খেয়াল আছে? কৌতূহলবশত জিগ্‌গেস করছি," একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে জিগ্‌গেস করল স্‌ভিদ্রিগাইলভ।

"যদি চাস তো জানা গিয়ে! নড়বি না! এক পাও নয়! গুলি করব! বৌটাকে বিষ খাইয়ে খুন করেছিস, আমি জানি! তুই নিজেই খুনি!..."

"আমি যে মার্ফা পেত্রোভ্‌নাকে বিষ খাইয়ে মেরেছি এ ব্যাপারে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত?

"তুই! তুই নিজে আমাকে আভাসে বলেছিস। তুই আমাকে বিষের কথা বলেছিলি।... আমি জানি, তুই নিজে আনতে গিয়েছিলি।... তোর কাছে তৈরি ছিল।... তুই ছাড়া আর কেউ নয়।... ইতর কোথাকার!"

"এটা যদি সত্যি হয়েও থাকে সে তো তোমারই জন্য।... তুমিই কিন্তু তার কারণ ছিলে।"

"মিথ্যে কথা! আমি তোকে চিরকাল ঘেন্না করে এসেছি! চিরকাল..."

"এহে, আভ্‌দোতিয়া রমানোভ্‌না! প্রচারের প্রবল উত্তেজনায় আপনি যে কী পরিমাণ নরম হয়ে গিয়েছিলেন, গদগদ হয়ে পড়েছিলেন তা ভুলে গেছেন দেখা যাচ্ছে।... আমি আপনার চোখ দেখে বুঝতে পেরেছি তখন। মনে আছে সেই সন্ধের কথা, সেই যে চাঁদের আলো... তখনও গান গাইছিল নাইটিংগেল?"

"মিথ্যেবাদী!" ক্রোধে দপ্ করে জ্বলে উঠল দুনিয়ার দুই চোখ। মিথ্যে কথা! কুৎসারটনাকারী কোথাকার!"

"মিথ্যে কথা? বেশ, হয়ত তাই। মিথ্যে কথাই বলেছি। এসব জিনিস মেয়েদের মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা না করাই ভালো," মুচকি হেসে সে বলল। "জানি গুলি তুমি করবে, আহা আমার পোষ - না - মানা বুনো। বেশ, কর গুলি!"

দুনিয়া রিভলভার তুলল। মড়ার মতো ফেকাসে দেখাচ্ছে তাকে। তার নিচের ঠোঁটটা সাদা হয়ে গেছে— থরথর করে কাঁপছে। বড়-বড় কালো দুচোখে আগুনের ফুলকি। চোখেমুখে দৃঢ়সঙ্কল্পের আভাস। স্‌ভিদ্রিগাইলভের দিকে তাকিয়ে দুজনের মাঝখানে দূরত্ব মাপতে-মাপতে অপেক্ষা করতে লাগল তার দিক থেকে কখন প্রথম আক্রমণটা আসে। স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ তার এমন মনোহারিণী রূপ এর আগে আর কখনও দেখেনি। যখন সে রিভল্‌ভার তুলে নিয়েছিল সেই মুহূর্তে তার চোখ থেকে যে আগুন ঠিকরে বের হচ্ছিল তা যেন তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিল, তার বুকের ভেতরটা যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠল। স্‌ভিদ্রিগাইলভ এক পা এগিয়ে গেল, গুড়ুম করে গুলি ছুটল। গুলিটা তার চুল ছুঁয়ে পেছনের দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেল, স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। চাপা হাসি হাসল।

" বোলতা হুল ফুটিয়েছে! সোজা মাথা লক্ষ করে অ্যাঁ?... আরে এটা কী? রক্ত!" ডান কপালের রগ বেয়ে সরু ধারায় রক্ত গড়িয়ে পড়তে মোছার জন্য পকেট থেকে রুমাল বের করল। গুলিটা সম্ভবত মাথায় খুলির ওপরকার সামান্য চামড়া ঘেঁষে আলতোভাবে চলে গেছে। দুনিয়া রিভলভার নামিয়ে রেখে স্‌ভিদ্রিগাইলভের দিকে তাকাল— ঠিক আতঙ্কে নয়, কেমন যেন হতবিহ্বল, উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে। কী সে করেছে এবং কী ঘটছে— সে যেন নিজেই আর বুঝতে পারছিল না।

"কী হল? ফসকে গেল যে! আরও একবার গুলি করুন, আমি অপেক্ষা করছি," স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌কে একটু ম্লান দেখালেও তখনও হাসতে-হাসতে মৃদুস্বরে সে বলল। "এরকম করলে তো আপনি ঘোড়া টেপার আগেই আমি আপনাকে ধরে ফেলব!"

দুনিয়া শিউরে উঠল। তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় আঙুল ঠেকিয়ে রিভল্‌ভার ওঁচাল।

"আমাকে ছেড়ে দিন!" মরিয়া কণ্ঠে সে বলল। "দিব্যি করে বলছি, আবার গুলি করব। ...খুন করব!..."

"তা... তিন পা তফাতে খুন করতে আর অসুবিধেটো কোথায়? কিন্তু খুন যদি না করেন... তাহলে..." তার চোখ চকচক করে উঠল, আরও দু পা এগিয়ে এলো সে।

দুনিয়া গুলি করল। গুলি ফুটল না!

"গুলি ভরায় কোন গোলমাল ছিল। ও কিছু না! আরও একটা কার্তুজ আছে। ঠিক করে নিন। আমি অপেক্ষা করছি।"

দুনিয়ার মুখোমুখি দু-পায়ের তফাতে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করছিল, উদ্‌ভ্রান্তের মতো একরোখা সঙ্কল্প নিয়ে উদগ্র আবেগে ভরপুর থমথমে দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল তার দিকে। দুনিয়া বুঝতে পারল লোকটা স্থির করেছে যে মরবে তাও ভালো, তবু ওকে ছাড়বে না। এখন... এখন দু-পায়ের তফাত— অবশ্যই লোকটাকে সে খুন করবে!....

হঠাৎ সে ছুড়ে ফেলে দিল হাতের রিভলভারটা।

"ফেলে দিলে!" স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ অবাক হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তার বুকের ওপর থেকে যেন একটা গুরুভার নেমে গেল— সেটা হয়ত একমাত্র মৃত্যুভয় নয়। তাছাড়া ঠিক সেই মুহূর্তে সে উপলব্ধি তার ছিল কিনা তাতে সন্দেহ আছে। এটা ছিল আরও বিষণ্ণ, আরও বেদনাদায়ক এমন এক উপলব্ধি থেকে উদ্ধারলাভের স্বস্তি, যার শক্তি পূর্ণমাত্রায় নির্ণয় করার ক্ষমতা তার ছিল না।

দুনিয়ার দিকে এগিয়ে গিয়ে নীরবে সে তার কটিদেশ জড়িয়ে ধরল। দুনিয়া বাধা দিল না, কিন্তু তার সর্বাঙ্গ বাঁশপাতার মতো কাঁপতে লাগল, সে মিনতিভরা চোখে তার দিকে তাকাল। স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ ওকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু শুধু ঠোঁটই কাঁপল তার, মুখ দিয়ে কথা বের হল না।

"ছেড়ে দাও আমাকে!" দুনিয়া মিনতি করল।

স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ শিউরে উঠল। এই *তুমি* সম্বোধনটা এখন আগের 'তুই' সম্বোধনের চেয়েও কেমন যেন বেয়াড়া শোনাল।

"তাহলে ভালোবাস না বলছ?" মৃদুস্বরে সে জিগ্‌গেস করল।

দুনিয়া মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানাল।

"ভালোবাসতে... পারও না?... কখনও পারবে না?" মরিয়া কণ্ঠে সে ফিসফিসিয়ে বলল।

"কখনও না।" দুনিয়া ফিসফিস করে বলল।

স্‌ভিদ্রিগাইলভের মনের ভেতরে মুহূর্তের জন্য ভয়ঙ্কর নীরব দ্বন্দ্ব চলল। এমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে দুনিয়ার দিকে তাকাল যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।.. হঠাৎ সে হাত সরিয়ে নিল, মুখ ঘুরিয়ে দ্রুত জানলার দিকে সরে গিয়ে সে দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আরও একটি মুহূর্ত কেটে গেল।

"এই যে চাবি!" দুনিয়ার দিকে না ফিরে, তার দিকে দৃষ্টিপাত না করে

ওভারকোটের বাঁ পকেট থেকে চাবি বের করে পেছনে টেবিলের ওপর রেখে সে বলল। "নিয়ে যান, শিগ্‌গির চলে যান।..."

স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ একদৃষ্টিতে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

দুনিয়া চাবি তুলে নিতে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

"শিগগির। শিগগির!" তখনও জায়গা থেকে না সরে, পিছন ফিরে না তাকিয়ে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ আওড়াল। কিন্তু 'শিগগির' কথাটির মধ্যে বেজে উঠল একটা আতঙ্কের সুর।

দুনিয়া তা বুঝতে পেরে খপ্ করে চাবিটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে ছুটে গেল। চাবি দিয়ে চটপট দরজা খুলে একছুটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। এক মুহূর্ত পরে দেখা গেল ভূতগ্রস্তের মতো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সে খালপাড় ধরে ছুটে চলেছে ব্রিজের দিকে।

স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ মিনিট তিনেক দাঁড়িয়ে রইল জানলার ধারে। অবশেষে ধীরে-ধীরে ঘুরে দাঁড়াল, চারধারে নজর বুলাল, আস্তে করে কপালে হাত বুলাল। একটা অদ্ভুত হাসিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠল তার মুখ। বড় বিষণ্ণ বড় করুণ সে হাসি। ক্ষীণ হাসি, হতাশার হাসি। রক্ত ততক্ষণে শুকিয়ে চচ্চড় করছে, হাতের তালুতে লেগে গেল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সে তাকাল তালুতে উঠে আসা রক্তের দিকে। তারপর তোয়ালে ভিজিয়ে কপালের পাশের রক্ত মুছে ফেলল। দুনিয়ার ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া রিভলভারটা ছিটকে দরজার কাছে গিয়ে পড়েছিল— হঠাৎ ওর নজরে পড়ল। রিভলভারটা তুলে নিয়ে ভালো করে দেখে নিল। পুরানো মডেলের তিন চেম্বারের পকেট রিভলভার। তখনও দুটো গুলি আর বারুদের একটা ক্যাপসুল সেখানে রয়ে গেছে। আরও একবার গুলি ছোঁড়া যেতে পারে। একটু ভেবে রিভলভারটা পকেটে পুরল। টুপি তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ছয়

সেদিন সারা সন্ধ্যা, দশটা পর্যন্ত সে একটার পর একটা সস্তার হোটেল আর অস্থানে-কুস্থানে নরককুণ্ডের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে কাটাল। এরকম একটা জায়গায় সে আবার কাতিয়ার দেখা পেল। কাতিয়া সেই সময় আবার গাইছিল চাকরবাকর মহলে প্রচলিত আরেকটি সস্তার গান। এই গানটির বিষয়বস্তু ছিল 'অত্যাচারী আর বদমাশ' গোছের একটা লোক কাতিয়াকে চুমু খেতে শুরু করে দিয়েছে।

সেখানে উপস্থিত কাতিয়া তার সঙ্গী কলের গানের বাজনাদার সেই ছেলেটো আরও কিছু গাইয়ে, চাকরবাকর শ্রেণীর কিছু লোক, ছোটখাটো চেহারার দুই নকলনবিশ কেরানি— সকলকে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ মদ্যপানে আপ্যায়িত করল। কেরানিদুটোকে তার বিশেষভাবে ভালো লেগেছিল এই কারণে যে ওদের দুটোরই

নাক বাঁকা— একজনের ডান দিকে, আরেকজনের বাঁদিকে। স্‌ভিদ্রিগাইলভ এতে অবাক হয়ে গিয়েছিল। শেষকালে ওরাই ওকে লোভ দেখিয়ে নিয়ে গেল এই প্রমোদোদ্যানে। সেখানে এদের খরচ এবং প্রবেশমূল্যও স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ই নিজের গাঁট থেকে দিল। উদ্যান বলতে সেখানে ছিল সবে তিন বছরের একটা লিকলিকে ফারগাছ আর তিনখানা ছোট-ছোট ঝোপ। এছাড়া তৈরি হয়েছিল একটা মুক্তাঙ্গন রেস্তোরাঁ— আসলে গার্ডেন বার— অবশ্য সেখানে চাও পাওয়া যায়। সবুজ রং করা কয়েকটা ছোট-ছোট টেবিল আর চেয়ারও সেখানে ছিল, উপস্থিত লোকজনের মনোরঞ্জনের জন্য ছিল ওঁছা ধরনের কতকগুলো গাইয়ের সমবেত কণ্ঠের গান, মিউনিখ থেকে আসা সঙ ধরনের এক জার্মান— লোকটার নাকের ডগা লাল, কিন্তু কী কারণে যেন তাকে বড় বেশি বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। কেরানিদুটো ওখানে আরও দুজন কেরানির সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু করে দিল, শেষকালে দুই দলের মধ্যে হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম। স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌কে ওরা সালিসি মানল। সে পনেরো মিনিট ধরে ওদের বিচার করল। কিন্তু ওরা এমন চেঁচামেচি করছিল যে বিন্দুবিসর্গ বোঝার সাধ্য কারও ছিল না। খুব সম্ভব ব্যাপারটা ছিল এই যে ওদের একজন কিছু একটা চুরি করে এবং তৎক্ষণাৎ ওখানেই একজন ইহুদিকে পেয়ে তার কাছে বিক্রিও করে ফেলে। কিন্তু বিক্রি করার পর বন্ধুর সঙ্গে বখরা করতে সে নারাজ। অবশেষে জানা গেল বিক্রি করা বস্তুটি আসলে ওই রেস্তোরাঁরই সামগ্রী— একটা চায়ের চামচ। রেস্তোরাঁয় যখন ধরা পড়ল যে ওটা খোয়া গেছে তখনই ব্যাপারটা গোলমালের আকার ধারণ করল। স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ চামচের দাম চুকিয়ে উঠে বাগান থেকে বেরিয়ে পড়ল। তখন দশটা বাজে। এতটা সময়ের মধ্যে সে নিজে একবারও একফোঁটা মদ মুখে দিল না। কেবল বাগানের রেস্তোরাঁয় নিজের জন্য চা অর্ডার দিয়েছিল— তাও অনেকটা নিয়মরক্ষার খাতিরে। মেঘে ঢাঁকা গুমোট সন্ধ্যা। দশটার দিকে ভয়ঙ্কর কালো মেঘ চারদিক থেকে আকাশ ছেয়ে ফেলল। বজ্রপাতের সঙ্গে-সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে গেল। বৃষ্টির ফোঁটা তো নয়, প্রবল ধারাবর্ষণ মাটিতে ঘনঘন আছড়ে পড়তে লাগল চাবুকের মতো। মুহুর্মুহু বিদ্যুতের চমক— কয়েকটা তো বেশ কয়েক সেকেন্ড পর্যন্ত চলতে থাকে— এমনকি হাতে গোনা যায়। স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ যখন বাড়ি পৌছুল ততক্ষণে তার গায়ের জামাকাপড় ভিজে একসা। ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে দেরাজ খুলে সমস্ত টাকাকড়ি বের করল, দু-তিনটে কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দিল। তারপর টাকাগুলো পকেটে গুঁজল। একবার ভাবল জামাকাপড় বদলাবে, কিন্তু জানলা দিয়ে তাকিয়ে বাইরের অবস্থা দেখে এবং বজ্রবিদ্যুৎ ও বৃষ্টির আওয়াজ পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে না বদলানই মনস্থ করল। টুপি হাতে নিয়ে দরজায় চাবি না দিয়েই বেরিয়ে পড়ল। সটান গিয়ে হাজির হল সোনিয়ার কাছে। সোনিয়া বাড়ি ছিল।

বাড়িতে সোনিয়া একা নয়। ওকে ঘিরে কাপেরনাউমভের চারটে ছোট-ছোট

বাচ্চা। সোনিয়া ওদের চা খাওয়াছিল। সসম্ভ্রমে চুপচাপ অভ্যর্থনা জানাল স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌কে। অবাক হয়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল তার ভিজে জামাকাপড়, কিন্তু একটি কথাও বলল না। বাচ্চাগুলো এত বেশি ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ওরা সঙ্গে-সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল।

স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ টেবিলের ধারে গিয়ে বসল, সোনিয়াকে পাশে বসতে বলল। সোনিয়া বিনীতভাবে ওর কথা শোনার জন্য তৈরি হল।

"সোফিয়া সেমিওনভ্‌না, আমি খুব সম্ভব আমেরিকা চলে যাব." স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ বলল, "তাই আপনার সঙ্গে যেহেতু এটাই সম্ভবত আমার শেষ দেখা, আমি এলাম দু-একটা ব্যবস্থা করে যেতে। হ্যাঁ, ওই ভদ্রমহিলার সঙ্গে আপনার আজ দেখা হয়েছিল তো?" ওর কথা শুনে সোনিয়াকে লজ্জায় লাল হয়ে যেতে এবং নড়েচড়ে বসতে দেখে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ বলল, "আমি জানি উনি আপনাকে কী বলেছেন, তাই পুনরাবৃত্তি করার কোন প্রয়োজন নেই। ওই জাতীয় লোকের ধরন-ধারণ জানা আছে। আপনার ছোট ভাই আর বোনদুটোর প্রসঙ্গে বলি, ওদের সত্যি-সত্যি ব্যবস্থা হয়ে গেছে, ওদের প্রত্যেকের জন্য বরাদ্দ টাকা আমি যথাস্থানে বিশ্বস্ত হাতে তুলে দিয়ে রসিদও করে নিয়েছি। আপনি বরং এই রসিদগুলো নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিন। বলা তো যায় না! এই যে নিন! আচ্ছা, এবারে এই ব্যাপারটা চুকে গেল। এই রইল পাঁচ শতাংশ হারের তিনটি ঋণপত্র— মোট তিন হাজারের। এগুলো আপনার, আপনারই জন্যে। ব্যাপারটা যেন আমাদের দুজনের মধ্যেই থাকে, আর কেউ যেন না জানে— তা আপনার কানে যাই আসুক না কেন। আপনার কাজে লাগবে, কেননা, সোফিয়া সেমিওনভ্‌না, আপনি যেভাবে জীবনযাপন করছিলেন সেটা খুবই খারাপ। তাছাড়া, এখন আর আপনার কোন অভাব রইল না।"

"আপনাকে কী বলে যে আমি কৃতজ্ঞতা জানাব! এই অনাথ শিশুগুলোর জন্য, আমার পরলোকগত মার জন্য আপনি কী না করলেন!" সোনিয়া তাড়াতাড়ি বলে উঠল। "তাই বলছিলাম কি আমার মধ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যদি কোন ঘাটতি দেখেন তা হলে... কিছু মনে করবেন না।..."

"ব্যস্‌ ব্যস, হয়েছে।"

"কিন্তু এই টাকাগুলো — এর জন্য আমি আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। কিন্তু এখন তো আমার আর কোন প্রয়োজন নেই। আমার একজনের পেট — কোন রকমে চালিয়ে নেব। এটা আমার অকৃতজ্ঞতা বলে মনে করবেন না —আপনি যদি অতই বদান্য হন তাহলে এই টাকা..."

"এই টাকা আপনার। আপনার জন্যই রাখা সোফিয়া সেমিওনভ্‌না। দোহাই আপনার, আর কথা বাড়াবেন না, কেননা আমার সময়ও নেই। কিন্তু আপনার কাজে লাগবে। রোদিওন রমানোভিচের সামনে খোলা আছে দুটি পথ: হয় কপালে গুলি

করে আত্মহত্যা, নয়ত সাইবেরিয়াতে নির্বাসন ' এই কথায় সোনিয়া শিউরে উঠে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে স্‌ভিদ্রিগাইলভের দিকে তাকাতে সে বলে চলল, "চিন্তা করবেন না, আমি সব জানি ওঁর নিজের মুখেই শুনেছি। আমি বাচাল নই। কাউকে বলতে যাচ্ছি না। আপনি তখন ওঁকে যে নিজে থেকে গিয়ে স্বীকারোক্তি করতে বলেছিলেন সেটা ভালো পরামর্শই দিয়েছিলেন। এতে তাঁর অনেক বেশি উপকার হবে। আর উনি যদি সাইবেরিয়ার পথ বেছে নেন তাহলে ভ্লাদিমির শহর হয়ে ওর সেই পথে আপনি নিশ্চয়ই ওকে অনুসরণ করবেন? তাই না? ঠিক বলিনি? তাই যদি হয় তাহলে তখন আপনার টাকাকড়িরও দরকার হবে। ওঁর জন্যেও দরকার হবে। বুঝতে পারছেন? আপনাকে দেওয়া ওঁকে দেওয়ারই সামিল হচ্ছে। তাছাড়া আপনি আবার আমালিয়া ইভানোভ্‌নাকে ঋণ শোধ করবেন এমন কথাও বলেছেন— আমি তা-ই শুনেছি। এটা আপনি কী করছেন, সোফিয়া সেমিওনভ্‌না? ভালোমতো না ভেবেচিন্তে এরকম চুক্তি আর দায়দায়িত্ব নিজের ওপর নিচ্ছেন। ওই জার্মান মেয়েমানুষটার কাছে ঋণী ছিলেন কাতেরিনা ইভানোভ্‌না, আপনি তো আর নন। সুতরাং ওই নিয়ে আপনার মাথাব্যথা কেন? এরকম হলে তো দুনিয়ায় বসবাস করা যায় না। হ্যাঁ, আপনাকে যদি কেউ কখনও— এই কাল কিংবা পরশু, যেদিনই হোক না কেন— আমার সম্পর্কে বা আমার ব্যাপারে কিছু জিগ্‌গেস করে— আর আপনাকে তা জিগ্‌গেস করবেই— তাহলে আমি এই যে এখন আপনার কাছে এসেছিলাম একথা ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করবেন না, টাকাকড়ি কোন অবস্থাতেই কাউকে দেখাবেন না এবং আমি যে আপনাকে দিয়েছি তাও বলবেন না। আচ্ছা, এবারে আসি।" চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে যোগ করল, "রোদিওন রমানোভিচকে আমার নমস্কার জানাবেন। প্রসঙ্গত বলি, টাকা অন্তত এখনকার মতো মিস্টার রাজুমিখিনের কাছে রাখুন। মিস্টার রাজুমিখিনকে জানেন তো? নিশ্চয়ই জানেন। লোকটা মন্দ নয়। কালই নিয়ে যান ওঁর কাছে, নয়ত যখন সময় পাবেন। যতক্ষণ তা না করছেন ততক্ষণ যত্ন করে কোথাও তুলে রেখে দিন।"

সোনিয়াও চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, ভীতসন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। সোনিয়ার বড় ইচ্ছে করছিল কিছু একটা বলে, কিছু একটা জিগ্‌গেস করে, কিন্তু প্রথম কয়েক মুহূর্ত তার সাহসে কুলাল না। অবশ্য জানতও না কী ভাবে শুরু করবে।

"সে কী! এখন আপনি... এখন এই বৃষ্টি মাথায় করে যাবেন কী করে?"

"আরে আমেরিকায় যে যাচ্ছে তার কি আর বৃষ্টিবাদলকে ভয় করলে চলে! হাঃ-হাঃ! চলি সোফিয়া সেমিওনভ্‌না, মাই ডিয়ার! বেঁচে থাকুন, দীর্ঘকাল বেঁচে থাকুন। আপনি অন্যদের কাজে লাগবেন। ভালো কথা... মিস্টার রাজুমিখিনকে আমার নমস্কার জানাবেন। জানাতে ভুলবেন না কিন্তু। আর্কাদি ইভানোভিচ স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ আপনাকে নমস্কার জানিয়েছে— ঠিক এই কথা বলবেন। অবশ্যই বলবেন।"

সোনিয়াকে আর কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে হতবুদ্ধি, ভীতি এবং কেমন যেন অস্পষ্ট ও পীড়াদায়ক সন্দেহের মধ্যে রেখে সে বেরিয়ে গেল।

পরে জানা যায়, ওই দিনই রাতের বেলায়, রাত প্রায় বারোটা নাগাদ আরও এক জায়গায় অপ্রত্যাশিতভাবে হানা দিয়ে আরও একটি অদ্ভুত খামখেয়ালিপনার পরিচয় সে দিয়েছিল। বৃষ্টি তখন থামেনি। সর্বাঙ্গ ভিজে সপসপ করছে— এই অবস্থায় এগারোটা বেজে কুড়ি মিনিটে সে ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপের মালি এভিনিউয়ের থার্ড লাইনে তার ভাবী বধূর বাপের ছোট্ট ঘপচি ফ্ল্যাটে এসে ঢুকল। গোড়ায় অবশ্য দরজার দুমদাম ধাক্কা দেওয়ায় ঘরের ভেতরে বিরাট হুলস্থূল ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু আর্কাদি ইভানোভিচ ইচ্ছে করলে ভালো ব্যবহারে লোকজনকে একেবারে জাদু করে রাখতে পারতেন। গোড়ার দিকে... প্রসঙ্গত খুবই যুক্তিসঙ্গতভাবে... মেয়ের বিচক্ষণ মা-বাপ অনুমান করে বসেছিল যে আর্কাদি ইভানোভিচ সম্ভবত কোথাও এত বেশি পরিমাণে টেনে এসেছেন যে এখন আর তাঁর কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। কিন্তু পরক্ষণেই সে সন্দেহ আপনা-আপনি দূর হয়ে যায়। হবু বধূর স্নেহময়ী ও বিচক্ষণ স্বভাবের জননীটি তার কন্যার জন্মদাতা পঙ্গু পিতাকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে স্‌ভিদ্রিগাইলভের কাছে ঠেলে নিয়ে এলো এবং চিরকালের অভ্যেসমতো অবান্তর কতকগুলো প্রশ্ন করতে শুরু করে দিল তাকে। এই মহিলা কখনও সরাসরি কোন প্রশ্ন করত না। সবসময় প্রথমে হাত কচলাতে-কচলাতে মুখে হাসি বের করত, তারপর আর্কাদি ইভনোভিচ কবে বিয়ের দিন ধার্য করতে ইচ্ছুক — এই ধরনের কোন তথ্য জানার যদি তার নিতান্তই এবং বাস্তবিকই ইচ্ছে হত তাহলে সে শুরু করত প্যারিস ও সেখানকার রাজসভার হালচাল-সংক্রান্ত অত্যন্ত কৌতূহলজনক ও আগ্রহোদ্দীপক প্রশ্ন দিয়ে— তারপর একে-একে নামতে-নামতে চলে আসত ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপের থার্ড লেনে। অন্য সময় হলে এসব অবশ্যই গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করত, কিন্তু এবারে আর্কাদি ইভানোভিচকে যেন বড় বেশি অসহিষ্ণু দেখাল। সে সরাসরি তার ভাবী বধূর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করল, যদিও তাকে একেবারে গোড়াতেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে মেয়ে ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। বলাই বাহুল্য শেষ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণে তাকে কিছু দিনের জন্য সেন্ট পিটার্সবুর্গ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে, তাই রুপোয় আর ব্যাঙ্কনোটে মোট পনেরো হাজার রুবল তাকে দেবে বলে এসেছে, এখন তাই এগুলোকে তার কাছ থেকে উপহার হিসেবে গ্রহণ করার অনুরোধ তাকে জানাচ্ছে, যেহেতু বিয়ের আগে এই সামান্য কিছু উপহার তার হাতে তুলে দেওয়া তার বহুদিনের বাসনা ছিল। স্‌ভিদ্রিগাইলভের আসন্ন যাত্রা অথবা বৃষ্টিবাদল মাথায় করে মাঝরাতে আসার একান্ত প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে উপহারের বিশেষ যুক্তিগ্রাহ্য সম্পর্ক এই ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে অবশ্য আদৌ স্পষ্ট হল না। তবে কাজ বেশ ভালোয়-ভালোয় উতরে গেল। এমনকি এসব ক্ষেত্রে অবধারিত ভাবে যে 'ওহো' 'আহা', নানারকম

প্রশ্ন আর বিস্ময়ের প্রকাশ ঘটে, তাও হঠাৎই যেন অস্বাভাবিক সংযত ও পরিমিত মাত্রায় প্রকাশ পেল। তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষায় আবেগের কোন অভাব ছিল না। এমনকি অসাধারণ বুদ্ধিমতী মায়ের চোখের জলে তা আরও জোরাল হয়ে উঠেছিল। স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ হাসতে-হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে ভাবী বধূকে চুমু খেল,. গালে মৃদু চাপড় মেরে তাকে আদর করল, আশ্বাস দিল যে শিগগিরই ফিরে আসবে। মেয়েটির চোখে শিশুর কৌতূহল হলেও সেই সঙ্গে বড় আন্তরিক, এক ধরনের নীরব প্রশ্নের আভাস পেয়ে একটু ভেবে আবার তাকে চুমু খেল। সঙ্গে-সঙ্গে এই ভেবে সত্যি-সত্যি তার মন বিরক্তিতে ভরে উঠল যে তার দেওয়া উপহার অনতিবিলম্বে অসাধারণ বুদ্ধিমতী এই জননীর হেফাজতে চলে গিয়ে তালাচাবি বন্ধ হয়ে থাকবে। সকলকে অস্বাভাবিক উত্তেজনার মধ্যে রেখে সে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু স্নেহময়ী জননীটি তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলো জটিল সমস্যার সমাধান ঘটাল— চাপা গলায় হড়বড় করে বলল যে আর্কাদি ইভানোভিচ একজন বড় মানুষ. উদ্যোগী পুরুষ,. ধনী, নানা জায়গায় বহু যোগাযোগ তাঁর আছে— ভগবান জানেন ওঁর মাথায় কী খেয়াল চেপেছিল! খেয়াল হল— চলে গেলেন, খেয়াল হল— টাকাকড়ি বিলিয়ে দিলেন। তাই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অবশ্য উনি যে ভিজে সপসপে হয়ে এসেছিলেন এটা অদ্ভুত। কিন্তু সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে ইংরেজদের কথা যদি ধরা যায় ওরা তো আরও বেশি খামখেয়ালি। তা উঁচু মহলের এই সব লোকজন তাদের নিয়ে কে কী বলল তাতে কোন আমল দেন না, লৌকিকতার কোন ধার তাঁরা ধারেন না। এমনকি হয়ত উনি ইচ্ছে করেই এই ভাবে ঘুরে বেড়ান, দেখাতে চান যেন উনি কারও তোয়াক্কা করেন না। সবচেয়ে বড় কথা, এই নিয়ে কাউকে একটি কথাও না বলা, কেননা ভগবান জানেন কোথা থেকে কী হয়ে যেতে পারে! আর টাকাকড়ি চটপট তালাচবি দিয়ে তুলে রাখা দরকার। অবশ্য ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে ফেদোসিয়াটা এই সময় রান্নাঘরে বসে ছিল। হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় কথা, ধড়িবাজ রেস্‌লিখটা যেন ঘুণাক্ষরেও কিছু টের না পায়, একেবারে না, একদম না। ইত্যাদি-ইত্যাদি কথা রাত দুটো পর্যন্ত বসে-বসে ওরা নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় বলাবলি করল। কনেটি অবশ্য অনেক আগেই শুতে চলে গিয়েছিল। সে বেশ খানিকটা অবাক হয়ে গিয়েছিল, মুষড়েও পড়েছিল।

স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ ইতিমধ্যে ঠিক মাঝরাতে ভাসিলিয়েভ্‌স্কি দ্বীপ থেকে সেন্ট পিটার্সবুর্গের মফস্বল অঞ্চলে যাবার ব্রিজ পার হচ্ছিল। বৃষ্টি থেমে গেছে, তবে হু হু হাওয়া বইছে। ঠাণ্ডায় হি হি কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল তার। মুহূর্তের জন্য এক ধরনের বিশেষ কৌতূহল নিয়ে, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সে তাকাল ছোট-নেভার গভীর কালো জলের দিকে। কিন্তু শিগ্‌গিরই তার মনে হল জলের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। তাই ব্রিজ থেকে মোড় নিয়ে সে বলশয় এভিনিউয়ের দিকে হাঁটা দিল।

বিশাল রাস্তাটার যেন আর শেষ নেই— অনেকক্ষণ, প্রায় আধঘণ্টা হাঁটল। অন্ধকারের মধ্যে বেশ কয়েকবার গাড়ি চলার পথের কাঠের পাটাতনের গায়ে ধাক্কা খেল, তবু রাস্তার ডানদিক থেকে একবারও দৃষ্টি সরাল না— সারাটা পথ গভীর মনোযোগ দিয়ে কী যেন খুঁজতে-খুঁজতে চলল। এখানেই কোথাও, রাস্তার একেবারে শেষ প্রান্তে, এই কিছুদিন আগে গাড়ি করে যেতে-যেতে তার চোখে পড়েছিল একটা হোটেল। কাঠের বাড়ি, তবে আকারে বেশ বড়, নামটা, যতদূর তার মনে আছে, আদ্রিয়ানোপোল বা ওই গোছের কিছু হবে। হিসাবে ওর কোন ভুল হয়নি— এরকম একটা নির্জন জায়গায় এই হোটেলটা এতই চোখে পড়ার মতো যে অন্ধকারের মধ্যেও তাকে খুঁজে না পাবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। রোদে-জলে কালচে রং ধরা কাঠের, লম্বাটে আকারের দালান। অত রাতেও ভেতরে আলো জ্বলছে। বেশ খানিকটা সজীবতার লক্ষণও চোখে পড়ল। সে ভেতরে ঢুকল, করিডরে ছেঁড়া জামাকাপড় পরা উস্‌কো-খুস্‌কো চেহারায় একটা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে তার কাছে থাকার ঘর চাইল। লোকটা স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌কে এক নজরে দেখে নিল, সচকিত হয়ে সঙ্গে-সঙ্গে তাকে নিয়ে গেল করিডরের একেবারে শেষ প্রান্তে, সিঁড়ির তলায়, এক কোনার একটা গুমোট একফালি ঘরে। আর কোন ঘর খালি ছিল না। সবগুলো ভাড়া হয়ে গেছে। উস্‌কো-খুসকো লোকটা প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকাল।

"চা পাওয়া পাবে?" স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ জিগ্‌গেস করল।

"তা পাওয়া যাবে।"

"আর কী আছে?"

"বাছুরের মাংস, ভোদকা, টুকিটাকি খাবার।"

"নিয়ে এসো বাছুরের মাংস আর চা।"

"আর কিছু লাগবে না?" অনেকটা যেন হকচকিয়ে গিয়েই লোকটা জিগ্‌গেস করল।

"আর কিছু না, আর কিছু না!"

লোকটা সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে বিদায় নিল।

'জায়গাটা ভালোই হবে মনে হচ্ছে,' স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ মনে-মনে ভাবল। 'কেন যে জানতাম না! আমাকেও সম্ভবত দেখে মনে হচ্ছে কোন আসর থেকে হুল্লোড়বাজি করে ফিরছি। পথেও বেশ কিছু অ্যাডভেঞ্চারের অভিজ্ঞতা হয়েছে। তবে জানতে আগ্রহ হয় কারা এখানে এসে ওঠে এবং রাত্রিবাস করে।'

মোমবাতি জ্বালিয়ে ঘরটা আরও ভালো করে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল সে। ঘর তো নয়, ছোটখাটো একটা খাঁচা— এতই ছোট যে স্‌ভিদ্রিগাইলভের মতো দৈর্ঘ্যের একজন মানুষের কোনমতে সোজা হয়ে দাঁড়ান কঠিন। ঘরে জানলা একটাই। বিছানা বেজায় নোংরা। প্রায় সারা ঘর জুড়ে একটা সাধারণ রং করা টেবিল আর একটা

চেয়ার। দেয়ালগুলো দেখে মনে হয় স্রেফ কতকগুলো তক্তা পর পর পেরেক মেরে বসানো, ওয়ালপেপার নোংরা, রং চটা— এত ছিন্নভিন্ন আর ধুলোপড়া যে তার এককালের হলুদ রং এখন অনুমান করা কঠিন, আর নকশা তো একেবারেই সনাক্ত করার উপায় নেই। দেয়াল আর ছাদের একটা অংশ তেরছা হয়ে কাটা পড়েছে— চিলেকোঠার বেলায় সচরাচর যেমন হয়; তবে এখানে মাথার ওপর দিয়ে কোনাকুনি চলে গেছে ওপরে যাবার সিঁড়ি। স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ মোমবাতিটা টেবিলের ওপর রেখে খাটে বসে ভাবতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার মনোযোগ গিয়ে পড়ল দেয়ালের ওপাশের খুপরির দিকে। সেখান থেকে অবিরাম ভেসে আসছে ফিসফিস কথাবার্তার অদ্ভুত আওয়াজ। আওয়াজটা থেকে-থেকে অনেকটা চিৎকারের পর্যায়ে উঠে যাচ্ছিল। যখন সে এখানে এসে ঢুকেছে তখন থেকে এই ফিসফিসানির কামাই নেই। কান পেতে শুনল: একজন আরেকজনকে গালমন্দ করছে, প্রায় কাঁদ-কাঁদ গলায় বকাঝকা করছে। তবে শোনা যাচ্ছে কেবল একজনেরই গলা। স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ এক হাতে মোমবাতি তুলে অন্য হাতে মোমবাতির শিখা আড়াল করে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে-সঙ্গে দেয়ালের একটা ফাটল দিয়ে ঝলক দিল একফালি আলো। স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগল। ঘরটা তার নিজেরটার চেয়ে সামান্য বড়— লোক সেখানে দুজন। তাদের মধ্যে একজনের গায়ে কোটের কোন বালাই নেই। তার মাথার চুল অস্বাভাবিক কোঁকড়া। ফোলাফোলা, লাল মুখ— ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে বক্তার ভঙ্গিতে। হাত দিয়ে বুক চাপড়াতে-চাপড়াতে করুণস্বরে আরেকজনকে এই বলে তিরস্কার করছে যে সে একটা ভিখিরি, তার কোন সামাজিক মর্যাদা নেই, তার মনে রাখা উচিত যে তাকে পাঁক থেকে সে উঠিয়ে এনেছে, যখন খুশি তখনই সে তাকে লাথি মেরে ভাগিয়ে দিতে পারে এবং সর্বশক্তিমান বিধাতাই এসবের একমাত্র সাক্ষী। তার সঙ্গীটি, চেয়ারে বসে-বসে গালাগাল শুনে যাচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে ভীষণ হাঁচি পাচ্ছে অথচ কিছুতেই হাঁচতে পারছে না। থেকে-থেকে সে ফ্যাল-ফ্যাল করে ঘোলাটে দৃষ্টিতে বক্তার দিকে তাকাচ্ছে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে কী নিয়ে কথা হচ্ছে তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারছে না, এমনকি কিছু শুনছে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। টেবিলের ওপর একটা মোমবাতি জ্বলতে-জ্বলতে শেষ হয়ে আসছে, ভোদকার একটা জগ— প্রায় খালি, কয়েকটা পানপাত্র, রুটি, গেলাস, কয়েক টুকরো শসা, অনেক আগে পান করা চায়ের কিছু সরঞ্জাম। দৃশ্যটা ভালোমতো নিরীক্ষণ করার পর স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ নিস্পৃহভাবে ফাটল থেকে সরে এসে আবার খাটে বসল।

উস্‌কো-খুস্‌কো লোকটা চা আর বাছুরের মাংস নিয়ে এলো। আরও একবার জিগ্‌গেস না করে পারল না যে আরও কিছু লাগবে কি না। এবারেও কিছু লাগবে না শুনে শেষ পর্যন্ত বিদায় হল। স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ শরীর গরম করার উদ্দেশ্যে সঙ্গে-সঙ্গে চা

পানে প্রবৃত্ত হল। এক গেলাস চা পান করল। কিন্তু খিদে একেবারে মরে যাওয়ায় কিছুই খেতে পারল না। শরীর কেমন যেন ম্যাজম্যাজ করছে। গায়ের ওপরের কোটটা খুলল, ভেতরের জ্যাকেটও খুলল, কম্বল মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তার মনে-মনে দুঃখ হচ্ছিল: 'এবারে শরীরটা ভালো থাকলে হয়,' ভেবে সে মনে-মনে হাসল। ঘরের মধ্যে গুমোট। মোমবাতিটা মিটমিট করে জ্বলছে, বাইরে হু হু বাতাস বইছে। এক কোণে কোথায় যেন একটা ইঁদুর খচমচ আওয়াজ করছে। তাছাড়া পুরো ঘরটাতেই কেমন যেন ইঁদুর-ইঁদুর আর চিমসে গন্ধ। শুয়ে-শুয়ে সে আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখতে লাগল— একটার পর একটা চিন্তা তার মনের মধ্যে এসে ভিড় করতে লাগল। তার ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, কল্পনা কোন একটা বিষয় নিয়ে দানা বাঁধতে পারলে ভালো হত। 'বাইরে নিশ্চয়ই কোন বাগান আছে,' সে মনে-মনে ভাবল, 'জানলার কাছেই পাওয়া যাচ্ছে গাছপালার সরসর আওয়াজ। নাঃ, রাতে, ঝড়বাদল আর অন্ধকারের মধ্যে গাছপালার আওয়াজ আমার ভালা লাগে না! খুবই বিচ্ছিরি লাগে!' তার মনে পড়ে গেল কিছুক্ষণ আগে পেত্রোভ্স্কি পার্কের পাশ দিয়ে যাবার সময় কী খারাপই না তার লাগছিল! এমনকি ভাবতে গেলে বিরক্তিই ধরে যায়। প্রসঙ্গত তার মনে পড়ে গেল ছোট-নেভার ওপরকার ব্রিজটা, নদীর জল। ...মনে পড়তেই আবার একটা ঠাণ্ডা শীত-শীত ভাব সে অনুভব করল, যেমন অনুভব করেছিল কিছু আগে ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে জল দেখতে-দেখতে। 'জীবনে কখনও আমি জল ভালোবাসতাম না— এমনকি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিতেও না;' মনে-মনে এই কথা ভাবার সঙ্গে-সঙ্গে আবার তার হাসি পেল আরেকটি অদ্ভুত কথা ভেবে : 'কিন্তু মনে হতে পারে এই এখন এসব নন্দনতত্ত্ব আর বিলাসিতা সম্পর্কে আমার সম্পূর্ণ উদাসীন থাকাটা স্বাভাবিক। অথচ এখনই কিনা আমার বাছবিচার শুরু হয়ে গেল! একটা বন্য জন্তু যেমন এ ধরনের পরিস্থিতিতে পড়ে নিজের জায়গাটা ঠিক বেছে নেয় অনেকটা তেমনি আর কি।... তখন মোড় নিয়ে পেত্রোভ্স্কি পার্কে ঢুকে পড়লেই হত! হয়ত বড় বেশি ঠাণ্ডা আর অন্ধকার মনে হয়েছিল, হে- হে! মধুর উপলব্ধি কি আমার এতই দরকার?... ভালো কথা, মোমবাতি নিভিয়ে দিচ্ছি না কেন?' ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দেওয়ার পর দেয়ালের ফাঁকটাতে আর আলো দেখতে না পেয়ে মনে-মনে ভাবল, 'পাশের ঘরের ওরা শুয়ে পড়েছে। এবারে মার্ফা পেত্রোভ্না, আপনার আগমন ঘটলেই হয়। ...অন্ধকার, জায়গাটা বেশ উপযোগী, আর মুহূর্তটার মধ্যেও বেশ মৌলিকত্ব আছে. ...আর কী চাই! অথচ ঠিক এই এখনই, জানি আপনি আসবেন না।...'

হঠাৎ মনে পড়ে গেল কিছুক্ষণ আগে, দুনিয়া সম্পর্কে তার মতলব হাসিল করতে যাবার এক ঘণ্টা আগেও রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে সে পরামর্শ দিয়েছিল যে দুনিয়াকে দেখাশোনা করার দায়িত্ব যেন রাজুমিখিনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। 'আমি আসলে

তখন খুব সম্ভব নিছক তামাসার খাতিরেই কথাগুলো বলেছিলাম। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ও তা অনুমান করতে পেরেছিল। যাই বল না কেন দারুণ পাজি লোক এই রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌টা। নিজের ওপর অনেক ভরসা ওর। আবোল-তাবোল চিন্তার ভূত ওর ভেতর থেকে বেরিয়ে গেলে কালে বড় মাপের বদমাশ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এখন আবার ওর বাঁচার সাধ হয়েছে! এই জাতীয় লোকজন কিন্তু এই ব্যাপারে একেবারে ইতর। তা মরুক গে, ওর যেমন খুশি। আমার কী?'

ঘুম কিছুতেই আসছিল না। অল্প-অল্প করে তার সামনে ভেসে উঠতে লাগল দুনিয়ার খানিকক্ষণ আগেকার উগ্র মূর্তি— সঙ্গে-সঙ্গে কেঁপে উঠল তার সর্বাঙ্গ। 'না, না; এ চিন্তাটা আমাকে ছাড়তেই হবে এখন,' হঠাৎ হুঁশ হতে সে মনে-মনে ভাবল। 'অন্য কিছু একটা চিন্তা করতে হয়। অদ্ভুত আর হাস্যকরও বটে কারও প্রতি বড় রকমের ঘৃণার ভাব আমার কখনও ছিল না, এমনকি কারও ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কথাও কখনও তেমন করে ভাবিনি। কিন্তু এটা খারাপ লক্ষণ, বড় খারাপ লক্ষণ! কারও সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে ভালো লাগত না, মেজাজও গরম করতাম না— এটাও খারাপ লক্ষণ! আজ কত প্রতিশ্রুতিই না ওকে দিয়েছিলাম! ছিঃ! যাচ্ছেতাই! কে জানে, আমাকে হয়ত ভেঙেচুরে বদল করে দিতে পারত...' আবার সে ভাবনা থামিয়ে দিয়ে দাঁতে দাঁত চাপল। এবারেও তার সামনে ভেসে উঠল দুনিয়ার চেহারা— ঠিক সেই চেহারা যখন প্রথমবার গুলি করার পর ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে রিভল্‌ভার নামিয়ে রেখেছিল, মড়ার মতো ফেকাসে মুখে তাকিয়ে ছিল স্‌ভিদ্রিগাইলভের দিকে। সেই সময় একবার কেন, দুবার স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ তাকে চেপে ধরতে পারত। তার তখন এমন অবস্থা যে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ নিজে যদি তাকে মনে করিয়ে না দিত তাহলে আত্মরক্ষার জন্য নিজে থেকে সে হাতই ওঠাতে পারত না। স্‌ভিদ্রিগাইলভের মনে পড়ে গেল ঠিক সেই মুহূর্তে দুনিয়ার প্রতি করুণায় তার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল। '...নাঃ! ধুত্তোর! আবার সেই চিন্তা! ছাড়তে হবে, ছাড়তে হবে এসব চিন্তা!'

এবারে সে ঝিমুতে লাগল। জ্বর-জ্বর কাঁপুনির ভাবটা কেটে যাচ্ছিল। এমন সময় মনে হল কম্বলের তলায় তার হাত আর পায়ের ওপর দিয়ে কিছু একটা দৌড়ে চলে গেল। সে চমকে উঠল। 'ধুত্তোর! ইঁদুর-টিঁদুর হবে মনে হচ্ছে!' মনে-মনে ভাবল। 'মাংসটা টেবিলে রেখে দেওয়া ঠিক হয়নি।...' কম্বলের তলা ছেড়ে বেরিয়ে এসে ঠাণ্ডায় জমে যাবার বিন্দুমাত্র সাধ তার ছিল না। কিন্তু হঠাৎ আবার বিশ্রী রকম সরসর করে পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল কিছু একটা। ঝটিতি কম্বল ফেলে উঠে সে মোমবাতি জ্বালাল। ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে জ্বর-জ্বর শরীরে কাঁপতে-কাঁপতে ঝুঁকে পড়ে বিছানা তন্ন-তন্ন করে দেখল— কোথাও কিছু নেই। কিন্তু কম্বলটা ঝাড়া দেওয়ামাত্র ছিটকে চাদরের ওপর এসে পড়ল একটা ইঁদুর। স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ ছুটে গিয়ে

ওটাকে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে নিচে না পড়ে ইঁদুরটা বিদ্যুৎগতিতে এঁকেবেঁকে চারদিকে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল। ওর আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে গিয়ে হাতের ওপর দিয়ে দৌড়ে সুড়ুৎ করে বালিশের তলায় ঢুকে পড়ল। বালিশ ছুঁড়ে ফেলে দিতে মুহূর্তের মধ্যে উপলব্ধি করল এক লাফে জামার ভেতরে ঢুকে গায়ের ওপর দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। এবারে চলে এসেছে পিঠের দিকে। জামার তলা থেকে বের হবার নাম নেই। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে কাঁপতে লাগল স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌। ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের ভেতরে অন্ধকার। সে যেমন ছিল তেমনি বিছানায় শুয়ে আছে কম্বল মুড়ি দিয়ে। জানলার বাইরে বাতাসের হু হু গর্জন। 'কী যাচ্ছেতাই!' বিরক্ত হয়ে সে মনে মনে ভাবল।

বিছানা ছেড়ে উঠে জানলার দিকে পিঠ করে খাটের কিনারায় সে বসে রইল। 'আদৌ না ঘুমোন বরং ভালো' সে ঠিক করল। তবে জানলার ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা আর স্যাঁতসেঁতে জলো হাওয়া গায়ে লাগছিল। জায়গা ছেড়ে না উঠে কম্বলটা টেনে সে গায়ে জড়িয়ে নিল। মোমবাতি আর জ্বালাল না। কোন কথাই আর সে ভাবছিল না. ভাবার ইচ্ছেও ছিল না। কিন্তু একটার পর একটা অবাস্তব কল্পনা তার মনের মধ্যে এসে ভিড় করছিল, একের পর এক ঝলক দিয়ে যাচ্ছিল টুকরো-টুকরো চিন্তা— আদি অন্তহীন, বিচ্ছিন্ন। আবার তার তন্দ্রামতো এসে গেল। একটা উদগ্র খেয়ালি কল্পনার ঝোঁক, একটা প্রবল বাসনা যে তাকে পেয়ে বসল তার কারণ হয়ত ঠাণ্ডা, হয়ত অন্ধকার, হয়ত সেঁতেসেঁতে ভাব, হয়ত বা বাইরের হু হু বাতাস যার ফলে জানলার ধারে ঘনঘন দুলছিল গাছপালা। যাই হোক না কেন, ওর সামনে সমানে ভেসে উঠতে লাগল ফুল আর ফুল। কল্পনায় সে দেখতে পেল এক অপূর্ব নিসর্গচিত্র। আলো ঝলমল, উষ্ণ একটা দিন। প্রায় গরমের দিনই বলা চলে। উৎসবের দিন, ট্রিনিটি পর্বের দিন। ইংরেজি কেতার একটা দামি জমকাল পল্লীকুটির। চারধারে সুন্দর সার দিয়ে সাজানো ফুলের কেয়ারি। ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। ফুলে-ফুলে ছেয়ে আছে বাড়ির আঙিনা। সামনের দেউড়িতে জড়িয়ে-জড়িয়ে উঠেছে বাহারি লতা,— তার চারপাশে গোলাপের সারি। সিঁড়ির ধাপগুলো আলোয় ঝলমলে, দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। দামি গালিচা বিছানো, সারি সারি চীনেমাটির টবে দুর্লভ ফুল। বিশেষ করে তার নজরে পড়ল জানলায় ফুলদানিতে জল দিয়ে রাখা সাদা, কোমল নার্সিসাস ফুলের স্তবক — উজ্জ্বল সবুজ রঙের লম্বা-লম্বা মোটা ডাঁটা থেকে গুচ্ছে-গুচ্ছে ঝুলে পড়েছে, তীব্র সুবাস ছড়াচ্ছে। ওখান থেকে সরতে মন চাইছিল না তার, তবু সে সিঁড়ির ধাপ বয়ে ওপরে উঠে গেল। এসে ঢুকল বেশ বড় উঁচু একটা হলঘরে। এখানেও জানলার ধারে, টেরাসের দিককার খোলা দরজার পাশে এবং টেরাসেও — সর্বত্র ফুল আর ফুল। মেঝেতে ছড়ান সদ্য কাটা তাজা সুগন্ধী ঘাস। জানলাগুলো খোলা। ফুরফুরে, তাজা প্রাণজুড়ান ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে ঘরে। জানলার ধারে কিচির -

মিচির করছে পাখির দল। হলঘরের ঠিক মাঝখানে কয়েকটা টেবিল জোড়া দিয়ে সাদা সাটিন কাপড় বিছানো, তার ওপর রাখা আছে একটা শবাধার। শবাধারটা সাদা তসর কাপড়ে মোড়া, চারধারে সাদা পুরু মসলিনের ঝালর। চারদিক থেকে ঘিরে আছে ফুলের মালা। রাশি রাশি ফুলের মাঝখানে শুয়ে আছে একটা বাচ্চা মেয়ে। গায়ে সাদা টুইলের পোশাক, হাতদুটো ভাঁজ করে বুকের ওপর চেপে ধরা— ঠিক যেন মার্বেল পাথরে খোদাই করা। কিন্তু হালকা বাদামি রঙের এলো চুল ভিজে। তার মাথায় গোলাপ ফুলের মালা জড়ান। ইতিমধ্যে কঠিন হয়ে এসেছে মুখের ধারাল পার্শ্বরেখা— যেন মার্বেল পাথরে খোদাই করা, কিন্তু তার পাণ্ডুর ঠোঁটের কোনায় যে হাসি ফুটে আছে তা এমন সীমাহীন শোক, এত ভয়ঙ্কর তিক্ততায় পরিপূর্ণ যাকে ঠিক শিশুসুলভ বলা চলে না। এই মেয়েটিকে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ জানত। ওর শবাধারের কাছে কোন বিগ্রহ মূর্তি রাখা হয়নি, কোন মোমবাতি জ্বালান হয়নি। এখানে কেউ কোন প্রার্থনাও উচ্চারণ করছে না। মেয়েটি জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিল। ওর বয়স তখন ছিল সবে চৌদ্দ। কিন্তু তখনই তার মন ভেঙে গেছে। নিদারুণ অপমানের এমন এক তীব্র জ্বালা ও যন্ত্রণা ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছিল তাকে, তার কাঁচা মনকে, কিশোরী চেতনাকে বিমূঢ় ও বিভীষিকাগ্রস্ত করে তুলেছিল, দেবশিশুর মতো নিষ্পাপ সেই মনে সঞ্চার করেছিল এমন এক লজ্জার উপলব্ধি যা আদৌ তার প্রাপ্য নয়। তার ভেতর থেকে মুচড়ে বেরিয়ে এসেছিল অন্তিম মুহূর্তের মরিয়া আর্তনাদ। সে আর্তনাদে কেউ কর্ণপাত করেনি। অন্ধকার রাত, রাতের তমিস্রা, হিমশীতল জলরাশি আর বাতাসের হুহুঙ্কার বড় নির্মম, বড় নির্লজ্জভাবে অবহেলা করেছিল তাকে।...

স্‌ভিদ্রিগাইলভের চমক ভাঙল। সে বিছানা ছেড়ে উঠে জানলার দিকে পা বাড়াল। অন্ধকারে হাতের আন্দাজে ছিটকিনি খুঁজে বের করে জানলা খুলল। দমকা হাওয়া ক্ষিপ্ত হয়ে আছড়ে পড়ল তার অপ্রশস্ত ছোট্ট কামরাটাতে, তার মুখে আর শুধুমাত্র শার্টে ঢাকা বুকে হিমকণার অজস্র ছুঁচ ফুটিয়ে দিল। জানলার বাইরে হয়ত সত্যি-সত্যি বাগান গোছের কিছু একটা আছে, হয়ত বা সেটাও একটা প্রমোদোদ্যান। সম্ভবত সেখানেও দিনেরবেলায় নাচগানের আসর বসেছিল, ছোট-ছোট টেবিলে চা পরিবেশন করা হয়েছিল। এখন গাছপালা আর ঝোপঝাড় থেকে জানলায় জলের ছিটে আসছে। ঘোর অন্ধকার, যেন পাতালপুরীর কালিমাখা অন্ধকার— আলাদা করে কোন জিনিস প্রায় চেনার উপায় নেই। চোখে পড়ে মাত্র কতকগুলো অস্পষ্ট কালো কালো ছোপ। স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ জানলার ধারে কনুইয়ে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল— মিনিটপাঁচেক একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল এই লেপাপোঁছা কালিমার দিকে। নিশুতির অন্ধকার ভেদ করে শোনা গেল একটা তোপের আওয়াজ, তারপর আরও একটা।

‘তোপ দেগে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে! নদীর জল বিপদসীমার ওপরে উঠছে,’ সে

মনে-মনে ভাবল। 'সকাল হতে না হতে শহরের নিচু জায়গাগুলোকে ভাসিয়ে দেবে, মাটির তলার কুঠুরি আর সেলারগুলো সব ডুবে যাবে, সেখান থেকে রাজ্যের যত ইঁদুর ভেসে উঠবে, লোকে বৃষ্টিবাদলের মধ্যে ভিজে শাপশাপান্ত করতে-করতে তাদের পুঁজিপাটা ওপর তলায় তুলছে।... কিন্তু কটা বাজে এখন?' এই কথা ভাবতে না ভাবতে শুনতে পেল কাছেই কোথায় যেন ব্যস্তসমস্তভাবে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বেজে উঠল একটা দেয়াল ঘড়ি। তিনটের ঘণ্টা। 'আচ্ছা, আর এক ঘণ্টা বাদেই ভোরের আলো দেখা দেবে! আর অপেক্ষা করা কেন? এখনই বেরিয়ে পড়ি। সোজা চলে যাব পেত্রোভ্স্কি পার্কে, সেখানে কোথাও বেছে নেব বড় দেখে একটা ঝোপ— আগাগোড়া বৃষ্টিতে ভেজা— এমনই ভেজা যে কাঁধের সঙ্গে একটু লাগামাত্র ঝরঝর করে লক্ষ-লক্ষ ফোঁটা মাথার ওপর ঝরে পড়ে।...' জানলার ধার থেকে সে সরে এলো। জানলা বন্ধ করে মোমবাতি জ্বালাল। গায়ে জ্যাকেট চাপাল, তার ওপর ওভারকোট। মাথায় টুপি দিয়ে মোমবাতি হাতে করে করিডরে বেরিয়ে এলো। রাজ্যের আবর্জনা আর পোড়া মোমবাতির টুকরোর জঞ্জালের মাঝখানে কোথায় কোন কুঠুরিতে উস্কো-খুস্কো লোকটা পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে কে জানে? তাকে এখন খুঁজে বের করে ঘর ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। প্রশস্ত সময়। এর চেয়ে ভালো সময় আর হতে পারে না!' স্ভিদ্রিগাইলভ্ মনে-মনে বলল।

লম্বা সরু করিডরটা আগাগোড়া হেঁটে যেতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল। কাউকে কোথাও দেখতে না পেয়ে সে জোরে হাঁকডাক করবে বলে ঠিক করেছে, এমন সময় পুরানো আলমারি আর দরজার মাঝখানের অন্ধকার কোণে তার চোখে পড়ল একটা অদ্ভুত বস্তু—মনে হল যেন জীবন্ত কিছু। মোমবাতি হাতে ঝুঁকে পড়তে দেখতে পেল একটা বাচ্চা— বাচ্চা মেয়ে— বছরপাঁচেকের বেশি হবে না। ঠকঠক করে কাঁপতে-কাঁপতে কাঁদছে। গায়ের জামাটা ঘর মোছার ন্যাতার মতো ভিজে সপসপ করছে। স্ভিদ্রিগাইলভ্‌কে দেখে সে ভয় পেয়েছে বলে মনে হল না। তবে বড়-বড় কালো চোখ তুলে অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকাল। থেকে-থেকে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে— বাচ্চারা যেমন সচরাচর অনেকক্ষণ ধরে কাঁদার পর কান্না থামিয়ে, এমনকি অনেকটা আশ্বস্ত হওয়ার পরও কান্নার বেগ সামলাতে না পেরে আবার যখন-তখন হঠাৎই ডুকরে কেঁদে ওঠে। মেয়েটার মুখ ফেকাসে, অবসন্ন। ঠাণ্ডায় সে সিঁটিয়ে গেছে। কিন্তু 'এখানে কী ভাবে এলো? তার মানে, এখানে লুকিয়ে ছিল, সারা রাত ঘুমোয়নি।' স্ভিদ্রিগাইলভ্ ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করল। মেয়েটা হঠাৎ যেন প্রাণ ফিরে পেল। হড়বড় করে শিশুর আধ-আধ বুলিতে তাকে একগাদা কী সব বলে গেল। তার মধ্যে 'মামুনির' কথাও কী যেন বলল। বলল যে 'মামুনি মালবে', জানা গেল একটা কাপ সে ভেঙেছে। কথা সে বলেই চলেছে অনর্গল— থামার নাম নেই। যা-যা বলল তা থেকে কিছু-কিছু আন্দাজ করা কঠিন

নয়। বোঝা গেল বাচ্চাটাকে তার মা ভালোবাসে না। মা রাঁধুনির কাজ করে, সবসময় মাতাল অবস্থায় থাকে— সম্ভবত এই হোটেলেই কাজ করে। মেয়েটাকে মারধর করেছে, ভয়ও দেখিয়েছে। মেয়ের একমাত্র দোষ এই যে মা'র কাপ ভেঙে ফেলেছে। মা তাকে এতই ভয় দেখিয়েছে যে গতকালই বাড়ি থেকে পালিয়েছে। বৃষ্টির মধ্যে বাড়ির বাইরে কোথাও সম্ভবত অনেকক্ষণ লুকিয়ে ছিল, শেষকালে কোনমতে এখানে এসে আলমারির আড়ালে লুকিয়েছে। এখন এসবের জন্য মা'র কাছে প্রচণ্ড মার খেতে হবে এই ভয়ে স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডায়, অন্ধকারের মধ্যে সারারাত এখানে এই কোণটাতে গুটিসুটি মেরে বসে ঠকঠক করে কাঁপছে আর কাঁদছে। স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ ওকে কোলে তুলে নিয়ে কামরায় ফিরে গেল, বিছানায় বসিয়ে ওর জামাকাপড় খুলতে লাগল। মোজা ছাড়া পায়ে পরা টুটোফাটা জুতোজোড়া এত ভিজে গেছে যে মনে হচ্ছিল সারারাত কোথাও নোংরা জলের মধ্যে পড়ে ছিল। জামাকাপড় খুলে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আপাদমস্তক কম্বলে জড়িয়ে ঢেকে দিল। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়ল। সব কাজ শেষ হলে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ আবার গম্ভীর মুখে চিন্তা করতে লাগল।

'আবার মাথায় কী যে ছাই চাপল! জড়িয়ে পড়লাম!' হঠাৎ ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে সে মনে-মনে ভাবল। 'কী যা তা কাণ্ড!' বিরক্তিভরে মোমবাতি তুলে নিয়ে সে ঠিক করল যে করেই হোক উস্‌কো-খুস্‌কো লোকটাকে খুঁজে বার করতেই হবে, এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে পড়তে হবে। 'ইস্‌ বেচারি!' দরজা খুলতে গিয়ে নিজেকে শাপশাপান্ত করতে-করতে সে আপন মনে বলল। কিন্তু আবার ফিরে এসে আরেকবার দেখল মেয়েটা সত্যি-সত্যি ঘুমোচ্ছে কিনা। সন্তর্পণে কম্বলটা সামান্য তুলে দেখল। পরম শান্তিতে গভীর ঘুমে অচেতন। কম্বলের তলায় থাকার ফলে শরীরটা এখন গরম হয়েছে, তার ফেকাসে গালে ইতিমধ্যে লালচে আভা ছড়িয়ে পড়েছে কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার এই যে বাচ্চাদের গালে সচরাচর যে গোলাপী আভা দেখা দেয় এ রংটা তার চেয়ে অনেক বেশি চড়া, অনেক বেশি গাঢ়। 'জ্বরের তাপে এই লাল আভা,' স্‌ভিদ্রিগাইলভের মনে হল। কিন্তু মদ খেলে গালে যেমন রং ধরে এ যেন ঠিক তাই। ঠিক যেন কেউ ওকে পুরো এক গেলাস মদ খাইয়ে দিয়েছে। লাল টকটকে ঠোঁট যেন উত্তাপে জ্বলছে। কিন্তু এ কী ব্যাপার? হঠাৎ তার মনে হল মেয়েটার চোখের পাতা কাঁপছে, পিটপিট করছে, নড়ছে পাতার দীর্ঘ, কালো লোমগুলো। একটু যেন উঠছে, তলা থেকে উঁকি মারছে ধূর্তের তীব্র চাহনি— যেভাবে চোখ টিপছে তা কেমন যেন— শিশুর মতো তাকে বলা চলে না। দেখে মনে হচ্ছে ঘুমোচ্ছে না, ঘুমের ভান করে পড়ে আছে। হ্যাঁ, সত্যিই তাই— ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে হাসি ফুটে বেরোচ্ছে। এখনও যেন নিজেকে সামলানোর চেষ্টায় ঠোঁটের কোনা অল্প-অল্প কাঁপছে। কিন্তু, না, এবারে আর সংযমের কোন বালাই দেখা যাচ্ছে না। এখন যে

হাসি হাসছে সেটা খোলাখুলি— কেমন যেন বেহায়া ধরনের। একটা প্ররোচনার ভাব ফুটে উঠছে সে হাসিতে। ও মুখ এখন মোটেই আর শিশুর মুখ নয়। এ তো ব্যাভিচার! এ মুখ বারবনিতার মুখ, ফরাসী উপন্যাসের সেই নির্লজ্জ লাস্যময়ী ক্যামেলিয়ার মুখ! এবারে আর কিছুমাত্র গোপন না করে দু-চোখই খুলেছে— নির্লজ্জ কামনার প্রখর দীপ্তি ঝরে পড়ছে তার দু-চোখে। দু-চোখের দৃষ্টিতে সে লেহন করছে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌কে, তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। তার দু-চোখ হাসছে।... সেই হাসিতে, চোখের সেই দৃষ্টিতে, শিশুর আদলের মুখের সেই আগাপাশতলা নীচতার মধ্যে এমন একটা বীভৎস ও আপত্তিকর ভাব ফুটে উঠেছিল যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। 'এ কী! পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে!' সত্যি-সত্যি আতঙ্কিত হয়ে ফিসফিস করে বলে উঠল স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌। 'এটা কী ব্যাপার? কী এটা?' এবারে মেয়েটা জ্বলন্ত মুখখানা তুলে সোজাসুজি তার দিকে তাকাল, দু-হাত সামনে বাড়িয়ে দিল।...'তবে রে! চুলোয় যা!' আতঙ্কিত হয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ তাকে আঘাত করার জন্য হাত তুলল।... ঠিক সেই মুহূর্তে তার ঘুম ভেঙে গেল।

সে শুয়ে আছে সেই একই বিছানাতে, আগের মতোই কম্বল মুড়ি দিয়ে। মোমবাতি জ্বালান হয়নি। বাইরে পুরোমাত্রায় দিনের আলো।

'সারা রাত এ কী দুঃস্বপ্ন দেখলাম!' মনে-মনে ক্রুদ্ধ হয়ে সে উঠে বসল, অনুভব করল তার দেহমন একেবারে ভেঙে পড়েছে, হাড় ব্যথা করছে। বাইরে ঘন কুয়াশায় সব কিছু লেপাপোঁছা। কিছুই চোখে দেখা যায় না। সকাল প্রায় পাঁচটা। না, ঘুমটা তার বেশি হয়ে গেছে। উঠে জ্যাকেট আর ওভারকোটটা পরে নিল। তখনও ভিজে। পকেটে রিভল্‌ভারটা ঠিক আছে কিনা হাত দিয়ে দেখার পর বের করে বারুদের ক্যাপসুলটা ঠিক করে রাখল। তারপর পকেট থেকে নোটবই বের করে সামনের পাতায়... যাতে সঙ্গে-সঙ্গে লোকের নজরে পড়ে এমন জায়গায়, বড়বড় অক্ষরে কয়েকটা ছত্র লিখল। লেখাটা ভালো করে পড়ার পর টেবিলের ওপর কনুই ঠেকিয়ে ভাবতে বসে গেল। রিভল্‌ভার ও নোটবইটা ওখানেই তার কনুইয়ের কাছাকাছি পড়ে রইল। কাছেই টেবিলের ওপর পড়ে ছিল গতকালের স্পর্শ না করা মাংসের প্লেট। সদ্য জেগে ওঠা কিছু মাছি তার ওপর ঝাঁক বেঁধে বসেছে. স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ অনেকক্ষণ তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল। অবশেষে খালি ডান হাতটা বাড়িয়ে একটা মাছি ধরার চেষ্টা করল। অনেকক্ষণ এই চেষ্টা চালানোর ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। মাছিটা কিছুতেই ধরা গেল না। শেষকালে এরকম একটা মজার কাজে ব্যস্ত অবস্থায় নিজের কাছে ধরা পড়ে যেতে তার হুঁশ হল। চমকে সে উঠে পড়ল জায়গা ছেড়ে। এতটুকু ইতস্তত না করে মুহূর্তের মধ্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

দুধ রঙের ঘন কুয়াশা নেমে এসেছে শহরের ওপর। কাঠের পাটাতন বিছানো নোংরা পেছল সদর রাস্তা ধরে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ ছোট-নেভার দিকে রওনা দিল।

কল্পনায় সে দেখতে পাচ্ছিল একরাতের মধ্যে ছোট-নেভার জল অনেক ওপরে উঠে গেছে। দেখতে পাচ্ছিল পেত্রোভ্স্কি দ্বীপ, ভিজে পথঘাট, ভিজে ঘাস, ভিজে গাছপালা, ঝোপঝাড় এবং... অবশেষে সেই ঝোপটা।... বিরক্ত হয়ে ভাবল অন্য কোন দিকে মন দেওয়া দরকার। তাই আশেপাশের বাড়িঘর খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। রাস্তায় কোন পথচারী বা গাড়ি— কিছুই চোখে পড়ছে না। উজ্জ্বল হলুদ রংয়ের ছোট-ছোট কাঠের বাড়ি, জানলার খড়খড়ি নামানো।... দেখতে যেমন নোংরা তেমনি হতশ্রী। ঠাণ্ডা আর স্যাঁতসেঁতে ভাব তার সর্বাঙ্গ অবশ করে ফেলছে। শীত-শীত করছে। কদাচিৎ নজরে পড়ে যাচ্ছিল ছোট-বড় নানারকম দোকানের সাইন বোর্ড। প্রত্যেকটিই সে মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছিল। তক্তা বিছানো রাস্তাটা এবারে শেষ হয়ে গেল। এখন সে পাথরের তৈরি একটা বড় বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে। ঠাণ্ডায় কাঁপতে-কাঁপতে একটা নোংরা কুকুর ওর সামনে দিয়ে লেজ গুটিয়ে রাস্তা পার হয়ে গেল। ওভারকোটে গা ঢাকা দিয়ে একটা মাতাল একেবারে অচৈতন্য অবস্থায় উপুড় হয়ে ফুটপাতের ওপর আড়াআড়ি পড়ে আছে। স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ একবার তাকিয়ে দেখে আবার এগিয়ে গেল। বাঁ পাশে হঠাৎ চোখে পড়ল ফায়ার ব্রিগেডের একটা উঁচু মিনার। 'বাঃ! এই তো চাই!' সে মনে-মনে ভাবল। 'পেত্রোভ্স্কিতে যাবার কী দরকার? তাছাড়া অন্তত সরকার তরফের একজন সাক্ষীও পাওয়া যাচ্ছে... 'এই নতুন আইডিয়াতে তার প্রায় হাসিই পেয়ে গেল। মিনারের রাস্তাটার দিকে সে মোড় নিল। রাস্তার ওপরে বড় একটা বাড়ির লাগোয়া এই মিনারটা। বিশাল বন্ধ ফটকের সামনে, ফটকের গায়ে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন বেঁটেখাটো লোক। লোকটার গায়ে সিপাহীর ভারী ছাইরঙা ওভারকোট। মাথায় কায়দার চুড়ো আকারের বিশাল শিরস্ত্রাণ— সেটা তামার— ফায়ার ব্রিগেডের লোকদের যেমন হয়ে থাকে। এই অবস্থায় তাকে দেখাচ্ছিল ইলিয়ডের একিলিসের মতো। স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌কে এগিয়ে আসতে দেখে সে বিশেষ আমল দিল না— ঘুম-ঘুম চোখে উদাসীনভাবে কটাক্ষপাত করল তার দিকে। লোকটার চেহারায় প্রকাশ পাচ্ছিল আবহমানকালের দুখী-দুখী, বেজার এমন একটা ভাব যা অবধারিতভাবে ইহুদীয় জনগোষ্ঠীর যে-কোন মানুষের চোখেমুখে আঁকা হয়ে থাকতে দেখা যায়। ওরা দুজনে— স্‌ভিদ্রিগাইলভ ও একিলিস বেশ খানিকক্ষণ নীরবে তাকিয়ে-তাকিয়ে একে অন্যকে দেখতে লাগল। একটা লোক তার তিন পা দূরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চুপচাপ তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অথচ মাতাল নয়— দেখে একিলিসের শেষকালে কেমন যেন খটকা লাগল।

"আপনার কী-ই দোরকার মোসাই ইখানে?" নিজের জায়গা না ছেড়ে একই ভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সে বলল।

"কিছু না ভাই। নমস্কার।" উত্তরে স্‌ভিদ্রিগাইলভ্ বলল।

"পথ দেখুন।"

"আমি ভিনদেশে যাচ্ছি ভাই।"

"ভিনদেশে?"

"আমেরিকায়।"

"আমরিকায়?"

স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ রিভ্‌লভার বের করে ঘোড়ায় আঙুল ঠেকাল। একিলিসের চোখ কপালে উঠে গেল।

"এই! এ সোব কী হোচ্চে? এটা আপনার তামাসার জায়গা নোয়!"

" কেন? জায়গা নয় কেন?"

"কেনো না জায়গা নোয়।"

"তা ভাই ওতে কিছু এসে যায় না। খাসা জায়গা। তা ভাই তোমায় যদি কেউ জিগ্‌গেস-টিগ্‌গেস করে তাহলে একথাই বলবে— আমেরিকায় চলে গেছে।"

রিভ্‌লভারটা সে কপালের ডান দিকের রগে ঠেকাল।

"এখেনে নোয়, এটা জায়গা নোয়!" একিলিস নড়েচড়ে উঠল, তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ ট্রিগারে চাপ দিল।

সাত

ওই দিনই, তবে সন্ধ্যাবেলা — সাতটার দিকে, রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ যাচ্ছিল তার মা আর বোনের সঙ্গে দেখা করতে, বাকালেইয়েভের বাড়ির সেই ফ্ল্যাটে, যেখানে রাজুমিখিন তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। বাড়ির সিঁড়ির মুখটা সদর রাস্তার দিকে। কাছাকাছি আসতে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ পায়ের গতি মন্থর করে দিল। মনে হচ্ছিল তখনও সে ইতস্তত করছে, ভাবছে ভেতরে যাবে কি যাবে না। কিন্তু না, ফেরার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সে মন ঠিক করে ফেলেছে। 'তা ছাড়া কিছু এসে যায় না, ওরা এখনও কিছু জানে না,' সে মনে-মনে ভাবল,'আমাকে আজব লোক বলে ভাবতে ওরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে...' তার বেশভূষা যাচ্ছেতাই— সারারাত বৃষ্টিবাদলের মধ্যে বাইরে কাটানোর ফলে আগাগোড়া নোংরা, কাদামাখা, জীর্ণ, শতচ্ছিন্ন। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা, রাতদিন সে নিজের সঙ্গে যুঝেছে, তাই দৈহিক ক্লান্তির ফলে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর দারুণ ধকল — সব কিছু মিলে তার চেহারাটাও হয়ে দাঁড়িয়েছে বীভৎস। সারাটা রাত ও একা-একা কোথায় কাটিয়েছে একমাত্র ভগবানই জানেন। কিন্তু যা হোক, শেষ পর্যন্ত সে মন স্থির করে ফেলেছে।

দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলে দিল মা। দুনিয়া বাড়ি ছিল না। এমনকি কাজের মেয়েটিও সেই সময় বাড়ি ছিল না। পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না বিস্ময়ে-আনন্দে এত

বেশি বিহ্বল হয়ে পড়ল যে তার মুখে প্রথমে কোন কথাই সরল না। পরে সে হাত ধরে তাকে ঘরের ভেতরে টেনে নিয়ে এলো।

"এলি তাহলে!" আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমতা-আমতা করতে লাগল সে। "তোকে দেখে আমি যে এমন বোকার মতো কাণ্ড-কারখানা করছি, চোখের জল ফেলছি সে জন্য রাগ করিস নে রে রোদিয়া। আমি কাঁদছি না, আমি হাসছি। তুই ভাবছিস আমি কাঁদছি? না রে, এটা আমার আনন্দের প্রকাশ। এটাই আমার বড় বদ স্বভাব— কথায়-কথায় চোখে জল এসে যায়। এ দশা আমার হয়েছে তোর বাবার মৃত্যুর পর থেকে— সবেতেই কাঁদি। বোস রে, অনেক ধকল গেছে তোর শরীরের ওপর দিয়ে— তাই না? হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। ইস্ এ কী জলকাদা মাখা নোংরা দশা তোর জামাকাপড়ের!"

"আমি কাল বৃষ্টির সময় বাইরে ছিলাম, মামণি..." রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বলল।

"না না, একদম না!" তাকে বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না। "তুই ভেবেছিলি আমি এখনই তোকে জেরার পর জেরা শুরু করে দেব আগেকার সেই মেয়েলি কৌতূহলের বশে? চিন্তা করিস নে। আমি কিন্তু বুঝতে পারছি, সব বুঝতে পারছি, এখন আমি এখানকার মতো করে বুঝতে শিখেছি। আর সত্যিই তো, আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি যে এটা বেশি বুদ্ধিমানের কাজ। আমি মনে-মনে চিন্তা করে চিরকালের মতো স্থির করে ফেলেছি: তোর মনের ভাব বোঝার সাধ্য কি আমার? তার জন্যে তোর কাছ থেকে কৈফিয়তই বা দাবি করতে যাব কেন? ভগবান জানেন, তোর মাথায় হয়ত কত রকমের কাজের চিন্তা, পরিকল্পনা কিংবা কোন আইডিয়া ঘুরছে। তাই তুই কী ভাবছিস তা জানার জন্যে তোকে খোঁচান— একেবারেই ঠিক নয়। দ্যাখ, আমি... দেখ কাণ্ড, কী পাগলের মতো উলটো-পালটা বকে যাচ্ছি!...দ্যাখ রোদিয়া, জার্নালে তোর ওই লেখাটা আমি এই নিয়ে তিনবার পড়ছি। দ্‌মিত্রি প্রকোফিচ নিয়ে এসেছিলেন। দেখে তো আমি হাঁ। মনে-মনে ভাবি দেখ কাণ্ড, কী বোকা আমি! ও তাহলে এইসব চিন্তায় ব্যস্ত থাকে! এতক্ষণে কিনা বোঝা গেল সমস্ত রহস্য। ভাবলাম, তখনও হয়ত ওর মাথার মধ্যে নতুন কোন চিন্তা-ভাবনা খেলছিল, ও হয়ত তাইতে ডুবে ছিল, এদিকে আমি কিনা ওকে উত্ত্যক্ত করছি, ব্যতিব্যস্ত করে তুলছি! পড়ছি রে, পড়ছি, অনেক কিছুই অবশ্য বুঝতে পারছি না। তা তো হবেই— ওসব কি আমার বোঝার জিনিস?

"দেখাও দেখি ওটা আমাকে!"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ পত্রিকাটা হাতে নিয়ে একলহমা চোখ বুলিয়ে নিল। লেখার বক্তব্য তার এখনকার অবস্থা আর মেজাজের যত বিরোধীই হোক না কেন, যে-কোন লেখক তার লেখা ছাপার অক্ষরে প্রথম দেখতে পেলে যে ধরনের অদ্ভুত অম্লমধুর অভিজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে পড়ে সেও তা উপলব্ধি না করে পারল না। তাছাড়া তার

বয়স আবার মাত্র তেইশ। কিন্তু অনুভূতিটা মুহূর্তের। কয়েক ছত্র পড়ার পর সে ভুরু কোঁচকাল, নিদারুণ বিষাদে ভারী হয়ে উঠল তার মন। গত কয়েক মাস ধরে তার মনের মধ্যে যে সংগ্রাম চলছিল সঙ্গে-সঙ্গে তা আবার ফিরে এলো। বিরক্তিভরে, প্রবল বিতৃষ্ণায় কাগজটা সে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল।

"কিন্তু রোদিয়া, খোকা আমার, দ্যাখ, আমি যত বোকাই হই না কেন, এটা অন্তত দেখতে পাচ্ছি যে খুব শিগগিরই তুই আমাদের পণ্ডিতমহলে সবার ওপরে না হলেও প্রথম সারির একজন যে হবি তাতে কোন সন্দেহ নেই। লোকের কী স্পর্ধা দ্যাখ— ভাবে, তোর মাথার গোলমাল হয়েছে! হাঃ হাঃ হাঃ। তুই জানিস না, কিন্তু ওদের তাই ধারণা! কী নীচু মনের মানুষ ওরা বল তো। মানুষ নয় পোকামাকড়ই বলব ওদের।— ওরা কী করে বুঝবে বিদ্যেবুদ্ধির মর্ম? অবশ্য দ্যাখ, দুনিয়াটাও প্রায় বিশ্বাস করে বসেছিল— তাহলেই বোঝ! তোর বাবা... তাঁর আত্মার শান্তি হোক... দুবার লেখা পাঠিয়েছিলেন পত্রিকায়... প্রথমবার কবিতা... খাতাটা আমার কাছে আছে, এক সময় তোকে দেখাব। তারপর উনি পাঠান পুরো একটা বড় গল্প... আমি নিজে উদ্যোগী হয়ে কপি করার জন্য ওঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলাম। যাতে ছাপা হয় তার জন্যে আমরা দুজনে কত প্রার্থনাই না করেছিলাম— কিন্তু ছাপা হল না। খোকা, দিন ছয়-সাতেক আগে তোর জামাকাপড়ের অবস্থা দেখে আমার কান্না পেয়ে গিয়েছিল। কী ভাবে দিন কাটাচ্ছিস, কী খাস, কোথায় যাস? কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি আবারও আমার বোকামি, কেননা তোর যা মাথা, যা প্রতিভা তাতে ওই খাটিয়ে তুই চাইলে যা তোর খুশি সঙ্গে-সঙ্গে পেয়ে যেতে পারিস। আসল কথা হল আপাতত সে ইচ্ছে তোর নেই, এখন তুই আরও অনেক বড় কোন কাজে ব্যস্ত আছিস..."

"দুনিয়া কি বাড়ি নেই মামণি?"

"না রে খোকা। প্রায়ই বাড়ি থাকে না। আমাকে একা ফেলে কোথায়-কোথায় যায়। দ্মিত্রি প্রকোফিচকে ভালো বলতে হবে যে আসেন, আমাকে সঙ্গ দেন, সব সময় তোর কথাই বলেন। তোকে বড্ড ভালোবাসেন, ভক্তিও করেন রে খোকা। তোর বোনের কথা আর কী বলব— আমি বলতে চাইছি না যে কোন অশ্রদ্ধার ভাব দেখাচ্ছে... না না আমার কোন অভিযোগ নেই। আমার যেমন নিজের মেজাজ আছে ওরও তেমনি নিজের মেজাজ আছে। ওর নিজস্ব কতকগুলো ভাবনাচিন্তা দেখা দিয়েছে— সেগুলো ও গোপন রাখে। আমার অবশ্য তোদের কারও কাছ থেকে গোপন করার মতো কিছু নেই। আমার অবশ্য এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে দুনিয়া খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে, তাছাড়া আমাকে এবং তোকেও ভালোবাসে... কিন্তু কী জানি বাপু, এসবের পরিণতি শেষপর্যন্ত কী হতে পারে। এই যে তুই এলি রোদিয়া, আমার ভারি ভালো লাগছে। অথচ দুনিয়াটা, দ্যাখ, কোথায় টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে— তোর

সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ হারাল। এলেই বলব, 'ভাই এসেছিল, কিন্তু তুই বাড়ি ছিলি না। কোথায় ঘুরে-ঘুরে সময় কাটাস?' তুই আর অত লাই দিস না আমাকে, খোকা। যখন দরকার মনে করবি তখন আসবি, যদি মনে করিস দরকার নেই— কিছু বলার নেই, আমি না হয় অপেক্ষা করব। তবু তো আমি জানতে পারব যে তুই আমাকে ভালোবাসিস। আমার পক্ষে এটাই যথেষ্ট। তোর লেখা পড়ব, চারদিক থেকে সকলের মুখে তোর কথা শুনব। তবে সময়-সময় নিজেই দেখতে আসবি আমাকে— এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে? এই তো এখন এলি তোর মাকে সান্ত্বনা দিতে। আমি তো দেখতেই পাচ্ছি ..." কথার মাঝখানে পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না হঠাৎ কেঁদে ফেলল। তারপর বলল," আবার আমি শুরু করলাম! আমার দিকে, তোর এই বোকা মা'টার দিকে আর তাকাস নে রে! কী ছাই হয়েছে আমার! দিব্যি বসে আছি!" ঝট করে জায়গা ছেড়ে উঠে সে চিৎকার করে বলল,"আরে কফি আছে তো ঘরে! অথচ দ্যাখ, আমি তোকে দিচ্ছি না! বুড়ির স্বার্থপরতা কতখানি ভেবে দ্যাখ একবার! দিচ্ছি, এখুনি দিচ্ছি!"

"মা গো, ওসব রাখ এখন, আমি এখুনি উঠছি। আমি ঠিক এর জন্য আসিনি। তোমার দুটি পায় পড়ি, আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোন।"

পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না ভয়ে-ভয়ে এগিয়ে গেল ছেলের দিকে।

"শোন মা, যা-ই ঘটুক না কেন, আমার সম্পর্কে যা-ই শোন না কেন, আমার সম্পর্কে তোমাকে যে যা-ই বলুক না কেন— সব সত্ত্বেও আমাকে আগের মতোই ভালোবাসবে তো?" কথার জন্য এতটুকু ভাবতে হল না তাকে। একটা কথাও ওজন করে বলতে হল না। অন্তরের অন্তস্তল থেকে আপনা-আপনি বেরিয়ে এলো কথাগুলো।

"খোকা! খোকা রে! কী হয়েছে তোর বল তো? এমন কথা তুই জিগ্‌গেস করতে পারলি কী বলে! তাছাড়া তোর সম্পর্কে আমাকে কে কী বলবে? বললেই কি আমি বিশ্বাস করব?— সে যে-ই বলুক না কেন। সোজা হাঁকিয়ে দেব।"

"আমি তোমাকে এই আশ্বাস দিতে এসেছি যে তোমাকে বরাবরই ভালোবেসে এসেছি। ভালো বলতে হবে যে আমরা এখন একা, এমনকি ভালো বলতে হবে যে দুনিয়াও নেই," সেই একই রকম আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বলল। "আমি তোমাকে সরাসরি এই কথা বলতে এসেছি যে তোমার কপাল খারাপ হলেও জেনে রেখো, তোমার ছেলে এখন নিজের চেয়েও তোমাকে বেশি ভালোবাসে এবং তুমি যে ভেবেছ আমি নিষ্ঠুর, আমি তোমাকে ভালোবাসি না... আমার সম্পর্কে যা যা ভেবে এসেছ — সে সবই মিথ্যে। তোমাকে আমি ভালোবাসব না এ কখনই হতে পারে না।... যাক গে, অনেক হয়েছে। আমার মনে হয়, এটা আমার করা উচিত, এভাবেই শুরু করা উচিত..."

পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না কোন কথা না বলে ছেলেকে জড়িয়ে ধরল, বুকে চেপে ধরে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

"তোর কী হয়েছে, খোকা, জানি নে," অবশেষে সে বলল। "আমার সব সময় কেমন যেন মনে হয়েছে আমাদের সঙ্গ স্রেফ তোর বিরক্তি ধরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এখন সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে একটা বড়রকমের বিপদ তোর সামনে আছে, তাই তোর এত দুঃখ। অনেকদিন হল আমার মন তাই বলছিল, রোদিয়া। কথাটা বললাম বলে তুই আমাকে ক্ষমা করবি। সারাক্ষণ এই কথাই ভাবছি, ভেবে-ভেবে রাতের পর রাত আমার ঘুম হচ্ছে না। আজ রাতে তোর বোনও ঘুমের মধ্যে সমানে প্রলাপ বকছিল— বারবার তোর কথা মনে করছিল। চেষ্টা করে কিছু-কিছু শুনেছি, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি। সারাটা সকাল পায়চারি করে বেড়িয়েছি— ফাঁসীর আসামির যেমন অবস্থা হয়ে থাকে। কিছু একটা আশঙ্কা করছিলাম, ভেতরে-ভেতরে টের পাচ্ছিলাম, শেষকালে তা-ই হল! রোদিয়া, খোকা রে, কোথায় যাচ্ছিস তুই? কোথাও যাচ্ছিস নাকি?"

"যাচ্ছি।"

"যা ভেবেছিলাম তাই! কিন্তু আমিও তো তোর সঙ্গে যেতে পারি— যদি তোর দরকার হয়। আর দুনিয়া— ও তোকে ভালোবাসে, খুব ভালোবাসে। সোফিয়া সেমিওনভ্‌না— দরকার হলে সেও চলুক না কেন আমাদের সঙ্গে। জানিস, ওকে আমার নিজের মেয়ে বলে গ্রহণ করতেও এতটুকু আপত্তি নেই— বরং খুশি মনেই গ্রহণ করব। আমাদের সকলের একসঙ্গে যাবার ব্যাপারে দ্‌মিত্রি প্রকোফিচ আমাদের সাহায্য করবেন... কিন্তু... কোথায় যাচ্ছিস বল তো?"

"চললাম মামণি।"

"সে কী রে! আজই!" আর্তনাদ করে উঠল সে— যেন চিরদিনের মতো ওকে হারিয়ে ফেলেছে।

"আমার উপায় নেই। আমার আর সময় নেই— খুব দরকার আমার।..."

"আমি কি তোর সঙ্গে যেতে পারি না?"

"না। তুমি নতজানু হয়ে আমার জন্যে প্রার্থনা করবে ঈশ্বরের কাছে। তোমার প্রার্থনা হয়ত তাঁর কানে পৌঁছুবে।"

"আয়, আমি ক্রুশচিহ্ন করে আশীর্বাদ করি তোকে। এই তো, হ্যাঁ, ঠিক আছে। হা ভগবান, এ আমরা কী করছি!"

হ্যাঁ। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ খুশি হয়েছিল, খুবই খুশি হয়েছিল, বাড়িতে আর কেউ ছিল না বলে মার সঙ্গে একা থাকার সুযোগ তার হয়েছিল। এই এতগুলো বিভীষিকাময় দিনের মধ্যে এখনই কেমন যেন হঠাৎ, মুহূর্তের মধ্যে তার মন গলে গেল। মা'র পায়ের সামনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে তার পায়ে চুমু খেল, দু পা জড়িয়ে ধরে

কাঁদতে লাগল। মা কিন্তু অবাক হল না, কোন জেরা করল না এবারে। অনেকদিন হলই সে বুঝতে পারছিল ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটতে চলেছে তার ছেলের জীবনে, এখন এসে পড়েছে তার চরম সর্বনাশের সেই মুহূর্তটি।

"রোদিয়া, দুলাল আমার! তুই যে আমার প্রথম সন্তান!" ফুঁপিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে সে বলল। "তুই ছেলেবেলায় যেমন ছিলি এখনও ঠিক তেমনি আছিস। ঠিক এমনি ভাবেই এসে আমাকে জড়িয়ে ধরতিস, চুমু খেতিস। তোর বাবা বেঁচে থাকতে আমরা যখন অনটনের মধ্যে ছিলাম তখনও তুই যে আমাদের সঙ্গে ছিলি এটাই ছিল আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা। তারপর তোর বাবা গত হওয়ার পর কতবারই না আমরা ঠিক এই এখনকার মতো একে অন্যকে বুকে জড়িয়ে ধরে ওঁর সমাধির ওপর চোখের জল ফেলেছি! আর এখন এই যে আমি এতক্ষণ ধরে কান্নাকাটি করছি তার কারণ এই যে মায়ের মন বিপদের পূর্বাভাস পেয়েছে। আমি তখন, সেদিন সন্ধেবেলায়... মনে আছে তোর... আমরা যখন সবে এখানে এসেছি... তোকে প্রথম দেখেই, একমাত্র তোর চাউনি দেখেই সব টের পেয়ে গিয়েছিলাম। ধক্ করে উঠেছিল আমার বুকের ভেতরটা। আর আজ দরজা খোলার পর তোকে দেখার সঙ্গে-সঙ্গে, তোর দিকে তাকানমাত্র আমি মনে-মনে ভাবলাম সেই সর্বনাশা মুহূর্তটি বুঝি এলো। রোদিয়া, রোদিয়া, তুই তো আর এক্ষুনি যাচ্ছিস না তাই বলে।"

"না।"

"তাহলে তুই আসছিস আবার?"

"হ্যাঁ, ... আসব।"

"রোদিযা, রাগ করিস নে, তোকে এই নিযে জেরা করার স্পর্ধা আমার নেই। জানি, স্পর্ধা নেই। তবু দু এক কথায় অন্তত বল আমাকে— তুই কি অনেক দূরে কোথাও যাচ্ছিস?"

"অনেক দূরে।"

"কী আছে সেখানে? কোন চাকরি নিয়ে যাচ্ছিস,? ওখানে কী তোর ভবিষ্যৎ?"

" সে ভগবান যা করেন।... আমার জন্যে প্রার্থনা কোরো।..."

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ দরজার দিকে পা বাড়াল। কিন্তু মা ওকে সঙ্গে-সঙ্গে চেপে ধরল, হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার চোখের দিকে। আতঙ্কে বিকৃত হয়ে উঠেছে তার চোখমুখ।

"হয়েছে মামণি, আর নয়!" রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বলল। এখানে আসার চিন্তা যে তার মাথায় এসেছিল এই ভেবে তার মনে-মনে গভীর অনুশোচনা হল।

"একেবারে চলে যাচ্ছিস না তো? এখনও নয়, তাই না? কাল আসছিস তো? ঠিক আসছিস?"

"আসব, আসব। চলি।"

মা'র হাত ছাড়িয়ে শেষপর্যন্ত সে বেরিয়ে গেল।

স্নিগ্ধ, উষ্ণ সন্ধ্যা। নির্মল আকাশ। দুর্যোগ সকাল থেকেই কেটে গিয়েছিল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বাড়ির দিকে চলল। তার এখন ভারি তাড়া। তার ইচ্ছে সূর্যাস্তের আগেই সব পাট চুকিয়ে দেয়। তার আগে পর্যন্ত কারও সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে নেই। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে-উঠতে সে লক্ষ করল নাস্তাসিয়া তাকে দেখতে পেয়ে সামোভার থেকে চোখ সরিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে, লক্ষ করছে তার গতিবিধি। 'আমার ঘরে কি তাহলে কেউ আছে নাকি?' সে মনে-মনে ভাবল। পর্‌ফিরির কথা ভেবে বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল তার মন। কিন্তু নিজের ঘরের কাছে পৌঁছে দরজা ফাঁক করতে চোখে পড়ল দুনিয়াকে। ঘরে সে বসে আছে একেবারে একা, গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। দেখে মনে হয় অনেকক্ষণ হল অপেক্ষা করছে। রাস্‌কোলনিকভ্‌ চৌকাটের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওকে দেখতে পেয়ে দুনিয়া চমকে সোফা ছেড়ে উঠে সোজা হয়ে ওর সামনে দাঁড়াল। স্থির দৃষ্টিতে যেভাবে দুনিয়া ওর দিকে তাকাল তাতে ফুটে উঠেছিল বিভীষিকা আর সান্ত্বনাতীত শোকের ভাব। এই দৃষ্টি দেখেই ও বুঝে নিল যে দুনিয়ার কিছু জানতে আর বাকি নেই।

"কী, ভেতরে আসব, না চলে যাব?" সন্দিগ্ধ কণ্ঠে সে জিগগেস করল।

"আমি সারাদিন সোফিয়া সেমিওনভ্‌নার ঘরে বসেছিলাম। দুজনেই অপেক্ষা করছিলাম তোর জন্যে। আমরা ভেবেছিলাম তুই নির্ঘাত ওখানে আসবি।"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ঘরে ঢুকে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল।

"আমি একটু দুর্বল হয়ে পড়েছি রে দুনিয়া। খুব ক্লান্ত। অন্তত ঠিক এই মুহূর্তটিতে পুরোমাত্রায় আত্মসংযম বজায় রাখার ইচ্ছে আমার ছিল।"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল বোনের দিকে।

"সারারাত কোথায় ছিলি বল তো?"

"ঠিক মনে করতে পারছি না। বুঝলি, আমি একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছিলাম, বহুবার নেভার ধার দিয়ে হেঁটেছি— এটা মনে আছে। ইচ্ছে হচ্ছিল ওখানেই সব চুকিয়ে দিই, কিন্তু... আমি মনস্থির করতে পারলাম না," ফিসফিস করে কথাগুলো বলে আবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল দুনিয়ার দিকে।

"ভগবানকে ধন্যবাদ। ঠিক এই আশঙ্কাই করছিলাম আমি আর সোফিয়া সেমিওনভ্‌না। তার মানে তোর এখনও জীবনে আস্থা আছে— ঈশ্বরের কৃপা, এও ঈশ্বরের কৃপা।"

রাস্‌কোল্‌নিকভের মুখে তিক্ত হাসি ফুটে উঠল।

"আস্থা আমার ছিল না, কিন্তু এখন আমি আর মা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছি। আমার আস্থা নেই, অথচ মাকে বললাম আমার জন্যে প্রার্থনা করতে। কী করে যে এমন হয় ভগবান জানেন, দুনিয়া। আমি এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ কিছু বুঝতে পারি না।"

"তুই মার কাছে গিয়েছিলি? তুই কি নিজে ওকে বললি?" আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল সে। "তুই মন স্থির করে বলতে পারলি?"

"না, বলিনি।... কথায় বলিনি। তবে অনেক কিছু বুঝে নিয়েছে। মা শুনেছে রাতে ঘুমের ঘোরে তোর প্রলাপ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর মধ্যে অর্ধেক ওর জানা হয়ে গেছে। আমি হয়ত গিয়ে খারাপই করেছি। কী করতে যে গেলাম ছাই তাও জানি না। আমি একটা যা তা লোক রে দুনিয়া।"

"বলছ যা তা লোক, অথচ দুঃখ মাথা পেতে নেবার জন্য মনে-মনে তৈরি! তৈরি কিনা?"

"হ্যাঁ এখন আমি তৈরি। হ্যাঁ, এই লজ্জার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য আমি ডুবে মরতে গিয়েছিলাম, দুনিয়া। কিন্তু ওপর থেকে জলের দিকে তাকিয়ে আমি মনে-মনে ভাবলাম, আমি যদি এখনও নিজেকে শক্তিমান মনে করি তাহলে লজ্জার ভয়ও তো এখন আর আমার করা উচিত হবে না," তাড়াতাড়ি সে আগেভাগে বলে উঠল। "এটা কি অহঙ্কার, দুনিয়া?"

"হ্যাঁ রোদিয়া, তাই।"

রাস্‌কোল্‌নিকভের নিভন্ত চোখে আবার যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল আগুনের ফুলকি। মনে হল তার যে এখনও অহঙ্কার আছে এটা শুনতে তার ভালো লাগছিল।

"তুই আবার ভাবছিস না তো যে আমি স্রেফ জলের ভয়ে পিছিয়ে এসেছি?" দুনিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্রীভাবে হেসে সে জিগ্‌গেস করল।

"আঃ রোদিয়া, অনেক হয়েছে!" তিক্ত কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল দুনিয়া।

মিনিটদুয়েকের নীরবতা। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ চোখ নামিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। দুনিয়া টেবিলের আরেক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ব্যথাতুর দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ করছিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল রাস্‌কোল্‌নিকভ্।

"দেরি হয়ে গেছে। আর সময় নেই। আমি এখম চললাম ধরা দিতে— যদিও জানি না কেন যাচ্ছি ধরা দিতে।"

দুনিয়ার দুই গাল বেয়ে বড়-বড় ফোঁটায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

"তুই কাঁদছিস বোন? একবার তোর হাতখানা বাড়িয়ে দিতে পারিস আমার দিকে?"

" তোর কি সন্দেহ ছিল এতে?"

দুনিয়া ওকে গাঢ় আলিঙ্গন দিল।

"তুই যে এভাবে দুঃখ মাথা পেতে নিতে যাচ্ছিস তাতে কি তোর অর্ধেক অপরাধ ক্ষালন হয়ে যাচ্ছে না?" ওকে জড়িয়ে চেপে ধরে চুমু খেতে-খেতে চিৎকার করে উঠল দুনিয়া।

"অপরাধ? কিসের অপরাধ?" যেন আচমকা খোঁচা খাওয়ায় হঠাৎ ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত

হয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল। "যাকে কারও কোন দরকার নেই এমন একটা ঘৃণ্য জীবকে, একটা অনিষ্টকারী উকুনকে, এক বুড়ি সুদখোরকে খুন করেছি বলে? যে কিনা গরিব লোকদের রক্ত শুষে খেত, যাকে হত্যা করলে সাত খুন মাফ হয়ে যাবার কথা, তাকে হত্যা করা— এর নাম অপরাধ? ও নিয়ে আমি ভাবছি না এবং তার প্রায়শ্চিত্ত করার কথাও ভাবছি না। কেন তোমরা সকলে চারদিক থেকে আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বারবার বলে চলেছ: 'অপরাধ! অপরাধ! অপরাধ!' মাত্র এই এখনই আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি কতদূর অর্থহীন, হাস্যকর, আমার কাপুরুষতা, দেখতে পাচ্ছি একমাত্র তখনই যখন এই অপ্রয়োজনীয় লজ্জা মাথা পেতে গ্রহণ করব বলে মনে-মনে স্থির করেছি! আমি এটা করতে যাচ্ছি স্রেফ আমি একটা নীচ আর অপদার্থ লোক বলে, সম্ভবত নিজের লাভের জন্যও হতে পারে, যেমন... প্রস্তাব দিয়েছিল ওই... পর্ফিরি!..."

"ওরে, তুই কী বলছিস! এ তুই কী বলছিস! তুই যে রক্তপাত করেছিস!" মরিয়ার মতো আর্তনাদ করে উঠল দুনিয়া

"সে তো সকলেই করে", দুনিয়ায় কথার খেই ধরে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌। "রক্তপাত সব সময় হচ্ছে, পৃথিবীতে চিরকাল হয়ে এসেছে, জলপ্রপাতের ধারার মতো, শ্যাম্পেনের মতো বয়ে চলেছে।... এর জন্যে ক্যাপিটলে সম্মানের আসনে বসিয়ে মাথায় মুকুট পরিয়ে অভিষেক করা হয়, পরে তাদের মানবহিতৈষী আখ্যায় ভূষিত করা হয়। আহা, তুই আরেকটু ভালো করে, নিরীক্ষণ করেই দেখ না কেন। আমি নিজে মানুষের ভালো চেয়েছিলাম। শত-শত হাজার-হাজার ভালো কাজ করতামও হয়ত, একমাত্র এই একটা মূর্খামির বদলে। মূর্খামিই বা কেন বলছি, বলব স্রেফ আনাড়িপনা— যেহেতু সামগ্রিকভাবে চিন্তাটা মোটেই তেমন মূর্খামি নয়। মূর্খামি বলে মনে হচ্ছে মাত্র এই এখন— ব্যর্থতার ফলে। ... কোন জিনিস ব্যর্থ হলেই আবার মূর্খামি বলে মনে হয় কিনা! এই মূর্খামিবশতই আমি নিজের অবস্থাটাকে কেবল স্বাধীন করে তুলতে চেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম প্রথম পদক্ষেপ নিয়ে আর্থিক সঙ্গতি অর্জন করব, এরপর তুলনামূলক বিচারে যখন সমাজের অশেষ উপকার সাধন করতে পারব, তখন সব ধুয়েমুছে যাবে।... কিন্তু আমি... আমি প্রথম পদক্ষেপেই কাত হয়ে পড়লাম, সামলাতে পারলাম না ধাক্কাটা, তার কারণ আমি একটা ইতর! আসল ঘটনা হল এই! যে যাই বলুক না কেন, বিষয়টাকে আমি তোমাদের দৃষ্টিতে দেখতে যাচ্ছি না। আমি যদি সফল হতাম তাহলে সকলে আমার মাথায় মুকুট পরাত, এখন তার বদলে সটান শিকারীর পাতা ফাঁদে!"

"না না তা নয়, যা বলছিস তা ঠিক নয়, একেবারে ঠিক নয়! এ তুই কী বলছিস ভাই!"

"ও, আঙ্গিকটা ঠিক হল না— নন্দনতত্ত্বের বিচারে ঠিক জুতসই নয়, তাইত!

কিন্তু নিয়মিত অবরোধ করে বা বোমা মেরে লোকজনকে উচ্ছেদ করা কী হিসাবে বেশি সম্মানজনক এটা আমার একেবারে মাথায় ঢোকে না। নন্দনতত্ত্বের ভয় অক্ষমতার প্রথম চিহ্ন!... আজকের মতো এত স্পষ্ট করে তা আমি আর কখনও হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি, কখনও পারিনি এবং নিজের অপরাধকে এত কম করে আর কখনও বুঝতে পারিনি! এখনকার মতো এত শক্তি, এতটা দৃঢ়বিশ্বাস আগে আমার আর কখনও ছিল না!...”

বলতে-বলতে ওর পাণ্ডুর অবসন্ন মুখে রং পর্যন্ত খেলে গেল। কিন্তু শেষ উচ্ছ্বাসটুকু প্রকাশ করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে তার দৃষ্টি দুনিয়ার চোখের ওপর পড়ে গেল। সেই দৃষ্টিতে ওর জন্য দুনিয়ার এতদূর, এত গভীর বেদনার পরিচয় পেল যে সঙ্গে-সঙ্গে হুঁশ ফিরে পেয়ে সে থেমে গেল। সে উপলব্ধি করল, যাই হোক না কেন, এই দুই অভাগিনীকে সে অসুখী করেছে। হাজার হোক, সে-ই তাদের দুর্ভাগ্যের কারণ।...

“দুনিয়া, লক্ষ্মীটি! আমার যদি অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে আমাকে ক্ষমা করিস— যদিও আমি যদি অপরাধী হয়েই থাকি তাহলে আর ক্ষমা কিসের? চলি। তর্কবিতর্কের মধ্যে গিয়ে কাজ নেই! আর সময় নেই, একেবারে সময় নেই। আমার পেছন-পেছন আর আসিস নে, তোর দুটি পায় পড়ি! আমাকে একবার যেতে হবে... তুই এখন যা, এক্ষুনি যা, মা'র কাছে-কাছে থাক। তোর দুটি পায় পড়ি, লক্ষ্মীটি! এটা আমার তোর কাছে সবচেয়ে বড় অনুরোধ, শেষ অনুরোধ। সব সময় ওর কাছে-কাছে থাকবি। আমি ওকে এমন একটা উদ্বেগের মধ্যে রেখে গেলাম যা ওর সহ্যশক্তিতে কুলোবে কিনা সন্দেহ— হয় মারা যাবে নয়ত পাগল হয়ে যাবে। ওর সঙ্গে থাক। রাজুমিখিন রইল তোদের পাশে। আমি ওকে বলেছি।... আমার কথা ভেবে কাঁদিস নে। আমি একজন খুনি হলেও সারাজীবন সততা আর সাহস বজায় রাখার চেষ্টা করব। হয়ত কোন এক সময় আমার নাম শুনতে পাবি। আমি তোদের লজ্জার কারণ হব না, দেখিস। আমি এখনও প্রমাণ করতে পারি... আচ্ছা, এখন আপাতত আসি,” তাড়াতাড়ি কথা শেষ করতে চাইল সে। কিন্তু তার শেষ কথা আর প্রতিশ্রুতি উচ্চারণের সময় দুনিয়ার চোখেমুখে অদ্ভুত এক ধরনের ভাব দেখতে পেয়ে সে আবার বলল, “কী হল? অমন কাঁদছিস কেন? কাঁদিস নে, কাঁদিস নে। একেবারে তো আর ছেড়ে চলে যাচ্ছি না!... ও হ্যাঁ, দাঁড়া! ভুলেই গিয়েছিলাম!...”

টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা ধুলোমাখা মোটা বই তুলে নিল। বইটা খুলে তার দুটো পাতার মাঝখান থেকে হাতির দাঁতের ওপর জল রঙে আঁকা একটা ছোট্ট প্রতিকৃতি বের করল। বাড়িউলির সেই মেয়ের ছবি, এককালে যার সঙ্গে ওর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, যে শেষকালে জ্বরে ভুগে মারা যায়। সেই অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে, যার ইচ্ছে ছিল সন্ন্যাসিনী হওয়ার। ব্যঞ্জনাময়, রোগক্লিষ্ট ছোট্ট মুখটা মিনিটখানেক

বেশ মনোযোগ দিয়ে সে দেখল। ছবিটাতে চুমু খেয়ে দুনিয়ার হাতে তুলে দিল।

"এই যে, *এই নিয়ে* ওর সঙ্গেও আমার অনেক কথা হয়েছে," অন্যমনস্কভাবে সে বলল। " যে সমস্ত জিনিস পরে অমন বীভৎসভাবে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল তার অনেক কিছু আমি বিশ্বাস করে একান্তে ওকে জানাই। ভাবিস নে," দুনিয়ার দিকে ফিরে সে বলল, "তোরই মতন ওরও সায় ছিল না। আমি খুশি যে ও বেঁচে নেই। সবচেয়ে বড় কথা, আসল কথা এই যে সব কিছু এখন চলবে নতুন ধারায়, ভেঙে দু-টুকরো হয়ে যাবে", আবার সেই বিষণ্ণ চিন্তা ফিরে আসতে হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল, "ভেঙে যাবে, সব ভেঙে যাবে। কিন্তু এর জন্য কি আমি প্রস্তুত? আমি নিজে কি এটা চাই? সকলে বলছে তো আমার অগ্নিপরীক্ষা? এটা নাকি আমার খুবই দরকার। কিন্তু কেন? কেন এইসব অর্থহীন পরীক্ষা? কিসের দরকার? বিশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর আমি যখন যন্ত্রণায় পিষ্ট হয়ে একটা জড়বুদ্ধিতে পরিণত হব, জরাগ্রস্ত ও অক্ষম হয়ে পড়ব তখন কি বিষয়টা এই এখন যেভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি, তার চেয়েও ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা আমার হবে? তখন আমার বাঁচার সার্থকতাই বা কী থাকছে? কেনই বা ওভাবে জীবনধারণ করতে আমি এখন রাজি হচ্ছি? ওঃ আজ ভোরবেলায় যখন নেভানদীর ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম তখনই জানতাম যে আমি একটা হতভাগা!"

দুজনেই অবশেষে বেরিয়ে পড়ল। দুনিয়ার পক্ষে কঠিন, কিন্তু সে ভাইকে ভালোবাসত! সে এগিয়ে গেল, কিন্তু পঞ্চাশ পা মতো দূরে সরে যাবার পর পেছন ফিরে আরও একবার তাকাল ভাইয়ের দিকে। ওকে তখনও দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু মোড় পর্যন্ত চলে যাবার পর রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ও ফিরে তাকাল। ওদের দুজনের চোখে চোখ মিলল এই শেষবারের মতো। কিন্তু দুনিয়া তার দিকে তাকাচ্ছে লক্ষ করে সে অসহিষ্ণু হয়ে, এমনকি বিরক্তির সঙ্গে হাত নাড়িয়ে তাকে ইশারায় চলে যেতে বলল, নিজে চটপট মোড় ঘুরে আড়ালে চলে গেল।

'আমি নিষ্ঠুর, এটা আমি দেখতে পাচ্ছি,' যেভাবে বিরক্তির সঙ্গে হাত নেড়ে দুনিয়াকে সে ইশারা করেছিল, মিনিটখানেক বাদে তার জন্য লজ্জা পেয়ে মনে-মনে সে বলল। 'কিন্তু ওরা আমাকে এত ভালোবাসে কেন? আমি তো সেই ভালোবাসার যোগ্য নই! ওঃ, আমি যদি একা মানুষ হতাম, আমাকে ভালোবাসার যদি কেউ না থাকত এবং আমিও কাউকে ভালো না বাসতাম! তাহলে *এসব কিছুই ঘটত না!* আচ্ছা, জানতে ইচ্ছে হয়, লোকের সামনে আমি ভক্তি গদগদ চিত্তে নাকিকান্না করে বেড়াব, কথায়-কথায় নিজেকে ডাকাত বলে পরিচয় দেব, আগামী পনেরো-কুড়ি বছরে আমার মন কি এতটা মেনে নিতে পারবে? হ্যাঁ তাই, ঠিক তাই! এই জন্যেই তো আমাকে এখন সাইবেরিয়াতে নির্বাসনে পাঠান হচ্ছে, ওরা তো এটাই চায়।... এই যে লোকগুলো রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওদের প্রত্যেকে তো এক-একটা বদমাশ, স্বভাবে দুর্বৃত্ত— আরও খারাপ— ইডিয়ট। অথচ আমাকে নির্বাসনদণ্ড থেকে রেহাই দেবার

চেষ্টা কেউ করে দেখুক না কেন, ওরা সবাই ন্যায়নীতির প্রশ্ন তুলে ক্রোধে, ঘৃণায় ফেটে পড়বে। আমি ওদের দেখতে পারি না, দু চক্ষে দেখতে পারি না!'

গভীর চিন্তা পেয়ে বসল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে। কোন্‌ প্রক্রিয়ার বলে এমন ঘটতে পারে যে শেষ পর্যন্ত কোন যুক্তি ছাড়াই, একমাত্র বিশ্বাসবশত এদের সামনে তাকে নতি স্বীকার করতে হচ্ছে? কিন্তু কেনই বা নয়? এমনই তো হওয়া উচিত। বিশ বছর ধরে অবিরাম নিপীড়নের চূড়ান্ত ফল কি আর ফলবে না? ক্রমাগত জল ঢালতে-ঢালতে পাথরও ক্ষয়ে যায়। তাহলে কেন? এর পরও বাঁচা কেন? কেন সে এখন ওখানে চলেছে যখন তার নিজেরও জানা আছে যে সব কিছু ঘটবে বইয়ে যেমন লেখা আছে ঠিক সেইভাবে— এর অন্যথা হবার নয়!

গতকাল সন্ধ্যা থেকে শুরু করে এই নিয়ে হয়ত একশবার সে নিজেকে এই প্রশ্ন করল। যা হোক, তবু সে পথ চলতে লাগল।

আট

সোনিয়ার কাছে যখন সে এলো ততক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। সারাটা দিন ভীষণ উৎকণ্ঠা নিয়ে সোনিয়া তার জন্য অপেক্ষা করে ছিল। সে আর দুনিয়া একসঙ্গে অপেক্ষা করছিল। সোনিয়া যে 'একথা' জানে গতকাল স্‌ভিদ্রিগাইলভের মুখে সে তা শুনেছিল। সেই কথা মনে করে সে সকালেই সোনিয়ার কাছে এসেছিল। দুই নারীর কথাবার্তা আর চোখের জল এবং তাদের দুজনের মধ্যে কতটা মনের মিল হয়েছিল— এসবের বিশদ বিবরণের মধ্যে আমরা যাচ্ছি না। এই সাক্ষাতের ফলে দুনিয়া অন্তত একটা সান্ত্বনা পেয়েছিল: তার ভাইকে একা থাকতে হচ্ছে না। সোনিয়াই প্রথম মানুষ যার কাছে এসে স্বীকারোক্তি করেছিল রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌। তার মধ্যে সে খুঁজেছিল একজন মানুষকে, যার সঙ্গ তার দরকার ছিল। ভাগ্য তাকে যেখানেই ঠেলে পাঠিয়ে দিক না কেন সোনিয়া অনুসরণ করবে ওকে। দুনিয়া এ নিয়ে সোনিয়াকে কোন প্রশ্নও করেনি, কিন্তু সে জানত যে তাই হবে। সোনিয়ার দিকে যে-দৃষ্টিতে সে তাকিয়েছিল তাতে অনেকটা যেন বিস্ময়মিশ্রিত ভক্তির ভাবই ফুটে উঠেছিল। তার প্রতি ভক্তির এই উচ্ছ্বাস প্রথম-প্রথম তাকে বিব্রত করে তোলে। সোনিয়া আরেকটু হলেই কেঁদে ফেলেছিল। নিজের সম্পর্কে তার ধারণা একেবারে বিপরীত। এমনকি তার মনে হচ্ছিল দুনিয়ার চোখে-চোখে তাকানোর যোগ্যতাও তার নেই। রাস্‌কোল্‌নিকভের ঘরে প্রথম যখন তাদের দেখা হয়ে গিয়েছিল সেই সময় দুনিয়া নিচু হয়ে তাকে অভিবাদন জানিয়ে যে/মনোযোগ ও শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় দিয়েছিল তখন থেকে তার সেই অপূর্ব রূপ সোনিয়ার জীবনে এক অধরা, পরমাশ্চর্য স্বপ্নমূর্তির মতো চিরতরে মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে যায়।

দুনিয়া অপেক্ষা করে-করে আর ধৈর্য ধারণা করতে পারল না। শেষকালে ঠিক

করল বরং ভাইয়ের ফ্ল্যাটে গিয়ে সেখানেই তার জন্য অপেক্ষা করবে। ওর মনে হয়েছিল ওখানে সে প্রথমে যাবেই। দুনিয়া চলে যাবার পর একা পড়ে গিয়ে সোনিয়া সঙ্গে-সঙ্গে এই ভেবে নিদারুণ আতঙ্কে ভীষণ কষ্ট পেতে লাগল যে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ হয়ত সত্যি-সত্যি আত্মহত্যা করে বসবে। দুনিয়াও সেই আশঙ্কাই করছিল। কিন্তু ওরা যখন দুজনে ছিল তখন সারাদিন ধরে পাল্লা দিয়ে, নানারকম যুক্তি দিয়ে একে অন্যকে এই বলে আশ্বাস দিয়ে এসেছে যে এটা হতে পারে না। যতক্ষণ ওরা একসঙ্গে ছিল ততক্ষণ মন অনেকটা শান্ত ছিল। এখন দুজনে আলাদা হয়ে যাওয়ামাত্র ওদের কেউই এ ছাড়া আর কোন কথা ভাবতে পারছিল না। সোনিয়ার মনে পড়ে যাচ্ছিল গতকাল স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ তাকে বলেছিল যে রাস্‌কোল্‌নিকভের সামনে খোলা আছে দুটি পথ— সাইবেরিয়া অথবা... তাছাড়া রাস্‌কোল্‌নিকভের অহঙ্কার, উদ্ধতস্বভাব, আত্মমর্যাদা বোধ ও অবিশ্বাস... তার অজানা ছিল না। 'একমাত্র ভীরুতা আর মৃত্যুভয় ওকে বাঁচতে প্রবৃত্ত করবে— এও কি সম্ভব?' হতাশ হয়ে শেষকালে সে ভাবল। সূর্য ততক্ষণে অস্ত গেছে। সোনিয়া ম্লান মুখে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু এই জানলাটা দিয়ে একমাত্র যা চোখে পড়ে তা হল পাশের বাড়ির রং-না-করা নিরেট প্রাচীর। অবশেষে সোনিয়া যখন দুঃখী মানুষটির মৃত্যু সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে গেছে ঠিক সেই সময় সে ঘরে ঢুকল।

সোনিয়ার বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা উল্লাসধ্বনি। কিন্তু ভালো করে তার মুখ নিরীক্ষণ করার পর হঠাৎ সে ফেকাসে হয়ে গেল।

"এই তো!" মৃদু হেসে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ বলল। "আমি তোমার ক্রস নিতে এসেছি, সোনিয়া। তুমি নিজেই তো আমাকে ক্রসের রাস্তায় পাঠিয়েছিলে। এখন কাজের বেলায় ভয়ে পিছিয়ে গেলে নাকি?"

সোনিয়া অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। রাস্‌কোল্‌নিকভের এই সুরটি তার কাছে অদ্ভুত শোনাল। একটা ঠাণ্ডা স্রোত খেলে গেল তার সর্বাঙ্গে। কিন্তু মিনিটখানেকের মধ্যে তার বুঝতে বাকি রইল না যে এই কথা, এই সুর— তার সবটাই বানানো। এমনকি ওর সঙ্গে রাস্‌কোলনিকভ্‌ যে কথা বলছিল তাও যেন চোখ ফিরিয়ে। মনে হচ্ছিল সরাসরি ওর মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না, দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছিল।

"বুঝলে সোনিয়া, আমি ভেবেচিন্তে দেখলাম যে এটাই সম্ভবত ভালো হবে। এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার আছে... তা সে অনেক দীর্ঘ কাহিনী, বলার কোন দরকারও দেখি না অবশ্য। জান, আমার রাগ ধরে যায় কিসে? আমার দুঃখ হয় এই ভেবে যে যত সব মূর্খ, জানোয়ারের মুখ তখন চারদিক থেকে আমাকে ঘিরে ধরবে, ড্যাবড্যাব করে সোজা আমার দিকে তাকাবে, এমন সব বোকা-বোকা প্রশ্ন করতে থাকবে যার উত্তরও আমাকে দিতে হবে, ওরা আমাকে আঙুল দিয়ে দেখাবে... ছি! জানো, আমি কিন্তু পর্‌ফিরির কাছে যাচ্ছি না— ও লোকটা আমাকে তিতিবিরক্ত করে ছেড়েছে।

আমি বরং যাব আমার পরিচিত সেই বারুদের কাছে, ওকে অবাক করে দেব। একটা বেশ নূতনত্ব হবে! তবে আরও নিস্পৃহ হওয়া দরকার। আজকাল আমি বড় বেশি খিটখিটে হয়ে পড়ছি। বিশ্বাস করতে পার, এই কিছুক্ষণ আগে আমার বোন শেষবারের মতো আমাকে দেখার জন্যে পিছু ফিরে তাকালে স্রেফ এই কারণে আমি প্রায় ঘুষি পাকিয়ে তাকে শাসিয়েছিলাম! কী যাচ্ছেতাই এই অবস্থা বল দেখি! ছিঃ, আমি কোথায় চলে গেছি। কী হল, কোথায় তোমার ক্রস?"

সে যেন নিজে আর নিজের মধ্যে ছিল না। এমনকি এক জায়গায় একমুহূর্তও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না, একটা কোন বিষয়ে মনোযোগ স্থির রাখতে পারছিল না। তার চিন্তা-ভাবনা একটার ওপর দিয়ে আরেকটা লাফিয়ে-লাফিয়ে চলছিল। আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছিল সে। হাত অল্প-অল্প কাঁপছিল।

সোনিয়া কোন কথা না বলে টানা দেরাজ থেকে দুটো ক্রস বের করল— একটা সাইপ্রেস কাঠের, আরেকটা তামার। নিজে কপালে বুকে কাঁধে আঙুল ঠেকিয়ে ক্রুশচিহ্ন আঁকল, তারপর রাসকোল্‌নিকভের মঙ্গলকামনায় ওর ওপরও ক্রুশচিহ্ন এঁকে সাইপ্রেস কাঠের ক্রসটা ওর গলায় ঝুলিয়ে দিল।

"ক্রসের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছি— এ হল তারই প্রতীক। হে- হে! এ পর্যন্ত আমি যা যন্ত্রণা ভোগ করেছি তাও কি তাহলে কম হল! সাইপ্রেস কাঠের এটা হল সাধারণ মানুষের জন্য, তামার ক্রসটা— লিজাভেতার— এটা তুমি নিচ্ছ। দেখি, দেখি! এটাই না ওর গলার ছিল... ওই মুহূর্তে? আমি জানি এরকম দুটো ছিল— একটা রুপোর ক্রস, আরেকটা ছোট্ট আইকন। আমি তখন ওই বুড়ির বুকের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। আহা, ওই দুটো যদি এখন থাকত তাহলে সত্যি ওগুলো পরলেই আমার এখন ঠিক মানাত।... যাক গে, যত বাজে বকছি। কাজের কথা ভুলে যাব শেষকালে। কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ছি!... শোন সোনিয়া, আমার আসার আসল উদ্দেশ্য হল তোমাকে জানান, যাতে তুমি জান...আর কী বলব?... আমার আসার এটাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য।.... হুম্, আমি অবশ্য ভেবেছিলাম এর চেয়েও বেশি কথায় বলব!... তুমি নিজেই তো চেয়েছিলে যে আমি যাই— তা এই তো, এখন জেলে বসে থাকব, তোমার ইচ্ছে পূরণ হবে। বাঃ, কাঁদছ কেন তুমি? তুমিও কাঁদছ? থাম, অনেক হয়েছে! ওঃ কী কঠিন অবস্থা!"

ওর মনের মধ্যে কিন্তু জেগে উঠেছিল একটা অনুভূতি। সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে ব্যথায় মুচড়ে উঠল ওর বুকের ভেতরটা। 'ওর কী? ওর আবার কী?' সে মনে-মনে ভাবল। 'আমি ওর কে?' আমার মা আর বোনের মতো এও এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কেন আমাকে নিয়ে? এমন কাঁদছে কেন? ভবিষ্যতে আমায় সেবাশুশ্রূষা করবে নাকি?'

"ক্রুশ প্রণাম কর, অন্তত একবার প্রার্থনা কর," সোনিয়া অনুনয় করল ভীরু কণ্ঠে। তার গলা কাঁপছিল।

"সে তুমি যতবার বল করব! শুদ্ধ মনে করব সোনিয়া, শুদ্ধ মনেই করব।..."
ওর অবশ্য ইচ্ছে হচ্ছিল অন্য কিছু বলার।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ কয়েকবার কপালে বুকে আর কাঁধে আঙুল ঠেকিয়ে ক্রুশচিহ্ন এঁকে প্রণাম করল। সোনিয়া তার শালটা তুলে নিয়ে মাথায় জড়াল। উলের সবুজ শাল— সম্ভবত সেই শালটা... তাদের পারিবারিক... যার কথা মার্মেলাদভ্ তখন শুঁড়িখানায় রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে বলেছিল। মুহূর্তের জন্য রাস্‌কোল্‌নিকভের তা মনে হয়েছিল। কিন্তু ওকে জিগ্‌গেস করল না। সত্যি-সত্যি, সে এখন নিজেও অনুভব করতে লাগল, সে ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে, তার উদ্বেগ কেমন যেন বেয়াড়া ধরনের হয়ে উঠেছে। সে ভয় পেয়ে গেল। হঠাৎ তার খেয়াল হল যে সোনিয়া তার সঙ্গে যেতে চায়।

"কী হল? তুমি কোথায় চললে? যেও না, যেও না! আমি একাই যাব," ভীতকণ্ঠে আর্তনাদ করতে-করতে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। "কিসের এত লোক-লশ্‌কর?" বেরিয়ে যেতে-যেতে সে বিড়বিড় করে বলল।

সোনিয়া দাঁড়িয়ে রইল ঘরের মাঝখানে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ওর কাছ থেকে বিদায় পর্যন্ত নিল না। ততক্ষণে ওর কথা সে ভুলেও গেছে। তার মনের মধ্যে টগবগ করে ফুটতে লাগল বিদ্রোহের জন্য ব্যাকুল সন্দেহের জ্বালা।

'কিন্তু এ কি ঠিক, ঠিক হচ্ছে কি এসব করা?' সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে আবার সে মনে-মনে ভাবল। 'এখনও কি থামা যায় না? সব সংশোধন করা যায় না?... না গেলে হয় না?'

কিন্তু তা সত্ত্বেও সে চলল। হঠাৎ সে চূড়ান্তভাবে উপলব্ধি করল যে নিজেকে প্রশ্ন করার কোন মানে হয় না। রাস্তায় বের হওয়ার পর তার মনে হল সোনিয়ার কাছ থেকে সে বিদায় নিয়ে আসেনি। সোনিয়া তার সবুজ শালখানা মাথায় দিয়ে ঘরের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে রইল, ওর ক্রুদ্ধ চিৎকারে এতটুকু নড়াচড়ার সাহস তার হল না— এ কথা মনে হতে সে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। ঠিক সেই মুহূর্তে তার মনে স্পষ্ট উদয় হল আরেকটি চিন্তা—চিন্তাটা তাকে চূড়ান্ত আঘাত হানবে বলেই যেন এতক্ষণ প্রতীক্ষা করে ছিল।

'তাহলে কেন? কী উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এখন ওর কাছে এসেছিলাম? আমি ওকে বললাম— একটা কাজে। কী সেই কাজ? আদৌ কোন কাজ ছিল না। *চলে যাচ্ছি*— শুধু একথা জানাতে? যাচ্ছি তো কী হয়েছে? এটা কি কোন কাজের কথা হল! তাহলে কি আমি ওকে ভালোবাসি? না তো। না? এই তো এখনই কুকুরের মতো দূর-ছেই করে খেদিয়ে দিলাম ওকে। তাহলে কি আসলে ক্রসটার দরকার পড়ে গিয়েছিল আমার? ইস্ কত নিচে নেমে গেছি আমি! না— আমার দরকার ছিল ওর চোখের জল, দরকার ছিল ও কী রকম ভয় পেয়ে যায় তা দেখা, কেমন করে বেদনায় ওর

বুক ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে চেয়ে-চেয়ে দেখা! দরকার ছিল কোন একটা কিছু, যে কোন একটা কিছু আঁকড়ে ধরে কালবিলম্ব করা, চোখ মেলে একজন মানুষকে দেখা! আমার মতো একটা কাঙাল, একটা পথের ভিখিরি, অতি নগণ্য, ইতর লোকের কী বলে স্পর্ধা হল নিজের ওপর এত ভরসা করার, নিজেকে নিয়ে এত স্বপ্ন দেখার!'

খালপাড়ের রাস্তা ধরে সে হাঁটতে লাগল। আর বেশি দূর নেই। কিন্তু ব্রিজ পর্যন্ত পৌঁছানোর পর পায়ের গতি কমিয়ে দিয়ে হঠাৎই পাশে ঘুরে গিয়ে ব্রিজের ওপর উঠে সেন্নায়া স্কোয়ারের পথ ধরল।

ডাইনে-বাঁয়ে সে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করতে লাগল, বেশ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে খুবই কষ্ট করে দেখার চেষ্টা করল প্রতিটি বস্তু। কিন্তু কোন কিছুর ওপরই মনোযোগ স্থির রাখতে পারছিল না। ...সব পিছলে-পিছলে চলে যাচ্ছে। 'এই তো এক সপ্তাহ বা এক মাসের মধ্যে কয়েদিদের এই গাড়িতে চাপিয়ে এই ব্রিজের ওপর দিয়ে আমাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া হবে... তখন এই খালটাকে কী দৃষ্টিতে দেখব আমি? এটাকে তাহলে মনে করে রাখা দরকার!' বিদ্যুৎচমকের মতো চিন্তাটা এসে গেল তার মাথায়। 'এই যে এই সাইনবোর্ডটা— তখন আমি এই অক্ষরগুলোই বা পড়ব কী করে? এই যে এখানে লেখা রয়েছে 'কাম্পানি'— মনে রাখতে হবে এই 'কা'— ক-য় আ-কারে 'কা', তারপর একমাস পরে দেখতে হয়. এই 'কা' ...তখন দেখতে কেমন লাগবে? তখন আমার কী উপলব্ধি হবে, কী আমি ভাবব?... হা ভগবান! এসব... আমার এই এখনকার এত সব ঝামেলা, দুশ্চিন্তা — না জানি কতই তুচ্ছ! অবশ্য এটা ঠিক যে এ সমস্তই কৌতূহল না জাগিয়ে পারে না ... এক ধরনের কৌতূহল নিশ্চয়ই জাগায়।... হা- হা- হা! ভাবার আর বিষয় পাওয়া গেল না! আমি একটা বাচ্চা ছেলের মতো হয়ে যাচ্ছি। নিজের ঢাক নিজেই পেটাচ্ছি— তাও আবার নিজের সামনে। নিজেই নিজেকে লজ্জায় ফেলে দিচ্ছি দেখছি! বাঃ লোকে কী রকম ঠেলাঠেলি করছে দেখ! এই যে এই মোটা লোকটা... সম্ভবত জার্মান হবে... আমাকে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল। লোকটা কি জানে কাকে ধাক্কা দিল? একটা চাষী বৌ তার বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। জানতে ইচ্ছে করে ও কি আমাকে নিজের চেয়ে বেশি সুখী বলে মনে করে? তামাশার খাতিরে কিছু দিতে পারলে মন্দ হত না। এই যে পকেটে দেখি একটা পাঁচ কোপেক রয়ে গেছে! কোত্থেকে এলো? এই যে মা,...নাও!"

"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাবা! " ভিখিরির করুণকণ্ঠ কানে এলো।

রাস্কোলনিকভ্ সেন্নায়া স্কোয়ারে ঢুকল। লোকজনের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করতে তার খারাপ লাগছিল, খুবই খারাপ লাগছিল। অথচ যেখানে লোকজনের বেশি ভিড় ঠিক সেখানেই সে যাচ্ছিল। একা থাকার জন্য দুনিয়ার কীই বা না দিতে সে রাজি! অথচ সে নিজেও উপলব্ধি করতে পারছিল যে একা সে এক মুহূর্তও থাকতে পারবে না। ভিড়ের মধ্যে যা-তা কাণ্ড করছিল এক মাতাল। লোকটা বারবার নাচার চেষ্টা

করছে। যতবার চেষ্টা করছে ততবারই তাল সামলাতে না পেরে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে। ওর চারধারে ভিড় জমে গেছে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল। মিনিটকয়েক তাকিয়ে দেখল লোকটাকে, তারপর হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেলল। মিনিটখানেকের মধ্যে লোকটার কথা যেন বেমালুম ভুলে গেল— তার দিকে তাকিয়ে রইল অথচ তাকে সে আর তখন দেখতে পাচ্ছিল না। অবশেষে সেখান থেকে সরে গেল। কিন্তু তখনও মনে করতে পারল না কোথায় সে আছে। স্কোয়ারের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছানোর পর আচমকা একটা নাড়া খেল সে— সঙ্গে-সঙ্গে আগাগোড়া তাকে, তার শরীর ও মনকে ছেয়ে ফেলল একটা আকস্মিক উপলব্ধি।

তখনই তার মনে পড়ে গেল সোনিয়ার কথাগুলো: 'যাও, রাস্তার মোড়ে গিয়ে লোকজনের সামনে মাথা নুইয়ে দাঁড়াও, মাটিকে চুমু খাও, কেননা তার কাছে তুমি পাপ করেছ, বিশ্বসুদ্ধ সকলকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বল: আমি খুনি!' এ কথা মনে হতে সে শিউরে উঠল। এতক্ষণ, বিশেষত গত কয়েক ঘণ্টা ধরে একটা নিষ্ফল ব্যাকুলতা ও উদ্বেগ তাকে এতদূর পিষে ফেলছিল যে এই নতুন, অখণ্ড ও পরিপূর্ণ উপলব্ধির সম্ভাবনাকে সে সঙ্গে-সঙ্গে লুফে নিল। উপলব্ধিটা তার কাছে এলো হঠাৎ একটা চমকের মতো, তার মনের মধ্যে একটিমাত্র স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দিয়ে হঠাৎই আগুনের মতো তাকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গে গলে গেল তার মন, চোখ দিয়ে দরদর ধারে ঝরে পড়ল অশ্রুধারা, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।...

স্কোয়ারের মাঝখানে সে নতজানু হয়ে আভূমি মাথা নত করল, সেই নোংরা মাটিতেই সে চুমু খেল— তাতে পরম সুখ আর আনন্দ উপভোগ করল। উঠে দাঁড়িয়ে আরও একবার মাথা নোয়াল।

"ইস, কেমন বুঁদ হয়ে আছে দেখছ!" ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক ছোকরা মন্তব্য করল।

চারদিক থেকে হাসির রোল উঠল।

"আসলে ও জেরুসালেমে তীর্থ করতে যাচ্ছে ভাই, যাবার আগে ছেলেমেয়ে আর আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে, দুনিয়ার সবাইকে মাথা নুইয়ে নমস্কার করছে, মহানগর রাজধানী সেন্টপিটার্সবুর্গ আর তার মাটিকে চুমু খাচ্ছে," কোন এক মাতাল গোছের লোক যোগ করল।

"ছোকরার বয়স এখনও কম!" তৃতীয়জন বলে উঠল।

"ভালো ঘরের কেউ হবে!" একজনের গুরুগম্ভীর মন্তব্য।

"আজকাল কে ভালো ঘরের কে না তা আর বোঝার উপায় আছে ভায়া!"

লোকজনের এই সব কথাবার্তা আর মন্তব্যের ফলে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ সংযত হয়ে গেল। তাই 'আমি খুন করেছি' কথাটা তার জিভের ডগায় আসা সত্ত্বেও মুখ দিয়ে

আর বের হল না। তবে এইসব চিৎকার-চেঁচামেচি সে শান্তভাবে গ্রহণ করল। উঠে এদিক-ওদিক না তাকিয়ে সোজা গলি ধরে সে পুলিস স্টেশনের দিকে চলল। পথে যেতে-যেতে একটা দৃশ্য নিমেষের জন্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তবে তাতে সে অবাক হল না— আগে থাকতেই তার মন বলছিল যে এমন ঘটবে, ঘটতে বাধ্য। স্কোয়ারে দ্বিতীয়বার যখন সে আভূমি নত হয়ে সকলকে প্রণাম জানাচ্ছিল সেই সময় বাঁ দিকে পাশ ফিরে তাকাতে পঞ্চাশ পা মতন দূরে সে সোনিয়াকে দেখতে পায়। রাস্‌কোল্‌নিকভের নজর এড়ানোর জন্য স্কোয়ারের ওপরের দোকানের একটা চালাঘরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ছিল। দেখা যাচ্ছে তার এই শোকযাত্রার পথে সোনিয়া সর্বক্ষণ সঙ্গে-সঙ্গে ছিল! রাস্‌কোল্‌নিকভ্ সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করল, বুঝতে পারল যে সোনিয়া এখন থেকে তার চিরজীবনের সঙ্গিনী, ভাগ্য রাস্‌কোলনিকভ্‌কে যেখানেই পাঠাক না কেন— দরকার হলে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে হলেও সোনিয়া তাকে অনুসরণ করবে। তার বুকের ভেতরে তোলপাড় করে উঠল।... কিন্তু এই তো সে পৌঁছে গেছে সেই নিয়তিনির্ধারিত জায়গাটাতে।...

বেশ খোসমেজাজে সে প্রাঙ্গণে ঢুকল। তিন তলায় উঠতে হবে। 'উঠতে যতটা সময় লাগবে সেই সময়টা অন্তত এখনও হাতে আছে,' সে ভাবল। মোটের ওপর তার মনে হচ্ছিল সেই অমোঘ মুহূর্তটি এখনও দূরে আছে, আরও অনেকটা সময় বাকি আছে, এখনও অনেক বিষয় নতুন করে ভেবেচিন্তে দেখার অবকাশ আছে।

সেই পাকানো সিঁড়ি, সিঁড়ির সর্বত্র সেই আবর্জনা, ডিমের খোলা আর আনাজের খোসায় ছড়াছড়ি। সিঁড়ির আশেপাশের ফ্ল্যাটের দরজাগুলো যথারীতি হাঁ করে খোলা, সেইসব হেঁসেলগুলো থেকে যথারীতি ভেসে আসছে ধোঁয়া আর দুর্গন্ধ। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ সেই যে একবার এখানে এসেছিল তারপর আর এ পথে পা মাড়ায়নি। তার পা অবশ হয়ে আসছিল, ভেঙে পড়ছিল। তবু সে চলতে লাগল। মুহূর্তের জন্য একবার অবশ্য থামল— 'দম নিয়ে নিজেকে গোছগাছ করে নিতে হবে যাতে অফিসে ঢোকার সময় তাকে *মানুষের মতো* দেখায়। কিন্তু কী জন্য? কেন?' কী করতে যাচ্ছে তা উপলব্ধি করার সঙ্গে-সঙ্গে সে মনে-মনে ভাবল। 'এই বিষপাত্র যদি পান করতেই হয় তাহলে আর কিসে কী এসে যায়? যত কদর্য দেখায় ততই ভালো।' কল্পনায় সেই মুহূর্তে 'বারুদ' নামে পরিচিত ইলিয়া পেত্রোভিচের মূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠতে তার মনে হল, 'তাহলে কি সত্যি-সত্যি ওঁর কাছে যাব? অন্য কারও কাছে গেলে হয় না? আচ্ছা নিকোদিম ফোমিচের কাছে গেলে কেমন হয়? তবে কি এখনই ফিরে যাব? সোজা সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে তাঁর বাড়ি চলে যাব? তাতে অন্তত ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে কাজটা হতে পারে।... না, না। বারুদের কাছেই যাই, ওঁর কাছেই যাই! বিষপাত্র যদি পান করতেই হয় তাহলে এক চুমুকে পান করাই ভালো।...'

রাস্‌কোল্‌নিকভের হাত-পা-ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল, সংজ্ঞা প্রায় লোপ পেয়ে যাচ্ছিল — এই অবস্থায় অফিসের ভেজান দরজা খুলে সে ভেতরে ঢুকল। এবারে দেখা যাচ্ছে ভেতরে লোকজন খুবই কম। দারোয়ানগোছের কে একজন এবং মামুলি চেহারার একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। দরজার পাশের পাহারাদারটি কাঠের পার্টিশানের ওপাশ থেকে উঁকি মেরে দেখার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করল না। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ পরের ঘরটাতে গেল। 'এখনও হয়ত না বললেও হয়,' আবার এক ঝলক তার মনের মধ্যে চিন্তাটা উঁকি মারল। এই ঘরটায় পুলিসের উর্দি ছাড়া সাধারণ ফ্রককোট গায়ে কে একজন ডেস্কের সামনে বসে মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা লিখছে— সাধারণ কোন কেরানি হবে। কোনায় ওইরকম আরও একজন কেরানি তার নির্দিষ্ট জায়গায় বসার উদ্যোগ করছিল। জামিওতভ্ ওখানে নেই। বলাই বাহুল্য, নিকোদিম ফোমিচও নেই।

"কেউ নেই এখানে?" ডেস্কের ধারের লোকটিকে লক্ষ করে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ জিগ্‌গেস করল।

"কাকে চাই আপনার?"

"হুঁ হুঁ! দেখা নেই, শোনা নেই... কিন্তু রুগী মানুষের গন্ধ পাই... ওই যে রূপকথায় আছে না... কী যেন?... ভুলে গেছি! প্-পে-ন্- নাম হই!" পরিচিত কণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল হঠাৎ।

রাস্‌কোল্‌নিকভ চমকে উঠল। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং বারুদ। হঠাৎ তৃতীয় ঘরটা থেকে বেরিয়ে এসেছে। 'একেই বলে অদৃষ্ট।' রাস্‌কোল্‌নিকভ্ মনে-মনে ভাবল। 'তা নইলে ও এখানে কেন?

"আমাদের কাছে এসেছেন? কারণ?" তাকে দেখে মনে হচ্ছিল বেশ খোস-মেজাজে আছেন— এমনকি যেন একটু বেশি মাত্রায়ই। উল্লসিত হয়ে বলল, "যদি কাজের জন্যে এসে থাকেন তাহলে বলব বড় আগে এসে গেছেন। আমি নিজে এখানে এসে পড়েছি দৈবাৎ।... যা হোক, বলুন কী ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি? আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে... মিস্টার... মিস্টার...মাফ করবেন।... কী যেন?..."

"রাস্‌কোল্‌নিকভ্।"

"হ্যাঁ তাই তো, রাস্‌কোল্‌নিকভ্! আপনি কী বলে ভাবতে পারলেন যে আমি ভুলে বসে আছি? দোহাই আপনার, আমাকে অমন ভাববেন না... রোদিওন... রো... রো... রোদিওনোভিচ... ঠিক বলেছি কিনা?"

"রোদিওন রমানোভিচ।"

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ। রোদিওন রমানোভিচ, রোদিওন রমানোভিচ! ওটাই তো মনে-মনে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম, বেশ কয়েকবার মনে-মনে আউড়েছিলামও। আমাকে স্বীকার

করতে হচ্ছে যে তখন আপনার সঙ্গে সেই যে আমার দেখা হয়েছিল, তারপর থেকে আমার মনে-মনে ভারি আফসোস... আমাকে ওরা পরে বলল, আমি জানতে পারলাম যে আপনি একজন উদীয়মান সাহিত্যিক, এমনকি পণ্ডিত ব্যক্তি... এবং যাকে বলে প্রথম পদক্ষেপ... হা ভগবান! এমন কোন্ লেখক বা পণ্ডিত আছেন যিনি প্রথম পদক্ষেপে মৌলিকতার পরিচয় দেননি? আমি আর আমার স্ত্রীও— আমরা দুজনেই সাহিত্যের ভারি ভক্ত। আমার স্ত্রী তো সাহিত্য বলতে অজ্ঞান!... সাহিত্য আর শিল্প আপনি যদি মহৎ লোক হন তাহলে বাকি সব কিছুই অর্জন করতে পারেন আপনার মেধা, জ্ঞান, বিচারশক্তি আর প্রতিভা দিয়ে! এই ধরুন না কেন টুপি— টুপি বস্তুটা কী? টুপি হল মাথার একটা ঢাকনা। জিমারম্যানের দোকানে কিনতে পাব। কিন্তু টুপির তলায় যা আছে. যা সযত্নে রাখা আছে, তা কখনও কেনা সম্ভব নয়!... স্বীকার করতে বাধা নেই যে সব কিছু খোলসা করার জন্য আপনার কাছে একবার যাব ভাবছিলাম, কিন্তু আবার ভাবলাম আপনি হয়ত... হ্যাঁ, ভালো কথা, আপনাকে তো জিগ্গেসই করা হয়নি আসলে আপনার কী দরকার। আপনার কাছে নাকি আপনার আত্মীয়স্বজন কারা সব এসেছেন?"

"হ্যাঁ, আমার মা আর বোন।"

"আপনার ভগিনীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পরম সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল। অসাধারণ মার্জিত রুচির, দারুণ মহিলা! স্বীকার করতে বাধা নেই, আপনার সঙ্গে সেই যখন দেখা হয়েছিল তখন আমাদের দুজনেরই মেজাজ যে এত চড়ে গিয়েছিল তা ভেবে আমার খারাপ লাগছিল। এক ধরনের ভুল বোঝাবুঝি! আপনার তখনকার মূর্ছা যাবার ঘটনাটাকে আমি একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখেছিলাম। কিন্তু পরে তার খুবই চমৎকার ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে! গোঁড়ামি, অন্ধ বিশ্বাস! আপনার নিদারুণ বিতৃষ্ণার কারণ বুঝতে পারি। তা আপনার পরিবারের লোকজন এসে যাওয়ায় ফ্ল্যাট বদলের কথা ভাবছেন নিশ্চয়?"

"ন্-না। আমি শুধু... এসেছি জিগ্গেস করতে.. আমি ভেবেছিলাম যে জামিওতভ্‌কে এখানে পাব।"

"ও তাই তো! ওর সঙ্গে তো আবার আপনার বন্ধুত্বও হয়েছে। শুনেছি। না, জামিওতভ্ আমাদের এখানে নেই— ওকে পাওয়া আপনার ভাগ্যে নেই। ওকে আমরাও আর পাচ্ছি না। গতকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। বদলি হয়ে চলে গেছে। এমনকি যাবার সময় কাউকে গালিগালাজ করতে বাকি রাখেনি।... খুবই অভদ্র ব্যবহার করেছে সকলের সঙ্গে ... অস্থিরমতি ছোকরা— এ ছাড়া আর কী বলব! ওর মধ্যে ভালো প্রতিশ্রুতি ছিল বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আমাদের এই সব অতি বুদ্ধিমান ছেলেছোকরার মতিগতি বোঝে সাধ্য কার! কোথায় কোন্ পরীক্ষা না কি দিতে চায়, কিন্তু আমাদের এখানে ওই নিয়ে ওর শুধু কথা আর কথা, খালি বাগাড়ম্বর—

ওখানেই পরীক্ষার ইতি। আপনি বা আপনার বন্ধু মিস্টার রাজুমিখিনের কথা যদি ধরি সে আলাদা —এ তো আর তা নয়! আপনাদের কর্মক্ষেত্র— সে হল জ্ঞানের জগৎ... এক-আধবার ব্যর্থ হলেও আপনারা পথভ্রষ্ট হবেন না। আপনাদের কাছে জীবনের যত সৌন্দর্য, যত আকর্ষণ তা হল— যাকে বলে nihilist — মায়া। আপনারা সাধুসন্ন্যেসী মানুষ!... আপনাদের কাছে বইপুথি, কানে গোঁজা কলম, বৈজ্ঞানিক গবেষণা— এই হল আপনাদের মনের জগৎ! আমি নিজে অবশ্য কিছুটা... আচ্ছা লিভিংস্টোনের রোজনামচা পড়েছেন কি কখনও?"

"না।"

"আমি কিন্তু পড়েছি। প্রসঙ্গত বলি, আজকাল চারদিকে নিহিলিস্টদের ছড়াছড়ি। কারণটা অবশ্য বুঝতে অসুবিধে হয় না। যা দিনকাল পড়েছে! কী বলেন? আমি অবশ্য, আমি আপনি... আপনি নিশ্চয়ই নিহিলিস্ট নন? খোলাখুলি বলুন, খোলাখুলিই বলুন না!"

"ন্- না..."

"না, দেখুন, আপনি আমার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে পারেন, সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। ধরে নিতে পারেন আপনি একা— এখানে আর কেউ নেই! ডিউটি এক জিনিস, আরেক জিনিস... আপনি ভাবছেন, আমি বুঝি বলব বন্ধুত্ব। না, ধরতে পারলেন না! ...বন্ধুত্ব নয়, একজন নাগরিক আর মানুষের উপলব্ধি, সর্বশক্তিমানের প্রতি ভালোবাসা আর মানবিকতার অনুভূতি। আমি একজন অফিসিয়াল লোক হতে পারি, কাজের জায়গায় থাকতে পারি, কিন্তু নিজের মধ্যে একজন নাগরিক আর মানুষকে সবসময় উপলব্ধি করতে এবং সে সম্পর্কে সচেতন থাকতে আমি বাধ্য। ...এটা আমার কর্তব্য।... এই যে আপনি জামিওতভের কথা বললেন... জামিওতভ্ এমন লোক যে কিনা শ্যাম্পেন বা রুশী মদের গেলাস নিয়ে কোন বাজে আড্ডায় বসে ফরাসী ধরনে কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি বাধিয়ে দিতে পারে... এই হল আপনার জামিওতভ্! কিন্তু আমি... সম্ভবত বলতে পারেন, ...নিষ্ঠা আর মহৎ অনুভূতির আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে গেছি। তার চেয়েও বড় কথা, আমার একটা গুরুত্ব আছে, পদমর্যাদা আছে, প্রতিষ্ঠা আছে! আমি বিবাহিত, আমার ছেলেপুলে আছে। আমি একজন সৎ নাগরিক আর মানুষ হিসেবে আমার কর্তব্য পালন করি। কিন্তু ও কে? — আমি আপনাকে জিগ্‌গেস করতে পারি কি? আমি আপনাকে অত্যন্ত উঁচুদরের শিক্ষিত ভদ্রলোক বলে মনে করি। একবার চেয়ে দেখুন কী বিপুল পরিমাণে ছড়িয়ে পড়ছে মিডওয়াইফগুলো।"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে ভুরু তুলল। লেফ্‌টেনান্টকে দেখে বোঝাই যাচ্ছে মাত্র কিছুক্ষণ আগে আহারপর্ব সমাধা করে উঠেছে। রাস্‌কোল্‌নিকভের সামনে তার অধিকাংশ কথাই অর্থহীন শূন্যগর্ভ আওয়াজের মতো ঝনঝন করে ইতস্তত ছড়িয়ে

পড়ছিল। তবে তার অংশবিশেষ সে কোনমতে বুঝতে পেরেছিল। প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকাল, কিন্তু বুঝতে পারছিল না এর শেষ কোথায়।

"আমি ওই বব ছাঁটা মেয়েগুলোর কথা বলছি," বাক্যবাগীশ লেফটানেন্ট বলল। "আমি নিজেই ডাক্তারি পড়া মেয়েগুলোর মিডওয়াইফ নাম দিয়েছি, আমার মনে হয় নামটা রীতিমতো লাগসই। হে- হে। মেডিক্যাল কলেজে এনাটমি শিখতে যাবার শখ কেন বাপু! আপনিই বলুন। আমি যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি তাহলে ওদের কাউকে চিকিৎসার জন্য ডাকব ভাবছেন? হে- হে!"

নিজের রসিকতায় নিজেই দারুণ খুশি হয়ে লেফটেনান্ট হাসতে লাগল।

"ধরলাম না হয় এ এক ধরনের অপরিমিত জ্ঞানপিপাসা। বেশ তো, জ্ঞানের আলো পেলে— আর কেন? —আপনাকেই জিগ্‌গেস করি। ...তারপর এই দেখুন না, আত্মহত্যার ঘটনা কী পরিমাণ বেড়ে গেছে— সে আপনি ধারণা করতে পারবেন না। সবগুলো ক্ষেত্রেই লক্ষ করবেন টাকাকড়ি ফুরিয়ে যাবার পর আত্মহত্যা করে বসে। ...অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে, বুড়ো মানুষ— সকলেই আছে এর মধ্যে।... এই তো আজ সকালে এক ভদ্রলোকের খবর পেলাম আমরা... মাত্র কিছুদিন হল এখানে এসেছিলেন।... নিল পাভ্‌লিচ, ও নিল পাভ্‌লিচ। এই কিছু আগে যার সম্পর্কে রিপোর্ট পাওয়া গেল কী যেন নামটা সেই ভদ্রলোকের? সেই যে পেতের্‌বুর্গস্কি দ্বীপে গুলি করে আত্মহত্যা করেছে?"

"স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌," পাশের ঘর থেকে ফ্যাসফেঁসে গলায় নিস্পৃহভাবে কে একজন উত্তর দিল।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ চমকে উঠল।

"স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌! স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন।" সে আর্তনাদ করে উঠল।

"সে কি! স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌কে জানতেন নাকি?"

"হ্যাঁ...জানতাম।... এই তো সবে এসেছিলেন এখানে।...

"হ্যাঁ, এই সবে এসেছিলেন। স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। শিথিল চরিত্রের লোক। হঠাৎ কিনা আত্মহত্যা করলেন। তাও আবার এমন একটা যা-তা ভাবে যে কল্পনাও করতে পারবেন না।... নিজে নোটবইতে এই মর্মে কয়েক ছত্র লিখে রেখে গেছেন যে সজ্ঞানে সুস্থ বুদ্ধিতে মারা যাচ্ছে এবং তাঁর অনুরোধ এই যে তাঁর মৃত্যুর জন্য যেন কাউকে দায়ী করা না হয়। এ লোকটার শোনা যায় টাকাকড়ির অভাব ছিল না। তা আপনি কী করে চিনলেন বলবেন কি?"

"আমি... জানি.... আমার বোন ওদের বাড়িতে থেকে গভর্নেসের কাজ করত।...

"বাঃ বাঃ... আপনি তো দেখছি তাহলে ওঁর সম্পর্কে তথ্য দিতে পারেন। আপনি কি কোন সন্দেহ করেছিলেন?"

"আমি গতকাল ওঁকে দেখেছি।... মদ খাচ্ছিলেন।... আমি কিছুই জানতাম না।"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ অনুভব করছিল একটা বিরাট বোঝা তার বুকে চেপে বসেছে।

"আপনি আবার কেমন যেন ফেকাসে হয়ে গেছেন। আমাদের এখানকার আবহাওয়াটাই এরকম— বড় চাপা।..."

"না, আমার আর সময় নেই," বিড়বিড় করে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ বলল। "বিরক্ত করার জন্য মাফ করবেন।..."

"আরে না না, আপনার যতবার খুশি। বড় আনন্দ দিলেন। আমি আপনাকে একথা জানাতে পেরে খুশি যে..."

বলতে-বলতে বিদায় নেবার জন্য হাতখানাও বাড়িয়ে দিলেন ইলিয়া পেত্রোভিচ।

"আমি শুধু চেয়েছিলাম... আমি এসেছিলাম জামিওতভের কাছে।..."

"বুঝেছি বুঝেছি। যা হোক, বড় আনন্দ দিলেন।"

"আমি... আমিও খুব খুশি।... আমি তাহলে..." রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ মৃদু হাসল। যখন বেরিয়ে এলো তখন সে টলছে। তার মাথা ঘুরছে। সে দু-পায়ে দাঁড়িয়ে আছে কিনা উপলব্ধি করতে পারছিল না। ডান হাতে দেয়াল ধরে-ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল, তার মনে হল রেজিস্টার হাতে একজন দপ্তরি যেন ওপরে অফিসে যাবার পথে তার সঙ্গে ধাক্কা খেল। নিচতলায় কোথা যেন একটা ছোট্ট কুকুর সমানে কিঁউ-কিঁউ করে ডেকে চলেছে। কোন এক মহিলা চেঁচামেচি করতে-করতে একটা বেলন ছুঁড়ে মারল কুকুরটাকে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ নিচে নেমে আঙিনায় গিয়ে পড়ল। আঙিনায়, ফটক থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে সোনিয়া। আগাগোড়া মড়ার মতো স্থির, বিবর্ণ। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল রাস্‌কোল্‌নিকভের দিকে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ ওর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। সোনিয়ার মুখে ফুটে উঠে উঠল কেমন যেন বেদনা আর ক্লান্তির ছাপ, যেন একটা হতাশার ভাব। সে হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ জোর করে মুখে ফুটিয়ে তুলল একটা বিশ্রী ধরনের ম্লান হাসি— হারিয়ে যাওয়া হাসির ক্ষীণ চিহ্ন। একটু দাঁড়িয়ে থেকে সে আবার উলটো দিকে হাঁটা দিয়ে অফিসের পথ ধরল, আবার ওপরে উঠে অফিসে গিয়ে ঢুকল।

ইলিয়া পেত্রোভিচ ততক্ষণে চেয়ারে বসে পড়ে কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করে দিয়েছে। তার সামনে দাঁড়িয়েছিল একটা লোক— এই সেই লোক সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে এইমাত্র রাস্‌কোল্‌নিকভের সঙ্গে যার ধাক্কা লেগে গিয়েছিল।

"বটে! আবার আপনি! কিছু ফেলে গেছেন নাকি? একী! কী হল আপনার?"

রাস্‌কোল্‌নিকভের ঠোঁট ততক্ষণে ফেকাসে হয়ে গেছে, স্থির দৃষ্টিতে তাকাতে-তাকাতে সে নিঃশব্দে তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। টেবিলের একেবারে কাছাকাছি আসার পর হাত দিয়ে টেবিলে ভর দিল, কিছু একটা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কথা সরল না— কেবল বেরিয়ে এলো কতকগুলো অসংলগ্ন আওয়াজ।

"আপনার শরীর খারাপ লাগছে। চেয়ার! এই যে বসুন চেয়ারে, বসে পড়ুন।"

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ চেয়ারে গা ছেড়ে দিল। কিন্তু সেই অবস্থাতেও এক মুহূর্তের জন্যও ইলিয়া পেত্রোভিচের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরাল না। খুবই অবাক হয়ে গেছে, রীতিমতো অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে ইলিয়া পেত্রোভিচ। দু-জনে দু-জনের দিকে তাকিয়ে রইল মিনিটখানেক। অপেক্ষা করতে লাগল। জল এসে গিয়েছিল।

"ওটা আমার কাজ..." রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ বলতে গেল।

"জল খান।"

রাস্‌কোল্‌নিকভ হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল জলের গেলাসটা। তারপর মৃদু স্বরে, থেমে থেমে, স্পষ্ট উচ্চারণে বলল:

"*ওটা আমার কাজ। আমিই খুন করেছিলাম কুড়ুল দিয়ে ওই সুদখোর বুড়ি আর তার বোন লিজাভেতাকে। আমিই লুট করেছিলাম ওদের জিনিস।*"

ইলিয়া পেত্রাভিচ হাঁ হয়ে গেলেন। চারদিক থেকে হাঁ হাঁ করে লোকজন ছুটে এলো।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ তার জবানবন্দির পুনরাবৃত্তি করল।...

উপসংহার

সাইবেরিয়া। প্রশস্ত নির্জন নদীতীরের একটি শহর। রাশিয়ার একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র। শহরে আছে একটি দুর্গ। দুর্গের ভেতরে কারাগার। এই কারাদুর্গে আজ নয় মাস হল বন্দি জীবনযাপন করছে মাঝারি মেয়াদের নির্বাসন দণ্ডভোগী কয়েদি রোদিওন রাস্‌কোল্‌নিকভ। তার অপরাধ সংঘটনের দিন থেকে কেটে গেছে প্রায় দেড় বছর।

মামলার বিচারে বিশেষ জটিলতা দেখা দেয়নি। অপরাধী পরিষ্কার, সুস্পষ্ট, দৃঢ়ভাষায় তার সাক্ষ্য সমর্থন করেছে, পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণের কোথাও এতটুকু তালগোল পাকায়নি, নিজের স্বার্থে কোনও ঘটনার গুরুত্ব লাঘব করেনি, বিকৃতি ঘটায়নি, খুঁটিনাটি কোন ঘটনাই উল্লেখ করতে ভোলেনি। হত্যাকাণ্ডের আগাগোড়া বিশদ বর্ণনা সে দেয়। নিহত বৃদ্ধার হাতে বন্ধক হিসেবে ধাতুর পাত সমেত যে কাঠের টুকরোটা পাওয়া গিয়েছিল তার রহস্যও সে উদ্‌ঘাটন করে। নিহতের কাছ থেকে কী ভাবে চাবির গোছা নিয়েছিল তার বিবরণ দেয়, চাবি আর ট্রাঙ্কের এবং ট্রাঙ্কের ভেতরকার জিনিসপত্রের বিস্তারিত বিবরণ দেয়— এমনকি কোন-কোন জিনিসের বিশেষ উল্লেখও করে। লিজাভেতার হত্যারহস্যও ব্যাখ্যা করে। কোখের আগমন, তার দরজা ধাক্কা দেওয়ার ঘটনা, কোখের পরই জনৈক ছাত্রের আবির্ভাব এবং তাদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তার বিষয়বস্তু— সবই সে জানায় ! সে বলে এরপর দুষ্কৃতকারী অর্থাৎ সে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে পালানোর সময় নিকোলাই ও দ্‌মিত্রির চেঁচামেচি শুনতে পায়, ফাঁকা ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকে কিছুক্ষণ গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর বাড়ি ফিরে আসে, শেষকালে সে ভজ্‌নেসেন্‌স্কি এভিনিউতে বাড়ির পেছনের আঙিনায় ফটকের কাছে পড়ে থাকা পাথরটাও দেখিয়ে দিল। তার তলায় মনিব্যাগ এবং অন্যান্য জিনিসও পাওয়া গেল। এককথায়, সব পরিষ্কার। মনিব্যাগ আর জিনিসগুলোর সদ্ব্যবহার না করে হত্যাকারী যে তা পাথরচাপা দিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল এই দেখে তদন্তকারী ও বিচারকরা অবশ্য খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের আরও বেশি অবাক হওয়ার কারণ এই যে তার নিজের চুরি করা সবগুলো জিনিসের খুঁটিনাটি তো সে মনে করতে পারলই না এমনকি সেগুলোর সংখ্যায়ও ভুল করল। সে যে একবারও মনিব্যগটা খোলেনি এমনকি ভেতরে ঠিক কত টাকা আছে তাও জানে না বিশেষ করে এই ঘটনাটি বিচারকদের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছিল। দেখা গেল মনিব্যাগে ছিল তিনশ সতেরো রুবল ষাট কোপেক। দীর্ঘকাল পাথরের নিচে পড়ে থাকায় ওপরের দিককার বেশ বড় অঙ্কের কিছু-কিছু নোট একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বিচারাধীন আসামী যেখানে অন্যান্য ক্ষেত্রে তার সমস্ত অপরাধ স্বীকার

করে অপরাধের যথাযথ বিবরণ দিয়েছে, সেখানে কেবল এ-ক্ষেত্রেই সে কেন মিথ্যে কথা বলছে বিচারকমণ্ডলী তা জানার চেষ্টায় বিস্তর সময় ব্যয় করেন। অবশেষে কেউ কেউ, বিশেষত মনস্তত্ত্ববিদরা— এমন সম্ভাবনার কথাও প্রকাশ করলেন যে আসামী বাস্তবিকই মনিব্যাগ খুলে দেখেনি, তাই ওর ভেতরে কী ছিল জানতে পারেনি এবং না জেনেই অমনি-অমনি পাথর চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এ থেকে তাঁরা এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হন যে আসলে সাময়িক মস্তিষ্কবিকৃতি অর্থাৎ লাভ-লোকসানের অঙ্কের বাইরে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন খুনজখম ও রাহাজানির এক ধরনের প্রবৃত্তি বা মনোম্যানিয়া ছাড়া আর কোন কারণ এই অপরাধের পেছনে থাকা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত, যে-কোন অপরাধীর ক্ষেত্রে সাময়িক মানসিক বিকারের যে অভিনব তত্ত্বটির ঘন-ঘন প্রয়োগের চেষ্টা ইদানীং ফ্যাশন হয়ে দাড়িয়েছে, এই সিদ্ধান্তটি তার সঙ্গে দিব্যি মানিয়েও গেল,পরন্তু রাস্‌কোল্‌নিকভ্ যে দীর্ঘকাল যাবৎ বিষণ্ণতায় ভুগছে ডাক্তার জোসিমভ, রাস্‌কোল্‌নিকভের বন্ধুবান্ধব, তার বাড়িউলি আর বাড়ির কাজের লোকের এবং অন্যান্য আর বহু লোকের সাক্ষ্যে তা চূড়ান্তভাবে প্রতিপন্ন হল। সমস্ত কিছু মিলে যে সিদ্ধান্তের প্রবল সহায়ক হল তা এই যে রাস্‌কোল্‌নিকভের ব্যাপারটা একটু অন্য ধরনের— তাকে সাধারণ খুনি, ডাকাত বা রাহাজানের পর্যায়ে ফেলা যায় না। এই মতের যাঁরা পৃষ্ঠপোষক তাঁদের কাছে নিদারুণ আক্ষেপের বিষয় এই যে অপরাধী আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রায় কোন চেষ্টাই করল না। ঠিক কী কারণে সে নরহত্যার দিকে ঝুঁকল এবং কোথা থেকে লুটতরাজ করার প্রেরণা পেল এই চরম প্রশ্নের অত্যন্ত সাফ জবাব সে দিয়েছিল। তার জবাব ছিল স্থূল, তবে বেশ স্পষ্ট, নিখুঁত। বলেছিল যে এ সবের কারণ তার চরম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা, তার দারিদ্র্য ও অসহায়তা এবং নিহতের কাছ থেকে অন্তত যে হাজার তিনেক রুবল পাবে বলে সে আশা করেছিল তার সাহায্যে নিজের কর্মজীবনের সূচনার শক্ত ভিত গড়ে তোলার বাসনা। বঞ্চনা ও ব্যর্থতার জ্বালা ছাড়াও ভীরু ও চপল স্বভাবের বশবর্তী হয়ে সে এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু ঠিক কিসের তাগিদে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অপরাধ স্বীকার করে এ প্রশ্নের উত্তরে সে সরাসরি আন্তরিক অনুশোচনার উল্লেখ করে। পুরো ব্যাপারটাই প্রায় স্থূল ধরনের।...

অপরাধের গুরুত্বের বিচারে দণ্ড কিন্তু আশাতীত হয়েছিল। তার কারণ এটাই হতে পারে যে অপরাধী আত্মপক্ষ সমর্থনের এতটুকু চেষ্টা তো করেইনি, বরং নিজেই নিজের অপরাধ আরও বেশি প্রকট করে তোলার বাসনা প্রকাশ করে। মামলার সমস্ত অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক দিকের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে অপরাধী যে ব্যাধিগ্রস্ত ছিল এবং দারিদ্র্যের মধ্যে দিনপাত করছিল এ বিষয়ে কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না। অপরাধী লুটের মাল কাজে লাগায়নি, অংশত কৃতকর্মের জন্য অপরাধীর মনে অনুশোচনাবোধ এবং অংশত

অপরাধ সংঘটনের সময় তার মানসিক বিকারকে তার কারণস্বরূপ দর্শান হয়। শেষোক্ত অনুমানকে বরং আরও জোরাল করে তোলে অনিচ্ছাকৃতভাবে লিজাভেতাকে খুন করার ঘটনা ও পরিস্থিতিটি: একটা লোক দু-দুটো খুন করল, অথচ দরজা যে খোলা রয়েছে সেদিকে তার এতটুকু হুঁশ নেই! অবশেষে, নিজে এসে দোষ স্বীকার করা— তাও যখন এক মানসিক অবসাদগ্রস্ত আত্মপীড়নকারী ধর্মোন্মাদ নিকোলাই নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান করে মামলা অসম্ভব রকম জটিল করে তোলে, যখন আসল অপরাধীর বিরুদ্ধে স্পষ্ট কোম সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া তো দূরের কথা এমনকি সন্দেহেরও প্রায় কোন কারণ ছিল না। তাছাড়া পর্‌ফিরি পেত্রোভিচও তার কথার সম্পূর্ণ মর্যাদা রেখেছিল। ...পারিপার্শ্বিক সমস্ত ঘটনা মিলে শেষপর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির দণ্ড লাঘবের পথ প্রশস্ত করে দেয়।

এছাড়া বিচারাধীন আসামীর অনুকূলে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আরও কিছু তথ্য প্রকাশ পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালের ছাত্র রাজুমিখিন কোথা থেকে যেন এই মর্মে তথ্য সংগ্রহ করে আনল এবং তার পক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণও হাজির করল যে আসামী রাস্‌কোল্‌নিকভ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালে তার শেষ সম্বল দিয়ে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত এক দরিদ্র সহপাঠীকে সাহায্য করে এবং প্রায় ছয় মাস বলতে গেলে তার ভরণপোষণ করে। সহপাঠীটি তেরো বছর বয়স থেকে নিজের পরিশ্রমে অর্জিত উপার্জনে বাবার ভরণপোষণ ও অন্নসংস্থান করত। সে মারা যাবার পর রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তার বৃদ্ধ অশক্ত বাবার দেখাশোনার ভার নিয়েছিল, পরে বৃদ্ধকে হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেছিল। বৃদ্ধ মারা যেতে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থাও সে করেছিল। এই সমস্ত তথ্যই রাস্‌কোল্‌নিকভের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনুকূল প্রভাব ফেলে। রাস্‌কোল্‌নিকভের এককালের বাড়িউলি, একসময় রাস্‌কোল্‌নিকভের সঙ্গে যার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল অধুনা মৃত সেই মেয়েটির বিধবা মা জার্‌নিৎসিনা নিজেও এই মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছিল যে তারা যখন ফাইভ কর্নার্সের কাছে অন্য একটা বাড়িতে থাকত, তখন এক রাতে অগ্নিকাণ্ডের সময় রাস্‌কোল্‌নিকভ্ এক জ্বলন্ত ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে দুটি শিশুকে উদ্ধার করে এবং তার ফলে সে নিজেও অগ্নিদগ্ধ হয়। এই ঘটনা খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করা হয়, প্রত্যক্ষদর্শীও এই সাক্ষ্য দেয়। এক কথায়, পরিণামে আসামীর স্বেচ্ছায় হাজির হয়ে স্বীকারোক্তি এবং অপরাধের গুরুত্ব লাঘবের উপযোগী অন্যান্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাকে মাঝারি মেয়াদের দণ্ডভোগী হিসেবে মাত্র আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

আদালতে শুনানির আগেই রাস্‌কোল্‌নিকভের মা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। মামলা যতদিন চলছিল সেই সময়ের জন্য দুনিয়া ও রাজুমিখিন চেষ্টাচরিত্র করে তাকে সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে অন্যত্র সরিয়ে দিতে পেরেছিল। সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে স্বল্প দূরত্বে রেলপথের ওপরে একটা শহর রাজুমিখিন বেছে নিয়েছিল যাতে মামলার গতিবিধির

ওপর নিয়মিত লক্ষ রাখা যায়, আবার যতদূর সম্ভব ঘন-ঘন আভ্দোতিয়া রমানোভ্নার সঙ্গে দেখাসাক্ষাতেরও সুযোগ পাওয়া যায়। পুল্খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্নার রোগটা একটু অদ্ভুত ধরনের। স্নায়বিক দৌর্বল্য, সেই সঙ্গে এক ধরনের মস্তিষ্কবিকৃতি — পুরোপুরি যদি নাও হয়, অন্তত আংশিক। ভাইয়ের সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করার পর ফিরে এসে দুনিয়া দেখল মা গুরুতর অসুস্থ, জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে। ওই দিন সন্ধ্যাবেলাতেই রাজুমিখিনের সঙ্গে কথা বলে সে ঠিক করে নিয়েছিল ভাইয়ের সম্পর্কে মার প্রশ্নের উত্তরে তারা কী বলবে। এমনকি দু'জনে মিলে মাথা খাটিয়ে মা'র জন্য রাস্কোল্নিকভ্কে নিয়ে এই মর্মে পুরো একটা গল্পও বানিয়ে ফেলেছিল যে সে কোন বেসরকারি কাজের ভার নিয়ে অনেক দূরে রাশিয়ার সীমান্তবর্তী কোন এক জায়গায় চলে গেছে। এই কাজে শেষ পর্যন্ত তার যেমন টাকাপয়সা আয় হবে তেমনি নামডাকও হবে। কিন্তু ওরা অবাক হয়ে গেল এই দেখে যে পুল্খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না এ ব্যাপারে নিজে কোন প্রশ্নই করল না— তখন তো নয়ই, তার পরেও না। বরং দেখা গেল পুত্রের আকস্মিক সেন্ট পিটার্সবুর্গ পরিত্যাগ সম্পর্কে সে নিজেই পুরোপুরি একটা কাহিনী বানিয়ে রেখেছে। চোখের জল ফেলতে-ফেলতে সে ওদের বলে যে ছেলে তার কাছে বিদায় নিতে এসেছিল। প্রসঙ্গত এমন ইঙ্গিতও দেয় যে এ ব্যাপারে বহু রহস্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য একমাত্র তারই জানা আছে এবং রোদিয়ার প্রবল ক্ষমতাশালী বহু শত্রু আছে, তাই সে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছে। রোদিয়ার কর্মজীবন প্রসঙ্গে সে একথাও বলে যে কিছু প্রতিকূল অবস্থা কেটে গেলে তার ভবিষ্যৎ যে রীতিমতো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই। এমনকি রাজুমিখিনকে এই বলে আশ্বাস দেয় যে ছেলে কালে একজন জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হবে— ওর এই প্রবন্ধ আর সাহিত্য-প্রতিভাই তার প্রমাণ। ছেলের লেখাটা সে অনবরত পড়ত, এমনকি কখন-কখন জোরে-জোরেও পড়ত, বলতে গেলে ঘুমানোর সময়ও ওটা তার সাথী ছিল। অথচ রোদিয়া এখন ঠিক কোথায় আছে এই নিয়ে কোন প্রশ্নই প্রায় সে করেনি। যদিও তার সঙ্গে কথা বলার সময় এই প্রসঙ্গটি যে ওরা এড়িয়ে যায় একমাত্র এটাই তার সন্দেহ জাগিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। অবশেষে কতকগুলো বিষয়ে পুল্খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্নার অদ্ভুত রকমের নীরবতা তাদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াল। যেমন, ওর কাছ থেকে চিঠি যে আসছে না এই নিয়ে সে একবারও কোন অনুযোগ পর্যন্ত করেনি, অথচ আগে যখন সে মফস্বলে থাকত তখন তার বড় আদরের খোকার কাছ থেকে কোন চিঠি পাবার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করার মধ্যেই সে জীবনের একমাত্র সার্থকতা খুঁজে পেত। এর কোন সঠিক ব্যাখ্যা না পাওয়াতে দুনিয়া রীতিমতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তার মনে এমন চিন্তার উদয় হল যে ছেলের ভাগ্যে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটেছে বলে মা মনে-মনে সম্ভবত টের পেয়েছে, তাই আরও ভয়ঙ্কর কিছু শুনতে হতে পারে এই আশঙ্কায়

হয়ত কোন প্রশ্ন করছে না। মোটের ওপর দুনিয়ার বুঝতে বাকি রইল না যে তার মা'র মাথার ঠিক নেই।

অবশ্য দু-একবার পুল্‌খেরিয়া আলক্সান্দ্রভ্‌না নিজে আলোচনা এমন দিকে নিয়ে গেছে যার ফলে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রোদিয়া এখন আসলে কোথায় আছে তার উল্লেখ না করে পারা যেত না। কিন্তু উত্তর যখন স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক, অসন্তোষজনক ও সন্দেহজনক না হয়ে উপায় থাকত না, তখন সে হঠাৎ ভীষণ গম্ভীর হয়ে যেত, কথা বন্ধ করে দিত। তার এই অবস্থা বেশ দীর্ঘদিন চলত। শেষকালে দুনিয়া যখন দেখতে পেল যে মিথ্যে করে বানিয়ে-বানিয়ে বলা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে তখন সে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল : বরং ওই রকম কোন-কোন বিষয়ে একেবারে চুপ করে যাওয়াই ভালো। কিন্তু হতভাগিনী মা যে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটেছে বলে সন্দেহ করছে এটা ক্রমেই বেশি করে, চোখে পড়ার মতো স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। দুনিয়ার মনে পড়ে গেল, ভাইয়ের মুখে সে শুনেছিল— স্‌ভিদ্রিগাইলভের সঙ্গে তার দেখা হওয়ার পরে, সর্বনাশা সেই শেষ দিনটির আগের রাতে সে যখন ঘুমের মধ্যে ভুল বকছিল তখন মা তা শুনে ফেলে। সেই সময় কিছু জেনে ফেলেনি তো? অনেক সময়, কখন-কখন বেশ কয়েকদিন, এমনকি কয়েক সপ্তাহ গম্ভীর মুখে বিষণ্ণ অবস্থায় চুপচাপ কাটিয়ে এবং নীরবে অশ্রুবিসর্জনের পর রোগী অনেকটা হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো সজীব হয়ে উঠে হঠাৎ জোরে-জোরে তার ছেলের সম্পর্কে, নিজের আশাভরসা আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রায় অনর্গল কথা বলতে শুরু করত।... সময়-সময় তার কল্পনা মাত্রাতিরিক্ত উদ্ভট হয়ে পড়ত। ওরা তখন ঠাট্টা-তামাশা করে, ওর কথায় সায় দিয়ে ওকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করত। সে নিজেও হয়ত পরিষ্কার দেখতে পারত যে তার সব কথায় সায় দিয়ে, ঠাট্টা-তামাশা করে ওরা তাকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, তবু তার কথা বলার কামাই ছিল না।...

অপরাধী যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বীকারোক্তি করল তার পাঁচ মাস পরে বিচারের রায় বের হল। রাজুমিখিন সম্ভব হলেই জেলখানায় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে আসত। সোনিয়াও দেখা করতে যেত। অবশেষে ছাড়াছাড়ির সময় ঘনিয়ে এলো। দুনিয়া শপথ করে তার ভাইকে বলল যে এ বিচ্ছেদ চিরকালের নয়। রাজুমিখিনের উত্তেজনাপ্রবণ তরুণ মস্তিষ্কে একটা পরিকল্পনা সুনির্দিষ্ট আকার নিতে শুরু করেছে— আগামী তিন-চার বছরে যতদূর সম্ভব তার ভবিষ্যৎ উপার্জনের একটা ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে, অন্তত বেশ খানিকটা টাকা জমিয়ে বাস উঠিয়ে চলে যাবে সাইবেরিয়ায়। সেখানে জমি সবদিক থেকে সমৃদ্ধ, কিন্তু লোকজনের অভাব, কর্মী লোকের সংখ্যা কম, পুঁজির পরিমাণও কম। সেখানে সে গিয়ে উঠবে ঠিক সেই শহরে যেখানে রোদিয়া আছে।... সকলে মিলে একসঙ্গে শুরু করা যাবে এক নতুন জীবন। বিদায়ের সময় সকলে কাঁদছিল। একেবারে শেষের কয়েকদিন

রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে বড় বেশি চিন্তিত দেখা যাচ্ছিল। মার কথা খুবই জিগ্‌গেস্‌ করত, তার কথা ভেবে সব সময় সে অস্থির হয়ে পড়ত। এমনকি মা'র কথা ভেবে ও এত কষ্ট পাচ্ছে দেখে দুনিয়া বিচলিত হয়ে পড়ে। মা'র ব্যাধিগ্রস্ত মানসিক অবস্থার কথা জানতে পেরে সে খুব মন-মরা হয়ে পড়েছে। যে-কোন কারণেই হোক, এই সময় সোনিয়ার সঙ্গে সে তেমন ভালো করে কথাবার্তাও বলত না। কয়েদিদের যে দলটির সঙ্গে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে পাঠানো হচ্ছে, স্‌ভিদ্রিগাইলভের রেখে যাওয়া টাকা দিয়ে সোনিয়া তাকে অনুসরণ করার যাবতীয় ব্যবস্থা ও আয়োজন ইতিমধ্যে করে ফেলেছে। এই নিয়ে রাস্‌কোল্‌নিকভের সঙ্গে তার কখনও ঘুণাক্ষরেও কোন কথা হয়নি, অথচ ওরা দুজনেই জানত যে এটা ঘটবে। একেবারে শেষ বিদায়ের সময় তার বোন আর রাজুমিখিন যখন জেলখানা থেকে রাস্‌কোল্‌নিকভের বেরিয়ে আসার পর তাদের সকলের রঙিন ভবিষ্যতের উল্লেখ করে গভীর আবেগ আর উচ্ছ্বাসভরে তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকে তখন তার মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে। সে ভবিষ্যদ্বাণী করল যে তার মা'র অসুস্থতা শিগগিরই চরম বিপর্যয়ে পরিণত হতে যাচ্ছে। অবশেষে সে আর সোনিয়া যাত্রা করল।

দু'মাস পরে রাজুমিখিনের সঙ্গে দুনিয়ার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের উৎসবটা ছিল নিরানন্দ, শান্ত। প্রসঙ্গত, আমন্ত্রিতদের মধ্যে পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ আর জোসিমভ্‌ও ছিল। সম্প্রতি, বেশ কিছুকাল হল রাজুমিখিনকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখাচ্ছে। দুনিয়ার অন্ধ বিশ্বাস ছিল যে রাজুমিখিন তার সমস্ত পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ ঘটাতে পারবে। বিশ্বাস না করার অবশ্য কোন কারণও ছিল না— এই মানুষটির মধ্যে সে লৌহকঠিন ইচ্ছাশক্তির পরিচয় পেয়েছে। ইতিমধ্যে রাজুমিখিন আবার ইউনিভার্সিটিতে যাতায়াত শুরু করে দিয়েছে। সে এখন ইউনিভার্সিটির পড়াশুনা শেষ করতে চায়। ওরা দুজনে প্রতি মুহূর্তে ভবিষ্যতের নানারকম পরিকল্পনা তৈরি করে যাচ্ছে। দুজনেরই দৃঢ় বিশ্বাস পাঁচ বছরের মধ্যে সাইবেরিয়াতে চলে যাওয়া সম্ভব হবে। যতদিন তারা না যেতে পারে ততদিন ওখানে তাদের ভরসা সোনিয়া।...

রাজুমিখিনের সঙ্গে দুনিয়ার বিয়েতে পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না প্রাণভরে আশীর্বাদ করল মেয়েকে। কিন্তু এই বিয়ের পর সে যেন আরও মনমরা, আরও বেশি চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল।... তাকে আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাজুমিখিন তাকে প্রসঙ্গত সেই ছাত্র আর তার অশক্ত বুড়ো বাপের ঘটনাটা জানায়, গত বছর কী ভাবে রোদিয়া আগুনের হাত থেকে দুটো কচি বাচ্চাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে আগুনে ঝলসে যায়, এমনকি অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকে তার বিবরণও দেয়। পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নার মন অমনিতেই বিপর্যস্ত হয়ে ছিল—এ দুটি সংবাদ পেয়ে উত্তেজনায় তার বিচারবুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়ে গেল। এই নিয়ে তার আর গল্প করার কামাই নেই, রাস্তায় ঘাটে যার-তার সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলতে শুরু করে দেয়— যদিও দুনিয়া সবসময়

তার সঙ্গে-সঙ্গে থাকত। সাধারণ যানবাহনে, দোকানে-বাজারে যখন-তখন যাকে-তাকে ধরে শুরু করে দেয় তার ছেলের গল্প, ছেলের লেখা প্রবন্ধের কথা এবং কী ভাবে সে তার সহপাঠী ছাত্রকে সাহায্য করেছিল, আগুনের কবল থেকে কচি বাচ্চাদের বাঁচাতে গিয়ে নিজে পুড়ে গিয়েছিল— ইত্যাদি নানা বিবরণ। দুনিয়া দিশেহারা হয়ে যেত, তাকে কী করে সামলাবে বুঝতে পারত না। মনের এই অসুস্থ ও বিপর্যস্ত এবং অতিমাত্রায় উত্তেজিত অবস্থার ফলে বিপদ ঘটার সম্ভাবনা তো ছিলই, তা ছাড়াও আর একটি বিপদের আশঙ্কা ছিল: হালের মামলার জের ধরে রাস্‌কোল্‌নিকভের নাম কারও মনে থাকতে পারে, তখন এই নিয়ে কথা উঠতে পারে। রোদিয়া যে দুটি বাচ্চাকে আগুনের কবল থেকে উদ্ধার করেছিল পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না ইতিমধ্যে কোথা থেকে তাদের মায়ের ঠিকানা জোগাড় করে ফেলেছে, এখন তার সঙ্গে দেখা করার জন্য সে বদ্ধপরিকর। শেষকালে তার অস্থিরতা একেবারে মাত্রাছাড়া হয়ে উঠল। কখন-কখন হঠাৎ-হঠাৎ কাঁদতে থাকে, প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে, জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকতে থাকে। একদিন সকালে সে সরাসরি ঘোষণা করে বসল যে তার হিসাবমতো রোদিয়ার শিগ্‌গিরই আসার কথা, কেননা তার মনে আছে বিদায় নেওয়ার সময় রোদিয়া তাকে এই কথাই বলেছিল যে নয় মাস পরে ওরা তাকে আশা করতে পারে। পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে সাক্ষাতের জন্য তৈরি হতে লাগল, তার নিজের থাকার ঘরটা ওর জন্য আলাদা করে ধরে সেখানে সমস্ত রকম ব্যবস্থা করতে লেগে গেল, আসবাবপত্র ঝাড়পোছ করে, ঘরের পর্দা ধোওয়া-কাচা করে নতুন পর্দা টাঙানো ইত্যাদি কাজে মেতে রইল। দুনিয়া উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল, তবু চুপ করে রইল। এমনকি ভাইকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্য গোছগাছ করার কাজে মাকে সাহায্যও করল। অবিরাম নানারকম কল্পনা, সুখস্বপ্ন ও অশ্রুপাতের মধ্য দিয়ে উত্তেজনাপূর্ণ দিনটি কেটে যাবার পর রাতে পুল্‌খেরিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না অসুস্থ হয়ে পড়ল, সকালের দিকে শুরু হয়ে গেল প্রবল জ্বর আর ভুল বকা। বায়ু চড়ে গেল। দু-সপ্তাহ পরে সে মারা গেল। বিকারের সময় তার মুখ ফসকে যে সমস্ত কথা বেরিয়ে এসেছিল তা থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে ওরা যা সন্দেহ করেছিল, ছেলের দুর্ভাগ্য সম্পর্কে তার চেয়ে অনেক বেশিই সে অনুমান করতে পেরেছে।

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ অনেকদিন পর্যন্ত তার মা'র মৃত্যুসংবাদ পায়নি, যদিও সাইবেরিয়ায় তার নির্বাসনের একেবারে গোড়া থেকেই সেন্ট পিটার্সবুর্গের সঙ্গে তার চিঠিপত্রের আদান-প্রদান শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেটা সম্ভব হয়েছিল সোনিয়ার মারফত। সোনিয়া নিয়মিত প্রতি মাসে রাজুমিখিনের নামে সেন্ট পিটার্সবুর্গে চিঠি লিখত, প্রতি মাসে সেখান থেকে নিয়মিত উত্তরও পেত। সোনিয়ার লেখা চিঠিগুলো প্রথম-প্রথম দুনিয়া ও রাজুমিখিনের কাছে কেমন যেন নীরস আর নিরুৎসাহব্যঞ্জক

মনে হত, কিন্তু পরে তারা দুজনেই ভেবে দেখেছে যে এর চেয়ে ভালো করে লেখা বোধহয় সম্ভবও নয়। হাজার হোক ওর লেখা এই সব চিঠি থেকেই শেষ পর্যন্ত তাদের হতভাগ্য ভাইয়ের অদৃষ্টের একটা পরিপূর্ণ ও সঠিক চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। সোনিয়ার চিঠি রাস্‌কোল্‌নিকভের নির্বাসিত বন্দি জীবনের সমস্ত পরিবেশের যাবতীয় খুঁটিনাটির অতি সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট বর্ণনায় এবং সাদামাঠা দৈনন্দিন বাস্তবতায় বোঝাই থাকত। সেখানে তার ব্যক্তিগত আশা-ভরসার কোন কথা থাকত না, ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা বা ব্যক্তিগত উপলব্ধির কোন বর্ণনাও থাকত না। রাস্‌কোল্‌নিকভের মানসিক অবস্থার এবং সামগ্রিকভাবে তার মনোজগতের ব্যাখ্যা দেওয়ার কোন চেষ্টা তাতে থাকত না। থাকত কেবল তথ্য, অর্থাৎ রাস্‌কোল্‌নিকভের নিজের মুখের কথা, তার স্বাস্থ্যের বিশদ বিবরণ, শেষবার তাদের যখন দেখা হয়েছিল তখন সে কী ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, কী অনুরোধ তাকে করেছিল, কী ভার তাকে দেয় ইত্যাদি সংবাদ। সব খবরই অত্যন্ত খুঁটিয়ে লিখত। হতভাগ্য ভাইয়ের চেহারাটা এই নিখুঁত বর্ণনা থেকে শেষ পর্যন্ত আপনা-আপনিই স্পষ্ট ফুটে উঠত। এখানে ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না, যেহেতু সবই ছিল বিশ্বাসযোগ্য তথ্য।

কিন্তু এ সব বিবরণ দুনিয়া আর তার স্বামীর মনকে প্রবোধ দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না— বিশেষত শুরুতে। সোনিয়ার কাছ থেকে অনবরত এই মর্মে সংবাদ আসত যে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ সব সময় বিষণ্ণ হয়ে থাকে, কথাবার্তায় তেমন একটা উৎসাহ দেখায় না এবং চিঠি পেলে প্রতিবারই যখন তার বিষয়বস্তু সে তাকে শোনায় তখন তাতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ সে দেখায় না। কখন-কখন সে মা'র কথা জিগ্‌গেস করে। সত্যটা সে ইতিমধ্যে অনুমান করতে পেরেছে দেখে সোনিয়া শেষ পর্যন্ত যখন তাকে আসল ঘটনা জানাল তখন সোনিয়া অবাক হয়ে গেল এই দেখে যে মা'র মৃত্যুসংবাদ পর্যন্ত তার মনের ওপর তেমন তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না— অন্তত ওর বাইরের চেহারা দেখে সোনিয়ার তা-ই মনে হয়েছিল। সোনিয়া এও জানায় যে তাকে দেখে যদিও মনে হয় যে সে নিজের ভেতরে সম্পূর্ণ ডুবে আছে এবং সকলের কাছ থেকে নিজেকে সযত্নে আড়াল করে রাখছে, তবু নতুন জীবনকে সে বেশ সহজ-সরলভাবে মেনে নিয়েছে। নিজের পরিস্থিতি সম্পর্কে তার পরিষ্কার ধারণা আছে, নিকট ভবিষ্যতে ভালো কিছুর প্রত্যাশা তার নেই, ভুলেও কোন দুর্বল মুহূর্তে মনের মধ্যে কোন আশা-ভরসা পোষণ করে না— অথচ তার মতো পরিস্থিতিতে সেটাই হত স্বাভাবিক। তাছাড়া তার আগের পরিস্থিতির সঙ্গে এখনকার নতুন পরিস্থিতি ও পরিবেশের এত অমিল সত্ত্বেও প্রায় কোন কিছুতেই সে বিস্ময় প্রকাশ করছে না। সে জানায় যে রাস্‌কোল্‌নিকভের স্বাস্থ্য সন্তোষজনক। কাজে সে নিয়মিত যায়— কাজে কোন গাফিলতি নেই, আবার কোন আগ্রহও নেই। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সে প্রায় উদাসীন। কিন্তু রবিবার ও অন্যান্য

ছুটির দিন ছাড়া সে খাবার এত খারাপ যে শেষকালে সোনিয়ার কাছ থেকে খানিকটা টাকা নিতেও সে আপত্তি করেনি। বরং সাগ্রহেই নিয়েছি। তাই দিয়ে অন্তত রোজ নিজের চায়ের বন্দোবস্ত করতে পারবে। বাদবাকি সমস্ত ব্যাপারে সোনিয়াকে দুশ্চিন্তা করতে মানা করে, তাকে বারবার বলে যে ওর জন্য তার এত উদ্বেগ দেখে সে বরং বিরক্তই হয়। সোনিয়া আরও জানায় যে জেলখানায় সব বাসিন্দার সঙ্গে সে এক ব্যারাকে থাকে, ওদের ব্যারাকের ভেতরের ব্যবস্থা অবশ্য সে নিজের চোখে দেখেনি, তবে তার ধারণা অত্যন্ত ঘিঞ্জি, কুৎসিত ও অস্বাস্থ্যকর। কাঠের থাক-থাক করা তক্তপোষ— তারই একটিতে একটুকরো কম্বল বিছিয়ে সে শোয়— নিজের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করে নিতে নারাজ। কিন্তু সে যে বিশ্রীভাবে, দৈন্যদশার মধ্যে জীবন-যাপন করছে তার পেছনে যে কোন পূর্বপরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য আছে এমন নয়— এর কারণ স্রেফ নিজের ভাগ্যের প্রতি তার আপাতবৈরাগ্য ও অমনোযোগ। সোনিয়া একথাও গোপন করে না যে তার দেখতে আসার ব্যাপারে রাস্‌কোল্‌নিকভের কোন আগ্রহ তো নেইই বরং বিশেষ করে গোড়ার দিকে এতে অনেকটা বিরক্তিই প্রকাশ করত, বিশেষ কথাবার্তা বলত না এমনকি তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করত। পরে অবশ্য এই সাক্ষাৎ তার কাছে অভ্যস্ত ব্যাপারে দাঁড়ায়, এমনকি খানিকটা প্রয়োজনীয়ও হয়ে পড়ে। ফলে বেশ কয়েকদিন অসুস্থতার দরুন সোনিয়া আসতে না পারলে তার অবস্থা বড় করুণ হয়ে দাঁড়ায়। বড় ছুটিছাটার দিনে তার সঙ্গে দেখা হয় জেলখানার ফটকের সামনে অথবা পাহারাদারের ঘরে— সেখানে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে ডেকে তার সামনে হাজির করা হয় কয়েক মিনিটের জন্য। সপ্তাহের অন্যান্য দিনে দেখাসাক্ষাৎ হয় কাজের জায়গায়—সোনিয়া সেখানে ওর কাছে যায়— ওয়ার্কশপে অথবা ইটের ভাটিতে, নয়ত ইর্তিশ নদীর ধারের গুদামের চালাঘরে। নিজের সম্পর্কে সোনিয়া জানায় যে সৌভাগ্যবশত শহরে তার বেশ কিছু চেনাপরিচিতি হয়েছে, এমনকি কিছু শুভার্থীও জুটেছে। সে সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ করে। শহরে জামাকাপড় সেলাইয়ের কারিগর বলতে প্রায় কেউ নেই, ফলে অনেক বাড়িতেই সে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কেবল একটা জিনিসেরই উল্লেখ সে করেনি— সোনিয়ার তদ্বিরের ফলে ওপরওয়ালার পৃষ্ঠপোষকতায় রাস্‌কোল্‌নিকভের পরিশ্রম ও কাজকর্মের ভার বেশ খানিকটা হালকা হয়েছে। কিন্তু সোনিয়ার লেখা সাম্প্রতিক চিঠিগুলোতে দুনিয়া যেন কতকটা অস্বস্তি ও উদ্বেগের আভাসও পেয়েছিল। অবশেষে সংবাদ পাওয়া গেল যে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ সকলকে এড়িয়ে চলছে, জেলখানার অন্য কয়দিরা তাকে ভালো চোখে দেখে না। সে সারাদিন চুপচাপ থাকে, ফেকাসে হয়ে যাচ্ছে। শেষ চিঠিতে সোনিয়া হঠাৎ লিখল যে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে, সে এখন হাসপাতালে, কয়েদিদের ওয়ার্ডে।

দুই

অসুস্থ সে অনেকদিন হল। কিন্তু যা তার মনোবল ভেঙে দিয়েছে তা বন্দি জীবনের বিভীষিকা বা হাড়ভাঙা খাটুনি নয়, জেলখানায় খাবার নয়, মুণ্ডিত মস্তক নয়, কয়েদির স্বল্পবাসও নয়। না, এসব দুঃখকষ্ট, দুর্ভোগকে সে মোটেই আমল দেয় না। বরং কাজ করতে পারায় সে খুশিই। কাজ করতে-করতে শারীরিকভাবে ক্লান্ত ও অবসন্ন হওয়ার ফলে অন্তত কয়েক ঘণ্টা শান্তিতে ঘুমানোর সুযোগ পাওয়া যায়। আর তার কাছে এই খাবার— বাঁধাকপির পাতলা ঝোল, সেইসঙ্গে আরশোলা?— এরই বা কী তাৎপর্য থাকতে পারে? আগে, সেই ছাত্রজীবনে অনেক সময় তো তাও কপালে জুটত না। তার জামাকাপড় গরম এবং এখন তার যে জীবনযাত্রা তার সম্পূর্ণ উপযোগী। পায়ের বেড়িও সে উপলব্ধি করত না। তার মুণ্ডিত মস্তক আর কয়েদির মার্কামারা খাটো কোর্তার জন্য লজ্জা? কিন্তু লজ্জা কার সামনে? সোনিয়ার সামনে? সোনিয়া ওকে ভয় করে, তাই তার সামনে আবার লজ্জা কিসের?

তাহলে কী? সোনিয়ার সামনেও যে লজ্জা ছিল না তা নয়— ছিল বলেই তার প্রতি অবজ্ঞার ভাব দেখিয়ে, তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে সে তাকে কষ্ট দিত। কিন্তু তার লজ্জা মুণ্ডিত মস্তক আর পায়ের বেড়ির জন্য নয়। আসলে ঘা লেগেছিল তার অহঙ্কারে। এই আহত অহঙ্কারের ফলেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। সে যদি নিজেকে দোষী মনে করতে পারত তাহলে কী সুখীই না হত! তখন সব সহ্য করতে পারত — এমনকি এই লজ্জা, এই কলঙ্কও। কিন্তু সে কঠোরভাবে আত্মসমালোচনা করে দেখেছে— তার তিক্ত বিবেকবুদ্ধি তার অতীতের কার্যকলাপের মধ্যে মারাত্মক রকম দোষের কিছুই খুঁজে পায়নি— দোষ যদি হয়ে থাকে তা কেবল একটাই— একটা সামান্য ভুল, যা যে কারও ক্ষেত্রে ঘটতে পারত। তার লজ্জা ঠিক এই কারণে যে তাকে, রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে কিনা বিচার-বিবেচনাহীন অন্ধ ভাগ্যের কোন্ এক অঙ্গুলিহেলনে এমন মুর্খের মতো, বধির ও অন্ধের মতো, বেঘোরে মারা যেতে হচ্ছে এবং নিজের মনে অন্তত সামান্য একটু শান্তি লাভের আশায় কোথাকার কোন এক 'অর্থহীন' দণ্ডাদেশ মেনে নিতে হচ্ছে, তার সামনে নতি স্বীকার করতে হচ্ছে!

বর্তমানে অন্তঃসারশূন্য, উদ্দেশ্যহীন উদ্বেগ, আশঙ্কা আর ভবিষ্যতে শুধুই আত্মবলি, যার কোন শেষ নেই সীমা নেই, যার দ্বারা কিছুই অর্জিত হয় না— পৃথিবীতে তার সামনে এখন এটাই পড়ে আছে। আট বছর পরে তার বয়স হবে মাত্র বত্রিশ এবং তখন আবার নতুন করে জীবন শুরু করা যেতে পারে— একথা মেনে নিলেও কী আছে তার তাৎপর্য? কী কারণে তাকে বাঁচতে হবে? কী উদ্দেশ্যে? কিসের আশায়? কেবল অস্তিত্বরক্ষার জন্য জীবনধারণ? কিন্তু অতীতে কোন একটা আইডিয়ার জন্য, আশার জন্য, এমনকি কল্পনার খাতিরেও নিজের অস্তিত্বকে জলাঞ্জলি

দিতে সে হাজার বার তৈরি ছিল। শুধুই অস্তিত্ব!— এটা তার কাছে কখনই যথেষ্ট মনে হয়নি। সব সময়ই তার আকাঙ্ক্ষা ছিল আরও বেশি কিছু। হয়ত একমাত্র তার এই প্রবল বাসনার বলেই সে তখন নিজেকে এমন এক ব্যক্তি বলে ঠাউরেছিল, যার অধিকার অন্য যে কারও চেয়ে বেশি।

হায়, যদি অদৃষ্ট তার মনে জাগিয়ে তুলতে পারত অনুশোচনার ভাব!— এমন এক অনুশোচনা যা মনকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়, ভেঙে চৌচির করে দেয়, চোখের ঘুম কেড়ে নেয়, এমন এক অনুশোচনা যার নিদারুণ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে লোকে চোখের সামনে ফাঁসির দড়ি ঝুলতে দেখে, ঘূর্ণাবর্ত দেখে! আঃ, তাহলে কী আনন্দই না সে পেত! বেদনা আর অশ্রু— এও তো জীবন। কিন্তু সে তার অপরাধের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেনি।

অন্ততপক্ষে তার রাগ হতে পারত নিজের বোকামির কথা ভেবে। যেমন এর আগে হয়েছিল, ডাহা মূর্খের মতো যাচ্ছেতাই কতকগুলো কাজ করে বসার ফলে যে জেলখানায় তার ঠাঁই হয়েছে সে কথা ভেবে নিজের ওপর এরকম রাগ এর আগে তার হতও। কিন্তু এখন জেলখানাতেই *মুক্তির মধ্যে* নিজের আগেকার কার্যকলাপ আবার খুঁটিয়ে বিচার করে দেখার পর এর আগে, সেই মারাত্মক সময়টিতে যেমন মনে হয়েছিল, তেমন মূর্খামি বা যাচ্ছেতাই রকমের কিছুই সে আর খুঁজে পায় না। 'যাবৎ এই পৃথিবী আছে তাবৎ ঝাঁকে-ঝাঁকে কতই না ভাবনাচিন্তা আর তত্ত্বকথার উদয় সেখানে হচ্ছে! একটার সঙ্গে আরেকটার সঙ্ঘর্ষ বাধছে। সেগুলোর কোনটার চেয়ে কিসে বেশি নির্বুদ্ধিতা ছিল আমার ভাবনাচিন্তায়? কিসে?' সে মনে-মনে ভাবল 'কেউ যদি গতানুগতিকতার প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও উদার দৃষ্টিতে বিষয়টাকে দেখে তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবে আমার ভাবনা মোটেই তেমন... অদ্ভুত ছিল না। ওহে, নেতিবাদী আর পাঁচ পয়সার পণ্ডিতের দল, তোমরা মাঝপথে থেমে যাও কেন বল তো?

'কিন্তু কিসে আমার কাজটা ওদের কাছে এত জঘন্য বলে মনে হচ্ছে?' সে নিজেকে প্রশ্ন করল। 'অনিষ্টকর' বলে? 'অনিষ্টকর' কথাটার অর্থ কী? আমি আমার বিবেকের কাছে পরিষ্কার। এটা ঠিক যে ফৌজদারি দণ্ডবিধি মতে অপরাধ আমি করেছি। এটা ঠিক যে আইনের শাসন আমি লঙ্ঘন করেছি, রক্তপাত করেছি— তা ঠিক আছে— আইনের শাসনের খাতিরে না হয় আমার মাথা কাট... তা হলেই তো চুকে গেল! অবশ্য হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে কিন্তু মানবজাতির হিতাকাঙ্ক্ষীদের অনেককে...যাঁরা উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতার অধিকারী না হয়ে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছেন... তাঁদের অনেককেই তাঁদের প্রথম পদক্ষেপের একেবারে সঙ্গে-সঙ্গে কোতল করতে হত। কিন্তু ওই মানুষগুলো তাঁদের প্রথম পদক্ষেপে সফল হয়েছিলেন, তাই *তাঁরা সঠিক*। আর আমি যেহেতু ব্যর্থ হয়েছি তার মানে ওই পদক্ষেপ করার কোন অধিকারই আমার ছিল না।'

একমাত্র যেটাকে সে তার অপরাধ বলে স্বীকার করে তা এই যে সে টিকে থাকতে পারেনি এবং নিজে আগ বাড়িয়ে স্বীকারোক্তি করে এসেছে।

সে কষ্ট পাচ্ছিল আরও একটি কথা ভেবে: তখন সে কেন নিজের জীবনের পালা চুকিয়ে দিতে পারল না? যখন সে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ছিল তখন কেনই বা যেচে অপরাধ স্বীকার করাটা তার কাছে তুলনায় ভালো মনে হয়েছিল? বাঁচার এই যে আকাঙ্ক্ষা তা কি তাহলে এতই দুর্নিবার? তাকে অতিক্রম করা কি এতই কঠিন? স্‌ভিদ্রিগাইলভ্‌ তো মৃত্যুকে ভয় করত, তাহলে সে এই বাধা অতিক্রম করল কী করে?

নিজেকে এই প্রশ্ন করতে গিয়ে সে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে, কিন্তু বুঝতে পারেনি যখন সে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ছিল হয়ত তখনই সে মনে-মনে টের পেয়ে গিয়েছিল তার নিজের মধ্যে এবং তার বিশ্বাসের কোথাও একটা বড় রকমের মিথ্যা আছে। সে বুঝতে পারেনি যে সেই উপলব্ধি তার জীবনের পরম সন্ধিক্ষণের, তার ভবিষ্যৎ পুনরুজ্জীবন ও ভাবী জীবনবোধের অগ্রদূত হতে পারে।

এসবের মধ্যে সম্ভবত সে দেখতে পেয়েছিল শুধুই স্থূল সহজাত প্রবৃত্তির চাপ, যা ভেঙে বেরিয়ে আসার সাধ্য তার ছিল না, যে বাধা তার নিজের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার দরুন এবারেও লঙ্ঘনের ক্ষমতা তার হয়নি। রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ অবাক হয়ে যায় তার সঙ্গী কয়েদিদের দেখে— ওরা সকলে এত ভালোবাসে জীবনকে, এত মূল্য দেয় জীবনকে। তার মনে হল ঠিক জেলখানাতেই যেন লোকে জীবনকে আরও বেশি করে ভালোবাসে, তার আরও বেশি মূল্য দিতে শেখে... এত বেশি সমাদর করে যে মুক্ত জীবনেও কেউ তেমন করে না। এদের মধ্যে কাউকে-কাউকে, যারা ভবঘুরে, তাদের মতো লোকজনকে কী দারুণ কষ্ট আর পীড়নই না সহ্য করতে হয়েছে। কোথায় কোন্‌ ফাঁক দিয়ে সূর্যের একচিলতে কিরণ প্রবেশ করছে, তা কি তাদের কাছে এতই বড়? কোন ভবঘুরের কাছে কী করেই বা এত বড় হয়ে দেখা দিতে পারে কোথাকার কোন্‌ আদিম অরণ্য, সুদূর কোন নির্জন দুর্গম প্রদেশে শীতল প্রস্রবণের প্রবাহ, যা হয়ত বা আজ থেকে তিন বছর আগে কোন একসময় তার চোখে লেগেছিল। অথচ এখনও দয়িতার সঙ্গে মিলনের আগ্রহ নিয়ে তাকে দেখার জন্য সে ব্যাকুল, এখনও স্বপ্নে দেখে থাকে সেখানকার দৃশ্য : চতুর্দিকে সবুজের সমারোহ, শুনতে পায় ঝোপের আড়ালে পাখির কূজন? তা কী করে সম্ভব? আরও বেশি খুঁটিয়ে দেখার পর এমন সব দৃষ্টান্ত তার নজরে এলো যার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া আরও দুরূহ।

জেলখানার পরিবেশের মধ্যে অবশ্য আরও এমন অনেক কিছু ছিল যা সে লক্ষ করেনি। লক্ষ করার মতো মানসিকতাও তার ছিল না। সে চলত অনেকটা যেন দুচোখ মাটিতে নামিয়ে। চোখ তুলে তাকাতে তার অসহ্য লাগত, বিশ্রী লাগত। কিন্তু শেষে অবাক হওয়ার মতো অনেক কিছুই তার নজরে পড়তে লাগল। ইচ্ছেয় হোক,

অনিচ্ছায় হোক, এমন সমস্ত জিনিস তার নজরে পড়তে লাগল যার সম্পর্কে আগে কখনও কোন ধারণা ছিল না। তবে মোটের ওপর, তাকে বেশি অবাক করতে থাকে এই সব লোকজন আর তার নিজের মাঝখানের দুস্তর ও ভয়ঙ্কর ব্যবধান। মনে হত সে এবং ওরা— যেন দুই ভিন্ন জাতের। সে এবং ওরা— পরস্পরের দিকে তাকাত, অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের দৃষ্টিতে। এই বিচ্ছিন্নতার সাধারণ কারণ সে জানত, বুঝতেও পারত। কিন্তু সেই কারণগুলো যে আসলে এত গভীর, এত প্রবল, আগে কখনও তার ধারণা ছিল না। জেলখানায় আরও ছিল কিছু নির্বাসিত পোল, রাজবন্দি। এরা আবার বাদবাকিদের স্রেফ গেঁয়ো চাষাভুষো শ্রেণীর লোক বলে মনে করত, উদ্ধত ভাব দেখাত, সকলকে যখন-তখন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ কিন্তু সেভাবে দেখতে পারছিল না— সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল যে ওই গেঁয়ো লোকগুলো এই পোলগুলোর চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। রুশীদের মধ্যেও কেউ- কেউ ছিল, একজন প্রাক্তন অফিসার আর ধর্মীয় বিদ্যালয়ের দুই ছাত্র... যারা ওই সাধারণ লোকগুলোকে খুবই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তাদের ভুল পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল।

তাকেও কেউ ভালোবাসত না, সকলে এড়িয়ে চলত। শেষে এমন অবস্থা হল যে সকলে তাকে ঘৃণা করতে লাগল— কেন? কারণটা সে জানত না। যাদের অপরাধ তার চেয়েও অনেক বেশি, তারা ওকে নিয়ে, ওর অপরাধ নিয়ে হাসাহাসি করত, ওকে অবজ্ঞা করত।

"আরে তুমি হলে গিয়ে বাবু মানুষ!" ওরা তাকে বলত। "কুড়ুল নিয়ে চলাফেরা করা কি তোমার শোভা পায়! মোটেই বাবুদের কম্ম নয়!"

লেন্ট পরবের দ্বিতীয় সপ্তাহে ব্যারাকের অন্যান্যদের সঙ্গে রাস্‌কোল্‌নিকভেরও পালা এলো যথারীতি সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করে প্রার্থনা সভায় যোগ দেবার। অন্যদের সঙ্গে সেও গির্জায় প্রার্থনা করতে যেত। এরই মধ্যে একদিন, কেন সে নিজেও জানে না, ঝগড়া বেধে গেল। সকলে তার ওপর ভয়ঙ্কর খাপ্পা হয়ে উঠল।

"তুই একটা পাষণ্ড, নাস্তিক। তুই ভগবানে বিশ্বাস করিস না!" ওরা চিৎকার করতে লাগল। "তোকে খুন করা দরকার।"

ভগবান সম্পর্কে, বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে ওদের সঙ্গে তার কস্মিনকালে কোন কথা হয়নি, অথচ ওরা ওকে নাস্তিক ধরে নিয়ে খুন করতে চায়। সে চুপ করে রইল। ওদের কথার কোন প্রতিবাদ করল না। একজন কয়েদি ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে ওর দিকে ধেয়ে গেল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ শান্তভাবে চুপচাপ ওর আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে লাগল। তার ভুরুতে এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা দিল না, মুখের একটা মাংসপেশীও এতটুকু কাঁপল না। সঙ্গী পাহারাদারটি ঠিক সময়মতো রাস্‌কোলনিকভ্ আর তার আক্রমণকারীর মাঝখানে এসে না দাঁড়ালে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যেত।

তার কাছে মীমাংসার অসাধ্য ছিল আরও একটা প্রশ্ন: সোনিয়াকে ওরা সকলে

কেন এত ভালোবাসে? সোনিয়া ওদের তোষামোদ করে না, ওদের সঙ্গে তার দেখা হয় কদাচিৎ, তাও আবার অনেক সময় কেবল কাজের জায়গায়। সেখানে সে মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য আসত রাস্‌কোল্‌নিকভের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, সকলে ইতিমধ্যেই তাকে চেনে, এও জানে যে সোনিয়া ওর সঙ্গে স্বেচ্ছায় এসেছে। সোনিয়া কোথায় কী ভাবে বসবাস করছে তাদের জানা আছে। সে ওদের টাকা-পয়সা দিত না, তাদের বিশেষ কোন কাজও যে করে দিত এমন নয়। শুধু একবার বড়দিনের উৎসবের সময় জেলখানার সকলের জন্য পিঠে আর সাদা রুটি উপহার এনেছিল। কিন্তু অল্প-অল্প করে সোনিয়ার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক বেশ খানিকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। সোনিয়া ওদের হয়ে ওদের আত্মীয়স্বজনের কাছে চিঠি লিখত, সেগুলো ডাকে পাঠাত। ওদের আত্মীয়স্বজন শহরে এলে ওদের নির্দেশমতো ওদের জন্য জিনিসপত্র, এমনকি টাকা-পয়সা তারা সোনিয়ার জিম্মায় রেখে দিত। ওদের বৌ বা প্রেমিকারা যারা দেখা করতে আসত তারাও ওকে জানত, ওর কাছে যেত। রাস্‌কোল্‌নিকভের কাছে তার কাজের জায়গায় আসার সময় অথবা কয়েদির দল যখন-যখন কাজে যেত তখন পথে যদি তাকে দেখতে পেত, তারা সবাই টুপি খুলে মাথা নোয়াত। "মা জননী সোফিয়া সেমিওনভ্‌না, আমাদের বড় স্নেহময়ী, করুণাময়ী মা জননী গো!" অশিষ্ট, অমার্জিত এই ছাপমারা কয়েদিগুলো পাতলা ছোটখাটো গড়নের এই জীবটিকে সমীহ করে বলত। সোনিয়া হাসত। সেও হাসতে-হাসতে মাথা নুইয়ে ওদের নমস্কার ফিরিয়ে দিত। ওকে হাসতে দেখে ওদের সকলের ভালো লাগত। ওরা ওর চলনভঙ্গি পর্যন্ত পছন্দ করত, ফিরে তাকিয়ে দেখত ওকে, ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়ত। এমনকি ও যে এত ছোট সেটাও ওদের প্রশংসার বিষয় ছিল। কী বলে যে প্রশংসা করবে তাও ঠিক জানত না। তার কাছে রোগের চিকিৎসার জন্যও আসত।

লেন্ট পরবের শেষ দিকের পুরোটা এবং ইস্টারের সময় রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌ হাসপাতালে পড়ে রইল। সে যখন আরোগ্য লাভের পথে, সেই সময় তার মনে পড়ে গেল জ্বর ও বিকারের ঘোরে দেখা তার স্বপ্নের কথা। অসুস্থতার সময় স্বপ্নে তার মনে হয়েছিল এশিয়ার গভীর অভ্যন্তর থেকে শুরু করে ইউরোপ পর্যন্ত গোটা পৃথিবীটা যেন এক অশ্রুতপূর্ব ও অদৃষ্টপূর্ব ভয়াবহ মহামারীর শিকার হতে চলেছে। ঈশ্বরের মনোনীত মাত্র কয়েকজন, অতি সামান্য কয়েকজন ছাড়া আর সকলেরই ধ্বংস আসন্ন। কোথা থেকে এক ধরনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রোগজীবাণু দেখা দিয়েছে, মানুষের দেহের ভেতরে তারা বাসা বাঁধছে। কিন্তু ঠিক জীবাণু এরা নয়— এরা প্রেতযোনি, যথেষ্ট বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। যে সমস্ত মানুষের দেহে এরা বাসা বাঁধছে তারা সঙ্গে-সঙ্গে ভূতগ্রস্ত ও উন্মাদ হয়ে পড়ছে। কিন্তু এই ব্যাধিতে আক্রান্ত লোকজন নিজেদের যে জ্ঞানী ও সত্যনিষ্ঠ বলে ভাবে সেরকম কেউ কখনও, কোনও

কালে ভাবতে পারেনি। এর আগে আর কখনও মানুষকে তার নিজের সিদ্ধান্তে, নিজের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে, নীতিবোধে ও বিশ্বাসে এমন অবিচলিত দেখা যায়নি। একের পর এক লোকবসতি, শহরের পর শহর, পুরোপুরি একেকটা জাতি এই রোগের কবলে পড়ে গেল, উন্মাদ হয়ে গেল। সবাই আশঙ্কাগ্রস্ত, কেউ কাউকে বুঝতে পারে না, প্রত্যেকে ভাবছে সত্য একমাত্র তারই অধিগত। একে অন্যকে দেখে কষ্ট পাচ্ছে, বুক চাপড়াচ্ছে, কাঁদছে, অসহায়ের মতো হাত-পা ছুঁড়ছে। কেউ জানে না কার বিচার করবে, কী ভাবে করবে। কোনটা ভালো কোনটা মন্দ এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে একমত তারা হতে পারছে না। বুঝতে পারছে না কাকে দুষবে, কাকেই বা রেহাই দেবে। অর্থহীন বিদ্বেষের জ্বালায় মানুষ একে অপরকে হত্যায় মেতে উঠেছে। বিশাল বিশাল সেনাবাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়ে এক দল আরেক দলের ওপর আক্রমণের উদ্যোগ নিচ্ছে, কিন্তু সেনাবাহিনী অভিযানের নামার পথেই আচমকা নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে মেতে উঠছে, বাহিনীর সারি ভেঙে পড়ছে, সৈন্যরা একে অন্যকে আক্রমণ করছে, নিজেদের মেরে-কেটে সাফ করছে, কামড়ে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে খেয়ে ফেলছে। নগরে-নগরে সারাদিন ধরে বাজছে বিপদ সঙ্কেত— আহ্বান সকলের উদ্দেশ্যে। কিন্তু কে কেন কিসের আহ্বান জানাচ্ছে কেউ জানে না— সবাই শঙ্কিত। লোকে নিত্যকার কাজকারবার বন্ধ করে বসে আছে। প্রত্যেকেই যার-যার নিজের ভাবনাচিন্তা শোধরানোর নিজস্ব উপায় বাতলাতে শুরু করে দিয়েছে কিন্তু কেউ কারও সঙ্গে একমত হতে পারছে না। চাষবাসও বন্ধ। কোথাও-কোথাও দেখা গেল লোকজন নানা জায়গা থেকে এসে দলে-দলে জমায়েত হচ্ছে, কোন-কোন বিষয়ে একমত হচ্ছে, আর কখনও তাদের ছাড়াছাড়ি হবে না বলে দিব্য করছে, কিন্তু এইমাত্র তারা নিজেরাই যে প্রস্তাব করল ঠিক পরমুহূর্তে শুরু হয়ে গেল তার একেবারে উলটো ব্যাপার— তারা একে অন্যকে দোষারোপ করতে লাগল, নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি হানাহানি শুরু করে দিল। এরপর শুরু হল অগ্নিকাণ্ড, দুর্ভিক্ষ। লোকজনের প্রাণহানি ঘটতে লাগল, সব রসাতলে যেতে বসল। মহামারীর প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়ে চলল, দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। সারা পৃথিবীতে মাত্র গুটিকয়েক মানুষ এর হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন— তাঁরা ঈশ্বরের মনোনীত, শুদ্ধচরিত্রের মানুষ। তাঁদের ওপর বর্তেছে মানবজাতির নতুন বংশধারা প্রবর্তন ও নবজীবন সূচনার এবং পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করে নতুন করে গড়ার দায়িত্ব। কিন্তু তাঁদের কেউ কোথাও কখনও দেখেনি, তাঁদের বাণী তাঁদের কণ্ঠস্বর কেউ কখনও শোনেনি।

এরকম একটা উদ্ভট আবোল-তাবোল চিন্তা যে তার স্মৃতিতে বারবার হানা দিয়ে তাকে এত বিষণ্ণ ও যন্ত্রণায় অস্থির করে তুলছে, জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন অবস্থায় ওই স্বপ্নের প্রভাব যে সে কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না এই ভেবে রাস্‌কোল্‌নিকভের দারুণ অস্বস্তি হচ্ছিল। ইস্টারের পর দ্বিতীয় সপ্তাহ চলছিল।

বসন্তের উষ্ণ দিন, নির্মল আকাশ। কয়েদিদের ওয়ার্ডের জানলাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে— যদিও সেগুলো জাল দিয়ে ঘেরা, জানলার নিচেই দাঁড়িয়ে আছে সান্ত্রী। রাস্‌কোল্‌নিকভের অসুস্থতার এই এতকালের মধ্যে সোনিয়া মাত্র দুবার ওয়ার্ডে তার সঙ্গে দেখা করতে পেরেছে। প্রতিবার অনুমতি ভিক্ষা করতে হত, অনুমতি পাওয়াও কঠিন ছিল। তবে হাসপাতালের চত্বরে, জানলার ধারে সে প্রায়ই আসত — বিশেষত সন্ধ্যাবেলা— সেও কয়েক মুহূর্তের জন্য, অনেক দূর থেকে ওয়ার্ডের জানলার দিকে চেয়ে দেখত মাত্র। একদিন, রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তখন প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে, সন্ধ্যার দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘুম ভাঙার পর উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হঠাৎ দূরে হাসপাতালের গেটের কাছে সোনিয়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। দেখে মনে হচ্ছিল কোন কিছুর প্রতীক্ষায় আছে। সেই মুহূর্তে রাস্‌কোল্‌নিকভ্ বুকের ভেতরে একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করল। চমকে উঠে সে তাড়াতাড়ি জানলা থেকে সরে গেল। পরদিন সোনিয়া এলো না, তার পরদিনও না। রস্‌কোল্‌নিকভ্ মনে-মনে অনুভব করল যে সে উদ্বিগ্ন হয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছে। শেষকালে হাসপাতাল থেকে সে ছাড়া পেল। জেলখানায় ফিরে আসার পর অন্য কয়েদিদের মুখে খবর পেল যে সোনিয়া সেমিওনভ্না অসুস্থ হয়ে পড়েছে, বাড়িতেই শুয়ে আছে, কোথাও বের হতে পারছে না।

খুবই অস্থির হয়ে পড়ল রাস্‌কোল্‌নিকভ্। ওর খোঁজখবর নেওয়ার জন্য লোক পাঠাল। শিগগিরই জানতে পারল সোনিয়ার অসুস্থতা গুরুতর কিছু নয়। সোনিয়া যখন জানতে পারল রাস্‌কোল্‌নিকভ্ তার কথা ভেবে খুবই বিচলিত ও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তখন সে তাকে পেনসিলে লেখা একটা চিরকুট পাঠিয়ে জানাল যে সে এখন অনেক ভালো আছে। সাধারণ, হালকা ধরনের সর্দিকাশি হয়েছিল। শিগ্‌গিরই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাস্‌কোল্‌নিকভের কাজের জায়গায় তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। চিঠিটা পড়তে-পড়তে তার বুকের ভেতরটা বেদনায় টনটন করে উঠল, তোলপাড় করে উঠল।

আজকের এই দিনটাও উষ্ণ, আজও আকাশ নির্মল। খুব ভোরে, প্রায় ছ'টা নাগাদ সে নদীর ধারে কাজের জায়গায় রওনা দিল। সেখানে চুনাপাথর গুঁড়িয়ে চালাঘরে একটা ভাটিতে পোড়ান হয়ে থাকে। মোট তিনজন কয়েদিকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। ওদের মধ্যে একজন সঙ্গী প্রহরীর রক্ষণাবেক্ষণে কিছু যন্ত্রপাতি আনতে দুর্গে গিয়েছিল। আরেকজন কাঠ চিরে ভাটিতে আঁচ দেওয়ার আয়োজন করছিল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ চালাঘর ছেড়ে সোজা নদীর ধারে চলে গেল। সেখানে চালাঘরের কাছে থরে-থরে কাঠের গুঁড়ি সাজান— তার ওপর গিয়ে বসল। তাকিয়ে রইল নদীর বিস্তীর্ণ ধু-ধু জলরাশির দিকে। নদীর উঁচু পাড় থেকে সামনে চোখে পড়ে প্রশস্ত দৃশ্যপট। ওপারের অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে গানের ক্ষীণ আওয়াজ। সেখানে

আদিগন্তপ্রসারী সূর্যস্নাত স্তেপের বুকে কালো-কালো বিন্দুর মতো যাযাবরের তাঁবুগুলো চোখে পড়ে কি পড়ে না। ওখানে আছে মুক্তি, ওখানে থাকে অন্য সব মানুষ—ওপারে যারা আছে তাদের চেয়ে এতই আলাদা যে মনে হয় ওখানে যেন সময় থেমে গেছে, যেন আব্রাহামের সেই মান্ধাতার আমল আর তার মেষপাল এখনও রয়ে গেছে সেখানে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ স্থির হয়ে বসে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেদিকে। তার চিন্তা দিবাস্বপ্নে, ধ্যানমগ্নতায় পর্যবসিত হতে যাচ্ছিল। বিশেষ কিছু যে সে ভাবছিল তা নয়, কিন্তু কিসের যেন একটা বেদনা তাকে আকুল করে তুলছিল, উতলা করে তুলছিল।

এমন সময় তার পাশে সোনিয়ার আবির্ভাব ঘটল। সে প্রায় নিঃশব্দে এসে ওর পাশে বসল। তখনও বেশ সকাল। ভোরের শিরশিরে ঠাণ্ডাটা তখনও কাটেনি। সোনিয়ার গায়ে হাতাছাড়া সেই ঢিলে পোশাক আর সেই সবুজ শাল। তার মুখে এখনও অসুস্থতার ছাপ। জীর্ণ, পাণ্ডুর মুখ। কোটরে বসে গেছে চোখ। সোনিয়া ওর দিকে তাকিয়ে স্বাগত জানানোর ভঙ্গিতে, উৎফুল্ল হয়ে হাসল। হাতখানা বরাবরের মতোই বাড়িয়ে দিল সলজ্জভাবে।

সোনিয়া সব সময়ই ওকে স্বাগত জানানোর সময় হাতখানা বাড়িয়ে দিত দ্বিধাগ্রস্ত সলজ্জ ভঙ্গিতে। কখন-কখন আবার হাত বাড়াতই না, যেন পাছে রাস্‌কোলনিকভ্ তার হাত ঠেলে সরিয়ে দেয় এই ভয়ে। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ সব সময় কেমন যেন বিতৃষ্ণার সঙ্গে ওর হাত ধরত, তাকে দেখে মনে হত ওর সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে বিরক্ত, কখন-কখন ওদের সাক্ষাতের সময় সারাক্ষণ ধরে মুখ গোঁজ করে থাকত। কখন-কখন এমনও হয়েছে যে রাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে দেখে ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে মনে বড় দুঃখ পেয়ে সে চলে গেছে। কিন্তু এবারে আর দু-হাতের জোড় আলাদা হল না। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ মুখে কোন কথা না বলে দ্রুত একপলকে দেখল তাকে, পরক্ষণেই মাটিতে চোখ নামিয়ে নিল। এখন ওরা শুধু দুজনে। কেউ ওদের দেখছে না। সঙ্গী প্রহরীটি এই মুহূর্তে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে আছে।

কী করে ঘটল সে নিজেও জানে না, হঠাৎ মনে হল কোন এক অদৃশ্য শক্তি ওকে চেপে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিল সোনিয়ার পায়ের কাছে। সে কাঁদতে-কাঁদতে সোনিয়ার দুই হাঁটু জড়িয়ে ধরল। প্রথম এক মুহূর্ত সোনিয়া ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল, তার সারা মুখ মড়ার মতো সাদা হয়ে গেল। একলাফে সরে গিয়ে থরথর করে কাঁপতে-কাঁপতে সে তাকাল ওর দিকে। কিন্তু তখনই, ঠিক সেই মুহূর্তে তার আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না। অপরিসীম সুখের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ল তার দুচোখে। সোনিয়া বুঝতে পারল, তার মনে এখন আর এতটুকু সন্দেহ নেই যে ও তাকে ভালোবাসে, ওর সেই ভালোবাসার কোন সীমাপরিসীমা নেই। ও জানত শেষ পর্যন্ত এসেছে সেই পরম ক্ষণটি।...

ওরা কথা বলতে গেল, কিন্তু দুজনের কারও মুখে কোন কথা সরল না। জলে ভরে উঠেছে দুজনেরই চোখ। দুজনেই পাণ্ডুর, শীর্ণ। কিন্তু ওদের ওই অসুস্থ ও পাণ্ডুর মুখ সম্পূর্ণ নতুন জীবনবোধের পুনরুজ্জীবনে, নবজীবনলাভের উষার আলোকে প্রদীপ্ত। প্রেম তাদের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছে। ওদের একজনের হৃদয় এখন আরেকজনের হৃদয়ের জন্য জীবনের অনন্ত উৎস।

ওরা স্থির করেছে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবে। ওদের এখনও বাকি আছে সাত বছর। এ সময় যতদিন শেষ না হচ্ছে ততদিন কত অসহ্য যন্ত্রণা সেই সঙ্গে কী অপরিসীম সুখই না ওদের ভাগ্যে আছে! কিন্তু এটা ঠিক যে তার পুনরুজ্জীবন ঘটেছে, সে নিজেও তা জানে, সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারছে তার সমগ্র নবলব্ধ সত্তা দিয়ে। আর সোনিয়া? রাস্‌কোল্‌নিকভের জীবনই তো এতদিন ছিল তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান!

ওই দিনই সন্ধ্যাবেলা ব্যারাকের যখন তালাবন্ধ হয়ে গেছে তখন রাসকোল্‌নিকভ্ তার তাকের তক্তপোষে শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগল সোনিয়ার কথা। সেদিন এমনকি তার এও মনে হয়েছিল যে তার এককালের শত্রুরা, কয়েদিরা সকলে যেন ইতিমধ্যেই তাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে দিয়েছে। এমনকি সে নিজে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছিল। দেখা গেল ওরাও বেশ ভালোভাবে ওর কথার উত্তর দিচ্ছে। এখন সেকথা মনে পড়তে মনে-মনে ভাবল এরকমই তো হওয়া উচিত। এখন সব কিছুর বদল হওয়াটাই কি স্বাভাবিক নয়?

রাস্‌কোল্‌নিকভ্ ভাবছিল ওর কথা। তার মনে পড়ে গেল সব সময় সে ওকে কত যাতনা দিয়েছি, ওর মনে কত ব্যথাই না দিয়েছে! মনে পড়ে গেল ওর শীর্ণ, পাণ্ডুর মুখখানা। কিন্তু এসব স্মৃতি তাকে এখন আর তেমন যন্ত্রণা দিচ্ছিল না, কারণ সে জানে কী অপরিসীম প্রেম দিয়ে এখন সে ওর সমস্ত দুঃখকষ্টের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবে।

তাছাড়া অতীতের এই যে এত জ্বালাযন্ত্রণা— সে আর এমন কী! সবই, এমনকি তার অপরাধ, তার দণ্ড, তার নির্বাসন পর্যন্ত এখন, উচ্ছ্বাসের প্রথম ধাক্কায় তার মনে হচ্ছিল অনেকটা যেন বাহ্য, অদ্ভুত! যেন এসব ঘটনা আদৌ তার জীবনে ঘটেনি। অবশ্য সেদিন সন্ধ্যায় স্থিরভাবে কোন একটা বিষয় নিয়ে ভাবার মতো বা কোন নির্দিষ্ট চিন্তায় একাগ্র মনোযোগ দেওয়ার মতো মানসিক অবস্থা তার ছিল না। সচেতনভাবে কোন কিছুর মীমাংসা করার ক্ষমতা তার এই মুহূর্তে ছিল না, এখন তার পক্ষে একমাত্র যা সম্ভব তা হল উপলব্ধি করা। দ্বন্দ্বের বদলে শুরু হল জীবন। তার চৈতন্যে এখন সম্পূর্ণ অন্য কিছুর বিকাশ আপনা-আপনি ঘটতে বাধ্য।

রাস্‌কোল্‌নিকভের বালিশের তলায় বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টখানা ছিল। সে যন্ত্রচালিতের মতো সেটা বের করল। এটা সোনিয়ার। এই থেকেই সোনিয়া তাকে পড়ে শুনিয়েছিল ল্যাজারাসের পুনরুত্থান কাহিনী। বন্দিজীবনের শুরুতে তার মনে

হয়েছিল সোনিয়া ধর্ম-ধর্ম করে তাকে অতিষ্ঠ করে ছাড়বে, বাইবেলের সুসমাচারের প্রসঙ্গ তুলবে, তার ওপর ওসব পুথি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু সে ভীষণ অবাক হয়ে গেল যখন দেখল সোনিয়া একবারও এই প্রসঙ্গ তোলেনি, এমনকি একবারও ওকে সুসমাচার পড়ার কথা বলেনি। বাইবেলটা নিজেই ও চেয়ে নিয়েছিল সোনিয়ার কাছ থেকে, সে অসুস্থ হওয়ার মাত্র দিনকয়েক আগে। সোনিয়া কোন কথা না বলে ওকে এনে দিয়েছিল। এখন পর্যন্ত একবারও খুলে দেখেনি।

এখনও খুলল না। কিন্তু তার মাথার মধ্যে খেলে গেল একটা চিন্তা: 'ওর যা বিশ্বাস তা এখন আমারও বিশ্বাস হবে না— সে কী করে হয়? ওর অনুভূতি, ওর আশা-আকাঙ্ক্ষা, অন্ততপক্ষে...'

সোনিয়াও সেদিন সর্বক্ষণ অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়েছিল। এমনকি রাতে সে অসুস্থই হয়ে পড়েছিল। তার মনে তখন সুখের সীমা নেই। নিজেকে সে এত সুখী ভাবছিল যে একেকবার প্রায় আশঙ্কিত হয়ে পড়ছিল। তার মনে হচ্ছিল এত সুখ তার কপালে সইবে কি! সাত বছর। *মাত্র* সাতটি বছর! ওদের সুখোদয়ের সূচনায় কখন-কখন এমন একেকটি মুহূর্তও এসেছিল যখন এই সাতটি বছরকে ওরা দুজনেই সাতটি দিন হিসেবে দেখতে প্রস্তুত ছিল। রাস্‌কোল্‌নিকভ্ এও জানত না যে তার নবজীবনপ্রাপ্তি অমনি-অমনি ঘটছে না— এর মূল্য পরিশোধ করতে হবে, এর জন্য তাকে অনেক মূল্য দিতে হবে ভবিষ্যতে বিপুল কীর্তি স্থাপন করে।...

কিন্তু এখানে শুরু হচ্ছে এক নতুন ইতিকথা— নবজীবনের পথে একজন মানুষের ক্রমবিকাশের কাহিনী, এক জগৎ থেকে আরেক জগতে, নবজন্মে তার ধারাবাহিক উত্তরণের কথা। অভিনব, অজ্ঞাতপূর্ব এক বাস্তবতার সঙ্গে তার পরিচয়ের কথা। সেসব আরেক নতুন কাহিনীর বিষয়বস্তু হতে পারে। কিন্তু আমাদের এই কাহিনীর এখানেই ইতি।

অপরাধ ও শাস্তি শুধু রুশ সাহিত্যের কেন, বিশ্ব সাহিত্যের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের জার আমলের সেন্ট পিটার্সবুর্গের অবক্ষয়ী পটভূমিকায় রচিত এই আলোড়নকারী ক্ল্যাসিক উপন্যাস যে কোনও সাহিত্যরসিকের আকর্ষণীয় বিষয়ে সমৃদ্ধ : একাধারে অপরাধ ও তার অনুসন্ধানের জটিল ও অভিনব কাহিনী, ঠাসবুননি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মানুষের চিরন্তন বিদ্রোহের মহানাটক। কাহিনীর নায়ক রাস্‌কোল্‌নিকভ্ এক দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্ব, মানসিকভাবে নির্যাতিত বুদ্ধিজীবী, যার উদ্দেশ্য ছিল একটি নিখুঁত অপরাধ সংগঠন করে তার মাধ্যমে নিজেকে অতিমানব রূপে প্রতিষ্ঠিত করা। উপন্যাসটি একটি পর্যায়ে প্রচণ্ড উত্তেজনাপূর্ণ রহস্যকাহিনীর আকার নিলেও এখানে লেখক যে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তা রহস্যকাহিনীর সম্পূর্ণ বিপরীত। মানুষের দুর্জ্ঞেয় মনোজগৎ ও তার বিচিত্র অভিসন্ধির উন্মোচনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও একটি বিষয় — মানসিক যন্ত্রণা ভোগের মধ্য দিয়ে তার আত্মার মুক্তি, নৈতিক শুদ্ধি।

ফিওদর দস্তইয়েভ্‌স্কির (১৮২১-১৮৮১) জন্ম হয়েছিল মস্কোয়। সেন্ট পিটার্সবুর্গের মিলিটারী ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতক হওয়ার পর ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে *গরিব লোক* নামে ছোট উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। এক সময় রাজনৈতিক বিপ্লবীদের একটি গোপন দলের সঙ্গে সংস্রব থাকার অভিযোগে জারের পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। রাজদ্রোহের দায়ে অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনিও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু বন্দীরা যখন বধ্যভূমিতে ফায়ারিং স্কোয়াডের সম্মুখীন ঠিক সেই মুহূর্তে মৃত্যুদণ্ড মকুব করে তাঁদের নির্বাসন দণ্ডের আদেশ আসে। পাঁচ বছর সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দণ্ড ভোগের পর দস্তইয়েভ্‌স্কি মুক্তি পান। *অপরাধ ও শাস্তি* (১৮৬৬), *জুয়াড়ি* (১৮৬৭), *ইডিয়ট* (১৮৬৯), *ব্রাদার্স কারামাজভ্* (১৮৮০) তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা।

অরুণ সোম (জ. ১৯৩৮) রুশ ভাষার বিশেষজ্ঞ, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক ও সাংবাদিক। মস্কোর প্রগতি ও রাদুগা প্রকাশনের দীর্ঘ দুই দশকের কর্মসূত্রে রুশ ও সোভিয়েত ক্ল্যাসিক, শিশুসাহিত্য, গল্প, উপন্যাস, গোগল, তুর্গেনেভ্, তলস্তোয়, চেখভ্, শোলখভ্ প্রমুখের রচনা মূল রুশ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন বাংলা অনুবাদের সম্পাদনা এবং বাংলা থেকে রুশ ভাষায় অনূদিত একাধিক গ্রন্থের উপদেষ্টার কাজও করেন। ছোটবড় মিলিয়ে অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা অর্ধশতাধিক।

প্রচ্ছদ : মুনীন্দ্র রাজবংশী

মূল্য : ১৮০ টাকা
ISBN 81-260-2175-6